প্রকাশক : শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীমৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাবা ও মা-কে

···গৌরচন্দ্রিকা···

নানাকারণে লোকসাহিত্যের উভয় বঙ্গীয় গবেষণা-ধারাটি ক্ষীণ ও দুর্বল। অনেক প্রাজ্ঞ-প্রবীণ অধ্যাপকদের মধ্যেও লোকসাহিত্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ ধারণার অভাব দেখেছি। বিষয়টিকে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় ও অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করে থাকেন। বাঙলা সমালোচনা ও গবেষণার ধারায় লোকসাহিত্যের আলোচনা-গবেষণাকে তাঁরা অনভিজাত, সহজ-তরল ও নিম্ন-মানের বলে মনে করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের সমবেদনার অভাব থাকলেও দোষ কিন্তু সবটুকুই তাঁদের নয়। দোষ লোকসাহিত্যেরই আলোচক-গবেষক-সঙ্কলকদের। তাঁদেরই অর্ধ-মনস্কতা ও গবেষণায় অপূর্ণতা পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষদের লোকসাহিত্য সম্পর্কে এমন ধারণা করতে বাধ্য করেছে। এই বিক্ষোভ-বোধ থেকেই এই বইয়ের জন্ম। আমার প্রয়াস নানাকারণে বিঘ্নিত, খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ; তথাপি, এই প্রয়াসের কণামাত্র সাফল্যও যদি কোনো সাহিত্যানুরাগীকে সামান্যতম আনন্দও দিতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

লোকসাহিত্যের গবেষণার তিনটি স্তর আছে: সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সমীক্ষা। তিনটিই এক জনের করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। প্রস্তুত গ্রন্থে কেবল সঙ্কলন ও সমীক্ষার দিকটিই আছে। সংগ্রহ আমার নয়, তা বিভিন্ন জনের।

'বাঙলা ছড়ার ভূমিকা' দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ: সমীক্ষা ও সঙ্কলন। সমীক্ষা অর্থাৎ প্রথম খণ্ডটি তিনটি অধ্যায়ের সমষ্টি। প্রথম অধ্যায়টি ছড়ার প্রাথমিক ও সাধারণ পরিচয়, ছড়ার কায়া ও কথা-বস্তুর ক্ষেত্রে কোন্-কোন্ দিক ক্রিয়াশীল হয়, ছড়ার স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ, এবং আমাদের মতে ছড়া পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণ—ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। সাধারণ আলোচনা বলেই ছড়ার তাবৎ বঙ্গীয় সঙ্কলনের সহায়তা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, বিস্তৃতভাবে উদাহরণও সংগ্রহ করা হয়েছে সে-সব বই থেকে। যে বিশেষ কথাগুলি বলতে চেয়েছি, উদাহরণের প্রাচুর্য ব্যতীত তা পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করবে না। একই বক্তব্যের দৃষ্টান্ত পৃথকভাবে প্রত্যেকটি বই থেকে আহরণ করেছি বলে কখনও বা এসেছে অপরিহার্য পুনরাবৃত্তি। পূর্বসূরীদের সকলের গ্রন্থ থেকেই আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় হল—প্রথম অধ্যায়ের প্রস্তাবিত দৃষ্টিকোণের প্রয়োগফল, সঙ্কলিত ছড়াগুলির সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় Structural analysis-কে গ্রহণ করা হয়েছে। যতদূর জানি, বাঙলায় এর আগে এই ধরণের আলোচনা হয় নি। সে জন্যে নানা ভুল-ত্রুটি এতে স্বাভাবিকভাবে থাকতেই পারে, রসজ্ঞ পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশেষ বাধিত হব। ইউ-রোপ ও আমেরিকায়, 'ছড়া' বলতে আমরা যা বুঝি, তার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যেমন নেই, তেমনি এর কাঠামো ও রূপ নিয়েও কোনো আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি। কাঠামো নিয়ে আলোচনা পাশ্চাত্ত্যদেশেও মূলতঃ লোককথা ও মিথেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাম্প্রতিক কালে ধাঁধা-প্রবাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হচ্ছে। আমরা আমাদের মতো করে ছড়ার ওপর তা প্রয়োগ করেছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ছড়া সমীক্ষার দৃষ্টিকোণ কেবল এই একটিই নয়। সমীক্ষার একাধিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে আমরা কেবল রূপ ও কাঠামোর দিকটিকেই বেছে নিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়টি বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন ও সমীক্ষার ইতিহাসের পর্যালোচনা। কারো প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ অথবা কাউকে নিন্দা করা এর লক্ষ্য নয়। পূর্বসূরীদের প্রত্যেকের আলোচনাদ্বারাই আমি কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়েছি।

মোট ৫২৫টি ছড়ার সঙ্কলন হল বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডটি। সূক্ষ্ম হিসেবে এই খণ্ডে ছড়ার সংখ্যা আরো বেশি। সমধর্মী ও সাদৃশ্যমূলক অনেক ছড়াই গণনার সময় একটিই বলে ধরে নিয়ে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ যোগ করা হয়েছে মূল সংখ্যার সঙ্গে।

এই সঙ্কলন খণ্ডের আছে তিনটি দিক : প্রথমতঃ, প্রত্যেক ছড়ার উৎস নির্দেশ, কোন্ জেলা বা অঞ্চল থেকে তা পাওয়া, কোন্ অনুষ্ঠান বা প্রসঙ্গের সঙ্গে তা যুক্ত, কে এর সংগ্রাহক, অথবা কোন্ লিখিত উৎস থেকে তা গৃহীত, —তার উল্লেখ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক—এই উভয় উৎস থেকেই ছড়াগুলি গৃহীত হয়েছে। অনেক ছড়াই এই প্রথম মুদ্রিত হলো। সাময়িকপত্রের যে-সব সঙ্কলকের সঙ্কলন যদৃচ্ছা গ্রহণ করেছি, তাঁদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই। প্রতিক্ষেত্রে পাদটীকায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, যেসব ছড়ার কথান্তর (varriants) পাওয়া গেছে, উৎসসহ

তার উল্লেখ করেছি। স্থানাভাবে পাদটীকায় সব 'কথান্তর' দিতে পারি নি। প্রথম খণ্ডের আলোচনাংশে যথাস্থানে তা দিয়েছি।

তৃতীয়তঃ, ছড়ার শ্রেণীভাগ। বিভিন্ন সঙ্কলক বিভিন্ন রীতিতে ছড়ার শ্রেণীভাগ করেছেন। এই সঙ্কলনে আমরাও আমাদের মতো করে বাঙলা ছড়ার শ্রেণীভাগ করেছি। ছড়াকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেছি : আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। তারপর প্রতিটি বিভাগের পর্যায়ানুক্রমিক উপ-বিভাগ করেছি। বিস্তৃত বিষয়-সূচীর দিকে তাকালেই আমাদের শ্রেণী বিভাগের পরিকল্পনাটি বোঝা যাবে। ভ্রমক্রমে "আনুষ্ঠানিক ছড়া : প্রথম পর্যায় : বিবিধ বার্ষিক অনুষ্ঠান"—এই শিরোনামটি ছাপা হয় নি। কয়েকটি ছড়ার ক্রমবিন্যাসেও ভুল হয়েছে। '২৬৯' সংখ্যাটি দুবার ছাপা হয়েছে। ১৬০ পৃষ্ঠারটি '২৬৯ক' পড়তে হবে। ৩৮২-সংখ্যক ছড়াটি কবি-গানের ছড়া।

এই গ্রন্থের সঙ্কলন অংশের ১৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেছি, প্রশ্নোত্তর-মূলক এক বিশেষ ধরণের ছড়া প্রথম সঙ্কলিত হয় বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য' (১২শ খণ্ড। ঢাকা, বাঙলা একাডেমি। ফাল্গুন, ১৩৮২। পৃ. ২৬-৫০) বইতে। কিন্তু, পরে লক্ষ্য করেছি, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) বইতেই (২৯১ সংখ্যক ছড়া) এই ধরণের ছড়া প্রথম সঙ্কলিত হয়।

সঙ্কলন অংশটি প্রস্তুত করতে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এঁদের মধ্যে আছেন : শ্রীতরুণকুমার মাজিল্যা, শ্রীরামরঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন মাহাতো, সাহাবুদ্দীন আহমেদ, শ্রীরাজেন অধিকারী, সেখ সা'আতুল ইসলাম, শ্রীউৎপলকান্তি গায়েন, শ্রীদিবাকর ভৌমিক, কাদের আলী সর্দার, আবদুর রব, শ্রীএকান্ত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতী দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়। লোকচিত্রের নিদর্শনগুলি এঁকেছেন শ্রীপঞ্চানন মালাকার। 'প্রবাসী' প্রভৃতি যেসব পত্র-পত্রিকা থেকে এগুলি গৃহীত, প্রত্যেকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। সিটি কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নীরদ-প্রসাদ নাথ বসিরহাট থেকে ছড়া সংগ্রহ করতে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন : শ্রীমৃদুলদেব রায়কত, শ্রীলালু চক্রবর্তী, শ্রীমদনলাল সিংহ,

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী অবনীবালা রায়, শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী, স্বর্গত বিজয়দাস ফকির, ডঃ ভবতারণ দত্ত, শ্রীমতী সুষমা গুছাইত, আবেদা বিবি, হীরালাল মাহাতো, শ্রীকৃষ্ণা হাজরা, অধ্যাপক মোহাম্মদ রাহাতুল্লা, শ্রীযুক্তা শুভ্রা বসু প্রভৃতি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পবিত্রকুমার সরকারের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। 'সংবর্তন' ও 'সঞ্জনন' এই পারিভাষিক শব্দ দুটি তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তবে Transformation নিয়ে আলোচনাকালে 'Kernal sentence'-কে কোনো চমস্কীয় অর্থে গ্রহণ না করে সহজ অর্থে গ্রহণ করেছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় নানা-ভাবে আমাকে সচেতন করে দিয়েছেন। আমার ছাত্র এবং বর্তমানে সহকর্মী, অধ্যাপক শ্রীমানস মজুমদারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি, এই সুযোগে তাঁকেও আমার প্রীতি জানাই। সহকর্মী ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত এবং Folk-lore পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত মশাই বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'সাহিত্যশ্রী'র প্রকাশক বন্ধু শ্রীতপনকুমার ঘোষ ও শ্রীপরেশচন্দ্র সাঁতরার উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ইতি,

বিনীত

নির্মলেন্দু ভৌমিক

বিষয়-সূচী : প্রথম খণ্ড

বিষয়-সূচী : দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ছড়া : কায়া, কথাবস্তু, প্রয়োগ, প্রকারভেদ, পর্যবেক্ষণ

···১···

যে বিশেষ ধরণের রচনাকে 'ছড়া' বলা হয়, সেই 'ছড়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বাঙলায় আজও তেমন আলোচনা হয় নি। শব্দটি সম্ভবতঃ দেশজ। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে নানা অর্থে শব্দটি চলিত আছে।

যে স্বল্প দু-একজন গবেষক শব্দটির মূল অন্বেষণ করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মশাইয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্যে আসবার আগে, অন্য গবেষকদের বক্তব্যের কথা বলে নিই।

যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০) গ্রন্থে 'ছড়া' এই বিশেষ্য শব্দটির মূল নির্দেশ করেছিলেন সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে। অর্থ লিখেছিলেন. 'সমূহ, পরম্পরা'। 'শ্লোক পরম্পরা'। 'মেয়েলী ছড়া' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, 'নারীদিগের কথিত পদাবলী'। 'ছড়া কাটাকাটি' : 'পদে উত্তর প্রত্যুত্তর'।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ খণ্ড। পৃ. ৪৯০) গ্রন্থে শব্দটিকে 'দেশজ' বলেছেন ; পরিচয় দিয়েছেন এই বলে : 'বিস্তৃত পদ্য বিশেষ। কবি বা তরজার দলের অধিকারী প্রতিপক্ষের প্রতি ছড়া কাটাইয়া থাকেন। ছড়া প্রায় গ্রাম্য ভাষায় রচিত হয়।' অপর অর্থ এই দিয়েছেন : 'এক বৃন্তে গ্রথিত কতকগুলি ফলসমষ্টি, কলা প্রভৃতি কাঁদির অংশ।'

'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন : 'ছটা (পরম্পরা>ছন্দোবদ্ধ পদ পরম্পরা) বিশেষ্য, ছন্দে গাঁথা পদ্য কথা ; গ্রাম্য কবিতা।' উদাহরণ দিয়েছেন চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করে : 'সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী কিসের সেই যে ছড়া'। 'ছড়াভাঙ্গা' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, 'ছড়ার অর্থ করা'।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩৩৮)

লিখিত একটি প্রবন্ধে ইন্দু বিকাশ বসু মশাই লিখেছিলেন: 'ছড়া সম্ভবতঃ 'ছন্দ' শব্দের অপভ্রংশ'।

'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই জানাচ্ছেন: 'কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা'। 'ছড়াকাটা': 'ছড়া আবৃত্তি করা'। 'ছড়া' শব্দের মূল তিনিও এইভাবে নির্ণয় করেছেন: সংস্কৃত ছটা>প্রাকৃত ছডা> ছড়া। 'গুচ্ছ' বা 'থোকা' বলতে যে 'ছড়া' বা 'ছড়ি' (যেমন দিনাজপুরে) শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তা হিন্দী প্রভাবজাত। এ ছাড়া তিনি 'হার বা মালার লহর', ধানের 'গোছা' ইত্যাদি অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

রাজশেখর বসুও 'চলন্তিকা'য় (১০ম সং) সংস্কৃত 'ছটা' থেকেই শব্দটির আগমন লক্ষ করেছেন। তিনিও এর অর্থ করেছেন: 'গ্রাম্য কবিতা'। 'ছডাকাটা' বলতে তিনি কেবল ছড়া 'আবৃত্তি' করাই বোঝেন নি, ছড়া 'রচনা' করাও বুঝেছেন। 'ছড়াদার' শব্দের অর্থ দিয়েছেন: 'কবির দলে যে মুখে মুখে ছড়া কাটে'।

'ব্যবহারিক শব্দকোষ' গ্রন্থে কাজী আবদুল ওদুদ মশাই লিখেছেন 'ছন্দোবদ্ধ গ্রাম্য উক্তি বা বাদ প্রতিবাদ'।

'সংসদ বাঙলা অভিধানে' (নভেম্বর, ১৯৬৪) লিখিত হয়েছে: 'গ্রাম্য কবিতা বিশেষ, শিশু-ভুলান বা মেয়েলী কবিতা'। 'ছড়াকাটা': 'ছড়া আবৃত্তি করা, ছড়া তৈয়ারি করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করা'।

মোটামুটি ভাবে, 'ছড়া' শব্দ নিয়ে এখন পর্যন্ত যে সব আলোচনা হয়েছে, ওপরে তার বিবরণ সঙ্কলিত হল। এর থেকে আভিধানিকদের মতামত সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। মত ও মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়:

'ছড়া' শব্দটি অধুনা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ শ্রেণীকে বোঝালেও আভিধানিকগণ সে কথা সকলে বলেন নি। তাঁরা প্রায় সকলেই 'গ্রাম্য কবিতা'কেই বুঝিয়েছেন। 'গ্রাম্য কবিতা' মানেই কিন্তু 'লোকসাহিত্য' নয়। দ্বিতীয়তঃ, আভিধানিকগণের মতে 'ছড়া'র সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলা কাব্য ও সঙ্গীতের ধারার একটি যোগ ছিল। কবি, পাঁচালি, তরজা ইত্যাদি সঙ্গীত-সাহিত্যের সঙ্গে শব্দটির ঘনিষ্ঠ যোগও অনেকে লক্ষ করেছেন। 'ছড়াদার' ও 'ছড়া কাটাকাটি' কথা দুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ছড়া 'বাঁধা' বা রচনা করা ওইসব সঙ্গীত-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট দিক ছিল। ছড়া পূর্ব থেকেই

রচিত ও কণ্ঠস্থ হতে পারত, অথবা, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে আসরেই রচিত হত : বাদানুবাদের জন্যে এ ছিল এক জনপ্রিয় ও বহুল চলিত সাহিত্যিক অঙ্গ। তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগে 'ছড়া' 'মেয়েলি' ব্যাপার হয়ে পড়লেও মধ্যযুগে তার ব্যাপকতা ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তায় যেমন, গানের ও সাহিত্যের আসরেও তেমনি 'ছড়া' ব্যবহৃত হত। তখন নারী-পুরুষের ভেদ রক্ষিত হত না এ ব্যাপারে। চতুর্থতঃ, ছড়া 'আবৃত্তি' করবার সঙ্গে সঙ্গে তার 'রচনা' কর্মটিও লক্ষ করবার। আজকাল যাঁরা শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করে কেবল লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত করে নিয়ে সঙ্কুচিত একটি অর্থে প্রয়োগ করতে চাইছেন, তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করি। আসরের ছড়া রচনা করা হত দু ভাবে : পূর্ব থেকেই রচনা করে তা কণ্ঠস্থ করে আসরে আসা, লিখিত রূপেও যে আসরে নিয়ে আসা হত না, তাই বা আজ কে বলবেন ? কিন্তু একথা ঠিক, পূর্ব থেকেই রচিত হবার ফলে রচয়িতার সচেতনতা তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠত, এমন কি, তৎক্ষণাৎ আসরেই রচিত হলেও তা বহু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হত। সুতরাং এই দুই ধরণের রচনা-কর্মের মধ্যে একটি 'সাহিত্যিক' নির্মিতিকে স্পষ্টরূপে লক্ষ করা যায়। পঞ্চমতঃ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস উল্লিখিত 'ছড়াভাঙ্গা' পদটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। স্পষ্ট বোঝা যায়, এর দ্বারা হেঁয়ালি বা ধাঁধা শ্রেণীর রচনাকেও বোঝাতে চাইছেন তিনি। কবি-ওয়ালাদের আসরে (বিশেষতঃ 'মেয়ে-কবি'র আসরে) শেষ পর্যন্ত ছড়াধর্মী ধাঁধা-হেঁয়ালি জিজ্ঞেস করা হত। এটি আসবার দুটি কারণ : এক, কবি-গানে দুই দলের লড়াই ও তাঁদের হার-জিতের প্রশ্ন, দুই, প্রথমে ছড়া দিয়েই এই লড়াই চলত, যে ছড়ায় আবার ধাঁধা-হেঁয়ালিও রচিত হত। সুতরাং 'ছড়া' বলতে ধাঁধা-হেঁয়ালিও বটে। ষষ্ঠতঃ, মধ্যযুগের সঙ্গীত-সাহিত্যে ব্যবহৃত 'ছড়া'র রূপাকৃতির দিকটি লক্ষণীয়। নগেন্দ্রনাথ বসু মশাই ছড়াকে বলেছেন, 'বিস্তৃত পদ্য বিশেষ'। অর্থাৎ আকারে তা নিতান্তই ক্ষুদ্রকায় কিছু ছিল না। আমাদের মনে হয়, 'বাঁধাছড়া' অর্থাৎ পূর্ব থেকেই রচিত ছড়ার আকৃতি একটু বড় হত,—তাকেই বসু মশাই 'বিস্তৃত পদ্য' বলেছেন। আসরে দাঁড়িয়ে রচিত ছড়া স্বাভাবিক কারণেই আকারে ছোটো হত। আকারে বড়ো হলে বাদ-প্রতিবাদের রসটা ঠিক তেমন জমেনা,—তখনকার শ্রোতারা যার জন্যে এই আসর বসাতেন। আসরে দাঁড়িয়ে, ছোটো আকারে রচিত এই ধরণের ছড়া সর্বত্র এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল বলে অনুমান করা যায়। ছোটো-ছোটো

ছড়াই যেন শিল্পীদের সংলাপ হয়ে ওঠে। প্রশ্ন, প্রশ্নের পর উত্তর, তারপর আবার প্রশ্ন, আবার উত্তর—এই রকম সংলাপ-প্রবাহের মধ্যে ছড়ার অস্তিত্ব থাকত। যোগেশচন্দ্র রায় যে ছড়ার অর্থ করেছেন, 'সমূহ, পরম্পরা' বা 'শ্লোক পরম্পরা', তা এইখানে ভালো করে অনুধাবন করে নিতে হবে। 'সমূহ' বা 'শ্লোক পরম্পরা' বলতে যেমন স্বাভাবিকভাবে একদিকে একটি ছড়ার অন্তর্গত একাধিক শ্লোককে বুঝব, তেমনি গোটা ছড়ায়-ছড়ায় মিলে 'সমূহ' ও 'পরম্পরা'-ও বটে,—যা প্রশ্নোত্তরেব পারম্পর্য ও শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে। যেমন দুই বিরুদ্ধ দলের প্রশ্নোত্তরের পারম্পর্য, তেমনি, একই দলের পর-পর প্রশ্ন বা পর-পর উত্তর। যে করেই দেখা যাক না কেন, 'সমূহ' ও 'পারম্পর্য' শব্দ দুটিকে সহজ ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে তার প্রযুক্তিগত দিককে, তৎকালীন ব্যবহারের স্মৃতির আলোকে গ্রহণ করতে হবে। 'ছড়া' শব্দের অপর অর্থও এর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। 'কলার ছড়া,' 'ধানের ছড়া,' ইত্যাদি প্রয়োগে 'সমাহারে'র দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, 'এক ছড়া ধানে' অনেকগুলি ধান, তেমনি ক্রমান্বয়িক, পারম্পর্য-মূলক রচনাবলীও এক-একটি 'ছড়া'। বাঙলা ছড়ার রচনা-রীতিতে অদ্যাবধি প্রশ্নোত্তব-প্রবণতা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তাও এই প্রসঙ্গে ভুলে যাবার নয়।

সপ্তমতঃ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত 'ছড়া'র পরিচায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্যটি. 'কোন বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবিতা'। এখানে আসরের ইঙ্গিত স্পষ্ট কবে নেই। অর্থাৎ আসরের বাইবেও, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে, কোনো বিষয় নিয়ে যে সব কবিতা বা পদ্য রচিত হত, তাও ছড়া। হরিচরণের ইঙ্গিতকে বিস্তৃত করা যেতে পারে। ওপরের বিভিন্ন প্রয়োগগুলো থেকে আমরা মোট চার ধরণের ক্ষেত্রকে ছড়ার প্রয়োগক্ষেত্র বলে নির্দেশ করতে পারি: এক, দৈনন্দিন ও গার্হস্থ্য জীবনে, হাসিকান্না, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদিতে নারী-পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত 'ছড়া'; দুই, কোনো পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, অথবা নিছক অবসর বিনোদনের জন্যে, কোনো বিষয় অবলম্বনে কথিত ছড়া; তিন, কবি-পাঁচালি-তরজা গানের আসবে ব্যবহৃত ছড়া; চার, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক ছড়া।

সুতরাং ছড়াকে কেবল নারীর বা পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি বলা অনুচিত: একথা অবশ্যই সত্য, নারীই বর্তমানে ছড়ার মূল ব্যবহারকারিণী —কিন্তু অতীতের আলোকে তা সর্বত্র স্বীকার্য নয়। তেমনি, ছড়াকে আবার কেবলই 'লোকসাহিত্যে'র একটি অঙ্গ বলে বিবেচনা করলে তার প্রয়োগের

ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হবে,—ইতিহাসকেও মান্য করা হবে না। ছড়াকে বিচার করতে হবে বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রূপে, যেখানে অভিজাত-অনভিজাত, লৈখিক-মৌখিক সাহিত্যের ভেদ নেই, নারী-পুরুষের লিঙ্গগত ভেদও যেখানে অবলুপ্ত। বাঙালীর রসবোধ ও শিল্পবোধ এর মধ্যে সার্বিকভাবে ধরা পড়েছে,—তাই ঘুমপাড়ানী গানেও ছড়া, সাপের মন্ত্রেও ছড়া, 'মঙ্গলকাব্যে'ও ছড়া কবি-তরজার গানেও ছড়া। ধাঁধা বলতেও ছড়া।

ডঃ সুকুমার সেন মশাই সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক রূপে দু দিক থেকেই ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন। ডঃ ভবতারণ দত্তের 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভূমিকায় 'শিশু-বেদ' নামে প্রবন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা ছত্রাংশ অর্থে ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাই নি। তবে লোক ব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ লোক গদ্য জানত না, 'পদ্য' শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গল গান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হল গান আর কবিতা ছত্র অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই শেষোক্তই "ছড়া"—শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে। (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো, (২) গ্রথিত, গাঁথা—মালা-ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত—এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্ব। তারপরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দী 'ফুটকল' কবিতা আর সংস্কৃত 'চাণক্য' (চানা ভাঙার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিশেষভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য। তাতে ছড়ার বিবর্তনটিও পরিস্ফুট হবে। লোক ব্যবহারে, পদ্য বা কবিতা বলতে 'ছড়া' শব্দটি চলিত ছিল হয়তো, কিন্তু এই অর্থে উনবিংশ শতকের আগে সাহিত্য ও ভাষার ঐতিহাসিক ডঃ সেন 'ছড়া' শব্দের প্রয়োগ পান নি। আমরা এইখানে আর একটা কথা যোগ করতে চাই: লোকব্যবহারে ছড়া শব্দটি বোধহয় ব্যাপকভাবে বাঙলার সর্বত্র ব্যবহৃতই হত না; তা বোধহয়, কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষায় এখন পর্যন্ত 'ছড়া' শব্দের ব্যবহার নেই। পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনো লেখক-গবেষক সাম্প্রতিক কালে যদিও 'ছড়া' নাম দিয়ে গ্রন্থ লিখছেন, কিন্তু, 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (ঢাকা:

বাঙলা একাডেমী। নভেম্বর, ১৯৬৫) গ্রন্থে 'ছড়া' শব্দের আঞ্চলিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হয় নি। শব্দটি সেখানে Entry করাই হয় নি। ছড়া জাতীয় রচনার অস্তিত্ব থাকলেও লোকব্যবহারে 'ছড়া' শব্দ তেমন প্রচলিত নেই সেখানে, তার বদলে আছে অন্য শব্দ। উত্তরবঙ্গেও তাই। ডঃ সুকুমার সেন সঙ্কলিত An etymological Dictionary of Bengali (Calcutta : 1971. vols. I, II) গ্রন্থেও (যে গ্রন্থে ১০০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে) 'ছড়া' শব্দটির উল্লেখ নেই। সুতরাং অনুমান করা চলে, 'ছড়া' শব্দ কেবল পশ্চিমবঙ্গেই লোকব্যবহারে চলিত ছিল, আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের প্রভাবে[১] পূর্ববঙ্গের গ্রন্থকারগণও সেখানকার আঞ্চলিক সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে 'ছড়া' শব্দ ব্যবহার করছেন। তাঁদের প্রভাবে আবার সেখানকার গ্রামের মানুষরাও প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেছেন, শহরের ও শিক্ষিত মানুষরা তো বটেই।

পশ্চিমবঙ্গেও যে 'ছড়া' শব্দের ব্যবহার লোকভাষাতে ছিলই, সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ সেন সে বিষয় দৃঢ় অনুমান পোষণ করেছেন মাত্র, লিখিত প্রমাণ দাখিল করেন নি। তিনি বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর আগে শব্দটির হদিশ মেলে নি—যদিও আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস চণ্ডীদাস থেকে পদ উদ্ধৃত করে 'ছড়া' শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন, অবশ্য চণ্ডীদাসের পদের কাল ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাই হোক, এবিষয়ে আমাদের একটি সংশয় আছে: পশ্চিমবঙ্গের লোক ব্যবহারে ও লোক ভাষাতেও ছড়া শব্দটির অস্তিত্ব উনবিংশ শতকের আগে ছিল কিনা, সন্দেহ করি। প্রথমতঃ, যদি লোকভাষাতে শব্দটির অস্তিত্ব থাকতই, তবে কোনো না কোনো প্রকারে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। অবশ্য সব শব্দই যে পরবর্তীকালে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে যাবেই, এমন কোনো কথা নেই। তথাপি, এ বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক

১ যেমন 'রূপকথা' শব্দটির প্রচলনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের রচনাতে (যেমন, 'মানসী' পর্যন্ত) রবীন্দ্রনাথ 'উপকথা' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন, একালে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' নামায়নে যার শেষ স্মৃতি রয়ে গেছে। মধ্য বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ 'রূপকথা' শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন; সেই প্রভাবে এখন শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই করেন।

কালে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই 'ছড়া' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, যে পশ্চিমবঙ্গেই কবি-পাঁচালি-তরজা গানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল,— সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি-পাঁচালি-তরজা গানে ব্যবহৃত অর্থেই কি লোকভাষাতে 'ছড়া' শব্দটির প্রয়োগ এসে গেছে ? তৃতীয়তঃ, ঔপভাষিক প্রমাণ। উপভাষাগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষা-ভঙ্গিগুলিকে এখন পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, বাঙলার সব অঞ্চলের উপভাষায় 'ছড়া' শব্দটি কি নাম নিয়েছে। দেখেছি, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের উপভাষায় 'ছড়া' শব্দের অস্তিত্বই নেই, বদলে আছে অন্য শব্দ (তাব উদাহরণ পরে দিচ্ছি)। উপভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই মনে হয় : বর্তমান কালে বাঙলার এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অপর অপর অঞ্চলের ভাষার পার্থক্য শিক্ষিত লোকের মধ্যে এসে গেছে ; উপভাষাগুলির মধ্যে কিন্তু আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। যেমন জলপাইগুড়ির উপভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য চট্টগ্রামের উপভাষাতে মেলে, যদিও দুই জেলার মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান অনেক। উপভাষার এই সাদৃশ্যেব ফলেই এক অঞ্চলে চলিত 'ছড়া' শব্দ অন্য অঞ্চলেও হয়তো চলিত থাকতে পাবত। যেহেতু উপভাষায় শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না, সেই হেতু চলিত অঞ্চল থেকে অচলিত অঞ্চলে তাকে নিয়ে যাবারও প্রশ্ন ওঠে নি।

মধ্যযুগে 'ছড়া' শব্দেব প্রতিশব্দ বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তবে কি ছিল ? আজ এ বিষয়ে কিছু, অনুমান মাত্র কবা যেতে পারে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিকলি' বা 'সিকলি' (<সিকিকলি) শব্দটির উল্লেখ করেছেন[১] । এব দুটি

[১] ডঃ সুকুমার সেন মশাই কিন্তু 'শিকলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রয়োগ ভিন্নভাবে প্রদর্শন করেছেন তাঁর প্রাগুক্ত অভিধান গ্রন্থে। শব্দটিকে তিনি <*শৃঙ্খলিকা শব্দ থেকে সঞ্জাত বলে অনুমান করেন। এর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: The singer's term for the narrative portions in verse chanted or hurriedly sung to supply the link of the story between two songs in a 'Mangala' poem.'—p.836. দুই গীতাংশের মধ্যবর্তী অংশে, কাহিনীর খেই ধরবার জন্যে, যা দ্রুত ভঙ্গিতে কথিত হত, মঙ্গলকাব্যের গায়করা তাকেই বলতেন 'শিকলি'। ভেবে দেখতে গেলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ সেনের ধৃত অর্থের মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে। আমরা ছড়াকে শ্লোক পরম্পরা বা শ্লোকের সমষ্টি বলে যদি মনে করি, তবে এক অংশকে অপরাংশের সঙ্গে শেকলের মতোই যুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 'শিকলি'র দ্রুত ভঙ্গিটি লক্ষণীয়, যা ছড়ার কোনো কোনো অংশের দ্রুততাকে মনে করিয়ে দেয়, যদিও ছড়ার মূল সৌন্দর্যকে আমরা এই দ্রুতলয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি নি।

অর্থ দিয়েছেন তিনি। এক, 'চার কলিতে রচিত পয়ার ছন্দ'। 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' (বঙ্গবাসী সং) থেকে উদাহরণ দিয়েছেন : '(সঙ্গীত) নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত'। 'নাচাড়ি সিকলি ছন্দে কহিব বিশেষ'। দুই, 'পয়ার ছন্দের প্রবন্ধ'। উদাহরণ দিয়েছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ (বঙ্গবাসী সং) থেকে : 'অযোধ্যা কাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি'। কিংবা, 'গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি'। এ ছাড়া দ্বিজ বংশীদাসের 'বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী' (১৯০৮) থেকে দিয়েছেন : 'কবিত্ব শিকলি'।

'শিকলি' ও 'সিকলি' একই, এবং তা 'শৃঙ্খল' অর্থে 'শৃঙ্খলিকা' শব্দ থেকে আগত,—হরিচরণ অনর্থক এর মূল নির্দেশ করেছেন 'সিকিকলি' বলে। 'শৃঙ্খল' শব্দটি পৃথক মনোযোগ দাবী করে। এর অন্তর্নিহিত 'পারম্পর্য' লক্ষণীয়, যা শেকলের মতো এক অংশকে অন্য অংশের সঙ্গে দৃঢ় বাঁধনে বেঁধে রাখে। তা পয়ার, লাচাড়ি, চার কলিতে পূর্ণ,—ইত্যাদি যেমন হতে পারে, তেমনি পর-পর বহু 'সিকলি'ও একাদিক্রমে কথিত হত হয়তো; ওপরের উদাহরণে 'গাইল প্রথম দিনে বিংশতি সিকলি' তার প্রমাণ। এই 'শিকলি' শব্দই ছিল মধ্যযুগে 'ছড়া' শব্দের সমনাম বা তার প্রতিশব্দ। পূর্ববঙ্গের উপভাষায় এখনও 'ছড়া' বলতে 'ছিকলি' (শিকলি)-ই ব্যবহৃত হয় বহুস্থানে।

তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ওপরে উল্লিখিত 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (ঢাকা। বাঙলা একাডেমী : নভেম্বর, ১৯৬৫) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, পাবনা জেলার লোকভাষাতে 'ছড়া' বলতে 'শিকেলি' শব্দই চলিত আছে, যা মধ্যযুগেও চলিত ছিল এই অর্থেই। পাবনা জেলাতেই, একই অর্থে চলিত, অপর একটি শব্দের কথাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, 'সক্‌কোল'। এর মূল নির্ণীত হয়েছে 'শ্লোক' শব্দ থেকে, বর্ণ-বিপর্যয়ের পথ ধরে। কিন্তু আমরা মনে করি, 'সক্‌কোল' শব্দও 'শৃঙ্খল' শব্দ-জাত, কারণ সেটাই সহজ পথ। 'ছড়া' অর্থেই, উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত, ময়মনসিংহে চলিত 'সিঙ্কল্‌লি' শব্দও একই মূল থেকে আগত।

'শৃঙ্খল' (শৃঙ্খলিকা) শব্দজাত কিছু তদ্ভব শব্দ ছাড়া 'ছড়া' বোঝাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই 'শ্লোক' শব্দের তদ্ভব রূপটিই চলিত ছিল বা এখনও আছে। আজ থেকে প্রায় শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গেও যে 'ছড়া' শব্দের বদলে 'শ্লোক' শব্দই প্রচলিত ছিল, তার অন্ততঃ একটি প্রমাণ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'জয়দেব'

(নবজীবন। চৈত্র, ১২৯৩। পৃ. ১৬২-১৭৪) প্রবন্ধে দিয়ে গেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি একটি 'শোলোক' উদ্ধৃত করে (সেটি বর্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত হয়েছে) মন্তব্য করেছেন : 'এই সকল স্থলেই শ্লোক অর্থে—ছড়া'। এই মন্তব্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'ছড়া'র প্রতিশব্দ সম্পর্কে খানিকটা অবহিত হওয়া যায়। গাজনের ছড়াকেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও 'শোলোক'ই বলে।

পূর্ববঙ্গেও ব্যাপকভাবে 'শ্লোক' শব্দজাত তদ্ভব রূপটিই চলিত ছিল বা আছে। 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' থেকে তার কিছু দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করা যেতে পারে। যেমন : 'শিলখ্' (সিলেট), 'শিলুখ,' 'শিল্কি' (মৈমনসিংহ) 'শিলক' (সিলেট), 'শললুক' (কুমিল্লা), 'শিলক' (মৈমনসিংহ), 'সিল্কি', 'সিল্হি' (ঐ), 'হল্লক' (ঐ)। উত্তরবঙ্গে : শিল্কা, সিল্কা, ছিল্কা <শ্লোক+আ। 'শিলুক' ও 'ছিলুক' শব্দ দুটিও সেখানে চলে। অর্থাৎ মোট কথা 'ছড়া' শব্দ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে চলিত নেই বা ছিল না।

'ছড়া' অর্থে শ্রীহট্টে দুটি বিশেষ শব্দ চলিত আছে। মোঃ আশরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন-কাব্যবিনোদ শ্রীহট্ট জেলা থেকে 'রাগ বাউল' এবং 'রাগ মারিফত' (মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট। মাঘ, ১৩৩৬) নামে দু খানি বই প্রকাশ করেছিলেন। 'রাগ বাউলে'র ভূমিকায় তিনি 'পই' এবং 'দিঠান' শব্দ দুটির উল্লেখ করেছিলেন। 'পই'<পদ, এবং 'দিঠান'<দৃষ্টান্ত। বাঙলার লোকভাষাতে ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, তাই 'ছড়া' বলতে 'পদ' ও 'দিঠান' শব্দও প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এক 'শ্লোক' শব্দ দিয়েই সব ধরণের রচনাকে নির্দেশ করা হয়। মৈমনসিংহে ধাঁধাকেও 'শিলোক' বলা হয় (দ্রঃ ডঃ কাজী দীন মহম্মদ সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য ধাঁধা ও প্রবাদ,' পৌষ ১৩৭৫, পৃ ২২, ২৩)। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে এইটুকু অনুমান করা যায়, 'ছড়া' শব্দের ব্যবহার লোকভাষায় তেমন ছিল না—যতখানি ছিল সঙ্গীতের আসরে।

যাই হোক, ডঃ সুকুমার সেন মশাইয়ের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে করতে দেখানো গেল, 'ছড়া' শব্দের বিস্তৃত প্রয়োগ ছিল কি না। ডঃ সেনের মন্তব্যের পরবর্তী অংশ এই : মধ্যযুগীয় শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করত গায়কদের কথিত কবিতাংশ। একেই ডঃ সেন 'ছড়া' বলেছেন এবং তার মধ্যে দুটি অর্থ দেখেছেন। 'গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত'—এই হল ছড়া। এখন পর্যন্ত 'ছড়া'র যতগুলি সংজ্ঞা ও পরিচায়ন দেখেছি, ডঃ সেন প্রদত্ত সংজ্ঞাই তার

মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। ইতিহাস ও ভাষা-বিজ্ঞান উভয় দিক থেকেই তিনি এটি বিচার করেছেন। 'ছড়া'র যে একটি ক্রমবিকাশ ঘটেছে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারা থেকে বিযুক্ত হয়ে 'ছুটকো ছন্দময়' রচনা হিসেবে আধুনিক 'ছড়া' যে একটি পৃথক সৃষ্টি, এসব কথা তাঁর পূর্বে কেউই উচ্চারণ করেন নি। তাঁর প্রদত্ত দুটি অর্থের সঙ্গে আমরা যোগ করলাম আর দুটি অর্থ: ১. দুই বিরুদ্ধ পক্ষের প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা ২. ছুটকো এক-একটি ছড়ার মধ্যে বহুশঃ দৃষ্ট প্রশ্নোত্তরের পরম্পরা ও সমাহার।

ডঃ সেন যে বলেছেন, গায়েনদের কথিত কবিতাংশই শ্রোতাদের মনকে টানত,—তার একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। গায়েনরা কি রকম কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন? নিঃসন্দেহে তা জীবন থেকে নেয়া, হাস্য রসাত্মক, এবং অতিশয়োক্তিমূলক। জীবনের খণ্ডচিত্র নিশ্চয়ই তাতে প্রাধান্য পেত। তেমনি ছিল এই সব গায়েনদের উপস্থিত বুদ্ধি। কোনো শ্রোতার বিশেষত্ব নিয়েই হয়তো তখুনি রচিত হতো কয়েকটি ছত্র, যা জীবন্ত। এদিকে সেই একই রীতি হয়তো চলিত ছিল গৃহকোণে, ননদ-ভাঁজ বা বউ-শাশুড়ী বা মা-ছেলের নিন্দা-আবদার প্রকাশের জন্যে, কখনো ছিল কোনো রসিক পুরুষ বা পাড়ার ঠানদি,—গ্রামের কোনো ঘটনা নিয়ে ছড়া বাঁধবার যাদের থাকত বিধিদত্ত নৈসর্গিক প্রতিভা। সেই সঙ্গে নানা ধরণের ব্রত ও মন্ত্রের প্রকাশ-রীতিতেও গৃহীত হত 'ছড়া'। এই সব নিয়েই 'ছড়া'॥

…২…

গত শতক পর্যন্ত ছড়ার যে ব্যাপক প্রসার ছিল, কালক্রমে তা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। এখন অনেকেই আমরা ছড়া বলতে 'শিশুসাহিত্য' বা 'নারী-সাহিত্য' বলে মনে করি। কেউ আবার আর একটু প্রসারিত করে একে 'লোক সাহিত্য' বলে থাকেন।

প্রতিপক্ষের প্রশ্ন হবে, ছড়াকে 'লোক-সাহিত্য' বলাটা কি অন্যায় বা অসঙ্গত? উত্তরে বলব, বর্তমানে ছড়া 'লোকসাহিত্য', 'নারীসাহিত্য', 'শিশুসাহিত্য' অংশতঃ ঠিকই, তবে তা বেশিদিন হল নয়। আগে এ সবের ভেদ ছিলই না। সাহিত্যিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা কারণে একটি ব্যাপক বিষয় আজ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। কালের গতিতেই এমনটা হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটি জিনিস বদলায় নি, তা ছড়ার রচনারীতি ও ভঙ্গি। মধ্যযুগের সাহিত্য আস্বাদনে উচ্চ-নীচ, অভিজাত-অনভিজাতের ভেদ-রেখা তেমন ছিল না। একই আসরে রাজা-প্রজা গান শুনতেন। 'রাজা' যখন গান শুনতেন তখন

আর দু-পাঁচটা প্রজার মতো তিনিও হয়ে যেতেন 'লোক', বলা যায় তাঁর 'প্রাকৃতায়ন' ঘটত। ফলে সেই আসরের সাহিত্য 'লোকে'-র বা প্রাকৃত জনেরই হত। যখন 'চুটকো ছন্দময়' ছড়া আসরের জন্তেও রচিত হতে থাকল, তখন সেই আসরের 'লোকস্বভাব'ও তা পরিত্যাগ করতে পারে নি। ফলে, 'লোক-সাহিত্যে'র সঙ্গে সমীকৃত হতেও তার সময় লাগে নি, যে 'লোক'-সাহিত্যের ধারা ঘরে-ঘরে দৈনিক জীবনের কর্ম, অনুষ্ঠান ও অবসরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলই। আসরের ছড়া, ঘরের ছড়া এবং বিবরণ-বর্ণনা-মূলক ছড়া—সবই একই মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত,—একই রচনারীতি সর্বত্র গৃহীত। এই রচনারীতিটি কিন্তু কেউ কারো কাছ থেকে সজ্ঞানে ধার করে নেয় নি, এটির মূল নিহিত আছে লোক-মানসের চিরকালীন বিশেষত্বের মধ্যে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকমানসের কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে, যদিও তার গতি অতি ধীর। নৃতাত্ত্বিকেরা শিক্ষিত ও বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে আদিম পর্যায়ের মানুষদের বিরোধটি অন্তভাবে লক্ষ করেন। একজন আদিম পর্যায়ের বয়স্ক মানুষের বোধ ও বুদ্ধি যেন আধুনিক সমাজের একজন শিশুর মতো। অর্থাৎ আধুনিক সমাজের শিশুর সারল্য ও মনোভাব যেন আদিম সমাজের বয়স্কদের মধ্যে ধরা পড়ে। এই কারণেই লোক-সাহিত্যের সঙ্গে শিশুর একটি যোগ স্থাপিত হয়ে যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও লোক-সাহিত্যের অনেক দিক (যেমন, ছড়া, ধাঁধা, লোককথা) শিশুসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এই পথ ধরেই, যথারীতি, 'ছড়া'ও শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। অন্যান্য দেশ এই ভুল অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে,—আমাদের সেই ভুল কবে ভাঙবে, জানি না।

রূপকথা-লোককথা সম্পর্কে এই ভুল সবার আগে ভাঙে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট গবেষকগণের গবেষণায় লোককথার মধ্যে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, 'প্রতীকতা' এবং অন্যান্য দিকের উপকরণ আবিষ্কৃত হবার ফলে আজকাল কেউ আর সহসা তাকে 'শিশুসাহিত্য' বলে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করতে সাহস পান না। ধাঁধা সম্পর্কেও সেই কথা। 'প্রবাদ' এদিক থেকে বরাবর আপন বিশুদ্ধতা রক্ষা করে এসেছে,—সাবালকত্বের জাত খুইয়ে তাকে নাবালকত্ব গ্রহণের অবাঞ্ছিত দায়িত্ব বহন করতে হয় নি,—কারণ প্রবাদের মধ্যে এমন একটি অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতার দিক আছে, যার ফলে 'শিশুসাহিত্যে'র লেবেল কোনদিনই তার গায়ে আঁটা যায় নি। ধাঁধা ও 'কথা' তাদের সাবালকত্ব ফিরে পেলেও, 'ছড়া' আজও

নাবালকই রয়ে গেছে। কিন্তু, বাঙলা ছড়ার প্রয়োগ-ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দেখলে, তার প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকার কথা স্মরণ করলে, কিছুতেই তাকে 'শিশুসাহিত্য' অভিধা প্রদান যুক্তিযুক্ত হয় না। ছেলেভুলানো ও ঘুমপাড়ানো ছড়া আছে বলেই তাবৎ ছড়া-সাহিত্যই শিশু-ঘটিত বা নারী-ঘটিত নয় এবং ছেলেভুলানো ও ঘুমপাড়ানী ছড়ার রচনারীতিতে যে প্রতীক-সঙ্কেতের প্রয়োগ আছে, অন্যান্য ধরণের ছড়ার রচনা-ভঙ্গির সঙ্গে তার যে সাদৃশ্য আছে, তাতে একে শিশুসাহিত্য বলা মূঢ়তার নামান্তর বলে মনে হয়।

যেমন একজন আদিম পর্যায়ের বয়স্ক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এ যুগের শিক্ষিত সমাজের একজন শিশুর মতো, আপেক্ষিক দিক থেকে, ঠিক তেমনি পুরুষের তুলনায় নারীর মনোভাব রক্ষণশীল ও অপরিণত বলে লোকসাহিত্যের কয়েকটি দিক নারীর সাহিত্য বলে ভুলক্রমে পরিচিত হয়ে গেছে। সেই কারণেই ছড়াকে 'নারী সাহিত্য' বলা হয়ে থাকে। নারীর জীবন ও মনের কয়েকটি দিক এতে ধরা পড়ে ঠিকই, কিন্তু তাই-ই ছড়ার সব কথা ও শেষ কথা নয়।

ছড়াকে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত করবার সম্পর্কে আরো দু-একটি প্রশ্ন মনে জাগে। লোকসাহিত্যের আলোচনার সুবিধের জন্যে আজকাল আমরা লোকসাহিত্যকে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গান, কথা ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে থাকি। কিন্তু আদিম মানুষ এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কতোটা সচেতন ছিল? তারা কি সচেতনভাবে এক-একটি বিষয় রচনা করেছিল, নাকি সব ক'টি বিষয়ই আদিকালে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে তাদের জীবনে, মনে ও রসচেতনায় ধরা দিয়েছিল? বলাই বাহুল্য, আদিম মানুষের মনে এই ধরণের কোনো ভেদ-বুদ্ধি ছিল না। তাদের সাহিত্য-বোধ ছিল মিশ্রিত। একই রচনার আধারে গান-প্রবাদ-ধাঁধা-কথা একত্র ধরা থাকত। এখনও তাই লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন, লোককথা বলবার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গান বা ছড়ায় ব্যক্ত করা; কিংবা লোককথার বর্ণনারীতিতে মাঝে-মাঝে প্রবাদ-মূলক বাক্যের ব্যবহার; কখনো বা একটি ধাঁধাকে পরিস্ফুট করবার জন্যে একটি 'কথা'র আশ্রয় নেওয়া। প্রবাদ ও ধাঁধার রচনারীতিতে তো ছড়ার রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এইসব দিক বিবেচনা করে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গকে কিছুতেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায় না; এবং সেই কারণে এদের বিচার-বিশ্লেষণও পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করেই করা উচিত।

ওপরের এই মন্তব্য থেকে আমাদের বক্তব্যটি এইভাবে পরিস্ফুট করা যায়: পূর্বের পরিচ্ছেদে বলেছি, ছড়ার প্রয়োগের ক্ষেত্র একটি ব্যাপকতার মধ্যে; তা আসরে-বাসরে, গৃহকোণে, চণ্ডীতলায়, দৈনিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে, আনুষ্ঠানিকতার বিশেষত্বমণ্ডিত পটভূমিকায় কথিত-রচিত-শ্রুত হয়। বাঙালীর যে কোনো প্রকারের সাহিত্য রচনার মাধ্যম হল 'ছড়া'। সুতরাং 'ছড়া'কে কেবল লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করলে তা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। মৌখিকতাকেই অনেকে লোকসাহিত্যের প্রথমতম বিশেষত্ব বলে মনে করেন বলে এই ভুল হয়েছে। যেমন ছড়ার প্রয়োগের ক্ষেত্র-বৈচিত্র্য, তেমনি তার রূপগত ব্যাপকতাও দেখা যায়: ছড়াকে আমরা প্রবাদে, ধাঁধাতে, কথাতে—সর্বত্রই দেখতে পাই, লোকসাহিত্যের কেবল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এক শ্রেণী রূপে নয়। যে করেই দেখা যাক না, প্রয়োগ ও রূপ উভয় দিক থেকেই ছড়ার একটি ব্যাপকতা আছে। ছড়ার এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা এত কাল উপযুক্ত দৃষ্টি দান করি নি॥

...৩...

কোনো কোনো মহলে এই রকম একটা প্রশ্ন চালু আছে, লোকসাহিত্যের কোন্ বিভাগটি আগে রচিত হয়, ছড়া না ধাঁধা? কেউ বলেন ছড়া, কেউ বলেন ধাঁধা, তবে ধাঁধার কথাই বলেন বেশি লোক।

ওপরে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, আমরা যে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করেছি, তাতে এই ধরণের প্রশ্নের উত্থাপনটিই নিরর্থক বলে মনে হতে পারে। প্রথমতঃ, লোকসাহিত্যের কোনো বিভাগই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাধীন নয়, একটিকে অপরটির ওপর নির্ভর করতেই হয়, অতএব কোন্‌টি আগে উদ্ভূত, সে প্রশ্ন অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই এক-একটি বিভাগের উদ্ভব হয়েছে, তবে বলব, ছড়ার ব্যাপকতা অন্য কোনো বিভাগেরই নেই,—অতএব ছড়াই ধাঁধার তুলনায় অগ্রজ।

সেই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন: নারী ও পুরুষের মধ্যে কে ছড়ার রচয়িতা। অধিকাংশেরই মত, নারীই ছড়ার রচয়িতা। এ প্রশ্নটিও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আমরা এই প্রশ্নটিকে একটু অন্তভাবে বিচার করতে চাই। নারী-পুরুষের প্রসঙ্গে আসবার আগে ছড়ার ছন্দটিকে একটু লক্ষ করে নিতে চাই।

ছড়ার মধ্যে একটি দ্রুততা, গতি, ক্ষিপ্রতা ও ব্যস্ততার দিক আছে, ছন্দের শ্বাসাঘাতে তা প্রতিফলিত হয়। অনেকেই এই শ্বাসাঘাতকে বাঙালীর উচ্চারণ-বিশেষত্বরূপে গ্রহণ করেছেন। শব্দের গোড়াতে একটু ঝোঁক ফেলা বাঙালীর উচ্চারণের এক বৈশিষ্ট্য ঠিকই ; কিন্তু তা কি কেবল ছড়ার বেলাতেই, অন্য কোনো ধরণের রচনাতেও নয় কেন ? যদি উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য বাঙালীর নিজস্ব এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যই হয়ে থাকত, তবে শুধু ছড়াতেই নয়, অন্য যে কোনো ধরণের রচনাতেও তা কার্যকরী হত। কাজেই, এই ঝোঁক প্রবণতাকে সাধারণভাবে বাঙালীর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, ছড়ার মধ্যে এমন এক নিগূঢ় অন্তর্নিহিত দিক আছে, যার ফলে এই শ্বাসাঘাত এর মধ্যে এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ছড়ার নিজস্ব প্রয়োজনেই এই শ্বাসাঘাত এসে থাকে, বাঙালীর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যে নয়। এই শ্বাসাঘাতেরও আবার নানান স্বর-বৈচিত্র্য আছে, পরে তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

আদিম মানুষের জীবন ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত বহুল, সংগ্রাম সঙ্কুল। তাকে আপন প্রতিবেশ এবং চতুর্দিকের প্রাকৃতিক জগতের শত্রুর সঙ্গে সর্বদা যুঝতে হত, পশুর সঙ্গে ছিল তার দৈনিক সংগ্রাম, শিকার, কৃষিকর্ম, নারীর ওপর অধিকার নিয়ে ছিল জাতি, গোষ্ঠী এবং প্রতিবাসীর সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম। অর্থাৎ সংগ্রাম ছিল তার জীবনে অপরিহার্য একটি দিক, বাঁচতে গেলে সেই সংগ্রাম তাকে করতে হতই। যে মারে সেই বাঁচে, এ নীতি পৃথিবীর এক আদিম নীতি।

অবশেষে এই সংগ্রাম আদিম মানুষের জীবনে এমনই এক সর্বাত্মক সত্য হয়ে উঠল যে তার উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানেও সেই সংগ্রামের ছায়া পড়ল। অথবা বলা যায়, সেই সংগ্রামের অভিনয় করেও তারা আনন্দ পেতে লাগল ; কিংবা যাদুময় ক্রিয়াচার রূপেও এই সংগ্রামের অভিনয় ও অনুকরণ করা হতে লাগল। এখনও তারশেষ রেশ কোনো-কোনো ব্রতানুষ্ঠানে ও লোক উৎসবে মেলে। উত্তরবঙ্গের মেছেনী ব্রতগানে, পশ্চিমবঙ্গের ভাদু, টুসু গানে, ঝাঁপানে, চৈত্র ও বৈশাখ সংক্রান্তির গাজনে, মালদহের গম্ভীরায়, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মেয়েলি অনুষ্ঠান 'কাদাখেঁড়ু' বা 'প্যাঁকখেলায়,' জন্মাষ্টমীর

পয়ঙ্গিন নন্দোৎসবে—সর্বত্র প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এমন কি বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বর ও কনে পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা তার অভিনয় দেখা যায়। আশ্বিন-সংক্রান্তির দিন উত্তরবঙ্গের কৃষকগণ আজও মাঠে গিয়ে এই প্রার্থনা জানায়, অন্যের ধান যেমন-তেমন হোক, আমার ধান যেন ভালো হয়। এও এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অধিকাংশ লোক-অনুষ্ঠান ও উৎসবই প্রতিযোগিতাপ্রধান—সংগ্রাম তার মূল কথা।

সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানেই হল, কি করে দ্রুততার সঙ্গে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, প্রতিপক্ষকে জব্দ করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার জন্যেই শ্বাসাঘাতের আয়োজন ও প্রয়োজন। তাই ছন্দে ধরা পড়ে। যেমন 'নৌকা বাইচ', 'ধানকাটা', 'সারিগান', 'ছাদ পেটানোর গান', ভারী কোনো বস্তু টানবার জন্যে ছড়া ইত্যাদিতে প্রয়োজন সমস্বরে সমবেত শক্তি প্রয়োগের। ওখানে যা সমস্বরে, সমবেত শক্তির প্রয়োগরূপে গানে ব্যক্ত হয়, ছড়ায় তাই শ্বাসাঘাতরূপে ধরা পড়ে। সংগ্রাম-প্রেরণাই অবশেষে দ্রুত ছন্দে রূপ নেয় এবং যেহেতু আদিম মানুষের জীবনেই তা উদ্ভূত হয়েছে, সেই হেতু লোকসাহিত্যেও আজও তা ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

কলহ-প্রবণা নারীর ভাষা-ভঙ্গিতে তো বটেই, সাধারণভাবে যে কোনো নারীর ভাষাতেই শ্বাসাঘাত-প্রবণতা দেখা যায়। শ্বাসাঘাতের জন্যেই কি নারীকে ছড়ার প্রথম রচয়িত্রী এবং শেষ ধারয়িত্রী বলা হয়? এও প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য এক বিষয়।

নারীকে ছড়ার ধারয়িত্রী রূপে নির্দেশ করবার পেছনে যে যুক্তি দেখানো হয়, তা তার রক্ষণশীলতা। রক্ষণশীলতার জন্যেই নাকি নারী প্রাচীন ধারাকে বজায় রেখেছে। আমাদের মতে এর পেছনে ভিন্ন একটি দিক কার্যকরী হয়েছে।

ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, পুরুষের তুলনায় নারী কিঞ্চিৎ কলহপ্রবণা। এই কলহ-প্রবণতা নারীর শারীর দিকের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হয়। জীব-জগতে দেখা যায়, পুরুষ-জীবের তুলনায় স্ত্রী-জীবের ক্রোধ-হিংসা বেশি। সাহিত্যের রূপক-উপমা সৃষ্টিতেও তার ছাপ পড়েছে। কোপ ক্রোধ ঈর্ষা বিদ্বেষ বোঝাতে তাই বাঘের চেয়ে 'বাঘিনী', সাপের চেয়ে 'সাপিনী'র উল্লেখ করা হয়। হয়তো এইসব প্রাণীদের পুরুষগুলি বহুশঃ সদ্যোজাত শাবকদের খেয়ে ফেলে, সুতরাং পুরুষদের গ্রাস থেকে সন্তানদের

রক্ষা করবার জন্যে স্ত্রী-জীবদের অনিবার্য কারণেই হিংস্রভাব ধারণ করতে হয়।

মানবীর ক্ষেত্রে সে ধরণের বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও, মানবী বলেই তার ঈর্ষা-বিদ্বেষের অন্যান্য বিচিত্র ও জটিল কারণ রয়েছে। পুরুষের তুলনায় নারীর Possessive instinct অনেক বেশি, সব কিছুকেই সে দখল করে নিতে চায় নিঃশেষে, সাংসারিক ভোগ্য সামগ্রী থেকে পুরুষ পর্যন্ত সব কিছুর ওপর করতে চায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ; এ যেমন একদিক, তেমনি রয়েছে অপর দিকের চিন্তা : রূপ-যৌবন যতদিন, ততদিনই কেবল পুরুষের কাছে প্রতিষ্ঠা, অতএব যৌবন সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা, তারই ফলে সমস্তরের রূপযৌবনবতী নারীকে ঈর্ষা,—ইত্যাদি নানা কারণে নারীকে কলহে লিপ্ত হতে হয়।

এবং কলহ মানেই প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ মানেই দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে হারিয়ে দেওয়া। সেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নারীর এমনই এক অচ্ছেদ্য যোগ যে, সহজেই তাঁর ভাষাতেও এসে পড়ে শ্বাসাঘাত,—যে শ্বাসাঘাত ছড়ার এক বিশিষ্ট দিক বলে অনেকের কাছে স্বীকৃত।

শ্বাসাঘাত ছাড়াও নারীর ভাষাভঙ্গিতে থাকে এক ধরণের ছন্দবোধ, —অবশ্য শ্বাসাঘাত ও ছন্দবোধ পরস্পর থেকে বিযুক্ত নয়। নারীর রক্ষণশীলতার এক সূক্ষ্ম ও বিচিত্র প্রভাবও এই ছন্দবোধের সঙ্গে জড়িত। রক্ষণশীল নারী তর্ক-কলহ ইত্যাদির কালে যুক্তির চেয়ে আবেগের দ্বারা অধিক পরিমাণে চালিত হয়, আগে যুক্তি পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত এবং আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল সিদ্ধান্তগুলিই সে কেবল গ্রহণ করে, পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তগুলি পূর্বের অভিজ্ঞতা-লব্ধ, কাজেই বর্তমানের প্রসঙ্গেও অতীতকে অস্বীকার বা অতিক্রম করা সম্ভব হয় না,—এবং এখানেই রক্ষণশীলতার অনতিক্রম্য শিকারে পরিণত হয় নারী।

অতীতের অভিজ্ঞতা ও স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তগুলি অচল-অনড়-অপ্রতিরোধ্য হয়ে নারীর মনের শেষ তলানিতে গিয়ে ঠেকে। চেতনে ও অবচেতনায় সেগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে। প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তেও তারা সমপরিমাণে সক্রিয় থাকে। এই জন্যে কলহ-বিবাদের কালেও তাঁদের জানা, শোনা ও কণ্ঠস্থ করা ছড়া-প্রবাদের শ্লোক-ধারা প্রায় যেন স্বাভাবিক অবস্থার মতোই নিঃসৃত হয়ে থাকে। শোনা ও শেখা কথাগুলি তাঁদের মনের মধ্যে যেন থরে-

থরে সাজানো থাকে, প্রয়োজন মাত্রেণ বৃষ্টি-ধারার মতো সেগুলি বর্ষিত হয়। এই কারণেই তাঁদের মনের মধ্যে একটি ছন্দের প্রবাহ সর্বদাই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবহমান থাকে। ওই ছন্দটি কিন্তু একটি যান্ত্রিকতার রূপ নেয়। যান্ত্রিকতা এই জন্যেই যে,একই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নারী একই ধরণের কণ্ঠস্থ করা ছড়া-প্রবাদ আওড়ায়। একেই আমরা বলি রক্ষণশীলতার প্রভাব। অনেক সময়ে এও অনেকে লক্ষ করে থাকবেন, কথিত ছড়া-প্রবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তাও সন্দেহের বিষয়। এরও কারণ সেই একই। এই জন্যেই নারীকে ছড়ার রচয়িত্রী বা ধারয়িত্রী বলে কারো-কারো মনে হয়।

যাই হোক, এই সব উক্তি সাধারণভাবে করা হল, এবং পুরাতন ও চিরন্তন নারীর সাধারণ বিশেষত্বকে কেবল লক্ষ করা গেল। এর থেকে এই কথা বলতে চাই: পূর্বলব্ধ স্মৃতি-অভিজ্ঞতার শাসনে বাঁধা নারী-মন নিজের মনের মধ্যে এমন একটি যান্ত্রিক ছন্দ নির্মাণ করে নেয় যে, তার কথাবার্তা, প্রেম-কলহ, আবেগ-উত্তেজনা, সবেরই প্রকাশ যেন পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিময় ভাষাভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, —যে ভাষাও আবার ছন্দোময়। ভাষার এই ছন্দোময়তা কেবল শ্বাসাঘাতজনিত একটি বিশেষত্ব নয়: তাতে থাকে সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের ব্যবহার, দ্বিরুক্তি ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার, বাগ্‌ভঙ্গিতে Antithesis-এর অতি ব্যবহার এবং অন্যান্য কয়েকটি দিক। লক্ষ করবার বিষয় এই, পুরুষের রচিত ছড়া-পাঁচালির রচনারীতিতেও এইগুলি প্রধান হয়ে ওঠে।

অতএব, নারীকেই যদি ছড়ার একমাত্র রচয়িত্রী ও ধারয়িত্রী বলতে হয়, তবে নারীর সাধারণ বাগ্‌ভঙ্গি ও ছড়ার রচনারীতির ভঙ্গির মধ্যে প্রথমে একটি যোগসূত্র খুঁজতে হবে, তবেই এই ধরণের মন্তব্যের একটি মূল্য থাকবে। দুঃখের বিষয়, গবেষকগণ বাঙলা ছড়ার রচনাগত বিশেষত্বগুলি প্রথমতঃ নিরূপণ-নির্ধারণ করেন নি; দ্বিতীয়তঃ, নারীর বাচনভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে তার সংযোগসূত্রও আবিষ্কার করেন নি; তা না করেই তাঁরা নারীকে ছড়ার রচয়িত্রী ও ধারয়িত্রী বলে থাকেন, ফলে ওই মন্তব্য অস্পষ্ট ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

শ্বাসাঘাত ও ছন্দোময়তা নারীর বাগ্‌ভঙ্গিতে থাকলেও কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তের বেলায় নারীকেই ছড়ার একমাত্র রচয়িত্রী-ধারয়িত্রী বলা যায় না। আসলে এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গভেদ করতে যাওয়াই নিষ্ফল বিড়ম্বনামাত্র।

ছড়া বাঙালীর জীবনের সাহিত্যিক প্রকাশের এক সাধারণ মাধ্যম, যখনই বাঙালী যা-কিছুই ব্যক্ত করতে চেয়েছে, তা করেছে এই ছড়ার ঢং বা ভঙ্গিতেই। গবেষকগণ যদি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে এক নজরেই দেখবেন, মৌখিক ও লৌখিক তাবৎ সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে ছড়া বা ছড়ার ঢং। ছড়া বাঙালীর জাতীয় একটি সাহিত্যিক ঢং, তার লিঙ্গভেদ নেই, —সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-প্রাত্যহিক —সর্ববিষয়কেই ব্যক্ত করতে যেখানে ছড়াকে আশ্রয় করা হয়েছে, সেখানে নারী-পুরুষের ভেদ আনায়ন বাতুলতা বলে বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ছড়ার ঘাসাঘাতের প্রসঙ্গে আমরা আদিম মানুষের জীবনের সর্বাত্মক সংগ্রামের যে কথাটি তুলেছি, সেটি বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই সর্বাত্মক সংগ্রামেরও কোনো লিঙ্গভেদ নেই। আদিম মানুষ, তা সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক, তার কাছে সাধারণ শত্রু ছিল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দিক। নারী ও পুরুষ সম্মিলিতভাবে সেই শত্রুর মোকাবিলা করেছে,—সুতরাং সংগ্রাম থেকে আগত ঘাসাঘাতের অধিকার কেবল একা নারীরই প্রাপ্য নয়। শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে নারীর মধ্যে যে ছন্দোপ্রাধান্য দেখা যায়, পুরুষের কর্মের মধ্যেও তা আছে। কুঠার বা হাতুড়ি চালনা, লাঙল চালনা, বৈঠা বাওয়া, সারিসারি কুটীর নির্মাণ—প্রভৃতি নানা কর্মের মধ্যে পুরুষের ছন্দ ধরা পড়ে। একথা সত্যি যে, সভ্যতার বিবর্তনের এক স্তরে নারী পুরুষের পদানত হয়ে পড়ে, পুরুষ কর্তৃক বহুবিবাহ ও অন্যান্য দিক নারীর সামাজিক অবনতির সূচনা করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নারী-পুরুষ সকলেরই প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক শত্রুসংখ্যা কমে আসতে থাকে; আদিম অবস্থার পরবর্তী স্তরে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদরেখা বৃহৎ হয়ে পড়ায়,—নারীর জীবনে প্রতিপক্ষ বলতে একদিকে পুরুষ, অপর দিকে সমলিঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী নারীই দেখা দেয়। মনে হয়, সেই কারণেই ঘাসাঘাত নারীর জীবনে প্রাধান্য রক্ষা করে চলতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কোনো ভেদ ছিল না, একথা মনে রাখতে হবে। পুরুষের জীবনেও সংগ্রাম জীবনভর থাকবেই। তবে এইটুকু বলা চলে, নারী-পুরুষের সংগ্রামের ক্ষেত্র এবং প্রকৃতি বর্তমানে কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু সংগ্রাম দু জনের জীবনেই আছে, অতএব ঘাসাঘাতও দু' জনের জীবন থেকেই আগত।

তৃতীয়তঃ, ছড়ার প্রয়োগ ও ব্যবহারের দিকটি লক্ষ করলে দেখা যায়, পুরুষও ছড়ার ব্যবহার করে থাকে এবং তা প্রায় নারীরই সমপরিমাণে। সাধারণভাবে কথা-বার্তায়, কলহে, ছেলেভুলানো ও ঘুমপাড়ানোতে, নানা ব্রতানুষ্ঠানে নারী ছড়া বলে থাকে বলেই নারীকেই ছড়ার ধাত্রয়িত্রী বলে মনে করা হয়। কৃষিকর্ম নারীরই আবিষ্কার, এখন পর্যন্ত কোনো কোনো কৃষি-অনুষ্ঠানের ছড়া নারীই বলে থাকে, নারী যাদুকর্মও করে, চাকমাদের মধ্যে তো নারীযাদুকরীকেও 'ওঝা' বলা হয়, সুতরাং এদিক থেকেও নারীর প্রাধান্য। কিন্তু তথাপি, ব্যাপকভাবে ওঝার কাজ, ও অন্যান্য 'প্রাণিকতা' ('Shamanism' শব্দটির অনুবাদ এই করলাম), ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা বিশেষ সর্বত্রই দেখা যায়। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে (যেমন, কবি-যাত্রা-পাঁচালী-তরজাতে) যে সব ছড়া ব্যবহৃত হত, তা পুরুষদেরই রচনা, নারীর রচনা খুবই কম। সামাজিক-প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত ছড়ার ক্ষেত্রেও পুরুষের প্রাধান্য।

আমাদের মূল কথা দাঁড়ালো এই. ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গি, সেটিকে নারী ও পুরুষ আপনাপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে,—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ছড়ার রচনাগত ভঙ্গিটি প্রায় এক এবং অবিকৃতই আছে। উভয় লিঙ্গের কথিত ও রচিত ছড়ার এই অভিন্ন ও অবিকৃত রচনাভঙ্গিই শেষবারের মতো প্রমাণিত করে, ছড়া এক সাধারণ সম্পত্তি, তা কেবল নারী বা কেবল পুরুষের নয়॥

··৪···

ছড়ার সম্পর্কে আর এক মন্তব্য: এর মধ্যে পূর্বাপর অর্থের সঙ্গতি-সামঞ্জস্য নেই, তা হেঁয়ালিতে ভরা, প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতি অংশের সংলগ্নতা অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ছড়ার এই বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই মন্তব্যটিকে বিচার করে দেখতে হবে।

ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনা 'মেয়েলি ছড়া' (সাধনা: আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১), গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে নামপরিবর্তন করে হয়:

'ছেলেভুলানো ছড়া'। নামপরিবর্তন গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই হয়তো কবির মনে ঘটে গিয়েছিল, তাই পরবর্তী প্রবন্ধ যখন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (মাঘ, ১৩০১ এবং কার্তিক, ১৩০২) পত্রস্থ হয়, তখনই নাম ছিল 'ছেলেভুলানো ছড়া'। এরপর 'ভারতী'তে (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫) যখন তিনি 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধ বের করেন, তাও ছড়া নিয়েই আলোচনা। দেখা যাচ্ছে, নাম নিয়ে কবি কিছু দ্বিধায় আছেন। তা থাকাই স্বাভাবিক, কেননা, এ বিষয়ে তখনও কারো কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।

প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ হর-গৌরী বা রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পান, যা কেবল নারীর বা নাবালকের নয়। ছড়ার অন্য ও বিস্তৃত দিক সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ কবি নিজেই করে নেন। সুতরাং ছেলেভুলানো বা মেয়েলি ছড়ার প্রকৃতি ও রচনারীতি সম্বন্ধে কবি কোনো মন্তব্য করে থাকলে তা একান্ত ও বিশেষভাবে সেই ধরণের ছড়া সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে মাত্র, নির্বিশেষভাবে সকল ছড়া নয়। অনেকেই এই সহজ কথাটি ভুলে গিয়ে, ছড়ার একাংশ সম্বন্ধে কৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে সর্বাংশে প্রয়োগ করতে চান।

প্রথম প্রবন্ধ 'মেয়েলি ছড়া' (ছেলেভুলানো ছড়া : ১)-তে কবির এই প্রসঙ্গে কৃত মন্তব্যগুলি স্মরণ করা যেতে পারে : ছড়ার রসস্বাদ করেছেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনের ছেলেবেলাকার স্মৃতি দিয়ে। ছড়ার মধ্যে তিনি যে 'চিরত্ব'র সন্ধান পেয়েছেন, সে 'চিরত্ব' আসলে একটি নবীনতা,—যে নবীনতার প্রতীক শিশু। 'চিরত্ব' ও নবীনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যেসব কথা বলেছেন, এখানেও তাই বলেছেন। 'চিরত্ব' মানে একই সঙ্গে নবীন ও পুরাতন এবং 'শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই' ; দ্বিতীয়তঃ, 'শিশু প্রকৃতির সৃজন'।

শিশুর মধ্যে কবি একটি দার্শনিক দিক আবিষ্কার করেছেন এই সব উক্তির মাধ্যমে। শিশুর মনস্তত্ত্বটিও কবি কবির মতোই দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। আলোচনার ভঙ্গি দেখে ক্ষণপরেই মনে হয়, শিশু আর 'শিশু' থাকে নি, তা বয়স্ক মানুষেরই এক ভিন্ন সংস্করণ হয়ে গেছে,—যেমন 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের শিশুকে আর নিছক শিশু বলা যায় না। শিশু বলতে কবি এখানে বয়স্ক মানুষেরও এক বিশেষ মনোভঙ্গিকে বুঝিয়েছেন। 'এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র'—এখানে 'আমাদের' শব্দে কবি কি আবালক-বালক সকলেরই আন্তর বিশেষত্বকে নির্দেশ করেন নি? সুতরাং

কবির মন্তব্যকে ঠিক আক্ষরিকভাবে কেবল শিশুদের প্রতি উক্তি বলেই গ্রহণ করলে কোনো নিরাপদ লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পৌঁছব না।

'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'—কবিকৃত এই মন্তব্যের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি-কণিকা এবং তার 'সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ' করবার যে রোমান্টিক ব্যাকুলতার কথা ধ্বনিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তা প্রচলিত অর্থে কোনো শিশুর মনকে নির্দেশ করে না।

ছড়ার রচনাভঙ্গির মধ্যেও কবি যে কাঠিন্যকে লক্ষ করেছেন, তাও কোনো শিশু বা বালকের নয়,—অনেকেই যেমন মনে করে থাকেন, খানিক বড়ো হলেই শিশু বা বালকই ছড়া রচনা করে! ছড়া সর্বস্তরে বয়স্ক লোকেরই রচনা, কোনো স্তরেই তা শিশু বা বালকের নয়, বয়স্ক মানুষকেও তা রচনা করতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয়। কবির মন্তব্য: 'হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। ...ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।' আসলে ছড়া রচিত হয় এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা ও মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে,—শিশু বা বালকের পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ছড়া তা হলে একটি 'সৃষ্টি' হয়ে উঠতে পারত না। '...ছড়ার এই সকল অযত্ন রচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনার দ্বরিতচিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।'

ছড়ার মধ্যে 'অসঙ্গতি' ও 'অসংলগ্নতা'র প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে ছড়া বালকের রচনা কিনা সে আলোচনায় রত হবার সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের প্রথম বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথ যদিও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে শিশু-বালকের মনোভঙ্গি ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকেই ছড়াকে লক্ষ করেছেন, তথাপি, এর রচয়িতাকে বয়স্ক ও পরিণত মনকেই দেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা মনে করি, ওই বয়স্ক ও পরিণত মনটির কোনো বয়স নেই, সে নিছেই

শিশু, প্রতি মানুষের মনেই বৃদ্ধ হলেও একটি শিশু বাস করে, সুতরাং শিশু বলতে আক্ষরিক ও অন্ত অর্থের—দুই অর্থের শিশুকে বুঝিয়েছেন কবি। এই জন্যেই ছড়ার রসাস্বাদন কালে বয়স্ক কবি আপন শৈশবের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করেছেন। তৃতীয়তঃ, এই শিশুর মধ্যে কবি যে আদিম সারল্যকে লক্ষ করেছেন, তাতে শিশু বলতে এক আদিম মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়: আজকের শিক্ষিত ও সভ্য শিশুর মনোভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব যা—অতীতের আদিম বয়স্ক মানুষের মনোভঙ্গিও তা,—দুয়ে কোনো ভেদ নেই।

সুতরাং ছড়ার মধ্যে লক্ষিত 'অসঙ্গতি' ও 'অসংলগ্নতা'র কারণটি কেবল শিশুর দিক থেকেই দেখলে চলবে না, তাকে দেখতে হবে আদিম মানবের মানসিকতার দিক থেকে। ছড়ার মধ্যে কবি যে 'স্বপ্নদর্শী' মনের প্রতিফলন দেখেছেন, এই 'স্বপ্নকে'ও নতুনতর এক অর্থে গ্রহণ করতে হবে,—সে অনুসানের ইঙ্গিত অবশ্য কবিই তাঁর আলোচনার মধ্যে দিয়ে গেছেন। বয়স্ক মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন অনেক সময়েই তারও মধ্যে থাকে না যুক্তিধর্মের অস্তিত্ব। সাধারণ শিশুর জাগ্রদাবস্থা ও বয়স্ক মানুষের ঘুমন্তাবস্থা এখানে এক, স্বপ্নদর্শনকে কেবল আক্ষরিক অর্থেই শিশুর দিক থেকে দেখতে চাই না। শিশুকে কবি 'প্রকৃতির সৃজন' বলেছেন,—আদিম মানুষও তাই।

শিশুর উদ্দেশ্যে রচিত ছড়াকে এইভাবে আদিম বয়স্ক মানুষের মনের আলোকে গ্রহণ করবার ইঙ্গিত আমরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাতেও পেয়েছি। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর (রচনার তারিখ: ৮ আষাঢ়, ১৩০৬)। 'খুকুমণির ছড়া' এই নাম থেকেই বোঝা যায়, সঙ্কলক এটি বালক-বালিকাদের জন্যেই সঙ্কলন করেছেন, এবং ভূমিকা লেখক রামেন্দ্রসুন্দর সেই দৃষ্টিতেই বইটিকে দেখেছেন। তথাপি রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি ঠিক তাহাদের জন্য [বালক-বালিকাদের জন্য] এই ভূমিকা লিখি নাই'। এই মন্তব্যটি রামেন্দ্রসুন্দরের ছড়া সম্পর্কে দৃষ্টির পরিচায়ক। ছড়ার মধ্যে যে অনিয়ম, অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা দেখা যায়, তিনি তাকে বালকের মন ও মনস্তত্ত্বের আলোকে না দেখে বয়স্ক মানুষেরই এক বিশিষ্ট মনোভঙ্গিরূপে দেখেছেন। বয়স্ক মানুষ বলতে তিনি দুধরণের মানুষকে বুঝিয়েছেন: প্রথমতঃ, আজকের সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ, যে মানুষের মন থেকে আজও অতি-প্রাকৃতের মোহ ঘোচে নি: সাধারণ মানুষের একটা অংশ আজও অতি-প্রাকৃতে (বর্তমান ক্ষেত্রে ছড়ার অসঙ্গতি,

অসংলগ্নতাকে) বিশ্বাস করে। এই সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর আর একটি দার্শনিক প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন : বিশাল জড় জগতের যতটুকু মানুষ আজ পর্যন্ত চিনেছে, ততটুকুকেই সে নিয়ম-সঙ্গতির বাঁধনে বেঁধেছে, বাকীটা আজও অজানা. কাজেই পৃথিবীর যে সব ঘটনা আজ অসঙ্গত-অসংলগ্ন বলে বোধ হয়, তা আসলে মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে আছে বলেই অসঙ্গত বলে মনে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গটির আংশিক উত্থাপন মাত্র করেছেন, কিন্তু এর সুন্দর আলোচনা তিনি এর বছর কয়েক আগে লিখিত 'অতি-প্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব' (সাধনা : ফাল্গুন, ১৩০০) প্রবন্ধে করেছেন।

অতঃপর এই ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিতীয় ধরণের যে বয়স্ক মানুষের কথা বলেছেন, তারা হল আদিম মানুষ। তাঁর মন্তব্য :'… এই শিশুজনসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধের মধ্যেও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন জাতির উপাসনাপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই শৈশবোচিত প্রবৃত্তির ভূরি পরিমাণ পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে। আমরা যে সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া নির্দেশ করি তাহাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটাই এইরূপ অনিয়ত বন্ধনশূন্য অতিপ্রাকৃতে নির্ভর ও বিশ্বাস মাত্র,…। কেন না, আমাদের মধ্যে ও পৃথিবীর সভ্যতম জাতির মধ্যেও বোধ করি, পোনের আনার অধিক লোক এই অতিপ্রাকৃতের মরীচিকার প্রতি সুপেয় বারিভ্রমে ধাবিত রহিয়াছে।'

তাহলে, ছড়ার অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা যে বালকমনের বল্গা-বিহীন কল্পনাপ্রবণতার ফল নয়, রামেন্দ্রসুন্দরের ওপরের উক্তি থেকেই তা পরিস্ফুট হল। রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতেই আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ধরা পড়েছিল, সভ্য মানুষের মনে অতি-প্রাকৃতকে বিশ্বাস করবার প্রবণতা আজও যেমন যায় নি, তেমনি আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মবন্ধনশূন্য প্রকৃতিকে গ্রহণ করবার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

এই দৃষ্টি থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি আমরা বিচার করবার চেষ্টা করেছি। এক দেশের শিশুর সঙ্গে যেমন অপর দেশের শিশুর প্রকৃতিগত কোনো অমিল নেই, তেমনি পৃথিবীর এক অংশের আদিম মানুষের সঙ্গে অপর অংশের আদিম মানুষের একটি নিগূঢ় যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এই অর্থে শিশু ও আদিম মানুষ এক ও অভিন্ন।

যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধি মশাই তাঁর 'পৌরাণিক উপাখ্যান' (মাঘ, ১৩৬১) বইটিতে 'আগডোম বাগডোম ঘড়াডোম সাজে' ছড়াটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (পৃ. ৭২-৭৪) লিখেছিলেন : 'ছড়ার দুই লক্ষণ,—(১) বাক্য ছোট ছোট, (২) পরপর বাক্যের অর্থের যোগ থাকে না'। এই মন্তব্যের মধ্যেও ছড়ার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যানিধি মশাইকে ধন্যবাদ, তিনি এই অসঙ্গতিকে বিশেষ এক পৌরাণিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে সম্পূর্ণ একটি গবেষণার বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা সকলে নাও মানতে পারেন; কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হল, ছড়াটির ব্যাখ্যায় তিনি শিশুর মনস্তত্ত্বের দ্বারস্থ হন নি, বয়স্ক মানুষের দৃষ্টিতেই দেখেছেন।

ছড়ার এই অসঙ্গতি ও পারম্পর্যহীনতার কারণ হিসেবে 'ক্রমবিকাশ' ও 'কালচেতনাকে' নির্দেশ করেছেন আশরাফ্ সিদ্দিকী তাঁর 'লোকসাহিত্য' (ঢাকা : নভেম্বর, ১৯৬৩) বইতে (পৃ. ১৫৩-১৪৪)। তাঁর মন্তব্য : 'যে সব ছড়ার মধ্যে 'অসঙ্গতি' অপেক্ষাকৃত বেশী সেগুলি যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তা সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।' তিনি বলতে চান, মানুষের মনে যতই চিন্তা ও যুক্তির স্পষ্টতা এসেছে, ততই ছড়ার অসঙ্গতি উধাও হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি দু-একটি দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। তাঁর এইসব মন্তব্য ও আলোচনাভঙ্গি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিতে পারি না। আদি কালের ছড়ায় অসঙ্গতির পরিমাণ বেশি, কিন্তু পরবর্তী কালের ছড়াতেও যখন সেই অসঙ্গতি সমপরিমাণেই দৃষ্ট হয়, তখন সিদ্দিকী সাহেবের তত্ত্বটিকে ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। আদিকালে রচিত ছড়া বলে চিহ্নিত রচনার ভাষার সঙ্গে পরবর্তী কালের ছড়ার ভাষার এমন কোনো গুরুতর বৈসাদৃশ্য নেই যে, যার ফলে দুটি ছড়াকে দূরবর্তী দুই যুগের রচনা বলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করা যায়। কোন্ ছড়া প্রাথমিক স্তরের আর কোন্টি পরবর্তী স্তরের তা স্থির-নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করবার নানা বাহ্য ও আভ্যন্তর মাপকাঠি নির্দেশ করে না নিয়ে বিচার করলে এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশয় আসবেই। সিদ্দিকী সাহেব তা না করেই, কেবল বাহ্যিক দু-একটি দিকের ওপর নির্ভর করেই, আপন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তা ছাড়া, মৌখিক সাহিত্যের এমন কালগত বিভাগ কল্পনা করতে গেলে এমনিতেই নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়।

এই পর্যন্ত পূর্বসূরীদের আলোচনা থেকে এই সত্যটুকু নিষ্কাশিত হল যে,

ছড়ার মধ্যে একটি অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা ও পারম্পর্যহীনতা আছেই। কারো কারো মতে তা শিশু-বালকের মন ও মনস্তত্ত্বজাত। কেউ বা এর মধ্যে আদিকালের প্রভাব লক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নরূপ।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই বোঝা গেছে যে, ছড়াকে আমরা শিশু বা বালকের সাহিত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই, কাজেই সে দৃষ্টিতে তা বিচার করতে চাই না। 'শিশু' বলতে আমরা আদিম মানবগোষ্ঠীর সারল্যকে বুঝি, এবং রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-যোগেশচন্দ্রের আলোচনায় তার সমর্থন প্রদর্শন করেছি। যেহেতু আমাদের মতে ছড়া শিশু-বালকের মন দ্বারা প্রভাবিত নয়, অতএব ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার অস্তিত্বই আমরা স্বীকার করি না।

লোকসাহিত্যের কোনো বিভাগই অসঙ্গতিতে পূর্ণ নয়। গান, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ—সব ধরণের রচনারই একটি সুস্পষ্ট অর্থ আছে। তবে ছড়ারই বা থাকবে না কেন? যে লোকমানস থেকে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা উৎসারিত হয়েছে, সেই একই লোকমানসের ফসল ছড়া। যদি অন্যান্য বর্গের নিদর্শনগুলিতেও অর্থগত সঙ্গতি ও পারম্পর্য অনুপস্থিত থাকত, তবে ছড়ার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের একটি ভিত্তি থাকত। 'কথা' ও 'ধাঁধা'কে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করবার রেওয়াজ আমাদের দেশে তো বটেই,—বিশ্বের নানা দেশেই ছিল বা আছে। 'কথা' সম্পর্কে উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে,—এর মধ্যে আছে নানা তত্ত্বের নানা দিক,—অন্ততঃ তা ছেলে-খেলার বস্তু নয়। তেমনি ধাঁধা-সম্পর্কেও ইউরোপ-আমেরিকার এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণায় এর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা নৃতাত্ত্বিক দিক ও প্রসঙ্গ। ফলে কথা ও ধাঁধাকে একদা যে অধঃপতনকে বরণ করতে হয়েছিল, কালক্রমে তা ঘুচে যায়। কিন্তু ছড়া নিয়ে আজও কোনো বিদেশী গবেষক নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে তার মূল্যকে বাড়িয়ে দেন নি,—এবং বিদেশী গবেষকরা তা না করা পর্যন্ত ছড়াকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে আমরাও কুণ্ঠিত আছি। আমরা বিদেশী গবেষকদের মুখে ঝাল খাই, সুতরাং বসে আছি, কবে অনুগ্রহ করে এক বিদেশী গবেষক চোখে আঙুল দিয়ে ছড়ার মূল্যটি আমাদের বুঝিয়ে দেবেন, এবং তখন রাতারাতি ছড়ার মধ্যে তাঁদের চশমা দিয়ে দেখে নতুন নতুন বিষয় খুঁজে পাব এবং ভুলেও আর তাকে ছেলেভোলানো পদার্থ বলব না! কিন্তু ভারতের মতো ছড়ার বৈচিত্র্য বিদেশে কোথাও নেই, অতএব একাজে তাঁদের হস্তক্ষেপের পূর্বে আমাদেরই করা দরকার।

ছড়াকে দেখতে হবে আদিম মানুষের জীবন ও চেতনা দিয়ে, একটি নৃতাত্ত্বিক বোধ নিয়ে। আদিম মানুষের সাহিত্য রচনায়, হোক তা মৌখিক, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তার আছে বিশেষ একটি কাঠামো, বিশেষ ভাষা ভঙ্গি। যে বিশেষ রচনারীতি একটি কথায় বা গানে দেখা যায়, তাই ধরা পড়ে একটি ছড়ার মধ্যেও। প্রথমেই আবিষ্কার করতে হবে লোকসাহিত্যের রচনাগত সেই সাধারণ বিশেষত্বগুলিকে'—যা সব ধরণের রচনাতেই সমপরিমাণে গৃহীত হয়; যা লোকজীবন ও মানস থেকেই উৎসারিত। লোকমানস কয়েকটি প্রতীক ও সংমিশ্রিত-প্রতীক (composite symbol)কে খুব গুরুত্ব দেয়। ছড়ার মধ্যেও সেই প্রতীক-প্রবণতা ধরা পড়ে। ছড়ার অসঙ্গতিকে বিচার করতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মিলিত ভাবে। যেমন, একটি ছড়ায় ফুলকে খৈ বলা হল; সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি ছড়ায় যদি ফুলের পর খৈ থাকে, তবেই বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই তা কোনো বিশেষ বিষয়ের ইঙ্গিত রূপে ব্যবহৃত। তেমনি বুড়ি থাকলে কলাগাছকে পাওয়া যাচ্ছে একটি ছড়াতে, এই দুটির পর-পর বা একত্র উল্লেখ যদি অন্যত্র মেলে তবে তা প্রতীক বলে মনে করতে হবে। এবং এইভাবে মিলিয়ে নিলে অনেক ছড়াকেই আর অসঙ্গতিমূলক বলে মনে হবে না। এইভাবে একাধিক প্রসঙ্গ মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে এক-একটি 'Motifeme'; এবং যেখানে সম্মিলিত প্রসঙ্গ-গুচ্ছের একটি অনুপস্থিত বলে পরিবর্তে অন্য একটি প্রসঙ্গ এসে পড়ে, তাকে বলে 'Allomotif'. ক্রমপুঞ্জিত ছড়ার পর-পর আগত বিষয়গুলির পারম্পর্যও এই দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। আমরা লোকমানসের পটভূমিকায়, তাদের প্রতীকতা বোধের আলোকে ছড়াকে দেখি নি বলেই ছড়াকে পারম্পর্যের সূত্রবিহীন অসঙ্গত ও অসংলগ্ন কিছু চিত্রের বা ধ্বনির সমাহার ছাড়া আর কিছু মনে করি না। কিন্তু যদি নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে, প্রতীকতাবোধের আলোকে, লোকসাহিত্যের রচনাগত বিশেষত্বের পট-ভূমিকায় ছড়াকে পর্যবেক্ষণ করি, তবে বহুক্ষেত্রেই ছড়াকে আর অসংলগ্ন বলে মনে হবে না। উপর্যুক্ত সম্মিলিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেও যদি কোথাও কোথাও ছড়ার সঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করতে আমরা অসমর্থ হই, তবে তা আমাদেরই অক্ষমতা। তখন মনে করতে হবে, ছড়ার পর্যবেক্ষণের পূর্ণ প্রেক্ষাপট এখনও অন্বেষণ করা শেষ হয় নি। এই গ্রন্থে আমরা সেই চেষ্টাই করেছি। দেখেছি, বহু ক্ষেত্রেই ওইসব তথাকথিত অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়,—অবশ্য তেমনি বহু ক্ষেত্রে আবার

দেওয়াও যায় না। কিছু ক্ষেত্রে যখন দেওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই সর্বক্ষেত্রেও তা দেওয়া যায়। কেবল সর্বত্র খাটে এমন দৃষ্টিকোণ খুঁজে পাই নি বলেই এমন ঘটেছে। সে আমাদেরই দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা ও খণ্ডতা,—নইলে সাধারণভাবে ছড়াকে অসঙ্গতিতে ভরা বলা চলে না॥

···৫···

ছড়ার সংজ্ঞা ও অন্যান্য লাক্ষণিক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচকের কিছু বিচ্ছিন্ন মন্তব্য মেলে। এইখানে তার উল্লেখ ও বিচার করি।

'বাঙলায় নারীর ভাষা' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৩৩, চতুর্থ সংখ্যা। পৃ ২৩৯-২৫০) এবং 'বিচিত্র সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৬১) গ্রন্থের 'লোক-সাহিত্য' (পৃ ১৯২-১৯৮) প্রবন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মশাই ছড়াকে কবিতা বা কবিতাংশ বলেছেন। প্রথম প্রবন্ধে সাধারণভাবে, দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য পেয়েছি। শেষোক্ত প্রবন্ধ থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : "ছেলেভুলোনো ছড়া কবিতাই। তবে তার নির্মাণ-রীতি সাধারণ কবিতার থেকে আলাদা। সাধারণ কবিতা লেখবার সময় কবির কল্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, রস থেকে ভাষায়। ছড়া কবিতায় লেখকের কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে, এবং তাতে রূপের ও ভাবের মধ্যে, ভাষা ও রসের সঙ্গে কোন রীতিসিদ্ধ যোগাযোগ বা সঙ্গতি আবশ্যিক নয়।"

ডঃ সেন এই মন্তব্য যদিও কেবল ছেলেভোলানো ছড়া সম্বন্ধেই করেছেন তথাপি এটিকে সম্প্রসারিত করে নির্বিশেষভাবে সকল ছড়া সম্পর্কেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ছড়া-কবিতার নির্মাণরীতি প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন করে বাঙলা ছড়ার শিল্পরীতি সম্পর্কে আর কেউ ভেবেছেন কিনা জানি না। ডঃ সেন লক্ষ করেছেন, সাধারণ কবিতা এবং ছড়া-কবিতার গতিপথ দুই বিরুদ্ধ দিকে। সাধারণ কবিতার মধ্যে রূপ ও ভাষা নির্মাণের দিকটি প্রাধান্য পায় অর্থাৎ প্রকাশকলা সেখানে বড়ো হয়ে ওঠে। এই প্রকাশই সৃষ্টি বা আর্ট। এই সৃষ্টি বা আর্ট তখনি সম্পূর্ণতা পায় যখন কবি-সাহিত্যিকের মনের ভাবনাটি যথাযথ বা যথার্থভাবে রচনায় রূপ ও ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে। এই ধরণের দৃষ্টিতে তা হলে উৎসরূপে থাকে কবির মন—যে মন সকল ভাব ও রসের মূল। অর্থাৎ ব্যক্তিমন এতে মূলতঃ স্বীকৃতি পায়। উল্টোদিকে, ছড়া কবিতার শিল্পরীতিতে থাকে প্রথমেই রূপ ও ভাষা

—পরে ভাব ও রস। প্রাথমিক স্তরে রূপ ও ভাষা থাকায় বাহ্য দিকটাই আন্তর দিকের তুলনায় বড়ো হয়, একই কারণে ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি। এইখানে ডঃ সেনের থেকে আমরা একটু ভিন্ন মত পোষণ করতে চাই। রূপ ও ভাষাই ছড়া-কবিতার শিল্পের প্রাথমিক দিক বটে কিন্তু সর্বদাই এবং সকল ক্ষেত্রেই কি তা প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে ভাবের ও রসের স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়? বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কেবল রূপ ও ভাষাগত দিক ছাড়া অর্থাৎ রূপনির্মিতির একটি objective দিক ছাড়া তাতে আর কিছুই মেলে না। অর্থাৎ তা সুখপাঠ্য বস্তুতে পরিণত হয় না, যেন নীরস তথ্য-বিবৃতি বা কোনো বস্তুর বর্ণনা ব্যতিরিক্ত তা অন্য কিছুই নয়। অবশ্য এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। লোকসাহিত্য মূলত: functional, লোকচিত্রও তাই; আনুষ্ঠানিকতার চাপে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই তার সাহিত্য-সাফল্য বিড়ম্বিত হয়ে থাকে। এইজন্যে একটি ব্রতের ছড়ার তুলনায় একটি ঘুমপাড়ানিয়া ছড়ার সাহিত্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি, কার্যক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। আনুষ্ঠানিকতার বাধা-বিপত্তি না থাকলেও অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক রচনা হলেও যে সর্বত্র তার সাহিত্য-সাফল্য নিশ্চিত হবেই, এমনও কোনো কথা নেই। কারণ, লোকসাহিত্যের শিল্প Graphic Art-এর মতো, তা একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক নক্শাকে ভাষা ও রূপের দিকে থেকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেই, যে আর্টকে শিল্পের ভাষায় বলা যায় Arabesque. কতকগুলি নিয়ম-বাঁধা হিসেব-কষা ভাষা ও ভঙ্গিগত দিককে প্রায় অন্ধভাবে অলঙ্ঘ্য নিয়মে এখানে রচনাকালে অনুসরণ করা হয়। এই হিসেব ও গোনা-গাঁথা দিকটি কিন্তু লোকজীবন ও মানসেরই একটি বিশেষ দিক। লোকসাহিত্যের মধ্যে তাই Symmetry-র প্রাধান্য, Harmony-র নয়। এরই ফলে সর্বত্রই রচনায় সহিত্য-সাফল্য দেখা যায় না। মনে হয়, সাহিত্য-সাফল্য সেখানে উদ্দিষ্টই নয়।

অবশ্য ডঃ সেনের পরবর্তী মন্তব্যটির মধ্যেই আমাদের উপর্যুক্ত মন্তব্যের পরোক্ষ সমর্থন আছে। তিনি যে বলেছেন, ছড়ার শিল্পরীতিতে রূপের সঙ্গে ভাষার এবং ভাবের সঙ্গে রসের স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যোগসম্পর্কটি নাও থকেতে পারে—তা এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখবার মতো। ব্যাপারটি আপাতভাবে তাই। অনেক সময়েই দেখেছি, যা বলতে চাওয়া হয়েছে আর যে ভাষায় তা বলা হল, দুই যেন এক নয়। এক-একটি অঞ্চলে বা লোকগোষ্ঠিতে এক-একটি সাঙ্কেতিক ভাষা আছে। সেই সাঙ্কেতিক ভাষাটি না জানালে কোনো-কোনো

রচনার মর্মোদ্ধারই করা যায় না, রস পাওয়া তো দূরের কথা। এই বিষয়ের ভালো উদাহরণ হল ধাঁধার ভাষা। ধাঁধায় অনেক সময়েই উদ্দিষ্ট বিষয়কে এমন ভাষাভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয় যে, পূর্বের থেকে তার নির্দিষ্ট ও উদ্দিষ্ট অর্থটি জানা না থাকলে তার অর্থোদ্ধার শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভবও বটে। এসব ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। উত্তর বাঙলার একটি লোকসঙ্গীতের একটি পঙক্তিতে পাই : 'পাটাবাড়ীত্ মোর শিয়াল কান্দে, কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে'। এই 'শিয়াল' যে প্রেমিকার গুপ্ত বা অবৈধ প্রণয়ী তা জানা না থাকলে এর রসগ্রহণ অসম্ভব। ডঃ সেন যা ছড়া সম্পর্কে বলেছেন, তা সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের যে কোনো শাখা সম্পর্কেই খাটে। এই ধরণের উক্তি এর পূর্বে 'ছত্তিশগড়ী লোকসঙ্গীত' নিয়ে আলোচনাকালে ভেরিয়র এলউইনের মুখেও শোনা গেছে। যাই হোক, ছড়ার যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, তার এক কারণ বোধ হয়, এই রূপের সঙ্গে ভাষার বা ভাবের সঙ্গে রসের আবশ্যিক যোগ রক্ষা না করা। কেন এমনটি ঘটে? গবেষকদের তার কারণ আবিষ্কার করতে হবে এবং কোন্ 'রূপ' কোন্ 'ভাষা'র প্রতীক বা সংকেত, কোন্ জনগোষ্ঠীর ভাষাভঙ্গির এই বিশেষত্ব, তাও আলোচনা করতে হবে।

ডঃ সেনের মন্তব্যের ইঙ্গিত ধরে এ বিষয়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায়। ছড়ার রূপ ও ভাষা এবং ভাব ও রসের যোগাযোগ আবশ্যিক নয়,—কেন নয়? সহজেই বোঝা যায়, এই যোগাযোগ স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে না করে পরোক্ষ ও অস্পষ্ট ভঙ্গিতে রক্ষা করা হয়। যোগাযোগ আছেই, আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে। কয়েকটি রূপক, প্রতীক ও সঙ্কেত লোকমানসে খুব প্রাধান্য পায়,—সেগুলো দিয়েই তারা তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে চায়। যেমন, ছড়ার মধ্যে দেখা যায়, ভরা কলসী ও সাপের উল্লেখ। ভরা কলসী নারী দেহ, এবং সাপ পুরুষের প্রতীক। তেমনি, গাছ-মাছ-নদী-ফল-পান প্রভৃতি থাকলে ইঙ্গিত দেয় বিয়ে বা সাধভোর। ছাতা মানে ঘর, খাট মানে বাড়ী, পালকি মানে পথ। আলতা আর পান থাকলে সধবা নারী। এতো সাধারণভাবে সামান্য কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই রকম এক-একটি অঞ্চলের বা সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু প্রতীক-সংকেত আছে। এই সব প্রতীক-সঙ্কেত সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত নই, আর সে কারণেই তাদের ভাষাভঙ্গির মাধ্যমে রচিত রূপটিকে আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।

ছড়া-কবিতার ভাষা ও রূপ সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। এই কবিতার প্রসঙ্গে ছড়ার আকৃতি এবং পঙ্‌ক্তির হ্রস্ব-দৈর্ঘ্যের কথাও উঠে পড়ে। এ বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর দুটি মন্তব্য স্মরণ করছি। যোগেশচন্দ্রের প্রাগুক্ত রচনাটিতে পাই, ছড়ার একটি লক্ষণ হল— 'বাক্য ছোট ছোট'। এই মন্তব্য ছড়ার পঙ্‌ক্তিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। ছড়ার পঙ্‌ক্তি গঠনে পর্বের খুব গুরুত্ব দেখা যায়, অবশ্য বাঙলা ছন্দেরই মূল উপকরণ পর্ব। কিন্তু ছড়ার পর্বগুলির অন্য বিশেষত্ব আছে। এখানে এক-একটি পর্ব যেন ভাবের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এক-একটি পর্বে এখানে এক-একটি খণ্ড-চিত্র ভরা থাকে, এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রায় সকলের কাছেই ওই চিত্রগুলির পরস্পরের মধ্যেকার যোগটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অনেক সময় দেখা যায়, পর্বই পঙ্‌ক্তি, পর্বই বাক্য হয়েছে। এই জন্যেই যোগেশচন্দ্রের কাছে এর বাক্যগুলিকে কাটা কাটা বা ছোটো ছোটো বলে মনে হয়েছে।

বাক্যগঠনের এই ধরণের বিশেষত্বের কারণ কি? ছড়ার রচনাভঙ্গিতে Telegraphic ভাষা-ভঙ্গির ব্যবহার দেখা যায়, (নৃতাত্ত্বিকেরা যে ভাষাভঙ্গিকে বলবেন Brachylogy, তার সঙ্গে এই রীতির দূরতম ও ক্ষীণতম একটি যোগ অনুভব করা যায়) তার মানে, ব্যাকরণের দিক থেকে বাক্য সেখানে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তার মানে, একটি বাক্য বা একটি ছড়াতে অনেক তথ্যের সার-নির্যাস সঙ্কলিত হয়, এখানে বর্ণনার পূর্ণ ও সংযোগমূলক স্পষ্ট ও স্বচ্ছ বিবৃতির বদলে, কিছু ইঙ্গিত-ইশারা, কিছু প্রতীক-সঙ্কেত, কিছু তথ্যের সার-নির্যাস প্রদত্ত হয়,—তাই পঙ্‌ক্তিগুলিকে হ্রস্বকায় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিযুক্ত বলে মনে হয়। লোকসাহিত্যের গবেষকদের ওই সব শূন্যস্থান পূরণ করে নিতে হবে, পূরণ করতে হবে লোকজীবনকেই অনুধাবন করে, তারই পটভূমিকাতে। অর্থাৎ ভাষা-বিজ্ঞানে যাকে বলে Tagmeme, এ যেন অনেকটা তারই সঙ্গে তুলনীয়। ছড়ায় অল্পকথায় অনেক কথা বলা হয় বলে মাঝে মাঝে ফাঁকা বা শূন্য বলে মনে হয়।

এই ধরণের শিল্পরীতির মধ্যে এক রকম Abstraction আছে। এই Abstraction কেবল ছড়ার শিল্পরীতিতেই নয়, লোকচিত্র এবং নানা ধরণের লোকশিল্পের মধ্যেও তা বর্তমান মূলতঃ এ হল লোকমানসেরই এক বিশেষত্ব। নৃতাত্ত্বিকেরা এই Abstraction-কেই আদিম মনস্তত্ত্বের প্রতিবিম্ব বলে মনে করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে আলপনা ও ব্রতচিত্রের কথা বলা যায়। আলপনায় বা ব্রতচিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা আঁকা হয়, তা এক টানে অর্থাৎ

আঙুল না উঠিয়ে আঁকা হয়, যেন এক সঙ্গে অনেকখানি দৃশ্যকে সংক্ষিপ্ত ও ঘন করে নিয়ে একটি রেখার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। এতে যেন হুবহু বাস্তবের Representation মেলে না, বদলে মেলে প্রকৃত ও বাস্তবের সংক্ষিপ্ত-সার, তার ভাবময় দিক। বাস্তবের পূর্ণ প্রতিকৃতি রচনার জন্যে যে প্রতিভা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তার Detail-এর কাজ সম্পর্কে যে পরিপক্ব দৃষ্টির আবশ্যক, লোকমানস তা আয়ত্ত করতে পারে না। যেমন, একটি শিশুকে ছবি আঁকতে দিলে সে অঙ্কিতব্য দৃশ্যটির একটি মোটামুটি আদল-আভাসকে এঁকে ফেলতে পারবে, কিন্তু বাস্তবের পূর্ণ প্রতিকৃতি রচনা করতে পারবে না, তা তার সামর্থ্যের বাইরে বলেই সে তা পারবে না। লোকচিত্র ও ব্রতচিত্রও তাই। উপরন্তু তাতে আছে আর একটি দিক। বিশেষ-বিশেষ জনগোষ্ঠীতে বিশেষ-বিশেষ রেখা ও রেখাচিত্র এক-একটি ভাবনাকে তুলে ধরে; তা যদি বাস্তবের সদৃশ নাও হয় তথাপি তা ওই বাস্তব দৃশ্যের প্রতিকৃতি রূপেই গৃহীত হবে সেই জনগোষ্ঠীতে। এমন কি, ব্যাপারটি যদি আনুষ্ঠানিক হয়, তবে ওই ভাবময় রূপচিত্রটিই সেখানে আবশ্যিক, বাস্তবের অনুকরণের প্রয়োজনটাই সেখানে অস্বীকৃত। যেমন, ধরা যাক, লক্ষ্মীব্রতে লক্ষ্মীর পা-এর চিত্র। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্মীর পা-এর এক-একটি আদর্শ-আভাস প্রচলিত আছে, কোনোটির মধ্যেই কিন্তু প্রকৃত পা-এর চিত্র নেই। তা যতটা সম্ভব একটানে আঁকা, তা পা-এর মোটামুটি একটি আদল আনে, এবং যে অঞ্চলে যে ভাব-মূর্তিটি প্রচলিত, অনুষ্ঠানের কালে সেটাই আঁকা আবশ্যিক: বাস্তবের প্রতিকৃতি না হলেও সেই অঞ্চলে লক্ষ্মীর পা বলেই তা সর্বজনস্বীকৃত। লক্ষ্মীর পা তো তবু পায়ের কাছাকাছি, কিন্তু ধানের মরাইয়ের চিত্রটি পরিপূর্ণই ভাব-চিত্র। ক্ষুদ্র থেকে ক্রমেই বৃহত্তর, একটানে আঁকা একটি ক্রমান্বয়িক বৃত্তকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্রতচিত্রে ধানের মরাই বলা হয়। মরাই গোল হয় সাধারণতঃ, যাকে বলে ধানের 'পুড়া', খড় পাকিয়ে গোল একটি বৃহৎ পাত্রের মতো দেখতে তা, তারই রূপাভাস এই ক্রমান্বয়িক বৃত্ত। অপর কোনো বিদেশী তা দেখে বুঝতেই পারবেন না যে ওই বৃত্তটি একটি ধানের মরাই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ এক নজরেই বুঝবেন, ওটা ধানের মরাই ছাড়া আর কিছু নয়। লোকচিত্র হয় টু-ডাইমেনশনাল, তাতে কেবল দৈর্ঘ্য-প্রস্থই থাকে, 'বেধ' থাকে না। এইজন্যেই তাতে বাস্তবের পূর্ণতা থাকে না।

এই ভাবময় রূপাভাস কেবল লোকচিত্রেই নয়, মৃৎশিল্পেও দেখা যায়। শ্রী বিনয় ঘোষ তাঁর লেখা 'বাংলার মৃৎশিল্পে সমাজতত্ত্ব' (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০। পৃ. ২০৪-২১০) নামে একটি প্রবন্ধে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া তৈরির ধারার মধ্যে এসেছে দুটি ধারা। একটি হল, আদিম ও আনুষ্ঠানিক শিল্পধারা; অপরটি আধুনিক ও অনানুষ্ঠানিক। পাঁচমুড়ার রীতি কুশলী। আর সোনামুখী, হামীরপুর, রাজগ্রামের ধারা আদিম। তাই এই সব অঞ্চলের পোড়ামাটির হাতীঘোড়া দেখতে ঠিক বাস্তবের হাতীঘোড়ার মতো নয়। 'এগুলির 'সলিড' বৃত্তাকার (Round) রূপের মধ্যে আদিমতার ভাব বেশি।' এককালে যে অতিকায় হাতীঘোড়া তৈরি হত নানা ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক চেতনার ফলে, তাতেও স্ফুটিত আদিমতার ভাব। তাতেও স্ফুটিত Abstraction.

ছড়ার বাক্যগঠন, পর্ব সজ্জা ও বিন্যাস এবং অন্যান্য বাগ্‌ভঙ্গিতেও এই Abstraction-এর রীতি ক্রিয়াশীল। আলপনায় যেমন একটানে, সংক্ষিপ্ত আকারে অনেকখানি দৃশ্যের সারসত্তা প্রতিফলিত হয়, ছড়ার ভাষাতেও তাই। তাই এখানে দৃশ্যগুলিকে কাটা-কাটা, সংযোগশূন্য বলে মনে হয়। আসলে এখানে বর্ণিতব্য বিষয়কে পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে, যথার্থ ও যথাযথ ভঙ্গিতে রূপায়িত করবার কোনো প্রয়াসই নেই, সেটাই লোকমনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব। এই জন্যেই ছড়ায় সংক্ষিপ্তাকারে অনেক কথা বলা হয়। এক-একটি পর্ব এক একটি পঙ্‌ক্তি হয়ে বিষয়কে তুলে ধরে এবং সহসা পর্বগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগসূত্র খুঁজে মেলে না। যেমন বাঁকুড়ার হাতীঘোড়া দেখতে ঠিক বাস্তবের মতো নয়, কিংবা ব্রতচিত্রের ধানের মরাই, তেমনি ছড়ার ভাষাও ঠিক বাস্তবের অনুগ এবং বিস্তৃত ও যথাযথ নয়। ছড়ার অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে এই নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে না দেখলে আমরাই ভুল করব। তার ভাবাভঙ্গিও লোকমনস্তত্ত্বের সঠিক প্রকাশের পটভূমিকায় বিচার্য। যাই হোক, পূর্বপ্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই।

আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে ছড়ার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'ছড়া সাধারণতঃ আকারে সংক্ষিপ্ত পাওয়া গেলেও পরবর্তী কালে কোন কোন স্থলে এই সংক্ষিপ্ততা বজায় থাকে নাই' (পৃ. ১৫০)। অর্থাৎ

তিনি বলতে চান, প্রাথমিক স্তরের ছড়া আকারে হ্রস্ব, পরবর্তী স্তরে তা দীর্ঘায়ত হয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। ছড়ার হ্রস্ব-দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয় তার প্রয়োজন, ভূমিকা এবং অন্যান্য বাহ্য ও আন্তর দিক দ্বারা। কালের প্রভাব এখানে না থাকাই স্বাভাবিক, তা অন্বেষণ করাও বৃথা। একেবারে হ্রস্বায়তন ছড়া এযুগেও রচিত হচ্ছে দেখেছি, এবং তা খাঁটি লোকমানস সঞ্জাতই। ছড়ার আয়তনের কথা যদি তুলতেই হয়, তবে বলতে হয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনে রচিত ছড়ার আকৃতি আনুষ্ঠানিক ও লৌকিক ছড়ার তুলনায় কিঞ্চিৎ বড়ো—কিন্তু এক নিশ্বাসে এও বলি, এর ব্যতিক্রমও হয়-হামেশা চোখে পড়ে। সিদ্দিকী সাহেব হয়তো ভেবেছেন, দীর্ঘ ছড়া কণ্ঠস্থ করতে প্রাথমিক যুগের মানুষদের কষ্ট হত, কিংবা তা রচনা করবারই সামর্থ্য তাদের ছিল না; কিন্তু ব্যালাড, রূপকথা ইত্যাদি যদি তারা কণ্ঠস্থ করতে ও সৃষ্টি করতে পারে, তবে দীর্ঘ ছড়াই বা নয় কেন?

ছড়া সম্পর্কে সিদ্দিকী সাহেবের অপর মন্তব্যটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেন, প্রথম যুগের ছড়ার ভাবপরিমণ্ডলটি ছিল এক অবাস্তব, অসম্ভব, কল্পনার রাজ্যের,—ক্রমেই তাতে এসেছে বাস্তবের ছোঁয়া, exacting বা যথাযথতা। আমাদের মতে, যে প্রয়োজনে ছড়ার 'কথান্তর' রচিত হয়, এ হল তারই একটি। মানুষের বাস্তব বোধ-বুদ্ধি এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এও এই সঙ্গে লক্ষ করবার বিষয়, অসম্ভব ও কাল্পনিক রাজ্যের বদলে যে বাস্তব নামধাম ছড়ায় প্রদত্ত হয় পরবর্তী কালে, সেই নাম-ধামও কি সবটাই বাস্তব? পরবর্তীকালীন নাম-ধামও কি অবাস্তব বলে এক এক সময় মনে হয় না? কিংবা প্রাথমিক স্তরের সব ছড়ার প্রতিবেশই কি অসম্ভব রাজ্যের? এই প্রশ্নের সমাধান অনেক দিন আগেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর করে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন: ছড়ার রাজ্য চিরদিনই অর্ধেক কল্পনার, অর্ধেক বাস্তবের।

'ছেলে ভোলানো ছড়া' (ভারতী: বৈশাখ, ১৩৩০। পৃ. ৪-১৫) নামে একটি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ছড়ার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী, মূলতঃ চিত্রের দিক থেকেই তিনি ছড়ার রস বিচার করেছেন, এবং সেই চিত্রের দিকটিকেই ছড়ার প্রধানতম লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ছড়া যে 'অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিতচিত্র আনিয়া উপস্থিত করে' তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম দিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে অবনীন্দ্রনাথ নতুন কোনো দিককে তুলে ধরতে পারেন নি,—যা রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, তিনি

তাকেই পরিস্ফুট করেছেন। তবে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের পরিভাষায় যেখানে ছড়ার এই লক্ষণটিকে ব্যক্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনি একটি গ্রামের ল্যাণ্ডস্কেপের মধ্যে ছড়াগুলিকে ধরতে চেয়েছেন যেন। ছড়ার কেবল বর্ণ-চিত্রই নয়, ধ্বনি-চিত্রকেও অনুধাবন করতে চেয়েছেন, যার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। এক ছড়ার মধ্যে বিভিন্ন ছড়ার সংমিশ্রণটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি,—এজন্যে তিনি ভাবসঙ্গতি অনুযায়ী ছড়াকে নতুন করে ঢেলে সাজবার কথা যেমন একদিকে বলেছেন, তেমনি যেমন-তেমন ভাবে ছড়িয়ে থাকা পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যেও একটি সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছেন।

এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বিশেষত্ব। "ছড়াগুলো এমন জিনিস যে তাদের যে ভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে মাঝে নেড়ে-চেড়ে দেখা নানা রকম আলোতে ধরে।" অবনীন্দ্রনাথ যেন ছড়ার মধ্যে ক্যালিডো-স্কোপকে দেখতে পেয়েছেন। ক্যালিডোস্কোপে যেমন একটি চোঙের মধ্যে কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যদৃচ্ছা ঘোরালেই একটি নয়নমোহন figure পাওয়া যাবেই, ছড়াতেও তেমনি। কিন্তু ছড়ার আপাত-অসঙ্গত পঙ্‌ক্তির সৌন্দর্য এবং ক্যালিডোস্কোপের figure-এর মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। অসঙ্গত ও অসংলগ্ন পঙ্‌ক্তিগুলিও যে একটি রস বা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, তার পেছনে একটি সৃষ্টির পূর্ণতা আছে। যদি রচয়িতার সৃষ্টির পূর্ণতা না থাকত, তবে কখনোই একটি ছড়ার আপাত-অসংলগ্ন পঙ্‌ক্তিগুলো রস বা সৌন্দর্যের প্রকাশক হত না। 'সৃষ্টির পূর্ণতা' বলতে কি বোঝাচ্ছি তা বলি: আমরা অনেকেই মনে করি, ছড়ায় যেহেতু পারম্পর্য নেই বা সহজে তা অনুধাবন করা যায় না, অতএব ছড়া পূর্ণ সৃষ্টি নয়, তা আংশিক বা অন্যমনস্ক বা অযত্নকৃত সৃষ্টি। কিন্তু মূল কথা ঠিক তার উল্টো। ছড়া পূর্ণ সৃষ্টিই, তবে তার ফাঁক বা শূন্যস্থানগুলো আমরা ভরাট করে নিতে পারি নি এখনও, কিংবা ছড়ার ভাষা-সৃষ্টির বিশেষত্ব আয়ত্ত করতে পারি নি এখনও,—সেইজন্য তাকে পূর্ণ সৃষ্টি বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করি। ছড়া যদি পূর্ণ সৃষ্টিই না হবে, তবে তথাকথিত অসংলগ্ন ও অসঙ্গত পঙ্‌ক্তির সমষ্টি মনের মধ্যে রসের সঞ্চার করে কেন? অসম্পূর্ণ বা আংশিক সৃষ্টি যা, কখনোই তা বলতে বা শুনতে কারো ইচ্ছেই হত না। অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্যের ইঙ্গিত ধরে এইভাবে আমরা ছড়ার শিল্পকাল সম্বন্ধে একটি সত্যে এসে উপনীত হই।

…ভ্রু…

ছড়া রচনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মশাইয়ের আর একটি মন্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বে উল্লিখিত 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধটিরই একস্থানে তিনি বলেছেন : 'ছড়ার প্রথম ছত্র রচনা হলেই যেন রচয়িতার দায়িত্ব শেষ, তারপর বাকিটা যেন আপনি গড়ে ওঠে।' এর পর তিনি উদাহরণ হিসেবে 'এক যে ছিল শেয়াল' এবং 'এক যে রাখাল গরু চরায় গামছা মাথায় দিয়ে' এই ছড়া দুটির রচনা-প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মিলের টানে-টানেই ছড়ার এক-একটি পঙ্‌ক্তি বেড়ে ওঠে এবং এক সময়ে শেষ হয়। যেমন, 'শেয়াল'-এর সঙ্গে মিলের জন্যেই কেবল (এবং অকারণেই) 'দেয়াল' শব্দ এল পরের পঙ্‌ক্তিতে। তেমনি 'ঝিঙে'র সঙ্গে মিল রক্ষা করবার জন্যেই দ্বিতীয় ছড়াটিতে 'শিঙে' শব্দ এসেছে। এইসব ছড়ার মধ্যে তিনি 'উজ্জ্বল ধ্বনিচিত্র' প্রত্যক্ষ করেছেন।

যদি মিলের টানে-টানেই এবং অনর্থক একটি পঙ্‌ক্তির পর আর একটি পঙ্‌ক্তি এসে যায়, তবে লজিকের দিক থেকে অপর একটি সত্যকেও স্বীকার করতে হবে : পর পর পঙ্‌ক্তিগুলি তবে নেহাতই পারম্পর্যবিহীন নয়,—অন্ততঃ মিলের একটা বন্ধন তো আছে। এবং অতএব পঙ্‌ক্তিগুলি ভাব ও অর্থের দিক থেকে যতোই পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হোক না কেন, একটার সঙ্গে একটার একটি বাঁধনকে তো অস্বীকার করা যায় না! তবে তো পঙ্‌ক্তিগুলি অসংলগ্নও নয়! এইভাবে চিন্তা করে এবার আমরা এটির মধ্যে ভিন্নতর একটি দিককে খুঁজে পাবো। একাধিকবার আগেও বলেছি, আবার বলি, ছড়ার পঙ্‌ক্তির মধ্যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। কি কি ভাবে সংলগ্নতা এসে পড়ে, পরে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, অর্থ ও ভাবগত প্রত্যক্ষ সংলগ্নতা অপেক্ষা রচনাভঙ্গিগত বা রচনাপ্রক্রিয়াগত সংলগ্নতাই ছড়ার মধ্যে বেশি প্রাধান্য পায়। কিন্তু তার মানে আবার এই নয়, যে ছড়ায় ভাব ও অর্থগত সঙ্গতি নেই!

অন্ত্যমিলের অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে কেন ছড়ার কায়া নির্মিত হয়? নিশ্চয়ই 'মিল'কে লোকমানস এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। এই মিল একটি objective রূপনির্মিতির দিককে নির্দেশ করে। এই রূপনির্মিতিই

ছড়ার ষ্টাইল,—তা গ্রাফিক আর্টের মতো, তা সিমেট্রিকাল, তা জ্যামিতিক নকশার মতো। তার একটি ব্যাপক দিক আছে, কেবল ছড়া নয়, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তা লক্ষ করি।

লোকসাহিত্যে বা তজ্জাতীয় সাহিত্যে যে অন্ত্যমিলগুলি প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তা মোটামুটি পূর্বনির্ধারিতই থাকে। প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষে একটি শব্দ এলে অবধারিত নিয়মে ওই শব্দটির সঙ্গে মিল দেবার জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হবেই—প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে থাকুক চাই না থাকুক। এইভাবে লোকমানসে মিলের একটি ঐতিহ্য সৃষ্ট হয়ে গেছে। যেমন, 'টিয়া' বা 'টিয়ে' শব্দ প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষে থাকলে অবধারিত নিয়মে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির শেষে থাকবে 'বিয়া' বা 'বিয়ে'। 'লোকসাহিত্যের ভাষা' (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০। পৃ. ৭২-৭৭) নামে একটি প্রবন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মশাই এই বিশেষ মিলটির (টিয়ে/বিয়ে) প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: 'মেয়েলি ছেলেভুলোনো ছড়ায় মিলের গাঁথনি অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব্দ ধরে হয়। এই শব্দটি অর্থবহ বস্তু শিশুর খুব পরিচিত হওয়া চাই।'

আমরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। প্রথমতঃ, কেবল ছেলে ভুলোনো ছড়াতেই নয়, লোকসাহিত্যের যে কোন শাখাতেই এই ঐতিহ্যময় পূর্ব-নির্ধারিত মিল-বন্ধন প্রবলরূপে ক্রিয়াশীল হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু বয়স্কদের লোকসাহিত্যেও এটি বিদ্যমান, সেই হেতু শব্দ দুটির মিলের ব্যাপারে 'শিশুর খুব পরিচিত হওয়া' শর্তটি অর্থহীন। আসলে এর মূল লুকোনো রয়েছে অন্যত্র, সেটিকেই খুঁজে দেখতে হবে।

আমরা মনে করি, কতকগুলি মিল প্রতীকতার এবং সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাসের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, তাই একটি এলেই আর একটি আসে। টিয়ে সাধারণভাবে পাখি, কিন্তু লোকসাহিত্যে নারী ও বিবাহের প্রতীক, কোথাও বা যৌনজীবনের ইঙ্গিত-বাহী। এই জন্যেই 'টিয়ে' থাকলে 'বিয়ে' থাকেই কেননা, শুক মদনদেবের বাহন। আমরা বাঙলা ছড়াতে এই ঐতিহ্যমূলক মিলগুলি দেখেছি: ইঁদুর-সিঁদুর। ঝি-ঘি। মৌ-বৌ। সাপ-বাপ। চুল-ফুল। আগুন-বেগুন। কূল-ফুল। শাড়ী-বাড়ী। এই সব মিলের পেছনে আছে এই সামাজিক দিকগুলি: অঘ্রানে ইঁদুর সাতটা বিয়ে করে, পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবাদ; পূর্ববঙ্গের বিশ্বাস: কনের বাপকে বিয়েতে

ঘি কিনতে নেই, 'ঝিয়ে-ঘিয়ে' দিতে নেই, নতুন বউ এলে, তার কানে মধু দিতে হয়, যেন শ্বশুরবাড়ীর সবকথা মধুর মতো লাগে ; সাপ দেখলেই লোকে 'বাপ' বলে চীৎকার করে, ইত্যাদি। তেমনি ফুল বলতে প্রায়শঃই 'চাম্পা' বা 'চম্পা' ফুল। শাড়ী বা গামছা বলতে যেমনি লাল রঙ। অনুমান করি, প্রতীকতার বন্ধন, পারিপার্শ্বিকতার বন্ধন, ইত্যাদি তো আছেই, উপরন্তু আছে ভাষাগত বন্ধন। সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ লোকসাহিত্যের ভাষাগত দিকের একটি প্রধান উপকরণ। শব্দগুলি জোড়া-বাঁধা থাকে, একটি এলেই নানাভাবে তার আর একটি আসবেই। এইভাবে তৈরী হয় একটি নিয়ম-মাফিক মিল, যা একটি নকশা বা প্যাটার্নকে নির্দেশ করে। যে প্রবণতার বশে সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দকে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করে নেওয়া হয়েছে লোকমানসে, সেই একই প্রবণতার ফলে কতকগুলি ঐতিহ্যমূলক মিলের শব্দকেও জোড়া-বেঁধে নেওয়া হয়েছে। হয় প্রতীক বা ওই জাতীয় কোনো বন্ধনে, নয় ভাষাগত বন্ধনে এগুলি বাঁধা। তাই একটি ব্যবহৃত হলেই আর একটিও হয়।

কিন্তু সেই বন্ধনকে অবলম্বন করে যে শব্দ চয়ন বা মিল বিন্যাস করা হয়, তা নিছক খেয়াল-খুশিতে ভরা নয়। শব্দে-শব্দে মিল রচনা করতে-করতে ছড়ার কায়া বাড়তে থাকে, কিন্তু সে বৃদ্ধিকরণ নিতান্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, শেষের একটি লক্ষ্য আছে। সব ছড়ারই শেষটুকু বিশেষত্বপূর্ণ। সমাপ্তির সুসম্পূর্ণতা, কোনো বিশেষ চরিত্রের, দৃশ্যের, ঘটনার, পরিস্থিতির পরিপূর্ণতা, কোনো ধ্বন্যাত্মক শব্দের বা শব্দদ্বৈতের বিশিষ্ট প্রয়োগ, অনুরোধ-অনুজ্ঞা-প্রতিজ্ঞাসূচক কোনো মনোভাব,—প্রভৃতি যতক্ষণ না এসে পৌঁছয় অথবা, তাকেই লক্ষ্য করে ছড়া বাড়তে বা এগোতে থাকে। ছড়ার কায়া-নির্মাণে এই শেষাংশের একটি অসামান্য ভূমিকা আছে। যাঁরা ছড়ার মধ্যে কেবল নিরর্থক ও নিরুদ্দেশ বৃদ্ধি লক্ষ করেন, তাঁদের উদ্দেশে অবশ্য এইটুকু বলা যায় · একটি বিশেষ ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রেখে তারই রূপায়ণের জন্যে ছড়ার বৃদ্ধি হয়তো সর্বত্র হয় না ঠিকই, কিন্তু একটি অযত্নকৃত ও অনায়াসলব্ধ ভঙ্গিতে ছড়া এমনভাবে বাড়ে যে একটি রসময় পরিণতি তার থাকেই, সেই পরিণতি না এসে পড়া পর্যন্ত ছড়া বাড়তে থাকে, সুতরাং ছড়ার বৃদ্ধি সচেতনতা-সঞ্জাত না হলেও নিতান্ত লক্ষ বা উদ্দেশ্যবিহীন নয় এবং সেই কারণেই ছড়াকে অসম্পূর্ণ সৃষ্টিও বলা যায় না।

ছড়ার রূপনির্বাণে মিলের এই বিশেষ প্রভাব কেবল পঙ্‌ক্তির শেষেই কার্যকরী হয় না, পঙ্‌ক্তির মধ্যে বা প্রথমেও তা দেখা যায়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ (কখনও বা শেষ শব্দ নয়, পঙ্‌ক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোনো স্থানের শব্দ) পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দে পরিণত হয়, কখনও বা একেবারে প্রথম শব্দ না হলেও পরবর্তী পঙ্‌ক্তির যে কোনো স্থানের শব্দ হয় ; ফলে শব্দগত পারম্পর্য, মিল ও সঙ্গতি দেখা যায়, এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অপর পঙ্‌ক্তির এইভাবে মিলের মাধ্যমে আসে রূপগত মেল-বন্ধন। অর্থাৎ ডঃ সেন যাকে অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রেই দেখেছেন মাত্র, আমরা তাকে প্রথম মিল বা পঙ্‌ক্তির অন্তরেও দেখেছি।

এই মিলের বন্ধন অন্যান্য ধরণের ছড়াতেও দেখা যায়। যেমন, 'ঘুঘুসই' বা 'কি কথা ব্যাঙের মাথা' অথবা জব্দ করবার ছড়াতে। মিলের খেলা নানা ধরণের ছড়াতেই দেখা যায়।

অন্ত্যমিল এবং অন্যান্য ধরণের বিচিত্র মিলকে অবলম্বন করে যে সব ছড়া ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, অবশ্যই তা উদ্দেশ্যবিহীন অকারণ পরিণতি লাভ করে না। প্রতি ছড়াবই একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ ছড়াটি বাড়তে থাকে। ছড়া পড়লেই বোঝা যায়, শেষের পর সত্যি আর কিছু নেই। যে ক্ষেত্রে মনে হয়, শেষ হবার পরও পঙ্‌ক্তি আরো বুঝি আছে, সে ক্ষেত্রে অবধারিত নিয়মে জানতে হবে, অন্য একটি ছড়া এসে তাতে মিশে গেছে। বাড়তে বাড়তে একটি বিশেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত ছড়া শেষ হয় না। একটি ভাব, দৃশ্য, ঘটনা, নাটকীয় পরিস্থিতি ও নাটকীয়তা, উপযুক্ত শব্দ-শৃঙ্খলা, চমৎকার ধ্বনি বা চিত্র যতক্ষণ না এগিয়ে আসছে, ততক্ষণ কিছুতেই একটা ছড়া শেষ হবে না, শেষ হবার পূর্বে উনশেষ পঙ্‌ক্তিতেই তার অগ্রিম ইঙ্গিত থাকবে, এবং শেষ হবার পব মনে হবে, আর কিছু বলবার বা শোনবার নেই, সব কিছু নিঃশেষে বলা হয়ে গেছে। বলা চলে, এই ভঙ্গিটাই ছড়ার Climax, এটার জন্যেই যেন এতক্ষণের প্রস্তুতি চলছিল। সুতরাং বিচিত্র ধরণের মিলকে অবলম্বন কবে যে সব ক্ষেত্রে ছড়ার কায়া নির্মিত হয়ে থাকে, সে সব ক্ষেত্রে একদিকে থাকে প্রতি পঙ্‌ক্তির পরস্পরের সঙ্গে কঠোর-কঠিন অর্থ ও রূপগত বাঁধুনি ; অপর দিকে থাকে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যময় পরিণতি প্রাপ্তি। পরিণতির বিশিষ্টতাও ছড়াকে সঙ্গতি ও সংলগ্নতার বন্ধনে বেঁধে রাখে, যদিও এর ব্যতিক্রমও দেখেছি।

...৭...

শুধু অন্ত্যমিল এবং অন্যান্য মধ্য মিলকে অবলম্বন করেই ছড়ার কায়া নির্মিত হয় না ; ছড়ার কায়া-বৈচিত্র্য আরো নানাভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এইবার তার উল্লেখ করি।

অন্ত্যমিল ও অন্যান্য মিলের পরই যে দিকটি ছড়ার কায়া নির্মাণে গুরুত্ব পায়, তা হল—প্রশ্নোত্তর-মূলকতা। বহু ছড়াই সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক, যেন দু'জনে নিভৃতে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে catechism-ই প্রধান লক্ষ্য যেন। catechism আধুনিক অভিজাত সমাজে এক শিক্ষাপ্রদ খেলাতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মূল লোকজীবনের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। ছড়ার প্রশ্নোত্তরমূলকতাকে রূপের দিক থেকে দু ভাগে ভাগ করতে পারি : এক, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, ছোটো-ছোটো, কাটা-কাটা, দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, দুই, কোনো ছড়ার এক স্থানে সকৃৎ প্রশ্নোত্তর-প্রবণতা, বাক্যের দিক থেকে যা প্রথমোক্ত শ্রেণীর চেয়ে দীর্ঘ, এবং যা পরোক্ষ। এ ছাড়া, আর এক ধরণের ছড়া আছে, প্রতিপক্ষকে জব্দ করাই যার উদ্দেশ্য। এখানে একজন অপরজনকে কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ উচ্চারণ করতে বলে : অপরজন তা উচ্চারণ করা মাত্রই প্রথমজন তার সঙ্গে মিল রক্ষা করে এমন একটি বাক্য রচনা করে, যা ওই দ্বিতীয় জনকে জব্দ করে ফেলে। এইসব ছড়ার ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল এবং প্রশ্নোত্তরমূলকতা অভিন্ন হয়ে গেছে। আবার, সমবেতভাবেও প্রশ্নোত্তরমূলকতা দেখা যায়। যেমন, কোনো ভারী পদার্থ টানবার বেলায় যখন সমবেতভাবে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তখন একজন যে শব্দ, বাক্যাংশ বা নিরর্থক ধ্বনি উচ্চারণ করে, বাকীরা তাতে সাড়া দেয়। এও যেন এক জনের প্রশ্ন করা, বাকী সকলের তাতে উত্তর দেওয়া। তেমনি সমবেত খেলার ছড়াতেও। অনেক খেলার ছড়াতে দেখা যায়, দুই পক্ষে সংলাপ চলেছে। আভিচারিক ও আনুষ্ঠানিক ছড়াতেও এই সংলাপ প্রবণতা কখনো-কখনো দেখা যায়। এই রীতির সঙ্গে 'Cumulative tales' বা 'chains' (Types : 2000 to 2199)-এর উপবিভাগ Alternate Response (যেমন : Type : 2014) তুলনীয়।

সংলাপ ও প্রশ্নোত্তরমূলকতার পেছনে একটি মৌখিকতা ও সহজ ঘরোয়া দিক আছে। মনে হয়, এই ধরণের ছড়া বেশ প্রাচীন। যে ছড়া একা-একা

বলা হয় তার মধ্যে একটুখানি ব্যক্তি-প্রাধান্য থাকেই, কিন্তু দু'জনে মিলে বা সমবেতভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কথিত ছড়ার একটি সামষ্টিক দিক আছে, যা ঠিক আধুনিক ব্যাপার নয়। লোক-সাহিত্যের রচনাভঙ্গিতে Antithesis একটি বড়ো দিক। Antithesis-এর মূল কথা—দুই সমান ওজনের বক্তব্যের তৌলন। সেই তৌলনেব এক দিক যেন প্রশ্ন, অপর দিক তার উত্তর। এই প্রশ্নোত্তরমূলক বাগ্‌ভঙ্গি আনে একটি Symmetryকে,—যা রচনা করা লোকমানসের একটি বৈশিষ্ট্য।

শুধু ছড়াতেই নয়, সাধারণভাবে লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যেও এই সংলাপ-প্রবণতাকে দেখা যায়। গানে, কথায়, কথকতায় এবং ব্যালাডে তা দেখা যায়। 'তারপর কি হল ?,' 'তখন সে কি করল ?,' 'অমুকে কোন্ কাম করে',—এই ধরণের প্রশ্ন বক্তা বা গায়ক নিজেই উত্থাপন করে নিজেই তাব উত্তব দিয়ে থাকেন। ধাঁধা মাত্রই এক জনের প্রশ্ন, অপরের তাতে উত্তব দেওয়া। প্রশ্নোত্তর-প্রবণতা লোকসাহিত্যের এক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য।

এই প্রশ্নোত্তর-প্রবণতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো নানা দিক, তাও বিভিন্ন ধরণের ছড়ার দেহ গঠন করেছে। যেমন, নাট্যমূলক ছড়ার মধ্যে লোকনাট্যের দিক। নাটকের সঙ্গে থাকে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের প্রসঙ্গ, অতএব কহিনীমূলক ছড়ার সঙ্গেও এর যোগ দেখা যায়। ক্রমপুঞ্জিত (cumulative) লোককথার সার-নির্যাস যে ছড়াটি, তাতেও থাকে এই প্রশ্নোত্তর। শর্তমূলক (conditional) ছডা বাঙলাতে খুব বেশি পাই নি,—তবু এর মধ্যেও প্রশ্নোত্তরই প্রধান। এবার এই সব বিষয়ে দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, বক্তব্যকে স্পষ্ট করবার জন্যে।

প্রথমেই শর্তমূলক ছড়ার দুটি উদাহরণ দিই। দু'টি দু'রকমের। প্রথমটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে সংগৃহীত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত আমার 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' বইতে ছড়াটি সঙ্কলিত হয়েছে (পৃ. ১৮১-১৮২), কাজেই এখানে তার অংশ বিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করছি :

ধুপ্ করিয়া পইলো তুই, বাপের বাড়ীত্ যাছোঁ মুই।
বাপোর বাড়ী যাবো তুই, পিঠি করিয়া আনিম্ মুই।

পিঠি করিয়া আনিবো তুই, পিঠি ভরিয়া…মুই।
পিঠি ভরিয়া ‥তুই, যমুনা নদীত্ ধুমো মুই॥
যমুনা নদীত ধুবো তুই, পয়া মাছ হইম্ মুই।
পয়া মাছ হবো তুই, থেঁকেরিমারা দিম্ মুই॥
থেঁকেরিমারা দিবো তুই, কাঁকড়া খালোত্ সোন্ধাম মুই।
কাঁকড়া খালোত্ সোন্ধাবো তুই, কাঁকোড়ভুকা দিম্ মুই॥

ছড়াটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শর্তমূলক, একজন যদি এক কাজ করে, অপর জন তবে আর একটি কাজ করবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই আবার প্রশ্নোত্তরমূলক : শর্তগুলো এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ব্যক্ত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ, এর শৃঙ্খলামূলকতা : পূর্ব পঙ্‌ক্তির শব্দ ও বাক্যাংশই পরের পঙ্‌ক্তিতে অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়েছে, ফলে একটি দৃঢ় বন্ধন ও সংহতিকে লক্ষ করা যায়।

এই ধরণের আর একটি ছড়া (এগুলো গীতও হয়) পাই খোদেজা খাতুন লিখিত 'বগুড়ার লোকসাহিত্য' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। পৌষ, ১৩৭৭) বইতে (পৃ. ৪৯)। ছড়াটির কিয়দংশ এই :

কাব বুদ্ধে মারলু তুই ফুল সোলার বাড়ি তুই
বাপের বুদ্ধে মারলু না মায়ের বুদ্ধে মারলু
কাব বুদ্ধে মারলু তুই মোটা সোলার বাড়ি মোক
আবার যদি মাবিস তুই যামো বাপেব বাড়ি মুই
‥ বাপেব বাড়ি যাবু তুই কান্দেত্ করি আনমো মুই। ‥

এইভাবে প্রশ্নোত্তবেব মাধ্যমে এবং একজনেব প্রশ্নের বাক্যকেই উত্তরদাতার উত্তবের মধ্যে গ্রহণ করে ছড়াটি এগিয়ে গেছে। এই সব ছড়াব মধ্যে যেটি লক্ষ করবার তা হল, প্রশ্নোত্তরেব মাধ্যমে একটি শৃঙ্খলা আনায়ন, যে শৃঙ্খলাবোধ ছড়ার দেহ নির্মাণে একটি সংহতিকে তুলে ধরে।[১]

ক্রমপুঞ্জিত (cumulative) ছড়ার মধ্যেও এই বোধটি কার্যকরী হয়। বাঙলা ও ওড়িশায় 'কথা' বলবার পর যে ছড়াটি বলবার রেওয়াজ আছে, সেটি মূলতঃ একটি ক্রমপুঞ্জিত ছড়া। মূল গল্পটি আজ হারিয়ে গেছে, কিন্তু ছড়াটি টিকে আছে।

১ এই ধরণের শর্তমূলক আর একটি ছড়া হল আলমগীর জলীল সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' চৈত্র, ১৩৭০) বইয়ের ৪৩-সংখ্যক (পৃ. ১৬) ছড়া।

আমার কথাটি ফুরোল/ নটে গাছটি মুড়োল/কেন রে নটে মুড়ুলি ?/গরুতে কেন খায় ?/কেন রে গরু খাস ?/রাখাল কেন চরায় না ?/কেন রে রাখাল চরাস না ?/বউ কেন ভাত দেয় না ?/কেন রে বউ ভাত দিস নে ?/কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?/কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস না ?/জল কেন হয় না ?/ কেন রে জল হোস না ?/ ব্যাঙ কেন ডাকে না ?/ কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না ?/ সাপে কেন খায় ?/ কেন রে সাপ খাস ?/ খাবার ধন খাব, গুড়গুড়োতে যাব।

শর্তমূলক ছড়ার শৃঙ্খলার মতো এখানেও প্রশ্নোত্তর আছে এবং পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির বাক্য বা শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়েছে। এই সব ছড়ার মধ্যে কাহিনীরও একটি ক্ষীণ আভাস আছে। কাহিনী আর সংলাপ মিলে লোকনাট্যের সম্ভাবনাকে সূচিত করেছে। খেলার ছড়াগুলিতে আবার এর সঙ্গে মিলেছে অভিনয়, তাতে লোকনাট্যের দিকটি উজ্জ্বলতর হয়েছে।

ভাদু ও টুসুর গানরূপে চলিত রচনাগুলি আসলে ছড়াই। ছড়া বলেই সে প্রসঙ্গকেও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। টুসুতে বিসর্জনের পূর্ব রাত্রে সারারাত ধরে যে ছড়ার প্রশ্নোত্তর চলে, তাকে বলে 'আলানী ছড়া' (অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে যা 'এলিয়ে' বা বিধ্বস্ত করে দেয়)। এই 'আলানী ছড়া'র প্রশ্নোত্তরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ছড়ার কাঠামোতে অনেক সময় মাত্র একবার প্রশ্নোত্তর দেখা যায়, আগে বলেছি। এই প্রশ্নোত্তরের অংশটি কোথায় স্থাপিত হবে, তার কোনো স্থিরতা থাকে না। কখনো থাকে মাঝখানে, আবার বহুশঃ তা ছড়ার অন্তিম পঙ্‌ক্তিও হয়ে থাকে। যে করেই দেখা যাক না, প্রশ্নোত্তরমূলকতা ছড়ার দেহ নির্মাণে এবং নানা ধরণের বিচিত্র ছড়ার গঠনে এক বড়ো ভূমিকা নেয়, কিছুতেই তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

যেমন, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে: সং ২ (ছড়ার প্রথমে প্রশ্ন, শেষে তার উত্তর), ১১ (গোটা ছড়াই প্রশ্নোত্তর)। 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সংস্করণ) থেকে: সং ১৩, ১৫, ৪৫,৪৬, ১৪৫, ১৯১, ১৯৩, ২০৫, ২১২, ৩৮৭, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০৩। ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) থেকে: সং ১৬৩, ২২৯, ২৪৮, ৩০৮, ৩১৯, ৩২৭ (এক পঙ্‌ক্তি প্রশ্ন, এক পঙ্‌ক্তি উত্তর), ৫১১, ৫৪৮, ৫৫৩, ৭৩৫। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'যশোর

খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন, ১৩৭১) থেকে : সং ১৫, ১৬, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৭ (একবার মাত্র), ৫১, ৯৭, ১০০, ২০৮, ২৩৭। আলমগীর জলীল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (চৈত্র, ১৩৭০) থেকে : সং ১০ (পৃ. ৪-৫), ১৪ (পৃ. ৬), ২১ (পৃ. ৮), ৫৫ (পৃ. ২০), ৫৮(পৃ. ২১), ৬৪(পৃ.২৩), ৪(পৃ.৫৮),৮(পৃ. ৫৯), ২৫(পৃ. ৬২), ৩০, ৩১ (পৃ. ৬৩-৬৪), ৫৫ (পৃ. ৭১), ১৬ (পৃ. ৭৫), ১৮ (পৃ. ৭৬), ২০ (পৃ. ৭৭)। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (বৈশাখ, ১৩৬৯) বই থেকে : সং ২ (পৃ. ২৫), ৭ (পৃ. ২৭, অংশতঃ), ৮, ৯ (পৃ. ২৭-২৮), ১৩ (পৃ. ৩০), ২ (পৃ. ৩৫, একবার), ১২ (পৃ. ৪৩), ২৮ (পৃ. ৪৬), ২৯ (পৃ. ৪৭), ৬৫ (পৃ. ৬১, শেষে), ৭০ (পৃ. ৬২, কেবলই প্রশ্ন, উত্তর নেই), ১০০ (পৃ. ৭৩, কেবল প্রথমাংশে), ১০৮ (পৃ. ৭৬, কেবল একবার, মাঝখানে), ২ (পৃ. ৮১), ৩ (পৃ. ৮২, কেবল প্রথমে), ২ (পৃ. ৮৪), ৬ (পৃ. ৮৭), ৩ (পৃ. ৯৩-৯৪, দুবার), ৭ (পৃ. ৯৭), ১২ (পৃ. ১০২-১০৩), ০ (পৃ. ১৩৯), ১১ (পৃ. ১৪০), ৩০ (পৃ. ১৪৭-১৪৮), ৫৫ (পৃ. ১৫৭), ৬৯ (পৃ. ১৬২), ৭২ (পৃ. ১৬৩-১৬৪), ৭৩ (পৃ. ১৬৪-১৬৫), ৯৭ (পৃ. ১৭৫)। বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য : ১২শ' (ফাল্গুন, ১৩৮২) থেকে : সং ৮ (পৃ. ৭), ১ (পৃ. ১১), ৫ (পৃ. ১৮, প্রথমে), ৬ (ঐ), ৮ (পৃ. ১৯), ১০ (পৃ. ২০), ১১ (ঐ, প্রথমে), ১ (পৃ. ২১-২১), ১ (পৃ. ২২-২৩), ১ (পৃ ২৩), ১ (পৃ. ২৩-২৪), ১ (পৃ. ২৪-২৫), ১ (পৃ. ২৫-২৬), 'হাইর জিতের ছড়া' (পৃ. ২৬-৫০) ১ (পৃ. ৫২), ১ (পৃ. ৫৬), ৩ (পৃ. ৫৭), ২ (পৃ ৬২), ৩ (ঐ), ৭ (পৃ.৬৫, শেষে), ২ (পৃ. ৭১), ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ (পৃ. ৭৩-৭৭), ১ (পৃ. ৭৭), ৩ (পৃ. ৮৫-৮৬), ১২ (পৃ. ৮৯), ১, ২, ৩ (পৃ. ৯০-৯১), ২, ৩ (পৃ. ৯২-৯৩), ১ (পৃ. ৯৩), ২ (পৃ. ৯৪, একবার), ৬ (পৃ. ৯৭), ২ (পৃ. ৯৯-১০০, একবার), ৫ (পৃ. ১০১), ১৪ (পৃ. ১০৩), ১১ (পৃ. ১০৬, একবার), ১৩ (ঐ), ৭ (পৃ. ১০৮), ২, ৩, ৪ (পৃ. ১১৩-১১৪), ৬ (পৃ. ১২২), ৮ (পৃ. ১২৩), ৯ (পৃ ১২৩-১২৪, শেষে), ১৪ (পৃ. ১২৬), ৩ (পৃ. ১২৮), ১৯ (পৃ ১৩৯), ১ (পৃ. ১৪২-১৪৩), ২ (পৃ. ১৪৩-১৪৪) ৩ (পৃ. ১৪৬), ১, ২ (পৃ. ১৫০-১৫১)। আমাদের বর্তমান সঙ্কলন থেকে : সং ১,২,৪,৫,৬,২১ (ঝ-অংশ), ৩৫, ৩৬, ৫৩, ৫৬, ৬৫ (জোলা-জুলনীর সংলাপ), ৬৬ (সংলাপ), ৭০ (খ, গ ও ঘ-অংশ), ৭৩ (ক-অংশ), ৭৫ (ঙ-অংশ), ৮২ (ক-অংশ), ৯০ (ক-অংশ এবং ব্যাপকার্থে গোটা ছড়াই, প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথমাংশ প্রশ্ন, 'হেঁচ্চ' তার উত্তর), ১১০, ১১১, ১৪৬-১৪৮,

১৫০, ১৬৬, ১৬৯, ১৭৪, ১৮৩, ২০৪ (একবার, মাঝখানে), ২১৩ (প্রথমে), ২২৫ (কেবল প্রশ্ন), ২২৬ (ঐ), ২৩৭ (প্রথমে), ২৪১, ২৬৬-২৭৭, ২৭৯-২৮৪, ২৮৭, ২৯৪, ২৯৭, ৩০১ (কেবল প্রশ্ন), ৩০৫ (শেষে), ৩১১ (প্রথমে), ৩১৫, ৩১৬, ৩২৭ (সংলাপ), ৩৩১ (শেষে), ৩৩২, ৩৩৬ (কেবল উত্তর), ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৫, ৪০০ (কেবল প্রশ্ন)।

প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে জড়িত, ছড়ার দেহ-নির্মাণের আর একটি উপাদান হল আহ্বান ও সম্বোধন-মূলকতা। বহু ছড়াতেই তা দেখা যায়। যেন একজন অপর একজনকে সম্বোধন করে একটি বক্তব্য পেশ করেছে। সম্বোধন ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক—দুইই হতে পারে। যখন কাউকে বিশেষ নাম ধরে ডেকে, স্পষ্ট-ভাবে তাকেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ করে ছড়াটি বলছে, তখন তা ব্যক্তিক। একটি নাম-সহ ব্যক্তি-চরিত্রকে এখানে পাই। ছড়ার প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেষে, যেখানেই হোক, এই সম্বোধন থাকতে পারে। সম্বোধনে কখনো-কখনো দ্বিরুক্তিও দেখা যায়। যাকে ডেকে বলা হচ্ছে, তার নাম পর-পর দুবার উল্লেখের মধ্যে একটি আবেগের তীব্রতা এবং বক্তব্য প্রকাশের তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে। আর যেখানে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নেপথ্যে উপস্থিত, অথচ যেন তাকেই সম্বোধন করে ছড়াটি রচিত, সেখানে সম্বোধন পরোক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক। সম্বোধিত ব্যক্তির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বক্তাকে আত্মীয়সম্বন্ধ পাতাতে দেখা যায়, এবং তাই বলেই সম্বোধন করা হয়। সেখানে মানুষ ও ইতর প্রাণীতে কোনো ভেদ নেই। সম্বোধনের ফলে যে সব ব্যক্তি-নাম ও সম্বোধনবাচক শব্দ মেলে, তাকে ছড়ার এক ধরণের motif বলেছি।

বলেছি, সম্বোধন একটি ছড়ার যে কোনো স্থানে থাকতে পারে। কিন্তু গুরুত্ব সর্বত্র সমান নয়। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রারম্ভেই সম্বোধন থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় অনুরোধ বা অনুজ্ঞা, অনুজ্ঞাই বেশি। বিভিন্ন ধরণের সম্বোধনের কিছু নির্বাচিত উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল।

সম্বোধন এবং দূরের ব্যক্তি ও বস্তুকে নিকটে আহ্বান করবার দৃষ্টান্ত: রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে: সং ৪ (ধন), ৫ (ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি), ৬, ৭ (ঐ), ৯, ১০ (পানকৌড়ি), ১১ (ঘুঘুমেতি সই), ১২ (ধন), ১৩ (পুঁটুমণি), ১৫ (নন্দকিশোর), ১৬ (চাঁদ), ১৭ (বড়ো বউ, ছোটো বউ), ১৮ (দেবতা), ২০ (কাঁদুনে), ২১ (শত্তুর), ২৪ (কাঠবেড়ালি), ২৭-২৯ (খোকা), ৩০ (ধন), ৩২ (কলমিলতা), ৩৬ (চাঁদের কোণা), ৪৫

(সোনা), ৬৪ (ইচাকমলের মা), ৬৬ (টিয়ে), ৬৭ (লটকুনা), ৬৮ (ষষ্ঠী বাছা), ৭৬ (ঘুম), ৭৮ (বাবা)। 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) থেকে : সং ১ (চাঁদমণি, মা), ৭ (গোপাল), ৯ (যাদু), ১৯ (বকমামা), ২০ (পটল), ২১ (সোনামণি, সোনা), ২৭ (ফিং ফিং এটি), ৩২ (খাঁদা), ৩৭ (পুষু), ৩৮ (ঝিঁঝি), ৪২ (গোপাল, বাপের ঠাকুর, সোনার যাদু), ৫৫ (বৃষ্টি), ৬৩ (নটেশাক), ৬৬ (খোকার মা), ৭২ (কাল সোনা), ৭৩ (মনা), ৭৬ (গেরস্ত ভাই), ৮১ (ছেলের পাল), ৯২ (ময়না), ৯৩ (গড় গড়ের মা), ১০১ (হনু), ১০৪ (মেনি), ১০৬ (কাঠ বেড়ালী), ১১৯ (জামাই), ১২৪ (নীলমণি), ১৩২ (বড দিদি, ছোট দিদি), ১৫৫ (চাঁদা) ১৫৭ (পাখী) ১৫৯ (কল্মিলতা), ১৬৬ (হনুমান), ১৮৪ (চাঁদের কোণা), ১৯৩ (ঘু ঘুঘু), ১৯৬ (ভাই), ১৯৮ (দাদা), ২০৩ (বৃষ্টি), ২১১ (গোবিন্দর মা), ২১৩ (টিয়ে পাখি), ২১৮ (সুয্যি মামা), ২৪০ (গুরুমশাই), ২৪৪ (ফেউয়ার মা), ২৭৬ (বাবুই), ২৭৮ (বউ), ২৯৪ (মেঘরাজা), ৩০৩ (লক্ষ্মীছেলে), ৩১১ (ভোঁদড়), ৩১৩ (ভোঁদড, শিয়ালী), ৩১৬ (ইঁদুর বাবাজী), ৩২৪ (সুয্যিঠাকুর), ৩৩৯ (বাদুড়), ৩৪৮ (সোনার নাড়ু), ৩৫৮ (মেনি), ৩৬৬ (আয় ধুরড়ী), ৩৮৯ (ধাঁধা, কাঁদুনে ওরে নাটাচোখের ঝি), ৩৯০ (মজুন্দার), ৩৯৪ (গোলাপ সুন্দরী), ৪০৪ (ঘুমানি), ৪০৮ (নেংটি বাবাজী), ৪০৯ (বিশে)। প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে (কেবল সংখ্যা উল্লেখ করছি) : ১১ (১, ৪, ৫, চিহ্নিত অংশ), ১৩, ১৯, ২০ (ক ও খ অংশ), ২১ (বিভিন্ন অংশ), ২৪, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪৫, ৫৫ (ক-অংশ), ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৯ (ক-অংশ), ৭০ (গ-অংশ), ৭২ (ক-অংশ), ৭৩ (ক-অংশ), ৭৪ (ঘ-অংশ), ৭৬, ৭৭, ৮৭, ৯২ (১, ২, ৩, ৭, ৯, প্রভৃতি অংশ), ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১১৪, ১১৫-১১৯, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩১-১৩৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০-১৪৩, ১৪৬, ১৫৬-১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৩-১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ১-৯, ২০৩, ২০৫-২০৮, ২১৬, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫৯, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৯, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১, ৩৪৩, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৯১, ৩৯৩-৩৯৫, ৩৯৯-৪০০ প্রভৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সম্বোধন যখন, তখন এক জনের উক্তি, এবং অপর জন হয় তার উত্তর দেয়, নয়তো কেবলই সে নিশ্চেষ্ট শ্রোতা। এই দু'জনের ব্যাপার বলেই সম্বোধনকেও প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা হল। সম্বোধনেরই প্রসারিত একটি দিক হল দূরের বা নেপথ্যের ব্যক্তি বা বস্তুকে আহ্বান॥

...৮...

কোনো একটি দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্র ও পরিস্থিতির বর্ণনা প্রদানের প্রবণতাও ছড়ার কায়া গঠনের (এবং ভাববস্তুর) ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। আসলে এরই ফলে এক-একটি ছড়া একাধিক খণ্ড চিত্রের সমষ্টি হয়ে যায়,—রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সকলেই ছড়ার অন্তর্ভুক্ত এই খণ্ড চিত্রের শোভাযাত্রা-সমারোহের কথা বলেছেন। এইসব খণ্ড চিত্র আসলে কোনো দৃশ্য, ঘটনা, পরিস্থিতি বা কোনো বিশেষ চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বতঃই নির্মিত হয়ে যায়, তার জন্যে কোনো যত্ন করতে হয় না। এই চিত্রগুলিই ছড়ার মূল সাহিত্যসম্পদ, এগুলো না থাকলে ছড়া বিরস বিবৃতিতে পরিণত হয়ে যেত। চিত্রগুলির ভেতরে লুকিয়ে আছে টুকরো-টুকরো কাহিনীকণা, কখনো বা অখণ্ড একটি গল্পই পাওয়া যায় ছড়াতে, কখনো একটি গল্পের মূলকথাটুকুই কেবল তুলে ধরা হয় সংক্ষিপ্ত একটি ছড়ার মধ্যে।

সুতরাং কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার একটি গভীর যোগ আছে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য দিকের তুলনায় কথা-কাহিনীর সঙ্গেই ছড়ার যোগ নিবিড়তম এবং পরিমাণেও তা ব্যাপক। কথা-কাহিনীর বিশিষ্ট দিকগুলিই (যেমন, দৃশ্য, ঘটনা, পরিস্থিতি, চিত্র, চরিত্র) ছড়াকে গঠিত হতে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

ছড়াতেই যেমন কথা-কাহিনী মেলে, তেমনি বহু কথা-কাহিনীর কথন-ভঙ্গিতেও ছড়াকে পাওয়া যায়। দুটি দৃষ্টান্ত দিই। ঊনবিংশ সংস্করণ (১৩৬৫) 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে একটি দৃষ্টান্ত: "ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন ফুলের বনে সোণার খাট, সোণার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোণার পদ্ম, সোণার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন।"

যদিও দক্ষিণারঞ্জন ভাষার অনেক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, তথাপি এই বর্ণনার মধ্যে ছড়ার ভাবটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এখানে পূর্ববর্তী শব্দই পরবর্তী অংশে আবৃত্ত হবার দরুণ এক ধরণের শৃঙ্খলার সূচনা করেছে।

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত একটি মন্ত্র-কথাকে (The Rajbansis of North Bengal: Asiatic Society, 1965. p. 172) আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়:

একটা আজার তিনটা গাঁও। তিনটা গাঁও যেমন-তেমন, একটা গাঁওতে বসতে নাই। যেইটা গাঁওতে বসতে নাই, ওইটা গাঁওতে বসিল্ তিনটা কুমার। তিনটা কুমার যেমন-তেমন, একটি কুমারের হাতে নাই। যেইটা কুমারের হাতে নাই, ঐটা কুমার বেনালে তিনটা তাই। তিনটা তাই ফাটা ফুটা, একটা তাই তাই-ই না হয়। ঐটা তাইতে আন্ধিয়া খা'লে তিন্টা বাভণ। একটা বাভণ পালে নাই। যেইটা বাভণ পালে নাই, ঐটা বাভণ পালে তিনটা বল। দুইটা বল বহে-পিটে খায়, একটা বল বহে না। ঐটা বল ব্যচে করিল্ তিন টাকা। দুইটা টাকা ফাটা-ফুটা, একটা টাকা টাকায় না হয়। সেই টাকাতে নিলে তিনখান কোদাল। তিনখান কোদাল যেমন-তেমন, একখান কোদালের ঘরে নাই। ঐখান কোদাল দি বসালে তিনটা চোকা। তিনটা চোকা যেমন-তেমন, একটা চোকাত্ পানিয়ে নাই। যেইটা চোকাত্ পানি নাই, ঐটা চোকাত্ বসালে তিনখান ঝাঁটি। তিনখান ঝাঁটি যেমন-তেমন, একখান ঝাঁটির পটে নাই। যেখান ঝাঁটির পটে নাই, ঐখান ঝাঁটিত্ মারিল্ তিনটা উহি মাছ। পুড়ে করল ছাই।·"

এই মৌখিক রচনাটি যে Chain folk tale বা শৃঙ্খলামূলক লোককথা, তাতে সন্দেহ নেই। এই শৃঙ্খলা ছড়াতেও দেখা যায়। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিই।

যেমন, 'খুকুমণির ছড়া'র (১৬শ সংস্করণ) ৪-সংখ্যক ছড়াটিতে: এক যে রাজা , তার যে রাণী···, তার যে বেটা ·, তার যে বৌ··, তার যে ঝি···, তার যে চাকর···। দেখা যাচ্ছে, শৃঙ্খলামূলক সংযোগ এখানে দু' ধরণের: পূর্বের উল্লিখিত চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত আর একটি চরিত্র; একে-একে পরিবারের সকলের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ, সে উল্লেখের ভাষাও সর্বত্র এক ও অভিন্ন, ফলে একটি নিবিড় সংবদ্ধতা এতে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের খাদ্য বস্তুর উল্লেখ, এও সমতা ও একতা এনেছে। এই ধরণের রচনারীতিকেই

বলেছি একটি গ্র্যাফিক বা জ্যামিতিক পদ্ধতি, যা একটি কঠোর নিয়ম অনুসরণ করে চলে। এই রকম উক্ত গ্রন্থেরই ২৯-সংখ্যক ছড়াতে তিনবার পাই : 'বাপ নয় ত কে ?'···বাপ নয়, খুড়ো··· বাপ নয়, শ্বশুর—এখানেও পুনরুক্তিতে প্রায় অভিন্ন ভাষা, এবং পর্যায়ক্রমিকতা। ১১০-সংখ্যক কাহিনীমূলক ছড়াতে দেখা যায় : শেয়ালনী বাঙ্গী চাষ করেছে, এবং বাঙ্গীর চাষ থেকে ফলন পর্যন্ত প্রতি স্তরে শেয়ালনী সম্পর্কে পরম্পরা ও পর্যায়মূলক অভিন্ন উক্তি করা হয়েছে[১]. তখন শেয়ালনী এসে বসে· ·তখন শেয়ালনীর হল মাথাব্যথা ·· তখন শেয়ালনী মনে বড়ই খুসি · তখন শেয়ালনী বেড়ায় আলি আলি ·· তখন শেয়ালনী ঝেড়ে বাঁধে চুল ··তখন শেয়ালনী ঘোরে দিনরাতি · তখন শেয়ালনী বসে চাটে। বাঙ্গীর এক-একটি স্তর অতিক্রম করা এবং শেয়ালনীর সম্পর্কে প্রায় অভিন্ন মন্তব্য সমান্তরালভাবে করে যাওয়াই এখানে সঙ্গতি ও সংহতি এনেছে, যা সুশৃঙ্খল একটি নিয়মকে রূপায়িত করে। ছড়ার রচনার মধ্যে এই ধরণের রূপনির্মিতিই বহুশঃ প্রাধান্য পায় এবং তা বস্তুমূলক, কিছু বা কৃত্রিম, নিছক হিসেব-কষা। কাহিনী, খণ্ড কাহিনী বা কাহিনী-চিত্রগুলিতেই এই বিশেষিকতা বেশি দেখা গেলেও অন্যত্রও তা দুর্লভ নয় মোটেই। এই ধরণের মানসিকতা ও রচনাভঙ্গিকেই খাঁটি মৌখিক ভঙ্গি বলা যায়। এই ভঙ্গিটিই লোককথা, লোকসঙ্গীত, ধাঁধা এবং প্রবাদেও নানা ভিন্ন রূপ নিয়ে ধরা দেয়। এমন কি, যেখানে লিখিত সাহিত্য মৌখিক বা লৌকিক সাহিত্যধারা দ্বারা প্রভাবিত, সেখানেও এই রচনাভঙ্গির উপস্থিতি চোখে পড়ে।

উক্ত গ্রন্থেরই ১৩৩-সংখ্যক ছড়াতে দেখা যায়, পর পর পাঁচ বার 'আয় রে বুড়ী' অবিকৃত রূপে উল্লিখিত হয়েছে, এবং এখানেও একটি শৃঙ্খলায় পটভূমিকায় তা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে যে শৃঙ্খলাটি গৃহীত হয়েছে, তা সহচর শব্দমূলক এবং এক-একটি স্থানের বিশেষত্বজাত। প্রতিবারের উল্লেখ ও তার প্রতিফল এবং শর্তও একই ধরণের। উল্লেখ ও শর্ত যেন দাঁড়ি-পাল্লার দুটি দিক,—দু'দিকে সমান ওজনের দু'টি ভাব ব্যক্ত থাকায় তার Antithesis

---

১ এ বিষয়ে আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (চৈত্র, ১৩৭০) বইয়ের ৪১-সংখ্যক ছড়া (পৃ. ১৫) তুলনীয়। দ্রঃ বর্তমান সঙ্কলনের ৪৩০-সংখ্যক ছড়া।

হয়ে যাওয়া। এই পর-পর Antithesis-এর ফলেও এক ধরণের রূপগত শৃঙ্খলা আসে। যেমন,

আয় রে বুড়ি কামার বাড়ী : তোকে দেবো হাতাবেড়ী
আয় রে বুড়ি কুমোর বাড়ি : তোকে দেবো হাঁড়ীকুড়ি
আয় রে বুড়ি ঢাকা, তোকে দেবো টাকা।
আয় রে বুড়ি কলকেতা, তোকে দেবো ছেঁড়াকাথা
আয় রে বুড়ি বদ্ধমান, তোকে দেবো জলপান।...

সঙ্গতি ও শৃঙ্খলাকে যেন জ্যামিতি বা গ্রাফের নক্‌শা ধরে এখানে রক্ষা করা হয়েছে। কামারের সঙ্গে কুমোর; হাতা-বেড়ীর সঙ্গে হাঁড়ীকুড়ি; ঢাকার সঙ্গে কলকাতা—সবই যেন সহচর শব্দের সহঅবস্থানকে নির্দেশ করে।

এই একই ভঙ্গিতে উক্ত গ্রন্থের ১৪৩, ১৯৫, ১৯৯, ২৫১, ২৭৮, ৩৩২, ৩৮৮, ৩৯৯ প্রভৃতি সংখ্যক ছড়ার কাঠামো ও রচনারীতি বিচার্য। এইসব ছড়াতে কাহিনী (পূর্বে উল্লিখিত ১১০ এবং ৩৪৩ সংখ্যক ছড়া দুটি পুরোই গল্প) বা কাহিনীর আভাস মেলে, এবং এসব ক্ষেত্রে মৌখিক কাহিনী-কথনের যে রীতিটি আগেই প্রদর্শন করেছি উদাহরণ দিয়ে, তারই সঙ্গে একাত্ম। এগুলোর মধ্যে আবার ১৯৯-সংখ্যক ছড়ার মধ্যে শব্দগত সঙ্গতি এসেছে কার্য-কারণ রূপে, পূর্ববর্তী শব্দই পরবর্তী বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে :

ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান,/কেলে ভূতের *ঠ্যাং/ঠ্যাং* এ দিলাম কোপ/বেরুল দুই পোক / পোকে দিলাম আগুন, / বেরুল দুই বেগুন / বেগুন দিলাম রাঁধ্‌তে / খোকার বউ বসল কাঁদতে।

এখানে এই ভাবে শব্দ আবর্তিত হয়েছে : *ঠ্যাং-ঠ্যাং*। পোক-পোক। বেগুন-বেগুন। প্রতিবারই প্রতিটি কার্যের একটি প্রতিফল দেখা যাচ্ছে, এবং 'দিলাম' শব্দের তিনবার আবর্তনও বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে।

এই বিশেষ ধরণের রচনাভঙ্গি থেকে আমরা এইসব সিদ্ধান্তে আসতে পারি : ছড়ার মধ্যে ভাব ও অর্থগত যতো আপাত-অসঙ্গতিই থাক না কেন, তার বস্তুগত রূপচর্চার মধ্যে একটি নিবিড় ও কঠোর, গোনা-গাঁথা ও হিসেব-করা শৃঙ্খলা ও সংহতির দৃশ্যগত রূপায়ণ আছে। এই সঙ্গতি নির্মাণে বিবিধ শব্দমালা নানা ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়। এই জন্যে ছড়াকে ভাব ও অর্থগত দিক থেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও শব্দের বস্তুগত রূপনির্মাণের একটি অপরূপ নিদর্শন রূপে দেখবার পক্ষপাতী আমরা।

ছড়ার এই বিশেষ ধরণের রচনাভঙ্গি খুবই দেখা যায়। অন্যান্য উদাহরণ নীচে সন্নিবিষ্ট হল। এই প্রসঙ্গে আরো একটি দিক লক্ষণীয়। এই শব্দগত শৃঙ্খলা প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়াতেও দেখা যায়। যেমন, ভবতারণ দত্ত-সঙ্কলিত 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র ১৩৭৭) বইয়ের ৬৬২-সংখ্যক ছড়া; প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই এখানে কাহিনীর আভাস আনা হয়েছে।

ভবতারণ দত্ত-সঙ্কলিত 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের: ১৩, ২১, ৮৯, ৩৩২, ৪২৭, ৪৯৩, ৫৪৬, ৬০৪, ৬১৩, ৬৪২ক, ৬৯৪, ৭৩৪, ৮২৪ প্রভৃতি ছড়া। এর মধ্যে ৬০।-সংখ্যক ছড়ায় পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হয়েছে। শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী-সঙ্কলিত 'যশোর খুলনার ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ফাল্গুন, ১৩৭১) বইয়ের: ৫৫, ৫৮, ৬১, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬, ১৯১, ২১৩, ২২২, ২৩০, ২৪৮-সংখ্যক ছড়া। অধ্যাপক আলমগীর জলীল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। চৈত্র, ১৩৭০) বইয়ের: ৪৮ (পৃ. ১৮), ৪৯ (পৃ. ১৯), ২৪ (পৃ. ৪১-৪২), ৩০ (পৃ. ৪৩), ১ (পৃ. ৪৭), ২ (পৃ. ৪৭-৪৮) সংখ্যক ছড়া। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সঙ্কলিত 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম সং বৈশাখ, ১৩৬৯) বইয়ের: ৩৭ক (পৃ. ৫০), ৪৬ (পৃ. ৫৪), ৫৪ (পৃ. ৫৭), ৬৭ (পৃ. ৬১-৬২), ৮০ (পৃ. ৬৬), ৮৯ (পৃ. ৬৯-৭০), ১১৩ (পৃ. ৭৮), ১০ পাঠান্তর (পৃ. ১০০-১০১), ৯৪ (পৃ. ১৭৪), ৯৯ (পৃ. ১৭৬) প্রভৃতি ছড়া। বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য: ১২শ' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ফাল্গুন, ১৩৮২) বইয়ের: ৬ (পৃ. ৫-৬), ৭ (পৃ. ১৮-১৯), ১ (পৃ. ২৪), ২ (পৃ. ৭৯), ১ (পৃ. ১১০), ২ (পৃ. ১৪৯) সংখ্যক ছড়া। এই সব ছড়ার প্রত্যেকটিতে কোনো না কোনো ধরণের সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, পারম্পর্য, ক্রমান্বয়িকতা, শব্দ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। বর্তমান সংগ্রহ থেকে দৃষ্টান্ত এই: সং ৩গ, ৭গ, ৮, ২৪গ, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৫৮খ, ৫৯ (দ্বিতীয়াংশ), ৬১, ৬৯ক, ৭০ গ, ঘ, ঙ, ৭৩ক, ৭৪গ, ৭৫ঘ, ৮৬, ৯০. (বিভিন্ন অংশ), ১০২, ১৪৫, ১৫১, ১৭০, ১৭৪, ২৬৪, ২৯৫, ৩০৩, ৩০৯, ৩১২, ৩১৮, ৩৫০, ৩৬৮, ৩৮১, ৩৮৬, ৪০১, ৪০২, ৪০৮ (পঞ্চম অংশ), ৪১০, ৪২১ প্রভৃতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ছড়ার ভাববস্তু ও রূপনির্মাণে কথা-কাহিনীর ভূমিকা অসামান্য। কথা-

কাহিনী-চরিত্রের আভাসে রচিত ছড়ার পরিমাণ কম নয়, কে জানে সব চেয়ে বেশিই কি না। এই জাতের ছড়াগুলিতে এই ক'টি দিক দেখা যায় : ক. একটি সুস্পষ্ট কাহিনীর অস্তিত্ব যেখানে মেলে ; খ. খণ্ড চিত্র ও চরিত্রের আভাস যেখানে দেখা যায়। এই চিত্র-মূলকতাকেই অনেকেই ছড়ার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলেও মানেন। কৌতুক ও অসঙ্গতির ভাবটিও এর মধ্যে ধরা পড়ে। রাজা-রাণী, বুড়ো-বুড়ী, ধোপা-নাপিত, বা অপর কোনো নাম-চরিত্রের উল্লেখ করে রচিত ছড়া , গ. একটি ছড়াকেই গোটা একটি কাহিনীর সার-নির্যাসে পরিণত করা , ছড়াটি যেন সেই কাহিনীব ফ্রেম, তারই বন্ধনে কাহিনীটি ধৃত থাকে। কাহিনী ও ছড়া এখানে সম-প্রধান, পরস্পরের ওপর নির্ভর-শীল। পূর্ববঙ্গে এই ধরণের কাহিনীকেই বলে 'শোলোকী কিস্সা' অর্থাৎ শ্লোকের আধারে ধৃত কেচ্ছা-কাহিনী ; ঘ. কাহিনীব বিশেষ-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কোনো মন্ত্র, রহস্যজনক তথ্য বা কথা, কোনো নাটকীয় পরিস্থিতি ব্যক্ত হয় যে সব ছড়ায়। 'ঠাকুরমাব ঝুলি' বা 'ঠাকুরদাদার ঝুলিতে' এবং গ্রীম-ভাইদের গল্পসংগ্রহে এই ধবণের ছড়াব নিদর্শন মেলে। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদাব বলেছেন, 'রূপকথা ও রসকথায় ছড়া আছে , গান নাই'। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, সব ধরণের 'কথা'য় ছড়া নেই। সাধারণ ভাবে এ উক্তি মেনে নিয়েও বলা যায়, ছড়া কেবল উক্ত দু ধরণের 'কথা'তেই সীমাবদ্ধ নয়। তা সে যাই হোক, এসব ক্ষেত্রে ছড়ার নিজস্ব স্বতন্ত্র মূল্য নেই, কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই তার মূল্য আবদ্ধ-নিবদ্ধ হয়ে পড়ে।

কথা-কাহিনীব মধ্যে ছড়াব এই ভূমিকা দেখে নানা কথা মনে হয়। ছড়ার মধ্যে যে কাহিনী-কণা বা টুকরো চিত্রের সমারোহ-শোভাযাত্রা থাকে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে চলা, তাও কি কথা-কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার এই নিবিড় সংযোগের ফল? অর্থাৎ কথা-কাহিনীর বিশিষ্ট বর্ণনাত্মক দিকটিই কি ছড়ার ভাব ও কায়া গঠনে প্রভাব ছড়ায়?

বস্তুতঃ এই রকমের অনুমানাত্মক মন্তব্যের বিশেষ ভিত্তি আছে। গান, ধাঁধা, প্রবাদ—লোকসাহিত্যের অন্যান্য বর্গের সঙ্গে ছড়ার যোগাযোগ থাকলেও 'কথা'র সঙ্গেই যোগ সব চেয়ে বেশি কেন? ছড়ার ও 'কথা'র রচনাভঙ্গির সাদৃশ্যও একটু আগে নিদর্শন দিয়ে দেখিয়েছি, তাতেও এই অনুমান দৃঢ়তর হয়। ছড়া নানা শ্রেণীর হয়ে থাকে, কিন্তু এই নানা শ্রেণীর ছড়ার মধ্যেই

কথা-চিত্রকে পাওয়া যায়,—এই দিকটিকে তাই কিছুতেই এড়ানো যায় না। সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত ছড়াতেও [যেমন: বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া, পূর্ববঙ্গের ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড় প্রভৃতির ছড়া, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছড়া; কিংবা সামাজিক কেচ্ছাকাহিনীর ছড়া, নুরুল ইছলাম চৌধুরী তাঁর 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (প্রথম সং জুলাই, ১৯৬৫। চট্টগ্রাম) বইতে যার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন পৃ. ৭)] রচনাভঙ্গি ও কাঠামোর মধ্যে কাহিনী ও কথার খণ্ড চিত্র-চরিত্র এসে পড়ে।

আনুষ্ঠানিক ছড়াতেও কথার প্রভাব ও প্রাধান্য অনুভূত হয়। যেমন, 'মাঘমণ্ডলের ব্রতে'র ছড়াতে আসামের পার্বত্য উপজাতির লোককথার প্রভাব দেখা যায়। কিংবা, রাজশাহীর 'ইটে কুমুড়ের' ব্রত-ছড়ায় (আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' [ঢাকা। নভেম্বর, ১৯৬৩। পৃ. ১৫৫] বইতে ছড়াটি উদ্ধৃত আছে) কাহিনীর আভাস লক্ষ করি। কখনো বা দেখা যায়, একই 'কাহিনী' ছড়া ও 'কথা' রূপে মেলে। যেমন, আমাদের বর্তমান সঙ্কলনে ধৃত 'সেইলী রে সেইলী' (যা 'খুকুমণির ছড়া'র 'বাঘী ও শেয়ালনী', ছড়া সং ১১০) ছড়াটির কাহিনী উত্তর-বঙ্গে 'কথা' রূপে মেলে। কিংবা ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মশাইয়ের 'দি রাজবংশী'স্ অফ্ নর্থ বেঙ্গল' বই থেকে পূর্বে যে 'কথা'টি উদ্ধৃত করেছি, সেটিই সামান্য পরিবর্তিত হয়ে একটি ছড়াতে রূপ পেয়েছে (দ্র: আশরাফ সিদ্দিকীর প্রাগুক্ত গ্রন্থের 'কানার ছেলে কানা' পৃ. ১৬১-১৬২, ছড়াটি)।

'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-র 'তাঁতীর সাজা' (সং ৩১) নামের ছড়াটিত তাঁতী ও ব্যাঙের যুদ্ধের কথা আছে। এখানে তাঁতী ও ব্যাঙ পরস্পরের শত্রু কিন্তু তথাপি, তাঁতী ও ব্যাঙের সংস্পর্শটি ভুলবার নয়[১]। 'The Frog' নামে ইটালী থেকে পাওয়া একটি লোককথাতে (Peter Lum : Italian Fairy Tales : Indian Edition, Bombay, 1969. pp. 20-29) দেখা যায়, নায়কের বিবাহের পথ প্রস্তুত করতে সেচ্ছায় একটি ব্যাঙ তাকে নির্দেশ অনুযায়ী কাপড় বুনে দিচ্ছে। 'কথা'টি গ্রীক-ভাইদের জার্মানী থেকে সংগৃহীত

১ আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। চৈত্র ১৩৭০) বাইয়ের একটি ছড়াতেও (সং ২৬। পৃ. ১০) ব্যাঙের সঙ্গে তাতীর যোগ দেখা যায়।

কথা-সঙ্কলনেও মেলে। ব্যাঙ এখানে তাঁতী, এবং তাঁতী ও ব্যাঙের যোগসম্পর্কটিই এইখানে কাহিনী ও ছড়াকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

বাঙলা ও ওড়িশাতে লোককথা বলবার শেষে 'আমার কথাটি ফুরোল' বলে যে ছড়াটি আবৃত্তি করবার রেওয়াজ আছে, পূর্বে তার কথা উত্থাপন করেছি। এর প্রশ্নমূলকতার পশ্চাতে একটি 'ক্রমপুঞ্জিত লোককথা' (cumulative Folk-tale বা Accumulation Droll)-র কাঠামোর অস্তিত্ব অনুমান করেছি, যে কাহিনীটি আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। কিন্তু এর থেকে ছড়া ও কথার নৈকট্য ও অভিন্নতার প্রসঙ্গে অন্যান্য প্রশ্নও মনে আসে: কেন প্রতিটি 'কথা'র শেষে ছড়াটি বলবার এই আবশ্যিকতা? তবে কি 'কথা' ও ছড়া এক? কেন 'ক্রমপুঞ্জিত' ছড়াই বলা হয়,—তবে কি ক্রমপুঞ্জিত কাহিনীর সঙ্গে ছড়ার যোগ নিবিড়তর?

দেখা যায়, কাহিনী-নিরপেক্ষ ভাবে অনেক ক্রমপুঞ্জিত ছড়া এখনও আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। যেমন, চট্টগ্রাম থেকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-কর্তৃক সংগৃহীত 'ও উকুন বিবি মরি গেইয়ে' (যা এখন ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া', ভাদ্র ১৩৭৭, বইয়ের ২১২-সংখ্যক ছড়া) ছড়াটি। ছড়াটি যে ক্রমপুঞ্জিত লোককথার সারবস্তু, সেটি মৈমনসিংহ থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংগ্রহ করে 'টুনটুনির বই'তে (১৯শ মুদ্রণ: পৌষ, ১৩৭০। পৃ. ৪৪-৫৪) সঙ্কলিত করেছেন। মৈমনসিংহে যা কাহিনীসহ মেলে, চট্টগ্রামে তা কাহিনী-নিরপেক্ষ হয়ে গেছে,—একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছড়া হিসেবেই তা প্রচলিত হয়েছে। আবদুল করিম এবং উপেন্দ্রকিশোর-সংগৃহীত ছড়ায় কিছু পার্থক্য আছে। আবদুল করিমের সংগৃহীত ছড়ার শেষে আছে: ময়না আয় রে আয় / মোর জাদুর সোনা মুখে / চুম দিয়ে যা /—এই শেষাংশই ছড়াটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কথা-নিরপেক্ষ ছড়ারূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছে—যার ফলে সংশ্লিষ্ট 'কথা'টি আজ বিস্মৃত। এই রকম 'গেরস্থ ভাই দেবে আগুন' ('বাংলা দেশের ছড়া', সং ৪০৪; 'খুকুমণির ছড়া', ১৬শ সংস্করণ, সং ৭৬) ছড়াটিও লক্ষণীয়। এটিও ক্রমপুঞ্জিত লোককথার সারবস্তু,—ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে পূর্ব ভারতের অনেক অঞ্চলেই চলিত আছে, উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৫৯-৬৩) সেটি দিয়েছেন। কিন্তু এখানেও দেখি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোরের ছড়ার রূপান্তর। উপেন্দ্রকিশোর-সঙ্কলিত রূপটিতে কাহিনীর সারবস্তু প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গেই ছড়া শেষ হয়েছে।

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ-সঙ্কলিত ছড়াটি নিছক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছড়ারূপেই বিবেচিত হয়েছে, তার প্রমাণ শেষ পঙ্‌ক্তি : 'তবে আমি চড়াবো ভাত', যেন এ কাকের উক্তি নয়, ছেলেকে ভুলোবার জন্তে মায়ের উক্তি। এখানেই ছড়াটি কথা-নিরপেক্ষ হয়ে গেল। শুধু ক্রমপুঞ্জিত কথার ছড়াই নয়, অন্যান্ত 'কথা'র অন্তর্গত ছড়াও একটি নিরপেক্ষ ও নিছক ছড়া হয়ে যায়। যেমন, 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' (খুকুমণির ছড়া, ১৬শ সং, ৩৩৬-সংখ্যক) ছড়াটি, কিংবা 'টাক্-ডুবা-ডুব্-ডুবা' (ঐ, সং ৮৭) ছড়াটি।

এইসব দৃষ্টান্ত থেকে 'কথা'র সঙ্গে ছড়ার যোগটি লক্ষ করতে চাইছি। দুয়ের রচনারীতির সাদৃশ্যের প্রমাণও আগে দিয়েছি। রচনাগত অপর সাদৃশ্য এই : 'কথা' যেমন বহু ক্ষেত্রেই আরম্ভ হয় 'এক যে ছিল রাজা' কিংবা 'এক গৃহস্থ ছিল' বলে—কাহিনীর আভাসে রচিত ছড়াগুলিও তেমনি। যেমন : 'এক যে ছিল বনলতা / বলি তার প্রেমের কথা (শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, 'যশোর খুলনার ছড়া,' ফাল্গুন, ১৩৭১, সং৭৫), 'এক বুড়ি বাদাম খাতি খাতি' (ঐ, সং ৬১); 'এক যে ছিল ছুঁচো' (ঐ, সং৬৭), 'এক যে ছিল মাইয়ে' (ঐ, সং ৫৭); 'এক যে ছিল রাজা' (ঐ, সং ৫৫), 'এক যে ছিল শিয়াল' (ঐ, সং ৬৫), প্রভৃতি। অপর এবং অতিরিক্ত উদাহরণ পাদটীকায় প্রদত্ত হল।[১] 'এক' শব্দের আরো বিচিত্র ব্যবহার ছড়ার অন্যত্রও দেখা যায়। অনেক ছড়াতে যে 'রাজা' 'রানী' প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাও রূপকথার দিকটিকেই নির্দেশ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্তমান সঙ্কলনের ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪ প্রভৃতি ছড়ার নাম করা যায়। এ ছাড়া, কাল্পনিক ও অদ্ভুত মানুষ-জীব-জন্তু-পাখি, আজব দেশ (যেমন : 'ক্ষীর নদীর কূল'। 'উজানতলীর দেশ' ইত্যাদি)—সবই রূপকথার সঙ্গে সেতু-বন্ধনের প্রয়াস। এই ধরণের সব ছড়াকে এক সঙ্গে

১ যেমন : 'খুকুমণির ছড়া'য় (১৬শ সং) : 'এক যে আছে একানোড়ে' (সং ২), 'এক যে গাছ ছিল' (সং ৬৫) 'এক যে রাখাল গরু চরায়' (সং ২০০), 'এক যে রাজা সে খায় খাজা' (সং ৪), 'এক যে শেয়াল' (সং ১৫৩)। ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া'য় (ভাদ্র, ১৩৭৭) : 'এক ছিয়লি আছে বাড়ে দুই ছিয়লি খায়' (সং ১৬২)। বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য : ১২শ' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : ফাল্গুন, ১৩৮২) খণ্ডে : 'একনা মনা গুড়গুড়ি ঠেং' (সং ৩, পৃ. ৫৩)। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সম্পাদিত 'লোকসাহিত্যে ছড়া'র (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। বৈশাখ, ১৩৬৯) : 'এক যে ছিল বুড়ী' (সং ৭, পৃ. ৪১)। আমাদের প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে : সং ১৮৪, ২৫৭ (অউন্যা), ৩০৭, ৩২৫।

মিলে মনে হয়, 'কথা'ই যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে বিভিন্ন ছড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। রূপকথা ছাড়া মধ্যযুগের সমুদ্র-যাত্রাও এসব ছড়াকে প্রভাবিত করেছে। তেপান্তরের মাঠের বিশালতা ও দূরত্ব যেন মধ্যযুগের বাণিজ্যে যাত্রাকারী বণিক-সাধুর অনির্দেশ্য সমুদ্র হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, অসম্ভব রাজ্য 'ক্ষীর নদীর কূল' বা 'উজানতলীর দেশ' সবই নদী-পথকে নির্দেশ করে। এসব ক্ষেত্রে রূপকথার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার বণিক-সাধুর সমুদ্র-যাত্রা বা বিদেশ-যাত্রায় রূপ নিয়েছে, ছড়াতেও তার ছায়া পড়েছে।

বাঙলা ছড়ার মধ্যে এই যে টুকরো-টুকরো কাহিনী-কণা, খণ্ড চরিত্রের সঘন আনাগোনা, দৃশ্য-ঘটনার ক্ষণিক-আকস্মিক চমক দেওয়া, তার কিছু নিদর্শন এইখানে উপস্থিত করি :

রবীন্দ্রনাথ যে ৮১টি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন (রবীন্দ্ররচনাবলী : ৬ষ্ঠ খণ্ড। পৃ. ৬১২-৬৩১) তার থেকে : সং ১ : গৌড়ে যাওয়া ও সোনার ময়ূর আনা। সং ১৬ . দুয়ারে বাঁধা হাতী রূপকথার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। সং ৫১ : যে ক্ষীর নদীর বিলে খোকা মাছ ধরতে যাবে, তা অনির্দেশ্য এক কাল্পনিক জগৎ। সং ৫৬ : বাপের নৌকো সাজানো এবং ভাইয়ের রাজ্যেশ্বর হওয়া মধ্যযুগীয় বাণিজ্যকে স্মরণ করায়। সং ৭৪ : 'খোকা যাবে নায়ে'—সেই বাণিজ্য-যাত্রারই নাবালক-সংস্করণ। কেবল বিশেষত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তগুলিরই উল্লেখ করলাম, অন্যান্য যে সব ছড়াতে টুকরো চিত্র-চরিত্র-দৃশ্যের উল্লেখ রয়েছে তা এতো স্পষ্ট এবং এতো বহু আলোচিত যে তার উল্লেখ অনাবশ্যক বোধ করছি। এখানে আমার লক্ষ্য দুটি · কাহিনী-কণা ছড়াতে কি ভাবে আছে, এবং সেই কথা-কাহিনী আবার কি ভাবে রূপকথা ও মধ্যযুগীয় জীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাই প্রদর্শন করা। যাই হোক, ওপরের দৃষ্টান্ত থেকে বণিকের চিত্র পাওয়া গেল।

যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) থেকে : সং ২ : অদ্ভুতদর্শন 'একানোড়ে'র রূপচিত্র, যেন সে রূপকথার এক আজগুবী প্রাণী। সং ৪ : একটি রাজার পবিবার। সং ৩৪ : এক রাজকুমারীর কথা। সং ৪২ : 'কনক রাজা'র কথা। সং ৪৫ : এক বুড়ীর চিত্র। সং ৪৯ : 'আঁধারে বুড়ী'র কথা। সং ৮৬ : 'হাজার টাকার বউ'য়ের রূপচিত্র। সং ১৩৩ : 'ছাগলার মা বুড়ী'র কথাচিত্র। সং ১৪১ : মাথায় শালিক নাচে, এমন এক বুড়োর চিত্র। সং ১৪৯ : 'কানকাটার মা'-এর চিত্র। সং ১৫৯ : বনে বাগদী মরবার পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা এবং রাজার উল্লেখ। সং ১৬৩ : পুঁটির

কান্নাতে মুক্তো ঝরে পড়া। সং ১৬৮: 'হস্তী রাজার দেশে' খোকার বিয়ে করতে যাওয়া, সোনার খাটে বসে, রূপোর খাটে পা রেখে। সং ২০৭: 'নিদান বুড়ী'র চিত্র। সং ২১০: এক ময়রা বুড়োর কথা। সং ২১৬. শ্যাওড়া গাছের ছয় বুড়ীর কথা। সং ২২৬: রূপকথা-সুলভ বিবাহ-যাত্রার বর্ণনা। সং ২৬৬: বাঁশতলার বুড়ীর চিত্র। সং ২৮৯: রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা। সং ৩২৫: রাজার দুয়ার ও হাতী-ঘোড়ার উল্লেখ। সং ৩৪২: তিন বুড়ীর পরিচয়।

এ ছাড়া পশু-পাখির আগমন ও উল্লেখও 'কথা'র দিকটিকে উজ্জ্বলতর করে। 'খুকুমণির ছড়া'য় এমন ছড়া হল: সং ৩১ (ব্যাঙ), ৯০ (শেয়াল), ৯৯ (কাক), ১০১ (হনু), ১১০ (পুরো কাহিনী, শেয়ালনী), ১২৯ (ভুঁড়োশেয়ালী), ১৫৩ (শেয়াল), ১৬৭ (কুকুর, বেড়াল), ১৭৮ (শেয়াল), ২১৬ (ভালুক), ৩১৩ (ভোঁদড় শিয়ালী), ৩৪৩ (হাতী, ব্যাঙ)।

ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত 'বাংলা দেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) থেকে: সং ১: অছিরদ্দির বাপের কথা। সং ১৩: 'অলকমণি রাজার রাণী'র কথা, রাজা ও রাজপুত্রীর কথা। সং ১৪৫খ: 'কামারমাগী কেরকেরানী যেন পাটরাণী' এবং 'চড়ুই রাজা'র উল্লেখ। সং ১৪৬: রামা ও সুনন্দার চিত্র। সং ১৫৮: 'রাজার পুতে' বিয়ের প্রসঙ্গ। সং ১৬২: 'ভূম রাজার বাড়ী'। সং ১৭২: গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র। সং ১৮৫: রাজারউল্লেখ। সং ১৯১: রাজার উল্লেখ। সং ২১১: খোঁড়া জামাইয়ের চিত্র। সং ২৩৩-২৩৬, ৪৪৫, ৫০৭: বুড়ীর উল্লেখ। সং ৫১৮, ৫২৩ ক-খ: বুড়োর উল্লেখ। সং ৮২৬: 'সিজীর মামা ভোম্বলদাসে'র কথা। সং ৮৬৭: রাজার উল্লেখ।

উক্ত গ্রন্থেই, পশু-পাখির উল্লেখের ফলে যে সব ছড়ায় কথা-চিত্রের আভাস এসেছে, তার দৃষ্টান্ত: সং ২৩ (ভুঁড় শিয়ালী), সং ৫৯ (বাঘ), সং ৭১ (ভালুক), সং ৭৮ (ভোঁদড়), সং ৮১ (লেজঝোলা পাখি), সং ৮৮-৯১ (টিয়েপাখি), সং ১০১ (লটকুনা পাখি), সং ১০১খ (টেংকোনা পাখি), সং ১২৯ (ময়না পাখি), সং ১৬২ (শেয়াল), সং ২৬১, ২৬২ (কাক), সং ২৯৩ (কুকুর), সং ৩১০ (কোড়াল, কোড়ালী), সং ৬৩৮ ক-খ, ৬৩৯ (পানকৌড়ি), সং ৬৬৪ (বগা, বগী), সং ৭০৯ (চ্যাং ও ব্যাঙের আলাপন), সং ৭১০ (মোষ), ইত্যাদি।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী মশাই তাঁর 'যশোর খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন, ১৩৭১)

বইতে পৃথক ভাবেই 'কথা ও কাহিনীমূলক ছড়া' (সং ৫৫-৬৭ এবং সং ১৬৮-১৭২) সঙ্কলিত করে আমাদের কাজ কিছু সুগম করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে যা অলক্ষিতই থেকে গেছে, এখানে আমরা তা লক্ষ করছি :

সং ১৯ : 'কালুর বৌ দারোগার' বর্ণনা। সং ২১ : সোলেমানের চিত্র। সং ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৬১, ১৬৯ : বুড়ীর চিত্র। সং ৮০ : বুড়ো ও ধাড়ীর নাচ। সং ১৮৫ : বুড়ো। সং ২১০ : বুড়ো নাপিত খুড়োর চিত্র। সং ৩৩ : 'সদাগরের ঝি'। সং ৩৩ : হীরের শাক। সং ৩৯ : 'মাইরামী'র চিত্র। সং ৪৬ : 'অরম বিবি'র চিত্র। সং ৫০ : 'হাজার টাকা'। সং ৫৬ : 'ধান্যপুরের রাজার কুমার', 'হীরের কাঁটা,' 'গুপ্তরাজের কন্যা আমড়ামতী'। সং ৫৯ ; লালবিবির রূপচিত্র। সং ৬২ : প্যায়দা বেটার কথা। সং ৭৩ : 'বকুল ফুলের' নাম ও রূপ। সং-৮৭-৯১ · জামাইয়ের চিত্র। সং ৯৯ : সতীনের চিত্র। সং ১০৪ : 'তিন ছেলের মা হলুদ বরণ গা'। সং ১৩২ : 'উচ্ছে পাড়ে শাড়ী'। সং ১৩৪ : 'বাঙা মাথায় চিরুণী'। সং ১৩৬ : 'রাঙ্গা ভাতার'। সং ১৩৮ : 'বোকডা দাদী, কাঁকড়া থাকী, নেমাল্যের মা'। সং ১৪০ : 'হাতে দেব হীরের বালা'। সং ১৪১ : 'আমার মেয়ের বে দেব হলদিপাতার দেশ'। সং ১৪৮ . 'পদ্মের পাতায় জল থুয়ে মারী গেছে ঘরে'। সং ১৪৯ : 'হাত কুড়ানি পাত কুড়ানি দুইটি বন্ধু তারা সেজেছে'। সং ১৫০ : 'লাল টুকটুক টিয়া,' 'মৌরিফুলের ছাতি'। সং ১৫৩ : 'মিঠাই বান্দা শাড়ী'। সং ১৮৮ : 'ফরিদপুরের বেই'। সং ১৯১ : 'আংটি বেচা মামাশ্বশুর'। সং ২০০ : 'মোল্লার বেটার চাপ দাড়িটা পাকা'। সং ২০৭ : 'ভূতের মেয়ের বিয়ে লাল গামছা দিয়ে'। সং ২১৩ : জামাইয়ের রূপচিত্র। সং ২১৫ : বৌ সোনার বরণ, মেঘের বরণ চুল, কাঁদলে মুক্তো, হাসলে ফুল। সং ২২৬ : 'ইছেমতীর ঘাট দেব পা ধুয়ে যাত্তি'। সং ২২৮ : 'ইছামতী কন্যা আমার'। সং ২২৯ : বুড়োর কথা। সং ২৩৬ : 'শ্যামপুকুরি ঘাট'।

উক্ত গ্রন্থে পশুপাখির উল্লেখ : সং ১১ (দাঁড়কাক, পাতিকাক), সং ২০ (কুলকে মাছের দাড়ি, কাঠ বিড়ালী), সং ৩১ (গিন্নী শকুন), সং ৩২ (কাঠবিড়াল), সং ৩৪ (চিল), সং ৩৫ (ঘুঘু), সং ৩৭ (ময়না), সং ৪৭ (রাজামশাই, হাতী), সং ৪৮ (পাতিকাক), সং ৫০ (ঘুঘু), সং ৫২ (প্যাঁচার মা, কাক, হরিণ), সং ৬৪ (সাঁওতালী ব্যাঙ), সং ৬৬ (ইঁদুরের রূপ), সং ৬৭ (ছুঁচোর রূপ), সং ৮৩ (শালিক), সং ১২৯, ১৩১ (ব্যাঙ), সং

১৩০ (ময়না), সং ১৫২ ('চিংড়ে মাছের গ্যাজগ্যাজানি / পাবদা মাছের দাড়ি'), সং ১৬৮ (ইঁদুর), সং ২০৫ (কাগের গলায় তুলসীমালা / ব্যাঙে বাজায় বাঁশি), সং ২০৬ (কুকুর, চামচিকে)।

মুকুল ইছলাম চৌধুরীর 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (প্রথম সং : জুলাই, ১৯৬৫) বই থেকে : 'জামাইবাবুর কি যে গুণ' (পৃ. ৭)। 'বুড়ীর বাড়ীর ঝেঁয়ালা' (পৃ. ১৪)। রাঙা বুড়ীর হাঙী আইব (পৃ. ২৭)। বুড়ী (পৃ. ৩৪, ৩৬)। রাজা (পৃ. ৩৫)।

আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (চৈত্র, ১৩৭০) বই থেকে : 'কলা বেচে রঁাধে বুড়ী' (পৃ. ১)। 'নেংড়া হল বর' (পৃ. ২)। 'পদ্মার মা বুড়ী' (পৃ ২)। ভুলুয়ার চিত্র (পৃ. ২)। 'আমার দিলআরার গা ঝুর ঝুর পান পাত' (পৃ. ৪)। 'পদ্মথাজার ফুল ফুটে' (পৃ. ৪)। 'খঁাটা খঁাটা সরিষার ফুল,' 'কোমরে দিল ঢাকা শাড়ী,' 'লাল গামছা,' 'রাণু দিদি রূপসীর পার,' 'ভূতের রাজা বাগানে' (পৃ. ৬)। 'খাটের বিবি খরমে পাও' (পৃ. ৮)। 'হুমবার মাথায় লাল টুপি' (পৃ. ৯)। বুড়াবুড়ি (পৃ. ১০)। 'শিবনতলার ছেলে-পেলে,' 'খুঘুমারীর ঘাট' (পৃ. ১২)। 'সাগর দীঘি নাম' (পৃ. ১৩)। 'নই দীঘির মধ্যে দীঘি' (পৃ. ১৪)। 'আমরা দুটি সদাগর' (পৃ. ১৬)। 'রাজার বেটি সিনান করে, পাকা পাকা চুল,' 'তালবড়া সোনার রূপ' (পৃ. ১৮)। রঘুমণির কথা, খোকার বাপের চিত্র (পৃ ১৯)। 'ডিঙ্গি লাকে লিয়া যা' (পৃ. ২০)। 'সোনার পা, রূপাব পা, ছেলে বিলে যায় নতুন জায়' (পৃ. ২১)। 'ত্তিপুরেব গোয়াল ব্যাটা,' 'কমরে আছে নীল শাড়ী' (পৃ. ২২)। 'রোহনপুরের গোলা,' 'আলতা দুখান পা' (পৃ ২৩)। 'সাত হাজারের ধনী' (পৃ. ৩১)। 'সাত ভাই জালুয়া,' 'ঘাটে বইসে চম্পাবতী মাজে আপন চুল' (পৃ. ৩৬)। 'দুই লক্ষ টাকার শাড়ী বেচে,' 'যে তক্কে রাজা মশাই হয়েছিলেন ঘোড়া' (পৃ. ৩৮)। 'সোনার চাবুক, ' 'কাঞ্চন নগর' (পৃ. ৪১)। মণ্টু গাঁঠ্ঠার চরিত্র-চিত্র (পৃ. ৪৪)। 'তোর গায়ে ভরিব সোনা' (পৃ. ৪৫)। 'তার দুয়ারে সোনার কড়ি' (পৃ. ৪৭)। 'সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল' (পৃ. ৪৮)। 'আবাছোঁড়া লিকা করিল চামড়া ঢিলা বুড়ী' । (পৃ. ৪৫)। 'রাজবাড়ীতে যাইতে' (পৃ. ৬৫)। 'তোর রাজাকে বাণ মেরেছি' (পৃ. ৬৬)। গেছ রাজা ফেল্‌লো পাটি' (পৃ. ৭৩)।

এবারে আমাদের প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উদাহরণ দিই।

যে সব ছড়াতে রাজা-রাণী, সদাগর, বাণিজ্যযাত্রা বা মধ্যযুগীয় প্রতিবেশ কিংবা রূপকথার অনুষঙ্গ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) লক্ষ করি : সাত ভায়ের বোন, ১। রাজ্যেশ্বর স্বামী, ৪, ৫। রাজার বেটা, ৪। সোনার কলসী, ৬। আট ভাই পেলেন যেন হীরার দানা, ৬। আমার ভাই লক্ষেশ্বর, ২১, ৭০। সাত সতীন, ২১, ৩৩। সোনার থালে ভুজ্যান, ২১। টাকার ছালা, ২১, ৫৮। সোনার ভেঁটা, ২১। তুমু মোর পাটেশ্বরী, ২৮। রাজার অন্দর, ৩৩। সোনার গাড়ু, ৩৬। শ্বশুরকুলে রাজ্য করি, ৩৬। সোনার লড়ি, ৪৬, ৫৫, ৫৮। সোনার কড়ি, ৫৩। কতক দুধ ঢেউ যায়, ৫৪। সোনার লাঙ্গল, রূপার ফাল, ৫৭। কান্দে সোনার গুলাইল বাঁশ, ৬৭। রাজার বাড়ী, ৬৯। সোনা দুইটি ভাইবোন, ৭০। বাপ আমার রাজা, ৭০, ৭২। দধীশ্বর বাপ, ৭০। রাজাব বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে, ৭০। সোনার খাট, বথ, আয়না, চিরুণী, ৭০। মুই বর্ত্ত করু সিঙ্গাসনে বস্‌ইয়া, ৭১। জন্মে জন্মে আয়রাণী, ৭১। বাপের রাজ, স্বামীর রাজ, পুত্রের রাজ, ৭১। মা পাটেশ্বরী, ৭২। ষোল ভাইয়ের ষোল ঘোড়া, ৭৪। সিংহাসন, ৮৩। সোনার বলি, হীরার ধার, ৮৫। রাখালের মাথায় সোনার জটা, ৯০। ইন্দ্ররাজা, ৯৯। সোনাব ডাবা, ১১৫। সদাগর ১৪১। দুবুরা রাজাব পাট, ১৬২। রাজার বেটী, ৫৬৬। লাল লৌকো, ১৭৪। আজার বেটা লখিন্দর ঘোড়ায় চড়িয়া যায়, ১৮৪। কইনামতী, ১৮৪। ফুলমালা, ১৮৫। রঙমালা, ১৮৫। সনাব চানের মাথাত্‌ মুকুট, ঘোড়াত্‌ চড়ি মারে চাবুক, ২২২। সোনার পালকি, ২২৮। আগে যায় হাতী ঘোড়া, পিছে যায় গাড়ী, ২৩৭। রাজার পুকুবে চান করে, ২৪৮ (পাদটীকা)। ফিঙ্গেরাজা, ২৪৯। বানিয়া রাজা, ২৫৩। রূপাব বাটা, ২৬৪। সোনা পাইক, ২৬৯। সোনা তাল, ২৬৯। আজার (রাজার) বেটা পাইক, ২৭১। চুনিয়াচন্দন (ব্যক্তি নাম), ২৭২। সোনা দিয়া মোড়াইছে, ২৭৩। মহারাজ, ২৭৭। রাণী যায় ঢুলতে ঢুলতে, ২৭৮। খেড়ীর রাজা, ২৮০। রাজা, ২৮১, ২৮২, ২৮৪। হাতী-ঘোড়া, ২৮৪। সোনায় বাঁধাবো ডাং, ২৯১। রাজার ঝি, ২৯৩। রাজা কন্যাদান করে, ২৯৫। হাজার টাকার সাড়ি, ৩০৮। সোনালী দাবর, ৩০৮। গজমোতি হার, ৩১০। সদাগরের ঝি, ৩২৮। সরকারের বেটী, ৩২৯। মোহর, ৩৪৫। রাজকন্যা, ৩৫০। কাজলমন্দির ঘরটা, ৩৫৫। দেশের রাজা, ৩৮০।

যে সব ছড়ায় কাহিনীর ঈষৎ ও অস্পষ্ট আভাস এবং টুকরো চিত্র ও চরিত্র আছে, বর্তমান সঙ্কলন থেকে তার নিদর্শন : মা আসছেন ধুঁকতে ধুঁকতে,

৭। ডাঁজো লো কলকলানি, ১১। দাওদা বুড়ি, খোওসা বুড়ি, ২০। সাত সতীন পুড়ে মরে, সতীন মাগী টেরী, ২১। বেনে পাড়া, গয়লা পাড়া, কামার পাড়া, জেলে পাড়া, নাপিত পাড়া, কলু পাড়া, চাষী পাড়া, ৩৫। তোমলার নাওয়া-খাওয়া-শোবার চিত্র, ৩৬। ঝাঁজ-এর চিত্র, ৩৭। দাদায় গেছে বাঘাইপুর, কিনা আন্‌ছে চাম্পা ফুল, ৪৯। বুড়ো বামনের হাড্যা প্যাট, ৫৩। বুড়া গোপাল, ৫৩। বুড়ীর নাম ল্যাজকাটা ডোমরি, ৫৩। চোরা ব্যাটা, ৫৪। বুড়া, বুড়ী, ৫৬। বুড়ীর চরকা, ৬২। জোলা, জুলানীর কাহিনী, ৬৫। রহিমবাবুর কাহিনী, ৬৭। হাড়িয়া নামক চরিত্র, ৬৯। মালিনীর চবিত্র, ৭০গ। ভুঁইমালী মেয়ে, ৭০গ। বামুন ঠাকরুণ, ৭০গ। নাপিত, ৭০গ। মাছ ধরা, কাটা, ধোয়া, রান্না করা, কাহিনীর আভাস, ৭৩ক। স্বর্ণের কনে দেখা, তার বিবাহ-কথা, ৭৫ঘ। হেঁচোড়া ঠাকরুণ লো ক্যাঁচোড়া চুল, ৭৬। গৃহস্থবধূর চিত্র, ৮৮। পান খায় গন্‌নী (কিম্ভূত চরিত্র), ৮৯। গোরক্ষ চরিত্রের বর্ণনা, হাতে নড়ী, মাথায় টিক্, ৯০। মাগী, মুইন্‌সা, ৯০। দোলা বাড়ীত্ চেংড়ীগিলা, ঝাঁপালি পাড়ে ডুবিয়া, ৯৯। পঞ্চ বহিনি, ১০৬। আল্‌সিয়ার চিত্র-চরিত্র, ১১০। ধোপা মাগী, ১২১। মঁউ (মাধু), ১২৩। নধা-নধনী, ১৩৫গ। বড় ঘরের বউ, ১৩৫ঙ। আ্যাংটা খুতুম, বিলাই কুতুম, সাত ছাওয়ালের মা, ১৫৬। বৈষ্ণব ভিখারী, ১৬৬। গাজর মাও, ১৬৯। টাংহা সিপাইটা, ১৭০। দক্তাখাকী ঠকরা বুড়ী, তামুক খেকো ঠক্‌রা বুড়ো, পান্তাবুড়ী, ১৭৪। মতিলাল (চরিত্র) ১৭৮। চোর, ১৭৯। মণ্ডল গেইছে হাট, ১৮৬। ট্যাপেবিমাই, ১৮৮। পাইক, ১৯০। তারার মাও মোতিহারা, ১৯২। সতিনী, ১৯২। ময়না দিদি, ১৯৩। রক্ত পড়ে ছি-র্-র্-র্-র্ করে, ১৯৫। ঘরে নাচে শ্যামসুন্দরী, বাহেরে নাচে বুড়া, ১৯৯। দুয়ার-বান্ধা নড়ীটা দিয়া ঘ্যাগত্ গুতাং, ২০১। ছোটো মামার বিয়াও হচ্ছে, ফুল-টুং-টুং বাইজ, ২০২। মুচিদের বাড়ী, ২০৪। বউ পালাল হুজুর বেলা, ২০৫। ছাগলের মা বুড়ী, ২০৫। বুড়ো খায় গুপ্ গাপ্ ২০৫। বুড়ী মরে ভাদে, বুড়ো মরে খালে, ২০৫। বুড়ো খায় চপাটি, বুড়ী খায় পাঁসটি, ২০৫। ফুল মামুন, ২০৬। কালা কালা চেঙড়ীগিলা নাচেছে, ২০৬। বউ পালাইচে চাদাইকোণা, ২০৯। ময়না বিবি, ২০৯। ময়নার মা, ২১২। নন্দ জামাই, ২১৮। তেইলানীর চিত্র, ২২৯। তাও মানিক জাল বয়, ২৩৫। বাজারে বুড়ী মরেছে, ২৩৮। পাগলা, পাগলী, ২৫৫। চুকারু (ব্যক্তিনাম), ২৫৮। তেলী বুঢ়ী, ২৬১। বজীবুড়ী, ২৬৪খ। ডিংলাকটং চৌধুরী, ২৬৭।

বাম্‌হনী বুড়ী, চণ্ডী বাম্‌হন, মাখাল বুড়ী, ২৬৯। বেটীর নাম চাপো, ২৭০। কামার, ২৭৩। মেথর, ২৭৭। ছাগল দানী, রাখালদানী, ২৭৯। চুটকা বামন, ২৮১। তেলি, ২৮৪। ময়রা বুড়ী, ২৮৬। বুড়ো দাদা, ২৯২। নিধিরাম পণ্ডিত, খেলারাম, মুকুম্বি, কাঁদন (ব্যক্তি নাম), ২৯৪। এনছান বিবি, ৩০১। গেঁড়ী বউ, ৩০৪। মনহুর দাদা বে' করেছে দাঁত-ক্যালানো বৌ, ৩০৬। ভাতারের মেসো, ৩১২। মেজ-মামার বৌ যেন কেমন কেমন করে, ৩১৬। অলিম্মিছারে বাঁধি এইবুগ্যে চিলাদি মইষর, ৩১৭। ছখিম্মিছা কাঁদেন্দে ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌, ৩১৭। মাগী, মিন্‌সে, ৩১৯। হাজার টাকার বউ, খ্যাঁদা নাকের চূড়ো, ৩২৩। এক বউ ছিল কপাটের আড়ে, ৩২৫। হেলা (ব্যক্তিনাম), ৩২৫। মাসী, মেসো, ৩৩৭গ। নাপ্‌তে বউ, ৩৪৫। হালুয়া (চরিত্র) ৩৫১। বেহানী, ৩৫৪। বোষ্টম, ৩৯৮। খোঁড়া, ৪০০।

এইসব দৃষ্টান্তগুলিতে কোনো বিশেষ চরিত্রের কোনো বিশেষ দৈহিক ও অন্যান্য বিশেষত্ব, বুড়ো-বুড়ী, মাসী-মেসো, বামুন-বাম্‌নী, মাগী-মিনসের জোড় বা জুটি, কোনো বিশেষ কাজ বা ঘটনা কাহিনীর আভাস এনেছে। বর্ণ ও বৃত্তিগত কিছু চরিত্রচিত্রও এব এক লক্ষণীয় দিক। লোকসাহিত্যে জুটি চরিত্র খুব প্রাধান্য পায়। এই জোড়-গাঁথা বা জুটি-বাঁধা চরিত্রগুলির মধ্যে বুড়ো-বুড়ীর প্রাধান্য দেখা যায়। বুড়ো-বুড়ীর চিত্র-চরিত্র ধাঁধা ও প্রবাদের মধ্যেও অধিক পরিমাণে দেখা যায়, লোককথার মধ্যে তো বটেই।

পশু-পাখি ও জড় বস্তু এবং জগৎ ও ছড়ার কথাবস্তুর দিককে নির্মাণ করে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশু ও জড় জগৎকে মানবিক নাম-রূপ-গুণ-ভাব দিয়ে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। জড় বস্তু ও জগতের ওপর মানবিক চেতনা আরোপের ফলে তা একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আবার নারীচরিত্র) উঠে কাহিনীর আভাসকে সম্ভাবিত করে। বর্তমান সঙ্কলন থেকে তার দৃষ্টান্ত এই :

ভাঁজো লো কলকলানি, মাটির লো শরা, ১১। গাইর নাম মোনামুনি, ৫৪। বাঘা, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০। হরিণ, সেজা, ৫৭। পঞ্চকোটি ঝি-পুত লইয়া লামছে বাঘিনী, ৬২। খেঁকশিয়াল জামাই হয়েছে, ৬৫। ইচা মাছে লাথ্‌থি দিয়া ভাঙল ছামার দাঁত, ৬৫। কাণ্টায় শিয়াল ফোলে, ৬৮। সোওয়া পক্ষে পানি খায়, ৭২৬। কুয়াল, ৭৪গ। হঁকা (হুঁকো) করে টৌড়োত্‌-টাড়াত্‌, ৭৮। পাট বলে মুই বড় বীর, ৯০। বাঁশের জন্ম কাত্তিক মাস,

৯০। আয় রে দেওয়া ডাকিয়া দৈ-চূঁড়া ঢেং বাধিয়া, ৯৯। বর্ষাকে নারী রূপে দেখা, ১০২। বক মামা, ১১৪। বুলবুল আমার কাকা, ১১৮। বাদুড় বাদুড় মিতা, ১১৯। ঝড় মামা, ১১৬। কাউয়া নানা, ১১৭। রইদানী রে রইদানী চাঁদার মার পুতানী, ১২৩। কোথা হতে এলো ব্যথা, কোথায় তোমার ঘর, ১৩১। গোদা, ১৩৫খ। নাগ্‌-নাগিন্ (নাগ-নাগিণী), ছাডো বাট, ১৩৬খ। পেছু আসছে বীর হনুমান, হাতে লোহার ডাং, ১৩৬খ। ভালুকে গুন কুথা পায়, ভালুকে ত্যাল কুথা পায়, ১৪২। শিয়াল কান্দেছে, ১৫৮। হরিণ কান্দেছে, ১৬১। হাড়গোরল গে হাডগোরল, তোর মাও কোঠে গেইছে, ১৬৯। হাতী মাইয়ে নেথা, ১৭২। আয় রে ভালুক লাপ-ঝাঁপ দিয়োঁ, ১৭৩। ইঁদুর রে ইঁদুর, ১৭৪। বাহনির ভাই বহনি বিড়ালের দুটা চইখ, ১৭৫। ব্যাঙের মাথায় পিদীম জ্বলে, ১৭৬। আয় রে পাখি আয়, কালো জামা গায়, ১৭৭। হনুমানেতে তেঁতুল খায়, ১৭৭। মামাদের শাওড়া গাছে গুন, ১৭৭। শাল বাগানের লাল ফুল, গালাত্ দিলেক বুলবুল, ১৭৮। ও পাখি নাইতে যাবি? ১৮৩। এক শিয়ালী আন্দে বাড়ে, দুই শিয়ালী খায়, ১৮৪। কাউয়ায় আনলেক খ্যাড় খাড়, বগুলায় আ।ন্দল্ ভাত, ১৮৬। কাঠ কাউয়া ঠকাইলেক দাড়ী, ১৯৯। চান ঘুঘু তোরহে দোহাই, ২০২। দুইটা বিলাই জোকার দেয়, ২১৬। একটা কুকুর ঢাক বাজায়, দুইটা শিয়াল সানাই বাজায়, দুইটা হরিণ পালকি উবায়, ২১৬। গাই-এর নাম হাসি, বাছুরের নাম দাসী, ২৩৩। পাব্‌দা মাছের দুটো ঠ্যাং, ২৩৯। এত রাতে এলি কেন্দা, ২৪৬। খারে বেটা খা (জলবিন্দুকে লক্ষ্য করে), ২৪৮। হাতী মামা, ২৫০। ডম্‌না-ডুম্‌নি, ২৫৯। শালিখ নাচে, ২৬৪খ। বাবুই ঠেলা পারে, ২৬৬। বেজীর দলেতে আমি নাচন শিখেছি, ২৬৬। ভালুক লাটাপাটা লো, ২৭৯। খয়রা পাখি তামাক খায়, ৩০৬। আকাশের বুলবুলি পাইক, আমার সোদর ভাই, ৩১৫। পানকৌড়ি. আডায় উঠ্যা না, ৩২৮। কুকুরা নাচে কদমতলা, ৩৩০। বাঘেব মাসী, ৩৩৯। পিরিতের ঢেঁকি, ৩৪৯। বাঘে খাইল্ চুমা, ৩৫৬।

ছড়ার অপর উপকরণ হল মধ্যযুগীয় কাব্যসংস্কার, রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরী, রাম-সীতার প্রসঙ্গ। বৈষ্ণবতার অনুষঙ্গটিই এর মধ্যে প্রধান। বৈষ্ণবতার মধ্যে বালগোবিন্দ, নন্দ-যশোদা ইত্যাদির প্রসঙ্গটি স্থানে-স্থানে খুব প্রাধান্য

পেয়েছে। সবক'টি প্রসঙ্গই ছড়ার কথা-কাহিনীর দিকটিকে পরিস্ফুট করে। তার দৃষ্টান্ত এই :

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে : সং ১ : বৃন্দাবন। গোপাল, চরাও গে বাছুর, ২। বঁধু, ভাব ভাব কদমের ফুল, ৮। বঁধু, কদম, ৯। ধুলোয় দোসর নন্দকিশোর, নন্দরায়, ১৪। কেষ্ট বেড়ান কূলে কূলে, ১৭। রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে, ১৭। মুরলী, ৩৬। তোমার নাচন আমি জানি, জানে না ব্রজাঙ্গনা, ৩৬। গোকুলে গোয়ালা নাচে, পাইয়ে গোবিন্দ, ৩৭। গোপের বালা, ৩৭। বৃন্দাবন, ৪১, ৪৩। সোনার বাঁশি, ৪৪। নন্দকিশোর, ৬৯। খোকো যাবে গাই চরাতে, ৭২। সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব মোহন-চূড়া বাঁশি, ৭২। বনমালী, ৭৫।

গৌরী বেটী কনে, ১৯। জগন্নাথ, ২৩। তাতে বসে পান খান দুর্গাভবানী, ৩১। শিব ঠাকুর বিয়ে করলেন, ৩৪। শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র, ৩৭। অন্নপূর্ণা দুধের সর, ৩৯। মা আমার জটাধারী, বাবা আমার বুড়োশিব, ৫৬। ছেলে ভুলোনো ছড়াতে শৈশব-বিবাহের যে প্রসঙ্গটি মেলে, তার পেছনে গৌরীর বাল্য-বিবাহ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়, কন্যার বিবাহই পুত্রের বিবাহের ছবি আঁকতে প্রাণিত করেছে। গৌরীর বুড়োবর, সেইসূত্রে কন্যারও বুড়োবর কল্পিত হয়।

'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) থেকে . গোপাল, ৬, ৭, ৪২, ১০৭, ১৫৭, ১৬২, ২৫৬, ২৫৭, ৩০৫। নাচে রে বলরাম, ১৪। চূড়া বাঁশি, ৭২। শ্যাম ঠাকুরের নায় (নৌকা বিলাসের ইঙ্গিত), ৭৩। কদম্বের ফুল, ৮১। নীলমণি, ১৩০, ১৭২, ১৯৪, ২৮০। আমার সোনার ঠাকুর, ১৩৪। নাচে যেন ঠাকুরটি ১৪৮। সুবল, ১৬৫। জগন্নাথ, ১৬৬, ১৭৮, ২৬০। নদের ফটিকচাঁদ, ১৮২। মুরলী, ১৮৪। নদেয় আমার বাড়ী, ২৩৮। ঘরে নাচে ·শ্যামসুন্দর, ২৬৫। শ্যামের নতি, ৩০১। গোয়াল পাড়া, ৩১৪। হাতের বাঁশি কেড়ে নিয়ে বলবে মাখনচোরা, ৩১৪। রাধা, ৩২৭। মাখনচোরা, ৩৬৮। কদমতলা, বাঁশি, ৩৬৮, ৩৮১। কালাচাঁদ, ৩৭৫। ঘোষের পাড়ায়, ৩৮০। নন্দগোপাল, ৩৮৬।

আজ দুগ্‌গার অধিবাস, কাল দুগ্‌গার বে, ৮১। গৌরী হেন ঝি (গৌরীর মতো মেয়ে যে), ১২৩। হরগৌরীর মাঠ, '১৬৫। দুর্গাগতি, ৩০১। গৌরী

বেটী কনে, ৩১০। নাচনী গেছে কাচ্‌নী (কোচনী) পাড়া, ৩২১। শিবের গাজন, ৩৫৯। হৈই দুর্গা, তোমার মেয়ের বিয়ে, ৩৭৭।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'যশোর খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন ১৩৭১) থেকে: শান্তিপুরের বাঘ, ১। কদমতলা, ৬,৩৩। বিন্দাবনে গোরু চরাবি, ২০৪। তুলসীমালা, ২০৫। শ্যামপুকুরি ঘাটে, ২৩৬। রাম-সীতের বিয়ে, ৪০। আমার ভাই রামচন্দ্র, ১৫৪।

অধ্যাপক আলমগীর জলীল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (চৈত্র, ১৩৭০) বই থেকে: ওপাল গোপাল, পৃ. ৮। বাঁশি, রাধা, পৃ. ৯। বাঁশীলাল, পৃ. ১৪। কদমগাছ, পৃ. ১৫, ৪৩। বিন্দাবন, পৃ. ৫৮। শ্যামকেলী, পৃ. ৬৬। শিবনতলা, পৃ. ১২। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোক-সাহিত্যে ছড়া' (বৈশাখ, ১৩৬৯) বই থেকে: সোনার নূপুর, পৃ. ২০। কদমগাছ, ফুল, পৃ. ৬৩, ৬৬, ১৫২। বাঁশি, নীলমণি, পৃ. ৭৭। গৌরী, পৃ. ১৪২। ভগবতী, পৃ. ১৪৫।

আমাদের বর্তমান সঙ্কলন থেকে: শ্রীকৃষ্ণের দাসী ৫। বংশীবদন, ৩৪। রাই, ২৪, ২৫, ৩৬। কদম গাছ, ৪০, ৪১, ৪২, ২৮১, ৩৩০। রাধাকৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে, ৪০। বিন্দাবন, ২৪, ১৯০, ১৯৩। কালীদহের কূল, ৪০। গোপ, শ্রীদাম, সুবল, যদুপতি, যশোমতী, নন্দ, যমুনা, বলাই, গোকুল, ৪১। শ্যাম, ৪৬, ১৯৯। আখাল গোপাল, ৫৩। গোয়ালের দই, ৫৯। সাজ্‌না গোঠে রাখাল ভাই, ৬০। ছিদাম, বলাই, কানু, ৬০। রাধা, 'ভিখবানুসুতা', ৬৩। রাধি, কানাই, বাঁশি, গোয়াল পাড়া, ৬৬। কৃষ্ণের দোহাই, ১৩৫। ব্রজাঙ্গনা, ১৩৯। নন্দরাণী, ২১১। রাধে, ৩৪০। বোষ্টম, ৩৯৮।

গৌরী, মহাদেব, ২। দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, ৩। কৈলাস মন্দিরে সতীর গমনাগমন, ৬৪। মেনকা, পাগল জামাই, হরগৌরী, ৬৪। শিবের কানের সোনা, ৭০। শিবশঙ্কর বিয়া করে গৌরী-পার্বতী, ৭০। ভোলা দিগম্বর, মহেশ্বর, উমারাণী, ৮১। শিবের দোহাই, ৯৮। শিবাই, পার্বতী, কার্তিকশর, ১৩৫। গিরিরাজ, ১৩৯। শিবঠাকুর, ১৮২। দুর্গার মাও, ২০৬।

রাম, সীতা, ৩, ৫, ৩৩, ১৩১, ১৩৬। রাম, লক্ষ্মণ, ১৩৫। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, ১৩৯, ২২৩। সীতা রামের খেলা, ২১৫। বনবাস, ৩৪৩।

বাঙলা ছড়ার উপকরণ রূপে কাহিনী-ঘটিত যে সব দিক পাওয়া যায়, ওপরে সঙ্কলিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলি থেকে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই সব পরিবেশই বাঙলা ছড়ার মূল কায়া ও ভাব-বস্তুকে নির্মাণ করে। এর একদিকে পাই রূপকথা ও মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার প্রভাব; অপর দিকে পাই মধ্যযুগীয় কাব্য-সংস্কার, রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, রামসীতার প্রসঙ্গ। আর এই দুইয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি দিক হল, খাঁটি লৌকিক ও বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত চিত্র-চরিত্র ও পরিস্থিতি: ধোপা-নাপিত, ডোম-বাগদী, জেলে মেছুনী, মুচি-ময়রা, বুড়ো-বুড়ী প্রভৃতির চিত্র ও বর্ণনা। এই তিনটি দিক সম্মিলিত হয়ে ছড়ার কায়া ও কথা বস্তুকে প্রধানতঃ নির্মাণ করে,—অন্যান্য দিক অবশ্যই আছে।

ইচ্ছে থাকলেও আর দৃষ্টান্ত দেবার স্থান নেই, ওপরের সঙ্কলনগুলি থেকেও আরো বহু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারত। যাই হোক, এই দৃষ্টান্ত-গুলিতে আমরা যা প্রদর্শন করতে চেয়েছি, পাঠককে তা পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিই: ক. ছড়ার মধ্যে টুকরো চিত্র ও খণ্ড-কাহিনীর শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন, পরবর্তী সকল আলোচকই তার জের টেনেছেন। বিষয়টি অতি পরিচিত বলে আমরা এ নিয়ে কোনো আলো-চনা করি নি। কেবল লক্ষ করেছি, চিত্র ও কাহিনীরেণু ছড়ার কায়া-নির্মাণের (ভাববস্তুর তো বটেই) একটি বড়ো উপকরণ হয়। খ. আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, ওই কথা ও চিত্রেরই একটি প্রসারিত দিক: সেই সূত্রেই রূপকথা ও মধ্যযুগীয় জীবনকে অবলম্বন করে এসেছে তজ্জাতীয় পরিবেশ, নাম, রূপ, চরিত্র, স্থান ইত্যাদি। যতটা পারা গেছে, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হয়েছে। বুড়ো-বুড়ী, ধোপা, নাপিত, জামাই প্রভৃতির কৌতুক ও অসঙ্গতিমূলক চরিত্র-কণাও এই পথ ধরে এসেছে, এরাও বিশিষ্ট উপকরণ। গ. পশু-পাখির ভূমিকা, তাদের মানববৎ আচরণ, বিশিষ্টতা, যা Animal tale-এর দিকটিকে নির্দেশ করে। এই তিন দিক থেকে কথা ও চিত্র কিভাবে ছড়াকে নির্মাণ করে, তাই বোঝাবার জন্যে এই আয়োজন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'খুকুমণির ছড়া' (১৬ শ সং) বইয়ের ৫২-সংখ্যক ছড়াটি (যা ভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া' বইয়ের ১৬৫-সংখ্যক ছড়া) প্রসঙ্গে এই কথা বলছি। ছড়াটির প্রথম পঙ্‌ক্তি হল, 'এক তারা বন্ধন, দুই তারা বন্ধন'

ইত্যাদি। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র মিত্র মশাই 'On an Ao Naga aetiological myth on the origin of the cock's crowing before sunrise' (Quarterly Journal of mythic society of Bangalore : vol XXII, No 1, July, 1931, pp. 97-100) প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন, আও নাগাদের মধ্যে প্রচলিত একটি মিথ্-এর কাহিনীর সঙ্গে উক্ত ছড়াটির একটি নিগূঢ় যোগ আছে। আও নাগাদের মধ্যে চলিত ওই মিথ্-টির মূল কথা এই : সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ সইতে না পেরে একদিন সব মানুষ সূর্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে : এতে রুষ্ট হয়ে পরদিন সূর্য আর উঠলেন না, গোটা পৃথিবীর কাজ-কর্ম অচল হয়ে পড়ল। অবশেষে এক মুরগীর কৌশলে সূর্য আবার উঠতে লাগলেন। এই মিথ্-এর স্মৃতি উক্ত ছড়াটির এইখানে ধরা পড়েছে বলে শরৎচন্দ্র মিত্র মশাই মনে করেন : চন্দ্র গেলেন সূর্যের বাড়ী,/ বসতে দিলেন চৌকি পিঁড়ি।/"বসব না আর পিঁড়িতে।/ মানুষ মরে ভাতে। গোরু মরে ঘাসে, তাই এসেছি তোমার বাসে।/ আমার কথাটি যেন থাকে ;/ কালকের রৌদ্রে যেন বসুমতী ফাটে।"

অর্থাৎ সূর্য আর উঠছেন না দেখে চন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করবার জন্যে সূর্যের বাড়ী গেলেন, এবং তাঁর দেওয়া পিঁড়েতে না বসে মানুষের অসুবিধের কথা বলে এলেন। আও নাগাদের কাহিনীর মুরগীর ভূমিকা এখানে নিয়েছেন চাঁদ। সূর্য ও চাঁদকে ভিত্তি করে এই প্রকারের 'কথা' ভারতের অন্যত্রও মিলেছে। যেমন সাঁওতালদের মধ্যে চলিত একটি কাহিনীতে (দ্রঃ Macphail : The Story of the Santal, P. 20)। কল্পনা করা অসঙ্গত নয়, বাঙলা দেশেও হয়তো একদা এই রকম কাহিনী চলিত ছিল, তারই রেশ ওই ছড়াতে এখনও ছড়ানো আছে।

লোককথা যে 'Broken down myth' বহুদিন আগেই সে তত্ত্ব বানচাল হয়ে গেছে। তারপর কতো নতুন নতুন তত্ত্ব ও মতবাদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ছড়ার মধ্যে রূপকথা ও পশুপাখিকে ভিত্তি করে রচা কথার যে প্রভাব আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এবং এখন শরৎচন্দ্র মিত্র প্রদর্শিত যে মিথ্-টির প্রভাবের কথা বললাম,—এই সব তথ্যকে যেন একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। অনেক ছড়াকেই অর্থহীন ও অসংলগ্ন বলে অনেকেরই কাছে মনে হয়েছে। কিন্তু, যদি কোনো কথা-কাহিনীর পটভূমিকায় তা পড়া যায়, তবে তার অর্থোদ্ধার হয়, অন্ততঃ অসংলগ্ন বলে মনে হয় না। এই ভাবে, এক

পরিত্যক্ত মতবাদের আলোকে, অন্ততঃ তাকে আংশিক ও সীমিতভাবে বাঙলা ছড়ার ওপর পুনরায় প্রয়োগ করে, ছড়ার আন্তর অসঙ্গতির দুর্নাম কি ঘোচানো যায় না? ফল যাই হোক, কোনো গবেষক এ বিষয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

…৯…

ছড়ার কায়া-গঠন ও রূপনির্মিতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ পর্যন্ত যা প্রদর্শিত হয়েছে, তা হল : মিল, অন্ত্যমিল, ঐতিহ্যমূলক মিলের মেলবন্ধন, প্রশ্নোত্তর মূলকতা ও সম্বোধন, কথা-কাহিনী ও মিথের প্রভাবে নানা ধরণের দৃশ্য, ঘটনা, চিত্র, চরিত্র ও পরিস্থিতি রচনার প্রবণতা,—এই দিকগুলিই ছড়ার কায়া ও রূপ নির্মাণে মূল ভূমিকা নিয়ে থাকে।

উল্লিখিত এই সব দিক ছাড়াও অন্যান্য যে সব দিক ও বৈশিষ্ট্য ছড়ার দেহ নির্মাণ করে থাকে, এইবার তার উল্লেখ করা যাচ্ছে। এই সব বৈশিষ্ট্য কেবল ছড়ার বেলাতেই নয়, সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্ততঃ লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য তার প্রমাণ আমি দু'খানি বইতে এর আগে দিয়েছি। বই দু'খানি হল, 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' (গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) এবং 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭)[১]। এই বই দু'টিতে আমি সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের (সঙ্গীতের) রচনা-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছি।

সে বৈশিষ্ট্যগুলি নানা ধরণের, ক্রমে ক্রমে তা প্রকাশ করছি। তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট দিক হল, ভাষা ও ব্যাকরণগত কিছু বৈশিষ্ট্য,—এ দিকটিই বর্তমানে আলোচ্য ও বিবেচ্য। ভাষা ও ব্যাকরণগত এই বিশেষত্বগুলি হল :

১. নামশব্দের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিকৃতি সাধন,

২. কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাব্যিক ব্যবহার,

৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দের নানা বিচিত্র ব্যবহার;

---

১ ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই বই লিখিত হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রায় ১৮ বছর আগে এই দিকগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

৪. পদাশ্রিত নির্দেশকের বিশিষ্টতা ;

৫. শব্দদ্বৈত, প্রতিধ্বনি শব্দ (Echo words), সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ;

৬. কারক-বিভক্তির ব্যবহারে অস্থিরতা ;

৭. অনুসর্গ পদের বিশিষ্ট ব্যবহার ;

৮. অসমাপিকা ও নিমিত্তার্থক অসমাপিকার বিশিষ্ট প্রয়োগ ;

৯. নামধাতুর প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ; ধ্বন্যাত্মক শব্দকে নামধাতু রূপে ব্যবহার ;

১০. কতকগুলি অব্যয় পদের বিশিষ্ট ব্যবহার ;

১১. বাক্য ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট ব্যবহার ; বিশেষ্য বাক্যাংশ (Nominal Phrase) এবং ক্রিয়া বাক্যাংশের (Verbal Phrase) ব্যবহার ;

১২. বিশিষ্ট বিশেষণ শব্দের ব্যবহার ; তিরস্কার, গালাগালি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক উক্তি প্রভৃতি ,

১৩. প্রসারিত ও নবাগত অর্থে শব্দের ব্যবহার ,

১৪. প্রশ্নবোধক ও সম্বোধনাত্মক উক্তি ,

১৫. বাক্যগঠনে Antithesis-এর প্রভাব ,

১৬. উপমার বিশিষ্টতা ;

১৭. যদিও ওপরের বিষয়গুলিতেই অন্তর্ভূত হয়ে গেছে, তবু onomastics অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি-বস্তু-দেশ-প্রাণী-র নামকরণ তত্ত্ব নিয়ে সবিশেষ আলোচনা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার কথা হল, ছড়ার ভাষা মূলতঃ কথ্য ভাষা-ভঙ্গিকেই আশ্রয় করে থাকে এবং চলমান জীবনের সঙ্গে ছন্দ-সঙ্গতি রেখে তা পাল্টে যায় সহজেই। অতীত যুগের শব্দ ও প্রয়োগ কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ এমন কিছু বেশি নয়। দ্বিতীয়তঃ, কথ্য ভাষা-ভঙ্গিকে আশ্রয় করবার জন্তে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার সঙ্গে ছড়ার একটি যোগ অনুভব করা যায়। তৃতীয়তঃ, ওপরে ভাষাগত যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির সমান প্রয়োগ কিন্তু সর্বত্র দেখা যায় না, এর মধ্যেও পরিমাণগত পার্থক্য আছে ; উল্লিখিত দিকগুলো ছাড়া অন্যান্য দিকও আছে। চতুর্থতঃ, এই বৈশিষ্ট্যগুলি, আগেই বলেছি, কেবল

বিশেষভাবে ছড়ারই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নয়,—নির্বিশেষ এবং সাধারণভাবে লোক-সাহিত্যেরই বিশেষত্ব।

এইবার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু নিদর্শন দিই। স্থানাভাবে কেবল নির্বাচিত নিদর্শনই দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ৮১টি ছড়া (রবীন্দ্র রচনাবলী: ষষ্ঠ খণ্ড। পৃ. ৬১২-৬৩১) থেকে:

শব্দের বিকৃতি: বৃথায় (বৃথাই) জীবন, ৪। আঁব-কাঁটাল, ৬। কান্‌ছিলে (কাঁদছিলে), ১২। ধন ধন ধনিয়ে কাপড় দেব বুনিয়ে (মিলের জন্যে, তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করে, আদর প্রকাশের উদ্দেশে 'ধনিয়ে' শব্দ), ৩০। কানছ (কাঁদছ), ৩১। নাল (লাল), ৩৩। আতুল (আদুরে), ৪৭। খাটপালঙ্গ (পালঙ্ক), ৫৪। খোকো খোকো (খোকা খোকা), ৭১। আয় রে চাঁদা, ১৬। খোকনমণি দুধের ফেনি (ফেনা), ২৭। লাল জুতুয়া, ৭৪। লাল নাঠিখান, ৭৯।

পদাশ্রিত নির্দেশক: কোঁদলখানি বাজে, ৫। লাল নাঠিখান, ৭৯।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ: চোখ ঢুলঢুল নয়নতারা, ১৬। উড়ে মেড়ার বাপ আসছে দিদিন্ ধিনা ধিনা, ২১। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, ২৩। উলুকেতু দুলুকেতু নলের বাঁশি, ২৪। হিঙুল করে কড়মড়, ২৩। কামার মাগী কের-কেরাণী, ২৪। সুড়সুড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান, ৩৪। তিল ঝুর ঝুর করে, ৫৬। ঐ আসছে পাখনা বিবি / প্যাক প্যাক প্যাক, ৫৬। খিড়কি দুয়োর কেটে দেব, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেয়ো, ৫৯। খাবি আর কলকলাবি, ৬৭। ঢোকুম্ কুম্ বাজনা বাজে, ৭৯। ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে, ৮০। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশিষ্টতা আছে: এগুলি শব্দদ্বৈত বা দ্বিরুক্ত প্রয়োগ; নামধাতু রূপে ব্যবহৃত (সং ৬৭); অসমাপিকার অনুল্লেখ (যেমন, পাখনা বিবি প্যাক-প্যাক 'করে' আসছে কিংবা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ 'করে' যাওয়া,—এ সব ক্ষেত্রে)।

শব্দদ্বৈত (Re-duplication of words): সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ, প্রতিধ্বনি শব্দ: চোত-বোশেখ, ৪। মাছ ধরেছি চুনোচানা, ১৯। হাজারে-বাজারে, ৩৪। ক্ষীর-খিরসে, ৩৭। খাট-পালঙ্গ, ৫৪। এগুলি সাধারণভাবে বাঙলা ভাষার নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব সমাস হয়ে থাকে কিন্তু লোকসাহিত্যে এর পরও একটি বিশেষত্ব দেখা যায়।

শব্দদ্বৈত মানেই, যে কয়েই হোক, দু'টি শব্দের মধ্যে একটি যোগাযোগ থাকেই। সেই যোগ সম্পর্কটিই আরো নানা বিচিত্ররূপ ধরে এখানে ধরা দেয়। যেমন: সোনা-কুড়ে পড়বি না ছাই-কুড়ে পড়বি (সোনার বিপরীতে ছাই), ১১। চোখ ঢুল্ ঢুল নয়নতারা (চোখ ও নয়ন সমার্থক), ১৬। এপারেতে বেনা, ওপারেতে বেনা, ১৯। কার পেটের দুয়ো, কার পেটের সুয়ো (সুয়ো-দুয়ো বিপরীতার্থক), ২৪। আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর, ৩১। সয়দাবাদের ময়দা, কাশিম বাজারের ঘি (এখানে ঘি-ময়দা সহচর শব্দ, কিন্তু বাক্যের দুই অংশে, দুই স্থাননামের সাদৃশ্যে, তা বিচ্ছিন্ন), ৩৩। এক কন্যে রাঁধেন-বাড়েন, এক কন্যে খান (রাঁধা-বাড়া একদিকে সহচর শব্দ, অপরদিকে বাঁধা-খাওয়াও তাই), ৩৪। তাদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাঁড়, ৩৭। মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি (মা-বাপ এখানে সহচর শব্দ), ৩৯। আগে যায় রে চৌপল, পিছে যায় রে ডুলি, ৩৯। বাম মাছ রেঁধেলি শোলমাছের পোনা (মাছের নাম এখানে বাক্যের দুই অংশে যোগসাধন করেছে), ৪৫। পরের বেটা মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে, ৭৮। এগুলি আসলে পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তির একটি বিশিষ্ট দিক। এই পুনরাবৃত্তি সমভাবার্থক বা বিপরীতার্থক, দু' রকমেরই হতে পারে।

এই পুনরাবৃত্তিরই অপর একটি স্তর দেখা যায়, যখন একই বা সমজাতীয় শব্দের একাধিকবার আবৃত্তি ঘটে। এই আবৃত্তি দু' বারের হলে তাতে গুরুত্ব বিশেষ পরিমাণে থাকে; তিনবারের হলে, তাতে বৃত্তের ভাব আসে। কিছু উদাহরণ এই: মাসি পিসি বনগাঁ বাসী, ১। মাকে দিলুম···বাপকে দিলুম, ১। কে মেরেছে, কে ধরেছে, কে দিয়েছে গাল, ২। মারি নাইকো, ধরি নাইকো, বলি নাইকো দূর, ২। কানে দেব···কোমরে দেব···গড়িয়ে দেব, ২২। ঘর নিকুচ্ছেন···নৌকা সাজাচ্ছেন···ঘড়া ডুবাচ্ছেন, ৫৬। কান্‌ছিলে,··· মাখছিলে,···ডাকছিলে, ৫৭। নিশির কাপড় খসিয়ে দেব···বাটা ভরে পান দেব···খিড়কি দুয়োর কেটে দেব, ৫৯। কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে, ৭৯। ক্রিয়াপদের এই পুনরাবৃত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে পুনরাবৃত্তি দু' রকমের। একই শব্দের অবিকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি, কিংবা তার বিকৃত পুনরাবৃত্তি,—সহচর শব্দের নিজস্ব নিয়মে যারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। 'তিন' বার আবৃত্ত হবার মধ্যে যাদু-রহস্য ও শৃঙ্খলার ইঙ্গিত আছে।

এই পুনরাবৃত্তির প্রসারিত দিক হল Antithesis.—পুনরাবৃত্তির মধ্যে যেমন বিকৃত ও অবিকৃতভাবে অভিন্ন বা সমধর্মী শব্দের আবৃত্তি দেখা যায়, Antithesis-এর মধ্যে তেমনি একই ওজনের বা পরিসরের দুই বাক্য বা বাক্যাংশকে বিন্যস্ত করে একটি সাম্য-সমতা-সামঞ্জস্যের আবৃত্তি সৃষ্টি করা হয়। এখানে বলা যায়, ধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'দিকে বিন্যস্ত করা, কিংবা অর্থকে দু-আধখানা করে দেখা। এই দুই অর্ধ আবার কখনো প্রশ্ন এবং উত্তরও হতে পারে। দৃষ্টান্ত এই :

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে : শতদলের মাঝখানে। সেখানে পুঁটু কী করে : চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে, ৩। ধন ধোনা ধন ধোনা : চোত-বোশেখের বেনা (এখানে প্রথমার্ধ অর্থের চেয়ে ধ্বনি-প্রধান, দ্বিতীয়ার্ধ সেই ওজনের অর্থময় শব্দমালা), ৪। ধন বর্ষাকালের ছাতা : জাড় কালের কাঁথা। ধন চুল বাঁধবার দড়ি : ছুড়কো দেবার নড়ি (এখানে দুটো অর্ধেই অর্থবহ শব্দমালা), ৪। হোক কোঁদল, ভাঙুক খাড়ু, ৫। সরু সুতোর কাপড় দেব, ভাত রেঁধে খেয়ো, ৫। বাটা ভরে পানদেব, গাল ভরে খেয়ো (অতঃপর এই ছড়ার পরবর্তী সাতটি পঙ্‌ক্তিই Antithesis-এর উদাহরণ), ৫। তেমনি ৯-সংখ্যক ছড়াতেও পরপর তিনটি Antithesis : ও বেগুন কুটো না, বীচ রেখেছে। ও ঘরেতে যেয়ো না, বঁধু এয়েছে। বঁধুর পান খেয়ো না, ঝগড়া করেছে। কী করে কুটব, চাকা-চাকা কবে (প্রথমাংশ প্রশ্ন, পরবর্তী অংশ উত্তর), ১০। টাঁকশালেতে চাকরি করে ঘুঘুডাঙায় ঘর (প্রথমাংশে কর্মস্থান, দ্বিতীয়াংশে বাসস্থান), ১৯। তুমি নেও কলসী কাঁকে, আমি নিই বন্দুহাতে, ৩২।

Antithesis-এরই আর একটি দিক হল 'এক' বা 'একটি' শব্দ দিয়ে বাক্যের দুই অর্ধ রচনা করা : এক পাথর কলা পোড়া, এক পাথর ঝোল, ২৫। এক বাড়িতে দই দিব্য, এক বাড়িতে চিঁড়ে, ৩১। এক কন্তে রাঁধেন-বাড়েন, এক কন্তে খান, ৩৪। একটা নিলে কিঁয়ের মা, একটা নিলে কিঁয়ে, ৭৯। একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলে টিয়ে, ৮০। এই রকম 'দুই' দিয়েও হয়ে থাকে : দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে, ৭৮।

পুনরাবৃত্তি, শব্দদ্বৈত, Antithesis-এর বিভিন্ন দিক,—এই সব মিলিয়ে যে মনস্তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়, তা হল একটি সংহতি-ঐক্য-বন্ধনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা ; এক শব্দ বা ধ্বনিকে আর এক শব্দ বা ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করা, কিংবা সমপ্রাধান্য প্রদান করা, কিংবা বাক্যের এক অংশের সঙ্গে

অপরাংশের যোগ-সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে।উভয়াংশকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলা। এই ঐক্য ও সংহতি বোধ লোক-জীবনের আসল থেকেই আগত বা সংগৃহীত। যে সংহতি বোধের ফলে পরস্পরের হাত ধরে অখণ্ড বৃত্ত রচনা ক'রে কিংবা পরস্পরের কোমর ধরে সরলরেখা রচনা ক'রে লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়; কিংবা আলপনা ও ব্রতচিত্রের মধ্যেও প্রতিফলিত হয় যে প্রতিসাম্য রচনা করবার প্রবণতা,—তাই ভাষাতেও ধরা পড়ে। সংহত সমাজবোধই যে লোকসাহিত্যের উৎস, এই ভাবেও তা পরিস্ফুট হয়।

এই একই প্রেরণা ও প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয় যখন দেখা যায় একই শব্দ এবং তার জের পর-পর উল্লিখিত হয়ে একটি ছড়ার পঙ্‌ক্তিগুলিকে বেঁধে ফেলছে। যেমন, ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি (সং ২৩) ছড়াটিতে : দামুদর··· দামুদর; হিঙ্‌লা গাছে · হিঙ্‌লা করে; জগন্নাথ · জগন্নাথের; চাল কাঁড়ি · চাল কাঁড়তে, ভাত খাওসে ··ভাতে পড়ল; কোদাল দিয়ে · কোদাল হল। দেখা যাচ্ছে, প্রতি জোড়া পঙ্‌ক্তি এক-একটি শব্দের আবর্তন দিয়ে গাঁথা ও বাঁধা; পূর্ববর্তী বাক্যের বা পঙ্‌ক্তির শব্দই পরবর্তী বাক্যে বা পঙ্‌ক্তিতে পুনরাবৃত্ত হয়ে প্রতি জোড়া পঙ্‌ক্তিকে একটি সংহত একক-এ পরিণত করে তুলেছে। লক্ষ করবার বিষয় এই, প্রতি পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তি নিবিড় শব্দ-বন্ধনে বাঁধা, কিন্তু প্রতি জোড়া পূর্ববর্তী শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তী শ্লোকের (দুই পঙ্‌ক্তির) যেন প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তাই বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেও অস্পষ্ট ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক যোগ আছে। তা ভাবগত দিক বলে, এখন ভাষার আলোচনায় আলোচ্য নয়।

একটির সঙ্গে আর একটিকে যোজনা করবার এই প্রয়াস অনুসর্গ শব্দ-গুলিতেও ধরা পড়ে। সাধারণ অনুসর্গ শব্দগুলির তুলনায় লোকসাহিত্যের অনুসর্গ শব্দের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত যে পূর্ববর্তী পদটির পরে স্থাপিত হয় অনুসর্গটি, সেই পূর্ববর্তী পদটির একটি রহস্যময়তা, বিশিষ্টতা বা গুরুত্ব থাকে, কখনো বা তা একটি প্রতীকও হতে পারে। পূর্ববর্তী পদটিকে এই মূল্য বা গুরুত্ব দেবার পর, তার নীচে-ওপরে, মধ্যে-ভেতরে, কাছে-দূরে, ভেতরে-বাইরে—অন্য বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করবার প্রয়াসের ফলেই অনুসর্গ শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ লোকসাহিত্যে দেখা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত এই :

আধকাঠা চাল দেব গালের ভিতরে (যে গালে আধ কাঠা চাল ধরে,

তা সাধারণ নয়), ২। জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে, ১৭। হাঁড়ির ভিতর ধনে, ১৯। ডুলকির ভিতর পাকা পান, ২৫। ছাতির উপর কোম্পানী, ৪৯।

এই প্রসঙ্গেই ষষ্ঠী বিভক্তির বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করতে হয়। অনাবশ্যক ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ লোকসাহিত্যে বেশ দেখা যায় (অনুসর্গের জন্যেই কি এটি ঘটে ?)। নিদর্শন এই :

কিনে দেব ঝালের নাড়ু (ঝাল নাড়ু), ৫। লাল গোলাপের ফুল (গোলাপ ফুল), ৩৩। মর্তমানের কলা (মর্তমান কলা), ৩৭।

কারক-বিভক্তির বৈচিত্র্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সপ্তমী বিভক্তিতে বিভক্তি-হীনতা এবং চতুর্থ বিভক্তির অর্থে 'কে'র ব্যবহার এর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য। যেমন, 'জলকে যাবি', 'বনকে যাব', 'খোকা আসুক ঘর।'

অন্যান্য বিশেষত্বগুলি এই : বিশেষ ধরণের বাক্য ও বাক্যাংশ : আমন দোলা, ১। সোনার গতর, ২। বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই, ৬। দেবতা এল জল, ১৮। আগুন লাগুক মাছে, ১৮। যে ঘরেতে রাঙা বউ সে ঘরেতে চুরি, ১৭। কে যাবি রে কামার-সাগর, ২৪। কোন্ সোহাগের বউ, ৩১। লক্ষ টাকার মলমলি থান, ৩৩। খোকার গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল, ৪৬। হাড়ি ডুগডুগানি উঠান-ঝাড়নি মণ্ডা খেকোর বউ, ৬০। খোকা খোকা ডাক পাড়ি, ৫৮। নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি, ৬১। বাগ্‌ধারা, ইডিয়ম, কথ্য ভঙ্গি, মেয়েলি ভাষা, বিশেষ স্থানের নাম, বস্তুর নাম, ইত্যাদি এর মধ্যে আছে।

লোকসাহিত্যের ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে কোথাও কোথাও অকারণ ও অনাবশ্যক detail-এর কাজ দেখা যায়। 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) বইয়ের ভূমিকায় এক সময়ে লিখেছি : "মার্জিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে যে সকল উক্তি ও প্রত্যুক্তি, কথা ও কাজ, দৃশ্য ও ভাবানুষঙ্গ, চলন ও ভঙ্গিমা উহ্য রহিয়া যায়, কিংবা অনাবশ্যক বোধে অনুক্ত থাকে অথবা, অশোভন ও অ-রসময় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়,—লোকসঙ্গীতের বর্ণনাভঙ্গির এমনই বিশেষত্ব যে, সেই সকল তুচ্ছ, অনাবশ্যক ও অ-রসময় অংশকেও গানের মধ্যে পরম আন্তরিকতায় স্থান করিয়া দেওয়া হয়" (পৃ. ১৮৯)। ছড়া সম্পর্কেও এই মন্তব্য খাটে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ থেকে তার উদাহরণ :

গোয়াল থেকে কিনে দেব দুধওলা গাই, ৬। ২৭-সংখ্যক ছড়ার শেষ

চার পঙ্‌ক্তি। এখন কেন কানছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে, ৩১। তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে, ৩১। দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে, ৭৮।

এক দিকে খুঁটিনাটির প্রতি এই আগ্রহ, অপর দিকে তেমনি বাক্যের কোনো কোনো অংশ আবাব অপূর্ণই থেকে যায়, কিংবা অস্পষ্ট। যেমন, খোকোমণি দুধের ফেনি ভাবলোর ঘি / খোকোর বিয়ের সময় করব আমি কী, ২৭। এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থ কি? দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সহায়তায় তার অর্থ এই করা যায়: দুধের ফেনার মতো শরীর যে খোকার, তার বিয়েতে 'ভাবলো' ভরা ঘি এসেছে। আর একটি উদাহরণ: আতা গাছে তোতা পাখি দালিম গাছে মউ, ৫৫। এখানে তোতা পাখির পব 'আর' বা 'এবং' থাকলে বাক্যটি স্পষ্টতর হত। এই সংক্ষিপ্ততাই ধরা পড়ে যখন দুই শব্দ মিলে তাকে ঘনবদ্ধ একটিতে পরিণত করবার প্রয়াস দেখা যায়: ওঠো'সে, কোটো'সে, দেখ্'সে, শুন্'সে প্রভৃতিতে।

স্থানাভাবে অনান্য উদাহরণ দিতে পারা গেল না। যাই হোক, এবাব যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

শব্দের বিকৃতি: ব্যাম্মুন, ৩। দুদু (দুধ), ৪১। বে (বিয়ে), ৫৭। যোতুক, ৬৮। খেলার সাজু (সাজ), ২৭৫। ঠাকুরা (ঠাকুর), কুকুরা (কুকুর), ৩২৫। বেড়ু (বেড়ানো), ৩৬৮। দিনেরেতে (রাতে), ৩৮৯।

পদাশ্রিত নির্দেশক: ভাতটি খেলে পেটটি সোজা,/পানটি খেলে আরো মজা, ৩৩১। 'ভাতে'র সঙ্গে 'টি'র যোগ লক্ষণীয়।

শব্দদ্বৈত: চৌধ্‌রী বাড়ীর মৌধ্‌রী পিঠা, (চৌধ্‌রীর সঙ্গে অর্থহীন, প্রতিধ্বনি 'মৌধ্‌রী'), ৪৪। ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল (একই শব্দের তিন বার অবিকৃত রূপে আবৃত্তি), ৬৫। থাল পেলুম, গাড়ু পেলুম ('পেলুম' অবিকৃত রূপে দুবার আবৃত্ত হয়েছে, তেমনি থালা ও গাড়ু সহচর শব্দ), ৬৮। একটি ধানে দুইটি তুষ ('একে'র পর 'দুই,' এই মিল এখানে কার্যকরী হয়েছে), ৬৯। বড় শাঁখাটি, ছোট শাঁখাটি ঝামুর ঝুমুর করে (স্বরধ্বনির বিকৃতি-জাত, ধ্বন্যাত্মক সহচর শব্দ 'ঝামুর-ঝুমুর' এবং প্রতিচর শব্দ বড় ও ছোট), ৮১। আজ দুগ্‌গার অধিবেস, কাল দুগ্‌গার বে (আজ ও কাল প্রতিচর শব্দ, তেমনি অধিবাস ও বিয়ে পারম্পর্য-মূলক অনুষ্ঠান), ৮১। আতুড় বাতুড়

চালতা বাহুড়, কলা বাহুড়ের বে ('বাহুড়' তিনবার আবৃত্ত ; তিন পর্বে পঙ্‌ক্তি বিভক্ত, প্রতি পর্বেই 'বাহুড়ে'র পূর্বে একটি করে শব্দ বসে 'বাহুড়' শব্দের সঙ্গে ধ্বনির প্রতিসাম্য রচনা করেছে ; 'আহুড়' নিরর্থক ধ্বনি), ১২৫। ঠিক এই একই রকমের উদাহরণ : অদল বদল বংশীবদন, ১৩২। খাটপালন, ১৩৪। বাড়া ভাত গুছন-গাছন, ১৫৬। সোনার আচীর, সোনার পাচীর, সোনার তিনপাট দেওয়াল (তিনবার 'সোনার,' পঙ্‌ক্তির তিন পর্বেই প্রথমে আছে শব্দটি, তারমধ্যে প্রথম বার নিরর্থক ধ্বনি দিয়ে প্রতিসাম্য রচনা করা হয়েছে), ১৭৮। এরণ ভেরণ (ব্যক্তিনামেও শব্দ-দ্বৈত), ২০৫। কিসের জন্যে কাঁদ রে যাদু / কি না দিতে পারি (এই পঙ্‌ক্তি অবিকৃত রূপে দুই স্তবকে আবৃত্ত হয়েছে, এ হল পঙ্‌ক্তিগত পুনরাবৃত্তি, শব্দগত আবৃত্তির প্রসারিত দিক, গানে যেমন Refrain বা ধুয়া, এখানেও যেন তেমনি), ২১৯। আগে যায় গাড়ী ঘোড়া, পিছে যায় হাতী (আগের বিপরীতে পিছে, এবং গাড়ীঘোড়া সহচব শব্দ), ২২৬। কালি ঘোটন, কালি ঘোটন / সরস্বতীর পায়, ২৩৭। আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে আছে ভালো, ২৫৩। ননীর গোপাল, ননীর শরীর, নধব নধর গা ('ননী' ও 'নধর' শব্দের আবৃত্তি, কিন্তু তফাত আছে : দুটি শব্দই অবিকৃত রূপে দুবার আবৃত্ত হয়েছে ; কিন্তু দু'বার ননী শব্দের প্রয়োগ অব্যবহিত নয়), ২৫৭। ঘরে নাচে শ্যামসুন্দর, বাইরে নাচে বুড়া (ঘর-বাহির বিপরীতার্থক, 'নাচে' শব্দের আবৃত্তি এতে সংযোগ সাধন করেছে), ২৬৫। কাল যাব বাড়ি পরশু যাব ঘর (এখানে পারম্পর্য হল বাড়ি-ঘরের এবং কাল পরশুর), ২৯৩। আতাল পাতাল সাম্‌লা সাতাল (পর-পর দুবার সমধ্বন্যাত্মক শব্দ, মাঝখানে অন্য ধ্বনির শব্দের পর, আবার পূর্ব ধ্বনির শব্দ), ৩০১। এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ (এপার ও ওপার বিরুদ্ধতামূলক, 'ঢেউ' অবিকৃত হয়ে দু'দিকেই আবৃত্ত), ৩০৬। ঠিক এই একই রকমের দৃষ্টান্ত : এ পারেতে বেণা, ও পারেতে বেণা, ৩১০। এটিও তাই : আয় তো ভোঁদড়, যায় তো ভোঁদড়, ৩১১। আয় ঘুম, যায় ঘুম, নেত্‌ড়া পেত্‌ড়া (তিন পর্বের মধ্যে প্রথম দুই পর্বে বিপরীতার্থক শব্দ ও একই শব্দের আবৃত্তি ; কিন্তু তৃতীয় পর্ব ধ্বন্যাত্মক শব্দ, সহচর শব্দের মতো), ৩২৫। একা বুড়ী, দোকা বুড়ী, তেকা বুড়ীর ছাও (সংখ্যার ক্রমান্বয়িকতা ও পারম্পর্য, তিন পর্বেই 'বুড়ী' শব্দের আবর্তন, কিন্তু তৃতীয় পর্বের 'বুড়ী' বিশিষ্টতাপূর্ণ), ৩৪২।

সোনার কৌটা রূপোর খিল, ৩৫৫। উপর কানে পিপুল পাতা, নীচের কানে ফুল, ৩৫৭। আয় ধুব্ড়ি, ছায় ধুব্ড়ি, ধুব্ড়ি আমার গায় (এখানেও তৃতীয় পর্বের 'ধুব্ড়ি' বৈশিষ্ট্যময় ও পৃথক), ৩৬৬। বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান, ৩৬৭। নাক কাটবো, চুল ছাঁটবো, করবো গাঙের পার, (তৃতীয় পর্বের ভিন্নতা লক্ষণীয়), ৩৮৯।

ওপরে নানা ধরণের শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সরল-সহজ সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দগুলিই হল এর প্রধান উপকরণ। এইগুলোকেই নানাভাবে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করে শব্দ-দ্বৈতের প্রয়োগ ও ব্যবহারের মধ্যে আনা হয় বৈচিত্র্য এবং জটিলতা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন: একটি শৃঙ্খলা, একটি পারম্পর্য, একটি ধারা বা নিয়মের অনুসরণে শব্দ-সজ্জা ও শব্দ-বিন্যাসের মাধ্যমে একটি বস্তুময় রূপ বা দেহ নির্মাণ। তাই হল ছড়ার মূল রচনাকৌশল। সেই নির্মিতিটিকে যেন চোখ দিয়ে দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরা-ছোঁয়া যায়।

শব্দদ্বৈতকে ভিত্তি করে যে সব রূপ নির্মিত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল হল দু' ধরণের রূপ-নির্মিতি: যে সব ক্ষেত্রে নিরর্থক ধ্বনিকে অর্থময় শব্দের সাহচর্য প্রদান করা হয়, এবং যে সব ক্ষেত্রে তিন পর্বের পারম্পর্যের মধ্যে তৃতীয় পর্বের পার্থক্য ও বিশিষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। উদাহরণ আগেই দিয়েছি।

শব্দদ্বৈতের একটি সহজ-সরল দিকের উল্লেখ এইবার করি। এটি আসলে 'একানুপ্রাস' বা 'ছেকানুপ্রয়াস'। অনুপ্রাস তো ধ্বনিরই অনুবৃত্তি, কাজেই শব্দদ্বৈতের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এর নৈকট্য ও অভিন্নতা লক্ষিত হয়ে থাকে। 'খুকুমণির ছড়া' থেকে কিছু উদাহরণ এই:

আসুক তাঁতি বিকুক সুত, ২২৪। পাকাল মাছের কাঁকাল সরু, ২৮৫। সরল পথে তরল গাছ, ২৯০। এচক বেগুন পেচক হবে, ৩০০। মিথ্যাবাদী কলার কাঁদি, ৪০২। দৃষ্টান্তগুলির বাক্য দু' ভাগে বিভক্ত: ধ্বনি-সাদৃশ্য সেই দুই ভাগের মধ্যে এনেছে যোগসূত্র। ধ্বনি আবার দু' রকমের: অর্থময় ও অর্থহীন। যেমন, 'এচক-পেচক'। কখনো দেখা যায়, একটি ধ্বনি অর্থময়, অপরটি নিরর্থক।

দুই অর্ধে বাক্যকে বিভক্ত করা, এবং সেই দুই অর্ধের মধ্যে সমতা বা প্রতিসাম্য রচনা করা (যা পুনরাবৃত্তির প্রসারিত দিক) এখানে মূল মনস্তত্ত্ব

রূপে কাজ করে। এটাই জটিল ও প্রসারিত হয়ে আর এক ধরণের প্রতিসাম্য রচনা করে, যা আসলে Antithesis. কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :

ভাত হতেছে কড়কড়া, ব্যান্নন হল বাসি, ৩। চিকণ বাঁশের দুলনী মোর, কেয়াকৃ বেতের বান, ১০। সোনা নাচে কোনা, বলদ বাজায় ঢোল, ১১। ডালিম গাছে পরভু নাচে, তাক্ ধুমাধুম বাদ্দি বাজে, ৯৬। চালে আছে চাল কুমড়ো, শিকেয় আছে ঘি, ১২৬। গাড়ু ভরে জল দাও, প্রাণ ভরে খাই, ১৭২। মাটির চাঁদ নয়, গ'ড়ে দেবো :/গাছের চাঁদ নয়, পেড়ে দেবো (এটি পুনরাবৃত্তিও বটে), ১৭৭। তালগাছেতে হুম্বুর-মুম্বুর, বাঁশ গাছেতে থানা, ১৮২। ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান্,/কেলে ভূতের ঠ্যাং (এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থহীন ধ্বনিগুচ্ছকে অর্থময় পরবর্তী পঙ্‌ক্তির বিপরীতে রেখে প্রতিসাম্য স্বষ্টির চেষ্টা), ১৯৯। উদ্বিড়ালে ক্ষুদ খায়, চালে নাচে ফিঙ্গে,/ পুঁটিমাছে গীত গায়, মাগুর বাজায় শিঙ্গে (দুই পঙ্‌ক্তিতে এখানে একটি করে Antithesis), ২০৮। ঠিক একই ব্যাপার এই দৃষ্টান্তটিতেও পাই, কিন্তু এখানে দ্বিতীয়াংশ দু'টি প্রথমাংশ দুটির তুলনায় হ্রস্ব হলেও প্রতিসাম্য বিনষ্ট হয় নি : শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খৈ,/মোটা মোটা সব্‌ড়ি কলা, কাগমারি দৈ, ২২০। পরবর্তী এই উদাহরণটিতে দেখা যায়, দু'টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম পঙ্‌ক্তির Antithesis-টির দুই অর্ধ সমান, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির Antithesis-এর দুই অর্ধও প্রায় সমান,—কিন্তু প্রথম পঙ্‌ক্তির তুলনায় দীর্ঘতর : রোদ বেটা রাজা, মানুষ করে তাজা ; / আগুন বেটা কুইড়া, মানুষ দেয় না ছাইড়া, ২৩৯। তথাপি এখানে সাম্য রক্ষিত আছে। মা হয়ে জল দেন, তৃষ্ণা ভরিয়ে / বাপ হয়ে গরু দেন, পাল ঢাকিয়ে, ২৭১। হৈরে বাবুই হৈ, রাঙা ধানের খৈ (প্রথমাংশ নিরর্থক ধ্বনিগুচ্ছ মাত্র), ২৭৬। মামী কাটে সরু সুতা/মামা কাটে পাট, ২৯৫। মেয়ে দেবো সাজিয়ে, টাকা নেবো বাজিয়ে, ৩১৫। ৩২০-সংখ্যক ছড়ার সবটাই এ বিষয়ের উদাহরণ। তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা/আমরা হলুদ কোথা পাব ? আমরা উল্টো রথে যাব (পর-পর দু'টি Antitiesis), ৩৩৩। হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ী (এখানে 'হাড়-মাস' এই সহচর শব্দই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে Antithesis-এর মধ্যে দৃঢবন্ধনের সৃষ্টি করেছে), ৩৪৫। বাপ ব'লেছে 'আয় আয়', মা ব'লছে 'থাক্,' ৩৯২।

ওপরে যে সব Antithesis-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছি, বিশ্লেষণ করলে তার

মধ্যে মান। বিভাগ ও বৈচিত্র্য চোখে পড়বে। সবগুলোর গঠন একই রকমের নয়। তবে, মূল উপকরণ রূপে এখানেও আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ ; কচিৎ অর্থময় খাঁটি Antithesis-ও মেলে। এছাড়া আছে পুনরাবৃত্তি-মূলক Antithesis, আকৃতির হ্রস্ব-দৈর্ঘ্যঘটিত Antithesis, ইত্যাদি।

Antithesis-এর মধ্যে 'এক' বা 'একটি' শব্দ, গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় : একখানা কুলো মাঠে, একখানা কুলো ঘাটে (মাঠ-ঘাটের সহচরত্ব লক্ষণীয়), ১১২। একদিকে রে বেগুন ভাজা, একদিকে রে ঝোল (বেগুনভাজা ও ঝোল দুইই খাদ্য, এবং তাইই দুই অংশের সংযোগসাধক), ১৮৭। এক নৌকা আলো চাল, এক নৌকা ঘি (এখানে ঘি ও আলোচাল সংযোজক) ৩৭০।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও তার দ্বিরাবৃত্তি লোকমানসের একটি বড়ো দিক, লোকসাহিত্যেও তার প্রয়োগের পরিমাণ বেশি। মার্জিত কথ্য ভাষাতে এর প্রয়োগ থাকলেও লেখ্য সাহিত্যে এর প্রয়োগ সেই তুলনায় অনেক কম। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অমার্জিত ভাষাতেই বেশি দেখা যায়। কেন অমার্জিত মানুষের ভাষাতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিমাণ বেশি ? এর দুটি কারণ : প্রথমতঃ, ভাষাকে স্পষ্ট ও যথাযথ করবার শব্দের অভাব ; দ্বিতীয়তঃ, এটাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিক, বর্ণনার মধ্যে ধ্বনিকে প্রাধান্য দেওয়া যেন বর্ণিতব্য বিষয় ও গৃহীত ধ্বনিকে পরস্পরের প্রতিরূপ করে একটি প্রতিসাম্য রচনার প্রয়াস। অর্থহীন ধ্বনি বা তার দ্বিরুক্তিটি যেন বর্ণিতব্য বিষয়ের ঠিক প্রতিচিত্র ; অর্থাৎ বর্ণিতব্য বিষয়টিকে বস্তুগত ও শারীরকরূপে উপস্থাপনার প্রয়াস, সেই concrete দিকটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা। আবার, ধ্বনিটি যেন বর্ণিতব্য বিষয়ের ঠিক সমান মাপ ও ওজনের একটি দিক, যেন দুটি দিক সমান হয়ে একটি Graphic Symmetry রচনা করে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই : খোকা খাবে সাপুর সুপুর, বৌ কুড়োবে পাত ('খাওয়া'র প্রতিধ্বনি ও প্রতিচিত্র 'সাপুর সুপুর' ; পরবর্তী অংশ এরই Antithesis), ২৬। খোকা দুধ খাবে ঘট-ঘট্, পুষু আসে খট্ খট্, ৩৭। মাটির পুতুল নটর পটর, পিঁপড়ে ধরে ছাতি, ৪০। ডালিম গাছে পরভু নাচে / তাক্ ধুমাধুম বাদ্দি বাজে (ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও Antithesis), ৯৬। তাক্ থুড়াথুড়্ থুড়া./ভাঙ্লো খাটের খুরা, ১১৬। কলা পড়ে দুপ-দাপ, বুড়ী খায়

গুপ্ গাপ (এখানে 'পড়া' ও 'খাওয়া' শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য, তারসঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও Antithesis), ১৩৩। বৈরাগী ঠাকুর টংটং/কাউট্টা খাইতে বড রং, ১৭৫। ফটর ফটর চলে, ২৪৩। ঢোল বাজে গামুর গুমুর, সানাই বাজে রইয়া, ২৭৫। হুম্ হুম্ হুম্—গুম্ গুম্ গুম্—ডালে বসেছে (এখানেই স্পষ্টই তিন পর্ব, পুনরাবৃত্তি এখানে সমদৈর্ঘ্যের পর্বের, প্রথম দুই পর্বে ধ্বন্যাত্মক শব্দের সমতা), ২৯০। নিছক বা বিশেষত্বহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির উদাহরণ দিলাম না। কিন্তু লক্ষ করতে হবে, ছড়ার মধ্যে যে 'ত্বরিত চিত্র' দর্শন করা হয়েছে, তা তড়িৎবেগে সর্ব প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দযোগেই রচিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের পর অসমাপিকা 'করে' শব্দ প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুল্লিখিত থাকে। যেমন, 'বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্'; এর পর 'করে' থাকলে বাক্যটি পূর্ণ হত। কিন্তু ওই অপূর্ণতার ফলেই বর্ণনাটি একটি অখণ্ডতা ও সংহতি পেয়েছে।

বর্ণনার ভাষাতে দ্রুততা, সংক্ষিপ্ততা, মাঝে মাঝে শূন্যতা, তার ফলে ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতা, প্রভৃতি সত্ত্বেও শব্দ ও বাক্যের বিশিষ্ট প্রয়োগের ফলে সবের মধ্যে সংযোগ-পারম্পর্য-শৃঙ্খলা রক্ষা করে একটি অর্থ ও বস্তুগত রূপ নির্মাণই ছড়ার মূল লক্ষ্য। রূপ নির্মিতির মধ্যে প্রতিসাম্য (symmetry) রচনার দিকে ঝোঁক সবচেয়ে বেশি। তার-ই জন্যে শব্দদ্বৈত, নানা ধরণের Antithesis, ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়।

সংযোগ রচনার মধ্যে কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গের একটি ভূমিকা থাকে। বিভক্তিহীনতা, বিভক্তির অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ—এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। তবে, অনুসর্গের ভূমিকা কারক-বিভক্তির চেয়ে বেশি। কিছু উদাহরণ দিই: চাঁদের মাঝে গোপাল (অর্থাৎ গোপালকে, দ্বিতীয়া বিভক্তি অনুল্লিখিত) ছড়িয়ে দেব (এর ফলে অর্থের দিক থেকে যতই অপূর্ণতা ও অস্পষ্টতা থাকুক না কেন, একটি বিভক্তি চিহ্ন না থাকায়, দুটি শব্দের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে গেল, সামগ্রিকভাবে দ্রুতভাবে বাক্যটি শেষ করা গেল, একটি সংহত ভাব অর্জন করা গেল), ৬। খোকন মেরে খুন করি, ১৫২। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি অনুপস্থিত। এই একই কারণে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন অনুল্লিখিতই থেকে যায় বহুশঃ। অনুসর্গশব্দগুলি সংযোজনের কাজটি সুন্দরভাবে পালন করে: তারি তলায় (তিল গাছের তলায়, তিলগাছের সঙ্গে মা-কে সংযুক্ত করা) মা আমার লক্ষ্মী-প্রদীপ জালো, ৩৩। ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ,

ট্যাপের ভিতর ঝিঙে, ৯৫। ঝুবকোর ভিতর পাকা পান, ১০৬। খুরোর উপর খাটখানি, তার উপরে যাদুমণি, ১৪৭। তার উপরে ব'সে আছেন জয় জগন্নাথ শেয়াল, ১৭৮। খড়ের উপর উঠল পানি, ১৮০। তারি মাঝে বসে আছে শিব সদাগর, ২২০। বেণীর আগায় সোনার ঝাঁপা, ২২৭। তার তলা যে আমার খোকন বিয়ে করতে যায়, ২৬৭। সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা, ২৯০।

ভাষার সাধারণ নিয়মে অনুসর্গ শব্দ তো থাকবেই, কিন্তু নিছক অনুসর্গ শব্দই এখানে উদ্দিষ্ট নয়। অনুসর্গ শব্দের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ধ্বন্যাত্মক ও সহচর শব্দ যেখানে থাকবে ; আগে ও পরে বর্ণিতব্য বিষয়বোধক শব্দটির একটি অসাধারণতা বা বিশিষ্টতা থাকবে, তবেই অনুসর্গ শব্দের উদ্দিষ্ট ভূমিকাটি বোঝা যাবে।

যাই হোক, আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি তা হল—দ্রুততা-সংক্ষিপ্ততা-শৃঙ্খতা সত্ত্বেও সংযোগ ও অখণ্ডতার দিকটিকে ভাষা-ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই জন্যেই দুই শব্দকে এক করে, ঘন করবার চেষ্টা,—এক ধরণের সন্ধির অনুসরণ। যেমন, হলুদ বাটসিয়ে (এসে বাট)। এই একই কারণে নামধাতুর প্রয়োগ-বাহুল্য , নাম শব্দকে ধাতুরূপে ব্যবহার করে ধাতুকে বর্জন করা, অর্থাৎ একটি ঘনবদ্ধতাকে অর্জন করা। যেমন, ছাল পড়ে ঝুর্‌ঝুরিয়ে, মাটি পড়ে খ'সে (এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত), ১০২। এই রকম : কাকটা মরে কড়্ কড়িয়ে, বৃষ্টি এল চড়্ চড়িয়ে ২০৩। টুনটুনিয়ে টুনটুনালো, ইন্দুরে বাজায় খোল, ২২৮। চড়্‌বড়িয়ে বেত মারলে পড়্‌পড়িয়ে যায়, ৩৬৬। লক্ষ করা প্রয়োজন, সব ক'টিই আবার Antithesis-এরও উদাহরণ।

বাক্যের প্রথমে সংযোগমূলক শব্দের ব্যবহারও এই একই কারণে। যেমন অনুসর্গ শব্দগুলি বাক্যের ভেতরে অবস্থান করেই পূর্বাপরের সংযোগ সাধন করে, তেমনি সংযোগমূলক শব্দগুলি দুই বাক্যের সঙ্গে যোগসাধন করে। দৃষ্টান্ত এই : তাতে দেবো (পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত কাপড়ে) হীরের থোপ, ১০০। সেই বেঙ্‌টা পচলো (যে ব্যাঙটা পোড়ানো হয়েছে), ৩৫০। সেই ফুলটি রয়ে গেল, ৩৭৮। এই সর্বনাম জাতীয় ক্রিয়া-বিশেষণগুলি সংযোগ রক্ষার একটি বিশিষ্ট উপকরণ।

ছড়ার মধ্যে বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ খুব দেখা যায়। এগুলিরও গঠনে

বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা লোকমানসেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। কয়েকটি নির্বাচিত বিশেষণ এই : কুলোকানী, মূলোদাঁতী, খ্যাব্‌ড়ানাকী, ১৩। ঝাপটাকাটা মুখনাড়াটা, ৮৬। ভ্যাংকাঁদুনে, ২৪৪। ভেচ্‌কা মুখী, ৩৪৩। ড্যাম্‌রাচোখো, ৪০১। সব ক'টি বিশেষণ দৈহিক বিশেষত্ব নির্দেশক। সব ক'টিই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কোনোটি সমাসের আভাস-যুক্ত। প্রত্যয় যোগ করে যেন 'বিশেষ' এবং 'রূপময়' করবার চেষ্টা। সমাসের ফলে, ব্যাস বাক্যের দৈর্ঘ্য বিলুপ্ত হয়ে, সমস্যমান দুই পদের ঘনবদ্ধ একতা লাভ।

এই ঘনবদ্ধ সংক্ষিপ্ততা উপমার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। কয়েকটি উপমার নিদর্শন উপস্থিত করছি : ছেলেটার চিংড়ে নাচন, চিংড়ে নাচন, (চিংড়ির মতো নাচন), ১৫৬। এখানে যেমন অপূর্ণতা, তেমনি অপরদিকে আছে অতিশয়োক্তি : 'একানোড়ে'র মূলোর মত দাঁত, কুলোর মত পিঠ, কান দুটো 'যোটা যোটা,' চোখ দুটি আগুনের ভাঁটা, ২। সোনা হেন রংটি তাহার,/ ঠোঁটে আলতাগোলার ঢেউ, ৬৩। জামাজোড়া দেখতে কেমন ?—শিমুলে ফুটেছে ফুল লাল পারা যেমন, ১১৮। খোকা যখন হাসে, মুক্তা যেন ভাসে,/ যখন খোকা হাঁটে রক্তে চরণ ফাটে, ১৮৯। এই অতিশয়োক্তিমূলক উপমাগুলি আসলে উজ্জ্বল ও খণ্ড চিত্র রচনা করে। চিত্র রচনা কংক্রিট দিককে নির্দেশ করে,—এই কংক্রিট বস্তুরূপ নির্মাণই ছড়ার লক্ষ্য। অতিশয়োক্তি সাধারণ বর্ণনার মধ্যেও দেখা যায়।

বাক্যরচনা ও বর্ণনাভঙ্গিতেও অপূর্ণতা-অস্পষ্টতা দেখা যায়। একদিকে পর-পর বাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করা, অপর দিকে একটি বাক্যের ভেতরেই অপূর্ণতা—এই দুই দিক মিলিয়ে আনে একটি ঘনবদ্ধতা। প্রতীক-সঙ্কেতের বোধও এই কর্মের সহায়ক হয়। দু'একটি নিদর্শন এই : আমার ছেলে আমার কোলে,/গাছের পাখী গাছের ডালে (মায়ের কোলে যেমন ছেলে গাছ-মায়ের শাখা-কোলে তেমনি পাখি, অথচ স্পষ্ট করে তা বলা নেই), ১৭৯। উলু উলু মাদারের ফুল, বর আসছে কতদূর ? বর আসছে বাঘ্‌না পাড়া... ২০৯। এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে, অথচ তা পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় নি। সাধারণতঃ ফুল বিয়ের প্রতীক হয়, এখানে মাদারের ফুল এবং উলু ধ্বনি বিয়েকে নির্দেশ করছে। কিন্তু বর বাঘ্‌না পাড়া 'দিয়ে' বা 'হয়ে' বা 'থেকে' আসছে, তার কোনো উল্লেখ নেই। এটিকেই বলি অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতা। এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে/গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন

করে, ৩৪৫। টুকটুকে লঙ্কাগাছের মূল অর্থটি না বুঝলে বাক্যটিকেও বোঝা যাবে না। লঙ্কার রঙটুকু যেমন বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর, ভেতরটা তেমনি, ঝাল। শ্বশুর বাড়ীটাও তাই। সেই কারণেই 'মন কেমন' করা।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি, বাক্যাংশের ব্যবহার, আতিশয্যমূলক উক্তি, বিশিষ্ট স্থানের নাম, সংখ্যার উল্লেখ, কথ্য ও মেয়েলি ভাষা-ভঙ্গি, প্রভৃতিও ছড়ার রূপনির্মাণের সহায়ক। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : মুচকি হাসি মুখখানি, হাজার চুমা, ১। লক্ষ টাকার ছেলে, ৭। আঁধার ঘরের মাণিক, ১১। হট্টমালার দেশ, ২৫। তারা হিরেয় দাঁত ঘষে, ২৫। নিদন্তের হাসি, ৩৬। সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব মোহনচূড়া বাঁশী, ৬২। চূড়াবাঁশী, ৭২। খোকা আসছে বিয়ে করে সঙ্গে ছ'শ ঢোল, ৮৩। সাত শ' ব্যাঙে কীর্তন করে, ১০২। তখন শেয়ালনী ঝেড়ে বাঁধে চুল, ১১০। সাধের নূতন তরকারি, ১১৯। কাল নয় আমার কেলে সোনা, ১২০। চোখ খাক তোর মা বাপ, চোখ খাক তোর খুড়ো, ১২৩। খাট-পালনে ঘুম যায় (ঘুমোয়) ষষ্ঠীঠাকুর, ১৩৪। বাঁশ পাতাটি নড়ে চড়ে, ১৩৫। অলকমণির কপাল পুড়ে হল ছারখার, ১৪৪। এমন খোঁপা বেঁধে দেব হাজার টাকা মূল, ১৫৪। ওই আসছে, ওই আসছে মাঠ আলো করে, ১৭২। হলদেগুড়ির মাঠে, ২০২। দেখ্ শত্তুর চেয়ে, ৩২২। হাতী চড়ে ডঙ্কা মেরে যাবেন নাচবাড়ী, ৩৯৪।

আমাদের ইচ্ছে ছিল, সব ক'টি ছড়া-সঙ্কলনের ছড়া নিয়ে বিস্তৃতভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু স্থানাভাবে তা সম্ভব হল না। কেবল রবীন্দ্রনাথ এবং যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলন নিয়ে আলোচনা করতেই অনেক পাতা ব্যয় হল। উল্লিখিত সব বিষয়ের উদাহরণও হয়তো এই দুটি সঙ্কলন থেকে মেলে নি। তবে, আশা করছি, আমাদের বক্তব্য এতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যে কারো পক্ষেই এখন আমাদের বক্তব্যকে অন্য যে কোনো ছড়ার ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

এইবার আমাদের বর্তমান সঙ্কলনের কথা বলি। এই সঙ্কলনে বাঙলা দেশের প্রায় সকল অঞ্চল থেকেই ছড়া প্রদত্ত হয়েছে, কাজেই সকল অঞ্চলের ভাষাও এতে কিছু-কিছু পাওয়া যাবে। ছড়ার ভাষা সমকালীন মানুষের মুখের ভাষা, উপভাষার প্রভাব তাই এতে সহজেই পড়ে। কিন্তু উপভাষার আলোচনা ও ছড়ার ভাষার আলোচনা এক নয়। উপভাষার আলোচনাও আমাদের দেশে এমন কোনো উচ্চস্তরে গিয়ে পৌঁছায় নি যে তারই নিরিখে

আলোচ্য ছড়ার ভাষা আলোচনা করা যাবে। এখন পর্যন্ত আমাদের গবেষকগণ কোনো 'Dialect geography' তৈরি করে উঠতে পারেননি, কাজেই কোনো বিশেষ ঔপভাষিক প্রয়োগ ঠিক কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত তারও কোনো বিবরণের মাধ্যমে, একটি বিশেষ ভূখণ্ডের লোকগোষ্ঠীকে শনাক্ত করা সম্ভব নয়।

শুধু ছড়াই নয়, লোকসাহিত্যের সকল শাখাতেই এক বিশেষ ভাষা ব্যবহার করা হয়। এক বিশেষ ভঙ্গি আছে সে ভাষার। এমনি করেই তৈরি হয় Folk speech. এই Folk speech এবং উপভাষা কিন্তু সর্বাংশে এক নয়। অনেকেরই ধারণা এই দুটোই বুঝি অভিন্ন। কিন্তু তা ভুল। দুয়ের মধ্যে অনেকখানিই মিল আছে বটে, কিন্তু সর্বত্র নয়। উপভাষা প্রধান বা মূল ভাষার সঙ্গে একটি যোগ রক্ষা করে চলে, কিন্তু লোকভাষা (Folk speech) লোকমনস্তত্ত্বকেই ফুটিয়ে তোলে,—যদিও উপভাষা ও লোকভাষা বহুশঃ অভিন্ন। ছড়ার ভাষা-ভঙ্গি বিচার করতে হবে উপভাষার আলোকে নয়, লোকভাষার নিরিখে। উপভাষা বাঙলাব বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে, কিন্তু লোকভাষা বিশ্বের সর্বত্র মোটামুটি একই লোকমনস্তত্ত্ব দ্বারা গড়া।

লোকসাহিত্যের সকল শাখাতেই অল্পবিস্তর লোকভাষার ব্যবহার হয়, কিন্তু পরিমাণে বোধহয় ছড়াতেই বেশি। সুরের জন্যে লোকসঙ্গীতে এবং দৈর্ঘ্যের অভাবের জন্যে ধাঁধা-প্রবাদে লোকভাষা প্রয়োগের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

লোকভাষার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ থাকে। ধ্বনি, ধন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত কিছু দেহভঙ্গি (ভাষায় যা প্রতিফলিত হয়), অনুকার ও অনুকরণাত্মক শব্দ, প্রভৃতির কথা এর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অনেক ভাষা-বিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষের নানা প্রকার আবেগ প্রকাশক এবং কোনো দৃশ্য-ঘটনার অনুকরণাত্মক ধ্বনিগুলিই হল ভাষা-সৃষ্টির উৎসস্থল। এক-একটি ধ্বনি এক-একটি সুস্পষ্ট অর্থ-নির্দেশক হয়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। এখনও বয়স্ক মানুষেরা তাদের কথাবার্তায় নানা ধ্বনি ও ভঙ্গির অনুকরণ করে থাকে। আদিম মানুষের ভাষা ছিল 'Gesture language'—নানা ভঙ্গি করে, অনুকরণ-অভিনয় করে অপরকে মনের ভাব ব্যক্ত করা হত। এরই একটি দিক 'Gesture-sound,' গলার স্বরের বৈচিত্র্য ও অভিনয় এখানে একত্র হয়ে যায়। 'Gesture-action'

এবং 'Gesture-sound' মিলে সৃষ্টি হয় সাধারণ স্বাভাবিক ভাষা (Natural language)। শিশুর সঙ্গে মা বা ধাইয়েরা, মূকবধিরেরা, বিদেশীদের সঙ্গে আদিবাসীরা এখনও এই ভাষাতেই কথা বলে থাকে। সুতরাং ধ্বনি ও অভিনয়ের এই ভাষা চিরকাল জীবিত থাকবে।

লোকমানসকে বলা হয় আজকের আধুনিক মানুষের তুলনায় অপরিণত শিশুবৎ, তাই চিরকাল শিশুর মনের সঙ্গে লোকমানসের সাদৃশ্য থাকবেই। শিশুর ভাষাতে ধ্বনি, অনুকরণ ও অভিনয় প্রধান, অতএব লোকভাষাতেও তাই। ধ্বনি ও অভিনয়ের ভাষাতে অনেক সময়েই বাক্যের Syntax পর্যন্ত বদলে যেতে পারে। Edward B. Tylor তাঁর 'Anthropology' (vol. 1. P. 96, 1937 Ed.) বইতে এ বিষয়ে দু'টি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, 'সবুজ বাক্স' বোঝাতে এই অনুকরণ-অভিনয়ের ভাষায় আগে একটি বাক্স দেখানো হবে, পরে ঘাস-পাতা ইত্যাদি দেখিয়ে সবুজ রঙকে নির্দেশ করা হবে। ফলতঃ বাক্যটি দাঁড়াল, 'বাক্স সবুজ'। তেমনি 'বেড়াল ইঁদুর মারে' এটি বোঝাতে প্রথমে দৌড়োদৌড়ি প্রদর্শন করে ইঁদুরের ইঙ্গিত, তারপর ধীরে পা ফেলে বেড়ালের ইঙ্গিত,. শেষে ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার অভিনয় করা হবে। বাক্যের দিক থেকে হয়ে গেল : ইঁদুর বেড়াল মারে !

আমরা মনে করি, ধ্বনি ও অভিনয় লোকভাষাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে, এবং এজন্যেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ এতে এতো বেশি। শব্দদ্বৈতের প্রয়োগও অভিনয়ের দিককেই তুলে ধরে। দ্বিরুক্ত শব্দ শব্দের প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট অর্থ অপেক্ষা একটি ভাব ও দৃশ্যকেই পরিস্ফুট করে, এবং তারই অভিনয়-আভাস তাতে ধরা পড়ে। 'আমার বড়ো শীত করছে' এই বাক্যে শীতের কোনো ছবি নেই, কিন্তু 'আমার বড়ো শীত-শীত করছে', এতে শীতের ভাবটিকে দেহভঙ্গির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে শীতের একটি চিত্র মূর্ত করে তোলা যায়। এই অভিনয় করে শীতের চিত্রকে মূর্ত করাই ছিল প্রাথমিক দিকের ভাষার লক্ষণ। অর্থাৎ ভাষার সম্পদ যেখানে নেই, বক্তাকে সেখানে শ্রোতার সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলতেই হয়, নইলে মনের ভাব পূর্ণ ও যথার্থ রূপে ব্যক্ত করা যায় না। কখনো ধ্বনি দিয়ে, কখনো দেহভঙ্গি করে তা দেখানো হত। এই দেহভঙ্গি থেকেই অভিনয়ের প্রয়োজনে দ্বিরুক্ত শব্দের উদ্ভব হয়েছে। দ্বিরুক্ত শব্দ চিত্র আনে, সেই চিত্রকে দেহভঙ্গি ও অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ দেয়। দ্বিরুক্তশব্দের পশ্চাৎ

পশ্চাৎ অতঃপর সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দাবলী এসে পড়ে। সবেরই উদ্দেশ্য এক : চিত্র ও অভিনয়। এই জন্যে দেখা যায়, ছড়াতে এক দিকে যেমন আছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দের দ্বিরুক্তি (শব্দ থেকে বাক্যের পুনরাবৃত্তি এসেছে), অপর দিকে প্রায় সব দেশের ছড়াতেই (বাঙলা ছড়াতে বেশি পরিমাণে) আছে দেহের নানা ভঙ্গি ও তার বিবরণ-চিত্র। যে কোনো বাঙলা ছড়া বিশ্লেষণ করলেই দেখি, এমন কতগুলি ভঙ্গির বর্ণনা আছে, যা না দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, অনেক সময় যেন কতকটা অনাবশ্যকভাবেই তা প্রদত্ত হয়। 'অনাবশ্যক' বললাম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা 'অপরিহার্য', ওই বর্ণনা-চিত্রগুলিই ছড়ার শোভা ও সম্পদ। এইভাবে অভিনয় ও অনুকরণের ভাষাগত দিক ছড়ার দেহ-নির্মাণে একটি বড়ো দিক হয়ে ওঠে। ছড়ার শেষাংশও লক্ষণীয়। অনেক ছড়ারই শেষে একটি Action বা Folk-gesture[১] থাকে। এই Action ও gesture শেষে কর্ম ও অভিনয়ের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ দিক বটে, কিন্তু ভাষা ও বর্ণনার মধ্যেও পরোক্ষে তা প্রতিফলিত হয়।

লোকভাষার অপর বিশেষত্ব হল নামকরণে ও নামচয়নে, যাকে বলে onomastics,—মানুষের, স্থানের, মানবেতর প্রাণীর, জড় পদার্থের নামকরণ তো আছেই, এ ছাড়া আছে অন্য যে কোনো বিষয়ের ও বস্তুর নামকরণ ও নামচয়ন। অনেক সমাজতাত্ত্বিক দিক এর পেছনে খুঁজে মেলে। লোকভাষার অন্যান্য বিশেষত্ব পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এইবার প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে এসবের দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমেই ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং তা অবলম্বন করে অন্যান্য দিকের উদাহরণ দিচ্ছি :

ঘরের ঘটি বাটি ঝলমল করে, আলনায় কাপড় দলমল করে, ৪। সোনার কলসী টলমল, ৬। জল ঝমাঝম্ (করে), ঘর গমাগম গম্ (করে), ১২। বামুন ঠাকরুণ খল্‌খল্ (করে) হাসে, ১০। কো কো কো (এই ধ্বনিটিই একটি পাখিকে নির্দেশ করছে। ধ্বনি এখানে অর্থের বিকল্প), ১০৭। জগতমালা ইলি ঝিলি, পান্তাভাত প্যাড়প্যাড়া, খেড়্যা বাড়ী খ্যাড় খ্যাড়া, ৫৩। নও জোড়া পাখিরে ইকর বিকর, ৫৪। কড়কড়া ভাত, ৫৬। হাম্বুর হুম্বুর করে রব, ৫৮। উঠ উঠ সুয্যিমামা ঝিকিমিকি দিয়া (করে) ৭০। গনগনা ভাত, ৮৮। কানা

১ Gesture scholarship অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি নিয়ে আলোচনাকে নৃতত্ত্বের পরিভাষায় kinesics বলে।

খড়িটা ঝুমুর (করে) বাজে, ৯৮। আয় রে পানি ঝিম্‌ঝিম্ (করে), ১০০। কুড়ুর কুড়ুর (করে) চাবানে, ১২৩। ফিরা কাটি ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ (করে), ১২৫। আহাত্তি-অহমুত্ত-থপ্ থপ্-থপর্-থপর্ করে পা, ১৩২। স্বর্গে হুড় হুড়্, ১৩৬। ঝম্‌ঝুম্ কপাট, ১৪১। ফিক্ করে হাসে, ১৪৬। জলে কড়্ কড়্, ১৬২। টুম্বি বাজাঃ টুম্বুং (এই বিশেষ শব্দ করে), ১৬৬। মুকুর-মাকার (করে) খাঃ, ১৬৬। ছোয়া নাচাও মুই খেত্তেই খেইয়া, ১৬৭। উমুর ঝুমুর করি নাচিবে, ১৬৯। টোকোরাই ঝুমঝুম, ১৭১। মাও কান্দেছে নাটুঙ্‌টু, ১৮৭। অক্ত পড়ে ছি-র্-র্-র্-র্ করো, ১৯৫। ফুল্ টুং-টুং ,বাইজ, ২০২। হাত ঝুমঝুম, পা ঝুমঝুম, ২১৫। ডিং-ডিংগা-ডিং (করে) কিসের বাদ্যি বাজে, ২৩৭। ঠাকুমা বলে টাক-ডুমা-ডুম, ২৩৮। কান্দে কেইনং—কহাকহা (করে), ২৭২। হাড়ার হুড়ুর বাজে কি, ২৮৫। ময়রা বুড়ীর ছানা কাঁদ্‌ইছে—কঁক্‌কঁক্, ২৮৬। কইনা কান্দে গুমুর গুমুর (করে), ২৯৮। ছখিম্নিছা কাঁদেন্দে ঝর্-ঝর্-ঝর্, ৩১৭। আম তলায় ঝামুর-ঝুমুর, ২১৮। বাকুম-বাকুম (করা) পায়রা, ২২৮। বাচার বুচুর (করে) ডুব পাড়ে, ২৪৮। ফিঙ্গে রাজা টিম্ টিম্, ২৪৯। মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাডে নোটোব পোটোর (কবে), ২৫৮। বানিয়া রাজা ঢুলঢুল (করে) কাঁপে, ২৬৩। একখান কুঞ্চি হ্যাঁকা-ব্যাঁকা, ২৭৩। হুকুড়-গুড়ুম দে, ২৮১। ইলির-মিলির-ঝিলির কাঁটা, ২৮৩। ভালুক লাটা-পাটা লো, ২৮৫। ডুব-ডুবি (বাত্ত), ২৯২। খট্ খট্ (করে) খড়ম পায়, ৩০৬। হাঁটতে লাগে ঝিমুক-ঝামুক, দেখতে লাগে শোভা, ৩০৮। মাগী চোটেচাটে চিঁড়ে কোটে, ৩১৯। চ্যারার মাটি দলদল (করে), ৩৩০। মাসীর বড়ো টস্, মেসোর বড় টস্, ৩৩৭। বেজে করে থল্ থল্, ৩৮৯। লাগল ধুম গুড়ুম-গুড়ুম, ৪১১। ভৃঙ্গী চলেন পিছে ধুতুম-তুতুম করি, ৪২১। সেইলী হেসে কুটি কুটি (হল), ৪৩০। শুচুনী রাগে হইল্ টং, ৪৩১। ময়নাকোনা টেউ টেউ করে, ৪৩২। ধ্যাপের-ধ্যাপের করে, ঘ্যাচের-ঘ্যাচের করে, ৪৩২। টুনিকোনা টিউটিউ করে, ৪৩২ (পা. টী)। ইতি-ঝি পুরুর-পুরুর, ৪৩৯।' ইড়্‌কি বিড়্‌কি টাম টিড়্‌কি, ৪৪৩। ভাড়েয়া রে ভুড়ুং, ছোয়ার বাদে চাউল ভাজ্জিলো নিজে কুড়ুং কুড়ুং (করে খাচ্ছিস), ৪৪৫। ফুৎ করি উড়াইল্ তিতিলি পাখি, ৪৪৬। ছেৎ প্যাং তের, ৪৪৮। পেটের আগুনে করডে করডে হজম করিম, ৪৭৬। Two men ধাপুস্ ধুপুস্ (করে), ৪৮৮।

এইসব দৃষ্টান্তে দেখা যাবে, ধ্বন্যাত্মক শব্দের সকৃৎ ও দ্বিত্ব প্রয়োগ ; বিশেষণ

ও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে তাদের প্রয়োগ; ক্রিয়াবিশেষণ রূপে 'করে' প্রায়শঃই উহ্য থেকে গেছে। যেমন, চাউল কাঁড়াঙ মুই চিক্কিৎ চাকাৎ, অর্থাৎ বিশেষ ধরণের শব্দ 'করে' চাল কাঁড়াচ্ছি। ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্ত প্রয়োগের কালে বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বিকৃতি ঘটে কখনো, কখনো একই শব্দ অবিকৃতভাবে দু'বার আবৃত্ত হয়,—এসব ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সবগুলির মধ্যে ধ্বনির মাধ্যমে চিত্রের আভাস আছে। জড়, চেতন—উভয় প্রকার পদার্থের সঙ্গেই তা ব্যবহৃত হয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দকে নামধাতু রূপে ব্যবহার করা উপভাষার ও লোকভাষার এক বড়ো বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ এই : গঙ্গমায়ে কুলকুলিয়ে চায়, ৬। ঝম্-ঝমাইয়া টাকা পড়ে, ৪৭। দুই চোখ কড়মড়ায়, ৫৬। যেত্‌কে হালুয়া কিচ্‌কিচায়, ৩৫১। নট্‌পটেয়া, ঝট্‌পটিয়া, টিপ্‌টিপাও, ৪৪১। ছাগলটা আরো মেল্‌মেলায়, ৪৪২। কেনে নট্‌ফটাইস্‌ কান, ৪৪৬। কাটারী খেকেরেয়া কাটিম, ৪৭৬। তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে, ৫০৬। ছুল্‌ছুলিয়া পড়ে ঝড়ি, ৯৯। চিচ্চিবাইয়া রইদ তোল্‌, ১২৩। মড়া নাচে কিচ্‌কিচায়, ডাইনী নাচে ঘিচ্‌ঘিচায়, ১৩৬। ঢ়াঁড়াসাপ ফ্যাপ্‌পেয়া উঠিছে, ১৮৮।

পরিমাণ বোঝাতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্ত প্রয়োগ মেলে : ওপারেতে কদম গাছটি কদম ঝুরঝুর করে, ৩৯। ওপারেতে কদমগাছ ঝুরোঝুরো ফুল, ৪২। নাউ ফলিসে গিরাগির্‌, ৯১। দাদার ঘরের বগোরিগিলা ঝুম্‌ঝুম্‌ করি ফলিছে, ১৯৭। নিমগাছটা নিম ঝোর্‌-ঝোর্‌ করে, ২৮৪। সব কটিতেই গাছ ও ফলের উল্লেখ আছে। জিহ্বার সুখে নডবড়াইম, ৪৭৬।

শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ : সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ : ভাতে-পুতে সে বাড়ে, ৮। গঙ্গা-যমুনা পূজ্জান, চন্দ্র-সূর্য পূজ্জান, ২১। জল-তুলসী, ২৪। ঘি মৌ-মৌ করে, ৩১। আয়না-চিরুণ, ৩৭। মাই-বাপু (মা-বাপ), ৭১। কাঁদার-গুঁজুর করো, ২২৬। চল রে ছানা-পুনারা, ২৩৩। আপন-থাপন ঝি-মউটা, ২৮১। ইছিয়া-বাছিয়া লইল সোনার কাইকন খানি, ৩০৮। আচুরি-বিচুরি কেশ করিল লড়া-লড়া, ৩০৮। ভাত-কাপড়, ৩১৮। চাল-চিঁড়ে, বোঁচকা-পিঁড়ে, ৩১৯। ঢেমন-ঢোসড়ের জাত, ৩২৭। মা-মাসী, ঝি-জামাই, ৩২৭। ঘিত-মধুর বাসে, ৩৩৪। ধান কাপাসে ঘর আলা, ৪৯৯। গঙ্গা গুকু গুকু, ৬। মা আসছে ধুঁকতে ধুঁকতে, ৭। টুয়েরি থড়গোছা করছে লোছা-গোছা, ৫৪। সাতদিনকার মরা ধেনু পাড়ে নোড়াহুড়ি, ৬০। দুই চোখ খাইয়া যেটী

আন্দিকুন্দি ভাই, ৬২ (পা. টী)। সরুয়া মরুয়া ছুটি ফুল, ১০৭। দুধে-ভাতে, মইচ্ছে-মাংসে, ঘির্‌তে-ভাতে, ৭১। লিখিয়া লো পুকিয়া লো, ৭২। বাড়ীর ভিতর না রে হাটু-গুটু পানি, ৭২। ধাক্কা-ধুক্কা, ৭৩। ঢুবুল ঢুবুল সরস্বতী নড়ে না চড়ে, ৭৫। মেঘ-মেঘালি, ৭৯। আরের ধান নটাপটা, ১০৪। বেটার মুখ করিছে ঝাঁকবাঁক, ১৩৫। ঘুম-ঘুমালী, ১৪০। আলনা-মালনা খায়েঁ ভালুক বনকে পালায় যায়, ১৪২। একেলায়-দোকোলায়, ১৬২। গাঙের পানি ইতল পিতল (উথাল-পাথাল), ১৬৯। কাঁপেকুপে নিমের ডাল, ২৬৩। ফুল থোঁপাথোঁপা, ২৭৩। গায়ের মাটি চাকাচাকা, ৩০৫। আলুর পাতা থালু থালু, ৩০৫। নদীর পারের ধুলধূলা মাটি, ৩২৯। কলা বুনলাম সারি সারি, ৩৩৩। এলপাতা বেলপাতা, ৪১৯। খঞ্জনী পাখী আইচ্চে ঠাঁইঠাঁই, ৪২৬।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে নানাভাবে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ দেখা যায়। সাদৃশ্য ও ঊদ্বভাব বোঝাতে একই শব্দের পর-পর দুবার আবৃত্তি , প্রথম বা দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন, কিন্তু অপরটি অর্থময় ; অর্থময় শব্দটির স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির বিকৃতি-জাত অপর শব্দ , অসমাপিকা শব্দের দ্বিরুক্তি, ইত্যাদি দেখা যায়। এরও লক্ষ্য কোনো দৃশ্য বা চিত্রকে বিস্তৃততর করা।

আগেই বলেছি, আদিম মানুষের ভাষাতে Gesture এবং sound প্রধান ভূমিকা নেবার জন্যে এখনও ছড়ার ভাষাতে ধবনি ও দেহভঙ্গির উল্লেখ মেলে। ধ্বনির উদাহরণ ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দে এবং কিছু পরিমাণে শব্দদ্বৈতের মধ্যে পাওয়া গেল। এইবার দেহভঙ্গির উদাহরণ দিই :

দোলায় আসি দোলায় যাই, ১। স্বামীর কোলে পুত্রের কোলে মরণ হয় যেন, ১। বিউলীর ডাল বর্ণ হব, দূর্বার মত লতিয়ে যাব, ৩। আজ কেন আমার শীতল পা, ৫। পায়ে আলতা মুখে পান, পাটবস্ত্র পরিধান, ৫। মা আসছেন ধুঁকতে ধুঁকতে, ৭। দাওদা বুড়ী, খোওসা বুড়ী, ২০। আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়, ২১। সতীন মাগী মর্তে যাচ্ছে ছাদে উঠে দেখি, ২১। বাসি গোবর খাসি খুসি, ২১। ছোটো মরায়ে পা দিয়ে বড়ো মরায়ে হাত দিয়ে, ২৪। চাল ক'টা তুই রাঁদ্‌ গো সখি, ভাত ক'টা তুই খাই, ২৪। কড়ির চুবড়ি মাথায় করে ছুতোর বাড়ী যাই, ২৪। গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি, ২৫। কোথায় ছিল ননদিনী, গালে মারিল কিলা, ৩২। সাত সতীনের মুখটি পুড়ে, ৩৩। সরার উপর জল রেখে তাতে ডুবে মরি, ৩৩। তোষ্‌-তোষ্‌না কাঁধে ছাতি, ৩৬। আজে গাজে গঙ্গার

খালি তুলে তুলে খাই, ৩৬। সোনার গাড়ুতে রাই মুখ ধুইসে, ৩৬। ডাহিন হাতে তেলের বাটি কানে কদম্বের ফুল, ·· কালিদহে গিয়ে রাধা খুলে দিলেন কেশ, ৪০। একটা বুড়ি মাথে বসে পথে লয়ে একখান ডেলে, ৪১। ডালে ডালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা, ৪১। ৪৩-সংখ্যক ছড়ায় মাতা-পুত্রের বেশ-বাস ও জীবনযাত্রার ছবি। খ্যাঁতা স্থাও উড়্যা যাই, ৫২। বুড়ো বামনের হ্যাঁড়্যা প্যাট, ৫৩। খায় আর মোচড়ে দাড়ি, ৫৪। সোনা রায়, সোনা রায় মুখে চাপ দাড়ি। হেলিতে ছুলিতে গ্যালা গোয়ালাজির বাড়ী, ৬০। কাঁদে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া নোটা, ৬০। ভিজে কেন্ লো গায়ের বসন, এলো কেন কেশ, ৬৩। চোক্ষ জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়, ৬৪। ইচামাছে লাথ্ থি দিয়া ভাঙল ছামার দাঁত, ৬৫। অঞ্চলে ছাপিয়া বাঁশি, বাঁশি নিল রাধে, ৬৬। মহিম বাবুর মায় কান্দে হাতে নিয়া দৈ, ৬৭। মহিমবাবুর বউ কান্দে পালঙ্কে শুইয়া, ৬৭। আয়রে নলিয়া অশ্বি ঘোড়ায় চড়িয়া, ৬৯। তাই দেখে বামন ঠাকরুণ খলখল হাসে, ৭০গ। আসছে ঐ বামুন মেয়ে, থালুই হাতে করে,··· বঁটী হাতে করে,··· জলের ঘটি নিয়ে,···কড়াই হাতে করে, ৭০ঘ। সাজ সাজ রে রাইল মাথায় মুকুট দিয়া, · পায়ে নূপুর দিয়া, ৭০চ। মুই বর্ত কক্ষ সিন্সাসনে বস্‌ইয়া, ৭১। ছিবচনীর গুয়া খায়য়া ক্যালেয়া দিলেক পিক, ৭৯। হাতে নড়ি মাথায় টিক, গাঙের কুলে পারেন পিক, ৯০। ছোট নড়ী উপরে দাও, নড়া চাঁছে এই ভাও, ৯০। ম'উ আস্তে ঘামাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া, ১২৩। কুড়ুর কুড়ুর চাবানে, ১২৩। বেটার মুখ করিছে আঁকবাঁক, চোখ করিছে ছাই, ১৩৫। কাঁদুনে ছেলে ফিক্ করে হাসে, ১৪৬। গাজর মাওকেনা হাসিবে, উমুর ঝুমুর করি নাচিবে, ১৬৯। মাও কান্দেছে নাটু হুটু, ১৮৪। কইনামতীর মাও কান্দে মুগুরি টানেয়া, ১৮৪। না কান্দিস না কান্দিস দাদা, গামছা মুখত্ দিয়া, ১৯৭। মামীর মাথায় সরু সুতু, মামুর মাথায় পাগ, ২০৩। বুড়ো খায় গুপ্ গাপ্, ২০৫। বর আসছে ছাঁদনাতলা দিয়ে, ২১০। হাত ঝুম্‌ঝুম্, পা ঝুম্‌ঝুম্, ২১৫। পরের ব্যাটা ধরে নিল মাল-কোঁচা দিয়া, ২১৭। দেখতে আসছে নন্দজামাই গামছা মুড়া দিয়া, ২১৮। বাবা কেন কাঁদছিস রে টাকার থলি নিয়ে, ২২১। কেরে ছলা বাড়িয়ে কাঁদার গুঁজুর করেঁ), ২২৬। আজ থাক রে বর-কনৈয়ারা হ্যাঁট-ম্যাজুর হয়েঁ), ২২৬। বাচুর-বুচুর ডুব পাড়ে, ২৪৮। বানিয়া রাজা হুলদুল্ কাঁপে, ২৬৩। কান্দে কেইনং !—কহা-কহা, ২৭২। রাণী যায় ঢুলতে ঢুলতে, পানের পিকটি ফেলতে

ফেলতে, ২৭৮। বড় ভাইয়ে কাঁদন করে ঝালির খুঁতা ধরি (এই রকম ছোট ভাই ও বোনের কান্না), ২৯৫। খট্‌ খট্‌ খড়ম পায়, কে যায়? ৩০৬। হাঁটতে লাগে ঝিনুক ঝামুক, দেখতে লাগে পোতা, ৩০৮। ছখিয়িছা কাঁদেছে ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌, ৩১৭। ৩২১, ৩২২, ৩২৫ (প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি), ৩২৬, ৩২৭, ৪০০, ৪০১ প্রভৃতি।

যে কোনো দেহভঙ্গিই কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণতঃ হাসি-কান্না-ঝগড়া-বিবাদ এবং অন্যান্য দৈহিক দিক যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই উল্লেখযোগ্য। কান্নার সময় দৈহিক বিশেষত্ব বর্ণনা করা বাঙলা ছড়াতে খুব প্রাধান্য পায়। তারপরই হাসি ও কলহ-বিবাদের দৈহিক-চিত্র। এই সবের মধ্যেও থাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার। যাই হোক, এই সব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যে সিদ্ধান্ত করতে চাই তা এই : Gesture বা দেহভঙ্গি আদিম মানুষের আত্মপ্রকাশের এক বিশিষ্ট উপায়-উপকরণ ছিল; আজও তার রেশ রয়ে গেছে কারণে-অকারণে দেহভঙ্গিকে লোকসাহিত্যের (এ ক্ষেত্রে ছড়াতে) বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গিতে। ছড়ার মধ্যে এই কারণেই ভঙ্গিজাত চিত্ররীতির প্রাধান্য অনুভূত হয়। অবশ্য, অন্যান্য কারণও আছে।

ব্যাকরণের রীতিকে পূর্ণ ও যথাযথরূপে অনুসরণ না করাই লোকভাষার রীতি। শব্দকে যেমন নানাভাবে বিকৃত করা হয়, বাক্যগঠনের রীতি বা Syntax-কেও তেমনি। তাই এখানে কারক-বিভক্তির এতো বিপর্যয় দেখা যায়, বাক্যের মধ্যেও থাকে না প্রত্যাশিত পরিপূর্ণতা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে :

কারক-বিভক্তির বিপর্যয় ও বিশেষত্ব : সুন্দ মল্লিকার ফুলে (অকারণ ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ), ৫। বেরাদরকে (বেরাদের বাড়ীতে) যাবনি, ৯। নলবনকে, ৯। গঙ্গাযমুনা (কে) পূজ্যান, চন্দ্রসূর্য পূজ্যান, ২১। ঘরকে, ২৯। যুঁতি মালতীর নাই ফুল, ৭০। এক হাত (হাতে) ঘাইটঘিলা, আর হাত (হাতে) তৈল, ৭১। কইনামতীর মাও (মা কন্যামতী), ১৮৪। দুর্গার মাও (মা দুর্গা), ২০৬। গিল্পি আসিল্‌ দেওয়ার ঝড়ি, ১৯৮। বাঁশের পাতার করি (পাতায় করে) নাড়ু আনেছে, ১৯৯। গোরু (গোরুর) ঘাস খায়, ২৮৩। হাতিনাতে উঠি জামাই দুধে কলা (দুধ ও কলা) খাইল, ৩০৩। সর্বনাশীর মেয়ে (সর্বনাশী মেয়ে), ৩২৫। বনিতে (বনিতাকে), ৪২৩। সেই পাতার (পাতা) বিনে, ৪৩৩। ছোট ঠাকুরের জাবাজোড়াটি রঘুনাথকে

সাজে, ৪৩৫। কাজ নাইরে দাদা আমার এঁটেল মাটির চাষকে, ৪৬০। দ-কে হল জর, ৪৮৬। গুশনির শাক, ৪৩। সোনা চেয়ে (সোনার চেয়ে) রূপা ভালা, ৪৮। খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া জামাই (জামাইকে) থুইল মাচার তলে, ৬৫। মাগ্যা আনলাম চাউলের কচি (এক 'খুঁচি' চাল) ৭২। নিশিরের (নিশির, দু'বার ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ, 'শিশির' শব্দের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়) পঞ্চবটী, ৭৫। ভাই দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়ার) ফোঁটা, ৮৬। কানশিসার ফুল, ১২০। চাম্পার ফুল, ১২২। নদী (নদীর) ধারে, ২৭৬। বাড়ীয়ে (বাড়ীতে) আছে নিমগাছটা, ২৮৪। উত্তরেত্‌তে (উত্তরের থেকে), ২২৪। কুকরা নাচে কদমতলা (কদমতলায়), ৩৩০। ভাড়ের (ভাড়) বেটা, ৪২০। যে গুণে (জন্যে, কারণে, অনুসর্গ), ৪৪১।

বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ এবং বিশেষ্য শব্দকে বিশেষণ রূপে প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাক্য পূর্ণ রূপে রচিত না হবার দরুণই বিশেষ্যগুলি বিশেষণবৎ হয়ে যায়। যেমন, লক্ষ্মী-সরস্বতী (মতো) বোন, কার্তিক গণেশ (মতো) ভাই, বিউলীর ডাল (মতো) বর্ণ, ৩। সভা-আলো (করা) জামাই, ৪। গিরিরাজ (মতো) বাপ, ৫। কাল-বৈশাখী (মতো) আগুন ঝরে, ৬। সোনা দুইটি ভাইবোন, ১০। কপিলেশ্বরী (মতো) গাই, ১০ খ। মেঘনাদ ডুমুর, ১৩৬।

বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ: গুণবতী ঝি, ৫। টিপের ধুতি, সাপাট জুতো, ৪৩। সোনার যাদু গিরিবালা, ৪৪। বুড়ো বামনের হাঁড়্যা প্যাট, ৫৩। নিদারুণ কথা, ৬৪। হাটেরা মাইনষে, ৬৫। শানবান্ধা ঘাট, ৬৭। সোনার মহিম, ৬৭। সোনার গুলাইল বাঁশ, ৬৭। দধীশ্বর বাপ, ৭০ঙ। থাওনী থাল, থাল ধুয়নী জল, ৭৩। খুদুনী বল্লা (ক্ষুদ্র বোলতা), ৭৮। ভব্‌ আঙিনা, ৭৮। ইলুয়াই কাশি (ক্ষেতের আলের ওপরে হওয়া কাশফুল), ৮৪। সিন্দুইরা ভাই, ৮০। আরাইজা বাঁশ, ৮০। পাপিষ্ঠজীবন, ১৩৫। মনহর রুটি, ১৪১। লট্‌কা চুল, ১৫২। নালভূমি ফোতা, ঘুঙনি ফোতা, মালদই ফোতা, ১৬৪। চন্দনাল ছোওয়া, ১৭০। পুকিনাডি ছামটা, ১৯৯। থলই প্যাট, ২০০। ফুল মামুন, ২০৬। পালাডি মাইয়া, ২৫৩। বাপে দিল সরু শাঁখা, ২২৬। টুপ রাঙার বাঁশি, ২৩৩। মাটিয়া ঘুঘু, ২৫৮। চুট্‌কা বামন, ২৮১। ছেঁড়াই কম্বল, ২৯৪। কাঞ্চন সোনা, ২৯৪। গেঁড়ী বউ, ৩০৪। পাইন্সা ফুল, ৩০৭। লল্যা ইচা, ৩০৭। সোনালী দাবর, ৩০৮। মুড়ামারা খাড়ু, ৩০৮। সাতনলী ডায়মনকাটা চিক, ৩১০। সাম

শুক্রবার, ৩১৬। গুণের ভাতার, কোলের ভাতার, ৩৩৫। পিরিতের ঢেঁকি, ৩৪৯। গকোলাতি ছাম, ৩৫৫। উট কপালী, চিরোনদাঁতী, ৩২৬। নিঃসতা ঘর, ৪৯৫। সুখি-উজল কন্যা, ৪১০। আদরের ঝি, ৪২১। পেটের বাছা, ৪২৪। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বিশেষণগুলি বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পরই উল্লেখ-যোগ্য ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত বিশেষণগুলি।

সমাস: ঘর-ভরা ধন, দরবার-জোড়া ছেলে, রাজ্যেশ্বর স্বামী (এগুলিও বিশেষণ), ৪। বউরান্নাভাত, ২১। কাজলতা বাসরঘর, ২১। তেলকলসী (তেলের কলসী) হাতে, ঘি-কলসী (ঘিয়ের কলসী), ৭৪। ঘর-সর্বস্বি (ঘরের সর্বস্ব), ৪১। তোক করমু নড়ি ধরি, ৫৩। এ ঘরখান জগতমালা, ৫৭। ফুল কোঁচা, ৬৭। সীতাসিন্দুর, ৬৭। এই গিরিটা জগৎ-ভাল্, ৯৮। হাঁসপুকুরি, ২০৩। হেলা পুত, ৩২৫। নেয়ের থাগী, ৩২৭। মন-আগুন, ৩৪৪। কুকুর-কুণ্ডলী, ৪০১। কীর্তিজন, ৪২৪। ত্যালকালো, ৪২৬। দেবহস্তী, ৪৯২।

প্রত্যয়: বাঘা, ৫৬। শিব্যাই, ৫০৭। হরুয়া (সরুয়া) নল্যের চাছ কলাই, ৫৫। এক বাঘ চৈতা (চিত্রিত), ৫৮। সুরুযাই, ৭২। নদীয়া, ৮৪। বেটাই, ১৩৫। সদাই (সৎগুরু), ১৩৬। নাচন পখিয়া, ১৬৮। পথের পথ্যোয়া বেটা, ৪৩৪। ছিকোয়া (শিকে), ৪৭৪।

পদাশ্রিত নির্দেশক: গিরিলিখানেক (গৃহস্থটিকে) বাঘে খা'ক, ৫৬। সোনা ভেলাটা, কাদা ভেলাটা, কোলে ফেলাটা, ১৫১। বাজকিনি (রাজ্যটি), মুখকিনি, ৭১। মাওকেনা (মা-টি), ১৬৯। দূন-পানি-পাথরখান্ (ঝড়-বৃষ্টি-শিলা-বৃষ্টিটি), ১৭০। এট্টা, ২৯৪। টুনিকোনা (টুনি পাখিটি), ৪৩২। প্রাণী ও অপ্রাণি-বাচক শব্দের সঙ্গে 'খান্'-এর ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কখনো পরিমাণ নির্দেশ করতে পাই: জলঘটিটি (এক ঘটি জল), ৪৯৬। কখনো বা পদাশ্রিত নির্দেশক অব্যবহৃত: তিরিশ (তিরিশটি) সলতে, ৫০০। বিশিষ্ট প্রয়োগ: কই মারেছে গোটা গোটা, ৩৩৪।

ছড়ার 'এক' শব্দের একটি বিশিষ্টতার কথা আগেই বলেছি। প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে উদাহরণ: এক কলসী গঙ্গা জল এক কলসী ঘি, ১১। একটা হল উনা, ৭০। একটি গেল পোকা, ৭৫। বারোমাস ফল ধরে এক মাস মানা, ৩৫৭।

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা: গাঙ সিনানে (স্নান করতে) যাই, ২৫। গান শোনানে (শুনতে) যাই, ৩৬। আইলাম রে অরণে (হরণ করতে) ৪৬।

অসমাপিকার বিশেষত্ব : শিয়াল ডাকতে (ডাকলে) ভাত না খায়, কাক ডাকতে (ডাকলে) ঘুম না যায়, ৭১।

ক্রিয়াবিশেষণ : বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে, ৪১। একেলায়-দোকোলায় না যায় আরো হাঁটা, ১৬২। রাজবাড়ী ছাড়ি বান ঘান গুটিগুটি, ৪২৭। নিষ্টি কোষ্টে খাও, ৪৩২।

নির্দেশক সর্বনাম : সোই (সেই+ঐ) আসচে, ৩০০। সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গ : 'অমুকা', ১৩৫চ।

নামধাতু : আমগাছটি বলইছে ভালো, ৭৫। এখনি বোধিবে (বোধ প্রাপ্ত হবে) ছেলা, ১২৮। মোর ঘরে সকাও, ১৩৬। বিহাহু (বিয়ে দিলাম), ২০২। ক্যাল্‌লো (কেলি করল), ২৩৫। উনিয়ে (উষ্ণ হয়ে) ওঠা, ২৯৪। চারায়, লতায়, ৪৩০।

ক্রিয়ার বিশেষত্ব : ক. যৌগিক ক্রিয়া : গলায় তুলিয়া দিল গজমতির হার, পায়েতে চড়াইয়া দিল মুড়ামারা খারু, ৩০৮। ব্যাচেয়া খাইল্‌, ৩১৮। খ. মধ্যযুগীয় প্রভাব : ঢেঁক পড়ন্ত, উনন জলন্ত, ২১। চলন্ত, ২১। চলন্তি, পূজন্তি, ৭১। করন্তি বিচার, বোলন্তি, ১৩৫। গ. বস্‌সে (বোস এসে), ধুইসে (ধোও এসে), ৩৬। নাওসে (নাও এসে), ৪১। বারাবে (বের হবে), ৬০। লেগুক (নিয়ে যাক), ২৩৬। বিরাউক (বের হোক), ২৯৮।

অব্যয় : যদি বা ছাড়িবে তুমি (যদি তুমি ছাড়ো), ২৯। খালাস না রে পাইল, ৬৭। রাত্রি না দুপুরের কালে, ৬৫। তবে সে নি কিয়া কাটি, ১২৫। নদী সে দামোদর, ৪২৭। বেচাং তে (বেচি তো), আন্ধোং তে (রাঁধি তো), ৪৩২। কি না বর দিয়া, ৫০২।

বাক্যের বিশেষত্ব : অমর বর পুত্র (অমর পুত্রবর) চায়, ৫। তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে (এবং) সুখী (কর), ৬। বউরান্না ভাত খেয়ে চাঁদ পারা মু (চাঁদের মতো যেন মুখ হয়), ২১। অরুণ ঠাকুর বরণে (বরণের কারণে, বরণ করতে), ২১। কি করছ রাই ধানে (ধানের মরাইতে) বসে, ২৪। চাল কটা দুই ('কটি' এবং গোটা দুই) রাঁদ্‌ গো সখি, ভাত কটা দুই খাই, ২৪। তুষুর কানে'চৌদ্দতোলা (সোনা), ২৬। যদি বা (যদি) ছাড়িবে তুমি, ২৯। বিয়ে দেব চতুর্ভুজ বরে (বরের সঙ্গে) ২৯। মরুক মরুক ননদিনী তাকে আমরা পারি (তার সঙ্গে কলহ-বিবাদ করতে পারি), ৩৩। যশোদা গেল জলে (জল আনতে), ৪১। যার জননী (জননীর) অগ্নি জ্বেলে শীতের বেলা

কাটে, ৪৩। কতক দুধ চেষ্ট যায় (বয়ে যায়), ৫৪। তাই দিয়া বানাইল শলা ঝাঁটি (এক ঝাঁটি শলা), ৮০। লক্ষ্মী দেবীর বরণে (বরণ করতে, নিমিত্তার্থক অসমাপিকার বিশেষত্ব), ৫৮। জ্যোষ্ঠিনো আষাঢ়ো মাসে ঝাঁকে চলে (ঝাঁক বেঁধে চলে) মাছ, ৬৬। সূর্য উঠে রঙ্গে হৈয়া (রঙ্গে এবং রঙীন হয়ে), ৭২। বনবাসী (হব বা বনবাসে) যায়াম, ৫৭। সূর্য পূজি দিবাকর (দিবাকর সূর্যকে পূজো করি), ৭৫। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা (বলি) পড়ে মোষ পাঁঠা, ৮৬। পান সেজেছি এলাচদানা (দিয়ে), ১১৪। চাউল স্বারে (এক সের) পাং, ১৬৬। কাঁদইতে কাঁদইতে বাপের ঘর (গেল), ২২৬। দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি, গুণতে গুণতে মামার বাড়ী (চলে যাব), ২৩৫। যোড়কলসী (এক জোড়া কলসী) পাইল, ৩০৩। মিনসে বলে, ওর মার মাথা খেয়ে শুনবে আমার কথা (আমার কথা না শুনে মায়ের মাথা খাবে), ৩১৯। পাড়া বেড়িয়ে এসে বউ হয় না কেন (দেয় না কেন) ছড়া ঝাঁট, ৩২৫। বড় ঠাকুরের ভাজামালা, আমরা ফুলের গেঁথেচি (আমরা ফুলের 'ভাজামালা' গেঁথেছি), ৩৩৫। সকলার (বিয়ে) দিলি আশেপাশে আমার (বিয়ে, আমাকে) দিলি বনবাসে, ৩৪৩। যমরাজ সাক্ষী থেকো, যমপুকুরটি (পুজো) করি, ৪৯৬।

বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি : মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গা জলে, ১। পায়ে আলতা মুখে পান, ৫। ভাতে-পুতে সে বাড়ে, ৮। পরাণে মরিব আমি, ২৯। সাত সতীনের মুখটি পোড়ে, ৩৩। সাগর শুকিয়ে গেছে, ৩৩। বদন ভরে একবার হরি হরি বল, ৩৪। ঘরকে আসুক ঘোষ, ৪১। কিসের জন্যে মিছে ঘরের মজাইবে কড়ি, ৪১। মুখে নাহি রা, ৪১। যশোদা কপালে মারে ঘা, ৪১। মজাবে গোকুল, ৪১। যার জননী ছেঁড়াকানী পরে ব্যাভার করে, ৪৩। ছাপোর খাট, ৪৩। জনে জনের (প্রতিজনের), ৩৮। মায়ের কোল শূন্য করে যমের কোলে দিলে, ৪৪। চোক্ষজলে বক্ষ ভিজে, ৬৪। গাড়ী ভইরা আনরে টাকা, ৬৭। সোহাগেব ঝলিতা, ৭২। বদনে পান ধরি, ১৩৯। হস্তি-ঘোড়ায় চড়িয়া, ৬৯। করিল মার্যমান (মর্যাদা ও সম্মান মিলে), ১৩৫। জোড় কইনা নড়ে চড়ে, ১৯৭। ঘোর-ঘোটার (ঘোর এবং ঘটা মিলে) বাজনা, ২১১। নাচন কেনে ঢিলা ('শিথিল' অর্থাৎ শৃঙ্খলাশূন্য), ২৩২। টুপরাঙার বাঁশি, ২৩৩। বেলের ভিতর লেখা আছে নানা রঙ্গের খেল, ২৮৮। উল্টোবস্ত্র হওয়া, ২৯৪। আঁধার ঘর আলো করে, যেন পির-

তিষের থানা, ২৯৪। দেইজির বুকে হাঁটু দিয়ে ঘর করা, ২৯৪। যেখানে ছুঁই চলে না, সেখানে চালাই বেটে, ২৯৪। গাছের পাড়ি তলার কুড়ুই, কুঁদে উড়ুই কাদা/হেল্‌কি দিয়ে ভেল্‌কি নাচাই হদ্দ হল বাবা, ২৯৪। জামাই হবে দেখতি ফটিঙ, ২৯৪। হাতে বাজাবে শিঙে, দাঁতে গুঁজবে মিশি, ২৯৪। হাজারে টাকার সাড়ি আনি কেমাইল মজাইল, ৩০৮। ভাত-কাপড়ে না পাং, ৩১৮। তোর দুঃখের কথা মোর দেহাতে না সয়, ৩১৮। আমার ভাতার ভেল্‌কি জানে, ৩৩৫। কোলের ভাতার পরকে দিয়ে বুক বেঁধেচি, ৩৩৫। ভাতার এমন ধন, কে জানে রে মন, ৩৩৫। পাখি এমন সর্বনেশে, ৩৩৫। সোনা ধরে দিব্যি করো, ৩৪০। যদি মন হয়, খরচ কর, ৩৪৫। হাজার টাকার বউ এনেছি, ৩২৩। ফেনে ভাতে খাবো, ৩২৫। টোপ গিলেচে, ৩৪৫। বউয়ের মুখে মারি উনটো ঝাঁটাব বাড়ি, ৩২৫। আমার কথায় মন ভরে না, এঁটো কাঁটায় পাত, ৩২৬। তোর ঝি-জামাইরি খেয়ে দেখ্‌গে, ৩২৭। শালীকে দেয় শখের শাড়ী, ৪২৩। পরের পুত জী'তে থাকে ৪৩৮। যেন না পড়ে আমার নো,' জনে জনে সো হবো, ৪৯৪। ধান কাপাসে ঘর আলা, ৪৯৯।

বিশিষ্ট রূপক-উপমা: কলা বউয়ের মত লজ্জাশীলা হব, দূর্বার মতো লতিয়ে যাব, ৩। আটভাই পেলেন যেন চাঁদের কোণা, ৬। আট ভাই পেলেন যেন হীরার দানা, ৬। এদেশের মানুষগুলা অক্ষয় লোয়ার (লোহার) কাড়ি (কাঠি), ৫৫। বেটা ছেলেটা সোনা ডেলাটা, মেয়ে ছেলেটা কাদা ডেলাটা, ১৫১। মেঘের আড়ে পড়ে যেন বিদ্যুতের আভা, ৩০৮। শ্যামা, মুড়ির ধামা, ৩২২। আর যত মিত্র আছেন কচু আর ঘেঁচু, ৩৭৬। বেনের পুঁটুলি, কুকুর কুণ্ডলী, ৪০১। সূর্য্যি-উজল কন্যা তার রূপে দিনমান, ৪১০। ভাঙ্গা চাঁদ উঠল যেন আশমানের গায়, ৪১০। শুনে বিবি পটের ছবির মত হয়ে যায়, ৪১০। লজ্জাবতী লতাব মতো আমরিয়া পড়িল, ৪১০। চললো বান যোজন জুড়ে, যেমন টাঙ্গন ঘোড়া, ৪২৬। কাড়ার (মোষের) মত গতর আমার, ৪৬০।

জড়বস্তুর ওপর চেতনা আরোপ, মানবেতর প্রাণীর মধ্যে মানবিকতা আরোপ: কলাবৌয়ের মতো লজ্জাশীলা, ৩। গঙ্গা মায়ে কুলকুলিয়ে চায়, ৬। নবীন কৌটো, ২১। গাইর নাম মোনামুনি, ৫৪। নবীন পৈতা, ৭০গ। কুজ্ঞান কাটে, ১৩৬। বেগুন হল ঝালাপালা, ৩৩১। গা-এর নাম হাসী,

মানুষের নাম দাসী, ২৩৩। ঝেঁচু বেটা পড়ামুহা, ৪২৬। রাজ বাড়ী ছাড়ি বান বান গুটিগুটি, ৪২৭। থাক্ বাইগন, তোক খামো পেল্কা করিয়া, ৪৩৩। ট্যাঙনা বেটা, ৪৪৩। শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় অমর হোক, ৪৯৫। পৈতে জাগাও, ৫০৮।

শব্দের বিকৃতি : খেল্ (খেলা) করবে, ২১। মেলিনী ('মেলানী,' বিদায়), ২১। ডেঁটা (ডাঁটা), ২১। মাধবলতা (মাধবীলতা), ২৪। গালে মারিল কিলা (কিল), ২২। আয়না চিরুণ, ৩৮। চাম্পাফুল, ৪৯। কুলগাছটি ঝাঁকুড়ি (ঝাঁকড়া), ৩৩। বিটি (বেটি) ৩৯। ডেলে (ডালা), ৪১। পরুণে (পরণে), ৪৩। শ্যাল (শেয়াল), ৫৩। এক বছর আন্তর (অন্তর), ৬০। মেলি (মারলি), ৬৪। জ্যোষ্ঠিনো আষাঢ় মাসে, ৬৬। নিবাদন, বিবারণ, ৬৭। পুষ্করী, ৭২। রাগল বোয়াল মাছ, ৭৩। চাল গুচ্ছেং (গুচ্ছের), খোল গুচ্ছেং, ৭৭। নিমান্তে (নিমিত্তে এবং ওয়াস্তে), ৭৮। সূর্যব্রণ (বর্ণ), ৮৩। জ'নে জ'নে (জ্যোৎস্নায়, জ্যোৎস্নায়), ৮৭। শিগ্ রে (শীঘ্র), ১২৭। কাত্তিকশর (কার্তিকেশ্বর), ডিম্বুর (ডম্বরু), উজরে (উদরে), ১৩৫। কুমণ্ডল (কমণ্ডলু), ১৩৬। চোহে (চোখে), ১৩৯। বাগ্ লা (বাবলা, ব্যক্তি নাম), ১৪৩। মুশুরি (মশারি) ১৮৪। কৈঁহুনা (কৈঁদ না,) ২০৩। জলক (জলকে, জল আনতে), ২০৬। নিভরে (নীহারে) ভিজিল গাও, ২৩৫। অল্লুক (অলুক) বাতি, ২৫৮। সতরঞ্জি, ২৬৪। পদ্দীপ (প্রদীপ), ২৮৯। কাট্টল (কাঁঠাল), সোদ্দর (সোদর, সহোদর), ২৯৩। কুস্সা ('কুরুসা') মাছ, ৩২৪। বেইশ (বেশ) সুন্দর, ৪৩২। বৈদ্ (বৈদ্য), ৪৫৭। ডালা, ৪৬৫, ৪৬৯। শোভাং (শোভা) ৪৭৩ (পা. টী)। সো (সুয়া), নো (নোয়া, লোহা), ৪৯৪।

ওপরের সব ধরণের দৃষ্টান্তের মধ্যেই onomastics অর্থাৎ সর্বপ্রকার নামকরণের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু মিলবে। আরও কিছু এই : লক্ষেশ্বর (নাম), ২১। সাঁজ পূজণী (সন্ধ্যাবেলায় পূজণীয়া যে), ২১। পাটেশ্বরী, ২৮। পৌষুরি (পৌষলক্ষ্মী), ২৮,৩০। তালগোপা (মজা তাল পুকুর), ৩৬। বাঘাইপুর (স্থান), ৪৯। এ ঘরখান জগতমালা, ৫৩, ৮০। বিরামপুর (স্থান নাম) ৫৩। বুড়ীর নাম ল্যাজকাটা ডোমরি, ৫৩। গাইএর নাম মোনামুনি, ৫৪। মাণিক নালের বেড়া, ৫৫। জুলনী (জোলার বউ), ৬৫। ফুল কোঁচা, সীতাসিন্দূর্ ৬৭। দধীশ্বর বাপ, ৭০৬। আয়রাণী (এয়োরাণী), ৭১। দেউলেশ্বর, ৭১। শাইলের ভাত, ৭২। সোহাগের ঝলিতা ৭২।

ব্যাভার (ব্যবহার, উপহার, যৌতুক),৭৫। ঘরখানি মোর চিরকিনি (চিক্কণ, সুন্দর), ৮৮। মিল্‌মিলা, আঙ্গুলপেটী, পড়াসুরা, জুনকাটী (বিভিন্ন রোগের নাম), ১৩০। বীর বাহুতি মা, ১৩৫। নোধনী (লোধার স্ত্রী), ১৩৫। মেঘনাদ ডমুর (ডমরু), ১৩৬। সদাই (সংগুরু), ১৩৬। নিদ্রাবতী মাসী, ঘুমঘুমাসী, ১৪০। কাঁদুনে মাসী, ১৪৬। ন্যাংটা ঘুতুম, ১৫৬। হুসনভীখি, মীর নগরের ডাঙ্গা (স্থাননাম), ১৬২। নালভূমি ফোতা, ঘুঙনি ফোতা (বস্ত্র বিশেষ), ১৬৬। হামাব বাউ নাচন পখিয়া, ১৬৮। চন্দনাল (চন্দনেব মতো লাল) ছোওয়া, ১৭০। অলিব কুল (স্থাননাম), ১৭১। মুনু (ব্যক্তিনাম, আদবার্থে), ১৭৩। মোতিনাল (ব্যক্তিনাম), ১৭৮। ফুলমালা, অংমালা (ব্যক্তি নাম).১৮৫। কপ্‌পুব (ব্যক্তি নাম), ১৮৫। ট্যাপেবি (ব্যক্তিনাম), ১৮৮। ময়না (ব্যক্তি নাম), ১৯৬, ২০৯, ২১৫। হাঁসপুকুরি (পুকুরেব নাম), ২০৩। এঁডতাল, ২০৫। মদনপুব (স্থাননাম), ২২০। ফেলানী (ব্যক্তি নাম), ২৩০। মাণিক (ব্যক্তি নাম), ২৩৫। চুকারু (ব্যক্তি নাম), ২৫৮। আইকুমাবী, (ব্যক্তি নাম) ২৬০। মোগলকাটা (স্থান নাম), ২৬০। একরুলি, তেজ্জ কাটা, ২৬৫। তামুক ঝোল (খাদ্যবিশেষ?), ২৬৭। দামডালেলে (স্থান, নাম?), ২৬৭। ব্যাঙজত, ২৬৯। পান বানাইছে বঙ্গদানা, ২৭৩। পায়রাকাবু, কাঁটকটকি (ব্যক্তি নাম), ২৭৪। ছাগলদানী, বাথালদানী, ২৭৯। নাঢাবেলতলা পিঁপড়াগাঢা (স্থান), ২৮৪। ভাকুডুডু (খেলাব নাম), ২৯১। কাঁদন (ব্যক্তি নাম), ২৯৪। মুড়ামারা থাড়ু, ৩০৮। চৌবাশি ঘুংগুরু, ৩০৮। নেয়ের খাগী (গালি বিশেষ), ৩২৭। চালতাফুল (গহনা বিশেষ), ৩৩৫। বিদ্রুক (ব্যক্তি নাম), ৩৭১। ভেল্‌কীর বেটী, ৪৩২। আঙুল কাঁসেব বালা (গহনার নাম), ৪২৪। গয়াব পাপ (গালি বিশেষ), ৪২৫। কালু বিন্দাবন (স্থান নাম), ৪২৬। দামোদবে জড হলো চৌদ্দতাল জল, ৪২৭। পাতুড়ে বাজা, ৪২৭। গুদুনী (গোদার স্ত্রী), ৪৩১। লক্ষ্মীপাতা (তামাক পাতাব নাম), ৪৩৩। হারামখোর, ৪৪৩। সাজনে (সজ্জার উপকরণ), ৫০৮। সেঁঝে (সন্ধ্যাকালীন দেবতা, অতিথি, ইত্যাদি), ৫০৮।

ছডার ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে (কেবল ছেলে ভুলানো ছড়া নয়, বয়স্কদেবও যে কোনো ধরণের ছড়ার মধ্যে) শিশুর ভাষা-ভঙ্গিব ছাপ দেখা যায়। শিশু পূর্ণরূপে বাক্য গঠন করে না। 'মার কাছে যাব' এই বাক্যকে সে বলে 'মা যাব'; গোরুকে নির্দিষ্ট শব্দ 'গোরু' না বলে ধ্বনিবাচক 'হাম্বা' বলে, কুকুরকে

বলে 'ঘেউ-ঘেউ'; বেড়াল তার কাছে 'মিউ-মিউ' এই ধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। নৃতাত্ত্বিকেরা আদিম এক বয়স্ক মানুষকেও এ-যুগের এক শিশু বলে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই এ-যুগের শিশুর ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে সে-যুগের বয়স্কদের ভাষা-ভঙ্গিতে সাদৃশ্য এসে পড়ে। এই বিশেষ ভঙ্গিকে Brachylogy বা তারই মতো এক ভাষা-ভঙ্গি বলা যায়। Brachylogy হল এক বিশেষ ভাষা-ভঙ্গি, যা ব্যাকরণের দিক থেকে অসম্পূর্ণ কিংবা যে ভাষা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়। ছড়ার ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে তার দূর ও অস্পষ্ট মিল আছে॥

.. ১০....

এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে এ পর্যন্ত ছড়ার কায়া ও রূপগঠনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে আসছিলাম। আমাদের এই আলোচনা থেকে এটুকু নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়েছে যে, ছড়াকে আমরা শব্দ ও ভাষার কারুকর্ম, একটি অর্থ ও বস্তুময় রূপনির্মিতি ছাড়া আর কিছু মনে করি না। ছড়ার সাহিত্যিক ও পারিবারিক চিত্রের দিক, যা এতোকাল বঙ্গীয় গবেষকদের কাছে আলোচনার বিশেষ প্রিয়বস্তু ছিল, আমরা তার ওপর কোনো গুরুত্বই আরোপ করি নি। ভাষা ও শব্দের এই কারুকর্মপ্রদর্শিত হয় অন্য কয়েকটি বিষয়-প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে. মিলের বন্ধন, প্রশ্নোত্তরমূলকতা, সম্বোধনমূলকতা, কথা-কাহিনী-মিথের প্রভাব, ইত্যাদি। এ বিষয়ে নবম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই আমাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া ছড়ার প্রারম্ভ, মধ্যাংশ এবং প্রান্তের গঠনগত বিশিষ্টতাও একটি মূল্যবান দিক।

ছড়ার এই রূপ ও কায়াগত দিকটিকে ছড়ার সমধর্মী অন্যান্য রচনার মধ্যেও কিভাবে ও কতখানি মেলে, এইবার সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে Clerihew, Limerick, Light Verse, Leonine Rhyme, Identical Rhyme, Nonsense Verse, Haiku বা Hokku প্রভৃতির কথা অনেকেরই মনে হতে পারে।

ছড়ার সঙ্গে এই সব রচনার তুলনামূলক আলোচনার পূর্বে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই সব রচনাকে কোনো উন্নতমানের রচনা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি, নিছক শব্দ-ক্রীড়া বা ছন্দ-সামর্থ্য প্রদর্শন করা ছাড়া এর

মধ্যে আর কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। অনেক সময়েই এগুলো বালক-বালিকাদের ড্রইংরুমে বসে খেলা করা (Parlour Games) মাত্র। কিন্তু ছড়া এদের থেকে অনেক পৃথক এবং উন্নতমানের রচনা; 'খেলার ছড়া' বলে পৃথক ছড়া থাকলেও সব ছড়াই খেলার ছড়া বা বালক-বালিকার ছড়া নয়,—সাহিত্য-গুণও তার আছে, এবং অন্যান্য সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে ছড়ার বিশেষ যোগ আছে।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও ছড়ার সঙ্গে ওইসব রচনার তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। ওইসব বিভিন্ন রচনার মধ্যে রূপ ও গঠনের এমন একটি বিশেষ দিক আছে, যা ছড়ার কায়া-নির্মিতির প্রায় কাছাকাছি একটি দিক।

Clerihew আসলে Edmund Clerihew Bentley-কর্তৃক উদ্ভাবিত চার পঙ্‌ক্তির ছড়া-ধর্মী রচনা, উদ্ভাবকের নাম দিয়েই রচনার নামকরণ হয়েছে। স্বল্প পরিসরে বুদ্ধি ও কৌতুকদীপ্ত ভঙ্গিতে কোনো বিশেষ ও বিখ্যাত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনই এর লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে রসায়ন-বিষয়ক আলোচনা শুনতে শুনতেই এডমণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্টলি লিখেছিলেন : Sir Humphry Devy/Abominated Gravy./He lived in the odium/Of having discovered Sodium.

বাঙলা ছড়ায় যে মাঝে মাঝে কোনো চরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও কৌতুকোজ্জ্বল মন্তব্য পাওয়া যায়, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যদিও Clerihew-র চার পঙ্‌ক্তির গঠনভঙ্গি বাঙলায় গৃহীত হয় নি।

এর পরই উল্লেখযোগ্য Limerick-এর কথা। লিমেরিক এখন বাঙলা সাহিত্যে খুব পরিচিত। এক সময়ে লিমেরিক রচনার জোয়ার এসে গিয়েছিল। একেবারে হাল আমলে একদল শিক্ষিত কবিদের সচেতন মনে লিখিত 'ছড়্‌রা' বা 'ছর্‌রা' নামে যে বিশেষ শ্রেণীর কবিতা দেখি, তা একদিকে প্রাচীন ছড়া-কবিতার বিবর্তিত শেষতম রূপ, অপরদিকে তা লিমেরিকের কাছাকাছি। যতদূর জানি, বাঙলায় প্রথম লিমেরিক রচনা করেছিলেন স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'কৈশোরক' পত্রে (শ্রাবণ, ১৩৪৫) Edward Leer-এর লিমেরিক-ছড়ার বৈশিষ্ট্য এবং বাঙলা সাহিত্যে তার অনুসরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তার মত হল : "অন্য সকলেই অন্যরূপ

করিয়াছেন," কিন্তু "লিমারিক ছড়ার প্রকৃত অনুসরণ" তিনি কেবল শুকসদয় দত্তের রচনাতেই পেয়েছেন। এ বিষয়ে শুকসদয় দত্ত যোগেন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠিও লিখেছিলেন (২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৬), যোগেন্দ্রনাথ পরে সেটি প্রকাশ করেন (বঙ্গলক্ষ্মী : আষাঢ়, ১৩৪১। পৃ. ৩০২-৩০৫)। শুকসদয়ের 'পাগলামির পুঁথি'ই (প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯) বাঙলার প্রথম খাঁটি লিমেরিক-ছড়া বলে স্বয়ং শুকসদয়ই দাবী করেছেন ওই চিঠিতে। লিমেরিক পাঁচ পঙ্‌ক্তির হয়, "এবং শেষ লাইনটা প্রায়ই অবিকল প্রথম লাইনের অনুরূপ—দু' একটা কথামাত্র তফাৎ।" এই বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়চৌধুরী বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাতে ফোটে নি। "সুতরাং সেগুলি ঠিক Edward Leer-এর প্রকৃত লিমারিক নয়। তা ছাড়া আমার মত এতগুলি লিমারিক ঐ সকল লক্ষণ পূর্ণ করে রেখে কেউ বোধহয় বাংলায় এখনো লিখে নি।"

অনেকেরই ধারণা লিমেরিক Edward Leer-এরই প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু তা নয়। পূর্বকালে গানের শেষে ধুয়ো ধরা হত বা আবৃত্তি করা হত : 'Won't you come up, come up, won't you come up to Limerick ?' এখন অবশ্য এ রীতি আর নেই। যাই হোক, এই ধুয়োপদের 'লিমেরিক' থেকেই লিমেরিকের সৃষ্টি। প্রথম লিমেরিক প্রকাশিত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে হেন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে লিমেরিক রচিত হয় না।

আমাদের আলোচনায় লিমেরিকের প্রসঙ্গ টেনে আনবার ক'টি কারণ আছে। লিমেরিকের কাঠামোর মধ্যে যে পুনরাবৃত্তিটি আছে (প্রথম পঙ্‌ক্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে রূপ নেয়) সেটি বাঙলা ছড়ার কাঠামোর একটি বিশেষ দিক, যদিও পুনরাবৃত্তি যে কোনো দেশের ছড়ারই গঠনগত বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ, লিমারিকে অদ্ভুত, অসঙ্গত, আকস্মিক প্রসঙ্গের প্রবর্তন। যদিও বাঙলা ছড়ার ক্ষেত্রে আমরা অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে সর্বত্র স্বীকার করি না, তবু যাঁরা বাঙলা ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতির অতিরেক দেখেন, তাঁরা এই দিক থেকে একটি সাদৃশ্য পাবেন। তৃতীয়তঃ, শিক্ষিত কবিদলের মধ্যে, নিছক সাহিত্য-চর্চা রূপে যে লিমারিক-ছড়া এবং তার দেখাদেখি 'ছড়্‌রা' রচনার প্রবণতা দেখা যায়, প্রাচীন ও প্রকৃত ছড়ার বিবর্তিত একটি দিক রূপে একে নির্দেশ করবার জন্যেও লিমারিকের প্রসঙ্গ টেনে আনা অসঙ্গত নয়।

এই পুনরাবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই বাঙলা ছড়াকে 'Leonine Rhyme'-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই বিশেষ ধরণের রচনাশ্রেণীর উদ্ভাবক হলেন,

দ্বাদশ শতাব্দীর প্যারিসের এক চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত এক কবি,—Leoninus এ হল মধ্যযুগের এক ধরণের ল্যাটিন কবিতা। এতে শেষ শব্দটি, পূর্ববর্তী Caesura অর্থাৎ চরণের মাঝখানের শব্দের পর যে যতি, সেই শব্দের সঙ্গে মিল রক্ষা করে। ঠিক এই ধরণের নিয়ম-মাফিক মিলরক্ষা বাঙলা ছন্দে নেই, কিন্তু অন্ত্যমিল ও মিলের এবং পুনরাবৃত্তির যে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছি, তার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা যায়।

Identical Rhyme-ও এক ধরণের কবিতা-ছন্দ। নাম থেকেই এই ছন্দের পরিচয় মেলে। নিশ্চয়তা (Emphasis) আরোপের জন্যে একই শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি করে অন্ত্যমিল প্রদর্শিত হয় এতে।

প্রথমে পাঁচ, তারপর সাত, তারপর ফের পাঁচ অক্ষরের (syllables) এক-একটি পঙ্‌ক্তির তিন পঙ্‌ক্তি নিয়ে রচিত হয় 'Haiku' বা 'Hokku' কবিতা হয়। ভাবাবেগ ও আধ্যাত্মিকতাকে ফোটানোই এই ধরণের কবিতার লক্ষ্য। অনুবাদের মধ্যে তার রূপটি পুরো ধরা যাবে না, তবু একটি নিদর্শন :

The falling flower/I saw drift back to the branch/Was a butterfly. বাঙলা ছড়ার শ্বাসাঘাত এবং পয়ার-ত্রিপদীর যতিবিভাগ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

Light Verse এবং Nonsense Verse-এর কথাও এই প্রসঙ্গে ওঠে। Light Verse বলতে অনেক ধরণের পদকে বোঝায়। প্রধানতঃ দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনাই এর উদ্দেশ্য। এর মধ্যে লালিকা (Parodies), লিমারিক, বিরোধমূলক উক্তি (Epigrams), বিশেষ গঠনের ফরাসী কবিতা (যেমন, Triolet, Ballade এবং Rondean) সবই অন্তর্ভুক্ত। Nonsense Verse-ও এর মধ্যে পড়ে। Nonsense Verse সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, এর মধ্যে 'sound and movement are more important than the sense.'—বাঙলা ছড়ার প্রাণসম্পদ যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, তার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে।

ইংরেজিতে ছড়া বলতে 'Nursery Rhymes', কিন্তু বাঙলা ছড়া মানেই 'ছেলে ভুলানো' ছড়া নয়। 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বাঙলা ছড়ার একটি সামান্য অংশ। বাঙলা ছড়া, বাঙালীর সাহিত্য-জীবন বিকাশের, সর্বত্রসঞ্চারী, সর্ববিষয়

প্রকাশকর, সর্বজনপ্রিয়, সর্বকালগৃহীত একটি পন্থা বা পদ্ধতি। 'Nursery Rhyme' দিয়ে তার অনুবাদ হয় না। তবে বাঙলা ছেলেভুলানো ছড়ার গঠন-রীতি ও রচনাভঙ্গির সঙ্গে ইংরেজি Nursery Rhyme-এর মিল কোথাও-কোথাও আছেই। যেমন, পুনরাবৃত্তি প্রদর্শনের মধ্যে।

শুধুই পাশ্চাত্ত্যের নানা ধরণের পদ্যের সঙ্গেই যে ছড়ার রচনাভঙ্গির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের একাধিক কলা ও সাহিত্যধারার সঙ্গেও ছড়ার যোগ অনুভূত হয়। প্রাচীন ভারতের চৌষট্টি কলার মধ্যে দু'টি কলা হল: হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা রচনা এবং কাব্যসমস্যা পূরণ। হেঁয়ালি-কলা দ্বারা ক্রীড়া এবং পণ্ডিতে-পণ্ডিতে বুদ্ধির লড়াই হত। কোনো প্রসিদ্ধ কবির একটি কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি বলে তার সঙ্গে মিলিয়ে আর একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করতে বলা হত। এ প্রথা এখনও দেখা যায়। সংস্কৃত সমস্যা-পূরণের অনুকরণে এক সময়ে বাঙলা দেশেও সমস্যা পূরণের প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল। যাঁরা সমস্যাপূরণ করতে পারতেন, সমাজে তাঁদের খুব সম্মান হত। নদীয়ার বাড়েবাঁকাগ্রামের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নাম একদা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। সমস্যা পূরণের জন্যে যে কবিত্ব ও কৌতুকবোধ, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তা তাঁর যথেষ্টই ছিল।

হেঁয়ালি রচনা বা সমস্যাপূরণ মূলত: মুখে মুখে উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করা পদ। ছড়ার মধ্যে যে কোন বিষয়ের বর্ণনা, বর্ণনার মধ্যে কৌতুকবোধ, কবি-তরজা-পাঁচালীতে যে উপস্থিত ক্ষেত্রে এবং 'বাঁধা ছড়া'র প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়,—সবই এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। এমন কি ছন্দের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

ছড়ার ছন্দোময় বর্ণনারীতির সঙ্গে 'চূর্ণী'র বিশেষ মিল আছে। 'চূর্ণী' কি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাঁর লেখা 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' (ভারতী। ভাদ্র, ১৩২৯। পৃ. ৪১৭-৪২৪) প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। 'চূর্ণী' হল 'চূর্ণ' বা টুকরো সাহিত্য-পদার্থ। কতকগুলি বিশেষ বর্ণনা, প্রাকৃতিক বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা কথকঠাকুরদের মুখস্থ করা থাকে। প্রয়োজন হলেই সেগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন, কবি-তরজা-পাঁচালির আসরে ছড়াদারেরা 'বাঁধা ছড়া'র আশ্রয় নিতেন। ওগুলো তাঁদের কণ্ঠস্থ থাকত, প্রয়োজন উদ্ভূত হলেই তা লাগিয়ে দিতেন। দু'টি 'চূর্ণী'র উদাহরণ অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩৭৭) বইতে মেলে। 'চূর্ণী'র রচনাভঙ্গিতে ছড়ার ছাপ আছে।

এইভাবে, ছড়ার রচনাভঙ্গি এবং রূপনির্মাণের মধ্যে আমরা নানা ধরণের সাহিত্যিক রচনার রীতিকে লক্ষ করি। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে এ কথাই বলতে চাইছি যে, কয়েকটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রচনারীতির কোনো দেশ-কালের সীমাবদ্ধতা নেই। তা সকল দেশে, সকল কালে ছড়ানো আছে। কেউ কারো দ্বারা প্রত্যক্ষ বা সচেতনভাবে প্রভাবিত না হয়েও একটি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে। আসলে এই ধরণের সাহিত্য-বর্গগুলির এমন একটি প্রসারণশীলতা আছে যে, মাত্রা ও ছন্দের নানা বাধানিষেধ ও নিয়মানুবর্তিতা থাকলেও তা যেন অন্য দেশের অন্য কালের বিশিষ্ট এক রচনাবর্গের সঙ্গে সহজেই সাদৃশ্য রক্ষা করতে পারে। Clerihew বা Leonine Rhyme এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের সঙ্গে জড়িত বটে, কিন্তু এই ধরণের সব রচনাকে একসঙ্গে দেখলে মনে হয়, তাঁরা কোনো আদিম বা গ্রামীণ সাহিত্য-ধারাকে অবলম্বন করেই তাঁদের আবিষ্কৃত ওই সব রচনার কাঠামোটি নির্মাণ করে নিয়েছিলেন॥

…১১…

ছড়ার কায়া-গঠনের মধ্যে নানা শ্রেণীর রচনার আদর্শ যেমন দেখা যায়, তেমনি তাকে প্রয়োগও করা হয় নানা বিষয় ও ভাব প্রকাশ করবার জন্যে। অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত হেন বিষয় নেই, যা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বক্তব্যের প্রচার-মাধ্যম রূপেও ছড়ার ভূমিকা অসামান্য। প্রয়োগক্ষেত্রের এই বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা ছড়ার একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। প্রস্তুত সঙ্কলনে তার আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এই প্রসঙ্গটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছিলাম, এখন এ নিয়ে আলোচনা করবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আমরা বলেছিলাম, ছড়া সব ধরণের রচনাবর্গের সঙ্গেই যুক্ত। গান, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা—সবের সঙ্গেই ছড়ার রচনাগত যোগ-বন্ধন আছে। এদের মধ্যে 'কথা'র সঙ্গে ছড়ার যোগটি আমরা অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করেছি। কিন্তু গান, ধাঁধা ও প্রবাদের সঙ্গে ছড়ার যোগটি প্রদর্শন করি নি। এইবার তা করছি।

ছড়া কেবল আবৃত্তিই করা হয় না, গাওয়াও হয়। অনেক সময় আবার স্বল্প সুরের আভাসসহ গান ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটা কিছু করা হয়। ছড়া মানেই শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে রচিত কোনো সাহিত্য-পদার্থ নয়; পয়ার-ত্রিপদীতেও বহু ছড়া রচিত হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ ও তানপ্রধান ছন্দের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটছে ছড়াতে।[১] বিবিধ মন্ত্র-ছড়াতে এই মিশ্রণ বেশিপরিমাণে দেখা যায়। ওই মিশ্রণই ছড়ার ব্যাপকভাব প্রমাণ। স্বরাঘাত যদি আবৃত্তির দিকটি তুলে ধরে তানের প্রাধান্য তবে গীতির আভাসকে স্বীকার করে। কেবল মন্ত্র-ছড়াই নয়, ঘুমপাড়ানী গান ও ছেলে ভুলোনো ছড়া অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের গায়ে এসে মিশে যায়। একই ছড়া কোথাও কম-বেশি সুরের আভাসসহ গীত হয়, কোথাও বা তাই আবার নিছক আবৃত্তিই করা হয়। অনেক ছড়া পড়লে মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে হয়, মনে হয় নির্ঘাত ছন্দ-পতন ঘটেছে। আসলে ওইসব জায়গা সুরের ডিঙিতে ডিঙোতে হয়, তখন তার ছন্দ-পতনের দোষ ঘুচে যায়। সুর প্রকাশের সুযোগের জন্যেই অমন ব্যবস্থা।

উদাহরণ দিই। বর্তমান সঙ্কলনের ২১৯-সংখ্যক ছড়াটিকে একটি বিয়ের গান রূপে রঙপুরে পাওয়া যায়। তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকায় রঙ্গরস' (অলকা· বৈশাখ, ১৩৪৭। পৃ. ৬৮৪-৬৯১) নামে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ভাদু ও টুসু (তুষু, তুষলা, তোষলা)-র গান মূলতঃ ছড়াই। ভাদু-টুসুর যেসব গান আনুষ্ঠানিক, সেসব সুর সহযোগেই মোটামুটিভাবে সাধারণ ক্ষেত্রে গীত হয়। কিন্তু রাত্রি জাগরণের সময় যে প্রতিযোগিতামূলক গান হয় (যাকে কোথাও কোথাও বলে 'আলানী' দেওয়া), তার মধ্যে ছড়ার ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। দ্রুততার জন্যে, প্রতিপক্ষের প্রশ্নের প্রতিধ্বনিবৎ উত্তর দেবার প্রয়োজনীয়তায়, ঢোল-কাঁসির সঙ্গে তাল মেলাতে, এতে শ্বাসাঘাত ও ছড়ার ভাব এসে পড়ে। যেমন এই ভাদু-গানটি . জল ঝমাঝম্ ঝম্। /সুখের ভাদ্রে ভাদু এল,/ সব দুঃখ ভেসে গেল—/বরষ পরে হরষ ভরে/ঘর গমাগম্ গম্। একটি টুসুর ছড়া-গান দেখেছি, যার প্রথম

১ লোককথার কোনো কোনো বিশেষ অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছড়াতেই প্রদত্ত হয়। কখনো তা ছড়ার মতো নিছক আবৃত্তি করা হয়, কখনো তাতে লাগে ঈষৎ সুরের আভাস, কখনো বা সে ছড়া হয়ে ওঠে একেবারেই গান। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই জন্যেই রূপকথাকে বলা হয় 'রোদনকহনী'—অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ছড়া কান্নার সুরে ব্যক্ত হয়।

পঙ্‌ক্তি একটি সুপরিচিত ছড়ারই পঙ্‌ক্তি: টুসু যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে/ ঘরে আছে গণেশ ঠাকুর, তাকে পাঠিয়ে দে। টুসুর একটি 'আলানী' ছড়া: আমার টুসু মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝম্‌ঝম্ করে গো/উয়ার টুসু হতভাগী আঁচল পেতে মাগে গো।[১] পড়া মাত্রই বোঝা যায়, রচনার দিক থেকে এগুলো ছড়া তবে সুরের দিকও আছে। জীবনহরি সামন্ত তাঁর 'ভাদুপরব' (প্রবাসী: আশ্বিন, ১৩২১। পৃ. ৭৫৩-৭৫৬) নামে প্রবন্ধটিতে এ নিয়ে মন্তব্য করেছেন: "অন্য গানের সহিত এই গানের (ভাদুগানের) সুর বিভিন্ন; ইহাকে ভাদুর সুর বলা যায়। "দেখে যা লো কুসুম, বাঁকুড়াতে ভাদুপূজার বড় ধূম" এইটি তাহাদের সুর রাখা পদ বা ধুয়া। প্রত্যেক গানের শেষে এইটি যোগ করে সুর বাঁধা হয়। গানগুলি এইরূপ: "চল্ সাবদা, চল্ বরদা, কুলিতে বাঁধ বাঁধ্‌বো/কুলির জলে সিনান করে ঝবকায় চুল শুকাবো।"

জীবনহরি সামন্ত যে সুর-রাখা পদের কথা বলেছেন, তা হয়তো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু গানের নামে যে রচনাটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তা নির্ভেজাল ছড়া বই অন্য কিছু নয়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তোষলাকে লক্ষ্য করে গান গাওয়া হয়, তবে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াই আবৃত্তি করা হয়। কিন্তু রচনাভঙ্গিতে ছড়ার ভাব সর্বত্রই থাকে, ওপরে উদ্ধৃত রচনাটি তার প্রমাণ। আমরা অনুমান করি, প্রাথমিক যুগে সব অঞ্চলেই ছড়া কাটা হত, কেননা, বাঙলার ব্রতের মধ্যে সাধারণভাবে গানের চেয়ে ছড়ারই প্রাধান্য অনুভূত হয়, উপরন্তু রচনাভঙ্গিতে ছড়ার ভাবটি তো আছেই। ভাদু ও টুসুর গানে এবং ছড়ায় উভয়কেই শিশু-মূর্তিতে কল্পনা করা হয় অনেক সময়। তখন নিছক ছেলেভুলোনো ছড়ার সঙ্গে ভাদু-টুসুর ছড়ার কোনো তফাত থাকে না। এদিক থেকেও ছড়ার প্রভাব এতে আসতে পারে।

অজয় নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে যে 'ভাঁজো'র অনুষ্ঠান হয়, তাতেও ছড়ারই প্রাধান্য। 'গানে'র টীকা-মন্তব্য রূপে যেসব পদ্যময় উক্তি করা হয়, তাকে বলে 'রঙ্ ছড়া'। এই 'রঙ্ ছড়া' ভাদু-টুসুতেও দেখা যায়। নারীর ব্রত এবং ছড়ার আধিক্য দেখে কেউ যেন মনে না করে ফেলেন, নারীর অনুষ্ঠান

১ ভাদু-টুসুর ছড়াগুলি 'বসুধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত তুলসীদাস সিংহের সংগ্রহ থেকে গৃহীত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বলেই এতে ছড়ার প্রচলন হয়েছে। যে-সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, রাঢ়ের কোনো কোনো অঞ্চলে পুরুষরাও এই সব ব্রতে অংশ নিয়ে থাকে, যদিও তার পরিমাণ অতি নগণ্য।

একদা কবি-তরজা-পাঁচালি গানের অংশ বিশেষে ছড়া প্রযুক্ত হত। এই সব গানে, গান বলেই সুরের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু ছড়াও কাটা হয় নানা কারণে। মূলত: এর ঐতিহ্য মধ্যযুগের। মধ্যযুগে আখ্যায়িকা-পাঁচালি গাইবার সময় বিশিষ্ট কোনো কোনো অংশ দ্রুত ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে যাওয়া হত, যাকে বলা হত 'শিকলি,' যা ছড়ার উচ্চারণ ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈচিত্র্য সৃষ্টি ছিল এর একটি প্রধান কারণ। কিন্তু রীতিটি বাঙলা দেশের এক সর্বজনীন সাহিত্য-রীতি থেকে গৃহীত। যে রীতি সকলের জানা, সে রীতিতে ভারত-কথা থেকে শুরু করে যে কোনো বিষয় প্রকাশ করা যায়,—আপামর জনসাধারণের কাছে যে কোনো বক্তব্য পৌঁছে দিতে, কাজেই, এর জুড়ি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন কবি-পাঁচালি-তরজা গানের বন্যা বইছিল, তখন একদিকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার 'শেষ গানের রেশ', অপর দিকে বাঙলার আবহমানকাল চলিত সাহিত্য-রীতি অর্থাৎ ছড়ার ভঙ্গি,—এই দুই কারণে তাতে ছড়ার ভূমিকা দেখা গেল। দাশরথি, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি সেকালের সেরা গান বাঁধিয়েরা সকলেই চমৎকার ছড়াও রচনা করেছেন।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালারাও কবিগানে ছড়া ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'কবি ভোলানাথ রায়' (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩২৬। পৃ. ২৪৭-২৪৮) এবং বিজয়নারায়ণ আচার্য লিখিত 'কবি লোচন কর্মকার' (সৌরভ : আশ্বিন, ১৩২৬। পৃ. ২৬৩-২৬৭) প্রভৃতি প্রবন্ধে কথিত কবিওয়ালাদের ছড়ার কথা উল্লেখ করা যায়।

এই ছড়া কাটা মৌখিক যাত্রার মধ্যেও দেখা যায়। 'ঠঃ'—এই ছদ্মনামধারী লেখকের [ইনি কি ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ?] 'মৈথিল যাত্রা' (নবজীবন : ফাল্গুন, ১২৯৪। পৃ. ৪৮৯-৪৯৩) নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যাত্রার অধিকারী সংস্কৃতে ছড়া কাটেন এবং তাতে 'সং'ও আছে। উক্ত লেখকের অনুমান, বঙ্গীয় যাত্রা এই সব দিকে মৌখিক যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত।

মধ্যযুগীয় এবং অন্ত্য-মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে, দেব-দেবীদের কর্ম-কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে কবিরা যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই লৌকিক ও ঘরোয়া নানা বিষয়কে ভিত্তি করে খুচরো ছড়া-কবিতা লিখেছেন।

হয়তো অপ্রধান কবিরাই এদিকে বেশি পরিমাণে মন দিয়েছিলেন, তবু এই সাহিত্য-ঐতিহ্যটি অবিস্মরণীয়। এর দৃষ্টান্ত মেলে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত, তিন খণ্ডে পূর্ণ, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচয়' (১ম খণ্ড: আষাঢ়, ১৩৫৮। ২য় খণ্ড: ফাল্গুন, ১৩৬৪। ৩য় খণ্ড: মাঘ, ১৩৬৯) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে অন্ত্য-মধ্যযুগীয় অনেক ছড়া, ছড়া-কবিতা বা তজ্জাতীয় রচনার নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে সংগৃহীত পুঁথি থেকে। কয়েকটির উল্লেখ করছি: প্রথম খণ্ড থেকে: গাঁজা ও তামাকুর গান, এবং ওই পুঁথির উল্টো দিকে 'ইষু বিষু দুটি বুন' ইত্যাদি 'একটি মজার ছড়া'র উল্লেখ, ৬২। বাঙ্গালা মন্ত্র: ৬৪, ৯৩, ১০১, ১২৯, ১৩১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ প্রভৃতি সংখ্যক রচনা। বানের কবিতা (দ্বিজ দ্বারকানাথ বিরচিত। আমরাও একটি বানের ছড়া সঙ্কলিত করেছি), ৬৫। গঙ্গাস্নান যাত্রার ছড়া,[১] ১৬৯। কালী প্রস্তুতের ছড়া[২], ১৭২।

দ্বিতীয় খণ্ড থেকে: ছড়া: ৯৬, ৯৭, ৯৮ (কড়চা), ৯৯ (প্রশ্নোত্তরী), ১০০, ১০১ প্রভৃতি সংখ্যক রচনা। কালী প্রস্তুতের ছড়া, ৩৭। বানের কবিতা, ১৮৮। বাঙ্গালা মন্ত্র: সং ১৭৯-১৮৭। তৃতীয় খণ্ড থেকে: ছড়া ৩১, ১৬৭। বানের কবিতা, ৬৯। বাঙ্গালা মন্ত্র: সং ৬৫-৬৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬।

প্রস্তুত সঙ্কলনে আমরা যেসব মন্ত্র-ছড়া সঙ্কলিত করেছি, রচনাভঙ্গির দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থে প্রাপ্ত মন্ত্রগুলির একটি বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্থাৎ মন্ত্রেরও রচনারীতিতে ছড়ার প্রভাব পড়েছে। 'ছড়া' বলে কথিত রচনাগুলির সঙ্গে তো আছেই।

যে সব অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন, সেই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেও ছড়ার আসঙ্গ লক্ষ করা যায়। যেমন 'সঙের' ছড়া। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লিখিত 'বাংলা দেশের সঙ প্রসঙ্গে' (দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা। ১৯৭২) বইটিতে এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। সঙের সঙ্গে বাঙলার লোক-মানস ও জনরুচির একটি নিবিড় ঐক্য অনুভব করা যায়। প্রধানতঃ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সঙ বের করা হলেও বৎসরের নানা অনুষ্ঠানে (যেমন, জন্মাষ্টমীতে) নানাপ্রকার মনোরঞ্জনের জন্যেও সঙ সাজা হত। সঙ সেজে

---

১ তুলনীয়: বর্তমান সঙ্কলনের ৩১৯-সংখ্যক ছড়া।

২ তুলনীয়: বর্তমান সঙ্কলনের ৪৮৪-সংখ্যক ছড়া।

ছড়া কাটা হত[১]। বিবাহসভায়, রাজসভায়, 'ভাঁড়'রা ছড়া কাটত, 'বহুরূপী'রাও নানা প্রকার বেশ ধারণ করে ছড়া কাটে। সঙের ছড়া নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। কখনো তা সমকালীন রাজনীতি বা সমাজ চর্চা, কখনো তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্রতায় ঝাঁঝালো, আবার কখনো বা নিছকই রঙ্গকৌতুক। পৌরাণিক বিষয়কে ভিত্তি করেও সঙের ছড়া দেখা যায়। 'গম্ভীরা' গানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ সঙ সেজে ছড়া কাটা। সাধারণ ছড়াতে যেমন নানা কারণে হিন্দী-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণে ছড়া রচনা করা হয় (যার দৃষ্টান্ত বর্তমান সঙ্কলনেও প্রদত্ত হয়েছে), সঙের ছড়ার ভাষাতেও তেমনি। যাত্রাতেও সঙ সেজে ছড়া কাটা হয়। কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চলে এক সময়ে সঙের ছড়ার বিশেষ নাম ছিল। বাগবাজারতলা, ২৪ পরগণা, শ্রীরামপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব উপলক্ষে সঙ বের হত, ছড়াও কাটা হত।

১৩২১ সাল থেকে সঙের ছড়া একটি বিশিষ্টতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক সঙের ছড়া লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন : অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, রসময় লাহা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শরৎ পণ্ডিত, মনোমোহন গোস্বামী, সতীশচন্দ্র ঘটক, নিত্য-বোধ বিদ্যারত্ন, কবিশেখর কালিদাস রায়। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে নানাবিধ সঙের ছড়া সঙ্কলিত করেছেন।

বীরেশ্বর বাবুই আর এক ধরণের ছড়ার কথা বলেছেন, যার নাম 'হেটো কবির ছড়া'। 'হেটোকবি' মানে 'হাটে'র কবি, পথ-ঘাটের কবি। হাটের দিনে, কিংবা পথে-পথে কিংবা কবি-তরজার আসরে যে ছড়ার বই কেনা-বেচা হয়। সামাজিক ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা বা সংগৃহীত ছড়া অতি নগণ্য মূল্যে, দীন-হীনভাবে মুদ্রিত করে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। কলকাতার বটতলায়, গ্রাম-গঞ্জের হাটে-বাটে এ সাহিত্যের রসিকও জুটে যায়, তাঁদেরই জন্যে এ পসরা সাজানো হয়। বীরেশ্বর বাবু এমন ছড়ার নিদর্শন দিয়েছেন (দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা। ২১ বৈশাখ, ১৩৮০। পৃ. ১০৬১-১০৬৪)। বাঙালী তার মনের প্রতিধ্বনি এর মধ্যে খুঁজে পায় বলেই আজও তা নিয়ে বেসাতি চলে, কবির কলমও চলে।

১ দ্রঃ এই সঙ্কলনের সঙের ছড়া।

মধ্যযুগীয় ধারাকে অনুসরণ করে যে সব সঙ্গীত গীত হয়ে থাকে, তাতেও ছড়ার প্রভাব দেখা যায়। মাণিক পীরকে অবলম্বন করে রচিত গানে (দ্রঃ নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ : মধ্যবঙ্গের গ্রাম্যগীতি / মাণিক পীর : মাসিক বসুমতী : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭। পৃ. ২৫৩-২৫৫), কিংবা গাজীর গানে, কিংবা জারী গানে (দ্রঃ এস্. এম্ লুৎফর রহমান লিখিত প্রবন্ধ : জারী গানের গীত-পদ্ধতি : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬। পৃ. ২২-৫২) ছড়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখা যায়। রাঢ় বঙ্গের বোলান গানে, বিভিন্ন অঞ্চলের গাজনের গানে (দ্রঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ · নদীয়া ও যশোহরের গাজনগীতি : মাসিক বসুমতী মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৭), জলপাইগুড়ির 'মরিসুবিয়া গানে' (দ্রঃ আমার লিখিত 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' · কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭), ছড়ার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি রচনারও স্থানবিশেষ ছড়াময়।

ধাঁধা এবং প্রবাদের গঠনভঙ্গি পুরোই ছড়ার। প্রবাদের সঙ্গে ছড়ার যে একটি গভীর যোগ আছে, প্রবাদের সঙ্কলনগুলির দিকে তাকালেও তা বোঝা যায়। অনেকে প্রবাদের সঙ্কলনকে ছড়ার সঙ্কলন বলেছেন। অনেক নীতিমূলক প্রবাদ ছড়াধর্মী, বর্তমান সঙ্কলনেই তার প্রমাণ আছে। ছড়ার মতো প্রবাদও মুখের ভাষা বা চলতি ভাষাকে আশ্রয় করে থাকে। বর্ণনার তীক্ষ্ণতা, ক্ষিপ্রতা, উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। শ্বাসাঘাতের বিশিষ্টতা দুয়ের মধ্যেই আছে। 'বাংলা প্রবাদ' (দ্বি সং ভাদ্র, ১৩৫৯) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ২৮) ডঃ সুশীলকুমার দে লিখেছেন · 'প্রবাদগুলি প্রায়ই ছড়ার আকারে ব্যক্ত, কিন্তু এগুলি ঠিক কবিতার চরণ নয়।' আমরা মনে করি, অনেক প্রবাদই কবিতার চরণ বা চরণাংশ, এবং এতে ছড়ার সঙ্গে প্রবাদের ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণিত হয়। ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ যে আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো বলেছেন, ডঃ দে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে প্রবাদের মধ্যেও তা দেখতে পেয়েছেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণকে আমরা সমর্থন করি।

ছড়া ও প্রবাদের আত্মীয়তা নির্দেশ করতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। আদর বিবি চাদর গায়, ভাত পায় না ভাতার চায়—এখানে 'আদর-চাদর' ও 'ভাত-ভাতার'-এর ধ্বনি সাদৃশ্য, সহচর শব্দবৎ প্রয়োগ লক্ষণীয়। কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই/গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই—

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একই বাক্যের দ্বিরাবৃত্তি এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে গিন্নী ও বউয়ের প্রতি ব্যবহার ভিন্নতার মধ্যে 'পাতে'র দ্বিরাবৃত্তি ছড়ার ভাব এনেছে। এই রকম মিলের আভাস এখানেও দেখি : জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর (এখানে 'জা-জাউলী' এবং 'আপনাউলী' মিলের আভাস দিচ্ছে, তা শব্দগত ও ভাবগত দুই-ই। কিন্তু বিপরীত ভাবের দিক ননদের কথা, এবং দুই দিকের সমতায় Antithesis রচনায় ছড়ার ভাব এনেছে)। এই রকম : পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে/পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে ॥ রঙ গেল, ঢঙ গেল, রস গেল দূর/নির্ধনের হাতে পড়ে দর্প হল চূর ॥ একচির পান ছুচির হল, সোনার পাটে ভাগ বসাল ॥ নিম তেতো' নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র/তার চেয়ে অধিক তেতো বোন সতীনের ঘর ॥[১]

ধাঁধার সঙ্গেও ছড়ার অন্তরঙ্গতা দেখা যায়। প্রবাদকে যেমন ছড়া বলেছেন অনেকে, তেমনি ছড়ার সঙ্গে ধাঁধাকেও সঙ্কলিত করেছেন কেউ কেউ। ছড়া যেমন আনুষ্ঠানিক হতে পারে, ধাঁধাও তাই। অনেক সময় বিবাহ,[২] মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ধাঁধা কথিত হয়। ছড়া ও ধাঁধা উভয়েই মন্ত্র-ধর্মী হতে পারে। দুয়েরই ছন্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি এক। ধাঁধাতেও ছড়ার মতো কাহিনীর কণা ছড়ানো থাকে : রাজা-রাণী, বুড়ো-বুড়ী, বউ-কন্যা, এবং অন্যান্য বিচিত্র নারী-পুরুষ চরিত্রের উল্লেখ, এবং এক ঝলক আলোকপাতে তাদের এঁকে ফেলা—ধাঁধাতেও দেখা যায়। শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, পুনরাবৃত্তি, কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের নিষ্কারণ উল্লেখ,—ছড়ার মতো ধাঁধাতেও আছে। উপমা প্রয়োগেও আছে সাদৃশ্য। প্রতীকতার ব্যবহার দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কিছু দৃষ্টান্ত দিই। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত 'লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। পৌষ, ১৩৭৫) বই থেকে দৃষ্টান্তগুলি নিচ্ছি। এই গ্রন্থের ২১৫-সংখ্যক (পৃ. ৭২) ধাঁধাটি একটি কাহিনীমূলক ধাঁধা, ছড়ার অন্তর্নিহিত কাহিনীর সঙ্গে যার তুলনা করা যায়। ছড়া ও ধাঁধার রচনাগত সাদৃশ্যের অন্যান্য দৃষ্টান্ত : 'জিহ্বা' সম্পর্কে একটি ধাঁধা : ইকর গাছে ঝিকর নড়ে,/মানা করলে আরও নড়ে (পৃ. ২৮)। 'চুন' সম্পর্কে : উঠান

১ দৃষ্টান্তগুলি ডঃ সুশীলকুমার দে-সঙ্কলিত 'বাঙলা প্রবাদ' (দ্বি. সং ১৩৫২) থেকে নেওয়া।

২ যেমন ওরাওঁদের মধ্যে।

ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি/কোন্ কুমারে গড়ছে ঘাটি…(পৃ. ২৯)। 'কলাগাছ' সম্পর্কে: বারমাসের মেয়ে বটে, তের মাস গেলে… (পৃ. ৩০)। 'পান' সম্পর্কে: ইকড়ের কড়মড় মাকড়ের আঁশ/ ফুল নাই, গোড়া নাই, ধরে বারোমাস (পৃ. ৩১)। 'চিঁড়ে' সম্পর্কে: এত্ কুল, বেত্ কুল, মেটে কুলার ছাও…(পৃ. ৩৭)। 'হাট' সম্পর্কে: এতম গাছে বেতম ধরে, / ধরতে ধরতে আরও ধরে · (পৃ. ৩৮)। 'জোঁক' সম্পর্কে: দাম ভুর্‌ভুর্ দাম ভুর্‌ভুর্ দামের তলে বাসা / হাড্ডি নাই, গুড্ডি নাই, মানুষ খাওনের আশা, (পৃ. ৩৯)। 'মেঘ ও বৃষ্টি' সম্পর্কে: এত্ গাছ টান দিলে বেত্ গাছ নড়ে / কুক্কুরে ডাক দিলে ঝন্‌ঝনাইয়া পড়ে (পৃ. ৪০)। 'ওড়া জাল' সম্পর্কে: উড়্ইয়া যায় পক্ষী জুড়াইয়া যায় বিল / সোনার বাটরা রূপার খিল (পৃ. ৪২)। 'আখ' সম্পর্কে: এম্বু, লেম্বু, তেম্বুর গাছ / একটা লেম্বু বাইশ হাত (পৃ. ৪৯)। 'প্রভাতকালীন সূর্য' সম্পর্কে: আলু পাতা ঠালুব ঠল্লুব বিন্না পাতা কেশ[১] / নয়া রাজা দীঘি দিছে পূবে তাহার দেশ (পৃ. ৫৯)। 'ময়ূব' সম্পর্কে: পড়িতে ঝুম্‌ঝুম্ করিতে রাও / সোনাব কটরা রূপাব পাও (পৃ. ৫৯)। 'তেঁতুল' সম্পর্কে: দোল্ দোল্ দুলেছি / ছেলে বেলা খেলেছি / বুড়ো হলে সুন্দরী হব / নেংটা হয়ে বাজারে যাব (পৃ. ৭৫)। এইসব উদাহরণ থেকে ছড়ার সঙ্গে ধাঁধার ঘনিষ্ঠতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

ছড়ার সঙ্গে লোকনাট্যেরও এক গভীর যোগ দেখা যায়। তবে মূলতঃ খেলার ছড়ার সঙ্গেই এই যোগ দেখি। অনেকেই মনে করেন, খেলার মধ্যে যে অভিনয়ের দিক আছে (যেমন, বাঘ-বাঘ, কুমীর-কুমীর, বা শেয়াল-শকুন খেলাতে বাঘ-কুমীর-শেয়াল-শকুন সাজা হয়), তা কালক্রমে নাট্যে উন্নীত হয়েছে। ছড়ার প্রশ্নোত্তরমূলকতা ও সংলাপ, কাহিনীর ক্ষীণ আভাসের পটভূমিকায় সংলাপ, প্রভৃতিও নাটকের আভাস আনে। 'ঘুঘুসই' খেলার ছড়ায় ঘুঘুকে 'সই' বলে সম্বোধন, কিংবা কাককে 'বোন' বলে সম্বোধন করা (দ্রঃ বদিউজ্জামান সম্পাদিত: 'লোক-সাহিত্য ১২শ': বাঙলা একাডেমি, ঢাকা। ফাল্গুন, ১৩৮২। পৃ. ৭৩-৭৪) প্রভৃতি অভিনয়াত্মক।

সর্বোপরি ছড়ার নিজস্ব শ্রেণীভাগের মধ্যেই নেই কোনো স্থিরতা-নিশ্চয়তার পরিচয়। এক শ্রেণীর বা বিষয়ের বা অনুষ্ঠানের ছড়া স্বচ্ছন্দে এবং অবলীলাক্রমে

১ অবিকৃতভাবে এই পঙ্‌ক্তিটি একটি বহুখ্যাত ছড়াতে মেলে।

অন্য শ্রেণী-বিষয়-অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূত হয়ে যায়। এও ছড়ার এক বিশিষ্ট প্রকৃতির দিক। এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতের ভেতর গিয়ে কেমন করে ঠাঁই করে নেয়, বর্তমান সঙ্কলনের দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে। এক খেলার ছড়া আর এক খেলাতে, এবং এমন কি, ব্রতের ছড়া খেলাতে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ক'টি উদাহরণ দিই[১]। বদিউজ্জামান সম্পাদিত প্রাগুক্ত গ্রন্থে 'পুণ্য পুকুর পুষ্পমালা / কে বুঝিবে সকাল বেলা' (পৃ. ৮৮। সং ৯) ছড়াটিকে ফরিদপুরের 'আবৃত্তিমূলক খেলার ছড়া' বলা হয়েছে। আসলে এটি 'পুণ্যিপুকুর' ব্রতের ছড়া, 'বুঝিবে'র জায়গায় হবে 'পূজিবে' বা 'পূজে রে'। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর 'লোক-সাহিত্যে ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। বৈশাখ, ১৩৬৯) গ্রন্থে (পৃ ৯০। সং ১৯) 'হেলেঞ্চা কলমী লকলক করে / রাজার বেটা পক্ষী মারে' ইত্যাদি বিখ্যাত ব্রতের ছড়াটিকে (যা একাধিক ব্রতে এবং লোককথায় পাওয়া গেছে) কিশোরগঞ্জে প্রচলিত 'হা-ডু-ডু' খেলার ছড়া রূপে উল্লেখ করেছেন[২]। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে স্বতঃই মনে হয়, বাঙালী যখনই যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে, তখন প্রাসঙ্গিকতা থাকুক চাই না থাকুক, ছড়ার আশ্রয় নিয়েছে,—তা সে ছড়া যে কোনো বিষয়ের, যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনো অনুষ্ঠানেরই হোক না কেন। বাঙালীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে ছড়া এমনই এক বিরাট, ব্যাপক ও বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে থাকে।

অমার্জিত ও অনভিজাত সাহিত্যের কথা দূরে থাক, শিষ্ট ও মার্জিত সাহিত্যেও ছড়ার অবাধ প্রকাশ দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা গেছে, যেখানেই তিনি লঘু, সহজ ও ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সেখানেই ছড়া এবং ছড়াধর্মী সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্যামা-সুন্দরীর কণ্ঠে, 'বিষবৃক্ষে'র একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে 'হীরার আয়ি'কে লক্ষ্য করে ছড়া প্রদত্ত হয়েছে। ছড়ার প্রয়োগ 'ইন্দিরা'-তে বোধ করি সর্বাধিক। এই উপন্যাসের অষ্টম, নবম এবং একবিংশ পরিচ্ছেদে ছড়ার আশ্রয় নিয়েছেন

---

১ 'খুকুমণির ছড়া'র (১৬শ সং) 'ঐ আসছে' (সং ৩৩২) ছড়াটি বর্তমান সঙ্কলনের একটি মাঘমণ্ডলের ব্রতের ছড়ার (সং ৭৩) সঙ্গে মেলে। খেলার ছড়া ও ব্রতের ছড়ার এই অভিন্নত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে

২ ছড়াটি 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) বইতেও (সং ৩৫৪) প্রদত্ত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু উপন্যাসেই নয়, 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধেও এই রীতির প্রভাব দেখা যায়। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বড় বাজার' প্রবন্ধ থেকে মেছুনীর উক্তি উদ্ধৃত করা যায় :

"মেছোনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো—বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো!—ধন সাগরের মিঠা মাছ— হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পালায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরস পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরস পুঁটি বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! ·"

ঈশ্বর গুপ্তের তাবৎ কবিতাবলীর মূল ছন্দ ও ভঙ্গি ছড়ারই। সাময়িক কোনো বিষয় বা ব্যাপার, সামাজিক কোন নিন্দা-প্রশংসার ঘটনা, রাজনৈতিক কোনো সমর্থন-অসমর্থনের পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক বা নৈসর্গিক কোনো পরিস্থিতি (যা উত্তরবঙ্গের 'মেছেনী', 'চোরচুন্নী' বা গম্ভীরাতে, পশ্চিমবঙ্গের ভাদু-টুসু-বোলান-গাজনে গৃহীত হয়), তা নিয়েই ছড়ার একটি বড়ো দিক, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীও তাই। তার ওপর ছন্দের দিকটা তো আছেই। এই ছড়ার ভঙ্গিটাকে আয়ত্ত ও আশ্রয় করেছিলেন বলেই, প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর কবি না হওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত-কবি তাঁর জীবৎকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই রীতিটাই যে বাঙালীর রুচিরই একটি দিক, তিনি সেটা সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

গুপ্ত-কবির পর যে কেউ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন কিংবা জনরুচির নিকটবর্তী হতে চেয়েছেন, তিনিই এ রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বা 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা-ভঙ্গিতেও রয়েছে এই ছড়ার ছাপ। কখনো বা ছড়ার পঙ্‌ক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি। সংবাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে তখন ছিল ছড়ার বিশেষ প্রভাব। রঙ্গ-কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার জন্য ছড়া পাশুপত অস্ত্রের চেয়েও অব্যর্থ ও অমোঘ। উনবিংশ শতক জুড়ে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ-বিষয়ক যে বিচিত্র কর্ম-কোলাহল চলেছিল, একমাত্র ছড়াই পারত বা পেরেছে তাকে বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতিতে এঁকে রাখতে।

সংবাদপত্রের গ্রাহক বাড়াবার জন্যে কিংবা গ্রাহকদের দেয় চাঁদা উদ্ধারের জন্যে কিংবা পত্রের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে ছড়ার সাহায্য নেওয়া তখনকার দিনের একটি রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় (৩রা ফাল্গুন, ১২৬৩) গ্রাহক-বন্দী কাব্যছড়া বের হয়েছিল (শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', চতুর্থ খণ্ড, জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ৬৩৩-৬৩৪, বইতে সেটি উদ্ধৃত করেছেন)। কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' (দাম ছিল এক পয়সা, তাই সুলভ) পত্রিকার নামের নীচে উদ্ধৃত থাকত একটি ছড়া-কবিতা: সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞানধন / সুলভ সমাচার কর অধ্যয়ন।...ইত্যাদি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ো থেকে বের করতেন 'সাধারণী' ('সাধারণী,' 'সুলভ সমাচার'—এসব নাম থেকেই জনতার কাছাকাছি আসবার প্রবণতা ধরা পড়ে) পত্রিকা। চাঁদা বাকী পড়া এ দেশের সংবাদপত্রের একটি অলঙ্ঘ্য নিয়তি। সেই বকেয়া চাঁদা পুনরুদ্ধারের জন্যেও অক্ষয়কুমারকে ছড়ারই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ছড়াটি আমরা বর্তমান গ্রন্থের সঙ্কলন অংশে উদ্ধৃত করেছি। বাস্তবিক, ঊনবিংশ শতকের যে কোনো বিশেষত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটেছে, তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছড়া বাঁধা হয়েছে।[১] সেই সব ছড়ার অনেকগুলিই আজ অবলুপ্ত, তার আংশিক পুনরুদ্ধার হলেও অনেক তথ্য জানা যেত।

অবশ্য এর পেছনে মূলতঃ ক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য। মধ্যযুগীয়-ই বা শুধু বলা কেন, বলা যায়, এ রীতি এক বিশেষ প্রাচীন রীতি। বিশ্বের সর্বদেশেই এ রীতি দেখা যায়। বিশ্বের কথা শিকেয় তোলা থাক, আপাতত এ দেশেরই কয়েকটি বিশেষ দিকের কথা বলি। দেখা যাবে, সর্ব বিষয়েই প্রকাশের ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে (বাছবার কথা ওঠেই না, কেননা, ছিল এই একটাই মাত্র রীতি) এই ছড়ার ভঙ্গিটাকেই।

---

১ সংবাদপত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে এই ধারার জের টেনেছিলেন যাঁরা, তাদের মধ্যে আছেন: অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি। সাময়িকপত্রে খুব বেশি পরিমাণে কবিতা পত্রস্থ করা হয় বলে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মশাই একবার ব্যঙ্গ করে ছড়ার আকারে বলেছিলেন, বাঙলা দেশে এতোই যখন কবিতার প্রাধান্য, তখন এর পর কি আমরা মুদীর দোকানে গিয়েও কবিতায় সংলাপ আওড়াব: আয় মুদী আয়,/পাঁচসের চাল ঢাল আমার ধামায়। পাঁচকড়ির রচনা ভঙ্গিতেও ছড়ার ছাপ পড়েছে, তিনিও ছড়া লিখেছেন। সমসাময়িক বাঙালীকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত ছড়া পাওয়া যায় (দ্রঃ জন্মভূমি। আশ্বিন, ১৩০৮। পৃ. ৭৮-৮১)। 'শনিবারের চিঠি'র একটি সংখ্যা একবার ছড়াতেই বের করেন সজনীকান্ত দাস। ওই সংখ্যার বিজ্ঞাপন-সুদ্ধ ছড়াতে লিখিত হয়েছিল।

এ দেশের একজন নিরক্ষর ফিরিওলাও তার পসরা সাজিয়ে পথে-পথে ফিরি করতে গিয়ে ছড়া কাটে। এক পূর্ববঙ্গীয় ফিরিওলার মুখে ছড়া শুনেছি : যত সব পোলাপান / মায়ের থিক্যা পয়সা আন্। পসরা সম্পর্কে ফিরির ছড়া লণ্ডনের পথেও শোনা যায়। তুলনার জন্যে ক'টি এখানে উপস্থিত করছি :

১. Diddle, diddle, diddle,
Dumplings, O! Hot, hot!

২ One a penny, two a penny,
Hot cross buns!

৩ Ready picked green gooseberries
Eight pence a gallon!

৪ Primroses, Primroses!
Buy my spring flowers!

৫ Cowslips and spring flowers
A half Penny a bunch!

৬. My old soul,
Will you buy a bowl!

৭. Hot spice ginger bread,
All hot!

৮. New Almanacks, new—
Some lies, some true,
Buy a new Almanack![১]

আমাদের দেশের প্রচলিত ফিরিওলার ছড়ার সঙ্গে লণ্ডনের এইসব Street cries, ফিরিওলার ছড়ায় ভাব ও রচনাগত দিকের চমকপ্রদ মিল খুঁজে পাই। অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ অবস্থা-পরিস্থিতিতে মানুষের মন একই ভাবে কাজ করে এবং তার প্রকাশভঙ্গিও অভিন্ন হয়। লণ্ডনের এই সব ছড়া সুর করে গাওয়া হত, প্রত্যেক ফিরিওলার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা থাকত,—কয়েকজন গীতিকার ও সুরকার এই সব ছড়ার সুর নিয়েই গান রচনা

১ The New Wonder World (A Library of knowledge): George L. Shuman and co., chicago, 1944. vol.V. P. 250.

করেছেন। এইভাবে লোকজীবনে ছড়িয়ে থাকা সুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাহিত্যে ঠাঁই পেয়েছে। আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাহিত্যে যে ঠাঁই পেয়েই থাকে, বিশ্বব্যাপী তার নিদর্শন এতই প্রচুর যে, দৃষ্টান্ত সঙ্কলন অনাবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে, এই বিশেষ ধরণের সাহিত্যরীতি যে কোনো প্রয়োজনেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এর প্রয়োগ-ক্ষেত্রের তাই কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। বর্ণশিক্ষার কয়েকটি ছড়া প্রস্তুত সঙ্কলনে আমরা দিয়েছি; অনুরূপ ছড়া বিহারেও পাওয়া যায়। সেখানে একে বলে 'হরফ-পহচান' ছড়া। রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রাম অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারম্ভ' (ভারতী। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। পৃ. ৯৯-১২৩) নামে একটি রচনাতে তেমন একটি ছড়া দিয়েছেন: ক—কা কো কোরোয়া। খ—খা বীজ খাট্টা। গ—গাবে নেড়িয়া। ঘ—ঘা সো রোট্টা। ঙ—আঁপোক বান্দা। চ—চ তিন-কোনা। ইংরিজিতে পাই: "A Aphle-pasty, B bak'd it, C cut it, D devided it, E eat it, F fought it, G got it…" দেখতে পাচ্ছি, বর্ণশিক্ষার ক্ষেত্রেও ছড়াকে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বংশপরিচয়-জ্ঞাপক ও কুলজী-বিষয়ক ছড়াও পাওয়া যায়, তার দু-একটি নিদর্শন প্রস্তুত সঙ্কলনেও মিলবে। একই ভাবে মারবারগণও নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে এইভাবে: আখ্‌কা ঝোপরা, / ফোখ্‌রা বাড়্‌, / বাজরা কা রোটি, / মথরাকা ডাল, / দেখ্‌হো রাজা, তেরি মারবার। অর্থাৎ আখের ঝোঁপ, কাঁটার বেড়া, বজরার রুটি এবং 'মথ্‌রা' ('মঠ' ডাল, মুগডাল বিশেষ)-র ডাল, মরুক্ষেত্রে মারবারদের পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্ন। ছড়াটি 'আকবর সাহের হিন্দু-প্রীতি' (ভারতী। পৌষ, ১৩০১। পৃ. ৫২৫, পাদটীকা) নামে একটি প্রবন্ধে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন।

বাঙলা দেশের হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ে বিবাহে ছড়া পাওয়া বা ছড়া কাটা হয়। ওড়িশাতে পাওয়া যায় বিয়ের মন্ত্র-ছড়া। বরের গলার পৈতের গ্রন্থি বাঁধবার সময় একটি মন্ত্র-ছড়া এই: অশ্বত্থ পত্র খস মস / এ গোত্রে যাই ও গোত্রে পস / লাঙ্গল উপার কন্তি / পড়ু হাত গন্তি। এটি পেয়েছি ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-লিখিত 'খণ্ডপাড়া' (নব্যভারত। আষাঢ়, ১৩১১। পৃ. ১৪২-১৪৯) নামে একটি রচনাতে। শুধু অনুষ্ঠানের দিক থেকে নয়, রচনাভঙ্গির দিক থেকেও এটি বাঙলা ছড়ার আত্মীয়স্থানীয়।

এই পরিচ্ছেদে আলোচিত বিভিন্ন দিক এবং প্রদর্শিত, বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ছড়ার রচনারীতি ও প্রয়োগক্ষেত্রের কোনো

সীমা নেই। একদিকে ছড়ার রচনাভঙ্গি গান-কথা-ধাঁধা-প্রবাদ-ব্যালাড লোকনাট্যে; মধ্যযুগের ও অন্ত্য-মধ্যযুগের নানা লিখিতসাহিত্যে; এবং আধুনিক যুগের অভিজাত সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। অপর দিকে, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে, ছেলে ভুলোতে, জীবনের নানা অনুষ্ঠানে (যেমন, বিয়ে প্রভৃতিতে), কর্মজীবনে, কৃষিকর্মে, নানাপ্রকার মন্ত্রাদিতে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক-নৈসর্গিক প্রভৃতি ব্যাপারকে ব্যক্ত করতে, রঙ্গ-কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যগত দিকের সুবিধা ও সৌকর্যার্থে,—অর্থাৎ এক কথায় জীবন ও ভুবনের যে কোনো বিষয়কে ব্যক্ত করতে, যখন খুশি তখন, যে কোনো দেশে (আমাদের দুই বাঙলা দেশে তো বটেই) এই সাহিত্যরীতিটি গৃহীত হয়ে আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই। আদিম মানুষের মনোভঙ্গির কয়েকটি বিশিষ্ট দিক এর মধ্যে ধরা পড়ে। সেইজন্যই হয়তো ছড়াকে আজকাল কেবল লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত করে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখবার একটি প্রয়াস দেখা যায়। ছড়া লোকজীবন-সম্ভূত ঠিকই, লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাও কিছু অযৌক্তিক নয়,—কিন্তু আমরা মনে করি, ছড়াকে ঠিক কেবল ওই একটি জায়গায় বন্দী করে দেখলে ছড়ার ব্যাপকত্বকে অস্বীকার করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে বিশিষ্ট ধারাটি প্রবহমান, সেই ছড়ার ভূমিকা যেখানে জীবন-পরিব্যাপ্ত, সেখানে ছড়াকে কেবলই 'লোকসাহিত্য' বলে পাশে ঠেলে রাখা ইতিহাস ও সমাজ-জ্ঞানের পরিচায়ক নয়॥

…১২…

প্রায় সকলেই লক্ষ করেছেন, বাঙলা ছড়ার ক্ষেত্রে তার ছন্দটি একটি মুখ্য জিনিস। ছড়া মাত্রকেই অনেকে মনে করেন ছন্দ-প্রধান, কখনো ছন্দ-সর্বস্ব। কেউ কেউ কোনো বিশেষ ছন্দকে বোঝাতেও 'ছড়ার ছন্দ' অভিধা ব্যবহার করেছেন—যেন ওই বিশেষ ছন্দটি ছড়ার একমাত্র এবং অপরিহার্য ছন্দ। ছড়ার ছন্দকে অনেকেই ছড়ার সৌন্দর্য ও তত্ত্বের দিক থেকে দেখেন নি, দেখেছেন বহিরঙ্গীয় একটি কাব্য-বাহন রূপে মাত্র। এই পটভূমিকায় আমরা ছড়ার ছন্দকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে চাই। আমাদের জিজ্ঞাসা এই প্রকার: ১. 'ছড়ার ছন্দ' বলে

আদৌ কোনো বিশেষ একটি ছন্দকে নির্দেশ করা সঙ্গত কি না, অর্থাৎ ছড়ার কেবল একটি ছন্দই আছে কি না, এবং ছড়া রচনার ক্ষেত্রে তাই-ই গ্রহণ করা আবশ্যিক বা অপরিহার্য কিনা, ২. ছড়ার ছন্দটি কি ছড়ার বহিরঙ্গীয় একটি সাধারণ দিক, না কি ছড়ার আত্মা-বস্তুটিকেও তা উদ্ভাসিত করে তোলে, অর্থাৎ ছড়ার সৌন্দর্যের সঙ্গে তার ছন্দটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কি না; ৩. ছড়ার যে কায়া-নির্মিতি ও রূপতত্ত্বের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি, সেই কায়া ও রূপগঠনের ক্ষেত্রে ছড়ার ছন্দটির ভূমিকা কি?

এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে হলে ব্যাপারটিকে গোড়ার দিক থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। ছড়ার মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ আছে। কিছু ছড়া আছে তা কেবল আবৃত্তিই করা হয়, কিছু ছড়া আছে, যা গেয়। শ্বাসাঘাত-স্বরাঘাত-বল-ঝোঁক যাই বলা হোক না, ছড়ার ক্ষেত্রে তা একটি বড়ো জিনিস। তাই দিয়েই ছড়ার তাল রক্ষা করা হয়। কিন্তু যে সব ছড়া নিছক আবৃত্তি করবার জন্যেই, তাতে তাল রক্ষার কোনো কড়াকড়ি নেই। সহজ ও শিথিল ভঙ্গিতে একটি ঢিলেঢালা তালের কাঠামোকে অনুসরণ করে গেলেই সেখানে কাজ চলে যায়। তাল কাটলে বা ছন্দ পতন হলেও সেখানে কোনো দোষ নেই। কারণ তা আবৃত্তিকারীর ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। তাতে গান নেই, অতএব তাল ও ছন্দের দিক স্বভাবতঃই সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু কোনো কোনো ব্রতের ছড়া যখন সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় (একক কণ্ঠে আবৃত্তি বা সমবেত কণ্ঠে ঈষৎ সুরের আভাস-সহ আবৃত্তিও করা হয়) তখন, কিংবা আসরে (কবি, পাঁচালি, তরজায়) যখন ঢোল-কাঁসীর তালের সঙ্গে গাওয়া হয় তখন, তাল রক্ষার একটি আবশ্যিক দায়িত্ব এসেই পড়ে, এবং শ্বাসাঘাত-বল-ঝোঁককে অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং আবৃত্তি-মূলক ছড়াতে শ্বাসাঘাত-বল-ঝোঁক গৌণ, কিন্তু গেয় ছড়াতে তা মুখ্য। ছন্দের অপরিহার্যতা ও আবশ্যিকতা এইভাবে ছড়ায় অস্বীকৃত হয়ে যায়।

মন্ত্রাত্মক ছড়াগুলি স্থানে-স্থানে এতো দ্রুত উচ্চারিত হয় যে (অনেক সময় এক নিশ্বাসে এক-একটি বিশেষ অংশ উচ্চারণের taboo থাকে, নইলে মন্ত্রের দ্রব্যগুণ ব্যাহত হয়) সেখানে সুর-তাল-ছন্দ-শ্বাসাঘাতের কোনো বালাই-ই থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রেও শ্বাসাঘাত-ঝোঁক-বল অপরিহার্য নয়। ঘুমপাড়ানী ছড়া-গানে তাল-ছন্দ থাকে বটে, কিন্তু তা যেন খাঁটি ভাটিয়ালি গানের তাল-ছন্দের মতো। খাঁটি ভাটিয়ালি গানে যেমন নির্দি

ও নিয়ম-মাফিক তাল কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয় না, এক-একবার এক-একটি শব্দগুচ্ছ সুরাত্মক ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, তার যেন continuation বা প্রবহমানতা থাকে না,—ঘুমপাড়ানী ছড়া-গানেও, তুলনা করলে, তাই ঘটে। অতিরিক্ত এবং সঘন শ্বাসাঘাত ঘুমের অনুকূল নয়, দীর্ঘ ও বিলম্বিত লয়ই সেখানে অভিপ্রেত। পরীক্ষা করে দেখেছি, আবৃত্তি করবার ছড়াতে মেপেমেপে ঝোঁক ফেলা এবং ঘনঘন তা ফেলা, বিশেষ কষ্টসাধ্য ও কৃত্রিম ব্যাপার। দেখা গেছে, প্রতি চার মাত্রা অন্তর-অন্তর ঝোঁক ফেলে-ফেলে উচ্চারণ বেশিক্ষণ করতে পারা যায় না, তা ক্লান্তিদায়ক। ফলে, আয়াসের জন্যেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণে, ছড়া আবৃত্তিকালে শ্বাসাঘাত ঠিক সর্বদা চার মাত্রার পর-পর না হয়ে, দুটি পর্ব একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যেন আট মাত্রার পর-পর হবার দিকে প্রবণতা প্রদর্শন করে, হয়ও তাই। তাতে কেবল উচ্চারণের সৌকর্যই ঘটে না, ছড়ার সৌষ্ঠবও আসে, ফলে সৌন্দর্যের দিক থেকে এ ব্যাপার বিশেষ সহায়তা করে। এইভাবে প্রতি চার মাত্রা অন্তর ঝোঁক না পড়ে আটমাত্রা অন্তর পড়াতে শ্বাসাঘাতের সংখ্যা পরিমাণে কমে আসে, পর্বের দৈর্ঘ্যও বেড়ে যায়, এবং যেহেতু শ্বাসাঘাতের পরিমাণ কমে আসে, সেই হেতু শ্বাসাঘাতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মনে সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়।

গানের ভাষা এবং মুখের ভাষায় তফাত আছে। যে ছড়া গেয়, শব্দের অর্থ অনুযায়ী সেখানে শ্বাসাঘাত পড়ে না, পড়ে অন্ধ তালের কঠিন নিয়ম রক্ষা করবার জন্যে, যেখানে পর্ব শুরু হয় সেখানে,—তাতে শব্দটি ও পর্বান্তে বা তালের শুরুতে শুরু নাও হতে পারে; শব্দের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বের বা পরের পর্বেতে গিয়ে নিষ্প্রাণ ও নিরর্থক হয়ে ঠাঁই পায়। কিন্তু মুখের ভাষায় অর্থই প্রধান, সেই অর্থ অনুযায়ীই মোটামুটিভাবে শ্বাসাঘাত পড়ে, ফলে শ্বাসাঘাত এ ক্ষেত্রেও একটি অপরিহার্য দিক রূপে গণিত হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা ছন্দের একটি দিকের flexibility বা সম্প্রসারণশীলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছান্দসিকদের মধ্যে কেউ কেউ কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনিপ্রধান ছন্দের সঙ্গে দলবৃত্ত-বলবৃত্ত-বলপ্রধান ছন্দের একটি যোগ দেখেছেন। অনেক ছড়াকেই খুশি মতো দ্রুত লয়ে আবৃত্তি করা যায়। তেমনি তাকেই আবার মধ্য লয়েও পড়া বা আবৃত্তি করা যায়। দুই ধরণের ছন্দের মধ্যে আবার একটি যোগবন্ধন যেন তলায়-তলায় আছে। আমাদের প্রশ্ন, তবে কি ছড়ার ছন্দও স্থির নয়? ইচ্ছে করলেই একটি ছড়াকে

যদি একই সঙ্গে দুই ছন্দে পড়তে পারি, বা আবৃত্তি করতে পারি, তবে বিশেষ একটি ছন্দের অপরিহার্যতা রইল কোথায়? কোন্ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে বলা চলবে, এই ছড়াটিকে কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনিপ্রধান ছন্দে আবৃত্তি করতেই হবে, এবং কোনটিকে বা তেমনি দলবৃত্ত-বলবৃত্ত-বলপ্রধান ছন্দে না পড়লে বা না বললে ছড়াটা ছড়াই হবে না। সুতরাং কেবল শ্বাসাঘাত-বল-ঝোঁকের ক্ষেত্রেই অস্থিরতা নয়, ছন্দ-প্রকৃতি ও লয়ের ক্ষেত্রেও সে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন ওঠে। এবং সে সংশয়-প্রশ্ন ওঠে বলেই তার অপরিহার্যতায়ও সংশয় আসে।

এই বিষয়ে এখানে আমাদের পর্যবেক্ষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে: আমরা লক্ষ করে দেখেছি, একই ছড়ার বিভিন্ন অংশে শ্বাসাঘাত-বল-ঝোঁকের তারতম্য হয়ে থাকে। পঙ্‌ক্তি ও চরণের দৈর্ঘ্য এ ব্যাপারে একটি বড়ো দিক। একই ছড়ায় নানান দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি-চরণ দেখা যায়। কিন্তু তাতে ছন্দ-পতন ঘটে না। ছন্দ-পতন না ঘটবার প্রাথমিক কারণ, পঙ্‌ক্তি ছোটো-বড়ো হলেও, তা এমনভাবে হয় যে পর্বের দিক থেকে সমতা বজায় থাকে। কিন্তু যেখানে থাকে না, সেখানেও কেন ছন্দ-পতন হয় না? সেখানে শ্বাসাঘাতকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, কিংবা সুরকে নিয়োগ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ও সুর নিয়োগই শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য ও অপরিহার্যতা অর্জনের পক্ষে বড়ো বাধা। যেখানে শ্বাসাঘাত পড়েও, সেখানেও দেখা যায়, শ্বাসাঘাতের মূল্য-পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রা-পরিমাণ সমান নয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আধুনিক যুগে ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য মশাই লক্ষ করেছেন, শ্বাসাঘাতের ফলে আধমাত্রা পরিমাণ বেড়ে যায়, যা এক মাত্রার তা দেড় মাত্রার হয়ে যায়। কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি, তা বিভিন্ন মাত্রার হয়,—মাত্রার এই পরিমাণ বিভিন্নতাও শ্বাসাঘাতের অপরিহার্যতার পরিপন্থী।

আমরা দেখেছি, একই ছড়ার ভেতরে কখনো কোনো অংশে দলবৃত্ত-বলবৃত্ত-বলপ্রধান ছন্দের প্রাধান্য, কোনো অংশে বা কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রাধান্য। কতকগুলি ছড়া আগা-গোড়াই কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনিপ্রধানে পড়লে বা আবৃত্তি করলে ভালো শোনায়। দলবৃত্ত-বলবৃত্ত-বলপ্রধান ছন্দে আবৃত্তি করতে গেলে কিছু ছড়ায় নানা অসুবিধের মুখোমুখী হতে হয়। তবু এ বিষয়ে আমরা একটি রীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলার মোটামুটি আভাস দেখেছি: পঙ্‌ক্তির যেখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও হলন্ত শব্দ থাকে বেশি, সেখানে দ্রুত লয়

আপনিই এসে পড়ে ; আর যেখানে থাকে পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ, এবং নানা ধরণের শব্দদ্বৈত, Antithesis-মূলক বাক্য, সেখানে লয়ের মধ্যে একটি মন্থরতা ও সঙ্গীতপ্রবাহ এসে পড়ে, ছন্দ তখন কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত-ধ্বনি প্রধানের দিকে স্বতঃই ঝুঁকে পড়ে। কেবল পঙ্‌ক্তি-চরণের বেলাতেই এটি ঘটে না, গোটা ছড়ার মধ্যেও এটি ঘটে। সুতরাং একটি ছড়ার আবৃত্তির লয় ওই ছড়ার ধ্বন্যাত্মক ও হলন্ত শব্দের পরিমাণের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। এইভাবে বলা যায় : ক. ছড়ার ছন্দের কোনো নির্দিষ্ট লয় নেই, কোনো অপরিহার্য ছন্দ নেই ; তার পর্ব চার মাত্রার কি আট মাত্রার হবে, তা ভিন্ন ভিন্ন ছড়ার বিশেষ ধরণের শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে ; খ. এবং সেই কারণেই ছড়ার রূপ ও কায়া নির্মাণের ওই সব উপকরণগুলির (যথা ধ্বন্যাত্মক ও হলন্ত শব্দ, পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দ, Antithesis, ইত্যাদি) প্রাধান্য ও পরিমাণই শেষ পর্যন্ত ছড়ার ছন্দটিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কয়েকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাচ্ছে। উদাহরণগুলির সবই প্রস্তুত সঙ্কলন থেকে নিচ্ছি এই কারণে যে, তা আর উদ্ধৃত করে দেখাতে হবে না, কেবল সংখ্যা উল্লেখ করে দিলেই চলবে।

মুদ্রিত হরফে বাঙলা ছড়ার অনেকগুলিরই অনেকাংশে শ্বাসাঘাত-বল-ঝোঁক পড়ে ; কিন্তু যখন তা আবৃত্তি করা হয় কিংবা গাওয়া হয়, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্বাসাঘাতের পরিমাণ অনেক কমে আসে। ছড়ার ছন্দ বিচার কালে তাই একটি ছড়ার মুদ্রিত দিকটিকে গ্রহণ না করে কার্যক্ষেত্রে তাকে যেভাবে রূপ দেওয়া হয়, সেই মৌখিক দিকটির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। দুঃখের বিষয়, তা করা হয় না। হয় না এই কারণে, ছড়ার বাস্তব রূপের দিকটি সম্পর্কে বিচারকর্তাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

ব্রতের ছড়া বা কবি-তরজা-পাঁচালির ছড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তা ভালো করে বোঝা যায়। এই সঙ্কলনে যে সব ব্রতের ছড়া মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির মুদ্রিত রূপের দিকে তাকালে শ্বাসাঘাতের আয়োজন-আভাস স্পষ্টই নজরে পড়ে। কিন্তু সেগুলো যখন কণ্ঠের উচ্চারণে বা সুরে রূপ পায়, তখন শ্বাসাঘাতের নানা বিপর্যয় ঘটে।

যেমন, ১-সংখ্যক ছড়াতে 'সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী' এই পর্বটি পূর্ববর্তী পর্বগুলির তুলনায় বড়ো, দ্রুত উচ্চারণ করে ছন্দ-রক্ষা করতে হয়। তেমনি, 'মরণ হয় যেন এক গলা গঙ্গাজলে' প্রায় সাধারণ গদ্যের মতো উচ্চারণ করা হয়।

বাঙলা ছড়ার শেষ অংশে উচ্চারণে ও আবৃত্তিতে পার্থক্য আসবেই। কেবল দীর্ঘ পর্ব বলেই নয়, শেষ অংশের বিশিষ্টতার জন্যেও এই গদ্যভঙ্গি এসে যায়। ২-সংখ্যক ছড়ার আবম্ভটুকু বেশ দ্রুত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ থাকলেই ছন্দ দ্রুত হয়, সাধারণ ক্ষেত্রে। তারপর 'কালাপুষ্প তুলতে গেলাম' অংশ থেকে সেই দ্রুততা মন্দীভূত হতে থাকে; অবশ্য সহচর শব্দ 'আশ' ও 'পাশ' আগের থেকেই দীর্ঘ উচ্চারণের দাবীতে এবং তিনবার 'নড়ে' শব্দের পুনরাবৃত্তিতে তান-সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারপর 'শিবচরণে দেখা হল' অংশে আবার দ্রুততা আসে। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে পয়ারের আভাস আছে। মধ্যলয়েই তা উচ্চারণ করা হয়। মুদ্রিত রূপে পাই এই রকম: আকন্দ। বিল্বপত্র। তোলা গঙ্গা। জল। কিন্তু আসলে হয়: আকন্দ বিল্বপত্র। তোলা গঙ্গাজল। এই পেয়ে তুষ্ট হলেন। ভোলা মহেশ্বর। দলবৃত্ত-বলবৃত্ত-বলপ্রধান ছন্দে পড়লেও ছন্দ ঠিক থাকে।

৩-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশের পর্ব ও শ্বাসাঘাতের সঙ্গে গ-অংশের পর্ব-শ্বাসাঘাতের মিল নেই, এবং এই গ-অংশ ৪-সংখ্যক ছড়ার পর্বের সঙ্গে তুলনীয়। ৪-সংখ্যক ছড়ারই 'ঘরের ঘটি-বাটি ঝলমল করে' ইত্যাদিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের জন্যে ছন্দ দ্রুত হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, ছড়া রচয়িতারা সাধারণ ছন্দ-বোধ থেকে ছড়া রচনা করেছেন, সূক্ষ্মতার দিকে স্বাভাবিক কারণেই নজর দেন নি। সুর প্রয়োগ করে, কিংবা কোথাও ক্ষিপ্র উচ্চারণ করে, কোথাও নিছক গদ্যের মতো উচ্চারণ করে ছন্দের সর্বপ্রকার ত্রুটি ঢাকা হয়েছে।

১২-সংখ্যক ছড়ায় সেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের জন্যে দ্রুততা, সুরে ফেলে গাইবার সময়ও তা অব্যাহত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছন্দ-রক্ষার জন্যে কোনো শব্দকে ছন্দের বাইরে অর্থাৎ গানের ভাষায় যাকে বলে 'ফাঁকে' রাখা, তাই রাখা হয়। যেমন, ৪৩-সংখ্যক ছড়ার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'তার', ৬০-সংখ্যক ছড়ায় 'তার', ৭৭-সংখ্যক ছড়ায় 'না হয়', ১৪২-সংখ্যক ছড়ায় 'ভালুকে' প্রভৃতি। একই ছড়া দ্রুত লয়ে পড়লে কোনো শব্দ 'ফাঁকে' থাকে, কিন্তু মধ্যলয়ে পড়লে থাকে না। যেমন, ১৭৪ বা ১৭৬-সংখ্যক ছড়াতে। একই ছড়ার এক পর্ব দীর্ঘ, পার্শ্ববর্তী পর্ব হ্রস্ব, সুর তাতে আসবেই। দ্রুত লয়ে পড়ে বা আবৃত্তি করে যে সব ক্ষেত্রে কোনো পর্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সেখানেও সুর আসবেই। এ ছাড়া সনাতন পয়ারের অস্ফুট ও পরিস্ফুট উপস্থিতি এবং তার দরুণও সুর

এসে যায়। তিনবার হলে তো কথাই নেই, দুবার কোনো শব্দ আবৃত্ত হলেও সুর আসে। একানুপ্রাস বা ছেকানুপ্রাস এবং Antithesisও সুরকে আনে।

কেন বার বার সুরের আগমনের কথা বলছি, এইবার তার কারণ বলি। এই সুরই ছড়ার প্রাণ অর্থাৎ শেষ দুই পঙ্‌ক্তির বিশেষত্বকে নির্দেশ করে। একটি ছড়ার সর্বাঙ্গ জুড়ে নানা কারণে যে সুরকে স্বীকার করা হয়, শেষ অংশে তাই একটি বিশিষ্ট শক্তি বা উপায় হয়ে ছড়াটিতে প্রাণ ও সৌন্দর্য অর্পণ করে। Penultimate বা উনশেষ পঙ্‌ক্তির উচ্চারণে তা প্রথমে স্পষ্ট হয়।[১] কলসীতে নিরবচ্ছিন্ন ভঙ্গিতে জল ভরবার সময়, কলসী যখন প্রায় ভরে আসে, তখন আওয়াজের একটি ভিন্নতা ঘটে,—সেই আওয়াজের ভিন্নতাই জানিয়ে দেয়, কলসী ভরে আসছে। ছড়ার উনশেষ পঙ্‌ক্তিও তাই। সুরের বিশিষ্টতাই জানিয়ে দেয়, ছড়া শেষ হতে চলেছে। এই বিশিষ্টতাটুকু ছাপার হরফে ধরা পড়বে না, তা ধরা পড়ে কানে আর মনে,—ছড়ার রসসৃষ্টিতে তার একটি আবেদন আছে। শেষ পঙ্‌ক্তিতেও থাকে শব্দ চয়নের বিশিষ্টতা, যা আবার সেই সুরকেই বিশিষ্ট হতে সাহায্য করে। শব্দ ও সুরের এই হর-গৌরীবৎ অদ্বয় সম্মিলনেই শেষ পর্যন্ত ছড়ার সৌন্দর্য ও রস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দ্রুত ও সঘন শ্বাসাঘাত নয়, সুরাশ্রিত মধ্যলয়ের পর্বগুলিই অনেক সময় এক-একটি পঙ্‌ক্তি হয়ে ছড়ার রূপগত বিন্যাসকে চোখের সামনে একটি Graphic Art রূপে ফুটিয়ে তোলে। সঘন শ্বাসাঘাতে ছড়ার অন্তর্গত চিত্রের শোভাযাত্রা বিক্ষুব্ধ মিছিল হয়, কিন্তু তা শোভাময় হয় না॥

…১৩…

নানা দিক থেকে ছড়ার কায়া-রূপ এবং তার প্রয়োগ ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য-ব্যাপকতার কথা এ পর্যন্ত বললাম। এবার ভিন্ন এক প্রসঙ্গে আসি।

ছড়া পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিকোণটি কী ও কেমন হওয়া উচিত? অন্যান্য আর দু-পাঁচটা সাহিত্য-পদার্থের মতো ছড়ারও পর্যবেক্ষণের একটি সুস্পষ্ট নীতি-নিয়ম

১ অনেক সময় Anti-penultimate পঙ্‌ক্তি অর্থাৎ উনশেষ পঙ্‌ক্তিরও পূর্ব পঙ্‌ক্তিতে শেষবাচক সুর ধ্বনিত হতে শুরু করে। তিন পঙ্‌ক্তি জুড়ে ছড়ার এই অন্তিম পর্বকে ছড়ার Colophon বলা যায়।

আবিষ্কার ও তা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন। হতে পারে, একজনের প্রদর্শিত নীতি-নিয়মগুলি অপরের অপছন্দ ; কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা যায় না। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা নিম্নরূপ।

আগেই বলেছি, ছড়াকে আমরা কেবল লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি সাহিত্য-শাখা রূপেই দেখতে চাই না ; তাকে বাঙালীর জাতীয়জীবন, জনরুচি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের পটভূমিকায় রেখে একটি ব্যাপকতা প্রদান করতে চাই। কিন্তু যেহেতু ওই জাতীয় বা লোকজীবন, সংস্কৃতি, রুচি ও ঐতিহ্যের দিকটি এতে অবিচ্ছেদ্যভাবে আছেই, সেই হেতু ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্যের যোগ-বন্ধনকে অস্বীকার করা অন্যায় এবং অসম্ভব দুই-ই। সুতরাং লোকসাহিত্যের আবরণ ও পটভূমিকাটি এতে এসে যাচ্ছেই। এই জন্যে এর পর্যবেক্ষণের মধ্যেও একটি দ্বৈতভাবে এসে যাচ্ছে : এর যে অংশ খাঁটি লোকসাহিত্য, সেটি একটি দিক ; এবং যে অংশে লোকমুখীনতা আছে, সেই হল আর একটি দিক। মনে রাখতে হবে, এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সংযোগের সূত্র কোথাও কোথাও বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই জন্যে দুইকে সম্পূর্ণ পৃথকও বলতে পারি না। আলোচনায় সুবিধের জন্যে দুইয়ের মধ্যে একটি শিথিল ভেদরেখাকে স্বীকার করে নেওয়া যাক। ব্যাপক ছড়া-সাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই দুটি স্তরের বিভাগকে মেনে নিচ্ছি পর্যবেক্ষণের সুবিধের জন্যে।

ছড়ার যে অংশটি খাঁটি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, সে অংশটি লোক-সাহিত্যের অনুগ ও উপযোগী দৃষ্টিকোণ দিয়েই আলোচিত হওয়া উচিত। এখানে আবার বলি, দ্বিতীয় স্তরের ছড়াকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিতে বিচার করা যায়, কেননা, রচনারীতি ও প্রয়োগের দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে যোগ আছে।

লোকসাহিত্যর অনুগ ও উপযোগী দৃষ্টিকোণটি কি, সেটি এখানে ব্যক্ত করি। লোকসাহিত্য পর্যবেক্ষণের তিনটি দিক আছে: ১. সংগ্রহ ২. সম্পাদনা ও সঙ্কলন ৩. সমীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণ। 'সংগ্রহ' বলতে কয়েকটি বিশিষ্ট সূত্র অনুসরণ করে সংগ্রহ ; একটি ধারাবাহিকতা, নাম-ধাম-ঠিকানা-সহ তা গ্রহণ করা এবং অবিকৃত রূপে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ব্যাখ্যা-সহ সংগ্রহ করে নেওয়া। 'সম্পাদনা ও সঙ্কলন' বলতে তার শ্রেণীবিন্যাস, যে পরিবেশে তা গীত বা কথিত হয় তার পূর্ণ বিবরণ, শব্দাদির টীকা-টিপ্পনি-কথান্তর প্রদান, অন্যান্য যাবতীয় তথ্য প্রদান। 'সমীক্ষা-নিরীক্ষা' হল—সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে

একটি তত্ত্বকে পরিস্ফুট করা, সেই জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে তুলে ধরা, তার সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করা, এবং অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা।

এই কর্ম-তালিকার দিকে দৃকপাত করা মাত্রই মনে হবে, এ একার কর্ম নয়, এর মধ্যে Division of labour অর্থাৎ শ্রম-বিভাগকে স্বীকার করা হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই, আমাদের দেশে আমরা এক্ষেত্রে এই শ্রম-বিভাগকে স্বীকার করি নি; করি নি বলেই গবেষণাকর্ম উচ্চস্তরের কিছু হয়ে ওঠে নি। আমরা একাই তিনজনের কর্ম করে সবখানি গৌরব নিজের থলেতে সঞ্চয় করতে চাই, ফলে কোনো স্তরের কাজই নিখুঁত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

আমরা মনে করি, বড়ো জোর দুটি স্তরের কর্ম একজনের পক্ষে করা সম্ভব। যেমন, যিনি সংগ্রাহক, তিনি বড়ো জোর সঙ্কলক পর্যন্ত হলেন, কিন্তু সমীক্ষক পর্যন্ত নয়। একজনের পক্ষেই তিন স্তরের কর্ম অবাঞ্ছনীয় হলেও অসাধ্য-দুঃসাধ্য কিছু নয়,—কিন্তু সেজন্যে তাঁকে শ্রম-নিষ্ঠা-অধ্যবসায় প্রদর্শন করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হচ্ছে, একই সঙ্গে তিন স্তরের কর্ম করবার প্রতিভা ও সামর্থ্য তাঁর আছেই। তেমনি, কেউ আবার সম্পাদনা-সঙ্কলন এবং সমীক্ষার স্তর দুটিকে নিতে পারেন।

এই পটভূমিকায় প্রস্তুত গ্রন্থের গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণটি কি, তা ব্যক্ত করা যাচ্ছে। ত্রি-স্তরিক কর্মের মধ্যে আমরা প্রথম স্তর অর্থাৎ সংগ্রহের দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি নি। আমাদের নিজস্ব সংগ্রহ এতে কিছু আছে বটে কিন্তু মূল অংশ অপর কর্তৃক সংগৃহীত, কিছু বা পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত (সেইজন্যে 'সঙ্কলন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে)। আমরা সম্পাদনা, শ্রেণী-বিভাগ এবং সমীক্ষার দিকটিকে গ্রহণ করেছি।

সম্পাদনার একটি বড়ো দিক শ্রেণী-বিন্যাস। কিন্তু এই শ্রেণী-বিন্যাস আবার সমীক্ষার সঙ্গে জড়িত। আমরা মনে করি, এক-একজন লেখকের সমীক্ষার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ দিয়েই তাঁর সঙ্কলনের শ্রেণী-বিন্যাসও নিয়ন্ত্রিত। কাজেই একজনের কৃত শ্রেণী-বিন্যাসই যে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, তা নয়,—লেখক তাঁর নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিজেরই মতো করে শ্রেণী-বিন্যাসের একটি রীতি-নিয়ম-সজ্জা স্থির করে নেবেন এবং সেই অনুযায়ীই তা বিন্যস্ত করবেন। তবে, যদি তাঁর বিন্যাস-ভঙ্গির মধ্যে এমন কোনো

স্থায়ী ও ব্যাপক দিক থাকে, যা অন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরও অনুকূল, তবে অন্যত্রও তা গ্রহণ করতে বাধা নেই। আমরা যেহেতু ছড়াকে কেবল লোকসাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চাই না, সেই হেতু আমাদের শ্রেণীবিভাগ-করণ ও বিন্যাসরীতিকেও আমাদেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক করে তোলা হয়েছে।

আমাদের শ্রেণী-বিভাগ ও বিন্যাসরীতির মূল পরিকল্পনাটি এই: প্রথমেই তাবৎ ছড়া-সাহিত্যকে দুই মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: আনুষ্ঠানিক (Functional, Ritualistic) এবং অনানুষ্ঠানিক (Non-functional, Non-ritualistic)। আদিমস্তরে সব কিছুই ছিল আনুষ্ঠানিক, নিছক শৌখিন শিল্পকর্ম বা সাহিত্যকর্ম তখন আদৌ স্বীকৃত হত না বা প্রাধান্য পেত না। আনুষ্ঠানিক শিল্প ও সাহিত্যকর্মই হল প্রাচীন ও আদিম স্তরের জিনিস। তাতে, কাজে কাজেই, সাহিত্যের শিল্প ও রসের অভিব্যক্তি নিতান্তই নগণ্য কিংবা আদৌ নেই। কোনো লেখক মন্তব্য করেছেন যে, functional ছড়ার মধ্যে সাহিত্যের দিকটি যেহেতু উপেক্ষিত, অতএব তার ওপর গুরুত্ব বা মর্যাদা আরোপ করা অনুচিত। ইনি আনন্দমূলক এবং রসমূলক ছড়াকেই বড়ো মর্যাদা দিতে চান। কিন্তু ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক থেকে আনুষ্ঠানিক ছড়ারই মূল্য ও মর্যাদা বেশি, একথা সকলেই স্বীকার করবেন,—থাক না কেন তাতে সাহিত্যগুণ অনুপস্থিত। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, আমরা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার ছড়ার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করি, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ছড়ার ওপর অধিক পরিমাণে।

এইজন্যে আনুষ্ঠানিক ছড়াকে প্রথমেই স্থান দিয়েছি সঙ্কলনে। এই আনুষ্ঠানিক ছড়ার বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একটি বিশিষ্ট নীতি-নিয়ম-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করেছি। এই রীতির অনুসরণ আমাদের অপর একটি গ্রন্থ 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭)-ও দেখা যাবে। একটি বৎসর এবং একটি মানুষের জীবনকে 'মডেল' বা আদর্শরূপে স্থাপনা করে, তারই অনুসরণে পর-পর ছড়াগুলি সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, বৎসরকে আদর্শ রেখে, বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত মাসানুক্রমে, ও তিথির অনুক্রমে এক-একটি অনুষ্ঠানের ছড়া পর-পর সাজানো গেছে। তেমনি, জন্ম থেকে শুরু করে, বৃদ্ধি-বিবাহ-মৃত্যু—অর্থাৎ ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে, এক-একটি অনুষ্ঠানের ছড়া সঙ্কলন করেছি। মনে রাখতে হবে, বৎসর ও জীবনের

কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নয় যে সব ছড়া (অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক ছড়া) তাও এই একই রীতিতে আর এক প্রস্থে বিন্যাস করা যায়। যেমন, বিবাহ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে সব আনুষ্ঠানিক ছড়া, তা 'আনুষ্ঠানিক ছড়া'র পর্যায়ভুক্ত ; কিন্তু সেই একই বিবাহের অন্তর্গত যে সব ছড়া আনুষ্ঠানিক নয়, তা 'অনানুষ্ঠানিক ছড়া'র অন্তর্ভুক্ত হবে। একই বিবাহের ছড়া দুই প্রস্থে সঙ্কলিত হল বটে, কিন্তু দু ধরণের ছড়ার ভেদটিও স্পষ্ট হয়ে উঠল।[১]

মানুষের জীবনের কিছু-কিছু অনুষ্ঠান তার জীবনের ক্রমধারার সঙ্গে সর্বত্র খাপ খায় না। যেমন ভাইদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান। এটিকে জীবনের কোনো ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত না করে বৎসরের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি। এইভাবে 'বৎসর' ও 'জীবন' এক হয়ে যায়। কৃষিজীবন ও জগৎকে অবলম্বন করে আচার-অনুষ্ঠানগুলি, স্বাভাবিকভাবেই বর্ষপরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একদিকে ; তেমনি এর সঙ্গে জড়িত অভিচার-যাদুমূলক ক্রিয়ানুষ্ঠানঘটিত ছড়াগুলি সঙ্কলিত হয়েছে তার পরে।

লোকসমাজের পূজোর মন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছড়া। পূজো একটি সাম্বাৎসরিক ব্যাপার বলে, বৈশাখ থেকে চৈত্রের মাসানুক্রমিক অনুষ্ঠানের ছড়া সঙ্কলনের পর পূজোর মন্ত্রছড়া প্রদত্ত হয়েছে। একই কারণে বারোমেসে ছড়াও সঙ্কলিত হয়েছে এর পরে।

প্রতিটি বিষয়ের ছড়াকেই কয়েকটি উপ-বিভাগে ভাগ করলে তার বিশিষ্টতাগুলি ফুটে উঠবে। আমরা সেইজন্য প্রতিটি বিভাগকে কয়েকটি 'পর্যায়ে' উপ-বিভক্ত করেছি। যেমন, আনুষ্ঠানিক ছড়ার প্রথম পর্যায় হল 'বর্ষ-পরিক্রমা' (ভুলক্রমে এই উপ-শিরোনামটি মুদ্রিত হয় নি)। দ্বিতীয় পর্যায় . 'কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন'। এখানেও মাসানুক্রমে, ধারাবাহিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে এই বিষয়ক ছড়াগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মাছ মারা প্রভৃতি কর্ম কৃষি-জীবনেরই অঙ্গীভূত বলে এই বিষয়ক ছড়া অতঃপর সঙ্কলন করা গেছে। তৃতীয় পর্যায় হল 'মানবজীবন ও জগৎ'। অতঃপর মন্ত্র, অভিশাপ, এবং লোক-চিকিৎসার

১ তেমনি ভাদু-টুসু প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে একদিকে আছে আনুষ্ঠানিক ছড়া, অপর দিকে অনানুষ্ঠানিক ছড়া,—অর্থাৎ যে সব ছড়া বৎসরের অন্যান্য সময়েও এবং অনুষ্ঠান ছাড়াই কথিত হয়। তবে, এ বিষয়ে বেশি কড়াকড়ি না করাই ভালো।

ছড়া দিয়েছি। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যে সব ছড়া নিতান্ত 'আনুষ্ঠানিক' তাও এই প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর 'অনানুষ্ঠানিক ছড়া'। এই অনানুষ্ঠানিক ছড়াকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছি : ১. মানবজীবন সম্পর্কীয়, ২. ইতিহাস ও সমাজ-বিষয়ক ছড়া, ৩. সাহিত্য-বিষয়ক ছড়া, ৪. নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তি-মূলক ছড়া ৫. বিচিত্র। প্রত্যেকটি বিষয়ের নানা দিক ও বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য একধিক 'পর্যায়ে' উপ-বিভক্ত করেছি। নানা পর্যায়ে উপ-বিভক্ত হবার দরুণ এদের এক-একটির বিশিষ্টতা আপনা থেকেই পরিস্ফুট হবে। যে সব ছড়া বিলম্বে পাওয়া গেছে, 'সংযোজন' অংশে তা প্রদত্ত হয়েছে।

কয়েকটি বিষয়ের ছড়ার শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত নই। যেমন, মানবজীবন সম্পর্কীয় ছড়ার পঞ্চম পর্যায়ের ছড়া, 'বৃত্তি-বিষয়ক ছড়া'। এর মধ্যে যে Taboo-র দিকটি আছে, তা আনুষ্ঠানিকতার একটি দৃঢ় বন্ধনকে স্বীকার করে, সে হিসেবে তা আনুষ্ঠানিক ছড়াব পর্যায়ভুক্ত হবার উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু জীবনের দিকটি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, সেহেতু সংশয়াত্মক মন নিয়েও, সেটিকে অনানুষ্ঠানিক ছড়ার অন্তর্গত করেছি। তেমনি, নীতি-মূলক ছড়ার অন্তর্গত ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয়ক ছড়াগুলি আনুষ্ঠানিক কি না, সে বিষয়ে সংশয়-মুক্ত হইনি।

ছড়ার সঙ্কলন-রীতির প্রসঙ্গে আমরা একটি বিশেষ মত পোষণ করি। অধিকাংশ বাঙলা ছড়ার সঙ্কলনগ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, আলোচনা এবং সঙ্কলন-কর্ম একই সঙ্গে করা হয়। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথ আগে আলোচনা করে পরে তাঁর সংগৃহীত ৮১টি ছড়া ভিন্ন ভাবে সঙ্কলিত কবেছেন, এই রীতিই আদর্শ রীতি। 'যশোব খুলনার ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫) বইতে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী মশাইও তা সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন। আর কাউকে এই রীতির অনুসরণ করতে অদ্যাবধি দেখিনি। আলোচনা করতে-করতে, তারই অঙ্গ হিসেবে যদি সঙ্কলনও করা হয়, তবে সঙ্কলনের নিজস্ব কোনো মূল্য থাকে না, আলোচকেরও কোনো বিশেষ সচেতনতা এ বিষয়ে ধরা পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, সঙ্কলনকে আলোচনার অঙ্গীভূত করে নিলে কিংবা আলোচ্য বিষয়ের উদাহরণ রূপে সঙ্কলনকে গ্রহণ করলে, সঙ্কলনের নিরপেক্ষ মূল্য হারিয়ে যায়। পাঠককে যেন আলোচক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়েই সঙ্কলনকে দেখতে বাধ্য করেন, পাঠক কেবল

লেখকের আলোচ্য বিষয়ের উদাহরণ রূপেই ছড়াকে দেখতে বাধ্য হন। গবেষণার ক্ষেত্রে,ফলে,একটি খণ্ডতা এবং একক ব্যক্তির দৃষ্টিকোণের অবাঞ্ছিত প্রাধান্য স্বতঃই সূচিত হয়ে যায়। সঙ্কলিত ছড়াগুলি যে,ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে, পাঠকের সে স্বাধীনতা এই রীতির অনুসরণের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, এই নিরপেক্ষ মূল্য হারিয়ে যাবার দরুণ, ছড়ার বৈজ্ঞানিক দিকটি (অর্থাৎ এর সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিকটি) ব্যাহত হয়। কেবল ছড়াই নয়, লোকসাহিত্যের যে কোনো শাখারই সঙ্কলন এইভাবে করা উচিত বলে আমরা বিবেচনা করি না।

সে যাই হোক, এ বিষয়ে আমাদের মূল বক্তব্য হল : ছড়ার আলোচনা-গবেষণাকে আমরা সংগ্রহ-সঙ্কলন-সমীক্ষা, এই তিন স্তরে বিভক্ত করবার পক্ষপাতী। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি নি, সংগ্রহ আমাদেব নিজস্ব নয়, তা অপর কর্তৃক সংগৃহীত বা পূর্বে প্রকাশিত। আমরা শ্রমবিভাগকে স্বীকাব করে সঙ্কলন ও সমীক্ষার স্তর দুটিকে গ্রহণ করেছি। সঙ্কলন বলতে শ্রেণী-বিভাগ এবং শ্রেণী-বিভাগকে আবার একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হতে হবে বলেছি, এবং সেই অনুযায়ী তা করেছি। শ্রেণী-বিভাগের পরিকল্পনাটি ওপরে ব্যক্ত করা হয়েছে। সঙ্কলনকর্মের আর দুটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নাম-ধাম যথাসম্ভব দেওয়া গেছে। এঁরা শিক্ষিত মানুষ হলেও লোকসাহিত্য সংগ্রহের রীতি-নীতি সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, কাজেই তাঁদের সংগ্রহকে আমরা 'বিকৃত' বলে মনে করি না। সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে অনেক ছড়া নেওয়া হয়েছে। সেখানে বিস্তৃতভাবে উৎস নির্দেশ করেছি। সঙ্কলনের অংশে 'কথান্তর' বলে একটি শব্দকে অনেকের নতুন মনে হতে পারে। প্রায় দুই দশক ধরে আমরা আমাদের নানা আলোচনায় এই শব্দটি ব্যবহার করে আসছি, সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের একজন লেখককে তা ব্যবহার করতে দেখে খুশি হলাম। 'পাঠান্তর' শব্দের অনুকরণে 'কথান্তর' শব্দটি গ্রহণ করেছি। লিখিত সাহিত্যেরই বিভিন্ন 'পাঠ' থাকতে পারে, মৌখিক সাহিত্যের নয়। সুতরাং প্রস্তাব করি, লোকসাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় 'কথান্তর' শব্দটিই অতঃপর চলিত হোক। যাই হোক, যে সব ছড়ার কথান্তর মিলেছে, সাধ্যমত তা দেবার চেষ্টা করেছি।

নানান জনে নানাভাবে ছড়ার শ্রেণী-ভাগ করেছেন, আমরাও আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী আর একটি বিভাগ এখানে উপস্থিত করলাম। কিন্তু যিনিই ছড়ার যেভাবেই শ্রেণী-ভাগ করুন, তাঁকে এই ক'টি কথা মনে রাখতেই হবে: ১. সঙ্কলকের মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সে শ্রেণী-ভাগ হবে; ২. শ্রেণী-ভাগ কালে ছড়ার বিস্তৃত প্রয়োগক্ষেত্রকে স্মরণ রাখতে হবে।

এক হিসেবে বাঙলা ছড়ার শ্রেণী-ভাগ করা দুরূহ কর্ম। নানা সংশয় ও বিতর্ক এসে পথে বাধা দেয়। তার প্রধান কারণ, ছড়ার প্রয়োগ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রের কোনো সীমারেখা নেই। একজন যে পথরেখা ও যুক্তিধারা অনুসরণ করে ছড়ার শ্রেণী-ভাগ করলেন, অপরের কাছে স্বভাবতঃই তা গ্রহণযোগ্য হয় না। 'আনুষ্ঠানিক' এবং 'অনানুষ্ঠানিক'—স্থূলতঃ ছড়াকে মাত্র এই দুইভাগে বিভক্ত করেও যে পার পাওয়া যায়, তাও নয়। অনানুষ্ঠানিক ছড়াগুলির শ্রেণী-ভাগ করা ততখানি কঠিন-জটিল কাজ নয়,—একটা শৃঙ্খলা বা আদর্শ ধরে পর-পর তা সাজিয়ে নেওয়া চলে, তার ক্রম সম্পর্কে কোনোই সংশয় ওঠে না। কিন্তু, বিয়ে, ভাদু-টুসু, প্রভৃতি নানা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দু' ধরণের ছড়াই প্রচলিত আছে। জারীগানের মধ্যে ছড়া ব্যবহৃত হয়। মৈমনসিংহে জারীগান শিয়া শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্মীয় গীতি, অতএব তা আনুষ্ঠানিক। কিন্তু সেই একই জারীগান যশোহর জেলায় শীতকালীন গান বিশেষ, সুতরাং তা অনানুষ্ঠানিক। তা হলে জারীগানের অন্তর্ভুক্ত ছড়াকে কোন্ দলে ফেলা চলবে? আমরা অবশ্য এই ধরণের ছড়াকে 'সাহিত্যিক ছড়া'র অন্তর্গত করেছি। অপরে তা স্বীকার নাও করতে পারেন।

তেমনি রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা বা হর-গৌরী-বিষয়ক ছড়াকে নিয়ে সংশয় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলার গ্রাম্যছড়া' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইতে এদের বলেছেন 'গ্রাম্যছড়া'। 'লৌকিক' ও 'পৌরাণিক' এই দুই ভাগে এদের ভাগ করেছেন। বিমলবাবু জানিয়েছেন, এই সব ছড়া কোনো-কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন কথিত হত। সুতরাং এগুলি আনুষ্ঠানিক ছড়া। কিন্তু অন্যান্য নানা সময়েও এসব ছড়া কথিত হয়, অতএব তা আনুষ্ঠানিক নয়ও বটে।

বিমলবাবু 'গ্রাম্যছড়া' নামে এক ভিন্নশ্রেণীর ছড়ার কথা বলতে চান,—শ্রেণী-বিভাগের প্রসঙ্গে যে কথাও ওঠে। 'গ্রাম্যছড়া' বলতে তিনি কি

কেন মনে 'শহুরে ছড়া' নামে এক বিশেষ ধরণের ছড়ার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন? নইলে 'গ্রাম্য' এই বিশেষণে সবিশেষ বলবার হেতু কি,—ছড়া মাত্রই এক হিসেবে 'গ্রাম্য' অর্থাৎ জনজীবন-সম্ভূত, লোকরুচির অনুগত এক ব্যাপক সাহিত্য, তাকে 'গ্রাম্য' বললে তার সম্পূর্ণতা-অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়ে যায়। উপরন্তু, যে সব ছড়াকে তিনি 'গ্রাম্য ছড়া' আখ্যা দিয়েছেন, আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, সেই ধরণের ছড়া নানাভাবে ও রূপে বাঙলার সর্বত্র ছড়ানো আছে। আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক উভয় রূপেই তা ব্যবহৃত হয়।

তিনি বলেছেন, 'গ্রাম্য ছড়া' তান-প্রধান পয়ারে রচিত, সাধারণ ছড়া সেখানে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে রচিত। আকৃতিগত দিকটাও সম্ভবতঃ তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছে। ভেবেছেন, যেগুলো আকারে একটু দীর্ঘ, সেগুলো 'গ্রাম্য ছড়া', এবং যেগুলো নিতান্তই ছোটো, সেগুলো সাধারণ ছড়া। বিমলবাবু লক্ষ করেন নি, সাধারণ ছড়াও তান-প্রধান (পয়ার, ত্রিপদী) ছন্দে রচিত হতে পারে এবং তথাকথিত 'গ্রাম্য ছড়া'তেও শ্বাসাঘাত থাকতে পারে। আকৃতির পার্থক্যও ভিত্তিহীন। সাধারণ ছড়াও বড়ো হতে পারে এবং তাতে পৌরাণিক দিক অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে না। সুতরাং 'গ্রাম্যছড়া' বলে পৃথকভাবে ছড়ার শ্রেণী-ভাগ অযৌক্তিক, রবীন্দ্রনাথ বললেও।

খেলার ছড়াকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাবে, তাও একটি সমস্যা। খেলা একটি 'অনুষ্ঠান', অতএব তা 'আনুষ্ঠানিক' হতে বাধা কি? খেলার ছড়ার মধ্যে 'ক্রম-পুঞ্জন' (cumulation), শৃঙ্খলামূলকতা, প্রশ্নোত্তর-প্রবণতা, অভিনয়, লোকনাট্যের ইঙ্গিত-আভাস থেকে কি খেলার ছড়াকে 'সাহিত্যিক ছড়ার' অন্তর্ভুক্ত করা যায় না? তা কি কেউ সহজ মনে মেনে নেবেন?

এইসব কারণে এক-এক সময় মনে হয়, বাঙলা ছড়ার শ্রেণী-ভাগ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে, বিভিন্নভাবে বুঝি করা উচিত। দু-একটি শ্রেণী-ভাগের প্রস্তাব এই রকম :

প্রথম ধারা : প্রয়োগক্ষেত্র ও ব্যবহারিক দিক ; অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিকতাকে ভিত্তি করে শ্রেণী-বিভাগ। একটি বৎসর এবং একটি মানবজীবন থাকবে এর আদর্শ। বিভিন্ন পর্যায়ে এক-একটি বিষয়ের ছড়া উপ-বিভক্ত হবে। প্রস্তুত সঙ্কলনে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারা : বিভিন্ন দিককে ভিত্তি করে শ্রেণী-বিভাগ। যেমন :

দৈনিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাময়িক, বিষয়মূলক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রেম, নিন্দা-ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্য ও করুণ-বিষয়ক, ইত্যাদি নানা দিককে ভিত্তি করে শ্রেণী-ভাগ।

তৃতীয় ধারা : রূপ ও আঙ্গিককে ভিত্তি করে শ্রেণী-ভাগ : পয়ার-ত্রিপদী-লাচাড়ী-শ্বাসাঘাতমূলক ছন্দকে ভিত্তি করা, হ্রস্বাকৃতির ও দীর্ঘাকৃতির ছড়া ; প্রশ্নোত্তর মূলকতা, গল্প-আখ্যান-কাহিনীর আভাস, ক্রমগুম্ফিত ছড়া, অখণ্ড ছড়া (যে ছড়াতে অন্য কোনো ছড়ার মিশ্রণ ঘটে নি), বিমিশ্র ছড়া (যে ছড়াতে অন্য এক বা একাধিক ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে.)। সঙ্গতি ও অর্থ যে সব ছড়ায় স্পষ্ট, এবং যে সব ছড়ায় তা স্পষ্ট নয়, কোনো সঙ্কেত-প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীকের (composite symbol) আবরণে তা দুর্বোধ্য, নাটোর আভাসযুক্ত ছড়া,—এই ভাবে রূপ ও আঙ্গিককে ভিত্তি করে এক-একটি শ্রেণী-ভাগ করা যায়। যে সব ছড়ার মধ্যে নিছক পাদপূরণের জন্যে পঙ্‌ক্তি প্রয়োগের উদাহরণ মেলে, তাও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে রূপ ও আঙ্গিককে ভিত্তি করে ছড়ার শ্রেণী-ভাগ করা যায়। দু'একটি ক্ষেত্রে এই বিভাগ overlapping হলেও, এর মূল্য আছে।

প্রস্তুত সঙ্কলনে আমরা প্রথম ধারাটি গ্রহণ করেছি। কিন্তু যদি তারপর কোনো ধারাকে আমাদের মনোমত বলা যায়, তাহলে তা তৃতীয় ধারা। বস্তুতঃ এ গ্রন্থে ছড়া সমীক্ষায় আমরা যে গঠন ও রূপতাত্ত্বিক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছি, তার সঙ্গে এই তৃতীয় ধারাটিই সামঞ্জস্যমূলক। সমীক্ষার ওই বিশেষত্বটিকে স্মরণ করেই শ্রেণী-বিভাগের এই তৃতীয় ধারাটির প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা গেল। কিন্তু তবু যে কার্যকালে প্রথম ধারাটিকেই গ্রহণ করেছি, তার পশ্চাতে অন্য কারণ আছে: প্রস্তাবিত তৃতীয় ধারাটিকে গ্রহণ করলে ছড়ার ওপর আমরা যে ব্যাপকতা আরোপ করেছি, তা পরিস্ফুট হত না। দ্বিতীয়তঃ, এক দিক থেকে বিচার করলে প্রথম ও তৃতীয় ধারার মধ্যে একটি মিল দেখা যাবে: সঙ্কলিত ছড়ার 'কথান্তর' নির্দেশ, প্রশ্নোত্তর-মূলক ছড়াকে একটি স্বতন্ত্র পর্যায় রূপে উল্লেখ, কিংবা কাহিনীর আভাস-মূলক ছড়াকে পৃথকভাবে উল্লেখ,—প্রভৃতি বিভাগগুলি ছড়ার রূপ ও আঙ্গিককে স্মরণ করেই করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশে ছড়ার আলোচনা-গবেষণা এখন পর্যন্ত যে স্তরে আবদ্ধ আছে, তাতে একবারেই তৃতীয় ধারানুযায়ী ছড়ার শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব নয়।

নানাদিক থেকে ক্রমান্বয়ে ছড়া সম্পর্কে গবেষণা হবার পর তবে যেন এই তৃতীয় ধারাটি কার্যকরী হতে পারে॥

…১৪…

ছড়ার আলোচনা-গবেষণার ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও সঙ্কলনের পরবর্তী বা শেষ স্তর হল, তার সমীক্ষার দিকটি। এবার সে কথাই আলোচ্য।

বাঙলা ছড়ার আলোচনা আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথ,—রবীন্দ্রনাথই ছড়ার আলোচনায় যে বিশেষ দৃষ্টিকোণটি দিয়ে গিয়েছেন, গত তিরাশি বছর ধরে তাকেই মূলধন করে বঙ্গীয় আলোচকগণ আলোচনা করে এসেছেন বা আজও আসছেন। রবীন্দ্রনাথই ছড়াকে অপাঙ্‌ক্তেয় স্তর থেকে কুড়িয়ে এনে সাহিত্যের কৌলীন্য প্রদান করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি, কাজেই কবিরই অনুরূপ দৃষ্টি দিয়ে তিনি ছড়ার বিচার করেছিলেন। ছড়ার মধ্যে চিত্রমালার শোভাযাত্রা, এক বিশেষ জগতের টুকরো চিত্র, মানবমনের শিশুসুলভ বল্গাবিহীন কল্পনার ফল হিসেবে অসঙ্গতি, পারিবারিক জীবনের করুণা-সমবেদনা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথই পরম মমতা ও সূক্ষ্ম রসবোধ দিয়ে লক্ষ করে গিয়েছিলেন। ছড়ার সাহিত্যিক দিকটির ওপরই তাঁর সবখানি নজর গিয়ে পড়েছিল, এবং সেই সাহিত্যিক দিকের সঙ্গে সমাজের যতটুকু অনস্বীকার্য ও প্রত্যক্ষ যোগ, তিনি সেই সঙ্গে সে দিকটিকেও তাঁর আলোচনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী আলোচকগণ তারই জের টেনেছেন মাত্র, নতুন কোনো দৃষ্টিকোণের প্রবর্তনে সক্ষম হন নি। এইদিক নিয়ে তাই আজ ভাববার সময় এসেছে।

১৩০৬ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই যখন 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকা লেখেন, তখন তিনি প্রসঙ্গতঃ ছড়ার ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক দিকটির প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রায় আশি বছর হতে চলল, আজও সে মন্তব্য কার্যে অনূদিত হয় নি। ছড়াকে যে কেবল ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতেই দেখা যায়, তা নয়; আরো নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায়। সে প্রয়াসও হয় নি।

সুতরাং এখন পর্যন্ত বাঙলা ছড়ার আলোচনায় সাহিত্যিক দিকটিই একমাত্র আলোচ্য দিক হয়ে আসছে। সাহিত্যিক দিকটির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবনের কিছু হাসি-কান্নার ছবি হিসেবেও ছড়াকে দেখার রেওয়াজ

আছে। ছড়ার এই বিশেষ দিকটি দুই বাঙলার গবেষকদের কাছে বড়োই রুচিকর এক প্রিয় প্রসঙ্গ।[১]

Folk-lore বা 'লোকচারণা'র গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশে দিন-দিন নানা দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে বা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ রসবোধের ফলে যে আলোচনার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন, তার মূল্য পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়ে, আমাদের উচিত নবতর দৃষ্টিতে ছড়াকে পর্যবেক্ষণ করা। নতুন দৃষ্টিকোণের প্রবর্তন মানে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা নয়, বরং তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন, নবতর দৃষ্টিকোণের প্রবর্তনের ফলে তার সঞ্জীবনী শক্তিই প্রমাণিত হবে।

সুতরাং বাঙলা ছড়ার সাহিত্যিক সমীক্ষা করবার আর কোনো সার্থকতা নেই। ছড়ার মধ্যে যদি কোনো সাহিত্যিক গুণ বা উৎকর্ষ কিছু থেকেই থাকে (নিশ্চয়ই আছে), তবে তা এতো সহজ-সরল, এতো স্পষ্ট ও সুবোধ্য যে, তা বোঝানোর জন্তে কোনো গবেষকের টীকা-ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা নেই।[২] আর, যেখানে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে সে কাজ করে গেছেন, সেখানে অন্ত কেউ তা করতে বসলে অনাবশ্যক বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ যা বলে গেছেন (অবনীন্দ্রনাথ

---

১ আমেরিকার Folk-lore গবেষণায় সমীক্ষার যে সব দিক প্রাধান্ত পেয়েছে, Jan Harold Brunvand তাঁর 'The Study of American Folk-lore' (New york, 1968) বইতে (P. 15) তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তা জানিয়েছেন: 'The oldest and still the most common technique of folk-lore analysis is comparison, usually of many different versions of the same item. Other effective techniques are linguistic analysis, psychological interpretation, structural dissection, and examination of folk-lore's role in a given culture. এই গবেষণা-ধারার সঙ্গে বঙ্গীয় ও ভারতীয় গবেষণার ধারার তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য পরিস্ফুট হবে।

২ এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা' ও 'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'য় ছড়ার সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করছেন, 'সাহিত্য' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩০১) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মশাই মন্তব্য করেছিলেন, ছড়ার উৎকর্ষ বোঝবার জন্তে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

যে ছড়াকে পুনর্গঠিত করতে বলেছিলেন, সে কাজই বা কে করেছেন), তাতেই শেষ কথা বলা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই।

আমাদের মতে বাঙলা ছড়ার মধ্যে যে সব দিক সমীক্ষার বিষয় হতে পারে, তা এই : ১. ছড়ার ভাষা-তাত্ত্বিক দিক ; কেউ যেন এটিকে নিছক ভাষাতত্ত্ব বলে মনে না করেন। লোকমানসের বিশেষত্বের পটভূমিকায় (প্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণের সূত্রের দিক থেকে নয়) তা আলোচ্য-বিবেচ্য ; ২. সামাজিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক, ৩. ছড়ার প্রসঙ্গোপকরণ (Motif), তার রূপগত বিশেষত্ব (Morphology, Structure), ছড়ার মধ্যে প্রতীক (Symbol) ও সংমিশ্রিত প্রতীক (composite symbol)-কে লক্ষ করা। এই তৃতীয় দিকটিকেই আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছি। কতকগুলি বিশেষ দিক থেকে প্রস্তাবিত প্রথম ও দ্বিতীয় দিকের সঙ্গেও এর মিল আছে। বলা প্রয়োজন, এই Structural analysis-ই Folk-lore সমীক্ষাব আধুনিকতম দিক বলে পাশ্চাত্ত্যদেশে স্বীকৃতিলাভ কবেছে।

আমাদের সমীক্ষাব দৃষ্টিকোণটি এইখানে ব্যাখ্যা কবি। ছড়া তো বটেই, লোকসাহিত্যের যে কোনো দিকই একটি 'মিশ্র দৃষ্টিতে' দেখা উচিত। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমবা দেখিয়েছি, গীতি-কথা-ধাঁধা-প্রবাদ ইত্যাদির দিক তো আছেই, উপরন্তু প্রয়োগ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রের দিক থেকেও ছড়া এক বিচিত্র সাহিত্য, সুতরাং তার বিচার-সমীক্ষাও মিশ্রদৃষ্টিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই 'মিশ্রদৃষ্টি' হলো এক ধরণের সর্বাত্মক ও সামঞ্জস্যমূলক দৃষ্টি, ইংরেজিতে বলা যায় 'Rounded study'. এই Rounded study-র নানা দিক ও বিশেষত্ব আছে, তা এই :

ছড়া সমীক্ষার জন্যে এমন একটি দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করতে হবে, যা লোক-মানস, জীবন, রুচি ও সংস্কারকে নিঃশেষে ব্যক্ত করতে ও ধারণ করতে সক্ষম হয়। কেউ আমরা মনে করি, ছড়া নারীর রচনা, কেউ বলি পুরুষের ; মেয়েলি ও পুরুষালি—এই দুই ভাগে ছড়াকে ভাগ করে নিতে অনেকেই আমরা অভ্যস্ত। কেউ বা ছড়ার এক অংশকে নাবালকের পথ্য, অপরাংশকে সাবালকের জীবন ও মানসের প্রতিবিম্ব বলি। কেউ কোনো-কোনো ছড়ার মধ্যে সঙ্গতি-সংলগ্নতাকে দেখি, কেউ তার মধ্যে অর্থহীন অসংলগ্নতাকে আবিষ্কার করি। ফলে ছড়া সমীক্ষার দৃষ্টিকোণটিও হয়ে যায় কেবল একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সহায়ক এবং সে কারণেই খণ্ডিত। ছড়ার Rounded study

বলতে, প্রথমতঃ, আমরা বুঝি এমন একটি দৃষ্টিকোণ যার মধ্যে এই ধরণের কোনো খণ্ডতা ও বিরুদ্ধতা থাকবে না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোণের জন্যে ছড়া নারীর কি পুরুষের, সাবালকের কি নাবালোকের, সঙ্গতির কি অসঙ্গতির সে ভেদ-জ্ঞানের প্রয়োজন নেই—এমন একটি দৃষ্টিকোণ, যা এই সব বিরুদ্ধাত্মক দিকগুলিকে সংহরণ করে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ, Rounded study বলতে বুঝি, ছড়াকে কেবল Formalized Folk-lore-এর অন্তর্ভুক্ত করে নয়, Material Folk-lore-এর মধ্যেও তাকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করে নিয়ে, এই উভয় দিক থেকেই তার বিচার। আধুনিক কালে Folk-lore-কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক. Verbal folk-lore: লোকভাষা (Folk-speech), সর্ব প্রকার নামকরণ (onomastics), প্রবাদ ও প্রবাদমূলক উক্তি, ধাঁধা, ছড়া, গান, খ. Partly verbal folk-lore: লোকবিশ্বাস, সংস্কার, নানাপ্রকার লোক-ভঙ্গি (Folk-gestures), লোকক্রীড়া, লোকনাট্য, লোক-নৃত্য, লোক-প্রথা, লোক-উৎসব; গ. Non-Verbal folk-lore: খাদ্য, বাসস্থান, শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রভৃতির ঐতিহ্যমূলক উপকরণ এবং লোকসঙ্গীত, লোক-ভঙ্গির সূক্ষ্ম দিকের ঐতিহ্য (non-material traditions)। আমরা এই তিনটি দিকের মধ্যে সমন্বয়ের পক্ষপাতী, যদিও এই বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। সুতরাং একটির সঙ্গে অপরটিকে জড়িয়ে Folk-lore-কে বিচার করতে চাই। একটি ব্রতচিত্র বা একটি কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে যে বিশিষ্ট Motif-টি দেখা দিল, তাই-ই অবিকৃত বা অপরিবর্তিত রূপে কি ভাবে একটি ছড়ার কায়া নির্মাণে বা রচনারীতিতে সক্রিয় হয়, সেটাই প্রদর্শন করে অখণ্ড লোকমানসকে তুলে ধরা; একটি বিশেষ ধরণের খেলার ভঙ্গি কি করে ওই খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়াটির রচনাভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাই দেখানো; কিংবা, দৈনন্দিন জীবনে যে সব আচার-বিশ্বাস আছে, তারই আলোকে ছড়াকে প্রত্যক্ষ করা; কিম্বা এক-একটি জনগোষ্ঠী যেভাবে তাদের কুঁড়ে ঘরগুলি বিন্যস্ত করে, তারই প্যাটার্ণকে ছড়ার রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা; কিংবা, বিশেষ উচ্চারণ রীতি, স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাতের বিশেষত্ব ইত্যাদি কি ভাবে ছড়ার দেহ নির্মাণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল হয়; এক কথায়, Material জগতের তাবৎ দিককে, যতটা সম্ভব গ্রহণ করে, তারই আলোকে ছড়াকে লক্ষ করা।

Rounded study তৃতীয় দিক হল, এক-একটি ছড়ার যে সব 'কথান্তর' ও 'রূপান্তর' মেলে, তার বিচার-সমীক্ষা করে তার পরিপূর্ণ দিকটি মেলে ধরে তার অর্থ ও রূপটি অন্বেষণ করা। সেই ছড়ার বিভিন্ন কথান্তরের মধ্যে গভীর ও গুহ্য যোগসূত্র লক্ষ করা, এবং বিভিন্ন কথান্তরের কারণ আবিষ্কার করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র প্রতিষ্ঠিত করা। কথান্তরের পেছনে শব্দচিন্তা এবং অন্যান্য সামাজিক দিককেও তুলে ধরা।

অতঃপর এর চতুর্থ দিক। এই দিকটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই। একই ছড়ার নিজস্ব অঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের স্বতন্ত্র উপকরণ যেমন থাকে, তেমনি ওই সব স্বতন্ত্র উপকরণের মধ্যে আবার একটি Unifying দিক অর্থাৎ একীকরণের দিকও থাকে,—এই খণ্ড উপকরণের সঙ্গে অখণ্ড ও একীকরণের দিকটাকে অনুসরণ করাও Rounded studyর একটি বড়ো দিক। সেটি এই ভাবে ঘটে :

১. ছড়ার Motif অর্থাৎ উপাদান-উপকরণ-প্রসঙ্গকে আমরা প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করি : ক. সাধারণ শব্দাবলী, যেগুলি এক-একটি বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ-অনুষঙ্গকে নির্দেশ করে, পটভূমিকাকে পরিস্ফুট করে। যেমন, নদী-পুকুর, পান-পাখি-বিয়ে-গান ইত্যাদি ; খ. ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি বিশিষ্ট দিক, যেমন, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ, একানুপ্রাস-অন্ত্যানুপ্রাস, মিলের অন্যান্য রীতি-বন্ধন, Antithesis, ইত্যাদি। ছড়ার Smallest unit বলতে এই দুটি দিক, এদুটিকে বলা যায়, ছড়ার Primary Motif.

২. সাধারণ শব্দ এবং বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক দিক—এই দুই Primary Motif মিলিত হয়ে রচনা করে ছড়ার এক-একটি পঙ্‌ক্তি, বা এক-এক জোড়া পঙ্‌ক্তি। অধিকাংশ ছড়াই এক-এক জোড়া পঙ্‌ক্তিতে অর্থাৎ এক-একটি শ্লোকে বিভক্ত, তাদেরই সমষ্টি হল এক-একটি গোটা ছড়া।[১] ছড়ার অন্তর্ভুক্ত এই শ্লোক বা জোড়া পঙ্‌ক্তিগুলিকে আমরা বলি ছড়ার Secondary Motif.

৩. Primary এবং Secondary উভয় প্রকার Motifই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল একটি 'প্রতিসাম্য' (Symmetry) রচনা করা। এই 'প্রতিসাম্য' বস্তুটি কেবল ছড়ার নয়, ব্যাপ্তার্থে

১ অবশ্য কখনো-কখনো তা দুটি পঙ্‌ক্তিকে ছাড়িয়ে তিন-চার বা ততোধিক পঙ্‌ক্তিতে ব্যাপ্ত হতে পারে, হয়েও থাকে।

লোকসাহিত্যের যে কোনো শাখারই বৈশিষ্ট্য। প্রতিসাম্য বস্তুটি কতকগুলি গোনাগাঁথা নির্দিষ্ট হিসেব, তাতে থাকে একটি জ্যামিতিক নক্‌শাকে ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা ও প্রয়োজন। এখানে সব কিছুই মাপাজোকা, কোনো দিকে এক চুল বা এক তিল কম-বেশি হতে পারে না। এর মধ্যে থাকে একটি Rigidity বা অনমনীয়তার কঠোর দিক। যেমন, উদাহরণ হিসেবে দুর্গা-প্রতিমার বিন্যাসটির কথা বলা যায়। ঠিক মাঝখানে, এবং সবার উঁচুতে রয়েছেন দুর্গা ; তাঁর একটু নীচে, ডানে-বাঁয়ে, সমপরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে আছেন লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই কন্যা , তাঁদের একটু নীচে, ডানে-বাঁয়ে, সমপরিমাণ দূরত্ব রক্ষা করে আছেন কার্তিক-গণেশ। একটি জ্যামিতিক ছক বা ডিজাইন বা নক্‌শাকে যেন অনুসরণ করা। এরই ফলে রচিত হয় Symmetry। উচ্চতর সাহিত্য A-symmetrical এবং Harmonical , কিন্তু লোকসাহিত্য Symmetrical. এই জ্যামিতিকতার জন্যে (পারস্যদেশের শিল্প-কলার মধ্যে এই দিকটিকে খুব দেখা যায়, একে বলে Arabesque) লোকচিত্রের মধ্যে নমনীয়তা ও গতিবেগের বদলে থাকে একটি Stiffness বা দৃঢ়তা এবং স্থিরতা। এখানে একটি উড়ন্ত বা চলন্ত পাখিকে দেখলেও মনে হবে সে স্থির হয়ে আছে। যাই হোক, ছড়ার এই Symmetry-কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি : ক. Primary এবং Secondary এই দুই Motif মিলে রচনা করে Primary Symmetry খ. যে unifying বা একীকরণের কতকগুলি সূত্র Primary ও Secondary Motif-গুলোকে একত্র করে একটি অখণ্ড ছড়াতে পরিণত করে, আমরা তাকে বলি Secondary বা Final Symmetry.

৪. Secondary বা Final Symmetry একটি ছড়ার সর্বাঙ্গ জুড়ে বর্তমান থাকে। সুতরাং ছড়ার Structure বা গঠন এবং Morphology বা রূপতত্ত্বের দিক বলতে, এই দিকটিই। প্রত্যেকটি ছড়ার একটি বিশিষ্ট 'রূপতত্ত্ব' আছে, সেই রূপ নির্মাণই ছড়া সৃষ্টির লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, সেই রূপটিই 'প্রতিসাম্যমূলক' রূপ। ছড়ার সমীক্ষা বলতে আমরা তাই দুই প্রকার Symmetry এবং তার পশ্চাতে আবার দুই প্রকার Motif অন্বেষণকে বুঝিয়েছি। একেই বলেছি, একদিকে ছড়াকে খণ্ড-খণ্ড উপকরণের সমষ্টিরূপে দেখা, অপরদিকে, তাকে অখণ্ড ও সার্বিকভাবে দেখা। এই দুই দৃষ্টিতে দেখার নামই Rounded study.

ছড়ার Primary symmetry এবং Secondary symmetry-র মধ্যে পার্থক্যটি অন্য ভাবেও পরিস্ফুট করা যায়। Primary symmetry-কে বলা যায় Horizontal বা দিগন্ত রেখার সঙ্গে সমান্তরাল অর্থাৎ সমতল : তা যেন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে প্রসারিত একটি সরলরেখা ; একে বলা যায় 'আড়া-আড়ি' দিক। অপরদিকে Secondary symmetry-কে বলা যায় Vertical, অর্থাৎ তা খাড়া-খাড়ি, উল্লম্ব, ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন পর্যন্ত প্রসারিত ; একে বলা যায় একটি বৃত্তের মতো, যা গোটা ছড়াকে বেষ্টন করে একটি পূর্ণতা বা অখণ্ডতা ও সমগ্রতা প্রদান করে। Horizontal symmetry বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Rigid, কঠোর ; Vertical symmetry সেখানে বহুশঃই Flexible, তার নমনীয়তা আছে, সে জন্যেই তা বৃত্তধর্মী হতে পারে,—তবে এর মধ্যেও অনেক সময় Rigidity দেখা যায়। Horizotal symmetry হল ছড়ার এক-একটি পঙ্‌ক্তি, কখনো একজোড়া পঙ্‌ক্তি, Vertical symmetry ছড়ার আগাগোড়া বিস্তৃত, এইজন্যেই একে বলেছি বৃত্তবৎ। কখনো কখনো Horizontal symmetry-র মধ্যে Vertical symmetry-র ভাব এসে পড়ে ; যেমন, একই পঙ্‌ক্তিতে কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যদি পর-পর তিনবার আবৃত্ত হয়, তবে তাতে বৃত্তধর্মিতার আভাস আসে।

যেমন Motif-এর দিক থেকে ছড়ার মধ্যে আমরা দুই প্রকার Motif (সাধারণ শব্দ এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব) দেখেছি, তেমনি Morphology বা রূপতত্ত্বের দিক থেকেও একটি ছড়াকে আমরা তিন অংশ বা খণ্ডে বিভক্ত করতে পারি। সব ছড়াকেই অবশ্য তিন অংশে বিভক্ত করতে না পারলেও মাঝারি আকারের প্রায় সব ছড়াকেই রূপতত্ত্বের দিক থেকে অন্ততঃ দুই অংশে ভাগ করা যায়। এই তিন অংশ হল : ক. ছড়ার প্রথম বা উদ্বোধনী অংশ ; খ. ছড়ার মধ্যাংশ ; গ. ছড়ার অন্তিম অংশ। অন্তিম অংশই ছড়ার প্রাণ, তার climax, এই দিকে লক্ষ্য রেখেই ছড়া গড়ে ওঠে এবং সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়া মাত্রই ছড়া শেষ হয়ে যায়। শেষ অংশের পর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রথমাংশ। মধ্যাংশের গুরুত্ব ও মূল্য সবচেয়ে কম। ছড়ার সমীক্ষার কালেও এই তিন অংশের মধ্যে চাই সামঞ্জস্য সাধন। এক হিসেবে বিচার করলে, রূপতত্ত্বের দিক থেকে এই যে তিন অংশ, তাও ছড়ার Motif বা উপকরণ।

কোন্ unifying সূত্রগুলি গোটা ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে থেকে অখণ্ডতার সৃষ্টি করে? সেগুলি এই: ক. পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাওয়া; কখনো দেখা যায়, পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দ হচ্ছে। শব্দের এই পুনরাবর্তন পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির যোগ সাধন করে: এই ভাবে দেখা যায়, শৃঙ্খলবৎ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। একই শব্দ হয়তো পর-পর দু'বারের বেশি আবৃত্ত হয় না; এক্ষেত্রে মিল-বন্ধনটি হল Relay পদ্ধতির মতো: দুটি শব্দ যোগ-বন্ধনকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে অপর দুটি শব্দের হাতে সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করল। সে দুটি শব্দ আবার তাদের দায়িত্ব শেষ করে অপর আর দুটি শব্দকে সে কাজ দিল। এইভাবে, খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-এক জোড়া পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে যোগ-বন্ধন অগ্রসর হতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রতিজোড়া পঙ্‌ক্তি বিচ্ছিন্ন, কিন্তু Relay পদ্ধতির প্রসঙ্গটি মনে রাখলে তা মনে হবে না। অনেক সময় পর-পর দুবারের বদলে তিনবারেব আবৃত্তি মেলে, কখনো বা দু-একটি পঙ্‌ক্তি ডিঙিয়ে সেই শব্দের আবর্তন হয়ে থাকে। খ. কখনো কখনো দেখা যায়, পূববর্তী পঙ্‌ক্তি 'কারণ' পরবর্তী পঙ্‌ক্তি 'কার্য', কার্য-কারণের এই শৃঙ্খলা অখণ্ডতা সৃষ্টি করে থাকে। গ. একটি বিশেষ ভাব-ভাবনা, একটি আবহ-অনুষঙ্গেব ক্রমান্বয়িক উল্লেখেব পর, পরিশেষে ওই ভাবনা-অনুষঙ্গটির পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে অখণ্ডতা আসে। ঘ. বহু ছড়াই প্রশ্নোত্তর-মূলক। প্রশ্ন এবং তার উত্তর এই দুই অংশ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, ফলে ছড়ার গঠনে ও রূপের মধ্যে আসে ঐক্য ও অখণ্ডতা। ঙ. প্রতীক (composite symbol)-এর ফলে অখণ্ডতা সৃষ্টি, যেমন, বিয়ে থাকলে পান, ফুল, ফল, জল ইত্যাদি থাকে, তেমনি একটির সঙ্গে অপরটির (যেমন পানেব সঙ্গে ফুলের) সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই সংমিশ্রণের প্রসারিত ফল হল পরিবর্তন বা বদল। যেমন, 'পানির তলে ঘুঘু ডাকে, শুনতে যাবি লো'—এই ছত্রের রূপান্তর পাই: 'জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি লো'। তা হলে এখানে 'ঘুঘু'র পরিবর্তে বা বদলে পাওয়া গেল 'ফুল'। অনুরূপভাবে এর উল্টো দিকও দেখা যায়। আবার তেমনি, পাখি থাকলে ফুল থাকে। আর একটি উদাহরণে: 'খুবড়িকে নিয়ে গেল কদম তলা দিয়ে,'—এর কথান্তর:

'পরত বাজিয়ে লইয়া যাইব 'শূন্ত উড়া দিয়া'। এখানে 'কদম' গাছের বদলে পাওয়া গেল 'পাখি'। আগের উদাহরণে পেয়েছিলাম—পাখির বদলে ফুল, এখানে পাখির বদলে গাছ। ফুল শিথিলভাবে গাছেরই সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অনুমান করা যায়, পাখি থাকলে ফুল, ফল, গাছ থাকে। পাখির সঙ্গে তাই ফুল-ফল-গাছের বর্ণনা থাকলে, ছড়াটিকে অসংলগ্ন বলা চলবে না, কারণ, সংমিশ্রিত প্রতীকের উপকরণ হিসেবে একটির সঙ্গে আর একটি জড়িত। প্রসঙ্গ বিয়ে হলেও আবার এগুলো থাকলে, সুতরাং বিয়ের ছড়াতে এগুলির বর্ণনা বা উল্লেখ দেখে সে বর্ণনা বা উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক, নিরর্থক ও অসঙ্গতিমূলক বলা যাবে না। অনেক সময় এও ঘটে, এবং এটি ছড়ার এক বিশেষ ব্যাপার, সংমিশ্রিত প্রতীকের একটি উপকরণ বেশি প্রাধান্ত পেয়ে গেল। অর্থাৎ ধরা যাক, বিয়ের বিষয়-প্রসঙ্গ নিয়ে একটি ছড়া: বিয়ে থাকলে জল, ফল, পান, সাপ, গাছ ইত্যাদি যা-যা প্রতীক হিসেবে এসে থাকে তার কোন একটি এককভাবে অথবা দু-তিনটি মিলিত-মিশ্রিত হয়ে ছড়াটিতে এসে পড়ল। এককভাবে কোনো প্রতীক উপস্থিত হলে সাধরণতঃ জটিলতা নেই। কিন্তু দু-তিনটি মিলিতভাবে এলে, তার মধ্যে একটি, কখনো বা দুটি প্রাধান্ত পায়। 'প্রাধান্ত পায়' মানে সে সম্পর্কে বর্ণনা-চিত্র একটু বড়ো হয়। এই কারণেই ছড়া চিত্রমালার সমষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ একই ছড়ার মধ্যে একাধিক চিত্র দেখে ঝাঁক বাঁধা পাখির উপমা দিয়েছিলেন। সংমিশ্রিত প্রতীককে অনুধাবন না করলে, কেন ছড়া চিত্রমালার সমষ্টি তা বোঝা যাবে না। লোকমানস প্রায়ই এক-একটি ভাবের সঙ্গে অপরাপর অন্যান্ত ভাবকে জড়িয়ে নেয়, ফলে একটি এলেই আর একটি আসে।

ছড়ার মধ্যে অখণ্ডতা ও সমগ্রতা এবং তার ফলে সঙ্গতি-সংলগ্নতার দিকটিকে পর্যবেক্ষণ করলে ছড়ার উনশেষ ও শেষ পঙ্‌ক্তির একটি বড়ো ভূমিকা দেখা যায়। উনশেষ এবং শেষ পঙ্‌ক্তি এসে গেলেই, তার রচনাভঙ্গির মধ্যে এমন কয়েকটি বিশেষত্ব আছে যে, আবৃত্তিকারীর কণ্ঠস্বরে এবং উচ্চারণে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবেই। উনশেষ এবং বিশেষতঃ শেষ পঙ্‌ক্তির উচ্চারণের বিশেষত্বের সঙ্গে থাকে এক-একটি 'Folkgesture'। এই 'লোকভঙ্গি' ছড়ার Action-এর দিক। ছড়ার রচনারীতির সঙ্গে এটি গভীরভাবে যুক্ত। একই ছড়ার মধ্যে যদি শেষ-বাচক এমন একাধিক অংশ থাকে, তবে প্রায় নিশ্চিত-

অনেকেই ধরে নেওয়া যায়, তাতে অন্য ছড়ার প্রবেশ ঘটেছে বা অন্য ছড়ার পুরোই এসে ওই ছড়াতে ঢুকে পড়েছে। সাধারণতঃ মিল, শব্দসাদৃশ্য বা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাহচর্যে এই ব্যাপার ঘটে, এবং ছড়ার অখণ্ডতা ও সঙ্গতিকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যাহত করে। শেষ অংশের বিশিষ্টতা দিয়ে এই ধরণের ছড়ার প্রক্ষিপ্ত অংশটি বা অংশগুলি ধরা যায়।

ছড়া সমীক্ষায় আমাদের দৃষ্টিকোণটি ওপরে ব্যক্ত হল। যে Rounded studyর কথা উত্থাপন করেছিলাম, মোট চারটি দিক থেকে তা করা যেতে পারে। এই চারটি দিকের মধ্যে চতুর্থ দিকটিই সর্বপ্রধান, তারই মাধ্যমে অন্যান্য তিনটি দিককেও স্পর্শ করা যায়। এই ভাবে ছড়ার গঠনগত দিকটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তুত সঙ্কলনের ছড়া সমীক্ষা

...১...

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাঙলা ছড়া সমীক্ষার যে বিশেষ দৃষ্টিকোণটি আমরা উপস্থিত করেছি, এইবার প্রস্তুত সঙ্কলনের ছড়াগুলির ওপর তা প্রয়োগ করা যাচ্ছে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে পুনরুক্তি আসবে, এজন্যে পাঠকের প্রশ্রয় প্রার্থনা করি।

ছড়া-সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল, ছড়ার Motif অর্থাৎ উপকরণ-উপাদান-প্রসঙ্গ ইত্যাদি। আলোচনার সুবিধের জন্যে Motif-এর বাঙলা করা যেতে পারে 'প্রসঙ্গোপকরণ' বলে। এই প্রসঙ্গোপকরণকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করেছি: ক. 'Constant' অর্থাৎ স্থির ও স্থায়ী কতকগুলি বিষয়-প্রসঙ্গকে ব্যক্ত করবার জন্যে সাধারণ শব্দাবলী খ. কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা। এই দুটি উপকরণকে ছড়ার ক্ষুদ্রতম প্রসঙ্গ (Smallest unit) বলেছি। এই দুই দিক মিলিয়ে ছড়ার 'Primary Motif.'

'সাধারণ শব্দাবলী' বলতে এমন কতকগুলি বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ-অনুষঙ্গের শব্দ বুঝি, ছড়াতে যেগুলো প্রায়ই ঘুরে-ফিরে আনাগোনা করে। অর্থাৎ এইগুলোই ছড়ার প্রতিবেশ এবং সেই প্রতিবেশের সঙ্গেই জড়িত হল এই শব্দাবলী। সাধারণ দৃষ্টিতে এই শব্দগুলি অভিধানের অন্যান্য শব্দের মতোই, কোনো বিশিষ্টতা নেই, কিন্তু এক-একটি পটভূমি, বিষয়, প্রসঙ্গ ধরে যখন এরা ব্যবহৃত বা গৃহীত হয়, তখন এরা Motif হয়ে ওঠে। বাঙলা ছড়ার কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ আছে, আলোচ্য ছড়াগুলিরও তাই। তবে, এক-একটি অঞ্চলে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব থাকা সম্ভব। বাঙলা ছড়ার Motif-কে ব্যক্ত করতে যে সব 'সাধারণ শব্দাবলী' আমাদের নজরে পড়েছে, তা এই (অর্থাৎ সাধারণ শব্দাবলী যে সব প্রসঙ্গকে নির্দেশ করে, তারই কথা বলা হল):

১. কাল্পনিক ও বাস্তবিক স্থানের নাম।

২. কাল্পনিক ও বাস্তবিক ব্যক্তিনাম, চরিত্র।

৩. জন্ম, জন্ম-বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা বিচিত্র দিক।

৪. মৃত্যু, মৃত্যু-বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা বিচিত্র দিক।

৫. বিবাহ, বিবাহ-বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা বিচিত্র দিক।

৬. পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি Cardinal দিক। ডান ও বাঁ দিক, মধ্যের দিক; ওপর, নীচ ও ভেতরের দিক।

৭. জড় বস্তুতে চেতনা আরোপ এবং আরোপ-বাচক শব্দ। এবং তার ফলে আগত শব্দাবলী।

৮. চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, তারা, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ প্রভৃতি এবং সেই অনুষঙ্গ-আবহ-প্রতিবেশ, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি।

৯. কয়েকটি বিশিষ্ট সংখ্যা; বেজোড় সংখ্যার প্রাধান্য, 'এক' ও 'তিন' সংখ্যা দুটির প্রাধান্য।

১০. বিভিন্ন রঙ ও বর্ণ; সাধারণতঃ উজ্জ্বল বর্ণ ও বর্ণ-বাচক শব্দ।

১১. নদী, দীঘি, পুকুর, ঘাট, জল প্রভৃতি এবং তজ্জাতীয় শব্দ। পুকুর, ঘাট ও জলের প্রাধান্য।

১২. আগুন, আগুনে পোড়া, প্রদীপ।

১৩. মানবেতর নানা প্রাণী: মাছ, সাপ, পাখি, প্রভৃতির প্রাধান্য। এগুলির ওপর মানবিকতা আরোপ। বাঁদর, হনুমান, বাঘ, শেয়াল প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীর নাম ও প্রসঙ্গ।

১৪. সর্বপ্রকার গাছ, ফল, তৃণ, ফুল, পাতা, লতা। ফুল, পান ও সুপুরির প্রাধান্য। সর্বপ্রকার গাছ-ফলের ওপর মানবিকতা আরোপ।

১৫. ভীতিপ্রদ, আশ্চর্যজনক, অনৈসর্গিক ও বিশেষত্বপূর্ণ বস্তু, প্রাণী, গাছ, ইত্যাদি; এগুলির ওপর মানবিকতা আরোপ।

১৬. রাম-সীতা, হর-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, বালগোপাল, যশোদা, নন্দ-কিশোর ইত্যাদি। বৈষ্ণব আসঙ্গের ও হর-পার্বতীর আসঙ্গের প্রাধান্য।

১৭. সর্বপ্রকার আত্মীয়-পরিজনের সম্বন্ধ-বাচক শব্দ। সতীন, মাসি-পিসি, মামা-মামীর প্রাধান্য। এ ছাড়া আছে, দাদা-বউদি, ভাই-বোন।

১৮. কয়েকটি বিশিষ্ট বৃত্তির মানুষ ও বৃত্তিবাচক শব্দ: জেলে, ডোম, বাগদী, ধোপা, ছুতোর, রাখাল, কাহার, তেলী-তেলেনী, মুচি প্রভৃতি।

১৯. প্রতি মানুষের অঙ্গ ও অঙ্গ-বাচক শব্দ: হাত, পা, চোখ, মাথা। খোঁপা ও চুলের প্রাধান্য।

২০. বাড়ী : বাপের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী, মামাবাড়ী।

২১. ঘর-বাড়ী, আঙিনা-অঙ্গন, চাল, মাঠ, প্রান্তর, মরাই, গোয়াল।

২১. হাট-বাজার, কেনা-বেচা।

২২. নৌকো, পালকি, দোলা, ডুলি।

২৩. ছাতা, খাট, পালঙ্ক, পিঁড়ি, আসন, মাদুর।

২৪. থালাবাসন, ঘটী-বাটী, কলসী।

২৫. শাঁখা-সিঁদুর, আয়না-চিরুনী, কাজললতা, তেল।

২৬. রান্না-বান্না, এবং সে সংক্রান্ত শব্দ, রান্নাঘর। 'হলুদ' শব্দের নানাবিধ প্রয়োগ।

২৭. খাদ্যদ্রব্য : বেশির ভাগই দুগ্ধজাত (দুধ, দই, ঘি, সর, ক্ষীর), চিঁড়ে, খই-নাড়ু-মোয়া। ভাত, পান্তাভাত, ছাতু, কলা।

২৮. গয়না-গাঁটি, সোনা-রূপো, মোহর, মণি-মুক্তো, সোনা-দানা। সোনার প্রাধান্য।

২৯. টাকা-পয়সা।

৩০. ঝাঁপি, 'ট্যাপোর', অন্যান্য পাত্র।

৩১. ধুতি, শাড়ী, শাড়ীর আঁচল, গামছা, পাগড়ি। শাড়ী ও গামছার প্রাধান্য।

৩২. জুতো, খড়ম।

৩৩. নূপুর, ঘুঙুর, টোপর, মুকুট।

৩৪. হুঁকো, তামাক।

৩৫. রাজা-রাণী, রাজ্যপাট, এবং এই বিষয়ক শব্দ।

৩৬. জামাই, শ্বশুর, বেহাই, বর-কনে; শ্যালক, ঘটক—ইত্যাদি বিবাহসংক্রান্ত চরিত্রাবলী, সে বিষয়ে বিভিন্ন শব্দ।

৩৭. কোনো বুড়ো ও বুড়ীর নাম, রূপ, চরিত্র, সে প্রসঙ্গে শব্দ। বিশেষ ও নির্বিশেষ বুড়ো ও বুড়ী।

৩৮. কোনো বিশেষ স্থানে যাওয়া, বা কোনো স্থান থেকে কারো আসা, সে বিষয়ে শব্দ।

৩৯. হাসা-কাঁদা-নাচা প্রভৃতি ক্রিয়া ও ক্রিয়াবাচক শব্দ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটমান বর্তমান কাল-জ্ঞাপক শব্দ।

নিশ্চয়ই এই তালিকা নিঃশেষ নয়, তবু এর থেকে বাঙলা ছড়ায় সাধারণ-

ভাবে ব্যবহৃত শব্দাবলীর নাম-পরিচয় জানা যায়। মনে রাখতে হবে, শব্দগুলি সচরাচর ছড়ার মধ্যে নিজে-নিজেই স্বতন্ত্রভাবে আসে না, আসে এক-একটি প্রসঙ্গ ধরে। এক-একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে অনেক ধরণের শব্দ থাকে। যেমন, কোনো স্থানে যাওয়া একটি প্রসঙ্গ। ধরা যাক, তা পুকুর-ঘাটে যাওয়া। তা হলে, জল, পুকুর, ঘাট, কলসী ইত্যাদি শব্দগুলো এসে যায়। তেমনি, বিয়ের প্রসঙ্গ। বোধ করি এই প্রসঙ্গটি ধরে সবচেয়ে বেশি শব্দ ছড়ায় আনাগোনা করে।

অনাবশ্যক বোধে কোন্ ছড়ায় কোন্ শব্দাবলী কোন্ প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছে, তা উদ্ধৃত করে দেখালাম না। প্রসঙ্গ ধরে যে কেউ তা দেখে নিতে পারবেন ॥

···২···

ছড়ার Primary Motif-এর অপরদিক হল, কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। ভাষাগত বিশেষত্বের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ এবং শব্দদ্বৈত, নানাভাবে এদের ব্যবহার;

২. সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ, নানাভাবে এদের ব্যবহার ;

৩. সমভাবার্থক শব্দ ;

৪. বিপরীতার্থক শব্দ ,

৫. অবিকৃতভাবে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ,—দুবার বা তিনবার ; বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি ; একই বাক্যাংশের অবিকৃত পুনরাবৃত্তি ;

৬. জটিল ও মিশ্র পুনরাবৃত্তি—দু'ভাবে তা ঘটে থাকে ; একদিকে তা শব্দগত, অপরদিকে তা ভাব-পটভূমি-আবহগত ;

৭. Antithesis রচনা এবং এর মধ্যেও পুনরাবৃত্তি ;

৮. সংখ্যাবাচক শব্দঘটিত পুনরাবৃত্তি ;

৯. অন্যান্য বিচিত্র ভঙ্গিতে আগত পুনরাবৃত্তি।

এই তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়, ছড়ার ভাষাগত যে Motif-টির কথা এখন আলোচ্য, 'পুনরাবৃত্তিই' হল তার মূল কথা। নানা বিচিত্র ও জটিল পথ ও পদ্ধতিতে তা এসে থাকে। এই 'পুনরাবৃত্তি' রচনা করা বা প্রদর্শন করা বিশ্বের তাবৎ লোকসাহিত্যের এবং লোকচিত্র ও লোকশিল্পেরও

একটি প্রধান (বলা যায়, প্রধানতম) বিশেষত্ব। যে জ্যামিতিক নকশা বা গ্রাফিক আর্ট বা 'সিমেট্রি'র অনুসরণ লোকমানসে দেখা যায়, এই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও জগতেও এই ধরণের বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। সুতরাং এই বিশেষত্ব জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত,—কেবল ছড়াতেই নয়। ভাষার মধ্যেও তার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নীচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে তা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের আম্রেড়ন : শিল শিলাটন, শিলে বাটন, শিল অঝ্ঝর ঝরে, ২। ভাঁজো লো কলকলানি, ১১। ওপারেতে কদম গাছটি, কদম ঝুর্-ঝুর্ করে, ৪০। ঝম্‌ঝমাইয়া টাকা পড়ে, ৪৭। রাত্রি না দুপুরের কালে হুয়া হুয়া করে, ৬৫। থরকা মুঠুম, কাটুম কুটুম, মুঠে ধরি মাজা, ৭০। আইঙন বাইঙন গুড়িত কাটা, ৭১। হুঁকা করে টৌড়ত্-টাড়াত্, ৭৮। আম তলায় ঝামুর-ঝুমুর, ২১৮। ডিং-ডিংগা-ডিং-ডিং, কিসের বাদ্যি বাজে, ২৩৭। নিম ঝোর্-ঝোর্ করে, ২৮৪। ঝিম্-ঝিমালো ঝিমালো, জালুক লাটা-পাটা লো, ২৮৫। কইল্লা করে ঘাচাউ-ঘাচাউ, ৩৫৩। বোঙ্গম টম্-টম্, ৩৯৮। লাগ্‌লো ধুম্ গুড়ুম্-গুড়ুম্, ৪১২। ভাত কড়্ কড়্, ৪৪৯। এ বিষয়ের অন্যান্য উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদে (পৃ. ৮৫-৮৬) দ্রষ্টব্য।

ধ্বন্যাত্মক-অনুকার শব্দগুলির পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়মগুলিই অবশ্য প্রযুক্ত হয়েছে। স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বিকৃতি-সাধন, নামধাতু ও ক্রিয়া বিশেষণরূপে তাদের ব্যবহার। কিন্তু যা লক্ষণীয় তা হল, এই শব্দগুলি দিয়ে এক একটি 'প্রতিসাম্য' রচনা করবার প্রয়াস। এই বিষয়ে ধ্বনি ও দৃশ্যের অনুকৃতি-মূলক ছড়াগুলি (সং ২৩৯-২৪৯) এবং সংশ্লিষ্ট পাদটীকায় আমাদের মন্তব্য (পৃ. ১৪৯-১৫০) দ্রষ্টব্য। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি যেন কোনো ভাব বা দৃশ্যের বা ঘটনার প্রতিধ্বনি, যেন একটির বিকল্প আর একটি। দৃশ্য-ভাব-ঘটনার প্রত্যক্ষ বিকল্পরূপে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে দাঁড় করানো—যেন মুখোমুখী দুই সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে পরস্পরের মধ্যে জ্যামিতিক সমতা রক্ষা করা। এই একই ব্যাপার দেখা যায়, যখন একটি পঙ্‌ক্তিকে নিছক ধ্বন্যাত্মক শব্দমালায় পূর্ণ করে, অপর পঙ্‌ক্তিকে অর্থময় শব্দ দিয়ে রচনা করা ; এও যেন একের সঙ্গে অপরের সমতা রক্ষা করা। যেমন : ঢুল্ ঢুল্ ঢুলানী, গাছ বায়ে তেলানী, ২২৯। চুলবুল্ ঝুলানী, তেলুয়া মাছের তেলানী, ২৩০। ওই হোলো

রে হোলো, মাছ মারিবা' গেলো, ২৩১। ইড়্কি বিড়্কি টাম্ টিড়্কি, টামের গছত্ বান্ধিমু ঘোড়া, ৪৪৩।

ধ্বন্যাত্মক-অনুকার শব্দের পুনরাবৃত্তির ফলে মোট তিন ধরণের 'প্রতিসাম্য' রচিত হতে পারে: ক. নিজস্ব পুনরাবৃত্তির মধ্যে (যেমন, 'ঝামুর-ঝুমুর,' বা 'ঘাচাউ-ঘাচাউ'), খ. কোনো ভাব, দৃশ্য, ঘটনার অনুকৃতি এবং তার বিকল্প রূপে; গ. অর্থময় কোনো পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে। 'প্রতিসাম্য' মানেই হল, গাণিতিক বা জ্যামিতিক কোনো নিয়ম বা আদর্শকে অনুসরণ করে, দুই দিককে সমতা প্রদান করা। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি তিন ভাবে সেই কাজ করে থাকে॥

…৩…

এইবার সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের পুনবাবৃত্তির কথা। ধ্বন্যাত্মক শব্দের পুনরাবৃত্তিতে একটি সহজতা আছে, দুটি শব্দই এখানে পাশাপাশি বা পর পর থাকে, কচিৎ দুই শব্দের মধ্যে অন্য শব্দ এসে এদের বিশ্লিষ্ট করে দেয় (যেমন, এই উদাহরণে: আউর যায়, বাউর যায়, ৫৪)। সহচব-অনুচর-প্রতিচর শব্দেব দ্বিরুক্তির ক্ষেত্রে এই পাশাপাশি বা পর-পব অবস্থানের পরিবর্তে কিন্তু বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানটাই বেশি চোখে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এর মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই একটি জটিলতা ও মিশ্রণকে দেখা যায়। এই মিশ্রণ দু'ভাবে ঘটে: একদিকে একটি শব্দের সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দরূপে আর একটি শব্দ, অপর দিকে, সেই একই বাক্যে একটি ভাবনা-পটভূমিকা বা আবহগত একটি ক্রমবিকাশ। যেমন, কটি উদাহরণ নেওয়া যাক: ক. দোলায় আসি, দোলায় যাই, সং ১। এখানে অবিকৃত রূপে 'দোলা' শব্দ দু'বার উক্ত হয়েছে, 'আসি-যাই' এই প্রতিচর শব্দ দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় নি, মাঝখানে অন্য শব্দ এসে তাদের বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এই বিশ্লিষ্ট হবার সুফল রূপে, প্রতিসাম্যটি বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়েছে, পাশাপাশি থাকলে তা এতখানি প্রসারিত ও পরিস্ফুট হতে পারত না। খ. স্বামীর কোলে, পুত্রেব কোলে, সং ১। এখানে 'কোলে' অবিকৃতভাবে দু'বার উক্ত, কিন্তু সহচব শব্দ 'স্বামী-পুত্র' বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে। গ. পায়ে আলতা মুখে পান, সং ৫। এখানে পা-মুখ মানুষেব দুই অঙ্গ, এবং আলতা-পান অনুচর শব্দ—দু'ধরণের শব্দের

নিজস্ব জুটি থেকে বিচ্ছিন্ন। ঘ. সোনার কৌটা রূপার খিল, ৪। এখানে, একদিকে 'সোনারূপা' এই সহচর শব্দ, অপর দিকে কৌটো এবং তার 'খিল'। এইভাবে দুটি সহচর শব্দ একটি কৌটো ও খিলকে একত্র করেছে; এবং একদিকে সোনা ও কৌটো, অপর দিকে রূপো ও খিল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিসাম্য রচনা করেছে। এর ফলে একই বাক্যের বিচ্ছিন্ন ও ব্যবহিত দুই অংশ একটি সংহতি ও অখণ্ডতা লাভ করে। এই মনোভাবই প্রথমে শব্দ ছাড়িয়ে বাক্যে, বাক্য ছাড়িয়ে স্তবকে, শেষে স্তবক ছাড়িয়ে গোটা ছড়ায় ছড়িয়ে পড়ে সমগ্রভাবে ছড়াটিকে অখণ্ড করে তোলে। সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ-ঘটিত এই ধরণের প্রতিসাম্য রচনার অপরাপর নিদর্শন এই :

আম পাত, চালিতা পাত, ১৪। আশ্বিনে বাঁধিয়া কাতিকে খায়, ১৫। আঁধারে মেডে জোনাকে খাই, ২৩। ছোটো মরায়ে পা দিয়ে বড়ো মরায়ে হাত দিয়ে, ২৭। আম-কাঁঠালের পিঁড়েখানি ৩১। আগে আগে পালান কৃষ্ণ, যশোমতী পাছে, ৪১। ডালে ডালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা, ৪১। আজা খায় বাজা খায়, ৫৪। সোনার লাঙল রূপার ফাল, ৫৭। সোনার নড়ি রূপার মালা, ৫৮। সুবুদ্ধি গোয়ালার নারী কুবুদ্ধি ঘটিল, ৬০। আগে দিতাম দধি দুগ্ধ, পাছে দিতাম ক্ষীর, ৬০। সোনাপীর উঠিয়া বলে, মাণিকপীর রে ভাই, ৬০। হাতে দিলি রে হাতকড়া পায়ে দিলেন বেড়ি, ৬৭। খোপে কান্দে খোপ কবুতর, জলে কান্দে হাঁস, ৬৭। ভাইটি আমার লক্ষেশ্বর, বাপ আমার রাজা, ৭০। চান্দ পূজু চান্দনে, সূর্য পূজু বন্ধনে, ৭০। বাপ রাজা, ভাই পর্জা, ৭১। লিখিয়া লো পুকিয়া লো সাত বৌল পানি, ৭২। মামায় দিল পুষ্করণী, ভাইগ্নায় দিল পাব, ৭২। সুশীলা আইতে সুশীলা যাইতে, ৭৪। ডালে তোর বাসা, খালে তোর আশা, ৭৪। নয়া কইনা, নয়া বর, ৭৯। বাপ গেল আনে, মা গেল বনে, ৮০। সোনার বলি, হীরার ধার, ৮৩। আঁধারে আঁধারে এসো, জ'নে জ'নে যেও, ৮৭। ঘাস খায়, পানি খায়, ৮৮। হোট নড়ী উপরে দাও, ৯০। আসুক বৃষ্টি, আসুক ঝড়, ৯৮। খাটো নাঙল দীঘল ইশ, ১০৩। আশ্বিন যায়, কাতিক আসে, ১০৪। ভূত আমার পুত, শাখনী আমার ঝি, ১১২। সাপের দুধ, বাঘের পানি, ১২৫। আগে পালায় ভূতাভূতী, পিছে পালায় ডাইন-ডাকিনী, ১২৯। আছে বিষ তাপে জুড়ে, নাই বিষ আয় জুড়ে, ১৩৪। বেটার মুখ করিছে আঁকবাঁক, চোখ করিছে ছাই,

১৩৫। স্বর্গে হুড়-হুড়, মর্ত্যে জয়জয়কার, ১৩৬। ভালুকে নুন কুথা পায়, ভালুকে ত্যাল কুথা পায়, ১৪২। মামীর মাথায় সরু সুতু, মামুর মাথায় পাগ, ২০৩। গাই তুলে গোবরার জল, বাছুর তুলে ফেনা, ২১১। বরের মাথায় লাল টুপি, মেয়ের মাথায় ঠাকা, ২১৩। উপারে একটি খোঁপা, ইপারে একটি খোঁপা,২১২। মায়ে দিল তেল-সিন্দুর, বাপে দিল বিয়া, ২১৭। আগে কাঁদে মাসী-পিসী, পেছু কাঁদে পর, ২২৬। বাপে দিল সরু শাঁখা, মাএ দিল শাড়ি, ২২৬। ছোটো পিঁড়াখান্ বড়ো পিঁড়াখান ডালিম গাছের তলে, ৩৩৪। ভশুর আইসে শশুব আইসে, কই মারিবার আলে, ৩৩৪। মাসীর বড় টস্—মেসোর বড় টস্, ৩৩৭। ছোট গাঙ্গের ঢেউ, বড় গাঙ্গের ঢেউ, ৩৪২। সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল, ৩৭০, পা. টী। আগে থাকে উল্লাতুল্লা, শেষে হয় উদ্দীন, ৩৭৮। তলেব মামুদ উপবে যায়, ৩৭৮। ঠাকুরে বিনোদীলাল চাকরে ধনাই, ৩৮১। যেমনি ঢেঁকি তেমনি পোয়া, ৩৪৯। যেত্‌কে হালুয়া কিচ্‌কিচায়, তেত্‌কে বারার ভুকি, ৩৫১। ভাতো ক'ছে গরম, শাগো ক'ছে গরম, ৩৫১। তোর হইল্ বেটা, মোর হইল্ নাতি, ৩৫৬। রেতে আসে, রেতে যায়, ৩৬২। দেখ্ তোর, না দেখ্ মোব, ৩৬৭। সাজনে এগার সিন্দুব, বাজনে টোক, ৪০৩। হাতে কাঁচি, কোমবে দা, ৪০৯। আগে যায় কার্তিক-গণেশ, শেষে যায় লক্ষ্মী-সরস্বতী, ৪২০। কেউ নেয় কুলোডালা, কেউ নেয় ঝাঁর, ৪২০। মাছো না পাইল্, টাছো না পাইল্, ঘুবি আসিল্ বাড়ী, ৪৩১। আঁতে তিত দাঁতে নুন, কানে কচু নাইয়ে তেল, ৪৫৭। দক্ষিণ মুখো ঘরের রাজা, পূর্বদিক তার প্রজা, ৪৫৮। নূতন নূতন তেঁতুল-বিচি, পুরাণ হোলে বাতায় গুঁজি, ৪৬৭। গুয়া ধরে থোপা-থোপা, পান ধরে বরে, ৪৭৮। হাতে কালী মুখে কালী, ৪৮৫। স্বর্গে হুলুস্থুল মর্ত্যে জোকার, ৪৯৮। স্বর্গেতে বসতি, মর্তেতে বিহার, ৫০৮। আশ্বিন গেল, কার্তিক এল, ৫১৬।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, 'একানুপ্রাস' ও Antithesis একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ছড়ার পঙ্‌ক্তিতে 'একানুপ্রাস' ও 'ছেকানুপ্রাস'কে খুবই দেখা যায়। অনুপ্রাস বাক্যের এক অংশকে অপর অংশের সঙ্গে একটি মিলের বাঁধনে বেঁধে রাখে। 'প্রতিসাম্য' যেমন দুই সত্তাকে পরস্পরের সঙ্গে সমতার গাণিতিক সূত্রে বেঁধে একটি অখণ্ডতার সৃষ্টি করে; একানুপ্রাস ও

ছেকানুপ্রাসও তাই। Antithesis-ও দুই বাক্যাংশের দুই দিকের মধ্যে একটি অখণ্ডতা আনে। একানুপ্রাস-ছেকানুপ্রাস, Antithesis এবং 'প্রতিসাম্য'—এই সবই একটি সংহতি ও অখণ্ডতার অন্বেষণ করে। এই ভাবে, সংহতি ও অখণ্ডতার ধারক লোকমানস যে সাহিত্য রচনা করে, তার গঠন ও কাঠামোতেও তা ধরা পড়ে।

শুধু একানুপ্রাসও ছড়ায় প্রতিসাম্য রচনা করে। ছড়ার প্রারম্ভিক পঙ্ক্তিতেই অবশ্য এই ব্যাপার বেশি দেখা যায়। সব ধরণের একানুপ্রাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই: চোক্ষ জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়, ৬৪। তুই শাশুড়ী কুম্‌লাশাড়া, গাম্‌লা ভরা ভাত, ৩২৬। হালের গোরু পালে থুয়ে বৌ খুঁজতি গ্যালো, ৩৩১। কূলের কুসুম অকূলে ফুটাই, ৩৭৫। হোক্কা গেছে মক্কাপুরে, ৪৩৪। আকালের ভাত সকালে খান, ৪৯৪। একানুপ্রাস বহুক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের জনক। এক-একটি শ্বাসাঘাতকে দেড় মাত্রা করে ধরলে ছড়ার মধ্যে সুরের পরিমাণ বেড়ে যায়।

তেমনি, সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের অস্তিত্ব ব্যতীতই Antithesisও দেখা যায়: গঙ্গা শুকু-শুকু—আকাশে ছাই, ৮। ভাঁজো লো কলকলানি, মাটির লো শরা, ১১ [এই দুটি উদাহরণে শব্দের দ্বিরুক্তি আছে, কিন্তু তারা সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ নয়]। এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘি, ১১। আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়, ২১। যদি বা ছাড়িবে তুমি পরাণে মরিব আমি, ৩০। নন্দ গেল বাথানে—যশোদা গেল জলে, ৪১। হরুয়া নলের চাছকলাই, মাণিকনালের বেড়া, ৫৫। ঘরে মরে গোয়ালা, বাথানে মরে গাই, ৬০। রাধে যায় রে স্নান করিতে, কানাই লাগল পাছ, ৬৬। উনুনে পিঠে ফোলে, কাণ্টায় শিয়াল ফোলে, ৬৮। পিথিম্ পূজি তিন কোণ, রাজ্যপূজি সম্‌কোণ, ৭০। আট পূজি আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর, ৭০। একহাত ঘাইট খিলা, আর হাত তৈল, ৭১। হুঁকা করে টোড়ত্-টাড়াত্, ছিলিমের পুকটিত্ ছাই, ৭৮। দেওয়ায় করে মেঘমেঘালি, তলত্ পুবাল বাও, ৭৯। আত বর‍্যা সন্দেশ দিমু, পেট্টী বর‍্যা খাইয়ো, ১০৭। সগারে খলৈ নড়ে চড়ে, হামার খলৈ উথুলি পড়ে, ১০৯। সোনার ডাবা নাইরকলর পানি, ১১৫। কাউয়ায় আনলেক খ্যাড়-খড়ি, বগুলায় আন্দিল্ ভাত, ১৮৬। মামা আসিল্ ভাসিয়া, ভাত খায় ঠাসিয়া, ২০০। ননদ মলো ভালো হলো, শাউড়ী মলো কোণে, ৩১৫। চালে আছে চাল কুমড়া, শিকায় আছে ঘি, ৩২৮।

আমড় গাছে টিকটিকিটি, মরিচ গাছে ছাই, ৩৩৫। আমার ভাতার ভেল্কি জানে, আকুল করে কলকে টানে, ৩৩৫। এক খোরা খুদ সিদ্ধ, লঙ্কা গোটা দশ, ৩৩৭। যতগুলি কল ধরে, ততগুলিই কানা, ৩৫৭। কেউ পেলে মাছের মুড়ো, কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো, ৩৬৯। বিক্রক এসে লুটে নিল, গাছে নাইকো পাতা, ৩৭১। ভুলোল হলো সরকার, গুরুর হলো দত্ত ৩৭৩। গোড় পাড়ার নন্দকিশোর, দেবগ্রামের পাঁচু, ৩৭৬। কার হাঁড়ীতে ক্যান খেয়েছিস্, কে ভেঙেছে ঠ্যাং, ৪০০। গোদে বাদিয়া, ঢেকে থামা, ৪০৩। লংলস্ত কুলাউড়া, ইটস্ত ননজোড়া, ৪০৪। মাছো চিনে মাদ্রেঙ্গা, পক্ষী চিনে ডাল, ৪২৬। ছুরা গেইল্ পালেয়া, বাইগন গেইল্ শুকিয়া, ৪৩৩। মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পক্ষীর মধ্যে কাউয়া, ৪৬১। পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান-কাপাসে ঘর আলা, ৪৯৯। এক কড়ার খুঁটী মাছ, দুই কড়ার ঘি, ৫০৮। আমরা আছি পোলাপান, গাজি আছে নিখাপান, ৫১৫।

ওপরে Antithesis-এর যে সব দৃষ্টান্ত দিলাম, তার মধ্যে অন্ততঃ চার ধরণের Antithesis আছে। ক. খাঁটি বা বিশুদ্ধ Antithesis, যাতে কোনোরকম মিলের বন্ধন নেই, কেবল সমান ওজনের দুটি বাক্যাংশ পরস্পরের সঙ্গে সাম্য রচনা করে বিদ্যমান (যেমন : আমড় গাছে টিকটিকিটি, মরিচ গাছে ছাই, ৩৩৫)। খ. সহচর-অনুচর শব্দের অস্তিত্ব-সহ Antithesis (যেমন : পঞ্চকোটী ঝি-পুতের তের কোটি ছাও, ৬২)। গ. অবিকৃত রূপে একই শব্দের দ্বিরুক্তি-সহ Antithesis (যেমন : পিথিম্ পূজি তিন কোণ, রাজ্য পূজি সমকোণ, ১০ ; এখানে 'পূজি' শব্দের দ্বিরুক্তি হয়েছে)। ঘ. অন্ত্যমিলের বন্ধন-সহ Antithesis (যেমন : মামা আসিল্ ভাসিয়া, ভাত খায় ঠাসিয়া, ২০০)। গঠনের দিক থেকে চার রকমের Antithesis হলেও, সব রকমেরই মূল কথা এক : একটি প্রতিসাম্য রচনা করা এবং নিছক শব্দগত দিক অপেক্ষা অর্থগত বন্ধনকে অনুসরণ করা।

ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ার বিভিন্ন কালকে অবলম্বন করে Antithesis রচনা করা বাঙলা ছড়ার এক সাধারণ ব্যাপার। কয়েকটি এই :

দোলায় আসি, দোলায় যাই, ১ [আসা-যাওয়া প্রতিচর শব্দও বটে]। পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে, ৬। দাওদা বুড়ী দাদ লে, খোওদা বুড়ী খোস লে, ২৪ ['দাদ-খোস' অবশ্য অনুচর শব্দ, সে হিসেবেও এই

দৃষ্টান্তকে বিচার করা যায়]। মারতক পক্ষ, শুকোক বিল, ২৪। জলুক বাত্তি, পুড়ুক ত্যাল, ৫১। চরুক বগা, পিউক পানি, ৯০। আসল গোরখুনাথ, বসল পাটে, ৯০। বাজুক ঝুমুর, বাজুক তাল, ৯৮। এক আম দে না, দু আম লে না, ১১৭। আনিলাম পানী, জুড়িলাম বাণ, ১২৯। মগুল গেইছে হাট, করিল্ বারোবাট, ১৮৬। লেগুক ধান থাকুক নাড়া, ২৩৬। বাপঘর যাবো, বাপঘর গেলে কাপড় পাবো, ২৪৭। জলুক পদ্দীপ, উঠুক ধুন্দা, ২৮৯। সকলার দিলি আশেপাশে, আমার দিলি বনবাসে, ৩৫৩। আর শুনেছ দুঃখের কথা, আর শুনেছ সৈ ৪১৮। কাঁহো নিলে সূতা-বশ্‌নী, কাঁহো নিলে চ্যাবা, ৩৩১। বৈশাখে কাঁকুড় খাবি, খাবি পাকা আম, ৪৫৩। সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়, সাত বৌ যায় সাত দোলায়, ৪৯২। চ'খান কাপড় পেলি, ছ' বউকে দিলি, ৫১৮।

ক্রিয়াপদ-ঘটিত এইসব Antithesis-এর মধ্যেও নানার কমফের আছে : ক. সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের সহযোগে ক্রিয়াপদ মিলিত হয়ে Antithesis (যেমন : দোলায় আসি, দোলায় যাই, ১)। খ. বিভিন্ন ধরণের অনুজ্ঞা-বাচক Antithesis (যেমন . চরুক বগা, পিউক পানি, ৯০)। গ. ভবিষ্যৎ, সামান্য অতীত, প্রভৃতি বিভিন্ন কালবাচক ক্রিয়াপদ। ঘ. অবিকৃত ভাবে একই ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি (যেমন : আর শুনেছ দুঃখের কথা, আর শুনছে সৈ, ৪১৮)। ঙ স-মিল ক্রিয়াপদ (যেমন · ভাসবে—খেলবে ; আনিলাম—জুড়িলাম , পেলি—দিলি)।

ছড়ায় প্রতিসাম্য রচনার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের আর একটি ভূমিকা আছে। ওপরের উদাহরণগুলিতে ক্রিয়াপদের আবৃত্তি ঘটেছে দু'বার। কখনো কখনো এই আবৃত্তি তিন বার ঘটে,—তারই ফলে একটি বৃত্তের রূপাভাস এসে পড়ে। তিন বারের পুনরাবৃত্তির মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য আছে। কিছু দৃষ্টান্ত এই :

নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন, ২। বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে, ৬। গঙ্গাযমুনা যুড়ি হয়ে, সাত ভেয়ের বোন হয়ে, সাবিত্রী সমান হয়ে, ২১। গোপ কাঁদে, গোপিনী কাঁদে, কাঁদে তরুলতা, ৪০। তোর ভাঙব হাঁড়ী, ভাঙব কুঁড়ী, ভাঙব দুধের হোলা, ৪১। হালা ধরি, মালা ধরি, তুলে ধরি ছাতি, ৭০। ঘাস খায় পানি খায়, আইল-বগল ঘুরি বেড়ায়, ৮৮। ধড়েয়া বান্দি, নেন্দুর বান্দি, বান্দি আজি নেকেনাই, ১০৫। পিঠা দিমো, মিঠা দিমো, দিমো দুধের ক্ষীর, ১০৬। আম পাকে, জাম পাকে, হাতে হাতে

পানিয়াল পাকে, ১২০। চাল কাটি চালন কাটি, কাটি দুশমনের বিস্তা, ১২৭। নদী সে বাঁধলাম, নালা সে বাঁধলাম, বাঁধলাম চৌ-দুয়ারা, ১৩৪। কাঁসা লাড়ি, কাঁসা ঝাড়ি, কাঁসা পড়ে করিলাম সার, ১৩৪। নজর-বিজর ছেড়ে যা, কুট-কপোত ভাসিয়ে যা, চালান-কুজান খসিয়ে যা, ১৩৫। পিঠা দিল, পানি দিল, বসতে দিল আসন, ১৩৫। আম খাব, জাম খাব, সাঁতার দেব জলে, ১৮১। এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, আরো কান্দে সুয়া, ১৮৪। গাছের পাড়ি, তলায় কুড়ুই, ফুঁদে উড়ুই কাদা, ২৯৪। কে দেখেছে, কে দেখেছে, মামা দেখেছে, ৩৩১। দেখলি ভাতার তুললে না, তোর ঘর করব না, দাঁড়িয়ে সিঁদুর পরব না, ৩৩৫। থাকত ভাল, ভাঙত হাঁড়ি, যেত পাড়াপাড়া, ৩৩৭। সুজন হইতা, সুবুদ্ধি যোগাইতা সুপথে চালাইতা মোকে, ৩৪৬। কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাহার খুড়ি, ৩৭১। কর্তা যান দেবহস্তীতে, গিন্নি যান রত্ন-সিংহাসনে, ঠাকুর-ঠাকরুণ যান দোলনে, ৪৯২। চরকা দিলাম, চরকি দিলাম, নাটাই দিলাম দানে, ৫০৬। আকাশ বন্ধ, পাতাল বন্ধ, ছত্রিশ কোটি দেবতা বন্ধ, ৫২১।

ওপরের এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে এই ক'রকমের আবৃত্তি দেখা যায়: ক. অবিকৃতভাবে একই শব্দের তিন বার আবৃত্তি (যেমন: নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন)। খ. তিন বারের আবৃত্তির মধ্যে অন্ততঃ দুবার সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ থাকে (যেমন: 'আশ-পাশ'; 'বট-পাকুড়')। গ. তিন বারের আবৃত্তি তিনটি বাক্যাংশ বা পর্বে বিভক্ত, এই তিন পর্বের মধ্যে অনেক সময় প্রথম দুটি সম-মাত্রিক ও সম-পার্বিক হয় বটে, কিন্তু তৃতীয়টি হয় অতি-পার্বিক এবং তার মিলও ভিন্ন হতে পারে বা হয়ে থাকে (যেমন: কাঁসা লাড়ি, কাঁসা ঝাড়ি, কাঁসা পড়ে কবিলাম সাব, ১৩৪। অর্থাৎ প্রথম দুই পর্ব সহচর শব্দের বাঁধনে সমিল ও সম-মাত্রিক, কিন্তু তৃতীয় পর্বে সহচর শব্দেব অনুপস্থিতির দরুণ তা অমিল এবং অতি-পর্বে পরিণত)। ঘ. অবিকৃতভাবে একই ক্রিয়াপদের তিনবার আম্রেড়নেব মধ্যে প্রথম দু'বার বাক্যের মধ্যে একই স্থানে একই ভঙ্গিতে থাকে, কিন্তু তৃতীয় বাবে তা স্থান পবিবর্তন করে পর্ব বা বাক্যাংশের প্রারম্ভে চলে আসে (যেমন: চাল কাটি, চালন কাটি, কাটি দুশমনের বিস্তা, ১২৭। কখনো কেবল স্থান পরিবর্তনই ঘটে, প্রারম্ভে নাও বসতে পারে)। ঙ. কচিৎ এই তিনটি পর্বই পরস্পরের সঙ্গে অমিল-যুক্ত, শেষেরটি দীর্ঘায়ত, কেবল ক্রিয়ার গঠনে মিলযুক্ত (যেমন: থাকত ভাল, ভাঙত হাঁড়ি, যেত পাড়াপাড়া, ৩৩৭)।

এই তিন বারের আবর্তন ক্রিয়াপদ ছাড়াও দেখা যায়। দৃষ্টান্ত এই : এক ঠগ, দুই ঠগ, তিন ঠগের মেলা, ৪২। এক ধান, দুই ধান, মধ্যে মধ্যে হলদে ধান, ৪৯। কংস কংস কংস পড়ি, ১৩৪। অকবুল, মকবুল, কড়িফুল ফোটে, ২৬৩। রামতুলসী, রামতুলসী, রামতুলসীর পাতা, ৩২৪। পাখির মইধ্যে পোড়া সারো, তিরির মইধ্যে ভ্যালকালো, পুরুষো মইধ্যে অসিকো ভমরা, ৪২৬। সংখ্যা-বাচক শব্দের এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি এগুলোর মধ্যে লক্ষ-নীয়। তিন পর্বের মধ্যে তৃতীয়টি আকারে দীর্ঘ। তিন পর্বের এই রকম পুনরাবৃত্তি আরো নানা বিচিত্র উপায়ে ঘটে থাকে। যেমন, প্রথম দুই পর্বে ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে : ন্যাংটা ঘুতুম্, বিলাই কুতুম্, সাত ছাওয়ালের মা, ১৫৬। প্রথম দুই পর্বে সহচর শব্দ, শেষ পর্ব অমিলযুক্ত ও দীর্ঘ : ভাত কড়্‌কড়্, ব্যন্নন বাসী ('ভাত ব্যঞ্জন' সহচর শব্দ), দুধ বিড়ালে খায়, ৪৪৯। প্রথম দুই পর্বে মিল, তারপর অমিল : দুফরি বান্দন, ছাওয়ার কান্দন, ছাগলটা আরও মেল্-মেলায়, ৪৪২।

প্রতিসাম্য রচনার ক্ষেত্রে সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দকে সাধারণতঃ বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন করে, বাক্যের দুই অর্ধের দুই দূরবর্তী অংশে বিন্যস্ত করা হয়, পূর্বে প্রদত্ত বহু উদাহরণেই তা আছে। বিপরীতার্থক শব্দকেও পাশা-পাশি সাজিয়ে বৈপরীত্যের মধ্যে সমতাকে অন্বেষণ করে লোকমানস। সমতার আকর্ষণ এতই বেশি যে সমভাবার্থক শব্দকেও বাক্যের মধ্যে পর-পর স্থান দেওয়া হয়। যেমন : হরির চরণ, হরির পা, ৪। ঘরণী-গৃহিণী বউ চায়, ৪। বুড়ী তুই ডাকিস কেন, করিস কলরব, ৪১। চলে যেতে ঘুঙুর বাজে, নূপুর বাজে পায়ে, ১৩৩।

তেমনি নঞর্থক 'না' শব্দের ব্যবহার প্রথমে করে, পরে সমধর্মী ও সাদৃশ্য-মূলক বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়। যেমন : ধান না দিয়া দিলেন কড়ি, ৫৮। মেড়ার চামড়া নয় রে, ভাঙ্‌দিল বাড়ী, ৬২ পা. টী। শিবের কানের সোনা না লো নরীয়ার পিতল, ৭০। আমরা জয় দেব না লো যোকাড় দেব, ৭০। রাইলের ঘরের পুত না লো, বেড়ার মাটি, ৭০। সত বৌল পানি না রে' এক বৌল সোনা, ৭২। এক বৌল সোনা না রে, লাড়িয়ার পিত্তল, ৭২

সংখ্যা-বাচক শব্দের নানা ধরণের আবৃত্তি দেখা যায়। পূর্বের উদাহরণগুলিতে তা দেখা যাবে, আরো কিছু এই : বারো ঘরে তের বাতি, ২১। দশ টাকার

গোরু জোলা বিশ টাকা কয়, ৬৫। বার শ' বলদ তের শ গাই, ৯০। আগলি বন্ধুম বারকোণা, পিছনে বাঁধলাম তের কোণা, ১৩৪। এক শিয়ালী আন্দেবাড়ে দুই শিয়ালী খায়, ১৮৪। একটা গুয়া, দুইটা পান, খায়া গেইল্ সনার চান, ২২২। একটা ভাতার, দুইটা মাইয়া, ঝগড়া করি মরে, ৩২০। Two men ধাপুস্ ধুপুস্, one man সেঁকে দেয়, ৪৮৮।

একাধিক শব্দ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি : না দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ, না দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ, ৪ পা. টী। ছিকা লড়ে ছিকা লড়ে, ৪৭। কুয়াভাঙ্গি কুয়াভাঙ্গি এ্যাচলার আগে, ৭০। দেউ দুয়ার দেউ দুয়ার, পূঞ্জি উঠি স্বর্গ দুয়ার, ৭০। হাতী বান্ধুম হাতী থির, গরু বান্ধুম গরু থির, ৯০। না কান্দিস না কান্দিস দাদা গামছা মুখত্ দিয়া, ১৯৭। ভেন্ধীর বেটী, ভেন্ধীর বেটী, আর একনা দেও, ৪৩২। নাই বাপু, নাই বাপু নিষ্টি-কোটে খাও, ৪৩২ ॥[১]

…৪…

ছড়াব Primary Motif বলতে আমরা যে দুটি দিককে (যথা : ক. বিষয়-প্রসঙ্গ-আবহ-অনুষঙ্গ-বিষয়ক সাধারণ শব্দাবলী, খ. কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য) বুঝিয়েছি, ওপরে তার আলোচনা এতক্ষণ করা হল। এইবার ছড়ার Secondary Motif সম্পর্কে আলোচনা করছি।

Primary Motif মূলতঃ একটি পঙ্‌ক্তিকেই আশ্রয়-অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, Secondary Motif সেখানে আর একটু বিস্তৃত হয়ে যায়,—একটি পঙ্‌ক্তির পরিসবকে পেবিয়ে তা অন্ততঃ পববর্তী পঙ্‌ক্তিতে তো বটেই, আরো বিস্তৃতি লাভ কবতে পারে। এই প্রসারণের কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বয়েছে : ক. এক পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন, অপর পঙ্‌ক্তিতে তার উত্তর (অবশ্য কখনো-কখনো একই পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্নোত্তব দেখা যেতে পাবে) ; খ. এক পঙ্‌ক্তি 'কারণ' অপর পঙ্‌ক্তি তার 'কার্য' বা প্রতিফল হতে পারে, দুই পঙ্‌ক্তিতে এইভাবে কার্য-কারণের বন্ধন ; গ. ভাব ও প্রতিবেশগত পারম্পর্য, ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ, একই ভঙ্গির একাধিকবার পুনরাবর্তন ; ঘ.

---

১ প্রথম অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদের কিছু বক্তব্যের এইখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন এই জন্যেই অনুভব করেছি যে, এর ফলে ছড়ার গঠন-সম্পর্কে আমাদের ধারণাটি অখণ্ডভাবে ব্যক্ত হবে।

অবিকৃত বা ঈষৎ বিকৃতরূপে একই শব্দের পরপর একাধিক পঙ্‌ক্তিতে পুনরাবর্তিত হওয়া : ঙ. পাশাপাশি বা পর পর পর্বের বিন্যাসের পুনরাবর্তন।

Primary Motif মূলত: দু'বারের আবর্তনকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন বারের আবর্তনকে আমরা Secondary Motif-এর অন্তর্গত করেছি। কারণ, দু'বারের আবর্তন যেন সরলরেখা ধর্মী, নিরন্তরতার অবকাশ তাতে নেই : কিন্তু তিন বারের আবর্তনের মধ্যে একটি নিরন্তরতা আছে, তা যেন বৃত্তের বা চাকার মতো, গড়িয়ে-গড়িয়ে একই কথা শুধু তিন বার কেন, তার চেয়েও বেশিবার যেন আবর্তিত হতে পারে। এখন Secondary Motif-এর বিভিন্ন দিকের উদাহরণ দিই একে-একে।

ক. এক পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন, অপর পঙ্‌ক্তিতে তার উত্তর : পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুপুর বেলা ? ১ : পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি যেন এই প্রশ্নেরই উত্তর। স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, গৌরি। ওরা কি ব্রত করে ? ২ : পরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে তারই উত্তর। সে কি বর চায় ? ৫ : অতঃপর বরের তালিকা প্রদান। ইন্দ্র আছেন কোন্ পুরী ! ৬ : পরে এর উত্তর। গঙ্গা এলেন 'নাইয়রে' ছেলে নিবে কে ? ৬ · পরের অংশে তার উত্তর। ওগো ভাঁজো ! তুমি কিসের গরব কর ? ১১ : পরের পঙ্‌ক্তিতে তার কারণ প্রদর্শন। এই রকম. কেন রে নাতি : এত রাতি ? ২১। সিংহাসনে বসে বাম কোন্ কার্য করে ? ৩৩। আমার রাই নেয়ে এলো পরতে দেব কি ? ১৩৬ [এই ছড়ার এর পরবর্তী অংশের সবটাই প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। এক পঙ্‌ক্তি প্রশ্ন, অপর পঙ্‌ক্তি তার উত্তর]। ভিক্ষা মাগি কার নামে, ৫১। ছেলের নাম কি ··, বুড়ার নাম কি, ৫৩। কড়কড়া ভাতে কি কাম করে, ৫৬। লক্ষীন্দর, লক্ষীন্দর কি কাজ করিলা, ৬২, পা. টী। চ'খে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে ?···কি কি ফুলে মুখ পাকালি ?···কপিলেশ্বরী গাই কি বা ঘাস খায়···কি দিয়ে পালবো আমরা রাইলের ঘরের পুত, ৭০। সূর্য উঠে কোনখান দিয়া, ৭০। এ ঘরে কে জাগে, ৭২। পাইলাম, পাইলাম কুটুব কে ? ৭৩ [এই ছড়ার পরবর্তী অংশের সবটাই এক পঙ্‌ক্তি প্রশ্ন, অপর পঙ্‌ক্তি তার উত্তর]। দূর্বা সরস্বতী কি বর মাগে, আইবর ভাইবর বিয়ার বর মাগে, ৭৪। আমার ধন কে মারেছে, কে দিয়েছে গালি, ১৫০। কত দিয়ে মা বর যাবে ? ২১২। কাঁয় ফেলাবে গু ? ২৪২। প্রশ্নোত্তরমূলক সব ক'টি ছড়া, যেমন, ২৬৬,

২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭ প্রভৃতি। খট্ট খট্ট খড়ম পায়, কে যায়? ৩০৬। কে দেখেচে, কে দেখেচে?—মামা দেখেচে, ৩৩১। ৩৪৬-৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩ প্রভৃতি ছড়া। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়েও আলোচনা করেছি। ক্রমপ্রসারণের সূত্রটি এখানে ক্রিয়া-শীল; অর্থাৎ ছড়ার একটি অংশ রূপে প্রশ্নোত্তর, অতঃপর গোটা ছড়াই প্রশ্নোত্তরমূলক।

খ. এক পঙ্‌ক্তিতে 'কারণ,' পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে 'কার্য': 'কার্য-কারণ' বলতে ঠিক আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপারটিকে দেখছি না। এখানেই ছড়ার মধ্যে ভাব বা অর্থের গুরুত্বের দিক এসে পড়ে। কোনো বিষয়ের ক্রমান্বয়িক দুই স্তর, দুই দিক-অংশ-প্রসঙ্গ, কর্ম, ভাব, অনুষঙ্গ,—এক কথায় সংশ্লিষ্ট সকল দিকের মিশ্রণকে বোঝাচ্ছি। সাধারণ ক্ষেত্রে এটির প্রসার দু'পঙ্‌ক্তির বেশি নয়, বড়ো জোর এক স্তবক। যাই হোক, এর মধ্যেও লোকমানস সেই সঙ্গতি ও সাম্যই অন্বেষণ করে। উদাহরণ এই:

দশ পুত্তল পূজে যে, দশ ফল পায় সে, ৩। চাপড় যায় ভাইদা, ছেলে থাকুক বাঁইচা, ১০। ১১-সংখ্যক ছড়ার তৃতীয় অংশ। যদি ঘর গঙ্গায় যায়—বাঁদীর পাতে বসে খায়, ১৪। ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ (খ-অংশ) প্রভৃতি সংখ্যক ছড়া। ২১-সংখ্যক ছড়ার ঘ-অংশে 'বেণা,' 'সোণা,' 'শর', 'ময়না,' 'হাতা,' 'বেড়ী', 'পাখী' ইত্যাদি একাধিকবার উচ্চারণ করে তার পরবর্তী যে সব পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করা হয়েছে, তা যেন প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলির প্রতিফল। ২১-সংখ্যক ছড়ার চ-অংশ। ২২, ২৩-সংখ্যক ছড়া। চাল ক'টা দুই রাঁদ্ গো সখি, ভাত ক'টা দুই খাই, ২৪। এই ছড়ার ঘ-অংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। যদি বা ছাড়িবে তুমি, পরাণে মরিব আমি, ৩০। নব কোট নড়ে চড়ে, সাত সতীনের মুখটি পুড়ে, ৩৩। ছিকা নড়ে, ছিকা চড়ে, ঝম্‌ঝমাইয়া টাকা পড়ে, ৪৭। যে না বলে হরি হরি, তার গলায় যমের দড়ি, ৫০। দ্যাও ভিখ্ ন্যাও বর, ধানে চাউলে বরুক ঘর, ৫৫। ৫৮-সংখ্যক ছড়ার খ-অংশে এক-একটি বাঘের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা। সোনার নড়ি ··মোচা দুই, ৫৯। এই ছড়ার শেষাংশে প্রতি বাঘের বৈশিষ্ট্যানুসারে বর্ণনা। সোনা বাঘের চেলা দেখে···দিবে যমজ্বালা, ৬০। ৬৮-সংখ্যক ছড়া। ৭০-সংখ্যক ছড়ার 'ছ' ও 'জ' অংশ। ৭১-সংখ্যক ছড়ার ৪-এর 'ঙ' অংশ। পরথম পুতে করে কাম পরথম বৌ ভোগে রাজ, ৭২। দোলায় আইলাম দোলায় গেলাম, মায় বাড়ীত গিয়া ঘি ভাত খাইলাম, ৭২। কলা পুতে না কেটো পাত, তাতেই

হবে কাপড় আর ভাত, ৯৪। ৯৯-সংখ্যক ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। আশ্বিন যায়, কাত্তিক আসে, মা লক্ষ্মী গড়্ভে বসে, ১০৪। ১০৯, ১১১-সংখ্যক ছড়া। মউ আস্যো খাষাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া, ১২৩। ঘাট নাই, পালঙ নাই, খুকুর চক্ষু পেতে ব'সো, ১৪০। শোলা ডুবে পাথর ভাসে, কাঁদুনে ছেলে ফিক্ করে হাসে, ১৪৬। যে আমার খোকাকে খোঁড়ে, যেন তার মুখখানা পোড়ে ১৪৯। হামার মাই নাচন জানে, হামরা পায়ো গুয়া, ১৬৮। হাতী মাইরে নেখা, বাউ যায়া পইল্ ছুতি, একখান পালে ধুতি, ১৭২। মামাদের শাওড়া গাছে মুন, আমাদের খুকুর চোখে ঘুম, ১৭৭। ১৯৪-সংখ্যক ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। ছ'খান কাপড় পেলি, ছ' বউকে দিলি, ২০৫। লেগুক ধান, থাকুক নাড়া, তবু কাইট্‌ব বত্রিশ আড়া ধান, ২৩৬। বাপে দিলেক তাড়ি,' যা ভাতারের বাড়ী, ২৫১। মোগল-কাটা নড়ে চড়ে, আইকুমারী ডাক পাড়ে, ২৬০। ২৬৪, ২৬৬-২৭৫-সংখ্যক ছড়া। মারবো ভাঙের বাড়ি, পাঠাবো যমের বাড়ী, ২৯১। ২৯৮-সংখ্যক ছড়া। বাঙ্গাল্যার উতরদি ছখিন্নিছার ঘর, ছখিন্নিছা কাঁদেন্দে ঝর্‌-ঝর্‌-ঝর্‌, ৩১৭। ৩২১, ৩২২, ৩২৪ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ৩২৬-সংখ্যক ছড়া। এত যদি জানো ঠাকরুণ এত যদি জানো, ঢেমন-ঢোসড়ের জাত ঘরকে কেন আনো, ৩২৭। ভাশুরকে দেখলে হাসি পায়, ভাশুর আবার ভাতার হতে চায়, ৩৩২। ৩৩৫-সংখ্যাকে ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। ৩৩৭-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশ। ৩৩৮-সংখ্যক ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। ৩৪০, ৩৪১-সংখ্যক ছড়া। যেমন ঢেঁকি, তেমনি পোয়া, মুযুলিটা তেল পারা, ৩৪৯। আন সোয়ামী পাত কাটিয়া, দেছি হামবা ভাত বাড়িয়া, ৩৫১। ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪-সংখ্যক ছড়া। তোর হইল্ বেটা মোর হইল নাতি—কলাত্ করিয়া থাকি, ৩৫৬। ধান ভুকাইতে আউলিল্ খঁপা—খঁপা বান্ধিয়া দাও, ৩৫৬। ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৮ ৩৯৯, ৪০০, ৪০৯-সংখ্যক ছড়া। ৪২১ ও ৪২২-সংখ্যক ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। ৪৪১-সংখ্যক প্রথম দুই ও শেষ দুই পঙ্‌ক্তি। ৪৪৯-সংখ্যক ছড়া 'ক' ও 'খ'-অংশ। ৪৫৩-৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬৬, ৪৭০ ('ক' ও 'খ'-অংশ), ৪৭১, (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ৪৭৪, ৪৭৭ ('খ' অংশ), ৪৮১, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৩, ('খ' ও 'গ' অংশ), ৪৯৭ ('ক' অংশ), ৪৯৮, ৪৯৯ (তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি), ৫০০ প্রভৃতি ছড়া। ৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ৫২২, ৫২৩ প্রভৃতি ছড়া।

এই উদাহরণগুলির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য দেখা যাবে। সাধারণভাবে এই নিয়মগুলি কার্যকরী হয়ে থাকে : ক. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পঙ্‌ক্তি কোনো বিশেষ সঙ্গতির সূত্রে এমন অচ্ছেদ্যভাবেই বাঁধা যে, কিছুতেই একটির থেকে অপরটিকে পৃথক করে নেয়া যায় না। খ. কোন ভাব, কথা, কাজ-এর ধারাবাহিকতা, ক্রমান্বয়িকতা ও পারম্পর্য রক্ষা (যেমন: আন সোয়ামী পাত কাটিয়া দেছি হামরা ভাত বাড়িয়া, ৩৫১। ধান ভুকাইতে আউলিল্‌ খপা—খপা বান্ধিয়া দাও, ৩৫৬)। গ. স্প:, বাস্তবানুগ, কার্য-কারণের বন্ধন (যেমন: যে আমার খোকাকে খোঁড়ে, যেন তার মুখখানা পোড়ে, ১৪৯)। ঘ. এরই বিপরীত দিক, অবাস্তব, অস্বাভাবিক, রহস্যময়, যাদুধর্মী কার্য-কারণের দিক (যেমন: খাট নাই, পালঙ নাই, খুকুর চক্ষু পেতে বসো, ১৪০। মামাদের শাওড়া গাছে ঘুন, আমাদের খুকুর চোখে ঘুম ১৭৭)। ঙ. Correlatives অর্থাৎ সংযোজক পদের ব্যবহারের ফলে এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির অচ্ছেদ্যতা (যেমন: যে ··সে, যেমন ··তেমন, যদি · তবে প্রভৃতি)। চ: ক্রমান্বয়িক ও ধারাবাহিক প্রশ্নের উত্তর, এই ধরণের কোনো বাক্যের প্রতিফল প্রতিক্রিয়া। ছ. অন্যান্য বিচিত্র দিক। কিন্তু একটি বিশেষত্ব সর্বত্রই দেখা যায় : দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে একটি মিল বা সঙ্গতির অবস্থান, তা থাকতেই হবে।

গ. ভাব ও প্রতিবেশগত পারম্পর্য, ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ, একই ভঙ্গি ও রীতির পুনরাবর্তন. ছড়ার রূপ ও কাঠামোতে এই রীতি ও ভঙ্গিই সাম্য সৃষ্টির প্রধান ভূমিকা নেয়। এক হিসেবে দেখতে গেলে এটি অব্যবহিত পূর্ববর্তী রীতিরই পরবর্তী ও প্রসারিত দিক। দুই পঙ্‌ক্তি জুড়ে প্রকাশিত হয়ে খুশি মতো এই রীতি প্রসারিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত এই ·

৪-সংখ্যক ছড়ার একই ভঙ্গিতে পরপর চারটি বাক্যে চারবার 'চায়'। ৫-সংখ্যক ছড়ায় তেমনি পরপর আটবার 'চায়', দুবার 'মত্ত', তিনবার 'ভরা'। ৬-সংখ্যক ছড়ার তৃতীয় অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি এক ; দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'আটফল' ও 'আটফুল' পর্যায়ক্রমে এক ভঙ্গিতে ; এই ছড়ারই চতুর্থ অংশের শেষ চার পঙ্‌ক্তির মধ্যেও এই ভঙ্গি দেখা যায়। 'আটফল' ও 'আটফুল' যেমন সমধর্মী, তেমনি 'চাঁদের কোণা' ও 'হীরার দানা'। 'হয়ে' শব্দের তিনবার আবর্তন, ২১খ। এই ছড়ার 'ছ'-অংশ। 'দিলাম কৌটা' ··

'পড়ল কাঁটা' : যমুনা যেন···আমি দিই ২২। একই ভঙ্গি এবং সংলাপে ছুতোর বাড়ী, গয়লার বাড়ী ও ময়রার বাড়ী যাওয়া, ২৪গ। খেলুক খেলুক··· মরুক মরুক, ৩৩। ৩৬-সংখ্যক ছড়ায় রাইয়ের স্নান করা থেকে শুতে যাবার ধারাবাহিক বর্ণনা। 'যে দেবে' এই অংশের তিনবার আবৃত্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিফলের পর্যায়ধর্মী বিবরণ, ৩৯। একটি অন্তর পঙ্‌ক্তিতে তিন বার, 'যার জননী', এবং তিন বার 'তার বেটা'র পর্যায়ধর্মী বিবরণ, ৪৩। ক্রমান্বয়ে তিনবার 'থাক' এবং চারবার 'যেও না' সমতা এনেছে, ৪৫। পর-পর তিন পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে 'যাই', ৫২। ছেলের নাম···বুড়ার নাম,···বুড়ার নাম ৫৩। একই ভঙ্গিতে বাঘদের বর্ণনা, ৫৮খ,৫৯। এক পঙ্‌ক্তি অন্তর 'সোনারায়ের চেলা দেখে যে করিয়ে হেলা' এবং তার প্রতিফল বর্ণনা, ৬০ক। দুইবার 'কাঁদে রে গোয়ালার নারী', ৬০গ। চার বার 'যে দেবে', চার বার 'তার হবে', ৬১। বাঁশিটি থুইয়া কানাই ··বাঁশিটি হারাইয়া কানাই, ৬৬। মহিমবাবুর মায় কান্দে ··,মহিমবাবুর বুনি কান্দে, ··,মহিমবাবুর বউ কান্দে, ·· বারবারি দরজায় কান্দে, ৬৭ [পর-পর পরিবার ও বাড়ীর এক-একজন ও দিকের উল্লেখ ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি ও সাম্য]। স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে, ৬৯ [তিনবার এই পঙ্‌ক্তির অনুবর্তন ও তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা]। তিনবার এই পঙ্‌ক্তির সমধর্মী প্রতিফল-সহ পুনরাবর্তন : হাসিস না লো মালিনী তুই আমার সই [দুবার], হাসিস না লো বামুন মেয়ে তুই আমার সই, ৭০গ। প্রথমে মাছ না পাওয়া, পরে পাওয়া, একই ভাষা-ভঙ্গিতে তার বর্ণনা পর্যায়ক্রমে প্রদান ; তারপর সেই পর্যায়ক্রমেই মাছ নেওয়া, কাটা, ধোওয়া, রাঁধার বর্ণনা, ৭০ঘ। 'সাজ সাজ রে রাইল মাথায় মুকুট দিয়া', 'সাজ সাজ রে রাইল পায়ে নূপুর দিয়া', ৭০চ [মুকুট ও নূপুর পা ও মাথার অলঙ্করণ, এদের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ ; প্রায় অভিন্ন ভাষায়]। আমরা পূজি···, তিনবার এই পঙ্‌ক্তির উল্লেখ, 'ঘাট', 'পথ' ও 'মান্দার' এখানে পর্যায় রচনা করেছে, ৭০ছ। একই ভঙ্গি ৭০জ-অংশেও দেখা যায়, ৭১ঘ। সাতকুয়া পানি মোর···, এক কুয়া পানি মোর···, ৭১/৫। শেষ তিন পঙ্‌ক্তি, ৭১/৬। সোনার কুণ্ডলে···, সোনার কুণ্ডলে···[ঘি ও মধু পর্যায় রচনা করেছে], ৭৩খ। চাঁদ পূজিয়া ঘরে যাই, সুরুজ পূজিয়া ঘি ভাত খাই, ৭৪গ। তিনবার 'সোনার কুণ্ডলে ঢালে···', ৭৫ছ। চাল শুচ্চেং দাও গো, না হয় খোস শুচ্চেং নাও গো, ৭৭। ৮০খ। ৮২ক। চারবার, পর্যায়ক্রমে 'এক বানের দুধ···', ৯০খ। ক্রমানুক্রমে পাটের বর্ণনা,

৯০/৪। আগা ফালাইল নিল মালী,…গোড়া ফালাইল নিল মালী, ৯০/৫ [এখানে 'আগা-গোড়া' এই প্রতিচয় শব্দের বন্ধন একই ভাষা-ভঙ্গিতে রচিত দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে সমতা সৃষ্টি করেছে]। অবিকৃতভাবে একই পঙ্‌ক্তির দুবার আবর্তন, ৯০/৬। মাচা পাতেক ধান থয়া…করেক দান, একটি কর্মের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন, এও এক ধরণের সমতা, ৯১। আয়রে পানি…,যা রে পানি, ১০০। কচুর পাতায়…, কচুর পাতায়, ১০১। পাতি কাউয়া…, দাঁড় কাউয়া…, ১০৭। এই জাল পড়্ তুই…রাতের মতো পড়্, ১২৬। চারবার 'পুড়ে' শব্দের একই ভঙ্গিতে ব্যবহার, ১২৯। ১৩৮-সংখ্যক ছড়া। বসতে দেব…, খেতে দেব…, গেয়ে শোনাবো…, ১৫২। বাপ গেল…, মা গেল…, ১৬৫। মাও গেইছে…, বাপ গেইছে…। মাও আনিবে…, বাপ আনিবে…, ১৯০। আগো আসিল্ সাতে…, পিসাই আসিল্ রথে…, ১৯৩।…চড়াইছে,… ভিজিছে,…পড়িছে, ১৯৮।…আইসেছে,…আনেছে,…উঠেছে, ১৯৯। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি, ২১০। শেষ দুই পঙ্‌ক্তি, …২১১। দুইটা বিলাই…ভরেয়া খায়া, ২১৬। জামাইকে আন্‌ইব…বিটীকে আন্‌ইব…,আজ থাক রে…, কাইল যাবি রে…,২২৬।…মরেছে,…এনেছে,…বলেছে,…হয়েছে,…হয়েছে, ২৩৮। দু'বার 'দুই দিকে দুই…,' ২৭৭। একই ভঙ্গিতে রাজার উক্তি, ২৮২। সজ্জার এক-একটি স্তরকে নির্দেশ করতে ছ'বার 'চড়ায়ে দিল' এই উল্লেখ, ৩০৮। মা রাঁধে…, বুন রাঁধে…, আবাগীর বেটী রাঁধে…, ৩১১। পর-পর চার বার 'মুলো', ৩১১। কোটেন…রাঁধেন…, খান…, একটি কাজের পরম্পরা, প্রতিবারই শব্দের দ্বিরুক্তি, ৩১৩। এ বৎসর…,আব বৎসর…, ৩১৫। ভাইয়রে পাল্যাম্‌দে…,ভইনবে নিলদে…,৩১৭। ভইনর উতর্‌দি…, বাজাল্যার উতর্‌দি…, ৩১৭। তোর বাড়ীত্ শাগাই গেইলে…, হামার বাড়ীত্ শাগাই আসিলে… ৩১৮। বাপোক যুদি খবর দেওং…, দাদাক যুদি খবর দেওং…,মাওক যুদি খবর দেওং…, ৩১৮। চিকা কইল্লে…,মাঝিয়া কইল্লে…, ৩৫৪।…যাবা' চাওঁ,… দিয়া যাওঁ, ৩৫৫।…কড়ি,…দাড়ি,…ছাড়ি [প্রত্যেকটির পূর্বেই ব্যক্তি নাম ও তৎসহ ষষ্ঠী বিভক্তি], ৩৬৮। পাঁচবার 'তার নীচে', প্রত্যেক বারই তার ওপরে এক-এক জনের নাম, ৩৮৬। তিন দিনর দিন…,চার দিনর দিন…,৪২১। গুরু এলি…,শ্বশুর-শাশুড়ী এলে…,৪২৩। পিতা-মাতাকে অন্ন দিতে দিনে হয়…, বনিতে গহনা দিতে রাতে হয়…, ৪২৩। এক পাথে লেখা আছে…, এক পাথে লেখা আছে…, ৪২৬। 'মইধ্যে' তিন বার, ৪২৬। হাঁড়ি কোণে

মেঘ জমেছে …হাঁড়ি কোণে মেঘ জমেছে, ৪২৯। 'থাক্ রে দুরা' দু'বার, ৪৩৩। আপনপুত …,পরের পুত, ৪৩৮। এক সের নুন…, এক সের মরিচ …, এক সের তেল…, ৪৫০। 'গাব' ফল খাওয়া সম্পর্কে কাকের মনে দুই রূপ ক্রিয়া, ৪৭০। মাছ ধরা থেকে তা হজম করা পর্যন্ত স্তরানুক্রমিক বর্ণনা, ৪৭৬। শোলোক শিখিনু …,শোলোক ভুলিনু …, ৪৭৭খ। 'জন্মিয়ে না দেখি' তিনবার, ৪৯৫। 'তুঁষ-তুষ্‌লি গেল ভেসে' তিনবার [বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী এখানে স্তরপরম্পরা], ৫০১। তোমরা সাতো ভাই…,আমরা সাতো বুন…, ৫০৭। এবারকার মত যাও রে…, আরবার এসো রে…, ৫০৮খ। 'কোন্ ধূলেতে তুষ্ট …,তিনবার, উত্তরের অংশেও তার প্রভাব, ৫০১। প্রশ্ন ও উত্তর উভয় অংশের ভাষাতে অভিন্নতা ও পরম্পরা রক্ষা, ৫১১।

এই উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে কোনো প্রকারেই হোক না,—সঙ্গতি, সাম্য ও মিল রচনা করাই এদের উদ্দেশ্য। তার বিস্তার দুই পঙ্‌ক্তি থেকে শুরু করে যে কোনো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত। একই বাক্যকে প্রায় অভিন্ন বা ঈষৎ বিকৃত রূপে পুনরাবর্তিত করে, কোনো ভাব-কর্ম-বিষয়-প্রসঙ্গের পর্যায় ও স্তর অনুসরণ করে, একটি স্তরানুক্রম, পারম্পর্য ও ক্রমান্বয়িক ধারাকে আভাসিত করে এই প্রতিসাম্য গড়ে ওঠে।

ঘ. অবিকৃত বা ঈষৎ বিকৃত রূপে একই শব্দের একাধিক পঙ্‌ক্তিতে পুনরাবর্তিত হওয়া : দুই বা ততোধিক পঙ্‌ক্তিতে একই শব্দের পুনরাবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে : ক. প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দে পরিণত হয় কিংবা প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দ অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিরও প্রথম শব্দ হয়, খ. প্রথম পঙ্‌ক্তির যে কোনো স্থানের একটি শব্দ অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তির যে কোনো স্থানে ব্যবহৃত হয়, গ. প্রথম পঙ্‌ক্তির যে কোনো স্থানের একটি শব্দ অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিকে ডিঙিয়ে, তার পরবর্তী কোনো পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তি-নিচয়ে ব্যবহৃত হয়, ঘ. অন্যান্য বিচিত্র ও নিয়মবহির্ভূত রীতিতে পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তিসমূহে পুনরাবৃত্ত হয়। নীচে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলাম :

গঙ্গামায়ে …গঙ্গামায়ের; অষ্টকোল…অষ্টকোলে, অষ্টপুত…অষ্টপুতে, ৬/৪। কলমিভাঙ্গা—কলমিভাঙ্গা, ৯। বারো ঘরে …সেই ঘরে…ঘরটি ২১ক। তুলসী… তুলসী…তুলসীর চরণে; কিষ্ণকথা …কৃষ্ণের কথা, ২৪ঘ। ঘাস…ঘাস…ঘাসের গোড়; সাগরে—সাগর; মৎস্যের নগরে—মৎস্য অবতার, ৩৩। কালীদহের কূল—

কালীদহে গিয়ে ; কেশ—কেশ পানে, ৪০। ঠগের মেলা—ঠগের গুরু, ৪২। লক্ষীমায়ের—লক্ষীমায়ে : ধান—ধান ; সোনার নড়ি—সোনার নড়ি, ৪৬। টাকা · টাকা ; বাইজ্ঞা বাড়ী—বাইজ্ঞা বাড়ী ; ঘুঘুর···ঘুঘু, নও নও বাগা—নও নও বাসে, ৪৭। উত্তর পাড়া—উত্তর পাড়া : সোনার নড়ি—সোনা চেয়ে : দেখতে ভালা—দেখতে ভালা ৪৮। চাম্পাফুল—চাম্পা ; ধান—ধান, ৪৯। সাত বেটা—সাত ব্যাটা : বাতি···বাতি, ৫১। ধান—ধান ; নড়ি ধরি—নড়ি ধরি ; সোনার—সোনা : জগতমালা—জগতমালা ; লিলি—লিলি ; পান্তাভাত—পান্তাভাত ; খেড়্যাবাড়ী—খেড়খেড়াতে : বিরামপুর—বিরামপুর ; ঘোড়া—ঘোড়া ; শাল—শাল , বামনের—বামনের ; ছেলে—ছেলের ; বুড়ার—বুড়া, ৫৩। হরিণ ··হরিণ ; সোনার লাঙ্গল—সোনার লাঙ্গল ; জুড়ছে হাল—জুড়ছে হাল : আমোন ধানের—আমোন ধানের, বনবাসী—বনেতে ; নীলহাঁস—নীল হাঁস, ৫৭। বরই গাছটি · বরই গাছটি ··বরই ; শিবের কানের সোনা—শিবের কানের সোনা ; বর্তের ভিতর—বর্তের ভিতর, ৭০ক। সাতকুবা পানি—সাত কুয়া পানি ; বাইছালি থালায়—বাইছালি থালাইতে ; বর্মার · বর্মার ; কুরুয়ার ··কুরুয়া, ৭১/৫। সাত বৌল পানি—সাত বৌল পানি ; এক বৌল সোনা—এক বৌল সোনা , বাড়ীর ভিতর—বাড়ীর ভিতর, ৭২ক। এই রকম : ৭২ঘ, ৭৪ঘ, ৭৫ঙ, ৭৬, ৮৮, ৯০/৩, ৯৭, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৯৪, ২০০, ২০৪, ২০৬, ২২২, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৫৩, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৮, ২৬৭, ২৭০, ২৮৪ (পৃ. ১৭০ : কুথা তুপ্‌লি···পিপঁড়া গাটা), ৩৫৩, ৩৫৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৫১৮ প্রভৃতি ছড়া।

এই ধরণের পুনরাবৃত্তিকে বলা যায়‘Palilogy’। যাকে বলে‘Epanalepsis,’ তার সঙ্গেও এই পদ্ধতির আংশিক ও ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে। এই পুনরাবৃত্তির ফলে এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তি’র একটি communication স্থাপিত হয়।

শব্দগত সব পুনরাবৃত্তিই কিন্তু একই ধরণের নয়। এর মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আছে। তবে একটি বিষয়ে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা যায়। সাধারণতঃ পুনরাবর্তন আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বা দ্বিতীয় পর্ব থেকে। বাঙলা ছড়ার গঠনের ক্ষেত্রে এই নিয়মটিকে তাই আমরা গুরুত্ব দিতে চাই।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বা পর্ব থেকে পুনরাবর্তন শুরু হবার পর [একে এখন থেকে 'শব্দ-পরম্পরা' বলব] সেই শব্দ-পরম্পরা নানাপ্রকার পরিণতি লাভ করে। প্রথমতঃ, শেষ পর্যন্ত সেই শব্দ-পরম্পরার জের চলতে পারে ; যেমন, সং২২৯।

দ্বিতীয়তঃ, শব্দ-পরম্পরার মধ্যে ভাবগত পরম্পরা ও পর্যায়ানুক্রমিকতা এসে যেতে পারে; যেমন, সং ২৩৩। তৃতীয়তঃ, শব্দের এই পারম্পর্য সাধারণতঃ ছড়ার প্রথম দিকে থাকে না; থাকে শেষাংশে বা দ্বিতীয়াংশে। পারম্পর্যের অংশ শেষ হবার পর ছড়া আর বেশি অগ্রসর হয় না, বড়ো জোর এক বা দুই পঙ্‌ক্তি।

যে সব ছড়া আকারে খুব ছোটো, সেই সব ছড়ায় যদি এই ধরণের শব্দ-পারম্পর্য থাকে তবে তার মধ্যেও বিশিষ্টতা দেখা যায়। যেমন: সং৯, ১৪, ২১ক, ২৪ঘ, ৭৬, ৯৪ক, ১১৯, ১২১, ১৪৩, ১৫২, ১৬৪, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ২০০, ২১০, ২১৫, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৪,২৩৬, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৭০, ৩০১, ৩০২, ৩১৪,৩২১, ৩২২, ৩৩২,৩৩৪, ৩১৩, ৩৫৬, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৩, ৫১৮ প্রভৃতি ছড়া। এগুলোর সব ক'টিই আকারে ছোটো; সব ক'টিতেই দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তি থেকে শব্দের পারম্পর্য শুরু হয়েছে। সব ক'টিরই দুটি করে অংশ বা অর্ধ আছে। সেই দুটি অংশের মধ্যে সেতু বেঁধেছে শব্দের পারম্পর্যগুলি। প্রত্যেকটিরই প্রথম অংশে আছে কোনো Statement বা বর্ণনা; দ্বিতীয় অংশে আছে তারই ওপর আলোকসম্পাত, মন্তব্য অথবা এমন একটা কিছু যাতে দুটি অংশ মিলে একটি অখণ্ড রূপের সৃষ্টি করে। যেমন, ধরা যাক ১১৯ বা ১২১-সংখ্যক ছড়া দুটি। প্রথমটিতে 'খায়' শব্দ এবং দ্বিতীয়টিতে 'ধোপামাগী' ছড়া দুটির দুই অর্ধের মধ্যে সেতু রচনা করেছে। অবশ্য বলা প্রয়োজন, এই সেতুবন্ধন নিছক শব্দ-বন্ধন মাত্র নয়,—অর্থের এবং ভাবেরও বন্ধন।

আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো ছড়া যেগুলো,—যেখানে এই শব্দ-পরম্পরা থাকে,—সেখানেও মোটামুটি একই বিশেষত্ব ধরা পড়লেও, তাদেরও আছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে আছে: সং ৩৩, ৪০, ৪৬-৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৭০ক. ৭১/৫, ৭২ক, খ, ৭৪ঘ, ৮৮, ৯০/৩, ৯৮, ১২৩, ১৯০, ২০৪, ২০৬, ২২২, ২২৬, ২৫৮, ২৬৯ প্রভৃতি। প্রথমে কিছু অংশ ভূমিকা, তারপর আরম্ভ হয়েছে শব্দ-পরম্পরা। তবে যখনই এবং যতো পরেই সেই পরম্পরা শুরু হোক না কেন, এখানেও দেখা যায়, দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তি থেকে তা শুরু হচ্ছে। কখনো দেখা যায়, ছড়ার শেষ পর্যন্ত সেই পরম্পরার খেলা চলছে। তাহলে রূপ ও গঠনের দিক থেকে বিচার করলে এইসব ছড়ারও থাকে দুটি খণ্ড বা অংশ: প্রথমে ভূমিকা-ধর্মী একটি অংশ, পরে শব্দ-পরম্পরার অংশ।

স্বভাবতঃ তা হলে দুই অংশের সংহতি ও সংযোগের কথাও ওঠে। যেমন, ৩৩-সংখ্যক ছড়ায় : 'ভাল দেখে গাই কিনব কপিলা ঈশ্বরী'—এই পঙ্‌ক্তি থেকে দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম অংশে আছে পাশা খেলে কড়ি জেতার কথা। এক অংশে কড়ি জেতা, অপর অংশে সেই কড়ি দিয়ে কপিলা গাই কেনবার কথা,—এই দুই দিক মিলে ভাবের একটি পূর্ণতা দেখা যায়।

ক্বচিৎ ভূমিকা অংশটিকে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায় [যেমন : ৭২ক], এক্ষেত্রে ভূমিকা পরিশিষ্টে রূপ নেয়, অর্থাৎ শব্দ-পরম্পরার পরে স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রেও অবশ্য দুই অংশের সংযোগ-সংহতির প্রশ্ন ওঠে। তা পাওয়াও যায়।

এইসব ছড়ার শেষটুকু লক্ষণীয়। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে হয় একটি couplet, নয় ছন্দান্তর, নয় হ্রস্ব-দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি—ইত্যাদি থাকে। সমাপ্তির সুসম্পূর্ণতা এই শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অপর বিশেষত্ব।

ঙ. পাশাপাশি বা পরপর পর্বের বিন্যাসের পুনরাবর্তন : পর্ব যেমন বাঙলা ছন্দের একটি উপকরণ, তেমনি ছড়ারও। সমদৈর্ঘ্যের এবং কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ-সূত্রে আবদ্ধ সমধরণের দুটি পর্বকে, একই পঙ্‌ক্তির মধ্যে পাশা-পাশি ডানে-বাঁয়ে বা পর-পর দুটি পঙ্‌ক্তি রূপে স্থাপনা করলে একটি Symmetry রচিত হয়। যে কোনো ধরণের পর্বই কিন্তু এই প্রতিসাম্য রচনা করে না। এই ধরণের প্রতিসাম্যের প্রথম বিশেষত্ব হল, এখানকার প্রত্যেকটি পর্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি বাক্য। স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য বলেইস্বয়ং সম্পূর্ণ এক-একটি পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠতে পারে তারা। অর্থাৎ পর্বই পঙ্‌ক্তি, পঙ্‌ক্তিই পর্ব হয়ে ওঠে,—পর্ব-পঙ্‌ক্তির এই অভেদের ফলে একটি ভাবগত অখণ্ডতার সৃষ্টি হয়। পর্বগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণ ক্ষেত্রে হয় আট থেকে দশ মাত্রার, তবে আটের কমও দেখা যায়। বড়ো না হবার দরুণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটি দ্রুততা আসে, একটি পর্বের অনুরূপ আর একটি পর্ব শীঘ্র বা অনতি-বিলম্বেই পুনরাবৃত্ত হয়। পর্বগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি বাক্য বলে প্রকৃতপক্ষে সমদৈর্ঘ্যের ও সমধরণের বাক্যেরই পুনরাবর্তন ঘটে ; বাক্যের পুনরাবর্তন মানে ভাবের পুনরাবর্তন,—এবং তাই পরিশেষে প্রতিসাম্য রচনা করে। পর্ব-ভিত্তিক এই প্রতিসাম্যের বিস্তৃতি দু'রকমের : ক. একটি ছড়ার কিছু অংশে তা ব্যাপ্ত হতে পারে ; খ. একটি ছড়ার সর্বাংশে তা ব্যাপ্ত হতে পারে। সর্বাংশে ব্যাপ্ত হলে তখন তাকে আর তাকে Secondary Motif বলব না, তখন তাকে বলব, Secondary বা Final Symmetry.

যে সব ছড়া প্রশ্নোত্তরমূলক অর্থাৎ এক পঙ্‌ক্তি (বা পর্ব) প্রশ্ন, অপর পঙ্‌ক্তি বা পর্ব তার উত্তর, (যেমন, ২৬৬-২৭৩-সংখ্যক ছড়া), সেখানে এই ধরণের প্রতিসাম্য দেখা যায়। এই পরিচ্ছেদেরই খ-অংশে আমরা যে অবিকৃত বা ঈষৎবিকৃত রূপে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির কথা বলেছি, এই ধরণের পর্ব-ভিত্তিক প্রতিসাম্য রচনার ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী হয়। একই শব্দ পর-পর বা পাশাপাশি দুই পর্বের মধ্যে একটি সঙ্গতি আনতে পারে। তেমনি, কখনো হতে পারে পর্ব দুটি Antithetical, কখনো তাদের মধ্যে থাকতে পারে কোনো কার্য-কারণের বাঁধন। এই ধরণের পর্ব-ভিত্তিক প্রতিসাম্যের দৃষ্টান্ত এই :

১ (প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি), ৩ (ক, খ, গ অংশ), ৫ (রামের মত…ভরা মব), ৯ (কলমি ভাজা…যাব নি), ১৪ (প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি), ১৯ (ধা রে… যা), ২১ (ক, ঘ অংশ), ২৪ক, ৩৩ (কুলগাছটি…লক্ষ্মণ জী), ৩৯ (শেষ তিন পঙ্‌ক্তি), ৫২ (মঙ্গল…চড়্যা যাই), ৫৩ (প্রথমাংশ), ৫৪ (ছিকা লডে…নও টাকা), ৫৫ক, ৭০গ (উঠ সূর্য…বেয়ান), ৭০চ (আন গৌরীকে…চুল), ৭২ঙ (প্রথমাংশ), ৭৫খ (রাইল গেল…হাসে), ৭৫ছ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ১০৩ (খাটো নাঙল…চাউল), ১০৯, ১১০, ১৩৮ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ১৪৩ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ১৪৬ (শেষ পঙ্‌ক্তি), ১৫২ (প্রথম তিন সারি), ১৬৬ (বৈষ্ণব ভিখারীর উক্তি), ১৮৪ (প্রথম দুই সারি), ১৯০ (মাও গেইছে…আনিবে খাট), ১৯১ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ১৯৩ (আবো আসিল্…তার হাতে), ১৯৬ (প্রথম দুই সারি), ১৯৯ (তা তুর্‌-তুর্‌… ঠকাইলেক দাড়ী), ২০০ (আমবাড়ী…ঠাসিয়া), ২০২ (চান্ ঘুঘু…যোলো জামাই), ২০৩ (মামা-মামী…ডাকাডাকি করে), ২০৪ (প্রথম চার সারি), ২০৫ (ঘেঁচু হল…খায় শাঁসটি), ২১৯ (ছাতির উপর…বাড়ী যাই), ২২৩ (প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি), ২২৫ (ঘি-মৌরির…রাসে), ২৫৮ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ২৬০ (যোগলকাটা…গেলো রে), ২৭৯ (তর ছাগলে…বাঁধ্যে রাখ), ৩০১ (জামাই এল…নিবার চায়), ৩০৬ (তালতলাতে…হায় হায়), ৩০৭ (শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ৩২০ (ঐ), ৩৫১ (হালুয়া…বাড়িয়া), ৩৮২ (প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি), ৩৯৭ (ঐ), ৪৫০ (এক সের নুন…কিচ্ছা গেল্), ৪৯৫গ (রণে এয়ো…এয়োতীতে), ৪৯৬ (চাঁপা চন্দনে…স্বামীর মরণ), ৫০৮

(শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), ৫০৯ক (সাঁঝ এলো…এতক্ষণ), ৫১৬ (প্রথম পঙ্‌ক্তি)।

লক্ষ করে দেখা গেছে, বাঙলা ছড়াতে দুই পর্বের পঙ্‌ক্তিই যেন বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। তিন পর্বের পঙ্‌ক্তি যে নেই, তা নয়, এমন কি, তার চেয়েও বেশি সংখ্যার পর্বময় পঙ্‌ক্তি মেলে। এই দুই পর্ব যেন Symmetry-কে সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। তিন পর্বের পঙ্‌ক্তিতে একটি সুরাত্মক দিক, নিরন্তরতার বৃত্তধর্মিতা থাকে, যার ফলে Symmetryর objectivity ও স্পষ্টতা কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়। তিন পর্বের পঙ্‌ক্তিতে যে পুনরাবর্তন, তার মধ্যে একটি লতানে মসৃণতা আছে,—তা উচ্চ, সূক্ষ্ম ও সভ্যতার পরবর্তী স্তরের। কিন্তু দুই পর্বের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, জ্যামিতিক সমতা ঢের বেশি আদি স্তরের। লোকচিত্রে নমনীয়, বৃত্তধর্মী, লতানে রেখার চেয়ে ঋজু ও সরল রেখাই বেশি ব্যবহৃত হয়,—বৃত্তের চেয়ে সরল রেখাই আগে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে। দুই পর্বের Symmetry ওই সরল রেখার দুই প্রান্তকেই নির্দেশ করে, তাতে Binarism স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ মূর্তি গ্রহণ করে॥

…৫…

Primary ও Secondary Motif মিলিত হয়ে যে Primary Symmetry রচনা করে, ওপরে এ পর্যন্ত তারই ব্যাখ্যা করা ও উদাহরণ দেওয়া হল। দেখা গেল, প্রথমে একটি শব্দে, তারপর একটি বাক্য বা একটি পঙ্‌ক্তিতে নানা ধরণের মিল অন্বেষণ; তারপর দুটি বা ততোধিক পঙ্‌ক্তিতে মিল অন্বেষণ,—এই দু' ধরণের মিল নিয়েই Primary Symmetry। এই Primary Symmetry-কে আমরা Horizontal Symmetryও নাম দিয়েছি। এটি আকারে সংক্ষিপ্ত। কিন্তু যে Symmetry একটি গোটা ছড়ার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত, তার গুরুত্ব অধিক। একেই আমরা বলেছি Secondary Symmetry বা Final Symmetry বা Vertical Symmetry। এবার এই ধরণের Symmetryর কথাই আমাদের আলোচ্য।

Secondary বা Final Symmetryর মধ্যে একটি রূপ ও অর্থগত ব্যাপ্তি এবং সামগ্রিকতার উপাদান আছে, যা সমগ্র ছড়াকে একটি নিয়ম-নীতির বাঁধনে আগাগোড়া দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। ছড়াটির মধ্যে শিথিলতা

ও অসংলগ্নতার কোনো দিক প্রশ্রয় পায় না। কতকগুলি Unifying factor এর পেছনে কাজ করে। সেগুলো হল: ক. একটি ছড়ার আগাগোড়া একই বিশেষ রীতি-ভঙ্গি-শৃঙ্খলা-পারম্পর্যের কঠোর অনুসরণ; খ. কোনো ভাব-বস্তু-বিষয়-প্রসঙ্গ-পরিবেশের তালিকামূলক বিবৃতি; গ. প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীকের (Composite Symbol) ব্যবহার; ঘ. এর ফলে সংমিশ্রিত ভাব ও বস্তুর সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একাধিক বিষয় ও প্রসঙ্গের সহাবস্থান ও যৌগপদ্য মিলে Motifeme রচনা করে, যা ছড়ার অখণ্ডতার নির্দেশক হয়; ঙ. পর্বসজ্জা ও পঙ্‌ক্তির বিন্যাসের মধ্যে কোনো বিশেষ রীতির অনুসরণ, যা ছড়ার অখণ্ডতা ও সংহতির দ্যোতনা করে। এর মধ্যে প্রথম প্রসঙ্গটি চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'গ' অংশেরই প্রসারিত দিক মাত্র। সেখানে যা কেবল একটি ছড়ার অঙ্গ বা অংশকে আশ্রয় করে দেখা দেয়, এখানে তাই সর্বাঙ্গ জুড়ে প্রকাশিত হয়,—নিয়ম-নীতি-রীতি-ভঙ্গি দু' জায়গাতেই এক এবং অভিন্ন, কেবল ব্যাপ্তির ভিন্নতা। প্রথমেই এই ধরণের সর্বাঙ্গ-ব্যাপক প্রতিসাম্যের দৃষ্টান্ত দিই:

ক. ৩গ (আগাগোড়া একই মিল, ভঙ্গিও এক)। ৭গ (ঐ)। ৮ (ভালো ও মন্দের দুই দিক)। ১২-সংখ্যক ছড়াটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ-মালা দিয়ে আরম্ভ হয়ে, ধ্বন্যাত্মক শব্দমালা দিয়েই শেষ হয়েছে, সুতরাং প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে একটি সঙ্গতির সূত্র অনুসৃত হয়েছে, যা ছড়াটিকে একটি অখণ্ডতা প্রদান করেছে। ২০-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশের একই মিলের অনুবর্তন পঙ্‌ক্তি দুটিকে অন্বয় করে রেখেছে। ৩৪-সংখ্যক ছড়ার সব ক'টি স্তবক একটি গাণিতিক নিয়মের দ্বারা পারম্পর্যের objective বাঁধনে বাঁধা, সংখ্যার ক্রমবিবর্তন এখানে সব চেয়ে বড়ো কথা, এবং প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক-একটি স্তবকের ভাষা-ভঙ্গিও অভিন্ন। পরবর্তী ৩৫-সংখ্যক ছড়ায় দেখা যায়, একই ভাষা ও ভঙ্গিতে পর-পর বামুন দাদা, বেনে পাড়া, ময়রা পাড়া, গয়লা পাড়া, কামার পাড়া, জেলে পাড়া, নাপিত পাড়া, কলু পাড়া, ও চাষী পাড়াতে যাবার বর্ণনা। ৩৭-সংখ্যক ছড়ায় তেমনি একটি পারম্পর্যকে অনুসরণের প্রয়াস,—প্রতি-বারের ভাষা প্রায় এক,—এক পঙ্‌ক্তি অন্তর সেই পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা হচ্ছে প্রায় অন্বভঙ্গিতে। একই ব্যাপার ঘটেছে ৭৩-সংখ্যক ছড়ার ক-অংশে। এই রকম, কোনো না কোনো রীতির অনুসরণে, একটি ছড়ার আগাগোড়াকে বেঁধে ফেলবার অন্যান্য দৃষ্টান্ত এই: ৭৫ঘ, ৮৬ (পর্যায়ক্রমে বারোমাসের উল্লেখ),

১০২ (মাসানুক্রমিকতা), ১৪১ (একই মিলের অনুসরণ), ১৪৪ (এও তাই), ১৪৫ (সংখ্যার ক্রমিকতা), ১৫১, ১৬৩ (দুই পঙ্‌ক্তিরই আরম্ভ এক), ১৭০ (প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ একই ভাষা-ভঙ্গিতে), ১৭৪ (এটিরও তাই। একই ধরণের প্রশ্ন, একই ধরণের উত্তর, তার ধারাবাহিকতা), ২৯৫ (পরিবারের এক-একজনের পরপর নামোল্লেখ, ও ক্রন্দনের বিশেষত্ব), ৩০৩ (জামাইয়ের বাড়ীতে আসবার প্রতিটি স্তরের ক্রমান্বয়িক বিবরণ ও প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষের শব্দের সঙ্গে পরপর মিল), ৩১২ (কচু শাক রাঁধবার স্তরানুক্রমিক বিবরণ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিফল বর্ণনা), ৩৫০ (ঢেঁকির এক-একটি অঙ্গের একই ভঙ্গিতে প্রাধান্য দাবী করা), ৪০১ (প্রতি প্রহরের সংখ্যানুক্রমিকতা ও তার বিশেষত্ববর্ণনা), ৪১৩/৫, ৪২৭ (প্রথম পঙ্‌ক্তির অবিকৃতরূপে অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে রূপ নেওয়া এবং সেই ভঙ্গি ছড়ার আগাগোড়ায় গৃহীত হওয়া), ৪৩০ (কাঁকুড়ের এক-একটি স্তর এবং শেয়ালীর প্রতিক্রিয়া), ৪৩২, ৪৫১ (মাসানুক্রমিকতা), ৪৫২ (ঐ), ৪৫৮ (পর্যায় ধরে চারদিকের উল্লেখ ও তার প্রতিফল কথন), ৪৬১, ৪৬৩, ৪৯২খ,৪৯৪ক ৪৯৬ক-খ, ৫০৫ প্রভৃতি ছড়া।

খ. কোনো ভাব-বস্তু-প্রসঙ্গের তালিকামূলক বিবৃতি: এই রীতিটি অবশ্য অব্যবহিত পূর্ববর্তী রীতিরই একটি বিশেষ দিক। কোনো ভাব বা বস্তু বা কাজের অঙ্গ, নানা দিক ও বিশেষত্ব নিয়ে পরপর উল্লেখ করে যাওয়ার মধ্যে তালিকা প্রণয়নের একটি প্রয়াস দেখা যায়। ওপরে উল্লিখিত কয়েকটির মধ্যেও তা দেখা যাবে। আরো কয়েকটি এই: ৩০৯ (গহনার তালিকা এবং তা আগাগোড়া জুড়ে), ৩৮৩, ৪০২ (স্থানের নামের তালিকা) ৪১৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৬৪, ৪৭৩ (শোভার তালিকা), ৪৭৪ (এও তাই)।

গ. প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীকের ব্যবহার: সব ছড়াতেই প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীকের ব্যবহার না থাকলেও বহু ছড়াতেই তা দেখা যায়। এই প্রতীককে না বোঝবার দরুণ অনেক ছড়াকে খাপছাড়া, অর্থহীন ও শিথিল-বিন্যাস বলে আমাদের মনে হয়ে থাকে। বাঙলা ছড়াতে সাধারণতঃ ঘুমপাড়ানো ও ছেলেভুলানো ছড়া এবং দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক ছড়াতেই প্রতীককে ব্যবহার করতে দেখা যায়। প্রতীক হল একটি বস্তু বা ভাবনার বিকল্পে আর একটি বস্তু বা ভাবনা। একটির বদলে বা তার প্রতিনিধি রূপে যখন যখন আর একটি বস্তু বা ভাবনা গৃহীত হয়, তখন তখন তার মধ্যে থাকে নানা যাদু ও রহস্যের পটভূমিকা। এ ছাড়া, Animism, Totemism প্রভৃতি নানা

কারণে এই প্রতীকতা এসে পড়ে। সাধারণভাবে বাঙলা ছড়াতে আমরা তিন ধরণের প্রতীক লক্ষ করেছি : ক. গাছ, ফুল, ফল,—এটাই পরিমাণে সব চেয়ে বেশি , খ. মানবেতর নানা প্রাণী, মাছ ও পাখি ; গ. জল, বৃষ্টি, নদী, পুকুর, দীঘি। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে আবার সংমিশ্রণ (compositicn) ঘটেছে। এই তিন ধরণের প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীক বাঙলা ছড়াতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ (বিবাহই বেশি) প্রভৃতি ভাবকে ব্যক্ত করে থাকে। এক-একটি প্রতীক কখনো এক-একটি ছড়াতে বেশ প্রধান হয়ে উঠতে পারে। যেমন, বিয়ের ভাব ব্যক্ত করতে নদী বা পুকুরের প্রতীক গ্রহণ করা হল ; কিছু পরেই দেখা গেল, পুকুর থেকে পুকুর ঘাট, পুকুর ঘাট থেকে গ্রাম ও নারীজীবনের হাসি-কান্নার ছবি ফুটে উঠতে থাকল। ছডাটি চিত্র ও বর্ণনা-প্রধান হয়ে উঠল। প্রতীকের একটি উপকরণের বর্ণনা ছডার মধ্যে প্রধান হয়ে যাবার দরুণ ছড়াটির লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তার ওপর যদি সংমিশ্রণতার জন্যে আরো একটি প্রতীক ও তার বর্ণনা বা কেবল উল্লেখই দেখা যায়, তবে সরাসরিই, মূল কারণটি না বুঝতে পেরে, ছডাটিকে আমরা খাপছাড়া বলে থাকি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে লোকসাহিত্যের অনেক শাখাতেই প্রতীকতার প্রভাব দেখা যায়। এখনও অনেক আদিম সমাজে বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতীকতাময় ভাষা ব্যবহার করা হয়। লোকসঙ্গীত ও লোককথার মধ্যেও প্রতীককে পাই। কাজেই, খুব স্বাভাবিক কারণেই, ছডাতেও তা দেখা যায়।

প্রয়োগের দিক থেকে দেখলে দেখি, আলোচ্য সংগ্রহের ছড়াগুলিতে দু' ধরণের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে : ক. অবৈধ ও গুপ্ত প্রেম এবং সংশ্লিষ্ট অশ্লীলতাকে ব্যক্ত করতে প্রতীকতা ; খ. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রভৃতি জীবনের কয়েকটি দিককে ব্যক্ত করতে প্রতীকতা। প্রথম ধারার উদাহরণ হিসেবে ৩৩৩ ও ৩৩৪-সংখ্যক ছড়া দুটির উল্লেখ করা যায়। ৩৩৩-সংখ্যক ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কলা ও জিরে রোপণ করবার কথা আছে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আছে বউয়ের তসর ছিঁড়ে যাবার কথা। সহজভাবে দেখলে এই দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে কোনো যোগবন্ধন চোখে না পড়বারই কথা। কিন্তু, বাঙলা ছড়াতে যেখানেই বিবাহ বা যৌন জীবনের কথা আছে, সেখানেই গাছ-ফুল-ফল একটি প্রতীক রূপে থাকেই,—এই তথ্যটি মনে রাখলে কলা ও জিরের উল্লেখ অকারণ বলে মনে হয় না। তসর ছিঁড়ে যাওয়া কিসের ইঙ্গিত, তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন

নেই। ৩৩৪-সংখ্যক ছড়ার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেও একটি অশ্লীল ব্যাপার আছে। এখানে ডালিমগাছটি হল একটি 'বাড়ী', পিঁড়ি হল 'খাট', এবং কইমাছ মারা হল 'অবৈধ সঙ্গম'। অতঃপর মাছমারার বর্ণনা দিয়ে Camouflage করবার চেষ্টা। এইভাবে প্রতীক থেকে চিত্রময়তার আগমন ঘটে ছড়াতে।

এবার সব ধরণের প্রতীকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমে গাছ-ফুল-ফলের দৃষ্টান্ত। গাছ বৃষ্টির প্রতীক, এই জন্যে বট-পাকুড় ও তুলসীর উল্লেখ করা হয়েছে, ৬/১। বৃষ্টিই ভারতীয় জীবনে শস্যের প্রাচুর্যের হেতু, এই জন্যে গাছ থাকলে প্রাচুর্য ও ধন-কড়ির কথাও থাকে, ১১/৫। গাছ থাকলে চন্দ্র-সূর্যের উল্লেখ থাকে, ৭০ (সূর্য), ১২৩ (চন্দ্র), ১৭৯ ('রসুন' ফল, তাই চাঁদের উল্লেখ), ২১০ (ডালিম গাছ ও চাঁদ, 'চাঁদাই কোণা')। একটি বৎসর একটি গাছের প্রতীক, ৩৫৭।

তেমনি, গাছ-ফুল-ফল থাকলে আবার মানবেতর প্রাণীর নাম মেলে। যেমন: বেণা, শর, সুপুরি, কুল গাছ প্রভৃতির সঙ্গে ময়না, পাখি প্রভৃতির উল্লেখ, ২১। এগুলির একত্র ও যুগপৎ উল্লেখ প্রতীকের মাধ্যমে ছড়াটিতে সংহতি এনেছে। বকের সঙ্গে ফুল ও নারকেল গাছের উল্লেখ, ১১৪। 'ডিয়াল্যা' নামে পাখির সঙ্গে নারিকেলের উল্লেখ, ১১৫ খ। কাকের সঙ্গে আম, ১১৭। বুলবুলের সঙ্গে ফুল, ১১৮। কুকুর আছে, তাই 'বাবুরি ফুল', ১৬০। বুলবুলি ও শাল গাছের যোগসূত্র, ১৭৮। আম-কাঁঠাল ও সাপের একত্রাবস্থান, ১৮৮। গাছ-ফুল-ফল এবং গোরুর একত্র উল্লেখ, ২৬৩। একই ব্যাপার দেখা যায় ২৬৬-সংখ্যক ছড়াতে। গাছ, মাছ ও পাখি, ৩০৬। ফুল, ফল ও মাছ, ৩০৭। গাছ ও পাখি, ৩২০। ফল ও পাখি (পানকৌড়ি), ৩২৮। ফল ও পাখি-গোরু-সাপ, ৩৩১। ৩৩৫-সংখ্যক ছড়াতেও তাই। গাছ ও মানবেতর প্রাণী, ৪৩৫।

গাছ-ফল-ফুলকে মানুষের প্রতীক বলে মনে করা হয়; মানুষ থেকে মানুষের বিয়ে, অতঃপর যে কোনো বিয়ের সঙ্গেই গাছ-ফুল-ফলের উল্লেখ দেখা যায়। বিয়ের থেকে নিছক যৌনতার, অবৈধ প্রণয়ের এবং অবৈধ যৌনলীলার ইঙ্গিত মেলে গাছ-ফুল-ফলের মাধ্যমে। উদাহরণ এই:

পঞ্চশস্যের অঙ্কুরকে 'ভাঁজো' এই মানবীরূপা করে দেখা, অতঃপর বিবাহের ইঙ্গিত, ১১/১। শিশুকে 'কান শিসার ফুলে'র সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে, ১৯০। শ্রীফল ও 'চাম্পাফুল' আছে, এই জন্যে 'সতীন' চরিত্র, ২০৬। রাজা, রাজ-

কন্যার সঙ্গে আম-কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের উল্লেখ, ২৯৩। ডালিম ফল কনে এবং ডালিম গাছ কনের বাপ, ২৯৫। বাঙলা ছড়ার বিবাহ প্রসঙ্গ সব চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ। বিবাহ-প্রসঙ্গ থাকলে বাঙলা ছড়াতে গাছ-ফুল-ফল থাকবেই। বর্তমান সঙ্কলনে এর উদাহরণ: ১১/১, ২৬, ২৭, ৭০, ১৯৭, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৬০, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩৫, ৩৯৩, ৪৪৭, ৫০৮ প্রভৃতি। দাদা-বউদি, মামা-মামীর বিয়ের কথাও ছড়ায় খুব শোনা যায়. সেইজন্যে এদের প্রসঙ্গেও গাছ-ফুল-ফলের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙলার অনেক অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, 'মাতুল না হলে বিয়ে হয় না', এই জন্যে বিয়ের অনুষঙ্গ থেকে মামা, মামা থেকে মামী চরিত্র এসেছে। বিয়ের একটি আনুষ্ঠানিক উপকরণ ছাতা; বর-কনের মাথার ওপর ছাতা ধরবার রীতি কোনো কোনো অঞ্চলের বিবাহের একটি রীতি। যেমন গাছ মানুষেব মাথার ওপর আবরণ হয়, ছাতাও তেমনি। এই জন্যে ছাতার সঙ্গে ফুল ও গাছেব উল্লেখ মেলে। চন্দ্র-সূর্যের বিয়েও বাঙলা ছড়ার একটি বিষয় বলে সে পথ ধরেও অনেক প্রতীক এসেছে।

গাছ-ফুল-ফলের পরেই বাঙলা ছড়ায় প্রতীক সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয় পাখি ও মাছ। পাখির সঙ্গেও আবার গাছ-ফুল-ফলের সংমিশ্রণ (Composition) ঘটে থাকে, ফলে 'সংমিশ্রিত প্রতীকে'র (Composite symbol) সৃষ্টি হয়। গাছ, মাছ, পাখি, জল,—সব কটি প্রতীক-পদার্থেরই পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছে। এরই ফলে বাঙলা ছড়াতে জটিলতা ও বৈচিত্র্য বেড়েছে।

পাখিকে ধন-সম্পদের ও প্রাচুর্যের প্রতীক রূপে এই সব ক্ষেত্রে মনে করা হয়েছে: যে বাড়ীতে রামশালিক, চড়ুই প্রভৃতি পাখি আছে, সে বাড়ীর গৃহস্থ বেশি পরিমাণে চাঁদা দিতে সক্ষম, ৫৪। এই একই কারণে হাঁস ও নীল পায়রার উল্লেখ, ৫৭। ৫৯-সংখ্যক ছড়াতেও তাই। রাজৈশ্বর্য বোঝাতেও পাখির প্রতীকতা গ্রহণ, ৬৯ খ। বকের সঙ্গে 'কড়ি'র উল্লেখ, ১১৪। 'ডিয়াল্যা' নামের পাখির সঙ্গে 'সোনা'র (যা ধনের প্রতীক) উল্লেখ, ১১৫খ। তেমনি পায়রার সঙ্গে সোনার উল্লেখ, ২২৮। পাখি ও ধন-দৌলতের একত্র উল্লেখ, ৪৪০। পাখি ও অলঙ্কারের সহাবস্থান, ৪৪৬।

পাখি থাকলে রাজা ও রাজার প্রতিবেশের উল্লেখ: ২৪৯, ২৮০, ৪৪৪। পাখিকে মানুষ, শিশু এবং অন্য মানবিক সত্তার প্রতীক বলে মনে করা: ১৬৮, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮৩, ১৯৭। পাখি থাকলে বিয়ে, প্রেম, অবৈধ প্রেম

ও প্রেমিকের উল্লেখ থাকে : ১৯৭, ২০২, ২০৩, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২২২, ২২৮, ৩০৬, ৩৩১ (মামার মাধ্যমে), ৩১৮, ৩৪৬, ৩৯৩ ইত্যাদি।

মাছ এবং মাছের প্রতিবেশ থেকে জল, জল থেকে নদী-দীঘি-পুকুর নানা প্রতীকের জনক হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন, হাঁস বা রাজহাঁস বা পানকৌড়ি। এরা পাখিও বটে, আবার জলজ পাখি বলে মাছের সঙ্গেও সমীকৃত। যেমন, ২০৩-সংখ্যক ছড়ায়। 'হাঁসপুকুরি' হাঁস ও জলকে নির্দেশ করে, বিয়ে ও যৌনতার দিক থাকলে নদী ও পুকুর থাকে এবং বাঙালীর বিয়েতে মাছ একটি মাঙ্গলিক উপকরণ বলে কথিত। নৌকো *(জল) এবং বিয়ের উল্লেখ, ২০৬। বিয়ে আছে বলে জলের উল্লেখ, সঙ্গে পাতারও, ২১৩। মাছের সঙ্গে ধন-কড়ির উল্লেখ, ২৩৩-২৩৪। বউ-জামাই (বিয়ে) মাছ ও* গহনার একত্র উল্লেখ, ৩০৪। মাছের সঙ্গে গাছ, পাখি ও বিয়েকে পাই, ৩০৬। তেমনি পাই নদী-জল, ফুল-ফল ও মাছকে একসঙ্গে, ৩০৭। জল (গাঙের ঢেউ) বিয়ের ইঙ্গিত দেয়, ৩৪২। গাছ, চাঁদ, খেওয়া (অর্থাৎ জল, নদী), মাছ ও বিয়ের যৌগপদ্য, ৫০৮।

প্রতীকের প্রসঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি দিকও উল্লেখযোগ্য। 'তিনটি সারের ঢেলা' এই জড় বস্তুকে Animism-এর ফলে কেবলই সপ্রাণ বলে মনে করা নয়, Anthropomorphism-এর ফলে 'পাটেশ্বরী' ও 'পৌঝুরী' এই নামযুক্ত মানবী বলে মনে করা, ২৮। বস্তুপিণ্ড এখানে মানবীর প্রতীক। একই ব্যাপার ঘটেছে একটি সরাকে 'ভাঁজো' নাম্নীয় নারী বলায় (সং ১১/১) কিংবা 'পৌষমাস'কে সপ্রাণ নারী বলে মনে করায় (সং ৩০)। এর পর এই সব নারীদের বিবাহ কল্পনা করা হয়েছে, যেমন, ভাদু বা তুষুব বেলায়। একই পথ ধরে চন্দ্র বা সূর্যের বিবাহের কথাও উঠেছে (সং ১০, ১৫)। বর্ষাকালের চাষমাসকে একটি যুবতীর দৈহিক ক্রমবিকাশের প্রতীক রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে, ১০২।

মানবেতর অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাপ, বাঘ, হরিণ ও ভালুক। ভারতীয় স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে, শিল্পে ও কলায় সাপ সর্বত্রই জলের সঙ্গে সংমিশ্রিত, বাঙলা ছড়াতেও তাই। সাপের সঙ্গে Phallicism এবং সেই পথ ধরে নারী, বিবাহ ও যৌনতার দিক মেলে, ১৭৯, ১৮৮। বাঘ হল অবৈধ প্রেমিক, ৩০৯। হরিণ ইঙ্গিত দিচ্ছে মৃত্যুর, ৪২৫, ৪৪৬। ভালুককে মেলে শিশুর প্রতীক রূপে, ১৪২। অবশ্য অন্যান্য প্রাণীকেও শিশু ও মানবের প্রতীক রূপে পাই।

বাঙলা ছড়ার অর্থোদ্ধারের জন্যে প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীকের কিছু দৃষ্টান্ত ওপরে দিলাম। এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে।

ঘ. এই Composition বা সংমিশ্রণ অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বস্তু বা প্রাণীর সহাবস্থানের ব্যাপারটির সঙ্গে আরো দুটি বিষয় সংযুক্ত। প্রথমটি হল : সংমিশ্রণগুলির স্থিরতা ও স্থায়িত্ব, অর্থাৎ সব ছড়াতেই তা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তারা একই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিদ্যমান থাকে ; আর দ্বিতীয়টি হল : সেই দুই বা ততোধিক বস্তু বা প্রাণীর একত্রাবস্থান Motifeme-এর সূচনা করে। বিষয় দুটি সম্পর্কে এবার স-উদাহরণ আলোচনা করি।

বলেছি, দুই বা ততোধিক বস্তু বা প্রাণীর একত্রাবস্থান বা যৌগপদ্য একটি ছড়াতে যে অর্থ বহন করে, অপর একটি ছড়াতেও তাই ; কিন্তু এই সহাবস্থান সর্বত্রই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয় , এর মধ্যে আছে নানা জটিলতা, নানা অস্পষ্টতা ও পরোক্ষ-প্রবণতা। এই সব অস্পষ্টতা ও পরোক্ষ-প্রবণতার অন্তরালে যে নিয়মটি নিরন্তর ক্রিয়াশীল, সর্ব প্রথমে তাকেই উপলব্ধি করতে হবে। যেমন, এই উদাহরণটিতে : মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল, শ্বশুরের কুলে তারা (৬/১)। এটি বিশ্লেষণ করলে একদিকে পাই : ফুল-ফল-তারা এই তিনটি বস্তুর একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে সহাবস্থান ; অপর দিকে পাই, মা-বাপ-শ্বশুর, পারিবারিক তিনটি ব্যক্তি। এই তিন ব্যক্তির সঙ্গে তিনটি বস্তু সংশ্লিষ্ট। মা : ফুল ; বাপ : ফল , শ্বশুর : তারা। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তিন ব্যক্তি সধবা নারীর মাধ্যমে একটি অখণ্ডতা ও সংহতি রচনা করে, সহজেই তা বোঝা যায়। কিন্তু ফুল, ফল ও তারা এই তিনটি পদার্থ কি ভাবে এক ও অভিন্ন হল ? সেটাই Composition-এর মূল দিক। সেটা এইভাবে ঘটে . মা-বাপ এবং ফুল-ফল সহচর শব্দ ; কেবল তাই নয় এদের মধ্যে আছে একটি 'Binary Principle' বা একটি যুগ্মকের ভাব। মা-বাপ যেমন একদিকে একটি যুগ্মক, ফুল-ফলও তেমনি। ঠিক তেমনি, শ্বশুর যেমন একদিকে 'তারা'ও তেমনি একদিকে। মা-বাপের সঙ্গে শ্বশুর অঙ্গীভূত এবং সমীকৃত, ফুল-ফলের সঙ্গে তেমনি তারা। এই ভাবে ফুল-ফল-তারা একীকৃত ও সমীকৃত হল এই ছড়াতে। অন্য ছড়াতেও কি তাই ? সে প্রমাণ যদি মেলে, তবেই এই সমীকরণকে মেনে নেওয়া যায়। দেখা যাক, ফুল ও ফলের সঙ্গে তারার একত্রাবস্থান ও যৌগপদ্য কি ভাবে অন্যত্র মেলে। আগেই বলেছি, সে

সহাবস্থান ও যৌগপদ্যকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে মেনে না,—মেনে অস্পষ্ট, জটিল ও পরোক্ষরূপে।

আলোচ্য ছড়াটির অপরাংশ (সং ৬/৩) থেকেই প্রমাণিত হয় ফুল-ফল = তারা। কেননা, তারার উদ্দেশে একবার ফুল, একবার ফল দেওয়া হয়েছে। ৪৭৪-সংখ্যক ছড়ায় পাই : আকাশের শোভা তারা যেন গাছের শোভা ফুল। এখানে তারা = ফুল। ৩০২-সংখ্যক ছড়ায় পাই : ঝিয়া ফুল ফুটে বেল্ নাই : ঝিঙে ফুল ফুটেছে, বেলা নেই। সূর্যাস্তের সময়ই ঝিঙে ফুল ফোটে। অর্থাৎ বিশেষ ফুল সূর্যাস্তের (অর্থাৎ রাত্রি, রাত্রির অনুষঙ্গে তারা) কালে ফোটে : তেমনি কোনো কোনো ফুল ফোটে সূর্যোদয়ে,—তাও রাত্রির সঙ্গে জড়িত। যে করেই হোক রাত্রি, রাত্রির সঙ্গে তারা, তারার সঙ্গে ফুল এবং সেই ফুলের সঙ্গে ফল, শেষে ফুল-ফলের সঙ্গে গাছকে জড়িত দেখা যায়। তারা থেকে চাঁদ (তাও রাতের সঙ্গে জড়িত) এসে পড়ে, এবং তারার সঙ্গে যেমন ফুল-ফলকে যুগপৎ মেলে, চাঁদের সঙ্গেও তাই। যেমন : পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বক্র (সং ১১/৩)। এখানে চাঁদ = তেঁতুল (ফল) [প্রচলিত ছড়া : চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে। এখানে চাঁদ = ফুল, এবং কদম গাছ]। ৩৫৬-সংখ্যক ছড়ায় পাই : বাঁশের গোড়ত্ তারা অর্থাৎ গাছ (বাঁশ গাছ) = তারা।

এ পর্যন্ত তা হলে মিলল চাঁদ-তারা = ফুল-ফল-গাছ। গাছের সঙ্গে ফুল-ফল তো নৈসর্গিক কারণেই অভিন্ন। উক্ত ছড়াতেই (সং ৬/১) দেখা যায় : গাছ = জল, নদী। কেননা বলা হয়েছে : বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে/···পৃথিবী জলে ভাসবে ··। চাঁদ-তারা = ফুল-ফল-গাছ ; গাছ = নদী, জল। ∴ চাঁদ-তারা = জল, নদী। আবার, জল-নদী যেহেতু তরল পদার্থ, তারল্যের সাদৃশ্যের ফলে জল-নদী = দুধ। যেমন : ভাঁজো ! এই পথে যেও। বেনাগাছে কড়ি আছে, দুধ কিনে খেও (সং ১১/৫)। এখানে গাছ = দুধ, ∵ নদী = গাছ, পূর্বের উদাহরণে। ৯১-সংখ্যক ছড়াতে লাউ এবং কাঁচাকলার উল্লেখের সঙ্গে যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে মেঘ-বৃষ্টির কথা।

বিয়ের কথা যেখানে থাকে, সেখানে গাছ-ফুল-ফলের উল্লেখ থাকে। আবার, বিয়ে থাকলে নদী-জল-দীঘি-পুকুর-ঢেউও থাকে। ∴ বিয়ের মাধ্যমে গাছ-ফুল-ফল = নদী-জল-দীঘি-ঢেউ। আবার, বিয়ে থাকলে থাকে মাছ ; অবৈধ প্রণয়, যৌনলীলা প্রভৃতির ইঙ্গিত থাকলেও থাকে মাছ ; টাকা-

কড়ি, গয়না-গাঁটি প্রভৃতি থাকলেও মাছ থাকে। ফলে, বিয়েকে মাঝখানে রেখে মাছ = গাছ, টাক-পয়সা, গয়না-গাঁটি। যেমন : সং ২৩৩,২৩৪ : মাছের কাঁটা পায়ে ফোটা, এবং দোলায় চেপে কড়ি গোনা। সং ৩০৪ : চিংড়ি মাছের খোলায় করে গয়না এনেছে। সং ৩০৬ : গাছ = মাছ, বিয়ের পটভূমিকা। মাছ = 'পাইনা ফুল', 'কাটুল বিচা'। সং ৩৩৩ : কই মাছ = কালো জিরে [কালো জিরে হল ফল, অতএব গাছ। 'কালো' রঙ অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে]।

বিয়ে থাকলে (কিংবা না থাকলেও) একদিকে থাকে গাছ-ফুল-ফল, অপর দিকে পাখি। অতএব পাখি = ফুল-ফল, মানুষ। যেমন, সং ১৭৮, ১৮৪, ২২৮ (পায়রা = বিয়ে), ৩০৬ (খয়রা পাখি), ৩৩৮ (পাখি = অবৈধ প্রেমিক)। পাখি থাকলে চাঁদ (সং২২২) এবং জল-নৌকো (সং ৩১৫) থাকে, অতএব পাখি, চাঁদ = জল। পাখি = ফুল ; তারা = ফুল। ∴ পাখি = তারা। যেমন, ওই তারাটা পাইখ মারা, ১৯৫।

বিয়ে থাকলে গাছ-ফুল-ফলের উল্লেখ থাকে। এই গাছ বা ফুল = ছাতা। এই জন্যে, গাছের তল = ছাতার তল। যেমন, সং ২৯৬, ২৯৭, ৩০১ প্রভৃতি। ছাতা ও গাছ—দুইই ঘরের প্রতীক, এই জন্যে বিয়ের প্রসঙ্গে এ দুটির উল্লেখ থাকে। গাছ যে ঘর, তা বোঝা যায় ১৪-সংখ্যক ছড়া থেকে : আম পাত চালিতা পাত / ঘর নোয়াইলাম আড়াই হাত। পূর্বেই দেখেছি গাছ = নদী, আর গাছ যদি 'ঘর', তবে ঘরও নদী হবে। তাই এই ছড়াতেই অতঃপর পাই : যদি ঘর গঙ্গায় যায় ·।

দেখা যায়, হাতী = ধুতি (সং ১৭২), চাঁদ = কাপড়, সুতো (সং ১৭৯) ; মামা-মামী = সুতো, কাপড় (সং ২০৩)। এই তিনটির মধ্যে একই রীতির বিকাশ। মূল হল চাঁদ, চাঁদের বুড়ী চরকা কাটে, অতএব চাঁদের সঙ্গে সুতো এবং কাপড়ের যোগ। 'চাঁদ মামা',—অতএব মামা-মামী সম্পর্কীয় ছড়াতেও কাপড়। প্রচলিত ছড়ায় পাই, চরকার দৌলতে দুয়ারে হাতী বাঁধা, এবং চাঁদ উঠেছে বলে হাতী নাচছে। তা হলে সমীকরণটি এই : চাঁদ = চরকা = হাতী = ধুতি। হাতীর সঙ্গে যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে ঢেঁকি ও ধানভানা (সং ৪৩৭)। এর পেছনে আছে চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'মিথ্'। ৩৫৬-সংখ্যক ছড়ায় পাই : বাঘ, হাতী, মোষ, পিঁপড়ে = ধানভানা। হাতী = মোষ,—ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গের 'মিথে'র প্রভাবে ; হাতী = পিঁপড়ে,—ওড়িশা ও

বাঙলায় ক্রমপুঞ্জিত লোককথায় দেখা যায়, হাতীর শুঁড়ে পিঁপড়ে কামড়ে দিয়ে হাতীকে শায়েস্তা করেছে। বাঘ=ঘোষ, দ্রঃ সং ২৮৯,২৯১গ এবং ২৫৮।

অবৈধপ্রণয়ের উল্লেখ করতে প্রায়শঃই মানবেতর প্রাণীর উল্লেখ দেখা যায়। কইমাছ (সং ৩৩৩), টিকটিকি (সং ৩৩৫), বাঘ (সং ৩৩৯)। এ ছাড়া মেলে পাখি (সং ৩৩৮)।

যে 'Binary Principle'-এর কথা পূর্বে বলেছি, সহাবস্থান বা যৌগপদ্যের ক্ষেত্রে সর্বদাই তা কেবল বিরোধমূলক বা বিপরীতার্থক বস্তু-প্রাণীকেই নির্দেশ করে না ; সমন্বয়ের ও সমধর্মী বস্তু-প্রাণীকেও নির্দেশ করে। যেমন, ঘি= মধু (সং ৭৩খ)। সেখানে আছে : ঘি : ঝি ; মধু : বধূ। অতএব ঘি-মধু এক। তারই ফলে ২৮১-সংখ্যক ছড়ায় 'ঘি-মউকে' সহচর শব্দরূপে উল্লিখিত হতে দেখি ; এবং ৩১-সংখ্যক ছড়ায় পাই : আম-কাঁঠালের পিঁড়েখানি ঘী-মৌ মৌ করে। 'ঝি-বউ', এই যুগ্মক 'ঘি-মউ'কে একত্রে অবস্থিত হতে প্রেরণা দিয়েছে। বাঙলার তাবৎ ছড়ায় 'ঘি'-এর অন্ত্যমিল রূপে 'ঝি' মিলবেই। সম্ভবতঃ, এর মূল কোনো সামাজিক প্রথার মধ্যে প্রোথিত আছে, আগেই তার উল্লেখ করেছি।

ওপরের এই সব উদাহরণ থেকে দেখলাম, কি করে একটি ভাব থেকে আর একটি ভাব, এক বস্তু থেকে আর একটি বস্তু এসে যায়। এক ভাব বা বস্তু থেকে অপর ভাব বা বস্তুর আগমন ও সঙ্করণকে আমরা বলব 'communication',—তা যেন দুই ভাব ও বস্তুর মধ্যে সংযোগসাধনকারী একটা কিছু। এই 'communication'-এর ফলে ছড়া প্রসারতা লাভ করে। যেন ছড়া একটি জৈব পদার্থ, তার প্রাণ আছে, তাই ক্রম-সঞ্চারিত হয়। যেমন, জীবদেহ নানা কোষে বিভক্ত, কিন্তু প্রতিটি কোষই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, একটি কোষ অপর আর একটি কোষের সঙ্গে communication রক্ষা করে, ফলে একটি জীবদেহে দেখা যায় অখণ্ডতা ও সমগ্রতা,—ছড়ার ক্ষেত্রেও তাই।

এই communication বা সংযোগসাধন ও রক্ষণ আরো নানাভাবে হয়ে থাকে। ধ্বনি সাদৃশ্য, পরিবেশ-সাদৃশ্য, মনস্তত্ত্ব—ইত্যাদি নানা কারণে তা হয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত এই : ৪২-সংখ্যক ছড়ায় 'ঠগের' শব্দের সংস্পর্শে সম্বন্ধাত্মক 'ঠাকুর' শব্দ এসে পড়েছে। ৬৫-সংখ্যক ছড়াটি 'জোলাভাতির' মাগনের ছড়া। 'জোলা' বা 'জুলি' শব্দের অর্থ হল খাল বা নালা। খালের ধারে যে 'চড়ুইভাতি' করা হয়, তাকে বলে 'জোলা ভাতি'। এই 'জোলা' (খাল,

নালা) থেকে বৃত্তিবাচক জোলা-জুলুনী এসে পড়েছে। ষষ্ঠী-দেবীর সংশ্রবের ফলেই ১২৬-সংখ্যক ছড়ায় ষাট দিন ও ষাট রাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ১৩৪গ-সংখ্যক ছড়াতে 'কংসাসুর রাজা' এবং কাঁসার থালা তেমনি এক হয়ে গেছে। ১৭৮-সংখ্যক ছড়াতে 'বুলবুল' একটি মেয়েরও নাম আবার পাখিবিশেষও বটে। পরবর্তী ১৭৯-সংখ্যক ছড়াতে 'বুক দুর্-দুর্' করে বাক্যাংশই 'বগধুল' বা 'বগদুর' (অর্থাৎ বাদুড়) শব্দের আগমন ঘটিয়েছে। এই ছড়াতেই ব্যথা-বেদনা অর্থে 'বিষ' শব্দ 'কুড়ি' সংখ্যা-সূচক 'বিশ' শব্দকে ডেকে এনেছে, তেমনি 'ডাঁডাইস্' (দাঁড়াস সাপ) শব্দ থেকে এসেছে 'ড্যাড়' (দেড়) শব্দ। বলাবিশেষভাবে প্রয়োজন, এই communicationগুলো কিন্তু একেবারে নিছক অর্থহীন শব্দের বদলে শব্দ এসে পড়া নয়,—এখানেও শব্দের অর্থগত function রয়েছে [পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শব্দ যদি পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে নীত ও গৃহীত হয়, তাকেও বলা চলে communication, যেমন ১৯০, ২০৬-সংখ্যক ছড়া]। ২২২-সংখ্যক ছড়াতে 'ময়না' নামীয় এক কন্যার উল্লেখ আছে। ছড়ার শেষ পঙ্‌ক্তিতে পাই : 'কইনা গেইল্ উড়িয়া'। এখানে ব্যক্তি নাম ও বিশেষ পাখি এক হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে ১৭৮-সংখ্যক ছড়াতে। ২৭৯-সংখ্যক ছড়াতে 'ছাগলদানী' শব্দই 'বাখালদানী' শব্দ সৃষ্টি করেছে। ৫১৮-সংখ্যক ছড়ায় আছে : 'ধান হল কামার বাড়ী'। এর অর্থ : ধান পেকেছে, তাই কামারবাড়ীতে গিয়ে কাস্তে গড়তে হবে। 'ধান' এখানে 'কামারবাড়ী' শব্দকে communicate করেছে।

সংমিশ্রণ (composition), বিরুদ্ধ ও সমভাবার্থক যুগ্মক (Binary Principles), প্রতীকতার বন্ধন, সংযোগরক্ষণ (communication) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দিক মিলে একাধিক ভাব-বস্তু-প্রাণীকে অর্থের বন্ধনে একত্রাবদ্ধ করে রাখে। একেই বলা যায়, 'Motifeme'। এবার এই Motifeme-এর কথাই বলি।

Motifeme শব্দটি আধুনিক গবেষকগণ লোককথা ও 'মিথ্'-এর Structural Analysis এবং Semiotics (বা Semiology)-এর আলোচনায় ব্যবহার করছেন। যতদূর জানি, আমেরিকান গবেষক Alan Dundes শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে প্রথম (১৯৬২খ্রীঃ) ব্যবহার করেন। তিনি এই শব্দটি আবার ফরাসী গবেষক Claude Levi-Strauss-এর একটি প্রবন্ধে (প্রবন্ধটির নাম : The Structural Study of 'Myth'. এটি লেভি-

ষ্ট্রসের 'Structural Anthropology' [Newyork : 1963] বইতে [PP. 206-231] আছে) উল্লিখিত 'Mytheme' শব্দের অনুকরণে নির্মাণ করেছেন। লেভি-ষ্ট্রস আবার 'Mytheme' শব্দটি নিজে নিয়েছেন ভাষা-বিজ্ঞানের 'Morpheme' শব্দটিকে অনুসরণ করে (১৯৫৫ খ্রীঃ)।

ভাষা-বিজ্ঞানের দুটি বিশেষ দিক আছে। একটি হল Etic (অর্থাৎ যা 'non-functional ; denoting feature that do not serve to distinguish one sound or meaning from another') ; আর একটি হল Emic (অর্থাৎ 'functional ; denoting features that distinguish one language element from all others, as in phon*emic*, morph*emic*'). লোকসাহিত্যের আধুনিক গবেষকগণ এখন আর লোকসাহিত্যের নিছক ও নিরর্থক শুষ্ক উপকরণমালা খোঁজেন না। তাঁরা চান, প্রতিটি উপকরণের এক-একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভূমিকা (function)-কে অন্বেষণের মাধ্যমে একটি রচনার গাঠনিক অখণ্ডতা ও সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে। তাই তাঁদের দৃষ্টিকোণ আর Etic নয়, Emic,—যাতে আছে একটি রচনার উপাদান-উপকরণের অর্থ ও ভূমিকা।

লোকসাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, লোকসাহিত্যের গবেষণায় লোককথা ও 'মিথ্'ই প্রাধান্য পেয়েছে এবং পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয় গবেষকগণই এ বিষয়ে যুগে-যুগে নব-নব দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করেছেন। লোকসাহিত্যের আলোচনা-গবেষণায় দুটি পদ্ধতি বিশ্ববিখ্যাত। একটি হল 'Finnis-American Method',—যা ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমিকায় একটি লোককথার আদি-উৎস নির্ণয় করতে চায়,—লোককথার প্রত্যেকটি Motif-কে ধরে ; এর মধ্যে ঐতিহাসিক দিকের প্রসঙ্গটি আছে বলেই এর দৃষ্টিকোণ হল Diachronic। মূলতঃ ফিনল্যাণ্ড এই দৃষ্টিকোণের জন্মভূমি। অপর দৃষ্টিকোণটি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা খুচরো প্রবন্ধে উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই বিকশিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে সেটিকে প্রথম রূপ দেন রুশী গবেষক Vladimir Propp,—তাঁর 'Morphology of the folktale' (১৯২৮) বইতে। রূপতাত্ত্বিক ও গাঠনিক দিক থেকে লোককথাকে বিচার করাই হল এই দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব। লোককথাকে যে ভাবে বর্তমানে মেলে সেটি অবলম্বনেই এঁরা লোককথার

রূপ ও গঠনের বিশেষত্ব নির্দেশ করতে চান। তাই এঁদের দৃষ্টিকোণ হল Synchronic.

ফিনল্যাণ্ড ও আমেরিকার যৌথউদ্যোগে প্রবর্তিত রীতির মধ্যে Motif একটি বড়ো ভূমিকা নেয়। কিন্তু এই রীতির কিছু বড়ো ত্রুটিও আবিষ্কৃত হয়েছে। একই বিষয় ও প্রসঙ্গ একটি লোককথায় Motif হতে পারে, কিন্তু অন্য একটি লোককথায় তা হতে পারে না। ফলে একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ তাবৎ লোককথাব মধ্যে সর্বত্র ও সর্বদা স্থির একটি Motif হয়ে উঠতে পারে না। সেইজন্যে কোনো একটি Motif-এর constantness থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, এই রীতির গবেষণায় Motit-কে নিছক শব্দ বা শব্দমালা বলেই মনে করা হয়; একটি রচনার মধ্যে তার অর্থগত সক্রিয়তা ও ভূমিকা (অর্থাৎ function)-টি:কে কোনোই মূল্য দেওয়া হয় না। রূপ ও গাঠনিক দিক থেকে যাঁরা লোককথার গবেষণায় নিযুক্ত হলেন, তাঁরা তাই Motif অপেক্ষা Motifeme (এবং 'মিথে'র আলোচনায় Mytheme)-কে প্রাধান্য দিতে লাগলেন।

Motif এবং Motifeme-এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। Motif হল বিশেষ শব্দ বা একটি বিশেষ প্রসঙ্গ বা বিষয় বা উপকরণ। তার অভিধানগত অর্থ আছে বটে, কিন্তু একটি রচনার মধ্যে তার বিশেষ ব্যঞ্জনা ও সক্রিয় অর্থগত ভূমিকার কথা অনুচ্চারিত বা অনালোচিতই থাকে। Motifeme কিন্তু কেবল একটি মাত্র Motif নয়,—একাধিক Motif সম্মিলিত বা গুচ্ছবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা বা অর্থকে যখন নির্দেশ করে, তখন তাই হয় Motifeme. অবশ্য যদি নির্দিষ্ট ও স্থির অর্থ থাকে তবে সংখ্যায় কেবল একটিমাত্র Motifও Motifeme হতে পারে। অর্থাৎ অর্থ ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ Motifই Motifeme.

এইখানে Motifeme শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ সম্পর্কেও আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। Motif শব্দটিকে অবলম্বন করেই যখন শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে, তখন Motif শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দকেই আগে লক্ষ করতে হবে। Webster-অভিধান মতে শব্দটির অর্থ এই: 'In literature and the fine arts, a salient feature or element of a composition or work; esp., the theme, or dominant feature.' সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রধান অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ বা বিষয়বস্তু। কিন্তু কেউ-কেউ যখন বাঙলায় 'অভিপ্রায়'

বলে শব্দটির প্রতিশব্দ দেন, তখন শব্দটির প্রত্যাশিত ও প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তা মেলে না। দুঃখ এবং আশ্চর্যের কথা এই—এই সব লেখকরাই এককালে যথাযথ না হোক, প্রায়-ঠিক প্রতিশব্দই ব্যবহার করেছিলেন। যেমন, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী তাঁর 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা। আষাঢ়, ১৩৭১) বইয়ের ভূমিকাতে প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন 'প্রসঙ্গ'। ভালোই তো করেছিলেন, পরে আবার তা পাল্টাতে গেলেন কেন! শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড: ছড়া। প্রথম সং ১৯৬৩। পৃ. ৪১) বইতে প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন 'বিষয়'। এটাও বা মন্দ কী ছিল! দু'জনের কাছেই অনুরোধ, তাঁরা আবার পূর্ব-প্রদত্ত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে থাকুন।

তা সে যাই হোক, আমরা Motif শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'প্রসঙ্গ', 'উপকরণ' বা 'প্রসঙ্গোপকরণ' শব্দ গ্রহণ করছি। Motifeme-এর বাঙলা প্রতিশব্দ তাই আমাদের মতে 'গুচ্ছবদ্ধ-প্রসঙ্গোপকরণ' বা 'উপকরণগুচ্ছ', বা 'উপকরণমালা' বা 'অর্থগর্ভউপকরণ'। ক্লদ্‌ লেভি-স্ট্রস্‌ যেমন 'মিথ্‌'-এর আলোচনায় 'Mytheme' শব্দের প্রবর্তন করেছিলেন, আমরাও তেমনি ছড়ার আলোচনায় 'Folk-Rhymeme' বা শুধুই 'Rhymeme' শব্দটি প্রবর্তন করতে চাই। স্বদেশী ও বিদেশী আলোচকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

বাঙলা ছড়ার Motifeme নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভূমিকা হিসেবে কিছু কথা বলে নিতে হল। এবার মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। আমেরিকার উপজাতি-বিশেষের মধ্যে প্রচলিত লোককথা ও 'মিথে'র আলোচনায় Alan Dundes যে অর্থে 'Motifeme' এবং 'Motifemic Depth'-কে নির্দেশ করেছেন, আমরা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই এগুলোকে গ্রহণ করছি না। তাঁর আলোচনা লোককথাকে অবলম্বন করে, আমাদের আলোচনার বিষয় ছড়া। কাজেই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এসে যাবেই।

'The study of Fork-lore' (1965) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'Structural Typology in North American Indian Folktales' (PP. 206-215) নামক প্রবন্ধে Alan Dundes লোককথাকে 'sequences of motifemes' রূপে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ লোককথায় থাকে কতকগুলি Motifeme-এর ধারা বা শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য। এই ধারা-শৃঙ্খলা-পারম্পর্যটি

মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ট থাকে (যেখানে ধারাটি ব্যাহত হয়, এবং বিকল্পে নতুন কোনো Motif এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে,—সেখানে হয় 'Allomotif'), সেটাকে বলে 'Motifeme Pattern'. ছড়ার মধ্যেও আমরা কিছু 'Motifeme Pattern' লক্ষ করেছি। ছড়ার Motifeme বলতে এইগুলি :

১. কোনো একটি ভাব বা ভাবনা, বিষয়, প্রতিবেশ বা প্রসঙ্গের পারম্পর্যমূলক, শৃঙ্খলাধর্মী, ধারাবাহিকতাময় উল্লেখ বা বর্ণনা একটি Motifeme Pattern-কে সৃষ্টি করে। এটিই বাঙলা ছড়ার (এবং সাধারণ ভাবে যে কোনো দেশের ছড়ার) প্রধানতম প্যাটার্ন,—ছড়ার Typology নির্দেশের ক্ষেত্রেও এটিকে আমরা দেখব। এতে যে উল্লেখ বা বর্ণনাগুলি করা হয়, সাধারণতঃ তা সংখ্যায় কেবল একটি মাত্র হবে না, অন্ততঃ দুটি হতে হবে। কারণ, Motifeme মানেই সাধারণভাবে একাধিক প্রসঙ্গ বা উপকরণের একটি গুচ্ছ, যা সম্মিলিতভাবে সুস্পষ্ট একটি অর্থ-ব্যঞ্জনার সূচক। এই প্যাটার্নেরই আর একটি প্রসারিত দিক হল তালিকামূলকতা,—এর উদাহরণ পূর্বেই দিয়েছি।

২. Motifeme-এর গুচ্ছ দৈর্ঘ্যে যে কোনো মাত্রার হতে পারে। তা কেবল একটি পঙ্‌ক্তিতে বা একটি Motif-এ আবদ্ধ হতে পারে, আবার গোটা ছড়াতেও পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিংবা একটি স্তবকের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যাই হোক না, সংখ্যায় কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুটি Motif থাকতে হবে। এক পঙ্‌ক্তি বা এক স্তবকের Motifeme বলতে এইগুলি : ক. বাক্যের মধ্যে সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দের অব্যবহিত, ব্যবহিত ও বিশ্লিষ্ট প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট প্রতিসাম্য ; খ. Antithesis, এর মাধ্যমেও প্রতিসাম্য ; গ. Binary combination/composition, জোড়া-জোড়া ভাব, প্রসঙ্গ, যুগ্মক সৃষ্টি ; ঘ. অন্য যে কোনো ধরণের পুনরুক্তি (Palilogy) ; একটি বিশেষ অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ শব্দের পুনরুক্তিমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দটির ওপর গুরুত্ব আরোপ (যা খানিকটা Epanalepsis-এর কাছাকাছি), ঙ. যুক্তিমূলক ক্রম, যুক্তির দ্বারাই এক পঙ্‌ক্তি বা বাক্যাংশ অপর পঙ্‌ক্তি বা বাক্যাংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পরিপূর্ণ অর্থকে নির্দেশ করে। একে বলা যায় 'Ergodism'. ল্যাটিন ভাষায় 'Ergo' শব্দের অর্থ হল 'অতএব'। কার্য-কারণের কঠোর বা শিথিল বন্ধনে দুই পঙ্‌ক্তি বা দুই অংশ যেখানে সংবদ্ধ। চ. নঞর্থক 'না' এই

অব্যয়পদকে বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয়পদ রূপে ব্যবহার করে দুই পঙ্‌ক্তি বা বাক্যের যোগসাধন। ছ. সাদৃশ্যমূলক ও Symmetrical বাক্য ও পঙ্‌ক্তি রচনা।

৩. Communication অর্থাৎ সংযোগসাধন।

৪. Composition এবং Composite symbol. সব ক'টির উদাহরণ আগেই দিয়েছি।

৬. পর্ব-সজ্জা ও পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে অখণ্ডতা : এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করেছি। সমগ্র ছড়ায় এই ধরণের সজ্জা ও বিন্যাসগত অখণ্ডতার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল : ১০, ১৩, ১৬, ১৮, ২০ক-খ, ২১, ২৬-২৮, ৩০, ৪৬-৪৯, ৫১, ৫৬, ৫৭, ৫৮ (বারো বাঘের বর্ণনা অংশ), ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩খ, ৭০ক, ৭২খ, ৮৮, ৯০/৩, ৯১, ৯২/১৮, ৯৩, ৯৪ক, ৯৫খ, ৯৬-৯৮, ১০০, ১০১, ১০৬, ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৪১, ১৬৪, ১৬৫, ১৫১, ১৬৩, ১৭৭-১৭৯, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৫, ২০১, ২০৭, ২২০ ২২২, ২২৮-২৩০, ২৩৫, ২৩৯-২৪১, ২৪৩, ২৪৯-২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৬-২৭৩, ২৭৬ক-চ, ২৮৭, ২৯৭, ৩০২, ৩০৩, ৩১৪, ৩২১, ৩২৯, ৩৩৭ক, ৩৪০, ৩৫২-৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৭-৩৬৯, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০২, ৪১৩/১-২, ৪৩২, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৭ক-খ, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯২, ৪৯৪ক, ৪৯৫খ, ৪৯৭ক-খ, ৫০২, ৫০৫, ৫১০, ৫১৪, ৫১৮, ৫১৯।

পর্ব-সজ্জা, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস এবং বাক্যভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে বাঙলা ছড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে দুটি ভাগ দেখা যায় : ক. একটির মধ্যে আছে সুরাত্মক গীতিভঙ্গি, একটি বৃত্তধর্মিতা, নিরন্তরতার প্রবাহ, তা যেন লতার মতো নমনীয় ; তিনটি পর্ব, শব্দ, এবং বিশিষ্ট বাক্যাংশের তিনবার পুনরাবর্তনকে ঘিরে এই সুরাত্মক দিকটি আসে। খ. অপরটি হল, সরল রেখাবৎ দুই দিকে মুখো-মুখি স্থাপিত দুই ভাব, বিষয়, প্রসঙ্গ,—যা জোড়া-জোড়া, যা কাটা-কাটা, যা নিরন্তরতার প্রবাহ-বিহীন, যা দুইয়ে-দুইয়ে সম্পূর্ণ, তার বাইরে যা যেতে চায় না। বাঙলা ছড়ার কাঠামোর আলোচনায় এটিকে বলা যায় Binarism, বা 'দ্বি-প্রান্তিকতা'। আমরা লক্ষ করেছি, এই দ্বিতীয় দিকটিই ছড়ায় প্রবলতর, এটি-কেই আমরা আদিম ও প্রাচীন মানসিকতার ভাববাহী বলে মনে করি। প্রথম দিকটির মধ্যে এমন একটি সুষমা ও সুসম্পূর্ণতার দিক আছে, একটি বিশেষ

সাংস্কৃতিক স্তর অতিক্রম না করলে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বহু ছড়াতে আবার এই দুই দিকের মিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্রণটাই একটি নিয়ম বা সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কি না, সে বিষয়ে এখনও আমরা নিশ্চিত নই। দু-একটি দৃষ্টান্ত এই :

যেমন, ৩৩১-সংখ্যক ছড়ার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি সুরাত্মক বা গীতিধর্মী : অতএব তা বৃত্তমূলক। কিন্তু, তৃতীয় পঙ্‌ক্তির দুটি পর্বই এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য, বাক্য দুটি পরস্পরের মুখোমুখি স্থাপিত, একটি সরল রেখার দুই দিক যেন, ফলে তা হয়েছে প্রতিসাম্যমূলক। ৩৩৫-সংখ্যক ছড়ায় এর বিপরীত ব্যাপার দেখা যায় : এখানে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির চারটি পর্বেই প্রতিসাম্য স্পষ্ট ; কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে একই ছাঁচের পর-পর তিনটি পর্ব থাকায় তা হয়েছে বৃত্তমূলক। এই একই ব্যাপার ঘটেছে ৪৯৩ক এবং ৫৯৫গ-সংখ্যক ছড়াতেও। ৪৩৪-সংখ্যক ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তি সুরাত্মক, কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম পঙ্‌ক্তি তা নয়। তিন পর্বের পর-পর স্থাপনার আর একটি বৈচিত্র্য দেখা যায় : পর-পর তিনটি সমধর্মী পর্বকে স্থাপনা করে, চতুর্থ পর্বটিকে দীর্ঘ কবে দেওয়া। যেমন, ৪০৪ বা ৪৩৬-সংখ্যক ছড়া।

যাই হোক, এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখা গেল, কোনো না কোনো প্রকারে মিল ও সাম্য সৃষ্টি করাই বাঙলা ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। এরই মধ্যে নিহিত আছে ছড়ার রচনারীতির মূল দিক, এবং সেই মূল দিক আবার লোকজীবন ও মানসেরই প্রতিবিম্ব। এই ভাবে, ছড়াব রচনারীতিকে লোকমনস্তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন করে দেওয়া যায়।

...৬...

ছড়ার সমীক্ষা বলতে আমবা ছড়ার Morphology বা 'রূপতত্ত্ব' এবং তার 'Sructural Analysis'কে বুঝিয়েছি। এই দুটি দিক মিলিয়েই ছড়ার Semiotics বা Semiology. এবারে আমরা ছড়ার রূপতাত্ত্বিক বিশেষত্বগুলি লক্ষ করছি।

সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাঝারি বা তার চেয়ে বড়ো আকারের বাঙলা ছড়া রূপ ও অর্থগত দিক থেকে তিনটি খণ্ড বা অংশে বিভক্ত। বিভাগগুলি

এই রকমের : ক. ছড়ার প্রারম্ভিক অংশ, বিশেষতঃ প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি : খ. ছড়ার মধ্যাংশ বা ছড়ার বিস্তৃতি : গ. ছড়ার অন্তিম অংশ—অর্থাৎ ছড়ার শেষ তিন বা চার পঙ্‌ক্তি। এই তিন অংশ বা খণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল—ছড়ার শেষাংশ। এই অংশকেই ছড়ার Climax বলা যায়,—এই অংশটিই ছড়ার ভাবগত ও অর্থগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই অংশ বলা হয়ে গেলেই এক-ফুঁয়ে-নিবিয়ে-দেওয়া প্রদীপ শিখার মতো ছড়াও দপ্‌ করে শেষ হয়ে যায়, হাওয়াই যেমন ক্রমেই আকাশে উঠে অবশেষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাই হয়ে যায়। এই শেষ অংশকেই লক্ষ্য করে ছড়া ক্রমেই বিস্তৃত ও বিকশিত হতে থাকে। ছড়ার শেষের মধ্যে এমন একটি Abruptness আছে, শ্রোতাকে যা সচেতন করে তোলে। শেষাংশের পর্ব, পঙ্‌ক্তিগঠনের মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব থাকে, যাতে আসন্ন শেষটিকে বক্তার উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের মধ্যেই অনুভব করা যায়। ছড়ার অন্তিম অংশ একাধিক পঙ্‌ক্তি জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে। চরম পঙ্‌ক্তি (ultimate line), উনশেষ পঙ্‌ক্তি (pen-ultimate line) এবং প্রাক্‌-উনশেষ পঙ্‌ক্তি (Anti-penultimate line)—প্রত্যেকটির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শেষ অংশের গুরুত্ব যেমন সর্বাধিক, মধ্যাংশের গুরুত্ব তেমনি সবচেয়ে কম।

ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তির তেমনি কিছু বিশেষত্ব আছে। অধিকাংশ ছড়ারই উদ্বোধনী পঙ্‌ক্তি বেশ striking, শোনামাত্র কানে-মনে লেগে যায়। ছড়ার পঙ্‌ক্তি গঠনের যে সূত্রগুলি আগেই লক্ষ করে এসেছি, তার সব ক'টি প্রথম পঙ্‌ক্তির গঠনের মধ্যেও দেখা যায়। অন্যান্য বিশেষত্বগুলি এই :

১. ব্যক্তি-নামের উল্লেখ, কখনো বা দ্বিরাবৃত্তি : ১, ২, ২৪খ, ২৫, ৩৬, ৬৩, ৬৯, ৭২ক, ৭৩ক, ৭৮, ১৮৮, ৩৯৩, ৩৯৪ প্রভৃতি।

২. সম্বোধন (মানুষ, জড় পদার্থ, কখনো বা সম্বোধনের দ্বিত্ব) : ১, ১১/১, ৪, ৫, ১৭, ২৪খ, ২৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৫১, ৫৩, ৬৩, ৬৯, ৭২ক, ৭২খ, ৭৩ক, ৭৬, ৮৯, ৯১, ১০৩, ১১১ (জড় পদার্থ), ১১৫ (পাখিকে সম্বোধন), ১১৬ (জড়পদার্থকে সম্বোধন), ১১৭, ১২৩, ১৩৮, ১৬৬, ১৮৮, ১৯০, ২০২, ২০৬, ২১৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৯৪, ৪৪০। আহ্বান : ১৪০, ১৪২, ৩৯৫।

৩. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রশ্নের দ্বিত্ব : ১, ২, ৫, ৩৬, ৫২, ৫৬, ২২৫।

৪. অনুজ্ঞা, অনুরোধ, এবং তার দ্বিত্ব প্রয়োগ : ১৯, ২৪গ, ৩৫, ৫৮গ, ৬০খ, ৬৪ (অনুরোধ), ৬৭ (ঐ), ৬৯, ৭০গ (অনুরোধ), ৭২ক, ৭৮ (অনুরোধ), ১০৩, ১১৬, ১১৭ (অনুরোধ), ৪৩৯।

৫. ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ, বিভিন্ন প্রয়োগ : ২, ১২ (ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে আরম্ভ, তাই দিয়েই শেষ), ৪০, ৫৬, ৫৮খ, ৭০ঙ, ৭৩ক, ৭৬, ৯৮, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১৬০, ১৭১, ১৭২ (তিনবার), ১৭৮, ১৯৭, ২৩৫, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬ (তিনবার), ৪০০, ৪১২, ৪৩২, ৪৪৫, ৪৪৬ প্রভৃতি।

৬. শব্দদ্বৈত, সহচর-অনুচর শব্দ, সর্বপ্রকার দ্বিরুক্তি ও ত্রিরুক্তি : ১৩, ১৪, ১৯, ২৪ক, ২৬, ৩৪, (সংখ্যাবাচক), ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫৩, ৫৫, ৫৮ক, ৫৯, ৬০ক ৬১-৬৪, ৭০ক, ৭০চ, ৭০জ, ৭৩ক, ৭৭, ৭৯, ৮২ক, ৮৭, ৯৮, ১০৩, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৯। তিনবার : ১৪৮, ১৭২, ১৯৩, ২০০, ৩৫৬, ৪০০, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৩, ৪৪৪, ৫০৬ প্রভৃতি। একই শব্দের একাধিক আবর্তন : ২, ১৬২, ১৬৮, ১৬৯, ২৫৮। অনুপ্রাস : ৪৩, ৪৪, ৭৫ঙ।

৭. কর্মের পারম্পর্য, বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমান্বয়িকতা : ১৫, ১৬, ২৪গ, ৩৫, ৫০, ৯৮ (দুই কর্মের যোগ)। মাসানুক্রমিকতা : ৬৬, ১০২, ১০৪, ৪৩১। কার্য-কারণের যোগ : ১০, ৫৮, ৭০ছ, ৯৮। সংখ্যাবাচক শব্দের ক্রমান্বয়িকতা : ৪২, ১১৭।

৮. কোথাও যাওয়া বা আসা : ৪৯, ৫৪, ৫৭, ৫৮ক, ৫৯, ৬১, ১০৪।

অনেক ছড়ার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি বা অংশ বিবরণ ও বিবৃতিমূলক। বৈচিত্র্য এইগুলিতেই বেশি। তবে এক্ষেত্রেও দেখা যায়, কোনো না কোনো প্রসঙ্গ-সূত্রদ্বারা উদ্বোধনী পঙ্‌ক্তির দুই অংশ, দুই পর্ব, বা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি জড়িত বা সংবদ্ধ থাকেই। অন্য কোনো সূত্রদ্বারা আবদ্ধ না হলে অন্ততঃ এটুকু দেখা যায়, প্রথম পঙ্‌ক্তি বা প্রথম অংশের কোনো শব্দ বা শব্দমালা পরবর্তী অংশে আবৃত্ত হচ্ছে; কিংবা প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশ কোনো বিশেষ কার্য-করণের অস্পষ্ট-অদৃশ্য-ক্ষীণসূত্র দ্বারা গ্রথিত হচ্ছে।

অপর কয়েকটি বিশেষত্বপূর্ণ প্রারম্ভ এই : মন্দ ও ভালোর দুই বিপরীত দিক, ৮। 'বেরা' শব্দ দিয়ে আরম্ভ, তাই দিয়েই শেষ, ৯। প্রথম পঙ্‌ক্তির 'বাঁশ' শব্দ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আবৃত্ত হয়েছে, ৬৫। এমন ব্যাপার ঘটেছে ৭০ঘ, ৭২ঘ, প্রভৃতি ছড়াতেও।

প্রথম পঙ্‌ক্তির তিন অংশের মধ্যে প্রথম দুই অংশে একানুপ্রাস জাতীয় মিল, কিন্তু তৃতীয় অংশ দল ছাড়া : জল পড়ে, পাতা নড়ে, খড়ি বনে কে, ২১৩। অশ্বত্থপাতা, কুঞ্জলতা, শ্যাম পণ্ডিতের ঝি, ৫৯৩। কখনো থাকে তিন অংশের মধ্যে

একই নিদের আবর্তন : আশ ঘোড়া, পাশ ঘোড়া, তার সাক্ষী ভীমে ছোঁড়া, ৫১৩।

প্রথম পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথমে দুটি অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কিন্তু তৃতীয়টি অর্থময় : আলুক মালুক শালুক রে, বন শালুকের পাতা, ৪৩৫। পর-পর তিনটিই অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ, তারপর অর্থময় বাক্য : ইড়্‌কি বিড়্‌কি টাম্ টিড়্‌কি / টামের গছত্ বান্ধিনু ঘোড়া, ৪৪৩।

প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিতে তিন বারের আবর্তন থাকলে একটি গীতিময়তার ভাব এসে পড়ে। তিন বারের আবর্তনের জন্যেই আবার পঙ্‌ক্তিও দীর্ঘ হয়, এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি হ্রস্ব হয়। এরই বিপরীতে পাওয়া যায় আর এক ধরণের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি, গীতাত্মকতা যাতে একেবারেই নেই। পঙ্‌ক্তিগুলি মূলতঃ হ্রস্বায়তনের, কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া হয় ; এখানে পঙ্‌ক্তিগুলিই এক-একটি পর্ব এবং পর্বগুলি প্রায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি বাক্য ॥

...৭...

একাধিক বার বলেছি, শেষাংশই ছড়ার প্রাণ, তাই ছড়ার Climax এবং বিচিত্র রূপে তা প্রদর্শিত হয়। ছড়া-কবিতার শেষ যথার্থই শেষ, এবং যেখানে তা শেষ হয়ে যায়, প্রকৃতই মনে হয়, তারপর কিছু বলবার বা শোনবার নেই।

শেষ পঙ্‌ক্তিতেই ছড়ার শেষ বটে, কিন্তু Penultimate বা উনশেষ পঙ্‌ক্তি থেকেই তার আয়োজন শুরু হয়ে যায়, এবং সেই অনুসারেই উনশেষ পঙ্‌ক্তি বা পর্ব গঠিত হয়। যিনি আবৃত্তিকারক (বা লিখিত ছড়ার পাঠক) তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তন থেকেই আসন্ন শেষকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করে নেয়া যায়। ছড়ার শেষাংশের সঙ্গে, সুতরাং, এই ভাবে, গঠন বা কাঠামোর দিকটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে।

উনশেষের পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তি বা পর্ব হল Anti-Penultimate বা প্রাগ্-নশেষ পঙ্‌ক্তি বা পর্ব ; অনেক ছড়ার এখান থেকেই শেষের সীমা শুরু হয়, এবং এরও পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তি বা পর্বও শেষাংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদিও তা ঘটে কদাচিৎ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, শেষ চার পঙ্‌ক্তি (বা পর্ব) নিয়ে শেষের কারবার ; তবে শেষ ও উনশেষের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,—এবং যতই ওপরের দিকে ওঠা যায়, পঙ্‌ক্তির গুরুত্ব ততই হ্রাস পেতে থাকে।

ছড়ার এই শেষাংশকে তিন দিক থেকে বিচার করা চলে : ক. ছড়ার ভাব ও বিষয় বস্তুর সঙ্গে শেষাংশের সম্পর্ক; খ. শেষাংশের পঙ্‌ক্তি বা পর্বগুলির দৈর্ঘ্য ; গ. শব্দ-চয়ন ও ভাষাগত বিশেষত্ব।

ছড়ার শেষের মধ্যেও আছে বৈচিত্র্য। ওপরে যে তিন দিকের কথা বললাম, তা মনে রেখে, ছড়ার শেষাংশের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় এইভাবে :

১. যে সব ছড়ার গোটাটাই একটি সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, ভাবের পারম্পর্য-মূলকতা, অন্ত্যমিলের বাঁধন ও গাণিতিক বিধানে আবদ্ধ ও গাঁথা থাকে, তার শেষাংশও হয় সেই পূর্বাগত ধারাকেই স্বীকার করে নিয়ে। পর্ব ও পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য গঠনেও পূর্বাপর অভিন্নতা থাকে। শেষাংশ এখানে পূর্বাগত ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়।

২. যে সব ছড়া উপর্যুক্ত শৃঙ্খলা বা পারম্পর্যমূলক নয়, কিন্তু কোনো ভাব-বিষয়-প্রসঙ্গ-কাহিনীর একটি যুক্তিধর্মী, প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক ও ক্রমিক অগ্রস্থতির ফলে পরিণতিটি নির্দেশিত হয়,—সেখানেও শেষাংশের সঙ্গে পূর্বাংশের যোগ-সম্বন্ধ থাকে। তবে, পূর্বাংশের পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে এই ধরণের ছড়ার শেষাংশের পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যের সমতা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

৩. দুই বা তিন (বা চার) পঙ্‌ক্তি বা পর্বেই যে সব ছড়া সম্পূর্ণ হয়, স্বাভাবিক কারণেই সে সব ছড়ার শেষাংশ বলে পৃথক কোনো অংশ থাকতে পারে না। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রেও, বহুশঃ, বাংলা ছড়া শেষ করবার সময় যে ভাষা-ভঙ্গি ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ, তারই অনুসরণ দেখা যায়। বাঙলা ছড়া শেষ করবার সাধারণ ভাষা-ভঙ্গিটি কি, সে আলোচনা পরে করছি।

৪. ওপরে উল্লিখিত প্রথম তিন ধরণের ছড়ার অন্তিমাংশ মূল ছড়া থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত নয় ; কিন্তু এইবার যে ধরণের ছড়ার কথা বলব, তার শেষাংশ মূল ছড়া থেকে আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ, মূল ছড়ার ধারা-বাহিকতা ও যুক্তিক্রমের সঙ্গে এই ধরণের শেষাংশের যেন সহজ যোগ থাকে না। অবশ্য এই বিচ্ছিন্ন অংশ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন একটি ছড়া বা ছড়ার অংশ কিনা, তা বিশেষকরে ভেবে দেখতে হবে। এই ধরণের অন্তিমাংশই বিশেষত্বময় ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ ; এগুলোরই শেষাংশের বিস্তৃতি শেষ চার, তিন বা দুই পঙ্‌ক্তি জুড়ে ; এদেরই শেষাংশের পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যে থাকে নানা বৈচিত্র্য।

৫. এই চতুর্থ ধারায় কথিত দুই (বা তিন, চার) পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণ শেষাংশের পঙ্‌ক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা একটি আলোচ্য বিষয়, দৈর্ঘ্যও একটি বিশেষ দিক। এই বিষয়ে এই ক'টি দিক বিবেচনা করবার : ক. শেষ ও উনশেষ পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য ; যে কোনো একটি ছোট বা বড়ো হতে পারে। খ. দুটিই আকারে-আয়তনে সমদৈর্ঘ্যের হয়ে একজোড়া পঙ্‌ক্তির একটি শ্লোক বা Couplet[১] হতে পারে ; গ. দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে সংযোগ থাকতে পারে, ফলে একটির সম্পূর্ণতা অপরটির ওপর নির্ভরশীল থাকে ; ঘ. কখনো আবার কোনো সংযোগের সূত্র না থাকায় একটি যেন অপবটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, স্বাধীন হয়ে ওঠে।

৬. কচিৎ, একক ভাবে, বিচ্ছিন্ন-নিঃসঙ্গ একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি দিয়ে ছড়া শেষ হতে পারে।

মোট এই ক' ধরণের পরিণতি দেখা যেতে পারে। পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য দিয়ে বিচার করলে, এই ক' রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায় :

১. পূর্বাপর তাবৎ ছড়ায় এই দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি ;

২. ছড়ার মধ্যাংশে ছন্দান্তব, পঙ্‌ক্তি আকারে হ্রস্ব, যেন একটি পর্বই পঙ্‌ক্তি হয়ে যায়, মধ্যাংশেব এই ছন্দান্তব বহুশঃ শেষের সীমা-নির্দেশক হয়ে ওঠে ;

৩. ছড়াব প্রথম ও মধ্যাংশে হ্রস্বাকৃতিব বা একপর্বের পঙ্‌ক্তি, কিন্তু শেষ দুই পঙ্‌ক্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতিব বা একাধিক পর্বের ,

৪. তৃতীয় ধারাব বিপরীতে, প্রথম ও মধ্যাংশেই দীর্ঘাকৃতির বা একাধিক পর্বের পঙ্‌ক্তি স্থাপনা করে, শেষাংশে অপেক্ষাকৃত হ্রস্বাকৃতিব বা একপর্বময় পঙ্‌ক্তি যোজনা :

৫. উনশেষ ও শেষ পঙ্‌ক্তি দুটির, গোটা ছড়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হয়ে সমদৈর্ঘ্যের একটি শ্লোক বা couplet হওয়া :

৬. নিঃসঙ্গ, একক, একটি অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি।

বাঙলা ছড়া শেষ করবার কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাষা-ভঙ্গি আছে, এইবার সে কথা বলি।

---

১ রবীন্দ্রনাথ couplet-এর বাঙলা করেছিলেন, 'দ্বিপদী'।

১. বহু সময়ে একটি নিছক-নীরস বিবৃতি প্রদানই শেষ পঙ্‌ক্তির লক্ষ্য হয়; এই ধরণের বিবৃতিমূলক পঙ্‌ক্তি বিশেষত্ব-বর্জিত এবং তা দৃষ্টিআকর্ষণকারী নয়।

২. কোনো-কোনো সমাপ্তিসূচক বাক্যের মধ্যে বিস্ময়, তৃপ্তি, আনন্দ-উল্লাস, ক্রোধ প্রভৃতি নানা ধরণের মনোভাব প্রকাশিত হয়।

৩. তেমনি ব্যক্ত হয় প্রতিজ্ঞা, শপথ, ভবিষ্যৎ কোনো ইচ্ছে।

৪. অনুপস্থিত কোন চরিত্র সম্পর্কে কোনো মন্তব্য, কোনো দৃশ্য, ঘটনা, কর্ম, পরিস্থিতির সম্পর্কে মন্তব্য; কোন ভাবের সম্পূর্ণতা, প্রকর্ষ, সুস্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা দ্যোতক মন্তব্য।

৫. কর্ম ও ক্রিয়াপদের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য। কর্মগুলি সকৃৎ বা নিরন্তরতা-মূলক হতে পারে, ক্রিয়ার কালের দিক থেকে ঘটমান বর্তমান কাল প্রাধান্য পায়, কর্মটি হঠাৎ আকস্মিকভাবে দ্রুত সম্পাদিত অথবা ধীরে সম্পন্ন হতে পারে।

৬. অনুজ্ঞা, অনুরোধ, আদেশ-জ্ঞাপক বাক্য।

৭. নিষেধার্থক বাক্য।

৮. প্রশ্নাত্মক বাক্য। কখনো উনশেষ পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন করে, শেষ পঙ্‌ক্তিতে তার উত্তর দান; কখনো কেবল নিরুত্তর জিজ্ঞাসায় বাক্য শেষ হওয়া।

৯. ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিচিত্র ও ব্যাপক প্রয়োগ, হ্রস্বকায় পঙ্‌ক্তির সঙ্গে এর বিশেষ যোগ।

১০. সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ ও শব্দ-দ্বৈতের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ।

১১. পুনরুক্তির প্রয়োগ।

বাঙলা ছড়ার শেষাংশ বিচারে তার পর্ব ও পঙ্‌ক্তির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। ছড়া সঙ্কলনের সঙ্গেও এই প্রসঙ্গটি জড়িত। অন্ত্য-মিল, ভাব ও বিষয় এবং ছড়ার পূর্বাপর পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য অনুসারে শেষাংশের পঙ্‌ক্তি বিন্যাস করলে ছড়ার কাঠামো এবং অন্তিমাংশের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সহজতর হয়। এ বিষয়ে সঙ্কলকদের সচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন।

ছড়ার মধ্যাংশে যে ছন্দান্তরের কথা পূর্বে তুলেছি, সেটিও সতর্কভাবে বিচার্য একটি প্রসঙ্গ। এই ছন্দান্তরের কারণ কি? ছড়ার কাঠামোতে মধ্যাংশের ভূমিকা বড়ো নয়, অবশ্য বহু ছড়াতে মধ্যাংশ বলে পৃথক একটি অংশ

থাকেও না। বিশিষ্ট ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী ভঙ্গিতে ছড়া শুরু হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, মধ্যাংশে, তা নিস্তেজ ও চমকবিহীন হয়ে পড়ে; হয়তো ছন্দান্তর তারই সূচক। ছন্দান্তর বলতে অবশ্য দুটি দিক: পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ্যে বড়ো বা ছোটো হয়ে যায়, ছোটোই হয় বেশি। যেখানে পঙ্‌ক্তি বড়ো হয়ে যায়, সেখানে সন্দেহের তেমন কিছু নেই; কিন্তু যেখানে ছোটো হয়ে যায়, সন্দেহ সেখানেই। সন্দেহ হল, ছড়াটির মধ্যে আর একটি ছড়া এসে জুটল না তো? কেননা, বহু সময়ে দেখা যায়, বাঙলা ছড়ার অন্তিম পর্ব বা পঙ্‌ক্তি আকারে গোটা ছড়ার অনুপাতে হ্রস্ব হয়ে থাকে। সুতরাং মধ্যাংশের হ্রস্ব পর্ব বা পঙ্‌ক্তি কিসের সূচক, তা একটি সন্দেহের বিষয়।

ছড়ার শেষাংশে ধ্বন্যাত্মক-অনুচর শব্দ, শব্দদ্বৈত ও পুনরুক্তির যে প্রাচুর্যের কথা বলেছি, সে সম্পর্কেও অতিরিক্ত দু-একটি কথা বলবার আছে। যে সব ছড়ার প্রারম্ভে বা মধ্যাংশে এই ধরণের শব্দের প্রয়োগ থাকে, সে সব ছড়ার শেষে এই ধরণের শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই পুনরায় প্রযুক্ত হয় না। এখানেও মধ্যাংশের একটি বিশিষ্টতা আছে,—মধ্যাংশে এই ধরণের শব্দাদি ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে কম। হয় প্রারম্ভে. নয় প্রান্তেই এই ধরণের শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং এক ক্ষেত্রে হলে সেই ছড়াতে, অপর ক্ষেত্রে পুনরায়, তা না হওয়াই একটি স্বাভাবিক নিয়ম।

ছড়ার মধ্যে আছে তিন পক্ষ: যিনি বক্তা বা আবৃত্তিকারক তিনি, যিনি শ্রোতা, আর অনুপস্থিত তৃতীয়পক্ষ,—প্রথম পুরুষের সর্বনাম শব্দদ্বারা যিনি উল্লিখিত। তাঁর প্রতি কখনোই প্রীতিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা হয় না। নেপথ্যবাসী এই 'প্রথমপুরুষ'-টির কর্মাবলীর ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখে অনেক ছড়া শেষ হয়।

ছড়ার অন্তিমাংশ সম্পর্কে ওপরে যে সব কথা বলা হল, এইবার সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টান্তগুলি নির্বাচিত। একই ছড়ার অন্তিমাংশ একাধিক বিষয়ের দৃষ্টান্ত হতে পারে, এই জন্যে একই ছড়ার নাম একাধিকবার উল্লেখ করা হল।

১. যে সব ছড়ার গোটাটাই একটি সঙ্গতি, শৃঙ্খলা, ভাবের পারম্পর্য-মূলকতা, অন্ত্যমিলের বাঁধনে বাঁধা অথবা একটি নিয়মে গাঁথা, সে সব ছড়ার অন্তিমাংশ পূর্বের থেকে আগত ধারার সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত থাকে। যেমন: ৩৭,

৩৯, ৪৫, ৬১, ৬২, ৬৯, ৭০ঘ, ছ, ৭৩ক, ৮৬, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ১৭০, ১৭৪, ১৯১, ২৯৫, ৩৫০, ৪৭৪, ৪৯৩ক, খ, ৫০২, ৫০৬।

২. যে সব ছড়ায় স্বাভাবিক, যুক্তিগ্রাহ্য, এবং ক্রমবিকাশের ফলজাত পরিণতি দেখা যায় : ৭৪ঘ, ৮৮, ৯১, ১০৫, ১০৬, ৩১৮, ৩২৮, ৪২১, ৪৩১, ৪৩২।

৩. দুই থেকে চারটি পর্বে বা পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ হয় যে সব ছড়া, তাতে শেষাংশ বলে ভিন্ন কোনো অংশ না থাকলেও, পরিণতির রীতি কিন্তু দীর্ঘতর ছড়ার মতোই। কাজেই সে সব পরিণতির দৃষ্টান্ত আলাদা করে দিলাম না। কিন্তু এই ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি ছড়ার গঠনরীতিগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি রীতি এই :

ক. ছড়াটির দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ তৃতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত বা পুনরুক্ত হয় এবং অতঃপর ওই শব্দটি কিংবা শব্দের ভাবানুষঙ্গটিকে ভিত্তি করে ছড়াটি প্রসারিত ও পরিণত হয় ; শেষে উক্ত ভাবটি সম্পর্কে কোনো টীকা-মন্তব্য করে ছড়াটি সমাপ্ত হয়। বড়ো বা মাঝারি আকারের ছড়াতেও এই রীতি অনুসৃত হয়, আগেই তা লক্ষ করে এসেছি। ছোটো আকারের ছড়াতে দ্বিতীয় পর্ব বা পঙ্‌ক্তির শব্দ ছাড়াও অনেক সময় প্রথম পর্ব বা পঙ্‌ক্তির এবং এমন কি, অন্য যে কোনো স্থানের শব্দ পরবর্তী পর্বে বা পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হতে পারে। এই রীতির মধ্যে সমাপ্তির ইঙ্গিতটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে অনুধাবন করা যায়। কাজেই মাঝারি বা তার চেয়ে বড়ো আকারের ছড়াতে যদি এই গঠনরীতির অনুসরণের ফলে একাধিক সমাপ্তির ইঙ্গিত থাকে, তবে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়, ছড়াটিতে একাধিক ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে। যাই হোক, এই রীতির উদাহরণ হল : ৯, ১৪, ১৯, ২১ক, ৭৫খ, ৯২/৭, ৯৪ক, ১১৯ (অংশত:), ১২১, ১৪৩, ১৫২, ১৭২, ২২৯, ২৮৩, ২৮৯, ২৯১ক, গ, ৩২২, ৩৫৬ (প্রথম দুই কথান্তরে) ; এ ছাড়া অন্যান্য অংশের শব্দের পুনরুল্লেখ : ১৪৪, ১৮৬ (প্রথম-দ্বিতীয়), ২৪৭ (প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয়-চতুর্থ), ১৭৭ (চতুর্থ-পঞ্চম পর্ব), ৪৩৬ (সবটাই)।

খ. তিন পর্বে বা অংশে যে ছড়া খণ্ডিত : ৮৭, ১১৭, ১২০, ১৩৭, ১৫২ (বসতে দেব, খেতে দেব, গেয়ে শোনাবো), ১৫৫, ১৮০, ২৪৩, ৪৬৪, ৪৯৪খ, ৪৯৮ক।

গ. পর-পর দুটি পর্ব, তারপর তার চেয়ে দীর্ঘ একটি পঙ্‌ক্তি : ১২০, ১৪৮ (এর ঠিক বিপরীত রীতি, ১৯৯), ১৬০, ১৮২, ২০৭, ২২৭, ২৯২, ৩৪২, ৪৪২

(পর-পর দুটি পর্ব, তৃতীয়টি আকারে-প্রকারে সেই তুলনায় বড়ো, শেষে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি)।

ঘ. পর্বই পঙ্‌ক্তি (একে পর্বাত্মক পঙ্‌ক্তি বলেছি) : ১১৩, ৩১৪, ৩২১।

ঙ. কেবল দুটি পর্বে ছড়াটি গড়া। এর একাধিক উদাহরণ মিলবে। কেবল একটির উল্লেখ করি : ১১৬।

চ. প্রথম পঙ্‌ক্তি আকারে ছোটো, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বড়ো : ১৭, ১১২, ১২৪, ২৪৪, ২৪৬ ('এত রাতে···শু' এক পঙ্‌ক্তি), ১৭৩ ('হামদের মহ··দিয়ে'া' এক পঙ্‌ক্তি), ৩৭০, ৩৯৮, ৪০০, ৪৩৭, ৪৪৫।

ছ. পয়ার, বা তজ্জাতীয় ছন্দে, শ্লোকধর্মী ছড়া। এর উদাহরণ বাঙলা ছড়ায় খুবই মেলে।

৪. ছড়ার শেষাংশ বলতে আমরা সাধারণ ক্ষেত্রে শেষ ও উনশেষ পর্ব ও পঙ্‌ক্তিকে বুঝিয়েছি। তবে অনেক ছড়ার শেষাংশের বিস্তৃতি তিন বা চার পর্ব বা পঙ্‌ক্তি জুড়ে হতে পারে। যেমন. ৬/৫, ২২, ২৪ক, ৫২, ৫৫খ, ৭০খ, ৭২ঘ, ৭৭, ২২৬, ২৩৩, ৩২৭, ৩৫১, ৩৫৪, ৪২১, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৫০, ৫০০ প্রভৃতি।

৫. ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্ব অনেক সময় সমদৈর্ঘ্যের ও সমমাত্রার একটি শ্লোক বা couplet (রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে 'দ্বিপদী' বলা যায়), বা এক জোড়া পয়ারে রূপ নিতে পারে : ৫, ৩৩, ৪৩, ১০৩, ১৭৭, ২০৯, ২১৫, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২২৯, ২৩৭, ২৫৪, ২৫৮, ২৬৮খ, ২৭০, ৩০৭, ৩১০, ৩১৭, ৩৪৩, ৪২২, ৪৪৬, ৫০০, ৫০৮, ৫১৪ ইত্যাদি।

৬. শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্ব ছড়ার পূর্ববর্তী অংশের তুলনায় অনেক সময় আকারে ও দৈর্ঘ্যে বড়ো হয় : ২২, ৫৭ (চার পঙ্‌ক্তি), ১২১, ১৪১, ১৪৩, ১৮৬, ১৯১, ১৯৪, ২২৬ ('পরের·· ঘর,' এই দুই পর্ব দুই পঙ্‌ক্তি), ২৩৫, ২৬৭, ৩০৬, ৩১৯, ৩৯৪, ৪০৮ ৪৯৫গ প্রভৃতি।

৭. তেমনি শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্ব ছড়ার পূর্ববর্তী অংশের তুলনায় অনেক সময় আকারে ও দৈর্ঘ্যে ছোটো হয়,—বড়োর চেয়ে ছোটোই হয় বেশি : ৯, ৩৬, ৬৯খ, ৭০ঙ, ৭৫ছ, ১৪৬ (পর্ব), ১৪৯ (পর্ব), ১৫০ (উনশেষ : আমার · গালি), ১৯৭ (পর্ব), ১৯৮ (পর্ব), ২০১, ২০৬, ২২১, ২২৫, ২৩৪ (পর্ব), ২৫৮, ৩১১, ৩২০ (শেষ চার পর্ব), ৩৩৫ (শেষ ক'টি পর্বই), ৪২২, ৫০০ (পর্ব), ৫০১, ৫০৮ প্রভৃতি।

৮. শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্বের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগ-সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ছড়াতেই তা থাকে (দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলির নাম করা যায় : ১৭৫, ১৯১, ২১০, ৪৫১)। কিন্তু অনেক সময় আবার সহজ যোগ থাকেও না। যেমন : ৪২, ১৯৬, ২১২, ৩৩৪ প্রভৃতি।

৯. এই শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্বের মধ্যে অনেক সময় উনশেষটি হ্রস্ব এবং শেষটি দীর্ঘ হয়, উনশেষই হ্রস্ব হয় বেশি : ১, ২, ৬/২, ১৪, ৬২, ৬৯ক, ৭০ছ, ১০৮ ('হাত ··খাইয়ো'), ১৬২, ১৬৫, ১৯০, ১৯৭ ('জোড় কইনা·· চড়ে', পর্ব), ২০০, ২১০, ২২৭, ২৩৩ (উনশেষ দুই পর্বে, পর্বগুলি পঙ্‌ক্তি), ২৩৬ (ঐ), ২৩৮, ২৪৫, ২৪৭, ২৬৬, ২৬৭, ৩২২ (উনশেষ পর্ব : 'চন্দ্রকোণায় দিল লাঠি'), ৩২৭ (উনশেষ ও প্রাগূনশেষ পর্ব ছোটো), ৩২৮, ৩৫৫, ৪০৩, ৪০৪ ৪১৬খ, ৪৩৩ (দুই পর্ব), ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৯৯ প্রভৃতি।

১০. তেমনি, এর বিপরীতে, উনশেষ পর্ব বা পঙ্‌ক্তি দীর্ঘ এবং শেষ পঙ্‌ক্তি হ্রস্ব হয় : ১৯, ২৪ক ('ছোটো · বসে'), ৪৭, ৭৪ঘ, ১২৩, ১৬৮, ১৭৯, ১৯৮ (পর্ব), ১৯৯, ২০৩, ২০৪, ৩৩৪, ৩৫৪, ৪৩৫, ৪৪৯ক, ৪৫৯ (পর্ব), ৪৬৩ (পর্ব), ৪৭১, ৫১৩ প্রভৃতি।

৫ থেকে ১০-সংখ্যক অনুচ্ছেদ পর্যন্ত শেষ ও উনশেষ পঙ্‌ক্তিব দৈর্ঘ্য সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য করা হল, সে ছাড়াও শেষের অন্যান্য গঠন-বৈচিত্র্য চোখে পড়ে :

ক. প্রথমাবধি ছড়াটির পঙ্‌ক্তি যে আকৃতিতে প্রদর্শিত হতে থাকে, প্রাগূনশেষ ও উনশেষ পঙ্‌ক্তিতে এসে সে পঙ্‌ক্তি-ধারা ব্যাহত হয়ে যায় ; পঙ্‌ক্তি তখন দুটি অংশে বা পর্বে খণ্ডিত হয়ে পড়ে দৃশ্যতঃই। এই ভাবে দুই অংশে বা পর্বে প্রাগূনশেষ বা উনশেষ খণ্ডিত হবাব পব, একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তিটি আবার সবার চেয়ে দীর্ঘ হয়। এই ভাবে একটি ছড়ার শেষাংশ তিন খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে। যেমন . ২৩৩, ২৩৬ [দ্রঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদের গ-অংশ]।

খ. শেষাংশ সমান তিন পর্বে বা খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে : ১৭২, ৪৯৪খ। [দ্রঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদের খ-অংশ]। তিন পর্বের প্রারম্ভও ছড়াতে দেখা যায়, যেমন, ১৯১।

গ. শেষাংশ কেবল সমান দুই পর্বে বা খণ্ডে বিভক্ত হতে পারে : ২৩৪ [দ্রঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদের ঙ-অংশ]।

১১. কখনো-কখনো শেষ পর্ব বা পঙ্‌ক্তিটি জোড়-বিহীন, একক, নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে : ৫৩, ১৬৪, ১৭১, ১৭২, ১৯৩, ২২৩, ২৬১, ২৬২, ২৮৫, ২৯৬, ৩০২, ৪৩১, ৪৩৮, ৫০৯থ প্রভৃতি। [এই রকম, ছড়ার প্রথম বা প্রারম্ভাংশেও বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি দেখা যায়, যেমন : ১৯১, ১৯২, ১৯৫ প্রভৃতি]।

১২. অনেক সময় ছড়ার প্রারম্ভিক, প্রথম বা মধ্যাংশের কোনো পঙ্‌ক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে, তাই পুনরুক্ত হয়ে শেষ পঙ্‌ক্তি হয়। ভাবের প্রকর্ষ এবং ছন্দ-রক্ষার জন্যে এটি ঘটে। যেমন : ৩৮, ১০৪, ১০৭, ১৪২, ১৯৬, ৩৩৬, ৩৬৯, ৪২৩, ৫১৭ প্রভৃতি।

এই পর্যন্ত যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তা ছড়ার শেষাংশের আকৃতি ও দৈর্ঘ্যকে অবলম্বন করে। এবার শেষাংশের প্রকৃতি, ভাবগত দিক এবং বাক্যগঠনের বিশেষত্বের মধ্যে তার প্রতিফলনের দিক সম্বন্ধে আলোচনা করছি ও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৩. শেষের সুস্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতা ব্যক্ত হয় যে সব ছড়ায় : ১, ৯, ১২, ২৯, ৮০, ৪১, ৪৪, ৫৪, ৬৪, ৯৮, ১২১, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ১৯২, ২০৯, ২১৯, ২২২, ২২৯, ৩০২, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৫৪, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৮১ প্রভৃতি।

১৪. যে সব ছড়া কোনো বিষয়ের বিবরণ-বিবৃতি দিয়ে শেষ হয়েছে : ২, ৮, ১৪, ২১থ, ২৪ ঘ, ৩০, ৪২, ৪৬, ৫৮, ৫৫থ, ৭০ঘ, ৭৮, ১৫৮, ১৭৯, ২০৩, ২১৪, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৭, ৩০৬, ৩১২, ৩১৮, ৩২০, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩০ক, ৩৪০, ৩৮৯, ৪০২, ৪১৯, ৪২১, ৪২৬, ৪৫০, ৪৫২, ৪৭৬, ৪৯৩থ, ৫০৫ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, যে কোনো ভাবেই ছড়া শেষ হোক না কেন, তার শেষের পঙ্‌ক্তি বা পর্বে এমন একটি ভাব প্রায় সর্বত্রই থাকে যে, ছড়াটি সম্পূর্ণ হবার পক্ষে কোনো সন্দেহই থাকে না। সে হিসেবে পৃথকভাবে শেষের সুস্পষ্টতা নির্দেশ করবার সার্থকতা নাও থাকতে পারে, তথাপি, যে ধরণের শেষগুলিকে কোনো বিশেষ ভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি, কেবল সেগুলিরই উল্লেখ ১৩ ও ১৪-সংখ্যক অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে করা হল।

১৫. কোনো দৃশ্য, ঘটনা ও পরিস্থিতির বর্ণনায় যে সব ছড়া শেষ হয়েছে : ৩১, ৫৪, ৬৫, ১৫৫, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৮, ১৯২, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৬, ২১০, ২১৫, ২১৭, ২২০, ২২২, ২৩০, ২৩৭, ২৫৫, ২৫৮, ২৮৩, ২৯৫, ৩০৩, ৩০৮, ৩১০, ৩১৭, ৩২২, ৩৩১, ৩৩৩ (ঢেঁকির দৃশ্য), ৩৫১, ৩৭১, ৩৯৫, ৪৯৯ প্রভৃতি।

১৬. কোনো বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম-কাজের বর্ণনায় অনেক ছড়া শেষ হয়েছে : ৩২, ৪০ (নৃত্য), ৬০, ৬৭, ৮৯, ৯৯, ১৪৩, ১৪৬, ১৬৯ (নাচা), ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৮, ১৯৯ (কর্মের নিরন্তরতা), ২০১, ২১০, ২১৬, ২৩০, ২৫৬, ২৫৮, ২৯৫, ৩১৭ (কান্না), ৩২২, ৩৩১, ৩৭৪, ৪৩০, ৪৪৭, ৪৬৬, ৪৮১, ৫১৩ (আসা) প্রভৃতি।

১৫ ও ১৬-সংখ্যক অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। কোনো কাজ করা বা ঘটাও তো একটি দৃশ্য,—সে হিসেবে এই দুই অনুচ্ছেদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকাই স্বাভাবিক। তবে,'মোটামুটি'ভাবে জড় ও অচেতন পদার্থকে অবলম্বন করে ঘটা ঘটনাকে ১৫-সংখ্যকে অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৭. অনুজ্ঞা-অনুরোধ-আদেশ দিয়ে বাঙলা ছড়া সব চেয়ে বেশি পরিমাণে শেষ করা হয়। এ বিষয়ে বর্তমান সঙ্কলনের এই ছড়াগুলো উল্লেখযোগ্য : ১১/৫, ১৯, ২৪ক, ২৮, ২৯, ৩৪, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৬৪, ৬৯ক-খ, ৭২ঘ, ৭৭, ৭৯, ৮০ক, ৮৭, ৯১, ১২১, ১৬৪, ১৯৪, ২১০, ২২৪, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৫, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৯, ৩১১, ৩৫৪, ৩৭২, ৪০৩, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৮, ৪৫৪, ৫০০, ৫১৪, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২২ ইত্যাদি।

১৮. প্রতিজ্ঞা, ভবিষ্যৎ কর্মের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে যে সব ছড়ার শেষে : ৯, ৭০ক, চ, ৭৬, ১৫২, ১৯২, ২২৮, ২২৯, ২৩৩, ৩২৭, ৩৩৯, ৪৩৩ প্রভৃতি।

১৯. কোনো জিজ্ঞাসা, কেবল প্রশ্ন বা উত্তর, অথবা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে শেষ হয়েছে যে সব ছড়া : ১১/২, ৪৭, ৬৪, ৭০ঘ (প্রশ্ন, উত্তর), ৭৫ঙ (ঐ), ৮১খ, ১৭৫ (প্রশ্ন, উত্তর), ২৩২, ২৪২, ২৭০, ২৬৯, ২৭২, ২৮০, ৩০৫ (প্রশ্ন, উত্তর), ৩১৯, ৪০০, ৪২১ (প্রশ্ন, উত্তর), ৪২৯, ৪৭০খ, ৪৯৭খ (প্রশ্ন, উত্তর), ৫০৭, ৫২৩ প্রভৃতি।

২০. ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা-খেদ-বিস্ময়-উল্লাস-স্বগতোক্তিমূলক শেষ : ১, ৩খ-গ, ৫, ২১ক, ৭৪ঘ, ৮৮, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৩৭খ, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৭৩, ৪১৩/৫, ৪২৩, ৪৩৪ প্রভৃতি।

২১. রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক : ১১/৩, ১৮৪, ২০৩, ৩০৩, ৩৭৫ক-খ, ৩৭৬খ-গ, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৪০৭, ৪০৮, ৪২৩, ৪২৯ প্রভৃতি।

২২. কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা চরিত্র, অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি (প্রথম পুরুষে উল্লিখিত) সম্পর্কে মন্তব্য, ব্যঙ্গোক্তি : ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ২১৩, ৪৪৩ প্রভৃতি।

২৩. সমালোচনা-মূলক টীকা-মন্তব্য : ৩০৬, ৩২৪, ৩৮০, ৪০৪, ৪০৬, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭ প্রভৃতি।

২১, ২২ ও ২৩-সংখ্যক অনুচ্ছেদের উদাহরণগুলির মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প। মূলতঃ এই তিনটি অনুচ্ছেদের বিষয় এক।

২৪. নিষেধমূলক বাক্য, নঞর্থকতা, এবং 'না'-এর বিভিন্ন অর্থদ্যোতক ভাব দিয়ে শেষ-হওয়া ছড়া : ৯, ৬০খ, ৭২ক, ১৭৫, ৩৩৯, ৩৭৪, ৪৭৬ প্রভৃতি।

২৫. ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ : ১২, ৩১, ৪২, ৯৯, ১০৭, ১২৩, ১৪৬, ১৬৯, ১৭০, ১৯৫, ২০০, ২০২ (পাদটীকা), ২০৪, ২১৫, ২৩২, ২৩৮, ২৪৮, ২৭২, ৩১৭, ৩৩১, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪৫, ৫০৭ প্রভৃতি।

২৬. শব্দদ্বৈত (একই শব্দের দ্বিরাবৃত্তি) : ১৯, ৭৪ঘ, ৮৭, ৮৯, ৯৮, ১৭০, ১৯৯, ২০০, ২৩৪, ২৪৫, ৩৯৪, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৪০ প্রভৃতি।

২৭. সহচর-অনুচর-প্রতিচর শব্দ : ৪, ২৮, ৩৬, ৫৪, ৬০, ৭০ক, ৭৬, ৭৯, ৮৮, ১২১, ১৪০, ১৬৯, ১৯৩, ১৯৭, ২০০, ২০১, ২১৭, ৩৫৪, ৪২২, ৪৩৯, ৫০০, ৫০৯ঘ, ৫১৩, ৫২২ প্রভৃতি।

২৮. অন্যান্য বিচিত্র ধরণের পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তি ৮/৪, ৪৭, ৫২, ৬৬, ৬৮, ৬৯ক, ৭১/৬, ১৩৮, ১৪৩, ১৮৪, ২১১, ২১৭, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৯, ৩৬৯, ৪৫১ প্রভৃতি।

পরিশেষে, ছড়ার শেষাংশের আবৃত্তি ও উচ্চারণের বিশেষত্বটিও লক্ষণীয়। ছড়ার শেষাংশে যে বিশেষ-বিশেষ মনোভঙ্গি (যেমন, টীকা-মন্তব্য, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা, রঙ্গ-কৌতুক, প্রশ্নোত্তর, নিষেধ ইত্যাদি) ব্যক্ত হয়, স্বাভাবিক-ভাবেই সে জন্য উচ্চারণে ভাবানুযায়ী Musical Accent বা Intonation এসে পড়ে। ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত এবং অন্যান্য পুনরাবৃত্তিও এই Intonation-কে পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে। Stress Accent সাধারণতঃ পর্বের প্রথমে পড়ে থাকে, কিন্তু Pitch Accent বা Intonation আসে পঙ্‌ক্তির বা পর্বের শেষে। পঙ্‌ক্তির বা পর্বের শেষ শব্দের উপধা স্বরে এই ব্যাপার ঘটে। লক্ষ করে দেখা গেছে, শেষ পঙ্‌ক্তির বদলে উনশেষ পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দে (বা শেষ শব্দের উপধা স্বরে) একটি দীর্ঘায়ত স্বর বা সুর লাগে। এই সুর বা স্বর কিছুটা ছন্দের কারণে,—কারণ বাঙলা ছড়ার উনশেষ পঙ্‌ক্তি অনেক সময় শেষ পঙ্‌ক্তির তুলনায় আকারে হ্রস্ব হয়ে থাকে, দুই বা একমাত্রা বেশি টেনে সেই হ্রস্বতার পূরণ করা হয়। কিন্তু সর্বত্রই আবার উনশেষ পঙ্‌ক্তি

আকৃতিতে হ্রস্ব নয়, বরং উল্টো ব্যাপার, শেষের তুলনায় আকৃতিতে দীর্ঘতর। আশ্চর্যের কথা, সে ক্ষেত্রেও উনশেষের শেষ শব্দ বা তার উপধা স্বরে সুর লাগে। এই সুরকেই আমরা আসন্ন শেষের প্রত্যক্ষ সূচনা বলতে পারি।

ছড়ার একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তিটির উচ্চারণেও আছে বিশেষত্ব : উনশেষের তুলনায় তা নীচু স্বরগ্রামে এবং লয়ের দিক থেকে সাধারণ কথাবার্তার লয়টি সেখানে গৃহীত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পঙ্‌ক্তি বা পর্বের উচ্চারণে স্বরগ্রামের অবনয়ন ঘটে। যেমন, উনশেষ পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ বা কোনো অংশ যদি তারাগ্রামে উচ্চারিত হয়, শেষ পঙ্‌ক্তির উচ্চাবণ তবে মুদারায় নেমে আসে , তেমনি, উনশেষ মুদারায় উচ্চারিত হলে শেষ পঙ্‌ক্তি উদারায় নেমে যায়। উচ্চারণের ভঙ্গিতে গদ্যাত্মকতা আসে। ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বা পর্বেব উচ্চাবণ বিশিষ্টতা কিছু পরিমাণে ওই পঙ্‌ক্তি বা পর্বের শব্দচয়নেব সঙ্গে জড়িত ॥

...৮ .

ছড়া সমীক্ষার ক্ষেত্রে আর দুটি বিষয় হল : 'সংমিশ্রণ' ও 'কথান্তর'। ছড়াব রূপগঠনের সঙ্গেও এ দুটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এই সব কারণেই বিষয় দুটি সচেতনতার সঙ্গে আলোচ্য।

একই ছড়ার মধ্যে অপর এক বা একাধিক ছড়ার অল্পাধিক পরিমাণে মিলে-মিশে যাওয়াকে 'সংমিশ্রণ' বা কেবল 'মিশ্রণ' বলছি।

সংমিশ্রণ ঘটাব প্রথম ও সহজ কাবণ স্মৃতির দুর্বলতা, অর্থগত বোধের অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি। কিন্তু ব্যাপারটিকে এত সহজভাবে মেনে নেওয়াও অনুচিত। আমাদের মতে লোকমানসের কয়েকটি বিচিত্র বিশেষত্ব এর পেছনে ক্রিয়াশীল। কোনো বিশেষ শব্দেব সঙ্গে অন্ত্যমিল রূপে বিশেষ কোনো শব্দ তাদের মনে গাঁথা থাকে। একটি শব্দ ব্যবহৃত হলেই অপরিহার্য বা অপ্রতিরোধ্য নিয়মে আর একটি শব্দ তারই টানে-টানে এসে উপস্থিত হয়। তেমনি এক-একটি ভাব বা প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ নিয়ে। একটি এলেই আর একটিও স্বতঃই এসে পড়ে। কতকগুলি পঙ্‌ক্তি, বাক্য ও বাক্যাংশ লোকমানসের সাধারণ সম্পত্তি, একটি ভূভাগের (এখানে বাঙলা দেশের) সব অঞ্চলের লোকসাহিত্যেরই উপকরণ, যে কোনো প্রয়োজনেই সেগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে সংমিশ্রণের পথও

অবারিত নয়। গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে কয়েকটি চিরাচরিত মূল্যবোধও এক ছড়াকে অপর ছড়ার কাছকাছি এনে ফেলে, মিশ্রণ এরও ফলে ঘটে। এ পর্যন্ত মিশ্রণের যে সব কারণ বলা হল, সেগুলো যেন আপনা থেকেই, প্রায় অজ্ঞাতেই, নিতান্ত নৈসর্গিক ও স্বাভাবিকভাবে ঘটে যায়। কিন্তু আর এক ধরণের সংমিশ্রণ আছে, সেগুলোর পেছনে একটি অর্ধস্ফুট চেতনা কাজ করে। যেমন, 'সংমিশ্রিত প্রতীক'। এক-একটি বিষয় থাকলেই অপর কতকগুলি বিষয় থাকবেই, এবং সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড ভাবকে পরিস্ফুট করবার প্রয়াস সেখানে দেখা যায়।

একটি ছড়ার মধ্যে অর্থের অসঙ্গতি ও সংলগ্নতার অভাব দেখলেই তৎক্ষণাৎ মনে হবে, সে ক্ষেত্রে বুঝি বিনা কারণেই অপর ছড়ার অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। ছড়ার শেষাংশের কতকগুলি ভাষা ও ভঙ্গিগত বিশেষত্ব আছে, এবং এমন কি, উচ্চারণে ও আবৃত্তিতেও তা ধরা পড়ে। যদি একটি ছড়ার মধ্যে অর্থগত আপাত-অসংলগ্নতার সঙ্গে শেষ-বাচক উক্ত বিশেষত্বগুলিকেও একাধিক-বার উপস্থিত থাকতে দেখা যায়, তবে অবধারিত নিয়মে বোঝা যাবে, ওই ছড়াতে একাধিক ছড়া মিলিত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, একাধিক ছড়ার সম্মিলন ঘটলেও, এমন কি তার ফলে অর্থের আপাত-বিপর্যয় ঘটলেও, ছড়ার মধ্যে ওই সংমিশ্রণটি এমন এক নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় ঘটে যে, প্রকৃতপক্ষে ছড়ার অখণ্ডত্বের রসটুকু প্রায় অক্ষতই থাকে! 'নৈসর্গিক প্রক্রিয়া'টিই এর মধ্যে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। লোকমনস্তত্বের মধ্যেই এই নৈসর্গিকতার বীজটি নিহিত আছে।

এই সঙ্কলনে ধৃত কয়েকটি ছড়ার সংমিশ্রণকে এবার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিচার করা যেতে পারে। যেমন, ৪ ও ২৪ক-সংখ্যক ছড়া দুটিতে 'শুসনি কলমি··· রূপারথিল' ইত্যাদি অংশ অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে গোটা ছড়ার সঙ্গে মেলে না, অন্ত ছড়ার অংশরূপে এটি এই অংশে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে এটিকে অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, এর পেছনে অন্ত কারণ আছে। পঙ্‌ক্তি চারটির অন্তর্নিহিত ভাব এই: একটি বিলের জল শুকিয়ে এসেছে, বিভিন্ন শাকের গাছ তাতে পুষ্ট হয়ে জন্মেছে; জলময় স্থানে পাখি এসে বসেছে; রাজার বেটা সেই পাখি শিকার করছে। পাখির সঙ্গে ধনদৌলতের এবং জলের আসঙ্গ বহু স্থানেই লক্ষ করি; শাকের গাছের পুষ্ট রূপও প্রাচুর্যের ইঙ্গিতবাহী। 'রাজপুত্র' থাকাতে ঐশ্বর্য-

প্রাচুর্য আরো স্পষ্ট, 'সোনা-রূপো'র উল্লেখে তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। সুতরাং সমস্ত ছবিটি একটি প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যের ছবি। যে ছড়া দুটিতে এটি গ্রথিত হয়েছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে ব্রতানুষ্ঠানের ফলে গৃহস্থের প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যের কল্পনা করা হয়েছে; তারই সঙ্গে এটি গ্রথিত। অতএব, হোক এ অংশ অন্য ছড়ার অংশ বা একটি গোটা ছড়া, তথাপি এই সংমিশ্রণকে গভীরভাবে বিচার করলে সঙ্গতিমূলক বলেই মনে হয়,—যার ফলে রূপ ও গঠনের দিক থেকেও ছড়াটিকে দোষগ্রস্ত বলা যায় না।

৩৩-সংখ্যক ছড়ার শেষাংশও তেমনি বাহ্যতঃ অপর ছড়া হলেও আন্তর দিক থেকে কিন্তু সঙ্গতিমূলক। কুলগাছের যাদুশক্তির ফলে সতীনের মুখ পুড়ল, তুষলা দেবীর 'নব-কৌটো'র মধ্যে রামসীতা পাশা খেলছেন। পাশা খেলা মানে ধনকড়ি সংগ্রহ করা; তাই দিয়ে 'কপিলা' গাই কেনা, গাই থেকে ঘাস, ঘাস থেকে দ্বীপ, দ্বীপ থেকে সাগর, সাগর থেকে লক্ষ্মীরূপা মৎস্য অবতার এবং তাঁর কাছে ধন-পুত্রের বর চাওয়া। পূর্বের আলোচনায় যাকে communication বলেছি, তার চমৎকার নিদর্শন এটি। কোনোই অসঙ্গতি নেই। ৩৬-সংখ্যক ছড়ার 'গেয়ের গোবর সরষের ফুল' ইত্যাদি অংশকে এইভাবে সামঞ্জস্যময় বলা যায়: তুষুকে আদর-যত্ন করে ঘরে আবাহন করা হল; তারই ফলে গোধন ও সর্ষের প্রাচুর্য, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে শান্তি এল।

৫৪-সংখ্যক ছড়ার 'ছিকা লড়ে ছিকা চড়ে' ইত্যাদি অংশ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভিন্ন একটি ছড়া, তার প্রমাণ ওই অংশ ৪৭-সংখ্যক ছড়া রূপেও পাওয়া গেছে। স্বভাবতঃই এর ফলে ৫৪-সংখ্যক ছড়ার অর্থগত সঙ্গতি হারিয়ে গেল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এইভাবে এর ব্যাখ্যা করি, তবে আর তা মনে হয় না: পাখি (চড়ুই ও ঘুঘু)-কে এখানে ধন-দৌলতের প্রতীক বলে মনে করা হয়েছে; গাই তো এমনিতেই 'গোধন' রূপে কল্পিত। যারা ছড়া গেয়ে চাঁদা চাইতে এসেছে, তারা গৃহস্থকে খোশামোদ করছে: যেন বেশি পরিমাণে চাঁদা দেবার ফলে তার ঐশ্বর্যের বিস্তার ঘটেছে, বড়ো বড়ো রাজাও তার গৃহে খেতে এসেছে। চাষীর চেয়ে বণিকের টাকা বেশি; অতঃপর সেই সূত্রেই বণিকের কথা উঠেছে। চাঁদা দেবার ফল স্বরূপ 'শিকে'র থেকে টাকা ঝরে পড়ছে, এবং তাই দিয়ে ধনের প্রতীক গোরু কেনা হল।

৫৫-সংখ্যক ছড়ার ক ও খ-অংশ পরস্পরের পরিপূরক: চাঁদা দেবার ফল হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে সুন্দর একটি বাসঘরের।

১২৩-সংখ্যক ছড়াটি দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে, এর ভেতর দুটি ছড়ার মিশ্রণ হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এর আগাগোড়াই সঙ্গতিমূলক। আমাদের ব্যাখ্যা এই : রোদকে স্ত্রীলোক বলে মনে করা হচ্ছে, চাঁদকেও তাই। স্ত্রীলোকের ব্যাপার বলেই একটি গার্হস্থ্য চিত্র এঁকে তাকেই যাদুধর্মী অনুষ্ঠান রূপে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হয়, চন্দ্র-সূর্য এখানে দুই সতীন। দুই সতীনের কলহের ফলে এখানে রোদ উঠেছে। যে ব্যঞ্জন রাঁধা হয়েছিল, বেড়ালে তা খেয়ে গেল। বউয়ের মা (সম্ভবতঃ 'বইদানী'র মা) তার বদলে এনে দিল ভুট্টা বা কাঁচাকলা। অপর কথান্তরে বউয়ের বাপ এনে দিল চিংড়ি মাছ। এই অপরাধে এক সতীন প্রহৃত হল, অপর সতীন খুশি হল। তার ফলে রোদ উঠল,—এতই রোদ উঠল যে মামাকে ছাতা নিয়ে পথ হাঁটতে হল। কলহের ফলে রোদ ওঠা কেন ? প্রহারের ফলেই বা রোদ উঠল কেন ? এইখানে কয়েকটি লোকবিশ্বাসকে ভিত্তি করতে হবে। বর্ধমান জেলাতে খুব খরা হলে এবং বৃষ্টি না হলে ধর্মঠাকুরের শিলাময় প্রতীকটিকে রোদে ফেলে এবং বেত্রাঘাত করে কষ্ট দেওয়া হয়,—এরই ফলে বৃষ্টি হবে এই ধারণায়। তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া বর্তমান ছড়াতে দেখা গেছে। পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, কেউ কারো প্রতি রাগারাগি করলে বা গালাগালি দিলে (একজন্যে ইচ্ছে করেই ঝগড়ার সৃষ্টি করা হয়) মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ওঠে, দুই সতীনের কলহে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। চাঁদার মাকে 'পুতানী' বলে গালি দেওয়াতেই এই কলহ। 'পুতানী' মানে 'পুতখাগী', যে নারীর পুত্র হয়ে মরে যায় বা যে মৃতবৎসা। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই ছড়াকে আর অসংলগ্ন বলে মনে হবে না।

১৬৯-সংখ্যক ছড়ার শেষাংশ সম্পর্কেও অনুরূপ সন্দেহ জাগতে পারে। ছয় কুড়ি ছেলে নিয়ে 'হাড়গোরলে'র মা গান শুনতে গেছে। 'হাড়গোরলে'র মাই 'গাজর' মা। সে নদীর পরপারে নৌকো করে গান শুনতে গেছে।

১৯৯-সংখ্যক ছড়ার তিনটি খণ্ড আছে, এবং বাহ্যতঃ এই তিন খণ্ডের মধ্যে সঙ্গতিসূত্রটি স্পষ্ট নয়। গোরু চরাবার সময় একটি গোরু পাল থেকে হারিয়ে যাবার দরুণ রাখাল-বালকের রাগ হল, মা-বাপ সবাই তাকে ফেরবার জন্যে অনুরোধ করল। অনুজ্ঞা দিয়ে অনেক ছড়া শেষ হয়, এবং বক্তব্যের পূর্ণতা থেকে মনে হয়, এখানেই বুঝি ছড়াটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'মাও গেইছে হাট…' ইত্যাদি অংশ থেকে যে আর একটি ছড়া এসে ঢুকে পড়েছে, কথান্তর

থেকে তা অনুমান করা যায়, কেননা, কথান্তরে ছড়াটি এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কেন এই অংশ অপর ছড়াতে এসে যুক্ত হল ? ক্রুদ্ধ রাখাল-বালককে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, তার মা-বাপ হাটের থেকে তার জন্যে উপহার নিয়ে আসবে। এই কারণেই প্রথম অংশের সঙ্গে এটি যুক্ত হল। মিলের টানে শব্দ এসে ছড়ার দেহ গঠন করে, অতএব, 'হাট' থেকে এল 'খাট' এবং 'খাট' থেকে ফের এল 'হাট'। খাটে যখন 'চড়া'র কথা বলা হয়, খাট হয় তখন পাল্কী। ছড়াটির তৃতীয়াংশ বা শেষাংশ কিন্তু রাখাল-বালককে উদ্দেশ করে কথিত নয়, এটি যিনি ছড়ার কথক (এখানে মহিলা-কথক) তাঁরই স্বগতোক্তি। এই মহিলা-কথক রাখাল-বালকের ঠাকুরমা বা দিদিমা, ঠাকুরমা হওয়াই সম্ভব। শেষাংশের বক্তব্যটুকুর প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে হলে আলোচ্য ছড়াটির আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে হবে। যে অঞ্চল থেকে ছড়াটি সংগৃহীত, সেই অঞ্চলের ঘুম-পাড়ানী ও ছেলে-ভুলোনো ছড়ার একটি বিশেষত্ব হল : ঠাকুরমা-দিদিমা এবং মায়ের প্রেম ও অবৈধপ্রেমকেও অম্লান বদনে স্থান দেওয়া হয়—শিশু বা বালকের উদ্দেশে কথিত ছড়াতে। 'পাইকার' অর্থাৎ 'হোল্‌সেলার'কে খুব বিত্তবান ব্যক্তি বলে আলোচ্য অঞ্চলে মনে করা হয়, এবং প্রেমের গানের নায়ক রূপে 'পাইকার' একটি পরিচিত চরিত্র এখানে। পান-সুপুরি আদান-প্রদান লোকসমাজে মন দেওয়া-নেওয়ার প্রতীক বলে গৃহীত হয়। এই আলোকে বিচার করলে এর অর্থ দাঁড়াবে : বৃন্দাবনের কল্পিত হাটে যে পাইকার অবৈধ প্রেমিকরূপে এসেছে, সে বৃদ্ধ, তাকে মহিলা-কথকের তাই পছন্দ হয় না। বয়স্ক মানুষের মনোভাব আলোচ্য অঞ্চলে ছড়াতে প্রক্ষিপ্ত হবার প্রথা থাকবার দরুণই এই ব্যাপার ঘটেছে। বাঙলা ছড়ার কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটি নির্দেশ করেছি (অর্থাৎ পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দে পরিণত হয়), তা এখানে কি ভাবে কার্যকরী হয়েছে, সেটাও লক্ষ করবার।

১৯২-সংখ্যক ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থগত সঙ্গতি সহসা মেলে না। তা কিন্তু পাওয়া যায় এইভাবে : তারার মায়ের নাম 'মোতিহারা'। সে তার ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে জল আনতে গেল, পায়ে বিঁধল কাঁটা,—সে কাঁটা যেন সতিনীর প্রখর বাক্য। ওপরে বলেছি, আলোচ্য অঞ্চলের বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ছড়াতে সঞ্চারিত হয়, এটিতেও তাই। কাঁটার মতো যন্ত্রণাদায়ক সতিনীকে মন্ত্রঃপূত ফুলের 'বাণ' মেরে নিহত

করবার কথা এটিতে ব্যক্ত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, এইভাবে 'বাণ' মেরে শত্রুকে নিহত করবার জন্যে ওঝাদের নিয়োগ করা আলোচ্য অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে।

১৯৯-সংখ্যক ছড়ার মধ্যে তিনটি অংশ বা ছড়া আছে এবং তার ফলে এটির গঠনে কিছু অসংলগ্নতা এসেছে বলে মনে হতে পারে। বাঁশের পাতায় করে মামা নাড়ু আনছে দেখে জড় বস্তু উদুখলটি নড়ে উঠল—এই পর্যন্ত একটি ছড়া। অন্ত্যমিলের বাঁধনেও এই অংশের অখণ্ডতা ও সংহতি ব্যক্ত হয়েছে। তার পরের দুই পঙ্‌ক্তি একটি স্বতন্ত্র অংশ বা ছড়া। প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশ যুক্ত হল কেন? নাড়ু পাবার আনন্দে ভাগ্নের নাচনকে ব্যক্ত করবার জন্যে 'তড়পিয়া' শব্দের অনুষঙ্গে 'তা-তুর্-তুর্-তুরা' ইত্যাদি দ্বিতীয় অংশ এসে গেছে,—আমাদেরই নির্ধারিত সূত্র অনুসারে। তারপর অপর সূত্র অনুসারে (শেষ শব্দ প্রথম শব্দ হওয়া) 'বুড়া গেইল্ বাইগন বাড়ী' ইত্যাদি তৃতীয় অংশ এতে এসে পড়েছে। এটি যে স্পষ্টই ভিন্ন একটি ছড়া, পর্বের বিন্যাস ও ছন্দান্তর থেকেই তা বোঝা যাবে। তিনটি ছড়া এতে যুক্ত হলেও (যুক্ত হবার কারণ আগেই বলেছি) কিন্তু গঠনগত অখণ্ডতা খোয়া যায় নি। ছড়া শেষ হবার যে সব সূত্র নির্দেশ করেছি, তার মধ্যে একটি হল: কোনো দৃশ্য বা ঘটনার নিরবচ্ছিন্নতা ও প্রবহমানতা। 'তড়পিয়া উঠেছে', 'খাবার ধরে' প্রভৃতিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

১৯২ ও ২০৪-সংখ্যক ছড়া দুটির প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি প্রায় একই, অথচ দুটি মিলেছে বাঙলার দুই ভিন্ন অঞ্চল থেকে। এতেই প্রমাণিত হয়, কতকগুলি শব্দ, পঙ্‌ক্তি বা স্তবক সারা বাঙলা দেশেরই লোকসাহিত্যের সাধারণ সম্পত্তি এবং কেবল এক বিষয়েই (যেমন, ছড়া) সেগুলি প্রযুক্ত হয় না, অন্যান্য বিষয়েও (যেমন, কথা, ধাঁধা, গান ইত্যাদি) সেগুলি ব্যবহৃত হয়। অপর দিকে মনে হয়, একই রচনার মধ্যে ভিন্ন রচনার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

আলোচ্য দুটি ছড়ার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি প্রায় একই বটে, কিন্তু ঈষৎ ভিন্নও বটে। প্রথমটিতে 'তারার মাও মোতিহারা' কিন্তু দ্বিতীয়টিতে 'তারার ভাই বাগমারা'। প্রথমটিতে নারীর আসঙ্গ আছে বলেই নারীজীবনকে ভিত্তি করে ছড়াটির দেহ নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয়টির 'বাগ মারা' হল 'বাঘ-মারা', অর্থাৎ যে বাঘ মারে। এই বাঘের সংস্পর্শে এসেছে টাট্টু ঘোড়া, অতঃপর টাট্টু ঘোড়ায় চেপে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার কথা। ছড়ার গঠনের যে সব সূত্র আমরা নির্দেশ করেছি, যেমন, স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া—সেই যাওয়ার পরম্পরা

নির্দেশ, এবং পূর্ববর্তী স্থানের সঙ্গে পরবর্তী স্থানের সংযোগ উল্লেখ ('সেই হুঁকু', 'সেই মুড়ি' প্রভৃতিতে 'সেই' সংযোগসাধন করেছে), পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত হওয়া, শেষ পঙ্‌ক্তিতে কোনো ধ্বনি বা দৃশ্যের অবতারণা করা,—এ সবই ছড়াটিতে মেলে। অতএব, প্রথম পঙ্‌ক্তি অন্য ছড়া থেকে এসে এতে সংমিশ্রিত হলেও গঠনের দিক থেকে অসংলগ্নতা অনুভব করা যায় না।

২০৫ এবং ৫১৯-সংখ্যক ছড়া দুটি আসলে একই, রোদ তোলা নিয়ে দুটিই রচিত। প্রসঙ্গ বিচার করলে ৩২৮ এবং ৩৩১-সংখ্যক ছড়া দুটির নামও এই সঙ্গে করতে হয়। এই চারটি ছড়াই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, অথচ আশ্চর্যের কথা, প্রত্যেকটিই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য, সংলগ্নতা ও সংহতি বজায় রেখেছে। এই চারটি ছড়ার সাধারণ প্রসঙ্গগুলি এই : শাশুড়ী, পুত্রবধূ, তরকারী কোটা, দুপুর বেলায় বউ পালানো, ছাগল, খেঁকশিয়াল, দাঁড়াস সাপ, কলাগাছ, ইত্যাদি। আগেই বলেছি, কতকগুলি বিষয় বা প্রসঙ্গের সঙ্গে লোকমানসে অন্য কতকগুলি বিষয় বা প্রসঙ্গ জোড়া বা জুটি হিসেবে গাঁথা থাকে ; শাশুড়ী-পুত্রবধূর প্রসঙ্গ ধরে সহজেই তাই রান্না-বান্না ও ঘর-কন্নার কথাবার্তা এসে গেছে। ৩২৮-সংখ্যক ছড়ায় তারই সহজ ও প্রত্যাশিত চিত্র প্রদত্ত হয়েছে। বাঙলা ছড়ায় বধূ ও বিয়ে থাকলে একটি ফলের নাম থাকবেই, বেগুন এখানে সেই ভূমিকা নিয়েছে ; বধূর উল্লেখ থাকলে যৌনতার প্রতীক রূপে সাপ থাকে, অতএব একই বিষয় ৩৩১-সংখ্যক ছড়ায় পেল ভিন্ন পরিণতি। গোরু, ছাগল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি মানবেতর প্রাণী এবং দূর্বা, শাক ও কলাগাছের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতে ভোর বেলায় সূর্যকে জাগাবার জন্যে দূর্বার গুচ্ছ দিয়ে দীঘির জল নাড়তে-নাড়তে ছড়া বলা হয়। সুতরাং সূর্যের প্রসঙ্গে বর্তমান ক্ষেত্রে দূর্বার ভূমিকা বোঝা যায়। রোদের সঙ্গে বৃষ্টি হলে বলা হয়, খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে। তাহলে সূর্যকে খেঁকশিয়ালের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। রোদ ওঠে নি, তাই কাঠ জ্বেলে উত্তাপ সংগ্রহ করা হচ্ছে। দেশে-গাঁয়ে বুড়ীরাই কাঠ সংগ্রহ করে। এই আগুন থেকেই বন পুড়ে ছাই হবার কথা বলা হয়েছে। আগুন না থাকবার জন্যে শীতে বুড়ীর কাতর হওয়া। ছাগলের উল্লেখের দুটি কারণ : দেশে-গাঁয়ে বুড়ীরা যেমন কাঠ কুড়োয়, তেমনি ছাগলও চরায়, মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যেও তার পরিচয় আছে। দ্বিতীয়তঃ, সূর্যকে উপহার

হিসেবে ছাগ প্রদানের কথা। নানা প্রসঙ্গ এবং একাধিক ছড়ার পটভূমিকার মাধ্যমে এইভাবে ছড়ার সংহতিকে অনুধাবন করা যায়।

২০৭-সংখ্যক ছড়াটির সংলগ্নতাও সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে। একেও বুঝতে হবে একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে : লোকবিশ্বাস, ছড়ার গঠনরীতির বিশেষ সূত্র (আমাদেরই নির্ধারিত) প্রভৃতি দিয়ে। আপাত-অসংলগ্ন পঙ্‌ক্তিগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ এই : বিয়ে করে বড়ো ভাই চাকরির জন্যে বিদেশে গেছে : প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তার ননদিনী। বধূর নাম ময়না বিবি। ময়না বিবির ননদিনীর ইচ্ছাবোধক উক্তিই হল ছড়াটি। সে বলে : ডালিম গাছে যখন হাঁড়িচাচা পাখি ডাকছে, নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে দাদা তবে আসবে, কেননা এ পাখি ডাকলে বাড়িতে স্বজনের আগমন ঘটে। 'দাদার গলায় চাঁদাই কোণা' এবং 'দাদা তোমার খেলা কবি' দুটি অংশ ভিন্ন ছড়া, কিন্তু দাদা ও বউয়ের প্রসঙ্গ পূর্ব থেকেই থাকাতেই এই পঙ্‌ক্তি মিলে গেছে, অথবা, কথয়িত্রীর অবচেতনায় এই পঙ্‌ক্তি স্মৃতিরূপে ছিল, প্রসঙ্গের টানে তা এসে পড়েছে। তার পরের পঙ্‌ক্তি এসেছে এই সূত্র ধরে : পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শব্দ বাঙলা ছড়ায় পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হয়—এই রীতির ফল রূপে। অতঃপর বধূর করুণ চিত্র এবং শেষ পঙ্‌ক্তিতে দাদাকেই চলে আসতে বলা : বাঙলা ছড়া শেষ করবার একটি সূত্র—অনুজ্ঞা প্রকাশ করা, তাই এখানে পরিশেষে কার্যকরী হয়েছে।

২১৪-সংখ্যক ছড়াটিকেও পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে গেলে একদিকে সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, অপরদিকে ছড়ার গঠনের সূত্রকে প্রয়োগ করতে হবে। বাঙলার স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'সই পাতানো'র রীতি প্রচলিত আছে। সখীরা পরস্পরকে 'পাতানো' নাম ধরে ডাকে। আলোচ্য ছড়ায় এক সখী অপর সখীকে 'তেঁতুলপাতা' নাম ধরে ডেকে তার বিয়ের খবর নিচ্ছে। ছড়ার এটুকু সাংস্কৃতিক দিক। পরবর্তী অংশে ছড়ার কাঠামোর সূত্র অনুসৃত হয়েছে : বাঙলা ছড়া বহুক্ষেত্রে দু'জনের সংলাপ হয়, এটিও তাই, সখীর প্রশ্নের জবাবে অপর সখী তার মনোভাব ব্যক্ত করছে : সখীর সাহচর্য ছেড়ে স্বামীর সাহচর্য তার কাছে কাঁটাওলা বাবলা পাতার মতো।

২২৬-সংখ্যক ছড়ার সংলগ্নতা অনুধাবনের জন্যে তেমনি একদিকে মনস্তাত্ত্বিকতা এবং অপর দিকে ছড়া-গঠনের সূত্রকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। আগেই বলেছি, কতকগুলি প্রসঙ্গ লোকমানসে পরম্পরা ধরে গাঁথা থাকে ;

সেই শৃঙ্খলা বা পরম্পরার কোনো একটি অংশ মাত্র হয়তো উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়,—কিন্তু লোকমানস যখন সেই পরম্পরাকে গ্রহণ করে, তখন কেবল প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক অংশটুকুকেই মাত্র গ্রহণ করে না,—নিঃশেষে সবটাই নেয়, ফলে ছড়ায় অসংলগ্নতা ঘটে যায়। এ যেমন একদিক, তেমনি অপব একটি দিক হলো, কোনো বিষয় বা প্রসঙ্গ তাদের অবচেতন মনে মিশ্রিত হয়ে যায়, আগের অংশ হয়তো চলে যায় পরে, পরের অংশে এসে পড়ে আগে। এর ফলেও অসংলগ্নতা বাড়ে। যেমন হয়েছে আলোচ্য ছড়াটিতে। কন্যার বিয়ে, বিবাহিত জীবন, বাপের বাড়ীতে তার স্বামিসহ আগমন, সবই দেওয়া আছে এতে, কেবল আগেরটা হবে পরে, পরেরটা হবে আগে। পঙ্‌ক্তি-সজ্জায় ছড়া-গঠনেব সূত্র এইভাবে কার্যকবী হয়েছে: পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিব শব্দ পববর্তী পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হয়েছে, প্রশ্নের পর উত্তর আছে, পর্যায়-ধর্মিতা রক্ষিত হয়েছে (যেমন: জামাইকে আন্‌ইব···বিটীকে আন্‌ইব, আজ থাক কাইল যাবি, আগে কাঁদে···পেছু কাঁদে; পর দেবতায়···পরেব ঘর, বাপে দিল··মাএ দিল, ইত্যাদি)। এ ছাড়া আছে অন্তিম পঙ্‌ক্তির গঠনে বিশেষত্ব।

২৫৮-সংখ্যক ছড়াতে স্পষ্টই দুটি ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে। 'নোটোর পোটর' পর্যন্ত একটি ছড়া, 'নোট্‌কো রে নটুয়া ··' থেকে আর একটি ছড়া। দুটি ছড়া যুক্ত হবার কারণ দুটি: 'নোটোর পোটোর'-এর ধ্বনি সাদৃশ্যে লোক-মানসের অবচেতনায় রক্ষিত 'নোটকো রে নটুয়া···' ইত্যাদি অংশ এসে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দে পবিণত হবার সূত্রটি কার্যকরী হয়েছে।

২৬০-সংখ্যক ছড়াটি কিছু জটিল, কতকগুলি সাংস্কৃতিক বিশেষত্বকে স্মরণে না রাখলে এর অর্থোদ্ধার সহজ নয়। মনে রাখতে হবে, ছড়াটি খেলাব ছড়া, সুতরাং খেলাব function-এর দিক থেকেই তা বিচার্য। যে খেলায় এটি ব্যবহৃত হয় তা ঘরে বসে খেলা, বাইরের নয়, অথচ খেলার ছড়া বলেই কোনো কারণে এটি বাইরের খেলা 'হা-ডু-ডু' খেলারও ছড়া হয়ে গেছে, অবশ্য তখন তার কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড় গোল হয়ে বসে, প্রত্যেকের হাত একসঙ্গে জড় করা হয় দীর্ঘাকারে, তারপর সেই সমবেত হাতের মুঠি নাড়াতে-নাড়াতে একজন এই ছড়া বলে। এক প্রস্থ ছড়াটি বলা হয়ে গেলেই সবার ওপরের হাতের মুঠি যার, সে তা সরিয়ে নেয়। আবার ছড়া বলা হয়। এইভাবে খেলা চলে। ছড়াটিকে বোঝবার জন্যে খেলার এই নিয়ম-

পদ্ধতিটি সকলের আগে মনে রাখতে হবে। তারপর মনে রাখতে হবে লোকমানসের ক'টি বিশেষত্ব: Animism-এর প্রতি বিশ্বাসের জন্মে যে কোনো অচেতন জড় পদার্থকে সচেতন পদার্থ বলে মনে করা; আঞ্চলিক বা বিশেষ কোনো প্রসঙ্গের প্রতীক হওয়া (আলোচ্য ছড়ায় যেমন শস্য ক্ষেত্র, গাছ, বাগান)। সবশেষে মনে রাখতে হবে ছড়ার নিজস্ব গঠন-রীতির নিয়ম বা সূত্রগুলি: যেমন সহচর-অনুচর শব্দের ব্যবহার, অর্থময় শব্দের সঙ্গে নিরর্থক শব্দের ব্যবহার, প্রথম পঙ্‌ক্তির শব্দ পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হওয়া, দু'জনের সংলাপ বা প্রশ্নোত্তর, শেষের বিশেষত্ব, ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত তিনটি দিককে মনে রেখে এইবার ছড়াটির অর্থোদ্ধার করা যেতে পারে: বীজ ছড়ানো ক্ষেতে (ক্ষেতটি 'মোগলকাটা' নামক স্থান হতে পারে, যথার্থই এই নামে একটি স্থান আছে আলোচ্য অঞ্চলে, অথবা অবচেতনে 'মোগলকাটা' এই প্রকৃত স্থান-নাম রচয়িতা বা কথককে অপর শব্দের ধ্বনি সাদৃশ্যে এই শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে) অথবা একটি ফুলের বাগানে অনেক গাছ বা ফুল রয়েছে, তার একটি তুলে নিলাম। অনেকগুলি হাত এখানে অনেকগুলি গাছ বা অনেক গাছের সমাহারে একটি ফুলের বাগান, অথবা অনেক ফুলের সমাহারে একটি ফুলের মণ্ডল। 'হাত' আছে অতএব সে হাতে সুন্দর আংটি পরা, কিংবা সে হাত দুর্গন্ধ বলে তাতে ভাত খেতে না চাওয়া। হাতের মুঠির সমষ্টি কখনো বেলের পাতা, যেহেতু বেলের পাতা তিনটি পাতার সমষ্টি। হাত এখানে ফুল, শস্য ক্ষেত্র, গাছ প্রভৃতির প্রতীক। সমবেত ভাবে তাই নাড়ানো হয়, তাই নড়া-চড়ার কথা। সমবেত হাত একটি স্থানও বটে, অচেতন সেই স্থান নড়া-চড়া করছে, আর একটি স্থান ('ডাউকিমারী' যথার্থই একটি স্থান), বা নারীচরিত্র (তার নাম 'আইকুমারী'। 'আইকুমারী' ও 'ডাউকিমারী' অবচেতনায় মিশ্রিত হয়েছে) তাকে ডাকছে, দু'জনের সংলাপ চলছে।

২৬৩-সংখ্যক ছড়াটিও যেহেতু খেলার ছড়া, সেই হেতু খেলার নিয়ম-পদ্ধতির পটভূমিকাতেই এটির সংলগ্নতা ও সঙ্গতি বিচার্য। কয়েক জন খেলোয়াড়ারের মধ্যে কে 'চোর' হবে, তাই নিরূপণ করবার ছড়া এটি। 'চোরে'র বিপরীতে রাজা; বাঙলা ছড়ায় 'রাজা' থাকলে ফুল, গাছ, পাখি প্রভৃতিকে সহচারী উপকরণ রূপে মেলে; এখানেও তাই পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে দেখলে প্রথম চার ছত্রের অর্থ এই হয়: একটি ফুলের গাছে বণিক-রাজা দুলছে, সে

মূল সম্ভবতঃ নিমের ফুল। বণিক-রাজা ছাড়াও ইনি 'টৌনেয়া' নামে কাল্পনিক কোনো রাজা অথবা রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ হতে পারেন। 'টৌনেয়া' এই ব্যক্তি নাম এবং 'টুনি' পাখি লোকমানসে সংমিশ্রিত হয়েছে, তার কারণ, রাজা থাকলে সহচারী উপকরণ রূপে পাখি থাকে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে 'টৌনেয়া' ব্যক্তি নাম রূপে খুবই মেলে। তেমনি 'মাল' ও 'ব্যাল' সংমিশ্রিত হয়েছে। শেষ চার ছত্র এর ঠিক বিপরীত : গাছের ওপরে যে ছিল রাজা সে মূঢ়তার জন্যে ('হোকা-দোমা' মানে এখানে 'বোকা') গাছের নীচে পড়ে চোর হল ; গাছের নীচে ছিল গোরু, তার পিঠে পড়ল। এইখানে 'হাড়কোল'-এর ভূমিকাটি সহজবোধ্য নয়। তা বুঝতে গেলে আলোচ্য অঞ্চলের আর একটি সাংস্কৃতিক দিককে স্মরণ করতে হবে। বর্তমান সঙ্কলনের ১৬৯-সংখ্যক ছড়াটিও এই একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এটিতে 'হাড়গোরল'-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ আলোচ্য অঞ্চলের ছড়াতে 'হাডগোরল' একটি Motif, একাধিক ছড়াতেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র অথবা 'গরুড়' এবং 'হাডগিলে' (হাড় গেলে যে) পাখি মিলিত হয়ে 'হাড়গোরল' নামে পাখি। 'গরুড়' থেকেই ছড়াটিতে 'গোরু'র নাম এসে গেছে,—একটি শব্দের সাদৃশ্যে লোকমানস অন্য শব্দ যে নিয়মে গ্রহণ করে, তারই অনুসরণে। ১৬৯-সংখ্যক ছড়াতে 'হাড়গোরল'কে 'মা' রূপে কল্পনা করা হয়েছিল,—২৬৩-সংখ্যক ছড়াতে সেই 'হাড়গোরল'কে তাই গাছ থেকে পড়া 'রাজা'কে কোল পেতে ধারণ করতে দেখা যায়। এইভাবে একই অঞ্চলের একটি ছড়ার আলোকে অপর ছড়াব অর্থোদ্ধার ও গঠনগত সংহতিকে অনুধাবন করা যায়।

এইখানে গাছ থেকে ভূতলে পড়ার প্রসঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলের একটি বিশেষ ক্রীড়া-পদ্ধতি স্মরণীয়। এই অঞ্চলের এক বিশেষ ধরণের খেলাকে বলে 'আম-পাকা' খেলা,—জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার রাজবংশী বালকদের মধ্যে খেলাটি দেখা যায়। বহু শাখা-সমন্বিত, সহজে আরোহণযোগ্য একটি গাছ হল এই খেলার মূল আশ্রয়। যে 'চোর' হয় সে থাকে গাছের নীচে, আর সবাই এক-একটি ডালে বসে। 'চোর' গাছে উঠে এক জনকে ছোঁবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে অপর খেলোয়াড় কেউ একজন লাফিয়ে মাটিতে নেমে ঘুঁটিকে (যা একটি গাছের ডাল) চুমু খায়, তবে চোরের সে দানে হার হল। আলোচ্য ছড়াটি বুঝতে এই বিশেষ খেলার পদ্ধতিও আমাদের সাহায্য করে। এ ছাড়া আমাদের উল্লিখিত ছড়ার গঠনসূত্রগুলিও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ একটি ছড়ার সংহতিকে অনুধাবনের জন্তে একদিকে চাই ছড়ার গঠন-সূত্রগুলির পর্যবেক্ষণ, অন্তদিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং সেই সঙ্গে লোকমনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে কিছু অভিজ্ঞতা।

লোকমানস কি ভাবে একটি শব্দের সাদৃশ্যে আর একটি ভিন্ন প্রসঙ্গের শব্দকে এবং একটি প্রসঙ্গের অনুসঙ্গে আর একটি ভিন্ন অনুষঙ্গকে একই ছড়ার মধ্যে গেঁথে দিয়ে একটি অর্থগত জটিলতা এবং গঠনগত সংশয়ের সৃষ্টি করে, তার ভালো উদাহরণ হল বর্তমান সঙ্কলনের ৩০০-সংখ্যক ছড়াটি। ছড়াটির একটি অংশ রয়েছে পূর্ববর্তী ২৯৯-সংখ্যক ছড়াতে। বস্তুতঃ ওই ছড়ার 'কমলালেবু' পরবর্তী ছড়াতে হয়েছে 'পাতিলেবু',—বিবাহ থাকলে যে কোনো একটি ফলের উল্লেখ বাঙলা ছড়াতে থাকেই। 'পাতিলেবু' থেকে ভাবসাদৃশ্যে এল 'মিষ্টিকুল' এবং সেই শব্দটির জন্যে এমন একটি পঙ্‌ক্তিকে ছড়াটির মধ্যে ঠাঁই দেওয়া হল, যে পঙ্‌ক্তি একটি ভিন্ন ছড়ার অন্তর্গত। কিন্তু এই নবনির্মাণের ফলে আমরা এর রূপ ও গঠনগত সংবদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারি না, কেননা, 'পাতিলেবু' ও 'মিষ্টিকুল' একই ভাবের অঙ্গীভূত। পরবর্তী অংশের সংযোজনার পেছনে রয়েছে আরো চমকপ্রদ কারণ। বাঙলা দেশের প্রচুর বিবাহের গানে বর-কনে রাম-সীতা রূপে উল্লিখিত হয়, রামের সঙ্গে আছে রাজত্বের ইঙ্গিত, রাজার সঙ্গে আছে ঘোড়ার অনুষঙ্গ। 'রাম' এবং 'ঘোড়া' এই দুটি শব্দের প্রসঙ্গে লোকমানসের অবচেতনায় যে অনুষঙ্গ জড়ানো আছে, তারই ফল রূপে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ছড়া এতে ঠাঁই পেল।

৩০৫-সংখ্যক ছড়াটিও একাধিক ছড়ার সংমিশ্রণ। ছড়াটির গঠনে আছে মূলতঃ কন্যার মায়ের প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের উত্তর এবং সংলাপ। বাঙলা ছড়ার গঠনে এই ভঙ্গিটি খুব ক্রিয়াশীল হয়। বিয়ে থাকলে ফল থাকে, অতএব আলু ও 'বৃন্দা'র ('ভেরেণ্ডা', এরণ্ড) পাতার উল্লেখের কারণ বোঝা যায়। দ্বিতীয় ছত্রের শেষ শব্দ 'কৈ', তৃতীয় ছত্রের প্রথম শব্দ 'সোই'কে নির্মাণ করেছে, যা বাঙলা ছড়ায় হামেশাই দেখা যায়। 'লাল গামছা' বা 'লাল শাড়ী' বাঙলা ছড়ায় বিয়ের উল্লেখ থাকলেই উল্লিখিত হয়, লাল যেহেতু fertilityর প্রতীক। এটি বাঙলা ছড়ার এক পরিচিত Motif। বাঙলা ছড়ার আর এক গঠনগত বিশেষত্ব হল বিষয়ের পারম্পর্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিপর্যয়, তাই শেষের ঘটনা আগে বা আগের ঘটনা শেষে বিন্যস্ত হয়, এ ছড়াটিতেও তাই ঘটেছে। আগেই পাই বিয়ে হয়ে যাবার সংবাদ, ক্রমেই তা পিছিয়ে গিয়েছে।—ছড়াটির

শেষাংশ সম্ভবতঃ মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ-প্রথাদ্বারা প্রভাবিত। এই সমাজে কনেই 'পণ' ('মোহরানা') পেয়ে থাকেন, অবশ্য কোনো কোনো হিন্দু সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। কনের মা জামাইয়ের সঙ্গে 'পণ' নিয়ে দর কষাকষি করছেন। 'চাকা চাকা' শব্দ রৌপ্যমুদ্রাকে নির্দেশ করছে। 'ষোল' শব্দটি ব্যবহারের পেছনে একটি সূক্ষ্ম কারণ আছে। 'ষোল' আনায় একটাকা, এই জন্যেই 'ষোল টাকার' উল্লেখ। এটি এখন ইডিয়মে পরিণত হয়েছে। আমার পাওনা আমি 'ষোল আনা'য় অর্থাৎ পূর্ণরূপে বুঝে নিতে চাই—এই idiomatic অর্থে এটি প্রযুক্ত, আক্ষরিক অর্থে নেবার প্রয়োজন নেই। হবু জামাই সম্ভবতঃ মাটি-কাটা মজুর, অথবা 'মাটি' শব্দ অন্য গূঢ় অর্থকে নির্দেশ করছে, যা আমাদের জানা নেই। 'মণ' এবং কথান্তর 'পণ' সংমিশ্রিত হল কেন? 'মণ' আসলে 'মন', কনের কতটাকা নেবার ইচ্ছে, তাই জানা। 'বৌর ষোল টাকা মণ'—অর্থাৎ তার পাওনা ষোল আনায় বুঝে নিতে তার ইচ্ছে।

পরবর্তী ৩০৬-সংখ্যক ছড়াটির আলোচনা করে এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করছি। পঙ্‌ক্তি ও পর্বের দৈর্ঘ্যের অসমতাই প্রমাণিত করে এতে একাধিক ছড়ার সমন্বয় হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ, প্রশ্নোত্তর প্রবণতা, ছত্রের শেষ শব্দের ভূমিকা, পর্যায়-ধর্মিতা, দুই বিরুদ্ধ ভাবের প্রতিসাম্যমূলক অবস্থান, শেষের বিশেষত্ব—অর্থাৎ ছড়াগঠনের যে সব সূত্র আমরা উল্লেখ করেছি, তার অনেকগুলিকেই এখানে উপস্থিত দেখা যাবে। খড়ম পায়ে দিয়ে ডাক্তারনীর স্বামী 'যায়'। এই 'যায়' পরবর্তী ছত্রের 'খায়'-কে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু মূল কারণ অন্যত্র: যৌনপ্রসঙ্গ ও বিয়ের কথা থাকলে মাছ, পাখি প্রভৃতির সহচারী উপকরণ রূপে উল্লিখিত হওয়া। মানবেতর প্রাণীকে মানববৎ মনে করা হয়েছে, যেমন অচেতন পদার্থকে চেতনময় বলে মনে করা হয়। শেষ দুই ছত্র কিছু জটিল। মনসুর দাদার রূপগুণ অনুযায়ী তার বউটি হয় নি। অবশ্যই এখানে 'গরমভাত' মনসুর দাদা, আর 'পান্তাভাত' হল তার 'দাঁত-ক্যালানো বৌ'। এই দুই ছত্রের অনুরূপ পঙ্‌ক্তি পূর্ববঙ্গ থেকেও পাওয়া গেছে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ একটি ছড়া রূপে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন এটি আর একটি ছড়াতে ঢুকে পড়ল? খড়মের খট্-খট্ শব্দ-চিত্রের সঙ্গে 'দাঁত-ক্যালানো বৌ'-এর দাঁতের খট্-খট্ শব্দ মিলে গেছে বলেই এমনটা ঘটেছে।

এক ছড়ার মধ্যে অপর ছড়ার সংমিশ্রণের একাধিক কারণ থাকে। এক-এক ক্ষেত্রে এক-একটি কারণ কার্যকরী হয়। ওপরে নির্বাচিত কয়েকটি ছড়া বিশ্লেষণ

করে তা দেখানো গেল। সংমিশ্রণের ফলেও ছড়ার অখণ্ডতা ও সংহতি যে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা প্রদর্শনই এই আলোচনার লক্ষ্য। 'ছেলে ভোলানো ছড়া' (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩০। পৃ.২-১৫) নামে প্রবন্ধটিতে অবনীন্দ্রনাথ একটি ছড়ার মধ্যে অপর ছড়ার সংমিশ্রণের দিকটির উল্লেখ করে বলেছিলেন, ভাব ও বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা অবলম্বন করে ছড়াগুলিকে নতুন করে বিন্যাস করতে। আমরা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের এই মত সমর্থন করি না। অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ Diachronic, সংমিশ্রিত ছড়াকে তাই পৃথক করে নিয়ে তিনি ছড়ার আদি ও বিশুদ্ধ রূপে পৌঁছতে চান। আমাদের দৃষ্টিকোণ Synchronic, তাই ছড়াকে যে ভাবে মেলে, সেই রূপেই তাকে গ্রহণ করে তার সমীক্ষা করতে চাই।

...৯...

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে 'সংমিশ্রণে'র সঙ্গে 'কথান্তর'-এর কথাও পেড়েছিলাম। এবার সে কথা বলি। অনেকেই 'পাঠান্তর' শব্দটি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। 'কথান্তর' শব্দটি 'পাঠান্তর' শব্দেরই সাদৃশ্যে আমরা গঠন করেছি। লিখিত পাঠের ভিন্ন পাঠকেই 'পাঠান্তর' বলে। এই কারণে আমরা 'কথিত' রচনার ভিন্ন 'কথা'কে 'পাঠান্তর' না বলে 'কথান্তর' বলাই সঙ্গত বলে মনে করি।

এই 'কথান্তর' ছড়ার গঠনের এক প্রধান দিক। এই গ্রন্থের সঙ্কলন অংশের পাদটীকায় কিছু-কিছু ছড়ার কথান্তর দেওয়া গেছে। স্থানাভাবে সব ছড়ার কথান্তর সেখানে দেওয়া যায় নি। সে জন্যেই বাকী কথান্তরগুলি এখানে প্রদত্ত হল।

এই কথান্তরের ফলে ছড়ার গঠন ও রূপটিকে অনুধাবন করাই এখানে আমাদের লক্ষ্য। আবার, কথান্তরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা কিন্তু ছড়াটির আদি বা মৌলিক বা তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' রূপটিকেও অন্বেষণ করতে চাই না। বর্তমানে ছড়ার যে রূপটি আমরা পেয়ে থাকি, তাই অবলম্বনে তার Synchronic আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য।

কথান্তর-সহ ছড়ার রূপ ও গঠনের দিকটা এইভাবে লক্ষ করা যায়: [যে সব সঙ্কলন-গ্রন্থ থেকে কথান্তরগুলি গৃহীত হল, সংক্ষেপে তাদের নাম এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : দত্ত : ভবতারণদত্ত সঙ্কলিত : বাংলা দেশের ছড়া (ভাদ্র, ১৩৭৭)। লাহিড়ী : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সঙ্কলিত : যশোর-খুলনার ছড়া (ফাল্গুন,

১৩৭১)। জলীল: আলমগীর জলীল সঙ্কলিত: রাজশাহীর ছড়া (চৈত্র, ১৩৭০)। কাসিমপুরী: সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সঙ্কলিত: লোকসাহিত্যে ছড়া (বৈশাখ, ১৩৬৯)। খাতুন: খোদেজা খাতুন সঙ্কলিত: বগুড়ার লোক সাহিত্য (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। পৌষ ১৩৭৭)। বদি: বদিউজ্জ্মান সঙ্কলিত: লোকসাহিত্য, ১২শ (ফাল্গুন, ১৩৮২)। রবীন্দ্রনাথ এবং যোগীন্দ্রনাথের সংগ্রহ শ্রীভবতারণ দত্তের সংগ্রহের অঙ্গীভূত হয়েছে বলে পৃথক করে উল্লখিত হল না। শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর 'ছেলেভুলানো ছড়া' (শান্তিনিকেতন। পুনর্মুদ্রণ: দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৮) বইতে সঙ্কলিত ৬০টি ছড়ার অধিকাংশই রবীন্দ্রসংগ্রহে থাকায়, তাও গৃহীত হয় নি। বর্তমান সঙ্কলনকে নির্দেশ করতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ভৌমিক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব ছড়ার কথান্তর পূর্বেই একবার সঙ্কলন-অংশের পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি এখানে অনুল্লিখিতই রইল। এইজন্য ডঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল মশাইয়ের 'দি রাজবংশী'স্ অফ নর্থ বেঙ্গল' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৫) বই থেকে নেওয়া কথান্তরগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে আর পুনরাবৃত্ত হয় নি। প্রথমে বর্তমান সঙ্কলনের ছড়ার সংখ্যা উল্লেখ করে পরে তার কথান্তর নির্দেশ করা হল]:

সং ১: পুণ্যিপুকুর · এক গঙ্গা জলে। কথান্তর: বদি, পৃ. ৮৮, সং ৯: পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা/কে বুঝিবে সকাল বেলা। / লীলাবতী/সাত ভার বুন ভাগ্যবতী/ · পুত্র থুইয়ে স্বামীর কোলে/মরি য্যানো গঙ্গাজলে।

সং ২: শিল শিলাটন · করে। কথান্তর: দত্ত, সং ৮০৭: শিল্ শিলাতি শিলাতা শিলা আছে ঘরে/হর বলে গৌরী কি ব্রত করে।

সং ৪: শুসনি কলমি খিল; সং ২৪ক। কথান্তর: দত্ত, সং ৮৬৭: হেলেঞ্চা কলমি লক্ লক্ করে, এবং অতিরিক্ত কথা। কাসিম, পৃ. ৯০, সং ১৯: ওরে পঙ্খী জোড়া মিল। বদি, পৃ. ৯৩, সং ৪: সোনার কোটুয়া রুপার খিল, এবং অতিরিক্ত কথা। খাতুন, পৃ.১২০: হেঞ্চা কলুম ঢুম্ ঢুম্ করে··· উপারখিল।

সং ১৩। কথান্তর: খাতুন, পৃ. ১০৩: এক ছি দুই ছি মানের পাত/দেরে কানাই চাড্ড্যা ভাত···।

সং ২২: ভাইয়ের কপালে···সোনার ভাটা; সং ৪১৯। কথান্তর: কাসিম, পৃ. ১৫১, সং ৩৬: যমের বোন যমুনা / যেমন যমকে দেয় কোটা / আমিও তেমনি ভাইকে দিলাম কোটা।

সং ২৪গ: চাল ক'টা···খাই; সং ৩৫। কথান্তর: লাহিড়ী, সং ২২২:

চাল চাইটে চড়াও রাণী,/ভাত চাইটে খাই,/ভাত চাইটে খেয়ে আমি/বসির-হাটে যাই।

সং ২৫ : ভুবলা গো রাই···জল খাই। (দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ২০-২১, পাদটীকা)। কথান্তর : দত্ত, সং ৬৫১ : পুবাদু গো রাই/আমরা ছোপ্‌ড়ি পিঠা খাই/ছোপ্‌ড়ি লোপ্‌ড়ি গাজ সিনাতে যাই/···চার মাস বর্ষা আমরা পোখর না যাই।

সং ৩১ : আম কাঁঠালের···করে। কথান্তর : কাসিম, পৃ. ১৫৫, সং ৪৯ : কাঁটালের পিড়িখান ঘি মউ মউ করে/তারি উপর বাপ খুড়া কন্যা দান করে।

সং ৪০ : ওপারেতে কদমগাছটি কদম ঝুর ঝুর করে, সং ৫২, ২৮৪। কথান্তর : দত্ত, সং ১২২খ. বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুরঝুর করে। ঐ, সং ২২২ : ওপারে তিল গাছটি তিল ঝুরঝুর করে।

সং ৫৬. আইলাম রে অরণে, লক্ষ্মী মায়ের চরণে, সং ৫৩ : আলো রে অরণি, মা লক্ষ্মীর চরণি, সং ৫৮ : আইলাম লো শরণে, লক্ষ্মী দেবীর বরণে, সং ৫৯ : আইলাম বে বরণে, ঠাকুর-গোঁসাই-চরণে। কথান্তর : দত্ত, সং ২১· আইএন্‌ রে হরণে, লক্ষ্মী দেবীর চরণে, এবং পরবর্তী সমস্ত অংশ। জলীল, পৃ. ৪৭, সং ১ : আইনু রে ভাই অরণে, দেবী লক্ষ্মীর চরণে, এবং পরবর্তী সমস্ত অংশ। কাসিম, পৃ. ৯৯, সং ১০. আইলাম বর মাগনে, লক্ষ্মী দেবীর চরণে, এবং পরবর্তী সমস্ত অংশ, ও পরপৃষ্ঠার পাঠান্তর। খাতুন, পৃ. ১২৭-১২৮।

সং ৪৬ : ধান দিয়া না দিস কড়ি, সং ৫৩, ৫৮, ৫৯। কথান্তর : বদি, পৃ. ১৩৯, সং ১৯. চাউল দিবে না কড়ি দিবে···। খাতুন, পৃ. ১২৮. ধান দেয় না দেয় কড়ি···।

সং ৪৭ · বাইন্যা বাড়ী গেলাম রে, সং ৫৮। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৯৭ক : বান্যাবাড়ীর কন্‌ঘাঁটা। ঐ, সং ৭৯৭খ· বান্যা বাড়ীর টেঁয়ার ছালা। কাসিম, পৃ. ১৫২, সং ৩৯ : বাইন্যা বাড়ীত গেলাম রে।

সং ৪৭ : ছিকা লড়ে ছিকা চড়ে ; সং ৫৪। কথান্তর : কাসিম, পৃ. ১৫২, সং ৩৯ : শিক্‌ক্যা লড়ে শিক্‌ক্যা লড়ে, এবং পরবর্তী অংশ।

সং ৪৮ : ঐ বাড়ীখান দেখ্‌তে ভালা ; সং ৫৩ : এ ঘরখান জগতমালা ; সং ৫৫খ : এ ঘরহান (ঘরখানি) ছাইছে বালো ; সং ৫৯, সং ৯৮ : এই গিরিটা জগৎ ভাল্‌। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৪১, সং ২৪ : এই ঘরখান দেখতে ভালা। খাতুন, পৃ. ১২৮।

সং ৪৯ : কিনা আনছে চাম্পা ফুল ; সং ১৯২, ২০৬। কথান্তর : দত্ত, সং ৬৭৩। কাসিম, পৃ. ৫৩, সং ৪৩ ; ঐ, পৃ. ৫৩, সং ৪৪ : কিন্‌না আনছে চাম্পাফুল।

সং ৫১ : জলুক বাতি পুড়ুক ত্যাল ; সং ২৫৮, ২৮৯। কথান্তর : দত্ত, সং ৮৪৭. জলছে প্রদীপ উঠছে ধোঁয়া। খাতুন, পৃ. ১০৫ : মশারীর তলে বার বাতি জলে / জলুক বাতি পুড়ুক ত্যাল।

সং ৫১ : আমশালুকা পাকা ব্যাল ; সং ৫৪ : আইল রে আমশালুকা। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৬২, সং ২২। খাতুন, পৃ ১০৫।

সং ৫২ : কথান্তর : খাতুন, পৃ. ১২৮ : রাম ক'ল শাম ক'ল, আমরা সব ছ'ল প'ল/জারে কসল্যা (কষ্ট) পাই/এক কুলা ধান দাও, বাড়ী বিল্যা যাই।

সং ৫৩ : ছেলের নাম কি, আখাল গোপাল। তুলনীয় : দত্ত, সং ১৪৫ক : আপ্পন তাপ্পন কুড়ে কুষ্ঠি ব্রাহ্মণ। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ১৫ : তোর ছাবালের নাম কি ? /আপাল দুলাল/তোর নাম কি ?/বুড়ো গোপাল। জলীল, পৃ. ৮, সং ২১. তোর ব্যাটা-বেটীর নাম কি ? /ওপাল গোপাল/তোর নাম কি ? পোড়া কপাল। বদি, পৃ. ২৫, সং ১ : ছাওয়ার নাম কি ? /আপ্পাল গোপ্পাল। ঐ, পৃ. ১১৪, সং ৪ : ছাওয়ালের নাম কি/আপাল গোপাল/তোর নাম কি ? /বুঢ়া গোপাল।

সং ৫৩ : কে কে যাব বিরামপুর। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৪৮, সং ২ : কে কে যাবি ভিখামপুর।

সং ৫৪ : খায় আর মোচড়ে দাড়ি , সং ৫৬ : খায় আর কামড়ায়, দুই চোখ কড়মড়ায়। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৪২, সং ২৪ : মানুষ খায় কড়মড়ায়, দুটি গালে কড়কড়ায়।

সং ৫৭ : সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৪৮, সং ২। কাসিম, পৃ. ১০৪, সং খ। খাতুন, পৃ. ১০৫ : সোনার কড়ি রূপার মালা।

সং ৬৫ : জোলা যায় রে বাঁশ কাটিতে, হস্তে লইয়া দাও, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৩৩, সং ১।

সং ৭০ঘ : রাইলদের পুকুরে ফেলিলাম জাল, ইত্যাদি গোটা অংশ। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৪৪।

সং ৭৫৬ : নাড়া বনে কাড়া·· ঠাকুরের ঝি। কথান্তর : দত্ত, সং ১৬৬ : নাড়া বনে কাড়া বাজে লোকে বলবে কি/সরাচাটা বে করেছে, মালসাচাটার ঝি।

সং ৭৬ : হেঁচোড়া ঠাকরুণ লো, ইত্যাদি গোটা ছড়া ; সং ৫০৪। কথান্তর : দত্ত, সং ৮৬৮।

সং ৮৬ : আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ১১২।

সং ৯৮ : শিব রে শিব সাজে, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : জলীল, পৃ. ১১, সং ২৯।

সং ১০০ : পাঠা মারিয়া দিম্ দিম্ ; সং ১০১, পা. টী : ছাগল দিব টেনে ; সং ৫১৯ : ছাগল দেব গোটা গোটা। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৬, ৭৯৫।

সং ১০০. পাদটীকা : বকরীর মা বুড়ী, সং ২০৫ : ছাগলের মা বুড়ী ; সং ৫১৯ : সুখির মা বুড়ী। কথান্তর : দত্ত, সং ২৬৬ ; কাণকাটার মা বুড়ী। ঐ, সং ৫৫৭ : দেবতার মা বুড়ী। লাহিড়ী, সং ২৭ : চান্দের মা বুড়ী। জলীল, পৃ ২, সং ৩ : পদ্মার মা বুড়ী। কাসিম, পৃ. ৭২, সং ১৭ : চান্দের মা গো বুড়ী।

সং ১১২ : ভূত আমার পুত, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর . দত্ত, সং ৭১৪ . ··রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি ?

সং ১১৫খ : সোনার ডাবা···জাল মেলানি। কথান্তর : বদি, পৃ. ৬৮, সং ২৪ : সোনার ডাবা নাইরকলর পানি/ডেইল্যা যাতে জাল বেড়ানী।

সং ১১৬ : একটি আম পড়্, সং ১১৭. কাউয়া নানা, এক আম দেনা, সং ১১৮ : বুলবুল আমার কাকা। কথান্তর : কাসিম, পৃ. ৩৩, সং ২০ : পাতি কাউয়া নাতি ভাই/আম ফালা বাড়ীত্ যাই। ঐ, পৃ. ১৫৩, সং ৪১। খাতুন, পৃ. ১০৫ : বাল্‌ক মাটির ঘর, আম দুরাদুর পড়্।

সং ১১৯ : বাদুড় বাদুড় মিতা, ইত্যাদি গোটা ছড়া এবং পাদটীকায় অন্যান্য কথান্তর। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৫৬, সং ৩২ : বাদুড় বাদুড় কলা পিতা/তোর বাপ আমার মিতা। কাসিম, পৃ. ১৬৬, সং ৭৬ : বাদুড় বাদুড় চৈতা/মামু কইছে যাইতা/তিলের সিন্নি খাইতা/তিল লাগে তিতা/তুমি আমার মিতা।

সং ১২৩ : রইদানী রে রইদানী · রইদ্ তোল। কথান্তর : দত্ত, সং ৪৫৬ : ছেড্ ছেড়াইয়া রোদ তোল। ঐ, সং ৭৯৪ক, খ। বদি, পৃ. ৬২, সং ১ ; ঐ, পৃ. ৬৩, সং ২ ; ঐ, পৃ. ১৩৫, সং ১ : আড়ির ভিতরে কদম ফুল/চড়্ চেড়াইয়া রইদ তোল। কাসিম, পৃ. ৬৩, সং ৭২।

সং ১২৩ : ম’উ আস্তে ঘামাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া ; সং ২১৯ ; সং ২২০ : কইনা আসিল্ ঘামিয়া, কেও ছাতাটা টানিয়া ; সং ২৯৭ : দামাদ্ এল ঘামিয়া,

ছাতা ধর টানিয়া ; সং ৩০১ : জামাই এল ঘামিয়া, ছাতা ধর টানিয়া। কথান্তর : কাসিম, পৃ. ৪০, সং ৩, ঐ, পৃ. ৪৮, সং ৩৩ : বুড়্ইয়া আইছে ঘাম্‌ম্যা, ছাতি ধর নাম্‌ম্যা ; ঐ, পৃ. ৫৮, সং ৫৬ ; ঐ, পৃ. ৬৬, সং ৭৯। দত্ত, সং ২৩৪ ; ঐ, সং ৬০৮ক : ফুলর ছাতি ধর্। লাহিড়ী, সং ৩৭। বলি, পৃ. ৫, সং ৩ ; ঐ, পৃ. ১২, সং ১ ; ঐ, পৃ. ৮৯, সং.১১।

সং ১৪২ : ভালুকে নুন কুথা পায়, ভালুকে তোল কুথা পায়, সং ১৭৭ : হনুমানেতে তেঁতুল খায়, নুন কোথা পায়। কথান্তর : দত্ত, সং ৭১, ৭২ক, ৭২খ, ৯৩, ৬৯৫। 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং), ৯০।

সং ১৪৫ . এক তারায় · , দু তারায়··· ; সং ১৯২ : একটা তারা দুইটা তারা ·· , সং ১৯৫ ; সং ২০৪। কথান্তর . লাহিড়ী, সং ২০, ৪২, ৪৩, ১৫১, ১৫২। কাসিম, পৃ. ৯৫, সং ৪ : এক তারা বান্‌লাম, দুই তারা বান্‌লাম। দত্ত, সং ১৬৫ : এক তারা বন্ধন দুই তারা বন্ধন। জলীল, পৃ. ৪২, সং ২৭।

সং ১৪৬ : নিমতলাতে বাসা। কথান্তর · দত্ত, সং ১২২খ : বাড়িতে আছে নিমগাছটি।

সং ১৪৭ : কে ধনকে মারে'্য দিল, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর · দত্ত. সং ২৬৪ (পাকাপান), ২৯৭ (দুধের গতরে), ৩০১ (কে মেরেছে কে ধরেছে সোণার গতরে), ৫৭১ (গোটা ছড়া)। লাহিড়ী, সং ২৯ (পাকা পান) ; ঐ, ১০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় : পাকা পান , ঐ, সং ১৪৬ (পাকা পান)।

সং ১৪৮ : পুড়ুক তাদের মন। কথান্তব : 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ), সং ৬৭।

সং ১৫০ : আমার ধন কে মারেছে, কে ধরেছে। কথান্তর : দত্ত, সং ২৯৭, ৩০১।

সং ১৫১ : বেটা ছেলেটা সোনা ডেলাটা। কথান্তর . দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১১৮, পাদটীকা।

সং ১৫৮ : কালা কুত্তাটা দুয়ারে ঢুকেছে ; সং ১৬০ : কাণকাটা কুকুরটা আইসে কতোদূর। কথান্তর : জলীল, পৃ. ২৭, সং ২ : কানকাটা কুকুর আ'ল চ'ক মুজে থাক ; ঐ, পৃ. ২৭, সং ৩ : কানকাটা শ্যাল আ'ল ··। দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১১৯, ১২০, পাদটীকা।

সং ১৬৩ : কাঁদিস না রে ধন, তর মা গেছে বন , সং ১৬৪ : তোর মাও গেইছে বাহো মারিবা'·· কান্দিস না ; সং ১৬৫ : মা গেল তিতা শাগ

থোড়ে…। কথান্তর : দত্ত, সং ১৬ : তোর মা গেইয়ে পানীর লাই; সং ৩৮৩ : খোকো বলে মা শাক তুলি; সং ৪২০ক : খোকার মা বাড়ী নেই।

সং ১৬৬. বরগী, তুই টুঙ্কি বাজাইস না। তুলনীয় : দত্ত, সং ১০৭ক, খ।

সং ১৬৯ : হাড়গোরল গে হাড়গোরল…। তুলনীয় : লাহিড়ী, সং ২৩৫ : হাড়গিলের ভাই চিঁড়ে কোট খাই। বদি, পৃ. ৮, সং ১১ : আরগিল্যারে রে ভাই / এক কোল চিড়া খাই…।

সং ১৭৩. হামদের মত্ত পান খায়েঁছে/শাহ্‌ড়ী বাঁধা দিয়েঁ। কথান্তর : দত্ত, সং ৯০।

সং ১৭৪ ইঁদুর রে ইঁদুর, তোর মা এসেচে, ইত্যাদি গোটা ছড়া। তুলনীয়. লাহিড়ী, সং ১৬৮।

সং ১৭৮ : এতোটালা বেতোটালা, ২৫৮ : পাকা ব্যাল; সং ২৬০ : এলে রে বেলে রে, এবং ১৫৫ পৃষ্ঠায় কথান্তর : আয় গুহুরী…তুল হাত। কথান্তর : বদি, পৃ. ২২, সং ১ : আয় গোয়ালী ঘরে যাই/দুহু মাখা ভাত খাই/না খাই তোর হাতে ভাত/কাউড়া কাউডি গোঁদায় হাত/এ্যালের পাত ব্যালের পাত/ চিঁড়া নেংটি তোল হাত। ঐ, পৃ. ১১৪, সং ১ : এ্যাল পাত ব্যাল পাত/ তুলা। লে লখিন্দার হাত। ঐ, পৃ. ১১৫, সং ২।

সং ১৮৪. এক শিয়ালী আম্লে-বাড়ে, দুই শিয়ালী খায়, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ১২৮খ : ভোম রাজা ভোম রাজা কি কর বসিয়া/ তোমার বাপে মারণ খাইয়ে দরবারত বসিয়া, ঐ, সং ১৬২ (গোটা ছড়া)। বদি, পৃ. ১৪৪, সং ১ (গোটা ছড়া)।

সং ১৮৬ : মণ্ডল গেইছে হাট, সং ১৯০ : মাও গেইছে হাট, বাপ গেইছে হাট। কথান্তর : লাহিড়ী : সং ১৬৫ : মা গেছে হাটে, বাপ গেছে মাঠে। দত্ত, সং ৬৮৩. খোকার বাপ গেছে হাটে মা গেছে ঘাটে।

সং ১৮৮ : নাওয়ের উপর টড়া সাপ ফ্যাপ্‌পেয়া উঠিছে। কথান্তর : বদি, পৃ. ১০, সং ২ : খুপার উপর ধুরা হাপ/ফাল দিয়া উঠে বিয়ার বর; ঐ, পৃ. ১৪, সং ৩ : কলসীর মইদে দুরা হাপ/কুম কুম করে। জলীল, পৃ. ২৮, সং ৬ : কলসীর মধ্যে গোমা সাপ/ফুপা উঠছে বরের বাপ।

সং ১৯০ : মাও আনিবে নাড়ু-মোলা · বিন্দাবনের হাট। কথান্তর : দত্ত, সং ৬১৫খ : তোর মা হাট গেলে আনিবে মালপুয়া; ঐ, সং ৬৪৮ক : এবার

যাব হাট, কিনে আনব রাজা খাট। জলীল : পৃ. ৩২, সং ৩ : খাড়ির উপর চড়ে দেখি ভোলা মণ্ডলের বাড়ী।

সং ১৯৯ : তা তুর্‌-তুর্‌-তুরা…নাচে বুড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৫১৮ (গোটা ছড়া)।

সং ২০২ : চান্‌ ঘুঘু‥ ষোলো জামাই। কথান্তর : দত্ত, সং ৪৫১ : চাঁদ মামা চাঁদ মামা তোরে ডুহায়/এক খুকীর বিভা দিব ষোল বিহায়।

সং ২০৩ : মামীর মাথায়‥ তুমার বাপ। কথান্তর : দত্ত, সং ১১১ : মামা কাটে চিকন ফুতা, মামী কাটে পাট/অ মামী ন কান্দিয় মামা তোমার বাপ, ঐ, সং ৭৬৬ : মামী কাটে সরু সুতা মামা কাটে পাট‥। বদি, পৃ. ১২১, সং ৩ : মামুয়ে পাডৈল চিরল পাতা মামীয়ে রান্দেন ভাত/মামু তোমার বাপ।

সং ২০৪ : গুড়গুড়ি-হুঁকু সেজে দে বে, সেই হুঁকু খেতি খেতি ‥সেই মুড়ি খেতি চলি' গেলাম মুচিদের বাড়ী। কথান্তর. বদি, পৃ. ৮ সং ১১ কন্নার জামাই উক্কা খায়…এক কোল চিড়া খাইতে খাইতে দাদার বাড়ী যাই।

সং ২০৫ : সুষ্যি মামা গো কুটো না গো/ঘেঁচু হল কালা কালা ‥। কথান্তর : দত্ত. সং ৮৩০ : সুষ্যিমামা সুষ্যিমামা রোদ করো না/তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোট না/বেগুন হল চাক চাকা ‥। দত্ত, সং ৬৩০ : উঠ উঠ যমুনা একটি বাইঅন কুট না, ঐ, সং ৬৩৮ ক, খ, গ, ঘ।

সং ২০৫ : ছ'খান কাপড় পেলি ‥বুড়ো খায় গুপ্‌ গাপ ; সং৫১৯। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ৯৪ : খড়ি কুড়োতে গিইলাম/চারখানা শাড়ী পাইলাম,/চার বৌরই দিলাম/আপনি মরলাম জাড়ে/কলাগাছেব আড়ে ‥। ঐ, সং ২৩৩ : ঘসি কুড়ুতি গেলাম/পাচ শাড়ি পালাম/আর একখান শাড়ি পালাম/পাচ বৌরই দিলাম, ‥। জলীল, পৃ. ২, সং ৩ : ছয় বন্ধুকে দিলি/আপনি মরে জাড়ে/কলা গাছের আড়ে/কলা পড়ে ধাপ্‌ ধুপ্‌/বুড়ি খায় গাপ্‌ গুপ্‌।

সং ২০৭ : মাই গো মাই…পাবি নাই/কথান্তর : লাহিড়ী, সং :৮০ : মাগো মা, বিয়ে দিলে না, রেলগাড়ীতে চাপে যাব/দেখতি পাব না।

সং ২০৯ : ডালিম গাছ ‥খেলা করি। কথান্তর : বদি, পৃ. ১০, সং ৩ : ডালিম গাছে চরকী নাচে। দত্ত, সং ৫৪২ (গোটা ছড়া)।

সং ২১০ : ও ফলটি খেয়ো না ‥ও বাড়িতে যেয়ো না। কথান্তর : দত্ত, সং ১১৮ক : ও পথেতে যেও না গো,‥ ; ঐ, সং ৬৩৮ ক : ও দুয়ারে যেও না ‥, ঐ, সং ৬৩৮ খ, গ।

সং ২১০ : আজ কনের গায়ে হলুদ, কাল কনের বিয়ে ; সং ২১২ : আজকে খুকী আলস-ঢালস, কালকে খুকীর বিয়ে। কথান্তর : দত্ত, সং ২২১, ৪১৩, ৪৪৪, ৬৩৮ক। জসীম, পৃ. ১৪, সং ৩৬ : আজ মুমুর আদ্বিবশ কাল মুমুর বিয়া। কাসিম, পৃ. ৬০, সং ৬৪ : আইজ চুপীর অধিবাস, কাইল চুপীর বিয়া।

সং ২১২ : খোপা খুলে দেখ না…। কথান্তর : বদি, পৃ. ১০, স' ২ : খুপার উপর ধুয়া হাপ… ; ঐ, পৃ. ১৯, সং ২।

সং ২১৩ : বরের মাথায় লাল টুপি, মেয়ের মাথায় ঠাকা। কথান্তর : দত্ত, সং ১৪৪ক : বরের মাথায় চাঁপার ফুল, কনের মাথায় টাকা ; ঐ সং ১৪৪খ। লাহিড়ী, সং ২০১ : বরের মাথায় কাঠকুটো, বউয়ের মাথায় ঝাপা।

সং ২১৫ : আশা লতা পালং পাতা। তুলনীয় : দত্ত, সং ৪৪০ : চাকু লাটা—পানের বাটা…।

সং ২১৬ : ওই টিয়া রে টিয়া · নাল পড়িখান দিয়া। কথান্তর . দত্ত, সং ২১১ : টীয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে , ঐ, সং ২২১ , সং ৭৩৬ : টিয়ের বেটী বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে। জসীম, পৃ. ৩০, সং ১০। বদি, পৃ. ৯০, সং ১ : টিয়ার বাড়ী বিয়া, ওলদা শাড়ী নিয়া ; ঐ, পৃ. ৯৯ সং ১ ; ঐ, পৃ. ১১৩, সং ১।

সং ২১৭ : ঘুঘু মলো মলো · ফিঁন্দ্যা। কথান্তর : দত্ত, সং ১৯৯ : ঘুঘু ডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চাল ভাজা খেয়ে / ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়ো শাঁখা পরে , ঐ, সং ৪১৩ ক, খ। লাহিড়ী, সং ৩৪ : চিল মরেছে চিল মরেছে ছ্যাচের পানি খেয়ে/চিলের মরণ দেখতি যাব শঙ্খ শাড়ী পরে : ঐ, সং ৩৫ : ঘগু মলো ঘুগু মলো শাক পিটেলি খায়ে/ঘুগুর মরণ দেখতি গেলাম পাটন শাড়ী পরে। বদি, পৃ. ১১২, সং ১ : ঘুগ্‌গু ঘুগ্‌গু মইল জল পিঠালি খাইয়্যা । ঐ, পৃ. ৯, সং ২ : ঘুঘু মারুম, ঘুঘু মারুম ; ঐ, পৃ. ১০, সং ৩। খাতুন, পৃ. ১০০ : ঘুঘু ম'ল ঘুঘু ম'ল তাল পিঠা খায়্যা/আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়্যা…।

সং ২১৭ : মায়ে দিল তেল-সিন্দুর, বাপে দিল বিয়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৭ক : মায়ে দিলে সরু শাঁখা বাপে দিলে শাড়ী ; ঐ, সং ৭খ, ৪২৩খ, ৪২৩। লাহিড়ী, সং ৩৪, ৩৫।

সং ২১৮ : আমতলায় ঝামুর ঝুমুর…গামছা মুড়া দিয়া। কথান্তর :

দত্ত, সং ৫৪০ : আমতলায় ঝাপুর-ঝুপুর কলাতলায় বিয়ে/ঐ আসছে খেঁদির বর গামছা মাথায় দিয়ে। লাহিড়ী, সং ৯১ : কলা গাছ তলায় ঝামুর-ঝুমুর,/ আসতেছে জামাই বেটা ছেমই পিঠে নিয়ে। জলীল, পৃ. ৩৭, সং ৯ : আমতলাতে বাজনা বাজে, কাঁঠাল তলায় বিয়া। কাসিম, পৃ. ১৫৪, সং ৪৭ : আমতলা ডামুর-ডুমুর কলাতলা বিয়া/আইল রে নাতিন জামাই হোলার মুকুট দিয়া ; ঐ, পৃ. ১৬৭, সং ৩৮। বদি, পৃ ৭৯, সং ২।

সং ২১৮ : গামছা মুড়া দিয়া ; সং ৩০৫ : নাল গামছা গায়। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৪০ : গামছা মাথায় দিয়ে। লাহিড়ী, সং ৯৩, ২১৭। বদি, পৃ. ৯৮, সং ৯. গামছা কাঁধে দিয়া। খাতুন, পৃ. ১১২।

সং ২১৯ : উলু উলু, কইনার বাড়ী কতয় দূর। কথান্তর : বদি, পৃ. ৯৯, সং ২ : উলু উলু মান্দারের ফুল। দত্ত, সং ১৪৩ ক, খ , ১৪৪ ক, খ।

সং ২১৯ : ছাতির উপর গামছা/তিনো বইনি তামচা , সং ২২০ : ছাতার উপর গামছা, তিন-এর ভাই তামশা। কথান্তর : দত্ত, সং ২৩৪ : ছাতির উপর কদম ফুল। লাহিড়ী, সং ৩৭ : ছাতির পর কমেলা। বদি, পৃ. ১৮, সং ৬ : ছাতিব ভিতোর নাল গামচা/দোনো বইনের তামসা ; ঐ, পৃ. ৮১, সং ১ : চহিব তলে গামছা, দেহ মাগীর তামশা। খাতুন, পৃ. ১১২ : ছাতির উপর গামছা, দেখ বউএর তামসা।

সং ২২১ : মা বড়ো নির্বুদ্ধি···কার ঘর কর। কথান্তর : দত্ত, সং ৭ক, ১১৭, ৫৬০ক।

সং ২২৩ : হেনা হেনা হেনা, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৮৬৬ (গোটা ছড়া)। লাহিড়ী, সং ৪০ : আন্না আন্না আন্না/তত্ত দুধির ফান্না / রাম-সিতেব বিয়ে / সিঁথে সিন্দূব দিয়ে।

সং ২২৪ : দিদি ভাই যাবে শ্বশুর বাড়ী, ইত্যাদি। কথান্তর : দত্ত, সং ৩৪৭ : খোকন যাবে শ্বশুব বাড়ী, ইত্যাদি গোটা ছড়া।

সং ২২৫ : ঘি-মৌরিব বাসে, জামাই এলো রাসে। কথান্তর : বদি, পৃ. ৬, সং ৬ : জবা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে ; ঐ, পৃ. ৭৯, সং ১ : চাম্পা ফুলের গন্ধে, জামাই আইছে আনন্দে।

সং ২২৬ : আজ থাক রে· , কাইল যাবি রে । কথান্তর : দত্ত, সং ১১৭, ৪১৩খ।

সং ২২৬ : আগে কাঁদে মাসী-পিসী, পেছু কাঁদে পর। কথান্তর : দত্ত, সং ৪১০খ। বন্দি, পৃ. ১২, সং ২ : আসণী কান্দে পসশি কান্দে ...।

সং ২২৯ : কাঁদইতে কঁদইতে বাপের ঘর। কথান্তর : দত্ত, সং ৭ক, খ ; ৪২৩প, ৫০৩।

সং ২৩৩ : চল রে ছানা-পুনারা শুণতে শুণতে যাব ; সং ২৩৪. আয় রে শুণতে শুণতে মামার বাড়ী। দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১৪৪, পাদটীকা। কথান্তর : দত্ত, সং ৮৭ক, খ , ১০৩। লাহিড়ী, সং ১৬১ : মাছের কাঁটা পায়ে ফুটেছে দোলায় উঠেছে/দোলায় ছিল চাকন কড়ি চাকা ভরেছে। কাসিম, পৃ. ৫২, সং, ৪০. আয় রে পুনা-পুঁড়ি ফুল টুকানিত যাই/ফুলের মালা গলায় দিয়া মামার বাড়ী যাই। ঐ, পৃ ৫৬, সং ৫১। জলীল, পৃ. ৭৬, সং ১৯. মাছোর কাঁটা পায়ে ফুটিল। খাতুন, পৃ. ১১২ : আয় রে আয় চ্যাংড়া প্যাংড়া ফুল কুড়াবার যাই ফুলের মালা গলায় দিয়া বউ আনিতে যাই।

সং ২৩৩ : বাগাল ভাইকে কিনে দিব টুপ্-বাডার বাঁশি : সং ২৮৫। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৬ : আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব মোহন চূড়া বাঁশী, ঐ, সং ৩৬৯।

সং ২৩৬ দোলিতে দোলিতে আড়া ধান, গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৫৯, ৭৬১ (প্রথম তিন ছত্র)।

সং ২৩৭ : ডিং ডিংগা. ধরে চাতি, গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৫০৪ (গোটা ছড়া)।

সং ২৩৯ : চড়ক চড়ক দুটো ঠ্যাং। কথান্তর : দত্ত, সং ৪০১ (শেষ দুই ছত্র)। লাহিড়ী, সং ১৫২ : পাবদা মাছের দাড়ি।

সং ২৪২ : ঝে-চু-চু শু। দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১৪৭, পাদটীকা। কথান্তর : জলীল, পৃ. ৭১, সং ৩। ঐ, পৃ. ৬৪, সং ৩৩।

সং ২৪৫ : ঢেবচু-চু-চু নতুন তরকারী (দ্রঃ ভৌমিক, পৃ. ১৪৮, পাদটীকা)। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ২২১। দত্ত, সং ২১৭।

সং ২৫৫ : পাগলা নিগায় হয়া পইল্। তুলনীয় : লাহিড়ী : সং ২৪।

সং ২৫৮ : উঁইষের তলে বারে বাতি জলে · পাকা ব্যাল (দ্রঃ ভৌমিক, ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা) ; সং ৫১ : জলুক বাতি · পাকা ব্যাল ; সং ২৮৯ : বাঘের তেলে · উঠুক ধুজা, ২৯১গ : বাঘের তেলে·· উঠুক ধোঁয়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৭১০, ৮৪৭। জলীল, পৃ. ৫৯-৬০, সং ১০ : বাগের

ত্যালে মোমবাতি জ্বলে/জ্বলুক বাতি, পুড়ুক ত্যাল/গাঙ শোয়ারী পাকা ব্যাল। লাহিড়ী, পৃ. ৯৩, পাদটীকা : মোসের তেলে বার প্রদীপ জ্বলে। খাতুন, পৃ. ১০৫।

সং ২০৮ : মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে/নোটোর পোটোর। তুলনীয় : জলীল, পৃ. ৬০, সং ১৪ : মাট্যা ঘুঘু ডিম পাড়ে/ডাউক কবু-করায়।

সং ২৫৮ : নোট্‌কো বে নটুয়া, ভঁইষেব খটুয়া। কথান্তব · বদি, পৃ. ২১, সং ১ : টুকরুস নাটুযা ব্যাঙেব কাটুযা।

সং ২৬০ : ইছন বিছন এলে বে বেলে বে · ছিবি আংটি হাত কাট্‌। দ্রঃ ভৌমিক, ১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকা। সং ১৭৮। কথান্তর : দত্ত, সং ১২২ক, ১২২খ (প্রথম পাঁচ ছত্র)। বদি, পৃ ২২, সং ১ : ঐ, পৃ. ১১৩, সং ১। খাতুন, পৃ. ১০৭ ইচ্‌ন বিচন ডাবক্যা মাছ, তাত্‌ ফালালো মাগুবমাছ/মাগুব মাছ লড়ে চড়ে · এ্যালপাত ন্যাল পাত, তুল্যা ফালাও এক হাত।

সং ২৬৪ : ফুলন ফুলন ফুলনাটি। কথান্তব . জলীল, পৃ ৭৫, সং ১৭ ; ঐ, পৃ ৭৬, সং ১৯। কাসিম, পৃ ১৭০, সং ৮৭। বদি, পৃ. ২০, সং ১।

সং ২৬৮ক . ও মিয়া, কি কব? ২৬৮খ : ও মিয়া, কোথায যাও? তুলনীয় : বদি, পৃ, ১২২, সং ৫, ৬, ৭।

সং ২৭৬ঘ : তালগাছে · কবেঙ্গা। তুলনীয় কাসিম, পৃ. ৮৬, সং ৩। তুলনীয় : খাতুন, পৃ. ১০২ . পিঠাপিঠি গাঙ্গে, তবলা বাজাঙ্গে।

সং ২৮৪ ' সদা সতীনের বিটি, লিত লিয়ায় লাগে। কথান্তব : দত্ত, সং ১২২খ : সদাই বিরালীর বিটি লিত্তি লিয়াই করে।

সং ২৮৪ : তর হাথি-ঘড়ায় কত জল খায়? তুলনীয় : খাতুন, পৃ. ১০৭।

সং ২৯০ক : চু-রে কুকুটী · ; ২৯১ক : চুরে রাম ডাং · । তুলনীয় . দত্ত, সং ৪৫৫ : চুরে চুকুটি/বেনা গাছে ঘুঘুটি।

সং ২৯৮ : দে বে দামান মরুচ ভাঙি' বিরাউক চখুর পানি। তুলনীয় : বদি, পৃ. ১২ সং ২ : ভাই বো হোতিনে কান্দে চোকে মরিচ দিয়া।

সং ২৯৯ : জামাইবাবু কমলালেবু ··জানে না, গোটা ছড়া। কথান্তর : বদি, পৃ. ১০২, সং ১১ : দাদাবাবু কমলালেবু এ্যাক্‌কা খাও না/আমার দিদি ছেলে মানুষ কিছুই বুজে না।

সং ৩০০ : ইষ্টিশনের মিষ্টিকুল···গোলাপ ফুল। কথান্তর : বদি, পৃ. ৭৩, সং ১ : ইষ্টিশনের বিষ্টি ফুল/আয়রে আমার গোলাপ ফুল। লাহিড়ী, সং ৫ :

ইষ্টিসনে মিষ্টি ফুল, স্বর্গের বাদাম গোলাপ ফুল ; এবং ৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকাতে : ইষ্টিসানে মিষ্টি গুড়, সখের বাজার গোলাপ ফুল। কাসিম, পৃ. ৬৪, সং ১৮।

সং ৩০০ : রাম দুই ঘোড়ার ডিম। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৯২। কাসিম, পৃ. ৪১, সং ৫।

সং ৩০১ : ছাতার উপর কোমলা, দেখ বিবির কমলা, দ্রঃ ভৌমিক সং ১২৩, ২১৯, ২২০, ২২৭। কথান্তর : বদি, পৃ. ৫, সং ৩ : ছাত্তির উপর কমলা, নাচেরে বিমলা। ঐ, পৃ. ১২, সং ১ : ছাত্তির উপরে কমলা, কাছা বিবি চ্যাপলা। ঐ, পৃ. ৮৯, সং ১১। কাসিম, পৃ ৩০, সং ৩ : ছাতির উপর বাজপাত, এলপাত বেলপাত, ঐ, পৃ. ৬৮, সং ৩৩ : ছাতির উপর কমলা, নাচে বিবি শ্যামলা ; ঐ, পৃ. ৭৮, সং ৭৬ : ছাতির উপর কমলা, নাইচ করে বিমলা ; ঐ, ৬৬, সং ৭৯ : ছাতির উপুর কদম ফুল, মুচকি নাচে মেহের কুল। দত্ত, সং ২৩৪ ছাতির উপর কদম ফুল, ভেকুআ নাচন্ নাদান ফুল ; ঐ, সং ৬০৮ক। লাহিড়ী : সং ৩৭ : ছাতির পর কমেলা, গাছের গোড়ায় আমেলা, ঐ, সং ৩৮ : নাচে বিবি ভেমোলা।

সং ৩০২ ঝিয়া ফুল ফুটে বেল নাই। কথান্তর : দত্ত, ৪৮৬।

সং ৩০৩ . তাল তলাত আসি জামাই, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৬২৪, গোটা ছড়া।

সং ৩০৫ . আলুর পাতা থালু . বে' ডুবুনি (দ্রঃ ভৌমিক, ১৮২ পৃষ্ঠায় পাদটীকা)। কথান্তর : দত্ত, সং ১১০ক, খ, গ, ঘ, ৪৩৪ (ষষ্ঠ ও সপ্তম ছত্র), ৫৪০, ৮৪২। লাহিড়ী, সং ৮৭, ৯৩, ২১৬, ২১৭। কাসিম, পৃ. ৬৭, সং ৮৪ ; পৃ. ১৫৬, সং ৫৩, ঐ, পৃ. ১৬৬, সং ৭৭। বদি, পৃ. ৬. সং ৬ : উ পান তো খামু না, ম্যায়া বিয়্যা দিমু না ; ঐ, পৃ. ৭১, সং ২, ঐ, পৃ. ১৪৯, সং ১। খাতুন, পৃ ১১১ . অত ট্যাকা নেমো না, আয়েষাক বিয়্যা দেমো না।

সং ৩০৬ : মনসুর দাদা বে' করেছে দাঁত-ক্যালানো বৌ। তুলনীয় : জলীল : পৃ ৫৪ সং ২৩ : আবাছোঁড়া লিকা, করিল চামড়া ঢিলা বুড়ি ; ঐ, পৃ. ৫৫, সং ২৭। বদি, পৃ ৭২, সং ৪ : ঠাকুরদাদা বিয়া করছে মটকা একটা বউ।

সং ৩১১ : মুলো রেঁধেছে কেডা, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ১১২ : বৌ বেঁধেছে আজকে মুলো/তাইতি তুলো তুলো ; ঐ, সং ১৩৫ . মার রান্ধা যেমন তেমন, বুনির রান্দা ছাই,/ঐ অভাগী রানলে আমি কেমন করে খাই।

সং ৩২৩ : হাজার টাকার বউ এনেছি, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৪৩।

সং ৩২৪ : সতীন গেইছে বাপের বাড়ী মোক সে আন্দন দিয়া। কথান্তর : বদি, পৃ. ১৮, সং ৭ : শতীন গেইচে বাপের বাড়ীত মোক সে আঁদোন দিয়া · আঁন্দিবার না পাঁও বাড়িবার না পাঁও/পিটির প্যালো ছাল/এ্যামোন ঘরোত্ বেচেয়া খাইচে বাবা নোয়ায় ভাল।

সং ৩২৮ : আমি কি···পটল ভাজ্যেছি। কথান্তর : দত্ত, সং ২৩ : বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ; ঐ, সং ৬৩ (গোটা ছড়া)। বদি, পৃ. ৮৫, সং ২।

সং ৩২৮ : পান কৌড়ি ··কদ কুট্য না ; সং ৩৩১ : পানকৌটি···কোট না। কথান্তব : দত্ত, সং ৬৩৮ক, খ, গ, ঘ। লাহিড়ী, সং ২০২, ২০৬। বদি, পৃ. ৯৩, সং ৪ : পানিকোড়ি পানিকোড়ি জল না জল।

সং ৩৩১ : কে দেখেচে বড্ড লেগেছে। কথান্তর : দত্ত, সং ১১৮ক, ৬২৫খ, ৬৭৬, ৭৩৭। জলীল, পৃ. ৯, সং ২৩ : দাদার হাতে তীর কামটা মাইরা ফেলাছে ডুলিতে টোঁড় সাপ কোঁস্ মারাছে। বদি, পৃ. ১১২, সং ৪ : কলম ফেল্যা মার্যাছে।

সং ৩৪২ : বড়ো গাঙের ঢেউ। তুলনীয় : বদি, পৃ. ৭২, সং ৪।

সং ৩৮৪ : তেলি, হাত পিছলে গেলি, ইত্যাদি। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৩৪।

সং ৩৯৩ : গুরুমশায় গুরুমশায় · ; সং ৩৯৪। কথান্তর : দত্ত, সং ৪০২।

সং ৩৯৪ : রামতুলসী রামতুলসী···। কথান্তর : দত্ত, সং ৫৩৩।

সং ৩৯৮ . বোষ্টম টমটম । কথান্তর : দত্ত, সং ৭০৭ক, খ।

সং ৪০০ : খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ··। কথান্তর : দত্ত, সং ৩~৪।

সং ৪২৯ : হাঁড়ি কোণে মেঘ জমেছে, উড়ে যায় গরু। কথান্তর : দত্ত, সং ১৩১ : উত্তরেতে মেঘ করেছে গরু বেড়ায় উড়ে।

সং ৪৩০ : সেইলী রে সেইলী। কথান্তর : দত্ত, ৭৬০ (গোটা ছড়া)। জলীল, পৃ. ১৫, সং ৪১ (গোটা ছড়া)। তুলনীয় : খাতুন, পৃ. ১২৪।

সং ৪৩১ : ভাত-ঘাঁটা·· ও গোদা চলিয়া গেইল্। তুলনীয় : কাসিম, পৃ. ১৬৬, সং ৭৫ : সকলে আনছে রুইত কাতলা, গোদায় আনছে ইচা/দুই সতীনে মজা কইরা গোদারে মারে পিছা।

সং ৪৩৫ : রঘুনাথের মরণ হল বেলতলার ঘাটে। কথান্তর ; জলীল, পৃ. ১৯, সং ৪৯ : রঘুমণি মারা গেল ঠিক দুপুর বেলা।

সং ৪৩৮ : ঘুঘু সই · পিঠে থুই। কথান্তর : বদি, পৃ. ৯, সং ১ : হাপন পুত কোলে থুই, পরের পুত পিঠে নই, ঘুঘু উড়ু ঘুঘু সই। . দত্ত, ৪১২খ।

সং ৪৪০ : চৈতার বউ গো, ইত্যাদি গোটা ছড়া। কথান্তর : বদি, পৃ. ৭৮, সং ৫ : চৈতার বউ গো, টেকা দেও গো, শেষে অতিরিক্ত কথা।

সং ৪৪১ : ধান নাই খায় টিপটিপার ঘাও, ইত্যাদি। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ১৪৩ : চাঁই চট্‌কা, কানকে কাটা,/তার ভুবন দেখায়েছে চিলে ব্যাটা/যে জানে না টিপটিপের ভয়/তারির কাছে সে খোপা নাচা। কাসিম, পৃ. ১'৫, সং ৫ (গোটা ছড়া)।

সং ৪৫২ : বারোমাসের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয়ক ছড়া। কথান্তর : কাসিম, পৃ. ১০৬, সং ঘ।

সং ৪৫৭ : জাতে তিত দাতে নুন ··। কথান্তর : কাসিম, পৃ. .২৫, সং ১

সং ৪৫৮ . কথান্তর খাতুন, পৃ ১৩০ : দখিনদ্বারী ঘর রাজা/পূর্বদ্বারী তার প্রজা।

সং ৪৬৩ . বাপ ভালা তার বেটা ভালা·· । কথান্তর : লাহিড়ী, সং ১০৮ এবং ১৭৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকা।

সং ৫৭৪ . ঘরের শোভা ছিকোয় পাতিলা · ইত্যাদি। কথান্তর : লাহিড়ী, সং ২৪৮।

সং ৪৭৭ক . শোলোক মোলোক বাঁশের গোঁজা···। কথান্তর : দত্ত, সং ৮০৯।

সং ৪৮৪ : তিল ত্রিফলা সিমূল ছালা (দ্রঃ ভৌমিক, ২৬৫ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকা)। তুলনীয় : দত্ত, সং ২৮২।

সং ৪৮৫ : হাতে কালী মুখে কালী···। কথান্তর : দত্ত, সং ৮৫৩। বদি, পৃ. ১১৯, সং ৮ : হাতে কালি মুখে কালি/তেবে জানছু যে ওলহা খালি।

সং ৫০৬ : মশার জালায় গেলাম বাড়ে···, গোটা ছড়া। কথান্তর : দত্ত, সং ৭৩৪ (গোটা ছড়া)। জলীল, পৃ. ৪২-৪৩, সং ২৮ (গোটা ছড়া)।

সং ৫০৯ক : ইটে কুমারের মাগো ভিঁটে বেঁধে দে । কথান্তর : দত্ত, সং ১২৩।

সং ৫২৪ : এক নেড়ে…কাণে ধরে নাচে। তুলনীয় : দত্ত, সং ১৭৫। কথান্তর : দত্ত, ২৫৩, ৪৪২, ৮৪৪।[১]

আমাদের সঙ্কলনের যে সব ছড়ার কথান্তর ও সাদৃশ্যমূলক ছড়া প্রচলিত সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে মিলেছে, ওপরে তারই কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। খুঁজে দেখলে আরো কথান্তরের উল্লেখ নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। কোনো একটি ধৃত রূপকেই আমরা ছড়াটির 'আদর্শ রূপ' বা 'বিশুদ্ধ রূপ' বলে মনে করি না। সব ধৃত রূপই লোকমানসের প্রতিবিম্ব। সে জন্যেই আমরা Diachronic দিক অপেক্ষা Synchronic দিকটিকেই গুরুত্ব দিই। ছড়ার মর্মোদ্ধার, তার রূপ ও কাঠামোটি অনুধাবন এবং তার পেছনে লোকমনস্তত্ত্বটিকে অন্বেষণের জন্যই কথান্তর নির্দেশের এই শ্রমসাধ্য আয়োজন॥

…১০…

এইবার কথান্তরের আলোকে ছড়ার অর্থোদ্ধার ও রূপতত্ত্ব-গঠনতত্ত্বের দিকটি নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে। কথান্তরের আলোকে অনেক ছড়ার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং অর্থ স্পষ্ট না হলে রূপ ও গঠনের আলোচনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। অনেক সময় কথান্তরের ফলে সরাসরি গঠনগত পরিবর্তন এসে যায়,

---

১ সুশীলকুমার দে-সঙ্কলিত 'বাংলা প্রবাদ' (দ্বি. সং ভাদ্র ১৩৫৯) বই থেকে আর ক'টি কথান্তর নির্দেশ করছি : সং ১১/৩ : গেঁড়ি গুগ্‌লি বলে এরা—আমরা শঙ্খ। সং ৪২ :… তিন ঠগের খেলা/ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেলা। সং ৪৩ : তুলনীয় : মাথার নাছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সুতো/ বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দ সিকের জুতো॥ মা বেচে খায় কলমি শাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ। সং ১২৬ : তুলনীয় : জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল। সং ১৫১ : মেয়েছেলে কাদার ডেলা, থপাস করে জলে ফেলা। সং ১৯৩ : কিসের মাসী কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন। সং ২২১ : কেঁদে কেন মর, আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর। ৩৩৭খ : শাকেই এত নাড়া, ডাল হলে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া-পাড়া। সং ৩৭৩ : তুলনীয় : ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার/ বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার। সং ৩৭৬খ : ঘোষ, বোস, মিত্র এরা কুলের অধিকারী…। সং ৩৭৮ : আগে থাকে আল্লা-উল্লা, পরে হয় উদ্দীন / তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন। সং ৪৫৭ : ভাতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ। সং ৪৫৯ : পড়াবি ত পড়া পো, না পড়াবি ত সভায় থো। সং ৪৬৭ : নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরানো হলে আতার-বাতার গুঁজি। সং ৪৬৯ : অভাগীর দুটা পুত, একটা দানা একটা ভূত। সং ৫১৪ : শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে থোড়া / ফেপার চোদ্দ ফেপীর আট, এই ধরে বছর কাট।

অনেক সময় তা আসেও না। যাই হোক, ক'টি নির্বাচিত কথান্তর নিয়ে আলোচনা করে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করছি।

১-সংখ্যক ছড়ার কথান্তরে 'দুপুরবেলা'র বদলে 'সকালবেলা' এবং 'লীলাবতী'র বদলে 'লীলাবতী' পাই। ফরিদপুরে এটি 'আবৃত্তিমূলক খেলার ছড়া', অথচ আমরা পেয়েছি ব্রতের ছড়া রূপে। এই function-এর পরিবর্তনের ফলেই 'সকালবেলা' এসে গেছে, কারণ, ব্রতটি দুপুর বেলায় করা হয়। লীলাবতী-লীলাবতীর পরিবর্তন সেই তুলনায় গুরুত্বহীন : তবে onomastics-এর দিক থেকে নতুন একটি ব্যক্তি-নাম মেলে এবং এই ধরণের নামই যে বঙ্গীয় লোকমানসের পছন্দসই, তা বোঝা যায়। ৪ ও ২৭ক-সংখ্যক ছড়া দুটিও একই সঙ্গে ব্রতেরও ছড়া, খেলারও ছড়া। function-এর পরিবর্তন এখানেও ঘটেছে, কিন্তু গঠন-কাঠামোগত পরিবর্তন পূর্ব উদাহরণটির মতো এখানেও ঘটে নি। ব্রতের ছড়ারূপেও যখন এ দুটিকে দেখি, তখন একাধিক ব্রতে একে গ্রহণ করতে দেখি। ব্রতের ছড়াতে এটির সংযোজনের অর্থ হল : ব্রত করবার ফল হিসেবে যেন এই ঐশ্বর্যের ও প্রাচুর্যের ছবিটি। কথান্তরের একটিতে (কাসিমপুরী) 'জোড়াপখি', আর একটিতে (বদিউজ্জামান) 'পানকৌড়ি'র উল্লেখ আছে। সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ ও নির্বিশেষ পাখি ঐশ্বর্যের প্রতীক। কাজেই ব্রতের ছড়া হিসেবে অংশটি যেমন ঐহিক কামনার প্রতীক, খেলার ছড়া রূপে তেমনি প্রতিপক্ষকে পরাভূত করবার কামনা রূপে ব্যবহৃত। মনোভাবের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। ৩১-সংখ্যক ছড়াটি আমাদের সঙ্কলনে তুষলার আনুষ্ঠানিক ছড়া, কিন্তু কথান্তরে (কাসিমপুরী) অনানুষ্ঠানিক ছড়া। তথাপি দেখা যায়, বিয়ের প্রসঙ্গ দুটি ক্ষেত্রেই আছে। আমাদের সঙ্কলনে যা 'ঝম্‌ঝম্ করে' কথান্তরে তাই হয়েছে 'আগুন জ্বলে',—ভাবের দিক থেকে একই। তেমনি ২৫-সংখ্যক ছড়াটি, যা তুষলার ছড়া, কথান্তরে তাই পুষালুর ছড়াতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভাব অপরিবর্তিতই আছে। ছ' বুড়ি ছ'টা ক্ষীরের নাড়ু খেলে কিংবা মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গায় স্নান করলে তার ফলাফল কি হয়, কথান্তরসহ সবগুলিতেই সে কথা একই ভাবে বর্ণিত আছে।

২-সংখ্যক ছড়াটি আমাদের সঙ্কলনে 'শিবব্রতের ছড়া', কিন্তু কথান্তরে (দত্ত) তা 'দশপুতুল ব্রতের ছড়া'। আশ্চর্যের কথা এই, বক্তব্যের খুব পরিবর্তন ঘটে নি। আমাদের সঙ্কলনে পাই কারণটি (মহাদেবের তুষ্ট হওয়া), কথান্তরে

পাই প্রতিকলটি। এইভাবে দুই কথান্তর মিলিয়ে একটি পূর্ণ বক্তব্যকে পাওয়া যায়। 'শিল' বলতে শিবের শিলাময় মূর্তিও বটে, আবার শিল-নোড়ার শিলও বটে; এবং এই কারণেই গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-আরামের কথা বলা হয়েছে।

২২ ও ৪৯৯-সংখ্যক ছড়া দুটির কথান্তরেরও অর্থ ও কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আসে নি। দুটি ক্ষেত্রেই একই মনোভাব এবং ছড়ার একই সূত্র কার্যকরী হয়েছে। তেমনি, ২৪৭ এবং ৩৫-সংখ্যক ছড়া দুটির কথান্তর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোনো স্থানে যাওয়া, যাওয়ার প্রস্তুতি, এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার বিবরণ প্রদান—যা বাঙলা ছড়ার কাঠামোগত একটি বিশেষত্ব, তা দুটিতেই আছে।

৭৫৬ ছড়াতে বলা হয়েছে, সুয্যিঠাকুর বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে 'আমড়ার আঁটি', অর্থাৎ কিছুই না। এই দারিদ্র্যের ব্যাপার কথান্তরে অন্যভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'সরাচাটা' (অন্নাভাবে সরাও চেটে খায়) মালসাচাটার মেয়েকে বিয়ে করেছে। এইভাবে একই বক্তব্য দুই কথান্তরে মেলে।

এই পর্যন্ত কথান্তরের যে আলোচনা করা হল, তাতে কথান্তরের ফলে অর্থের ও কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় নি। এমন কি, function পরিবর্তিত হলেও তা ঘটে নি। দ্বিতীয়তঃ দেখাতে চেয়েছি, ছড়ার গঠনের কয়েকটি বিশেষ সূত্র আছে (যা আগেই বলে এসেছি), কথান্তর ঘটলেও সেই সূত্রগুলি কার্যকরী থাকে। এতে আমাদের কথিত সূত্রাবলীর স্থিরতাই প্রমাণিত হয়।

এবার কথান্তরের যে দৃষ্টান্তগুলি দেব, সেগুলি কথান্তরের মধ্যে ভিন্নতার দিক। অর্থাৎ দুই কথান্তরের মধ্যে যেখানে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ যোগ নেই, অর্থটিও সহজবোধ্য নয় এবং অর্থের উদ্ধারের জন্যে একটির আলোকে অপরটিকে দেখতেই হয় (ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে যার প্রয়োজন হয় নি)। আসলে এখানেই কথান্তরের আলোচনার অন্যতম প্রধান সার্থকতা। শুধু দুই কথান্তরের পরস্পরের আলোকেই পরস্পরকে দেখা নয়, সঙ্গে অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গকেও যুক্ত করে তবে ছড়ার মর্মোদ্ধার করবার দিকটিও এর মধ্যে আছে।

যেমন, ৪০, ৪২, ২৮৪ প্রভৃতি ছড়াতে দেখা যায়, কদম বা নিমগাছের পাতা 'ঝুরঝুর' করছে। অথচ তিনটিরই পরিবেশ ভিন্ন। কিন্তু মিলও আছে: সব ক'টিতেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদের কথা আছে। কথান্তরের 'ইচিং বিচিং

জামাই কিচিং' এবং 'এলের পাত বেলের পাত' আমাদের সঙ্কলনে (সং ২৮৪) হয়েছে : 'ইকিড় মিকিড় দাঁত কিড়্-কিড়্ লহালতি বেলপাত'। সমস্ত ছড়াটি সতীনের বিষ-নজরে সন্তানের মৃত্যু ও তার পরবর্তী অনুষ্ঠানের অভিনয় ও বিবরণ। এইজন্যেই সতীনের উদ্দেশে 'দাঁত কিড়্-কিড়্' করা, তার সঙ্গে সম্পর্কটি নিমের মতো তেতো,—নিমের পাতার কাঁপুনি দাঁতের 'কিড়্কিড়্' হওয়া। বৈষ্ণব আসঙ্গে তাই কদম গাছে পরিণত। ১৪৬-সংখ্যক ছড়ায় কাঁদুনে মাসীর এবং ১৩৫গ ছড়াতে অপদেবতা 'পাঙ্কু'র বাসস্থান নিমগাছেই কল্পিত হয়েছে। মা-বাপের স্নেহময় পরিবেশ ব্যক্ত করতে তেমনি তৈলময় তিলগাছেব কথা বলা হয়েছে। এই সব কথান্তব থেকে এইবার এই কথাটি পাওয়া গেল : স্নেহ ও বিবাদ ব্যক্ত করতে বাঙলা ছড়ায় বিশিষ্ট গাছের পটভূমিকা গৃহীত হয়।

পৌষসংক্রান্তি-বিষয়ক যে ছড়াগুলি (সং ৪৬-৬০) পাওয়া যায়, সেগুলিকে গুচ্ছবদ্ধভাবে কথান্তরের আলোকে দেখলে তাদের অর্থ বোঝা যায়। চাঁদা সংগ্রহকারীরা গৃহস্থের ঘর-বাড়ীর ও অবস্থার খুব প্রশংসা করেছে, যেন তাতে গৃহস্থ বেশি চাঁদা দেবেন। বাড়ীকে প্রতীকের ভাষায় বলা হয়েছে 'বাঘাইপুব', 'বিরামপুর',—তা যেন 'ঘুঘুব বাসা' (কারণ পাখি ধনের প্রতীক), গৃহস্থ যে লাঠিখানা ব্যবহার করেন, তাও 'সোনাব লড়ি'। চাঁদা বেশি কবে দেবার ফলে তাঁব ঘব-সংসার ধনে-জনে পূর্ণ হল।

৬৫-সংখ্যক ছড়ার 'খেঁকশিয়াল' যে একই সঙ্গে 'মানবশিশু' ও 'গাভী',—কথান্তরটি না পেলে তা বোঝা যেত না, অর্থও অজানা থাকত। যেহেতু জোলার বাড়ী, সেহেতু লম্বা 'রোঁয়া' সুতোতে পরিণত। তাঁতী ও জোলা অভিন্ন ; তাঁতীর সঙ্গে ব্যাঙের যোগ দেখা যায় (তাঁতীব বাড়ী ব্যাঙের বাসা ··), এইজন্যেই কথান্তবে ব্যাঙের উল্লেখ। কথান্তরে চিংড়ি মাছ ও মুরগীর উল্লেখ দেখা যায়। মাছ-পাখির composition লোকসাহিত্যে খুবই দেখা যায়। পৃথিবীর বহু প্রাচীন দেশে মুরগীকে বীরত্বের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এইজন্যে মুরগীর সঙ্গে রয়েছে তীর মারার কথা।

৯৮-সংখ্যক ছড়া বৃষ্টি নামানোর ছড়া বটে, কিন্তু কথান্তর থেকে জানা যায়, তা সোনারায়ের মাগনেরও ছড়া। দু'য়ের মধ্যে সুন্দর যোগ রচনা করা যায়। ঝড়-বৃষ্টি যেন শিবের নাচন ; আর সেই নাচনের ছন্দ ধরা পড়েছে বাঘ ও ঘোড়ার যুদ্ধে। শিবের ষাঁড় থেকে সোনারায়ের বাঘ এবং সত্যপীরের ঘোড়ার আগমন ঘটেছে।

১০০-সংখ্যক ছড়ার বিভিন্ন কথান্তরে যে বুড়ীকে মেলে, সে চন্দ্র-সূর্য, দেবতা, পদ্মা ও ছাগলের মা। এই বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে কথান্তরই ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে। পদ্মা মানে পদ্মা নদী, পূর্ববঙ্গে মনসা রূপে যিনি দেবী, আর চন্দ্র-সূর্য এমনিতেই দেবতা। চাঁদের সঙ্গে জল ও সাপের composition লোকসাহিত্যে ও শিল্পে এক পরিচিত ব্যাপার। চন্দ্র ও সূর্য সহচর শব্দ-বন্ধনেও পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। সূর্যকে বৃষ্টির কারণ বা উৎস বলা হয়। পদ্মা যদি নদী হয়, নদী সেই জলের আধার। বৃষ্টি হবার জন্যে সূর্য ও পদ্মার কাছে যেন ছাগ নিবেদন করা হচ্ছে। এই ছাগের স্কন্ধ কাটা গেলেই সে হয় 'কাণকাটা'। চাঁদের চরকা-কাটা বুড়ী ও আলোচ্য বুড়ী তুলনীয়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১২৩ এবং ১৬০-সংখ্যক ছড়া দু'টির কথান্তরও বিচার করা যায়। ১২৩-সংখ্যক ছড়াটি রোদ-তোলার ছড়া,—চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে বকুল, ঝিঙে ও কদম ফুল বা গাছের সংযোগ দেখা যাচ্ছে। ওপরে সূর্যের সঙ্গে জলের সংযোগ দেখে এসেছি। এখানে চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে পাই ফুলের সংযোগ। ১৬০-সংখ্যক ছড়ায় তেমনি শেয়াল-কুকুরের সঙ্গে পাই গাছ-পাতা-ফুলকে, ১৭৩-সংখ্যক ছড়ায় যেমন পাই ভালুকের সঙ্গে 'পানে'র উল্লেখ। সব কথান্তর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় : চন্দ্র-সূর্য = গাছ-ফুল-পাতা = নদী, গাছ-ফুল-পাতা = মানবেতর প্রাণী। অতএব চন্দ্র-সূর্য = মানবেতর প্রাণী (যেমন, চাঁদকে 'শশধর' বলায় শশকের সঙ্গে যোগ। দ্বিতীয়ার চাঁদ গোরু-মোষের শৃঙ্গ-তুল্য, বাঙলা ধাঁধায় তার পরিচয় আছে, চীনদেশেও চাঁদের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর যোগ খোঁজা হয়)।

চাঁদের সঙ্গে যৌনপ্রসঙ্গ, বিবাহ প্রভৃতির যোগও দেখা যায়। জল, পাখি ও সাপ আর ক'টি প্রসঙ্গ, যা চাঁদের সঙ্গে জড়িত। জল-পাখি ও সাপও যৌনজীবন, বিবাহ ও উর্বরতার প্রতীক। অতএব, চাঁদ = জল-পাখি-সাপ = বিবাহ, উর্বরতা, যৌন জীবন। যেমন, ২০২ ও ২০৩ ছড়া দুটির কথান্তর। ছোটো মামার বিয়ের প্রসঙ্গে চাঁদ ও ঘুঘুকে মেলে, সঙ্গে পাই 'ষোলো' জামাইয়ের কথা। 'ষোলো' শব্দ চাঁদের ষোলো কলার দ্যোতক। মামা-মামীর বিয়েতে দু'জনের মাথায় যে সরুসুতো ও পাগড়ির কথা আছে, আগেই বলেছি, চাঁদের বুড়ী চরকাকাটে বলে সুতোর কথা। চাঁদের সঙ্গে গাছের যোগ আছে বলেই 'চিরলপাতা'র কথা পাই।

২০৫-সংখ্যক ছড়া এবং তার কথান্তর সূর্য-ঘটিত, রোদ-তোলার ছড়া। সূর্যমামা ও পানকৌড়ি এখানে একই ভূমিকা নিয়েছে। কতকগুলি পাখিকে Sun-bird বলে চিহ্নিত করা হয়। পানকৌড়ি জলজ পাখি, রোদের ঠিক বিপরীত, যেন এই জন্যেই এ পাখির গাত্রবর্ণ কালো। যে কথান্তরের প্রথমে পানকৌড়ি আছে, শেষে তার আছে উজ্জ্বল রোদের প্রসঙ্গ (দ্রষ্টব্য : সং ৬৩৮ক)। এতে পানকৌড়ি-সূর্যের অভিন্নতা প্রমাণিত। ঘেঁচু, বেগুন বা আলু, যাই কুটতে বলা হোক না, এগুলি ফল,—ফুল ও গাছের সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ তো আগেই দেখে এসেছি। এই জন্যেই এক কথান্তরে কলাগাছের প্রসঙ্গ আছে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, বাজ পড়লে কলাগাছই তা নিজের মধ্যে সংহরণ করে নেয় এবং বজ্রপাতের পেছনে আছে সূর্য। বহু ছড়ায় চন্দ্র-সূর্যের বিয়ের কথা উত্থাপিত হয়েছে। এই জন্যে কথান্তরে সূর্যের শাশুড়ীর কথা আছে। চন্দ্র-সূর্য 'মামা'ও বটে, এবং মামা-মামীর বিয়ে বাঙলা ছড়ার এক প্রিয় বিষয়, সে দিক থেকেও চন্দ্র-সূর্য বিবাহের সঙ্গে যুক্ত। সূর্য যেমন বিবাহিত, পানকৌড়িও তাই। বাঙলাদেশে পানকৌড়ি সম্পর্কে যে Aetiological myth চলিত আছে, তাতে পানকৌড়িকে এক 'কালো বউ' বলা হয়। কথান্তরে ছ' বউ ছ' ঋতুর প্রতীক। কাপড়ের প্রসঙ্গটি চাঁদ থেকে সঞ্চারিত, কেননা নানাভাবে চন্দ্র-সূর্য অভিন্ন রূপে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত।

৩২৮ এবং ৩৩১-সংখ্যক ছড়া দুটিও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সূর্যকে যেমন তরকারী কাটতে বলা হয়েছে, পানকৌড়িকেও তাই। বধূ পানকৌড়ির দু' রকম পরিণতি। এক ধরণের পরিণতিতে সে লক্ষ্মী বউ, শাশুড়ীর কথা শুনেছে (সং ৩২৮)। অপর পরিণতিতে 'বউ পালালো দুকুর বেলা', অতঃপর ঢোঁড়া সাপ আনা এবং মাথার কলম ছুঁড়ে মারা। পানকৌড়ি সম্পর্কে 'মিথ্' এই : এক কালো বউ মাছ চুরি করে খেত, শাশুড়ীর যন্ত্রণায় সে জলে ঝাঁপ দেয়। বউ পালানো মানে সেই জলে ডুবে অদৃশ্য হওয়া। পানকৌড়ি মাছ-খেকো পাখি। প্রচলিত ছড়ায় পাই : দুই পারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে এবং দাদা কলম ছুঁড়ে মেরেছে। পাখি ও মাছ দুইই বিবাহের প্রতীক, এ দুটির composition-ও খুব দেখা যায় (যেমন ২৩৩ ও ২৩৪-সংখ্যক ছড়ায় মাছ ও কড়ির যৌগপত্য ১১৪-সংখ্যক ছড়ায় বক ও কড়ির যৌগপত্যে রূপান্তরিত। অতএব মাছ ও পাখিকে সমীকৃত করা যায়), ফলে রুই-কাতলা মাছ

পানকৌড়ি পাখিতে পরিণত, অতএব সেই মাছ বা পাখিকে মারা। কথান্তরে অতঃপর সম্পূর্ণ বিয়ের বর্ণনা। ৩৩১-সংখ্যক ছড়ায় আছে সাপের উল্লেখ। এইসব যোগপন্থ থেকে বলা যায় : মাছ-পাখি-সাপ হল বিবাহ ও যৌনজীবনের প্রতীক। এক ক্ষেত্রে যা মাছের পটভূমিকায় ব্যক্ত, অপর ক্ষেত্রে তাই সাপের ইঙ্গিতে ব্যক্ত। কিছু ছুঁড়ে মারা স্পষ্টই যৌনলীলার ইঙ্গিত এবং এ কারণেই বিবাহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দান।

১৮৮-সংখ্যক ছড়ায় দেখা যায়, নৌকোর ওপর ঢোঁড়া সাপ ফণা তুলে উঠেছে। 'ট্যাপেবি' নামীয়া একটি মেয়েকে আহ্বান করায় সে এ কথা বলেছে। কথান্তরগুলিব প্রতি তাকালে মেয়েটির এ কথার অর্থ বোঝা যায়। চাঁদের সঙ্গে নৌকোব যোগ দেখা যায় (দ্রঃ এই গ্রন্থে প্রকাশিত মিশরের 'চাঁদের নৌকো'র ছবি), আর সাপ ও জলের সংযোগেব তো কথাই নেই। সব কটিই যৌ -সম্ভোগের ইঙ্গিতবাহী। নাবী চরিত্রের উপস্থিতিতে তা স্পষ্টতর হয়। কখনো খোঁপা থেকে সাপ বেব হয় (দ্রঃ ২১২-সংখ্যক ছড়া), কখনো কলসী থেকে। এই কলসী নারীদেহ। কলসী জলপাত্র, নৌকোও জল-চারী। এই-ভাবে কথান্তব থেকে আহৃত জল-নৌকো-সাপ প্রভৃতির সমবেত প্রভাবের পটভূমিকায় ছড়াটির অর্থোদ্ধার করা যায়।

'জল' যে বিবাহেব দ্যোতক তার আর এক প্রমাণ ৩৪২-সংখ্যক ছড়া এবং তাব কথান্তর। বিয়ের সঙ্গে ফুলেব উল্লেখ থাকে বলেই (তুলনীয় : 'বিয়ের ফুল ফোটা' এই বাগ্ধারা) ২১৩-সংখ্যক ছড়ার 'বরের মাথার লাল টুপি' কথান্তরে 'বরের মাথায় চাঁপা ফুল' (দত্ত : ১৬৪ক) হয়েছে। ফুলের থেকে গন্ধ এসেছে, ২২৫-সংখ্যক ছড়ায় তাই বলা হয়েছে : 'ঘি মৌরীর বাসে জামাই এল বাসে'। সব ক'টি কথান্তরেই এটি মিলেছে, কাজেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। লাল বঙ রক্ত বা উর্বরতাব প্রতীক বলে ২১৩-সংখ্যক ছড়ার 'লাল টুপি' অন্য ছড়ায় হয়েছে 'লাল শাড়ী' (সং ২১৬), কথান্তরে 'লাল গামছা'—সবেরই অর্থ এক। লাল থেকে হলুদ রঙও মেলে। একটি কথান্তরে যে হলদে শাড়ীর কথা মেলে, তা বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্য হলুদ থেকে সঞ্জাত ; তবে আমাদের সন্দেহ, টীয়ে বা শুকের হরিদ্বর্ণই ধ্বনি সাদৃশ্যে এই বর্ণগত ভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকবে। কারণ, শুক মদনের বাহন এবং বিবাহের ছড়াতে টীয়ের উল্লেখ মেলে একাধিক বার। বাঙলা বিয়ের গানে ও

ছড়ায় বর-কনে হয় রাম-সীতা, নয় হর-গৌরী। সেজন্যে ২২৩-সংখ্যক ছড়াতে রাম-সীতার উল্লেখ মেলে, বিয়ে থাকলে ফুল-ফল থাকে, এই জন্যেই এতে শিম এবং কথান্তরে বেগুন মেলে। টাট্‌কা দুধ যে আসলে 'তপ্ত' দুধ, কথান্তর থেকে তা বোঝা যায়। কারণ, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ম আছে, কনে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে ঢোকে, তখন উনুনে দুধের কড়ায় দুধ যেন উথলে ওঠে। অর্থাৎ কনের আগমনে শ্বশুরবাড়ী ধনে-বৈভবে উথলে উঠল যেন।

৩০১-সংখ্যক ছড়ায় কথিত জামাই, ছাতা, ফুল, নাচ ইত্যাদির নানা কথান্তর পেয়েছি। ফুল যেহেতু বিবাহের ইঙ্গিত দেয়, সেই হেতু 'জোমলা' নাম্নীয় নারীর নাম মেলে; এ ছাড়া কোনো কোনো স্থানে বিবাহে বর-কনের ওপর ছাতা মেলে ধরবার প্রথা আছে, কোথাও বা এয়োরা নাচে। এই নাচ 'তামাশা'র রূপ নেয় কখনো (যেমন, ২১৯, ২২০-সংখ্যক ছড়াতে), যা যৌন-লীলার দ্যোতক। সব ক'টি কথান্তর মিলিয়ে নিলে এই সব কথা স্পষ্ট হয়।

মাছ ও পাখি বিয়ের আর দুটি প্রতীক। ২৩৩ ও ২৩৪-সংখ্যক ছড়া দু'টির কথান্তরে মাছ ও কড়ির প্রসঙ্গ আছে,—মাছ আছে বলেই বেশির ভাগ কথান্তরে পরিণতি হিসেবে বিয়ের কথা আছে। মাছ প্রাচুর্য ও বৈভবের প্রতীক বলে কড়ির কথা পাই এবং ধন বলতে গোধনই শ্রেষ্ঠ ধন বলে ২২৩-সংখ্যক ছড়ার পরিণতি গাই-বাছুর ও রাখালে। আর একটি কথান্তরের পরিণতি দেখি মামার-বাড়ীর উল্লেখে। শ্বশুরবাড়ী এবং ধন-সম্পদময় সুখের রাজ্য মিলে মামার-বাড়ীর উদ্ভব হয়েছে। কোনো কথান্তরে মাছ ফুলে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একটি ছড়ার বিভিন্ন কথান্তরে যে উপকরণগুলি মেলে, সেই উপকরণের প্রতীক-গত অর্থানুযায়ী তার পরিণতি ঘটে এবং পরিণতিগুলির মধ্যে এইভাবে যোগানুভব করা যায়।

পাখির সঙ্গে যাদু-রহস্যের যোগ অনুভব করা যায় ১১৫খ-সংখ্যক ছড়া এবং তার কথান্তর লক্ষ করলে।

২১৮-সংখ্যক ছড়ায় বিবাহের স্থান হিসেবে আমতলা ও কাঁঠালতলা দুয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে, কথান্তরে কেবল কলাতলা। আমের সহচর শব্দ রূপে এবং বাক্যটির Antithetical গঠনভঙ্গির পূর্ণতার জন্যে কাঁঠাল শব্দ এসেছে। কলাগাছের উল্লেখে বাস্তবতা থাকলেও ছড়ার পঙ্‌ক্তি ও দেহনির্মাণের দিকটি বোঝা যেত না; এবং এ কারণেই কথান্তরে কলার চেয়ে কাঁঠালের উল্লেখের গুরুত্ব অধিক।

কয়েকটি কথান্তর থেকে কিছু সমাজতাত্ত্বিক উপকরণ মিলতে পারে। ২১৯-সংখ্যক ছড়াতে যেখানে পাই 'তিনো বইনি তামৃচা', পরবর্তী ছড়াতে সেখানে পাই 'তিন-এর ভাই তামশা'। বহুবিবাহ প্রথার ফলে একই পুরুষের সঙ্গে তিন কন্যার বিবাহ হয়েছিল। সে প্রথা নিন্দিত বা অবলুপ্ত বলে কন্যার কথা আর বলা হয় নি। অবশ্য এ শুধু অনুমান। ৩০৫-সংখ্যক ছড়ার কথান্তর বিচার করে সে তুলনায় কিছু দৃঢ় অনুমান করা যায়। ভিন্ন-ভিন্ন কথান্তরে মিলছে—মেজ জামাই, গোদা জামাই, খোঁড়া জামাই,—শেষ দুটি নিন্দাত্মক। নিন্দার কারণ, দেনা-পাওনা নিয়ে মতের মিল হয় নি, সে কারণেই জামাই পঙ্‌ক্তি ভোজনে অসম্মত। কথান্তরে তিন ধরণের পরিণতি মেলে: পাত্র নিজেই এ বিবাহে অসম্মত; কিংবা কনে পক্ষই বিয়ে দিতে অসম্মত। তাই তাবা 'পান' নিতে নারাজ, 'পান' নেওয়া মানে বিবাহে সম্মত হওয়া। তৃতীয় ধরণের পরিণতিতে দেখা যায়, দু' পক্ষের মনান্তর ঘুচে গেছে, তাই বিবাহের বর্ণনা। এর থেকে কেউ কেউ এমন ধারণা করতে পারেন—কালক্রমে দুই পক্ষের মনোমালিন্য ঘুচে গিয়ে এইবারে ও এতদিনে বর-কনের বিয়ে আরম্ভ হয়েছে! ৪৫২-সংখ্যক ছড়া এবং তাব কথান্তরের মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়, দুই কথান্তর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয়ক,—দুইয়েব মধ্যে এই সাদৃশ্য সামগ্রিকভাবে বাঙালী-সংস্কৃতিব ঐক্যকে নির্দেশ করে।

৪৩৮-সংখ্যক ছড়াব অন্তরালে একটি 'মিথ্‌' আছে: নিজের ছেলেকে বুকে এবং সতীনের ছেলেকে পিঠে নিয়ে 'ঘুঘু' নদী পার হচ্ছিল, স্রোতের টানে নিজের ছেলে ভেসে যায়। কথান্তরে পাই: সই লো সই তোর পুত কৈ/মোর পুত জলে। কথান্তরকে স্মরণে রাখলে এই ছড়ার অর্থোদ্ধার হয়। ৪৪১-সংখ্যক ছড়ার কথান্তর (লাহিড়ী, সং ১৪৩) রূপে যা মেলে, তার সাহায্য না নিলে ছড়াটির অর্থ করা যায় না।

কথান্তরের আলোচনায় আমরা দু'টি দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। প্রথমতঃ, বিভিন্ন বিষয়-প্রসঙ্গের সহাবস্থান, যৌগপদ্য, দ্বিতীয়তঃ, নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস ও 'মিথ্‌'-এর ওপর গুরুত্ব দান।

···১১···

এইবার ছড়ার রূপ ও গঠন তত্ত্বের চূড়ান্ত দিকের আলোচনা, অর্থাৎ ছড়ার Typology নির্দেশ করা। ওপরে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি, তা

এই চূড়ান্ত পর্যায়েরই অবতরণিকা রূপে। এই Typology নির্দেশের মধ্যেই এই আলোচনা-সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা ধরা পড়বে। ছড়ার Semiotics (বা Semiology)-র আলোচনার সারাংশের দিক হলো Typology নির্দেশের মধ্যে।

বাঙলা ছড়ার রূপতত্ত্ব ও গঠনগত বিশেষত্ব নানা দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের মনে হয়েছে, বাঙলা ছড়ার গঠন ও রূপগত 'টাইপে'র সংখ্যা খুবই কম। যে সব সূত্র বাঙলা ছড়ার বিশেষ 'টাইপ'কে গড়ে তোলে, তারও সংখ্যা বেশি নয়। একই 'টাইপ' এবং একই ধরণের সূত্রাবলী যখন বাঙলার সর্ব অঞ্চলের এবং সর্ব শ্রেণীর ছড়াতেই অনুসৃত হতে দেখা যায়, তখন মানতেই হবে, বাঙালীর সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়েছে ছড়ার মধ্যে , এবং সে সংস্কৃতির একটি গভীর ঐক্য আছে।

আমাদের মতে, বাঙলা ছড়ার রূপ ও গঠনের ক্ষেত্রে যে তত্ত্বটি ব্যাপকতম রূপে সক্রিয়, তা হল 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'। এই 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'-তেই বাঙলা ছড়ার প্রধানতম Typology নিহিত আছে, বলা যায়। আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনাতে ছড়ার রূপ ও গঠনের যে সব সূত্র নির্দেশ করেছি, তার সব ক'টিই এই 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'রই পরিপোষক। বিষয়টিকে এইভাবে নির্দেশ করা যায় :

বাঙলা ছড়া স্তরে-স্তরে বিকশিত ও প্রসারিত হয়। প্রত্যেক স্তর আবার অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের সঙ্গে নানা সূত্র দ্বারা জড়িত থাকে। এইভাবে খণ্ডের সঙ্গে সমগ্রের সেতু বাঁধা হয়। ছড়া যেন জীব-দেহের মতো, তার মধ্যে প্রতি কোষের সঙ্গে প্রতি কোষের সংযোগ থাকে ; এবং সেই জন্যেই স্তরে-স্তরে বিকশিত ও গঠিত হয়। স্তরে-স্তরে ক্রমেই প্রসারিত হবার পথে কতকগুলি ধরা-বাঁধা কঠোর নিয়ম-নীতি-সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। প্রথমে শব্দ, তারপর বাক্য, তারপর পঙ্‌ক্তি, স্তবক—এমনি করে ক্রমে-ক্রমে ছড়া নির্মিত হয়, যেন তার একটি প্রাণ বা জীবন আছে। একটি শব্দ বা ধ্বনি, তার সহচর-অনুচর রূপে আর একটি ধ্বনি বা শব্দের জন্ম দিল,—কখনো বা আনল বিপরীত ভাব-ধ্বনিকে : যে করেই হোক, এক থেকে দ্বিরুক্তির ফলে এলো দুই। এই 'দুই' এবং 'দুই'য়ের ভাবই (যেমন : জোড়া, যুগ্ম, সমার্থক ভাব, বিপরীতার্থক ভাব) অতঃপর নানা বিচিত্র উপায়ে (সেগুলিকেই ছড়া নির্মাণের

'সূত্র' বলেছি) তাবৎ বাঙলা ছড়ার ক্রমপ্রসারণের মূল সূত্র। এই 'দুই'কে ব্যাপকার্থে বলা যায় 'Binarism'। ধ্বনির সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি, শব্দের ক্ষেত্রে তেমনি Reduplication বা 'শব্দদ্বৈত'। 'শব্দদ্বৈতের' আছে নানা বিচিত্র বিভাগ। 'শব্দদ্বৈতে'র পর 'শব্দ-পরম্পরা'। 'শব্দপরম্পরা' মানে, পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ অবিকৃত বা ঈষদ্বিকৃত রূপে অব্যবহিত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে নীত বা গৃহীত হওয়া ; তারপর সেই পঙ্‌ক্তির কোনো শব্দ তার পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে গৃহীত হওয়া। এইভাবে পর-পর কয়েক পঙ্‌ক্তি জুড়ে চলে যে শব্দের খেলা, তাকেই বলেছি 'শব্দ-পরম্পরা'। এরই সঙ্গে যুক্ত আর একটি ব্যাপার, তাকে বলা যায় 'শব্দ-সমতা,' অর্থাৎ একই শব্দের একাধিক পঙ্‌ক্তিতে আবর্তিত হওয়া। এইসব ধরণের আবর্তনকে Palilogy এবং কিয়দংশে Epanalepsis বলা যায়।

শব্দের পরবর্তী দিক বাক্য। বাক্য বলতে একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশাবলী, পর্ব বিন্যাস, পঙ্‌ক্তি রচনা। বাক্যের বিভিন্ন অংশ স্থান পায় পর্বের বিন্যাসের মধ্যে। বাক্যাংশ আরো নানাভাবে বিন্যস্ত হয়। যেমন, একটি বাক্যের দুটি অর্ধ যেন দাঁড়ি-পাল্লার দুটি দিকের সমান। সমান ওজনের ভাব ও অর্থ দু' দিকে বিন্যস্ত থাকে। এইখানে আবার ওঠে শব্দের কথা। একই শব্দ অথবা সেই শব্দটির সহচর-অনুচর-প্রতিচর আর একটি শব্দ, একটি বাক্যের দুটি অর্ধে, কিংবা যে দুটি পর্বে বাক্যটি দ্বিধান্বিত, সেই দুটি পর্বে বিন্যস্ত হতে পারে। এইখানে শব্দের সূত্র বাক্যের সূত্রের অঙ্গীভূত হল। দুই অর্ধে বা দুই পর্বে বাক্য যখন দ্বিধাখণ্ডিত, দুই দিকই তখন থাকে সমান। এইভাবে, এরই ফলে সৃষ্ট হয় 'প্রতিসাম্য' (Symmetry)। অবশ্য 'প্রতিসাম্য' আরো নানা ভাবে ও রূপে ছড়ায় দৃষ্ট হয়। ভাব ও অর্থকে ভিত্তি করে বাক্যের কাঠামোর মধ্যে 'প্রতিসাম্য' প্রথমে জন্মলাভ করে অবশেষে ক্রমপ্রসারিত হতে থাকে নানা পন্থায়, গোটা ছড়ায়। বাক্য Syntax-এর দিক থেকে যেমন দুটি অর্ধে বিভক্ত হতে পারে (যেমন : Subject-Predicate ; 'Subject-Verb, Verb-object' ; phrase ; co-rrelatives) তেমনি ভাব ও প্রতিবেশ অনুযায়ীও দুই অর্ধে বিভক্ত হতে পারে। এই দুই অর্ধ যেমন Symmetrical হয়, তেমনি আবার Antithetical-ও হয়। বাক্যের দুই অংশ যেন একে অপরের প্রতিধ্বনি ও পরিপূরক। সুতরাং যে রীতিতে শব্দের আবর্তন ঘটে, ঠিক সেই একই

রীতিতে ঘটে বাক্য ও বাক্যাংশেরও আবর্তন। আমরা এর মধ্যে একটি গাণিতিক ধারা, জ্যামিতিক নকশা, গ্রাফিক আর্টকে লক্ষ করেছি। চিত্রকলার ভাষায় একেই বলা যায় Arabesque।

একটি বাক্যের বিভিন্ন অংশের বা দুই অর্থের মধ্যে যেমন জৈব-যোগ রচনা করা হয়, তেমনি একটি গোটা বাক্যের সঙ্গে আর একটি গোটা বাক্যেরও যোগ রচনা করা হয়। সে যোগ কার্য-কারণের যোগ (একে বলেছি Ergodism), প্রশ্ন-উত্তরের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ যোগ, প্রশ্ন-উত্তরের 'অন্তরমূলক' যোগ (Alternate response) প্রভৃতি। এইভাবে একটি বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের যোগ রচিত হবার ফলে বাক্যটি যেন ক্রমেই বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে স্তবকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ শব্দই হোক, ধ্বনিই হোক, আর বাক্যই হোক— একটি যেন পরবর্তী আর একটির সঙ্গে Communication স্থাপন করে।

স্তবকও ঠিক এই একই রীতি অবলম্বন করে স্তবকান্তরে উত্তীর্ণ হয়। এর জন্যে ভাবগত শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতাকে ভিত্তি করতে হয়। সুতরাং বাঙলা ছড়ার ক্রমপ্রসারণশীলতার পদ্ধতি হল : প্রথমে তা আড়াআড়ি দিকে (অর্থাৎ Horizontally) প্রসারিত হয়, পরে তা খাড়াখাড়ি দিকে (অর্থাৎ Vertically) প্রসারিত হয়। আকারে যে ছড়াগুলি ক্ষুদ্র, তাদের খাড়াখাড়ি সংযোগটি সহজে দেখা বা বোঝা যায় না।

আকারে ক্ষুদ্র যে সব ছড়া (অধিকাংশই দুই থেকে চার বা ছ'-পঙ্‌ক্তির), সে সব ছড়ায় দুটি করে অংশ বা খণ্ড থাকে। দুটি খণ্ডের মধ্যে একটা-না-একটা যোগ থাকেই। সেই যোগটিকেই এখানে খাড়াখাড়ি যোগ বলে ধরে নিতে হবে। এখানেও দেখা যাবে সেই 'দুইয়ের ভাব' বা 'দুইয়ের নীতি'। দুই অংশ যেন পরস্পরের সঙ্গে Communication রক্ষা করে চলে ; যেন পরস্পরের Antithesis ; যেন দুই অংশ মিলিতভাবে একটি Motifeme। তা হলে বাঙলা ছড়ার Typology সম্পর্কে যে ক্রমপ্রসারণশীলতার তত্ত্বটি আমরা পূর্বে উপস্থিত করেছি, তাকে এই ধরণের ছড়াতেও দেখা যায়। 'দুইয়ের ভাব' উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়।

উদাহরণ হিসেবে এই ছড়াগুলির নাম করা যায় : সং ৮ (পরের মন্দে···, পরের ভালোয়)। ১৬ (যায়, আয়)। ২১খ ('গঙ্গা যমুনা পূজ্যন' পর্যন্ত প্রথম অংশ, তারপর সেই পুজোর ফল প্রাপ্তি)। ২২ (যমুনা যেন, আমি দিই)।

৪২ ('ঠগ' যেমন ঠকায়, 'ঠাকুর'ও তেমনি)। ৪৩ (জননী ও সন্তানের অবস্থার তুলনা)। ৭৭ (দাও, নাও)। ৭৮ (এক বাড়ীর পর অন্য বাড়ী)। ৯৭গ (দূর, নিকট)। ৯৭ঘ (পশ্চিম, পুব)। ১০৪ (সাধ খাওয়া এবং তার ফল হিসেবে বেশি ধান হওয়া)। ১০৭ ('কাক বলি লবা,' পর্যন্ত প্রথম অংশ, তারপর বিপরীত অংশ)। ১০৯ ('সগার,' 'হামার')। ১৩৭ (দিনে, রাতে)। ১৩৮ (কত্তার মা, তুলার মা)। ১৪০ (প্রথম অংশে নিদ্রাবতীর আগমন, দ্বিতীয়াংশে আপ্যায়নের ফিরিস্তি)। ১৪২ (ভালুকের তেল-নুন পাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন, দ্বিতীয় অংশে না পেয়ে পালিয়ে যাওয়া)। ১৭৭ (তেল-নুন সম্পর্কে প্রশ্ন, পরে তার উত্তর)। ১৮৮ (ট্যাপেরিকে প্রশ্ন এবং ট্যাপেরির উত্তর)। ১৯১ (আমাদের ছেলে, ওদের ছেলে)। ১৯৩ (ধান দেওয়া, খেতে না চাওয়া ; ধান থেকেই ভাত হয়, তা স্মরণীয়)। ১৯৮ (ঘটি জলে পড়া এবং তা তোলবার জন্যে দৌড়ে আসা)। ২১১ (নন্দরানীর বিয়ে ও চলে যাওয়া)। ২১২ (খুকীর জন্ম ও বিবাহ)। ২১৬ (বিয়ে ও বিয়ের বর্ণনা)। ২২১ (বাবা-মা)। ২৪২ (প্রশ্ন, উত্তর)। ২৪৬ (ধ্বনি, পরে ধ্বনি অনুযায়ী বিবৃতি)। ২৯৬ (প্রথম অংশে 'অধিবাস,' দ্বিতীয়াংশে বিবাহের ফল রূপে অসন্তোষ)। ৩০২ (জামাইয়ের আগমন, তার অপ্যায়নের ব্যবস্থা)। ৩১০ (প্রথমে গহনা না দেবার অক্ষমতা, পরে গহনার শৃঙ্খলামূলক বর্ণনা)। ৩১১ (এক দিকে বউয়ের রান্না, অপর দিকে মা-বোনের রান্না)। ৩১৫ (বুলবুলি পাখির প্রতি প্রশ্ন, বুলবুলির উত্তর)। ৩২৮ (প্রথমে তরকারী কোটা, পরে রান্নার বিবরণ)। ৩৩৬ (জ্যাঠার প্রশ্ন, ভাইপোর উত্তর)। ৩৪৯ (ধান ভানার আহ্বান, পরে ঢেঁকির বিবরণ)। ৩৫২ (প্রথমে প্রশ্ন, পরে উত্তর)। ৩৫৪ (প্রথমে 'চিকা' মারা, পরে 'চিকা' খাওয়ার শৃঙ্খলামূলক বর্ণনা)। ৪৭০ক, খ ('গাব' খাওয়া ও মা খাওয়ার কথা)। কেবল নির্বাচিত দৃষ্টান্তই এখানে দিলাম।

এইসব উদাহরণগুলিতেই দুটি করে অংশ বা খণ্ড আছে। অংশ দুটির মধ্যে ভাব ও অর্থগত সংযোগও স্পষ্ট। অতএব কাঠামোর দিক থেকেও এগুলি সংহত।

দেখা গেল, 'দুই দিক' বাঙলা ছড়ার কাঠামো-নির্মিতির ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড়ো প্রভাব ফেলে থাকে। এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের একটি অংশেও দেখেছি, যে সব ক্ষুদ্রাকৃতির ছড়ায় শব্দ-পারম্পর্য আছে, সেখানেও আছে

দুই দিক বা দুই অংশের ভূমিকা। এক অংশ প্রসারিত হয়ে অপরাংশে উত্তীর্ণ হয়। এইভাবে দেখা যায়, সব ধরণের ছড়াতেই 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'র তত্ত্বটি সক্রিয় থাকে।

রূপতত্ত্বের দিক থেকে বাঙলা ছড়াকে আমরা তিন খণ্ডে বিভক্ত করেছি : আদি, মধ্য ও অন্ত্য। স্বভাবতঃই তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, এখানে বুঝি আমাদের কথিত 'দুইয়ের ভাব বা নীতি' কার্যকরী হল না। সব ছড়ারই প্রধান অংশ—তার শেষাংশ, এটাকেই আমরা ছড়ার Climax এবং লক্ষ্য বলেছি ছড়ার আদি ও মধ্যাংশকে এখানে একাংশ বলে গণনা করতে হবে। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা ছড়ার কাঠামোর মূল Typologyটিকে এইভাবে লক্ষ করতে পারি : সূচনা, পরিপুষ্টি, এবং সর্বোন্নয়নের মধ্যে 'ক্রমপ্রসারণশীলতা' ; আবার, সূচনা-পরিপুষ্টিকে একদিকে রেখে, সর্বোন্নয়নকে অপরদিকে স্থাপনা করে 'দুয়ের ভাব ও নীতি'কে লক্ষ করা।

তবে কিছু ছড়ার গঠন সম্পর্কে আমরা সন্দেহমুক্ত নই। এইসব ছড়ায় 'দুই দিকের নীতি' মেলে না। ফলে, Vertical দিক থেকে কোনো সংহতির নিয়ম উহ্যই থেকে যায়। যেমন : সং ৩গ, ৫, ৭ক, ১২, ১১/৫, ১৩, ১৭, ২০ক, ২১ছ, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৬৮,৮২খ, ৮৭,৯৭ক,৯৯, ১১৪, ১৬১, ৩০৪,৩৬২, ৪৪০, ৪৪২ প্রভৃতি। এইসব ছড়া যেন একমুখীন। কিন্তু খাড়াখাড়ি দিকের সংহতি না থাকুক, আড়াআড়ি দিকের সূত্রগুলি সবই অনুসৃত হয়েছে। 'একমুখীন' বলতে কি বুঝি, উদাহরণ দিয়ে তা বলি। যেমন, ৫-সংখ্যক ছড়াটি। এটিতে কেবল চাইবার তালিকাই আছে, পাবার দিক একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু যদি ৪-সংখ্যক ছড়াব মতো চাওয়া ও পাওয়া উভয় দিকই এতে থাকত, তবে কাঠামোর পূর্ণতাও থাকত। তা নেই বলেই একে 'একমুখীন' বলি।

বাঙলা ছড়ার গঠনরীতিতে নিশ্চয়ই আরো Type কার্যকরী হয়েছে। হয় সেগুলি আমাদের চোখে ধরা দেয় নি, নয়তো তাদের সম্পর্কে কোনো সূত্র এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। প্রদত্ত Typology দিয়ে বর্তমান সঙ্কলনেরই তাবৎ ছড়াকে বাঁধা যায় না। সে অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণই সজাগ আছি।

...১১...

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা লোককথার গঠনগত দিক নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: রাশিয়ার Vladi'mir Propp এবং ফ্রান্সের Claude Levi'-Strauss. তবে দু'জনের দৃষ্টিকোণের পার্থক্যও আছে। প্রপের ধারাটিকে বলা হয় 'Syntagmatic structural analysis'; আর লেভি-ষ্ট্রসের ধারাটিকে বলা হয় 'Paradigmatic structural analysis'. দুটি অভিধাই ভাষা-বিজ্ঞান থেকে ধার করা। Syntagmatic রীতি হল . একটি বাক্যে যেমন পর-পর অর্থ-বোধক শব্দ যোজনা করে পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করা হয়, লোককথার গঠনগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও কাহিনীর পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতাকে তেমনিভাবে অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ কাহিনীটিতে ঘটনার ধারা যে শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য অনুসারে প্রবাহিত হয়, আলোচনা-বিশ্লেষণের ধারাও তারই সঙ্গে সঙ্গতি-সমতা রক্ষা করে অগ্রসর হয়। আমরা এ পর্যন্ত ছড়ার যে গঠনগত বিশ্লেষণ করে এসেছি, তা এই রীতির অনুসরণ করেই।

ভাষা-বিজ্ঞানে Paradigme শব্দের অর্থ হল: 'set of forms having a common element which occurs with various affixes · 'যেমন, I sing, you sing, he sings. কিংবা, শব্দরূপের ক্ষেত্রে: he, him, his. এক-একটি গুচ্ছ ('set of forms') এখানে মূল লক্ষ্য। এই রীতিতে লোককথা বা মিথ্-এর কাঠামো বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে তাকে গুচ্ছে-গুচ্ছে বিশ্লিষ্ট করে ঢেলে সাজতে হবে। যে ধারা বা ভঙ্গিতে কাহিনীটি কথিত হয়, তাকে সম্পূর্ণই এখানে উপেক্ষা করা হয়। গুচ্ছে-গুচ্ছে বিশ্লিষ্ট এবং গবেষক-কর্তৃক নতুন করে বিন্যস্ত কাহিনীর বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ে অতঃপর গবেষক কাহিনীর গঠনগত বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই ভঙ্গিতেই Levi'-Strauss 'মিথ্'-এর আলোচনা করেছেন।

আগেই বলেছি, আমাদের আলোচনা মোটামুটি Syntagmatic. তবে Paradigme-কে ভিত্তি করেও ছড়ার কাঠামো বিশ্লেষণ করা যায়। লেভি-ষ্ট্রসের রীতিকে আমরা সর্বত্র এবং পুরোপুরি গ্রহণ করি নি। তাঁর রীতি কেবল four-term homology আবিষ্কারের মধ্যেই প্রতিফলিত। আমরা Paradigme-কে ভিত্তি করে অন্যান্য দিকেও আলোচনাকে প্রসারিত করতে পারি। দু-একটি নিদর্শন এই:

দৃষ্টান্ত : ১। ছড়া সংখ্যা : ৭৩ক :

১	২
কুটব কে	নিজে কুটলাম যেমন তেমন কইর‍্যা
রাঁধব কে	নিজে রাঁধলাম যেমন তেমন কইর‍্যা
খাইব কে	নিজে খাইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা
কুড়াইব কে	নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা
ধুইব কে।	নিজে ধইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।

৩	৪
কুটনী দা হাতে কইর‍্যা	ওরা আইল কুটনী দা হাতে কইর‍্যা
রাঁধুনী কড়াই হাতে কইর‍্যা	ওরা আইল রাঁধুনী কড়াই হাতে কইর‍্যা
খাওনী থাল হাতে কইর‍্যা	ওরা আইল খাওনী থাল হাতে কইর‍্যা
কাঁটা কুড়ানী গোবর হাতে কইর‍্যা	ওরা আইল কাঁটা কুড়ানী গোবর হাতে কইর‍্যা
ধুয়নী জল হাতে কইর‍্যা।	ওরা আইল খাল ধুয়নী জল হাতে কইর‍্যা।

ইচ্ছে করেই একটি শৃঙ্খলামূলক ছড়াকে এখানে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কথিত 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'-র দিকটি চমৎকার রূপে ছড়াটিতে উপস্থিত। কিন্তু Paradigme-গত আলোচনা এই রকম : ছড়াটিকে ধারাবাহিক রূপে গ্রহণ করা হয় নি, মোট চারটি গুচ্ছে তাকে ভাগ করে নতুন করে বিন্যস্ত করেছি। বিন্যস্ত করেছি ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য এবং ভঙ্গিগত দিক থেকে। এইবার এই গুচ্ছগুলি পর্যবেক্ষণ করতেহবে দু' দিক থেকে · আড়াআড়ি অর্থাৎ ধারাবাহিক-ভাবে ; এবং খাড়াখাড়ি অর্থাৎ গুচ্ছবদ্ধভাবে। খাড়াখাড়িভাবে দেখা যাচ্ছে : মাছ কোটা-রাঁধা-খাওয়া-কুড়োনো-ধোওয়া ; দা-কড়াই-থালা-গোবর-জল—এইভাবে একটি কর্মের পর্যায় ও ধারা বর্ণিত হয়েছে। আড়াআড়িভাবেও দেখা যায় একই ব্যাপার। দু' দিক থেকেই বোঝা গেল ছড়াটি ক্রমবৃদ্ধিশীল,—এবং প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশ সংযুক্ত, প্রশ্নের বিপরীতে আছে উত্তর, 'নিজের' বিপরীতে আছে 'ওরা' ; এইভাবে Binarism-কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এখানে।

দৃষ্টান্ত : ২। ছড়া সংখ্যা : ৫৭

১

'সোনার লাঙ্গল রুপার কাল··· আমোন ধানের গুড়িত রে।' 'পোলা'। 'ঘরগুষ্টি'।

[আমন ধানের ক্ষেতে কৃষক তার ছেলে, জামাই এবং অন্যান্য স্বজনসহ সুন্দর লাঙল দিয়ে চাষ করছিল]

২

'আইলাম রে ভাই কান্দি ভাইয়া···ঘরে যায়।' 'ও পোলা আমার রে'।

[এমন সময় এল বাঘ। বাঘ হরিণ-সজারু খেল, কৃষকের ছেলেকেও খেল। সেইজন্যে কৃষি-কর্ম বন্ধ রইল, সোনার লাঙল ঘরে তুলে রাখতে হল। কৃষক সেই দুঃখ কেঁদে-কেঁদে ব্যক্ত করতে এসেছে]

৩

'আমোন ধানের বড় বড় পাত্তা'।

[এই বাঘের আক্রমণ না হলে, সগোষ্ঠি চাষের জন্যে আমন ধানের ভালো ফলন হত]

৪

'বন বাসী যায়াম রে'

[ধান ও পুত্রের শোকে কৃষক বনবাসে যেতে চায়]

'বনেতে বেরুয়া বাঁশ···সেলামে থাক'

[বনবাসে গিয়ে অর্থাৎ নতুন স্থানে গিয়ে আবার চাষবাসের ফলে কৃষকের সুখ-সমৃদ্ধির কাল্পনিক চিত্র

এই দৃষ্টান্তটি পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের তুলনায় ভিন্ন। এটিতে ছড়াটিকে শুধু বিশ্লিষ্টই করা হয়নি, ক্রমেরও বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। আরম্ভ ধরেছি ছড়ার পঞ্চম পঙ্‌ক্তি থেকে। 'পোলা' ও 'ঘরগুষ্টি' শব্দ দুটিও ভিন্ন-ভিন্ন স্থান থেকে এনে এই অংশে জুড়ে দিয়েছি। মোট চারটি অংশে ছড়াটিকে ভাগ করেছি। তৃতীয় বন্ধনীতে ক্রমান্বয়িক ঘটনার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, আড়াআড়ি দিকের কাজ তাতেই সারা হয়েছে। এইবার খাড়াখাড়ি দিক থেকে বিচার : প্রথম অংশ থেকে বোঝা যায়, সমাজ সংহত হবার পর, এই ঘটনা ঘটেছে। তাই পুত্র, জামাতা, (জামাতা যখন শ্বশুরের সঙ্গে চাষ-বাস করছে, তখন তার মধ্যে কি মাতৃতান্ত্রিক দিক আছে ?) ও স্বজনসহ কৃষিকর্ম করা হচ্ছে। দ্বিতীয় অংশের থেকে জানা যায় : সমাজের সংহতি ও বাঁধুনি খুব দৃঢ়, তাই ব্যক্তিগত বিপদের ব্যাপার প্রতিবেশীর কাছে জ্ঞাপন করা হচ্ছে, প্রতিকারের জন্যে। যেন প্রতিবেশীরা সকলেই সমবেত হয়ে বাঘকে দূর করে দেবে। তৃতীয় অংশে কৃষকের কল্পনা, স-গোষ্ঠী চাষের ফলে আমন ধানের বড়ো-বড়ো শীষ্ উঠত। 'আমন'ই যে প্রধান শস্য, তাও এই উক্তিতে প্রমাণিত। চতুর্থ অংশ থেকে বাঙালী ও ভারতীয় জীবনের আর

একটি সাংস্কৃতিক উপকরণ মেলে। মনে খেদ বা দুঃখ হলে এদেশের মানুষ 'বনবাসে' যেতে চায়। পুত্রশোকের কথা যখন আছে, তখন 'রামায়ণ' ও রামচন্দ্রের বনবাসের কথাও অস্পষ্টভাবে এখানে উপস্থিত। পরবর্তী অংশ থেকে তা বোঝা যায়। 'বনবাস' এক বিশেষ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ধানের শোক ও পুত্রের শোকে কৃষক 'বনবাসে' যাবে বলেছে বটে, কিন্তু তা প্রাথমিক অর্থেই মাত্র। আসল 'বনবাস' মানে বন কেটে নতুন বাসভূমি প্রস্তুত করা, যেখানে বাঘ নেই। নতুন বাসভূমিতে থাকবে বাঁশের তৈরি ঘর; নীল হাঁস পুকুরের আভাস দেয়, নীল পারাবত তেমনি ধনের প্রতীক। তেলে-জলে মসৃণ শরীর। প্রশস্ত কলার পাতায় প্রচুর অন্ন ঢেলে খাবার সুখের চিত্র। এবং এই নতুন বাসভূমিতে যাওয়া হবে স-গোষ্ঠী। সমস্ত ছড়াটি তা হলে নতুন বাসভূমি রচনার পটভূমিকায় রচিত, মানুষ যখন নৈসর্গিক জগতের উপদ্রবে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেত। এইভাবে Paradigme-কে ভিত্তি করে ছড়াটি একটি নতুন অর্থগত মাত্রা পেল,—ছড়ার আক্ষরিক অর্থের মধ্যে যা নেই। এই সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব ও অর্থ আবিষ্কারেই এই ধরণের আলোচনার সার্থকতা। যাই হোক, Binarism-এর মধ্যেও মেলে। প্রথম গুচ্ছে ভালো করে কৃষিকর্ম চলতে থাকার বিপরীতে দ্বিতীয় গুচ্ছ, বাঘের আক্রমণে তা ব্যাহত হওয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ গুচ্ছ আবার এদের বিপরীতে, নতুন বাসভূমিতে গিয়ে ভালো কৃষি-কর্মের ফলে সুখ-সমৃদ্ধির কাল্পনিক চিত্র আঁকা। এইভাবে fourterm homology-কে এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

দৃষ্টান্ত : ৩। ছড়া সংখ্যা : ২২৬

১

'আজ থাক রে সংসার কাঁদায়ে।'
'আগে কাঁদে মাসী-পিসী, পেছু কাঁদে পর।'
'কে রে কলা-বাড়িয়ে খাবার-গুড়ুর করে।'

২

'জামাইকে আনইব শাঁখা-শাড়ি দিয়ে।'
'বাপে দিল সরু শাঁখা, মাএ দিল-শাড়ি।'
'কলা শাগ রাঁধ্‌ইব হিংমশলা দিয়ে।'

৩

'জামাই গেল রূষে।'
'পরের বাটায় মারইল চড়।'

৪

'কাঁদইতে-কাঁদইতে বাপের ঘর
'যাবি পরের ঘর'
'আর যাব না গো বাপু সেই শ্বশুরের বাড়ি।'

ছড়াটিতে আগাগোড়া ঘটনার বিপর্যয় ঘটেছে। আমরা গুচ্ছে-গুচ্ছে ভাগ

করে, বিশ্লিষ্ট করে, নতুনভাবে তা বিন্যস্ত করেছি,—এইবার কালানুক্রমিকভাবে দেখলে ঘটনার পর-পর ধারাগুলি সহজেই বোঝা যাবে : বর-কনের বিয়ে আজ রাতে হল, কাল তারা চলে যাবে, সবাই কাঁদছে। ক'দিন পর বর-কনেকে আনা। তাদের ধুতি-শাড়ি দেওয়া, বিশেষ তরকারি রেঁধে আপ্যায়ন। বর-কনে ঘর করছে। একদিন বর কনেকে প্রহার করলে। কনে কেঁদে বাপের বাড়ি এল। রেগে বলে, সে আর শ্বশুরবাড়ি যাবে না। আড়াআড়ি দিক থেকে বিচার করে এই পাওয়া গেল। এইবার খাড়াখাড়ি দিক থেকে বিচার : প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে, পর-পর তিনটি প্রসঙ্গে মিলে যে একটি গুচ্ছ রচনা করা হয়েছে, তা 'কাঁদাব'। এই কান্না পারিবারিক জীবনের গভীর বন্ধনের দিক। তৃতীয় দিকটি হল ঠিক এর বিপরীত দিক, সেখানে আছে প্রহার। দ্বিতীয় অংশে কনে-জামাইকে আনা ও আপ্যায়ন, চতুর্থ অংশ ঠিক এর বিপরীত, সেখানে কনের বাপের বাড়ী আসা আর সুখের নয়। প্রথম অংশেও কান্না আছে, চতুর্থ অংশেও আছে, কিন্তু দুই কান্নায় ভেদও আছে। যাওয়া এবং ফিরে আসা এর মধ্যে আর এক বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। এক-একটি অংশ আর একটি করে বিপরীত অংশের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবে এর মধ্যে Binarism দেখা যায়। তবে এই দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ত করবার সময় ইচ্ছে করেই আমরা প্রথম গুচ্ছের বিপরীতে দ্বিতীয়গুচ্ছ স্থাপন না করে তৃতীয় গুচ্ছ স্থাপন করেছি। এখনও অনেক অঞ্চলে নারীর দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণের প্রথা আছে। স্বামিগৃহে অত্যাচারিত হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে এলে অনেক ক্ষেত্রে পিতাই কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়ে থাকেন। বর্তমান ক্ষেত্রে কনের শ্বশুরবাড়ীতে না যাবার প্রতিজ্ঞা সেই দিকেরই ক্ষীণ আভাস দিচ্ছে বলে অনুমিত হয়। বিবাহের পরবর্তী একটি প্রথার ওপর আলোক পাত করা হয়েছে : বিবাহের ক'দিন পর জামাতা-কন্যাকে জোড়ে নিয়ে আসা। এই সব দিক থেকে ছড়াটির সাংস্কৃতিক পটভূমিকা পরিস্ফুট হয়।

বিভিন্ন ধরণের তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে Paradigme-কে ভিত্তি করে ছড়ার কাঠামোর আলোচনার নিদর্শন দেওয়া গেল। বাঙলা ছড়ার মধ্যে অনেকেই অসঙ্গতি-অসংলগ্নতার আতিশয্য লক্ষ করেছেন। Syntagmatic দিক থেকে লক্ষ করলে তাই অনেক সময় মনে হয় বটে, কিন্তু Paradigmatic দিক থেকে দেখে, বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে ওলট-পালট করে পুনর্বিন্যস্ত করলে

আর তা মনে হয় না। এই জন্যে আমরা মনে করি, Paradigme-কে ভিত্তি করে বাংলা ছড়ার কাঠামো বিশ্লেষণের অপার সুযোগ আছে। সে কাজ যতো শীঘ্র শুরু হয়, ততোই মঙ্গল।[1]

...১৩...

ওপরে Claude Levi´-strauss-এর অনুসরণে বাংলা ছড়ার যে paradigme-ভিত্তিক আলোচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেওয়া গেল, সে সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত মন্তব্যের প্রয়োজন আছে। লেভি-স্ট্রসের পদ্ধতি বিভিন্ন সমালোচকের কাছে ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। যেমন, Jonathan Culler তাঁর 'Structuralist Poetics' (Cornell University Press,

---

১ লোককথা ও মিথ-এর রূপতত্ত্ব ও কাঠামো সম্পর্কে যে সব আলোচনা উল্লেখযোগ্য এবং আমরা যে সব আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছি, সেগুলি হল : ১. Morphology of the folktale (Revised 2nd edition, 1968, Indiana University, New introduction by Alan Dundes) . Vladimi'r Propp. ২. Structural Anthropology [ফরাসী থেকে ইংরেজীতে অনূদিত, নিউইয়র্ক, ১৯৬৩] বইয়ের 'Structural Study of Myth' [pp. 206-231] প্রবন্ধ : Claude Levi'-strauss. ৩. Alan Dundes-সম্পাদিত The study of Folklore [Prentice Hall, Inc., Englewood cliffs, N. J., 1965] বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ : ক. 'Epic laws of folk narrative' [pp. 129-141] : Axel Olrik. খ. Structural Typology in North American Indian Folktales [pp. 206-215] : Alan Dundes ৪. Approaches to Semiotics (Soviet Structural Folkloristics) : Edited by Thomas A. Sebeok ; Introduction : P. Maranda (vol. 1: Mouton, The Hague, 1974) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ : ক. Structural Typological Study of Folktales (pp. 19-51) : Eleazar Meletinsky. খ. Marriage : its function and position in the structure of folktales (pp. 61-72) : Eleazar Meletinsky. ৫. Stylistic Repetition in the Veda (Amsterdam, 1959) : J. Gonda.

Ithaca, New york : Second printing, 1976) বইটিতে লেভি-ষ্ট্রসের সমালোচনা করেছেন।

লেভি-ষ্ট্রসের মূল আলোচ্য বিষয় 'মিথে'র গঠন ও কাঠামো। আধুনিক যুগে 'মিথ্'কে মানবমনের মূল ভিত্তির ক্রিয়াকলাপের প্রকাশক রূপে ব্যাখ্যা করবার প্রবণতা দেখা যায়। লেভি-ষ্ট্রস্ বলেন, সচেতনভাবে, এবং বিশেষতঃ অবচেতনভাবে, মানুষের মন হল একটি 'structuring mechanism'—যা কিছুই সে চোখের সামনে দেখে বা হাতের কাছে পায়, তারই একটি form বা 'রূপ'কে সে গঠন করে নিতে চায় মনে-মনে। নইলে স্মৃতির মধ্যে তা রক্ষা করা বা সে সম্পর্কে অর্থ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

সভ্য মানুষ যেখানে অনেক নির্বস্তুক শ্রেণীভাগ এবং গাণিতিক সূত্রদ্বারা জগদ্ব্যাপারের ব্যাখ্যা করে, আদিম মানুষও তেমনি 'যুক্তি' বা 'Logic' প্রয়োগ করে; তবে তাদের শ্রেণীবিভাগ আরো বাস্তব ও বস্তুময়। তারা কতকগুলি যুক্তির কঠোরতাকে মানে। তাদের এই যুক্তি প্রকাশের উপায়কে বলা যায় 'code'. 'code' কি? কোনো বিশেষ একটি অভিজ্ঞতার অঞ্চলকে কয়েকটি বিষয়-প্রসঙ্গ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা: তারপর, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা; এবং তার ফলে যে সব নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি পাওয়া গেল, তার দ্বারা অন্যান্য বিষয়কে প্রকাশ করা। 'code' হল আসলে 'logical tools'. 'মিথ্' যদি আদিম মানুষের মনের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে, তবে 'মিথ্'ও হবে 'code' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'মিথে'র মধ্যে যে সব ঘটনা-বিষয়-প্রসঙ্গ থাকে, তাদেরও ব্যাখ্যা করতে হবে উপর্যুক্ত 'code'-এরই আলোকে। সেটাই গবেষকের কাজ বলে লেভি-ষ্ট্রস মনে করেন।

'Code'-এর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণীত হয় এক-একটি আদিম সমাজের সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক পটভূমিকা দিয়ে। অর্থাৎ, একটি আদিম সমাজ ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ প্রভৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তারই আলোকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আইডিয়াগুলি ঠিক একে অপরের বিপরীতে, বিরুদ্ধ গুণান্বিত। লেভি-ষ্ট্রস এই জন্যে 'মিথে'র উপকরণ গুচ্ছের [এগুলিকে তিনি বলেন 'Mytheme'] চারটি গুচ্ছকে দুই জোড়ায় বিভক্ত করে সাজিয়ে নিয়েছেন, যেগুলি একে অপরের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং আন্তর-সাদৃশ্যসংযুক্ত। তাঁর মতে, 'মিথ্' হল এক জোড়া উপকরণগুচ্ছের সঙ্গে আর এক জোড়া

উপকরণগুচ্ছের সম্পর্ক স্থাপন। 'মিথে'র মধ্যে তিনি দেখেছেন 'fourterm homology' অর্থাৎ 'চতুষ্পদী সাদৃশ্য-মূলকতা'। চারটি ভাগে 'Mytheme'-গুলিকে লেভি-ষ্ট্রস এমন খাড়াখাড়িভাবে বিন্যস্ত করেন যে, প্রতিটি গুচ্ছের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ থাকবে যা ওই homological structure-এর অঙ্গ হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্তরূপে তিনি Oedipus myth-এর ব্যাখ্যা করেছেন। এই দৃষ্টান্তে প্রথম খাড়াখাড়ি স্তম্ভের বক্তব্য যেন দ্বিতীয় খাড়াখাড়ি স্তম্ভটির বিরুদ্ধতাযুক্ত, তৃতীয় ও চতুর্থ খাড়াখাড়ি স্তম্ভ দুটি আবার প্রথম দুটির সঙ্গে বিরুদ্ধতাময় যেমন, তেমনি একই ভাবনার অন্তর্গত বলে সম্পর্কযুক্তও বটে।

একটি 'মিথ্'কে এইভাবে চারটি স্তম্ভে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করবার পর, দুই জোড়া স্তম্ভের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যে থাকে মূলতঃ Binarism. এই বিশেষ পদ্ধতিতে মিথের বিশ্লেষণের পর, অতঃপর তার দ্বিতীয় স্তর। গবেষককে 'মিথে'র কেবল কাঠামো বিচার করলেই চলবে না, অর্থকেও আবিষ্কার করতে হবে। সে জন্যে কেবল একটি মিথের মধ্যে বন্দী থাকলেই চলবে না। একটি মিথের ব্যাখ্যার জন্যে দ্বিতীয় আর একটি সম্পর্কান্বিত মিথের সাহায্য গ্রহণ; এবং সেটিকে অনুধাবনের জন্যে তৃতীয় আর একটি মিথের সাহায্য নেওয়া। প্রত্যেকটির আলোকে প্রত্যেকটি দেখবার ফলে একটি পূর্ণ ও সামঞ্জস্যমূলক অর্থকে মেলে। এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে লেভি-ষ্ট্রস বলেছেন, 'a spiral movement' এই পদ্ধতিতে একটি মিথ্ transformed বা 'সংবর্তিত' হয় আর একটি মিথে; এই সংবর্তনের মাধ্যমেই মিথটির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

লোককথা এবং মিথ্-এর রূপ ও কাঠামো বিচারের দিকটি মূলতঃ ভাষা-বিজ্ঞান থেকে সঞ্চারিত। ১৯২০-৩০-এর দশকেই নৃতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রূপ ও গঠনগত আলোচনার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল। লোককথার আলোচনায় তখনও এই ধারার প্রভাব পড়ে নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার V.Propp যে 'Morphology of the folktale' নামে বই লিখেছিলেন, নানা কারণে তার ফল গবেষকদের ওপরে প্রভাব ফেলে নি। ইংরেজী, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রায় তিন দশক পর হলে অনেকেই তখন এ দিকে দৃষ্টি ফেরান। লেভি-ষ্ট্রস মূলতঃ একজন নৃতাত্ত্বিক, কিন্তু তিনি ছিলেন structural linguist-দেরও একজন, স্বভাবতঃই মিথ্-এর রূপ ও গঠনের প্রতি

মনোযোগী হয়েছিলেন। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তিনি এই 'গঠনগত' দিকটিকে লক্ষ করেছেন। এর মধ্যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ফিলাডেলফিয়া (পেনসিল্‌ভানিয়া)-র Avram Noam Chomsky (জন্ম : ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮) বের করেন তাঁর বিখ্যাত বই 'Syntactic Structure' (The Hague: Mouton, 1957)। ভাষা-বিজ্ঞানের এই বইটিতে যে তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয়, তা বিভিন্ন বিষয়েও প্রযুক্ত হতে থাকে। লোককথা ও মিথের ক্ষেত্রে তো বটেই।

Chomsky-কথিত 'সঞ্জনন' (generative) এবং 'সংবর্তন'-মূলক (transformational) ব্যাকরণ বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে মানুষের মনকে নতুন করে উপলব্ধি করায়। একটি বাক্য বক্তার মনের গহনে যখন প্রাথমিক অবস্থায় রূপ ও অর্থসহ ধরা দেয় (এটিকে তিনি বলেন 'Deep structure') তখন প্রকাশের জগতে সেটি ঠিক সে ভাবেই এসে পৌছয় না (এই প্রকাশের বাক্যটিকে তিনি বলেছেন 'Surface structure') : নানাভাবে ওই প্রাথমিক বাক্যটির মধ্যে অন্য শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশের 'সঞ্জনন' এবং বাক্যটির 'সংবর্তন' ঘটে থাকে অর্থকে লক্ষ্য বা ভিত্তি করে। মিথের গঠনের ক্ষেত্রেও এই 'সংবর্তন'কে লক্ষ করা হতে থাকল। Jonathan Culler তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইটিতে লেভি-স্ট্রসের আলোচনা-পদ্ধতির সমালোচনা করে মন্তব্য করেছেন · 'Such transformations have nothing to do with transformational grammar'—(p. 25)। তিনি মনে করেন, Chomsky-র 'transformational grammer'-এর নিয়মাবলীর বিস্তৃততর ব্যাখ্যা প্রয়োজন, নইলে নানা ভুল বোঝা-বুঝির সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে। 'সংবর্তন' (transformation) হল বিশেষ কয়েকটি পদ্ধতি, 'but until the rules of those systems are made more explicit, the attempt to formulate transfarmation is likely to lead only to confusion.' যেমন হয়েছে লেভি-স্ট্রসের ক্ষেত্রে।

Paradigme-কে ভিত্তি করে লেভি-স্ট্রস যে পদ্ধতিতে মিথের গঠনগত আলোচনা করেছেন, Jonathan culler তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইটিতে (pp.42-43) তারও সমালোচনা করেছেন তিনটি দিক থেকে : প্রথমতঃ লেভি-স্ট্রস প্রতিটি মিথ্‌কে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে চান ; কিন্তু অপর একটি মিথ্‌কে কোন্ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত করা যাবে,

তার কোনো নির্দেশ নেই। দ্বিতীয়তঃ, কোন্-কোন্ উপকরণগুচ্ছকে আলোচ্য কাঠামোর অঙ্গ বলে নির্বাচিত করা হবে, তার কোনো নিয়ম প্রদর্শিত হয় নি; তা আলোচকের ব্যক্তিগত খুশি ও রুচির ওপর নির্ভর করে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বা উপকরণ বাদ পড়ে যায়। তৃতীয়তঃ, যে code-এর আলোকে লেভি-স্ট্রস মিথ্‌কে বিচারের কথা বলেছেন, এই বিশেষ পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত তা প্রাধান্য পায় না। শেষ পর্যন্ত যা প্রাধান্য পায়, তা হল four term homology আবিষ্কার।

যাই হোক, আমরা লেভি-স্ট্রসের পদ্ধতিকে ছড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি। সে জন্যেই মিথের প্রসঙ্গ নিয়ে এতো কথা বলা হল।

এইবার আর একটি প্রসঙ্গে আসছি। Jonathan Culler প্রমুখ গবেষকগণ লোককথা, মিথ্‌ প্রভৃতির গঠনগত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত transformational analysis-কে Chomsky-র তত্ত্বের সঙ্গে যোগ-বিরহিত বললেও পরবর্তী গবেষকগণ কিন্তু এ বিষয়ে নিরস্ত হন নি। লোককথা তো বটেই, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার গঠনগত আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা নিরলসভাবে transformation-কে প্রয়োগ করে চলেছেন। যাঁদের আলোচনা এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁরা হলেন Elli Kongas Maranda এবং Pierre Maranda. এঁদের দু'জনের যুগ্মভাবে সম্পাদিত 'Structural Models in Folklore and Transformational Essays' (Mouton : The Hague, Paris : 1971) বইটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, P. Maranda লিখিত 'Of bears and spouses./Transformatianal analysis of a myth' (pp. 95-115) এবং E. K. Maranda লিখিত 'A tree grows/Transformations of a riddle metaphor' (pp. 116-139) প্রবন্ধ দুটি থেকে 'transformation' সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটিকে স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া যায়।

P. Maranda-লিখিত প্রবন্ধটি এস্কিমোদের মধ্যে চলিত তিনটি মিথের বিচার: এস্কিমোদের দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনে ভালুক কি ভূমিকা নেয়, তাদের বন্য ও গৃহজীবনে যাদু ও অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাস কি ভাবে সক্রিয় হয়, তাই প্রদর্শন করা। প্রথমে দুটি মিথের তুলনামূলক আলোচনা, পরে তারই ফলাফল ও সিদ্ধান্তটিকে তৃতীয় আর একটি মিথের পটভূমিকায় যাচাই করা।

এই যে 'to pass from one myth to the other,' এটিকেই তিনি বলেন 'transformation'. এই পদ্ধতির মধ্যে তিনি 'inversion'-কেও লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ একটিতে যে সব উপকরণ ও বিশেষত্ব নেই, সেই সব উপকরণ ও বিশেষত্ব অপর আর একটি মিথে উপস্থিত থাকবার জন্যে কী ফলাফল হয়েছে, তাই লক্ষ করা। তিনটির মধ্যে একই সত্য বা তত্ত্বই যে পরিস্ফুট হয়েছে, তাই দেখানো। 'সংবর্তন' (transformation) নানা দিক থেকে ঘটতে পারে। ফলে Syntagmatic দিক হয়ে যেতে পারে Paradigmatic দিক : যে ভালুক ছিল সাহায্যকারী, সেই-ই হয়ে যায় শিকারের লক্ষ্য ও বিষয়। মিথের সংবর্তনের মধ্যে তিনি চারটি 'শৃঙ্খলা' (Series) দেখেছেন : ১. প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে ; ২. প্রথমটি থেকে তৃতীয়টিতে , ৩. দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টিতে; ৪. তৃতীয়টি থেকে প্রথমটিতে। অর্থাৎ একই ভাব-উৎস (core) থেকে তিনটি মিথ্ সংবর্তিত, Chomsky যাকে 'Kernel sentence' বলেছেন, তা এর সঙ্গে তুলনীয়। শেষে মন্তব্য করেছেন : 'The series can thus be generated back and forth' (p. 113). এই 'generated' শব্দটির পেছনে Chomsky-র গন্ধ নির্ভুলভাবে মিলছে।

E. K. Maranda-লিখিত প্রবন্ধটিতে Chomsky-র গন্ধ আরও স্পষ্ট। প্রবন্ধটি ফিনিশীয় ধাঁধার গঠন নিয়ে আলোচনা। আলোচনার লক্ষ্য হল : 'an investigation cf the properties of the logical Staucture of riddles and of the Process of generating such structures (p. 116)। ধাঁধার দুটি অংশ : প্রশ্ন, উত্তর। প্রশ্নটির বিস্তৃতির মধ্যেই (একে বলে 'riddle image') উত্তরের ইঙ্গিত থাকে। প্রশ্ন রচনার মধ্যে থাকে সাদৃশ্য, রূপক, উপমা। সাদৃশ্য-রূপক-উপমা মানেই হল এক বস্তু বা ভাবের সঙ্গে অপর বস্তু বা ভাবের যোগ-সম্পর্ক। এই যোগ-সম্পর্কটিই হল ধাঁধার সারাৎসার দিক, তাই উপমান-উপমেয়কে যোগযুক্ত করে। এই সারাৎসার দিকটিই যেন Kernel sentence. এই যোগ-সম্পর্কের দিকটি সম্প্রসারিত হবার ফলে নতুন-নতুন ধাঁধার 'সজনন' এবং এক ধাঁধা থেকে অপর ধাঁধায় 'সংবর্তন' সম্ভব। E. K. Maranda মনে করেন, লোকে ধাঁধা মুখস্থ করে শেখে না ; লোকে মুখস্থ করে ধাঁধা গঠনের কয়েকটি নিয়ম-পদ্ধতি, তাই দিয়েই রচনা করে নতুন-নতুন ধাঁধা। এক-একটি সংস্কৃতির ধাঁধা গঠনের কয়েকটি বিশিষ্ট নিয়ম-

পদ্ধতি থাকে; সেই নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারলেই সেই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ধাঁধাগুলি কোন্ পথে কি ভাবে 'সংবর্তিত' হবে, আগেই তা বলে দেওয়া যায়; এবং যে ধাঁধা আজও সৃষ্ট হয় নি, আবিষ্কৃত নিয়মগুলি অনুসরণ তাও গঠন করা যায়।

ছড়ার গঠনগত আলোচনায় 'সজ্জনন' ও 'সংবর্তনে'র প্রসঙ্গে অবতরণ করতে ভূমিকা একটু দীর্ঘ হল বটে, কিন্তু এ জাতীয় আলোচনা বাঙলায় প্রথম বলেই এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। যাই হোক, 'সজ্জনন' ও 'সংবর্তন' ছড়ার ক্ষেত্রেও সম্ভব কিনা এবার সেটাই বিবেচ্য।

যদি কেউ কোনো ভাষার Phoneme-গুলি ঠিক-ঠিক চিনতে ও বুঝতে পারেন, তবে তিনি সেগুলি দিয়ে সেই ভাষার নতুন শব্দ নির্মাণ করতে পারেন; এমন কি, যে শব্দটি সে ভাষায় এখনও তৈরি বা ব্যবহৃতই হয় নি, তবুও Phoneme-এর বিশেষত্ব অবলম্বনে তাও নির্মাণ করতে পারেন। অনুরূপ-ভাবে বলা যায়, ধাঁধা বা ছড়ার গঠনের নিয়ম-সূত্রগুলিও যদি অধিগত করা যায়, তবে নতুন ধাঁধা বা ছড়া সৃষ্টি করা যায়। বাস্তবিক, লোকমানস কতক-গুলি নিয়ম-পদ্ধতিকেই স্মরণে রাখে, এবং তা রাখে বলেই ছড়ার গঠনের অন্তরালে বিশিষ্ট নিয়ম-সূত্রগুলির অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এমনিভাবে ছড়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ধরা যাক, এক-একটি ছড়া যেন এক-একটি বাক্য। মানুষের মনের গহনে যেমন অর্থ ও রূপ নিয়ে একটি বাক্যের প্রাথমিক আভাস দেখা যায়, তেমনি রূপ ও অর্থ নিয়েও যেন একটি ছড়ার প্রাথমিক আদল ধরা দেয়। অতঃপর প্রকাশের রাজ্যে আসবার সময় বাক্যের ক্ষেত্রে যে সজ্জনন ও সংবর্তন দেখা দেয়, তা ছড়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা, তাই বিচার্য।

আগেই বলেছি, বাঙলা ছড়ার সৃষ্টির পেছনে যে তত্ত্বটি কাজ করে, তা হল 'ক্রমপ্রসারণশীলতা'। অর্থাৎ যা ক্রমেই ছোটো থেকে বিকশিত হয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃই 'সজ্জননে'র একটি সুযোগ এতে থাকেই। কিন্তু সেই ক্রমবিকাশ ঘটে কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণের মাধ্যমে। 'নিয়মাবলীর অনুসরণ' ও 'ক্রমপ্রসারণ' ছড়ার লক্ষ্যকে ধরে রাখে, ফলে যথেচ্ছভাবে ছড়ার বৃদ্ধি সংঘটিত হতে পারে না। তথাপি বাঙলা ছড়া সম্পর্কে বলা হয়, এতে অসংলগ্ন চিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটে। তা' কি অকারণ 'সজ্জনন'? অথবা, আদৌ তাকে 'সজ্জনন' বলা কি উচিত?

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, একটি শব্দের ধ্বনি-সাদৃশ্যে আর একটি শব্দ এসে পড়ে, এবং সেই শব্দের অনুষঙ্গে নতুন চিত্রও ছড়ায় সংযোজিত হয়,—যার ফলে অসঙ্গতি-অসংলগ্নতার সন্দেহ এসে পড়ে। যেমন, ৪২-সংখ্যক ছড়ায় 'ঠগ' থেকে 'ঠাকুর' শব্দ এসেছে ধ্বনি-সাদৃশ্যে; কিংবা, ৬৫-সংখ্যক ছড়ায় 'জোলা-ভাতি'র function-টি জোলা-জোলানীর চিত্র-চরিত্রকে টেনে এনেছে।

একটি শব্দ বা একটি অনুষ্ঠানের ধ্বনি ও অন্য প্রকার অনুষঙ্গ ও সাদৃশ্যে ছড়ায় যে একটি বক্তব্য থেকে অপর একটি বক্তব্যে, একটি চিত্র থেকে অপর একটি চিত্রে চলে যাওয়া হয়, সেটি ছড়ার প্রথম অবস্থার অর্থাৎ 'Deep strur-cture'-এর ফলাফল নয় বলেই মনে হয়; সেটাকে 'Surface structure'-এরই ব্যাপার বলা যেতে পারে। Deep structure-এর স্তরেই সাধারণভাবে বাক্যের অর্থ স্থিরীকৃত হয়ে যায়, কাজেই ছড়ার মধ্যে বাড়তি দৃশ্য ও চিত্রের আগমন ঘটলেও, আমরা দেখেছি মূল অর্থের হের-ফের হয় না, বা অর্থের সঙ্গতি হারিয়ে যায় না। অতএব, এই বাড়তি দৃশ্য ও চিত্র 'Surface stru-cture'-এই ঘটে থাকে [যেমন, ১৩-সংখ্যক ছড়ায় যে 'সাত-ভাত' পাই, তা মূলতঃ 'সাধ-ভাত,'—ধানের সাধভক্ষণের জন্যে 'সাত-ব্যঞ্জনে'র উপহার। কিন্তু, 'সাধ-ভাতই' হোক আর 'সাত-ভাতই' হোক, অর্থ বা অনুষ্ঠানের কোনো হের-ফের হচ্ছে না]। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা মনে রাখতে হবে; ছড়ায় যে বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাতে বাক্যকে Normal বলা যায় না। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ধ্বনি বা অন্য কোনো বিষয়ের সাদৃশ্যে যদি বাড়তি ও বিচিত্র দৃশ্য-চিত্র এসেও যায়, তা Deep structure-এর ওপরে Surface structure-এর প্রভাবের ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত মাত্র।

লোকসাহিত্য এবং নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা structuralist, তাঁরা Trans-formation বা 'সংবর্তন'কে তাই কেবল একটি মিথ্ বা কেবল একটি ধাঁধার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন নি। সংবর্তনকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে: ক. একটি বিশেষ মিথ্ বা ধাঁধা বা ছড়ার নিজস্ব ক্ষেত্রে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত-বিভিন্ন স্তরে; কিন্তু এইভাবে একটি ছড়াকে বিচার করে ওপরে দেখানো গেছে যে, তাতে অর্থের বা কাঠামোর পরিবর্তন হয় না; খ. একটি গোটা মিথ্ বা ধাঁধা বা ছড়া থেকে আর একটি গোটা রচনায় সঞ্জনন ও সংবর্তন। এই দিক থেকে আলোচনা করেই মারাণ্ডা-দম্পতি কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন। এই

পদ্ধতিকে বাঙলা ছড়ার ওপরও স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যায়। নীচে তার দু-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম।

যেহেতু এই পদ্ধতিতে একাধিক ছড়াকে একগুচ্ছে নিয়ে তারপর 'সংবর্তন'-কে প্রত্যক্ষ করতে হবে, সেই হেতু এমন বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে একটি ঐক্যের ভিত্তিতে আলোচ্য ছড়াগুলিকে একত্রাবদ্ধ করা যায়। ধরা যাক, ব্রত-বিষয়ক ছড়াগুলি। বিভিন্ন ধরণের ব্রতে একই মনোভাব ও মনস্তত্ত্ব কাজ করে, তাই ব্রতধারিণীর চাইবার তালিকাও অভিন্ন হয়। এই জন্যে কতকগুলি শব্দ, পঙ্‌ক্তি ও স্তবক সব ধরণের ব্রতের ছড়াতেই থাকে। কিন্তু, তাদেরও 'সংবর্তন' ঘটে থাকে।

যেমন, ১০-সংখ্যক ছড়ায় পাই : চাপড় যায় ভাইসা, ছেলে থাকুক বাঁইচা। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্ত রূপটিতে দেখা যায়, শুধু 'বেঁচে' থাকা নয়, 'হাসা'র মধ্যে সেই বেঁচে থাকাটুকু সংবর্তিত হয়েছে : চাপড়া গেল ভেসে/অমুক [ছেলের নাম] এল হেসে। যেন ছেলে মারা গিয়েছিল, 'চাপড়া' ভাসানোয় সে বেঁচে উঠে, হেসে হেসে বাড়িতে এল। ছেলেও নির্বিশেষ ছেলে নয়, নাম বলায় তা সবিশেষ। অতএব পূর্ববঙ্গীয় রূপটি নির্বিশেষ, এবং অনুষ্ঠানের সক্রিয়তাও সেখানে অকথিত, পশ্চিমবঙ্গীয় রূপটিতে বিশেষিকতা এবং অনুষ্ঠানের যাদুময় দিকটি প্রতিফলিত। আবার যেহেতু পশ্চিমবঙ্গীয় রূপটি বিস্তৃততর, সেইহেতু এই একই ছড়া অপর অনুষ্ঠানেও (যেমন, তুষলার হাঁড়ী ভাসাবার অনুষ্ঠানে) গৃহীত : তখন, কেবল আর ছেলে নয়, বাপ-ভাই, স্বামী-শ্বশুর, এবং ধন-দৌলতের কথাও এসে পড়ল। মূল মনস্তত্ত্ব একই . অনুষ্ঠানের যাদু-বিশ্বাসের ফলে ঐহিক সুখের আগমন। এটাই যেন এখানে 'Kernel sentence' এবং তাই ছেলে থেকে পরিবারের অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

পুণ্যিপুকুর ব্রত (সং ১), দশ পুত্তল ব্রত (সং ৩), হরিরচরণ ব্রত (সং ৪-৫), বসুধারাব্রত (সং ৬), সাঁজপূজনীব্রত (সং ২১), ইতুব্রত (সং ২৪), তুষলার ব্রত (সং ৩৩, ৩৬) প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ব্রতের মধ্যে কতকগুলি মনোভাবের সংবর্তন দেখা যায়। দেখা যায়, নারীর সম্পূর্ণ জীবনকথা এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কুমারী জীবন, আপন রূপ-যৌবন সম্পর্কে সচেতনতা, পিতৃগৃহে পিতা-মাতা-ভাই-বোনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিবাহিত জীবন, স্বামী-শ্বশুর ও পুত্র-কন্যা-জামাতার সমৃদ্ধি কামনা, সপত্নী পরিহারের জন্যে প্রয়াস, শেষে সধবা রূপে মৃত্যু প্রভৃতি কামনার চিত্র আঁকা হয়েছে। এখানে বাঙলার বিশিষ্ট পারিবারিক জীবন, যাদু-বিশ্বাস, ও নারীর স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব কার্যকরী হয়েছে। ছক করে তা এইভাবে দেখানো যায় :

জন্ম : কুমারীজীবন : পিতৃকুল, মাতৃকুল	বিবাহিত জীবন : স্বামী ও শ্বশুরের গৃহ : অনুকূল দিক	বিবাহিত জীবন : সতীত্ব : দাম্পত্য জীবনে সপত্নী ও ননদ : প্রতিকূল দিক	মরণ : সাধবা, বৈধব্য
নিজের রূপগুণ, জন্ম ও ভাগ্য : মরিয়ে মনুষ্যহব, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব, ৩খ। কুন্তীর মত ধীরা হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব, কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব, বিউলীর ডাল বর্ণ হব, দূর্বার মত লতিয়ে যাব, ৩গ। আপনাকে সুন্দর চায়, ৫। সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী, ১। সাত ভেয়ের বোন, ২১খ। বাপ-মা : দুর্গার মত মা পাব, শিবের মত বাপ পাব, ৩গ। গিরিরাজ বাপ, মেনকার মত মা, দুর্গার মত আদর, ৫। ভাই-বোন : লক্ষ্মী সরস্বতী বোন পাব, কার্তিক-গণেশ ভাই পাব, ৩গ। আমার মায়ের কোলে দেখি অষ্টসোনা, ৬/৪। আটভাই পেলেন যেন হীরার দানা ৬/৪। আট ভাই নিয়ে খেলতে যাই ৬/৫। আমার ভাই গাঁয়ের সোণা, ২১ঘ। আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়, ২১য। আমার ভাই গাঁয়ের বর, ২১য়। আমার ভাই লক্ষেশ্বর, ২১য।	স্বামী : রামের মত পতি, ৫ রাজ্যেশ্বর স্বামী, ৪। রাজরাজেশ্বর স্বামী, ৫। পুত্র : লব-কুশ ছেলে পাব, ৩গ। দরবার জোড়া ছেলে, ৪। বছর বছর পুত্তুর, ৪। রাজার বেটা…, ৪। অমর বর পুত্র, ৫। ধনেপুত্রে বাড়ুক ঘর, ২১ক। কন্যা-জামাতা : গুণবতী ঝি, ৫। সভা-আলো জামাই, ৪। সভা-উজ্জ্বল জামাই, ৫। পুত্র-বধূ, নাতি : বউ-রান্না ভাত খেয়ে চান্দ-পারা মু, ২১ঙ। এস নাতি বস খাটে, ২১ঝ। ধন-সম্পদ : ঘর-ভরা ধন, ৪। ঘরের ঘটি-বাটি…ধান, ৪। আলনাভরা…পাল ভরা মব, ৫। ঢেঁক পড়ন্ত, উনন জ্বলন্ত, ২১ঙ। বাপের বাড়ী-শ্বশুর বাড়ী যাওয়া-আসা : দোলায় আসি, দোলায় যাই, ১।	সতীত্ব : আমি সতী লীলাবতী, ১। সীতার মত সতী, ৩গ, ৫। সাবিত্রী সমান, ২১খ। সতীন : নবীন কৌটো নড়ে চড়ো সাত সতীনে পুড়ে মরে। নিজে কনিষ্ঠা বধূ, তাই সিঁদুরের কৌটো নতুন, সে কৌটোর যাদু শক্তি-তে সতীনেরা পুড়ে মরে]। খাই সতীনের মাথা, সতীন মাগী টেরী, সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে ছাদে উঠে দেখি, ২১ঘ। সাত সতীনের মুখটি পুড়ে, ৩৩। ননদিনী : মরুক মরুক ননদিনী, ৩৩।	জনম ভরে সিঁদুর পাই, ১। পায়ে আলতা, মুখে পান, ৫। শঙ্খের উপর সুবর্ণের খাড়ু, ২১খ। স্বামীর কোলে পুত্রের কোলে মরণ হয় যেন একগঙ্গা জলে, ১। এক গঙ্গাজলে, স্বামীর কোলে পুত্র খোলে, মরণ হয় অন্তে গঙ্গাজলে, ৫

এই ছকটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, বঙ্গনারীর ব্রতকথা আসলে তার জীবনকথা, জন্ম থেকে মরণের কথা। জীবনের বিভিন্ন স্তরের কামনাগুলি তাই এক স্তর থেকে অপর স্তরে সংবর্তিত হয়। নারীর জীবনের কাঠামোই ছড়ার কাঠামো হয়ে যায়। জীবনের স্তর অনুযায়ীই কামনা-বাসনাগুলির তালিকা বিবৃত হয়, এমনি করেই তালিকা বাড়ে (একেই কি 'সঞ্চনন' বলা যায়?), তারপর তার সংবর্তন দেখা দেয়। সুতরাং ব্রতের ছড়ার কাঠামো বিচার করতে হবে বঙ্গীয় নারীর জীবন ও মনস্তত্ত্বের আলোকে। এই সংবর্তনের পেছনে পৌরাণিকতা একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। কুমারী-জীবনে শিব-দুর্গার প্রভাব বিবাহিত-জীবনে রাম-সীতার প্রভাবে সংবর্তিত। শিবের সঙ্গে আছে গঙ্গার যোগ, শিব প্রাথমিক স্তরে প্রাধান্য পেয়েছেন; কিন্তু মরণ বা অন্তিমে আছেন গঙ্গা, সুতরাং জীবনের প্রারম্ভে ও প্রান্তে শিবকেই দেখা যায়। নিজে 'গিরিরাজ' পিতার কন্যা, এই ভাবটি সংবর্তিত হয়েছে 'রাজেশ্বর স্বামী'তে, তাই অতঃপর পুত্র ও জামাতার ক্ষেত্রে। কুমারী-পর্বের 'গিরিরাজ' আদর্শ রাজা বলে কথিত 'রামচন্দ্রে' সংবর্তিত। এই রাজ-রাজড়ার আসঙ্গের সঙ্গে যেহেতু ধন-দৌলতের কথা আছে, সেহেতু কুমারী-পর্বে 'ভাই' প্রসঙ্গে 'লঙ্কেশ্বর' 'সোনা' ও 'হীরে'র কথা আছে; বিবাহিত-পর্বে তাই বিবর্তিত হল স্বামীর ধনদৌলতে, শেষে নিজের 'সুবর্ণের খাড়ু'তে। তা হলে পৌরাণিক আসঙ্গ থেকে রাজ-আসঙ্গে এবং তা থেকে ধন-সম্পদে ব্যাপারটি সংবর্তিত হল। কুমারী এবং বিবাহিত-পর্বে নিজের সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য-দের উল্লেখ আছে, কিন্তু মরণের প্রসঙ্গে কেবল নিজের স্বামী-পুত্র ও সাধব্যের কথা, অর্থাৎ বৃহৎ পটভূমিকা ক্রমে বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এসে সংহত হওয়া। এই আত্মনিমগ্নতা সতীনের মরণ-কামনায় স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। সতীনের অকাল এবং আকস্মিক মৃত্যুর অপর দিক নিজের স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত এবং সুখের মৃত্যুর চিত্রাঙ্কন। একটি ছড়ায় যে সব দিক নেই, অপর ছড়া থেকে তা কুড়িয়ে এনে শূন্য স্থান পূরণ যায়। ফলে একটি ছড়া যেন অপর ছড়ার ওপর নির্ভরশীল, এবং এই জন্যেই প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা আছে। একেই বলা যায় 'spiral movement'. যে ক'টি ছড়া একত্রে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে নারীর পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুর কুলকে একত্রে লক্ষ করা হয়েছে। এই জন্যেই ছড়াতে তিনকুলের বর্ণনা মেলে। এইবার বলা যায়, জন্ম থেকে মরণের

ছবি আঁকাই ব্রতের ছড়ার মূল লক্ষ্য, সেই অনুযায়ীই ছড়ার কাঠামো নির্মিত হয়। এমন কি, জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল দিকের কথাও এতে ব্যক্ত। বাক্‌শক্তির প্রভাবে প্রতিকূল সতীন অনুকূলে আসবে (একেও সংবর্তন বলা যায়) এমন কথাও বলা হয়েছে।

এই একই রীতিতে মাঘমণ্ডলের বিভিন্ন ছড়া, কিংবা মাগনের ছড়া অথবা ঘুমপাড়ানি-ছেলেভুলোনো ছড়ার সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করা যায়। এই সংবর্তনের ক্ষেত্রে 'কথান্তর'-এর ভূমিকাও আলোচ্য, যদিও ওপরের আলোচনায় কথান্তরের সাহায্য নিই নি। আলোচকের সুবিধে হবে বলে পর্যায়ে-পর্যায়ে বিষয়গুলিকে বিন্যস্ত করে সঙ্কলিত করেছি। যে 'ক্রমপ্রসারণশীলতা' বাঙলা ছড়ার মূল বীজ, তা সংবর্তনের সঙ্গেও যুক্ত।

…১৪…

আধুনিক আলোচক-গবেষকগণ কোনো তত্ত্বকেই পরিপূর্ণরূপে মেনে নেবেন না, যতক্ষণ সেই তত্ত্বটিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রমাণিত করা না হবে। বাঙলা ছড়ার Typology সম্পর্কে আমরা যে তত্ত্বটির কথা বলেছি, তাকেও জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে তবেই তা আধুনিক গবেষকের কাছে বিশ্বাস্য ও গ্রহণীয় হবে, নতুবা নয়। এবার সে চেষ্টাই করা যাচ্ছে।

ছড়া লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা। ছড়ার কাঠামোর যে বিশেষত্ব আমরা লক্ষ করেছি, লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যেও যদি তা লক্ষ করা যায়, তবেই ছড়ার কাঠামোটির বিশেষত্ব গবেষকদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

ধাঁধার মধ্যে আছে দুটি দিক: প্রশ্ন এবং উত্তর,—যে প্রশ্নোত্তরের দুই দিক ছড়ার এক বিশেষত্ব। ছড়ার মতো ধাঁধার মধ্যেও আছে প্রতীক-প্রবণতা: দুইবার ছাড়া 'তিনবারের' পুনরাবৃত্তি ছড়ার মতো ধাঁধাতেও দেখা যায়। ছড়ার প্রারম্ভের সঙ্গে ধাঁধার প্রারম্ভের কেউ-কেউ সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন (দ্রঃ পূর্বে উল্লিখিত Alan Dundes-সম্পাদিত 'The study of Folklore' বইয়ের ১৮৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদের খ-অংশে

আমরা ফুল-ফলের সঙ্গে 'তারা'-কে অভিন্ন ও একাত্ম হতে দেখেছি। প্রসঙ্গটি ধাঁধাতেও মেলে। যেমন, এই ধাঁধাতে : বড়্ পিরথের বড়্ উভান/কোরলা নাই,/ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফোটে/তোলনা নাই। ধাঁধাটির উত্তর হল 'তারা'। ছড়াতেও যখন এটি মেলে, তখন বুঝতে হবে, লোকমানসে ফুলের সঙ্গে তারার সমীকরণটি গভীরভাবে প্রোথিত, যার ফলে দুই ধরণের রচনাতেই তা ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবাদের মধ্যেও পুনরাবৃত্তি, Binarism, প্রভৃতি দেখা যায়। লোকসঙ্গীতের মধ্যেও যে এসব দেখা যায় তা আমাদের সম্পাদিত (গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত) 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬; পৃ. ১৭৮-১৯৫) এবং 'প্রাক্-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭: পৃ. ৩৮৩-৪১৯) বই দু'খানি থেকে প্রমাণিত হয়।

লোককথার সঙ্গে ছড়ার যোগ নিবিড়তর। ছড়ার মধ্যে যে ব্যঙ্গচিত্র ও চরিত্রের প্রকাশ দেখা যায় মাঝে মাঝে, তা বোকামি ও চালাকির লোককথার সঙ্গে (Noodle Stories; Numskull-দের প্রসঙ্গে) তুলনীয়। কোনো কোনো ছড়ার শেষে কর্ম ও Action-এর যে নিরন্তরতা দেখা যায়, তা Endless tale-এর মতো। যাকে বলে Rebus অর্থাৎ চিত্রমূলক ছড়া, তার সঙ্গে তুলনীয় Pictorial folktale-গুলো। Alternate Response ছড়া ও লোককথা উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ছড়ার মধ্যে দেখা যায়, শিশু-পশু-পাখি, গাছ-পালা এবং অন্যান্য ইতর প্রাণী ও জড় বস্তুর বিবাহচিত্র আঁকা হচ্ছে; এবং এককভাবে এই বিবাহ-প্রসঙ্গই ছড়ার সব চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ। লোককথার মধ্যেও বিবাহ-প্রসঙ্গই সব চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ। কোনো-কোনো গবেষক তো স্পষ্টই প্রমাণিত করেছেন, বিভিন্ন প্রকার বিবাহই লোককথার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য দ্বারাই লোককথার কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। [যেমন, পূর্বে পাদটীকায় উল্লিখিত E. Meletinisky লিখিত প্রবন্ধ]।

এই সব বিভিন্ন দিকের সাদৃশ্যের ফলে ছড়া ও লোককথার কাঠামোগত সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত 'জিরাধনীর কাহিনী'টিকে (The Story of Ziradhani: Folktales of Bangladesh: vol 1, Bangla Academy, Dacca; March

1972. Translated by Kabir Choudhury. pp. 17-23) একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। এই গল্পের কাঠামোতে ছড়ার মতোই Binarism দেখা যায়। গল্পের নায়ক ডালিমকুমার বলেছিল: যে তার গাছের প্রথম ডালিম প্রথমে খাবে, সে তাকেই বিয়ে করবে। দৈবাৎ তার সহোদরা জিরাধনী তা খায়, এবং কাহিনীর শেষে দেখা যায়, সে তাকেই বিয়ে করেছে। এইখানে প্রতিজ্ঞা ও কর্ম—এই দুই দিক যেন কঠোর গাণিতিক সূত্রে বাঁধা। এই বিচিত্র বিবাহের প্রস্তাবে জিরাধনীর মন সায় দেয় নি। তাই সে জলে ডুবে মরতে যায়। তার এই জলে ডোবার দৃশ্যের বর্ণনাও Binarism-এ পূর্ণ। এই দৃশ্যের বর্ণনাতে ছড়ার ক্রমপ্রসারণশীলতাকেও দেখা যায়। যেমন, জিরাধনী যখন ডুবে মরতে যাচ্ছে, তখন পর্যায়ক্রমে তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য স্বজনেরা এলো তাকে ফিরিয়ে নিতে। প্রত্যেকের অনুরোধ এবং জিরাধনীর প্রত্যুত্তর যেন এক-একটি জোড়া। সব জোড়াগুলি মিলে একটি শৃঙ্খলামূলক ক্রমপ্রসারণশীলতা এখানে কার্যকরী হয়েছে। জিরাধনী দিনে শামুক-খোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকত, রাতে বের হত। এ হল এক ধরণের বৈপরীত্যমূলক Binarism. লোককথায় নানারকম contrast দেখা যায়,—চরিত্রমূলক, ঘটনামূলক, পরিস্থিতিমূলক। সে বৈপরীত্য এখানেও আছে, তেমনি পরিস্থিতিগত বৈপরীত্য। Axel Olrik তাঁর (পূর্বে উল্লিখিত) প্রবন্ধে লোককথার মধ্যে যে Law of contrast-এর কথা বলেছেন, ছড়ার পঙ্‌ক্তিতে বিপরীতার্থক শব্দ-সমাবেশে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, 'ফকির চাঁদ' গল্পটি (Phakirchand : Folk tales of Bengal, Macmillan and co., 1910 edn : Rev. Lal Behari Dey. pp. 17-52)। দুই চরিত্র যেমন পরস্পরের শত্রু হয়, তেমনি মিত্রও হয়। এই গল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজপুত্র মন্ত্রি-পুত্র পরস্পরের মিত্র কিন্তু এক অংশে শত্রুতার স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তেমনি, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, গণিতের নিয়মে আসা-যাওয়া করেছে। পাগল ফকিরচাঁদের ছদ্মবেশে মন্ত্রীর পুত্র যা যা করতে চেয়েছে, প্রত্যাশানুযায়ী ঠিক তাই তাই ঘটেছে,—এর মধ্যেও আছে গণিতের নিয়ম। বাঙ্গমা-বাঙ্গমী যা-যা বলেছে অক্ষরে-অক্ষরে তা ফলেছে। এই সংলাপের মধ্যে ক্রমপ্রসারণশীলতাও ধরা

পড়েছে। রাজকন্যার বররূপে গরীবঘরের পাগল ছেলে ফকিরচাঁদকে নির্বাচন বৈপরীত্যমূলকতার দৃষ্টান্ত।

শুধু লোকসাহিত্যেই নয়, সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য দিকেও 'প্রতিসাম্য' (Symmetry), Binarism, শৃঙ্খলা-পারম্পর্য, প্রভৃতি দেখা যায়। বাংলার কৃষকেরা যখন প্রতিদিন হলকর্ষণ করতে যায়, তখন সে দিনের কর্ষিতব্য জমিতে চারদিকে একটি পরিসীমা তৈরি করে নেয়। একে বলে 'আতর দেওয়া' বা 'আতর মারা'। হলকর্ষণ মানেই হল ওই 'আতর দেওয়া' সীমাটুকুর মধ্যে ঘুরে-ঘুরে, একটি গাণিতিক সূত্রের মতো শৃঙ্খলার আবর্তন করে যাওয়া। ছড়ার মধ্যে যে নীতি দেখি, হলকর্ষণের রীতির মধ্যেও তাই। যে সব মানুষ 'মাটির কাছাকাছি' তাদের নবজাত সন্তানের নামকরণের বেলায় দিন-ক্ষণ-মাস-বৎসরের বিশেষত্বকে স্মরণ করা হয়, এবং তদনুযায়ীই নামকরণ হয়। যেমন, মঙ্গলবারে জন্ম হলে 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গলা' নাম হয়, পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম হলে 'পূর্ণচন্দ্র' বা 'পূর্ণিমা' হয়, সকালে জন্ম হলে হয় 'প্রভাত' বা 'প্রভাতী' বা উষা। তাহলে জন্মের দিন-ক্ষণ-মাস-বৎসর রইল একদিকে এবং তদনুযায়ী নামকরণ অপরদিকে,—ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতো দু'দিকের প্রতিসাম্য এতে ধরা পড়ে। লোকসঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিই, বাংলা মার্জিত সঙ্গীতের কাঠামোতে পর্যন্ত এই রীতি দেখা যায়। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ—বাংলা গানের কাঠামো এই চারটি 'কলি'তে বিভক্ত। এতে দেখা যায়, আস্থায়ীর অন্ত্যমিল পর-পর চারবার আবৃত্ত হয় এবং সুরগত বিশেষত্বের দিক থেকে অন্তরা ও আভোগ অভিন্ন হয়। অন্তরা-আভোগের পারস্পরিক সম্পর্ক Binarism-এর চমৎকার নিদর্শন। নাচের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতি ভঙ্গি (Figure) দু'বার করে করা হয় (যেমন, গানের 'কলি' দু'বার ফিরে গাইতে হয়) ডানে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পেছনে। এও প্রতিসাম্যের দৃষ্টান্ত। পরস্পরের কোমর ধরে সরল রেখাবৎ সঞ্চরণ অথবা বৃত্তরচনা করে যে চলমানতা, তা ছড়ার শৃঙ্খলা-পারম্পর্যের সূচক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বীরভূমের ভাঁজো-নৃত্য, যশোহরের শীতলা-নৃত্য, মৈমনসিংহের জারী এবং শ্রীহট্টের ধামাইল—সবই বৃত্তাকারে হয়ে থাকে।

'মাটির কাছাকাছি' মানুষ মানবেতর প্রাণীর জীবনধারা দিয়ে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত। পিঁপড়ে যেমন সার বেঁধে সুনিয়মে চলে কিংবা উটেরা যেমন

শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে পথ অতিক্রম করে (এই জন্যে অনেকে উটকে 'ক্রমেলক' বলেন, যদিও 'ক্রমেলক' শব্দটি সংস্কৃত ছাড়াও অন্যান্য ভাষাতে দেখা যায়), চিলেরা যেমন আকাশে নিটোল বৃত্ত রচনা করে নিরন্তর ঘোরে, ময়ূর যেমন গুণে-গুণে পা ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই আবার পিছিয়ে আসে, বিকেলের দিকে কাকেরা যেমন পঙ্‌ক্তি রচনা করে বসে থাকে—এ সবই ছড়ার মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবে কার্যকরী হয়।

সাধারণভাবে লোকচিত্র এবং বিশেষভাবে ব্রত-চিত্র বা আলপনার কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যায়। কিছু লোকচিত্র ও ব্রত চিত্রের নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদত্ত হল। তার থেকেই ছড়ার কাঠামোর সঙ্গে এদের অঙ্কনরীতির সাদৃশ্য অনুধাবন করা যাবে।

প্রদত্ত লোকচিত্রগুলির কয়েকটির ব্যাখ্যা-বিবরণ দিচ্ছি। যে Binarism ছড়ার রূপ ও গঠনের এক প্রধান দিক, লোকচিত্রের মধ্যেও তা প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, 'সেঁজুতিব্রতের' আলপনায় (পৃ. ২৬৩। ১,৩,৪,৭ সংখ্যক চিত্র), কিংবা, ২৬৪ পৃষ্ঠায় ২,৩,৪,৬ সংখ্যক চিত্র; ২৬৫ পৃষ্ঠায় ৪, ৬, ৭, ৮ সংখ্যক চিত্র; ২৬৮ পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক চিত্র, ২৬৯ পৃষ্ঠায় ১, ৩, ৪ সংখ্যক চিত্র। সব দৃষ্টান্তগুলিতেই দেখা যায় 'দুই'য়ের বিচিত্র ভাব এবং প্রতিসাম্য (Symmetry)-কে তুলে ধরা হয়েছে।

Binarism-এর মধ্যে যে 'প্রতিসাম্য' আছে, তা এক ধরণের জ্যামিতিক নক্শা। তার মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যায় 'ডাইমেনশন' নেই। এই 'ডাইমেনশনের' অভাবের জন্যেও একটি Stiffness বা কঠোর অনমনীয়তা, একটি স্থির-নিশ্চলতার ভাব লোকচিত্রে এসে পড়ে, যা ছড়ার বাক্য ও দেহ-গঠনের মধ্যেও দেখা যায়। এই গ্রন্থে প্রদত্ত লোকচিত্রগুলির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত হল: ২৬৩ পৃষ্ঠায় ৫, ৬, ৮, ১০ সংখ্যক চিত্র; ২৬৫ পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক চিত্র; ২৬৭ পৃষ্ঠায় ৫, ৬, ৭ সংখ্যক চিত্র; ২৬৯ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক চিত্র।

Repetition বা পুনরাবৃত্তি ছড়ার গঠনের আর এক প্রধান সূত্র; লোকচিত্রে তাও প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। যেমন: ২৬৩ পৃষ্ঠায় ২, ৯, ১১, ১২ সংখ্যক চিত্র; ২৬৪ পৃষ্ঠায় ১-সংখ্যক চিত্র, ২৬৫ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩, ৭, ৯ সংখ্যক চিত্র; ২৬৬ পৃষ্ঠায় ৩ সংখ্যক চিত্র; ২৬৭ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩, ৮ সংখ্যক চিত্র।

বচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল, একই চিত্রের মধ্যে একটি ভঙ্গির সঙ্গে আর

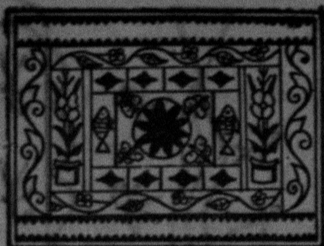
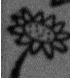
একটি বা একাধিক ভঙ্গির মিশ্রণ। উল্লিখিত ভঙ্গিগুলো যে লোকমানসে এক গভীর প্রভাব ফেলেছে, এই সংমিশ্রণ তারই নিশ্চিত প্রমাণ। কয়েকটি নিদর্শন এই : Binarism + Repetition : ২৬৪ পৃষ্ঠায় ১,২,৫ সংখ্যক চিত্র; ২৬৫ পৃষ্ঠায় ২ (কলমীলতার পুনরাবৃত্তি এবং পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ দিকে সেই লতার পাতা),৩ (এক-এক বারে তিনটি করে খুন্তীর আবৃত্তি, এবং তা পর্যায়ক্রমে ডান ও বাঁ দিকে), ৭ (ডান ও বাঁ পা, এবং জোড়ায়-জোড়ায় তার আবৃত্তি) প্রভৃতি চিত্র ; ২৬৬ পৃষ্ঠায় ১, ২ সংখ্যক চিত্র , ২৬৭ পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক চিত্র , ২৬৮ পৃষ্ঠায় ৩, ৫ সংখ্যক চিত্র।

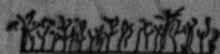
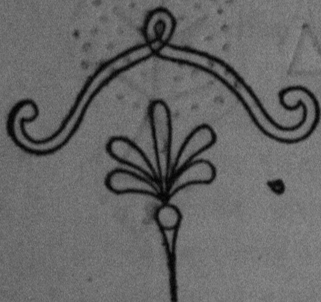
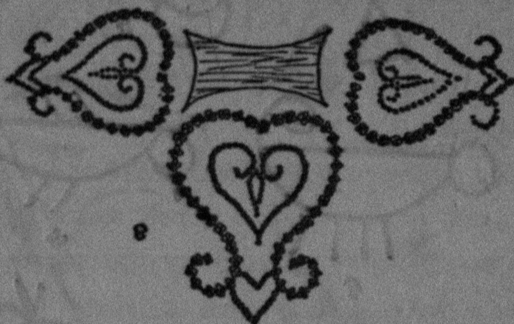
Binarism + Stiffness : ২৬৬ পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক চিত্র। Repetition + Stiffness : ২৬৮ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক চিত্র , ২৬৯ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক চিত্র। Binarism + Repetition + Stiffness : ২৬৮ পৃষ্ঠায় ১ সংখ্যক চিত্র , ২৬৪ পৃষ্ঠায় 'সেঁজুতি-ব্রতের আলপনা'-চিত্র সং ৬।

ল্যাটিন ভাষায় ও রোমান সাহিত্যে 'Carmen' বলতে যা বোঝায়, সবশেষে তারই উল্লেখ করি। যত বিচিত্র ধরণের পুনরাবৃত্তি, শৃঙ্খলা ও ছন্দ ভাষায় সৃষ্টি করা যায়, মিলিতভাবে তাকেই বলে 'Carmen'। বিশ্বের সব দেশের লোকসাহিত্যে ও প্রাচীনতম সাহিত্যে এই রীতি গৃহীত হয়েছে। এই রীতিই বৈদিক সাহিত্যের ভাষাতেও লক্ষিত হয় (দ্রঃ J. Gonda লিখিত 'Stylistic Repetition in the Veda' গ্রন্থ : Amsterdam, 1959)। ছড়ার ভাষায় ও গঠনেও যে তা কার্যকরী হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

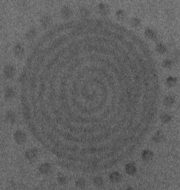
যে Binarism-এর কথা আমরা বারবার উচ্চারণ করেছি, Munro S Edmonson তাঁর 'Lore : An introduction to the science of Folklore and Literature' (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971) বইতে তাকে 'Metaphor' বলে উল্লেখ করেছেন। Binarism-এর মধ্যে যেমন দুটি বিষয় থাকে, Metaphor-এর মধ্যেও তেমনি থাকে উপমান ও উপমেয়ের দুটি দিক। এই দু'দিকের মধ্যে একটি হল Denotative অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের দিক ; অপরটি হল Connotative অর্থাৎ লক্ষ্যার্থের দিক, অর্থকে যা সম্প্রসারিত করে দেয়, তারই ফলে রচিত হয় Metaphor (P. 195)। Binarism-ই হোক আর Metaphor-ই হোক, দেখা যাচ্ছে আধুনিক গবেষকরা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে দুই দিক বা বিষয়ের সংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চান।


৪
৮
১০
৯
১১
১২

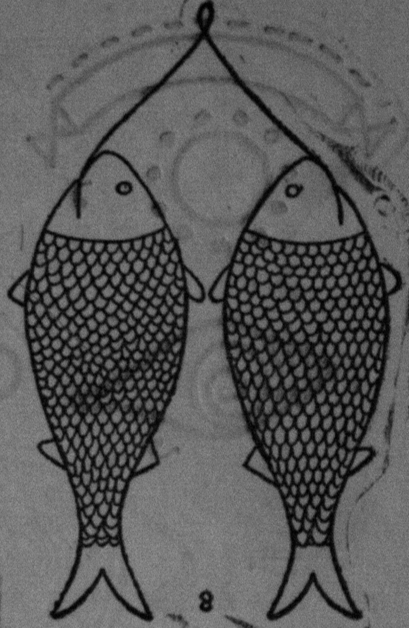




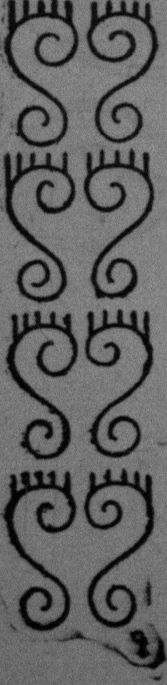




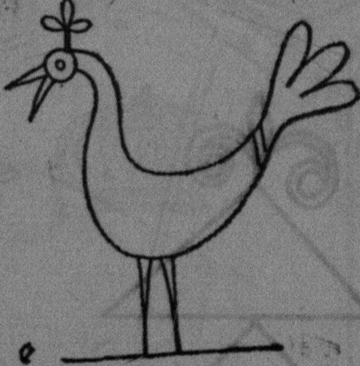


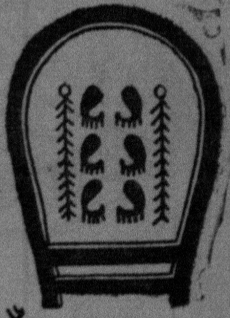


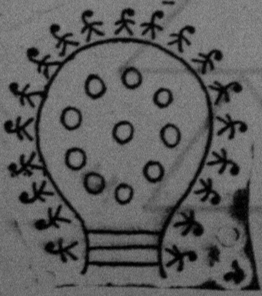


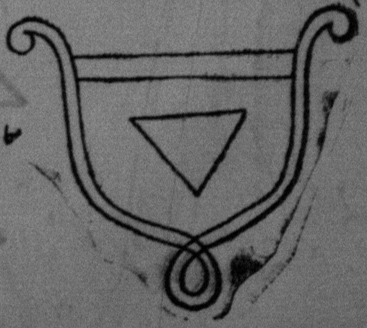


৪

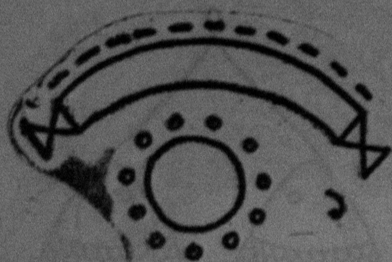


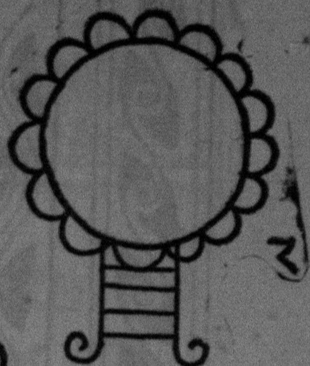




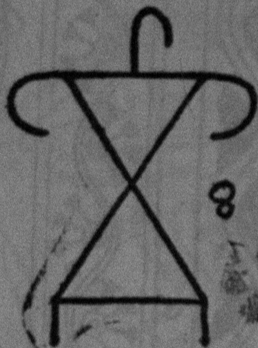




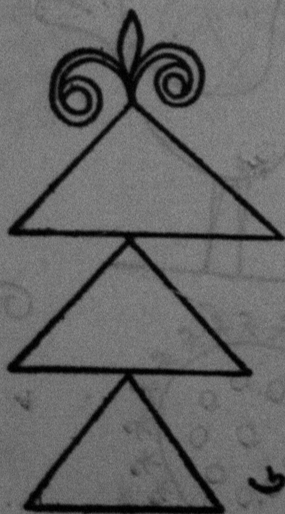

১


২

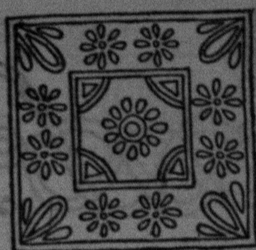

৩

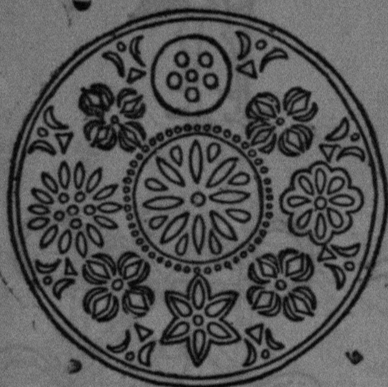

৪


৫


৬

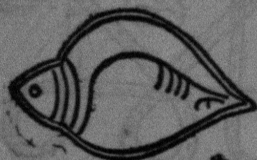






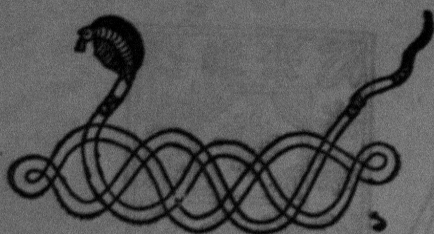








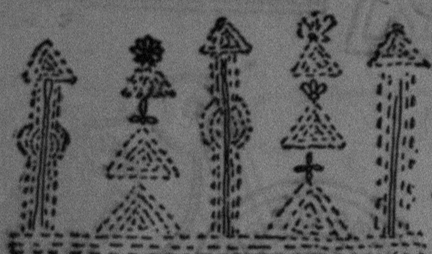




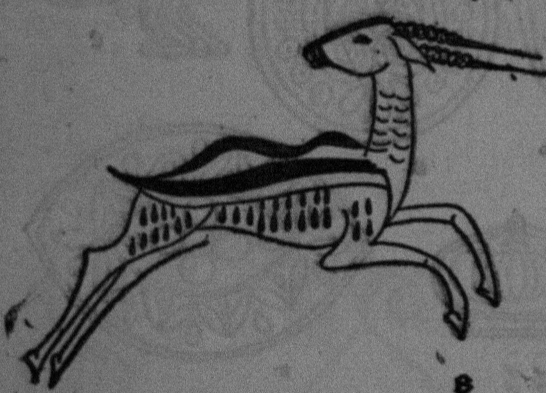
১



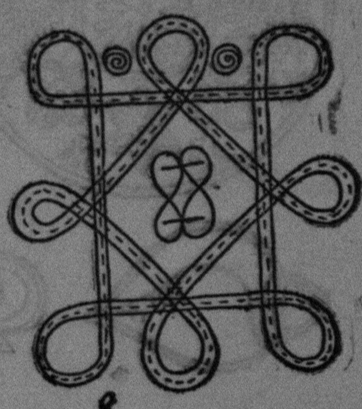
২



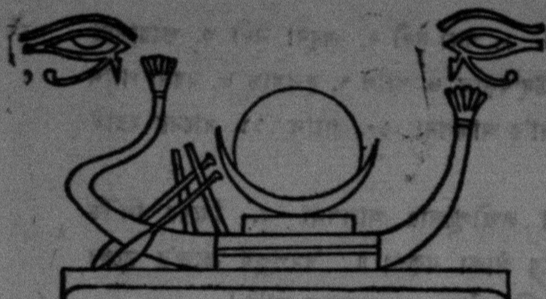
৩

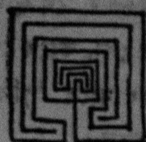


৪



৫


১


২



। প্রবন্ধ চিত্রগুলির বিবরণ ।

পৃ. ২৬৩ । 'সেঁজুতিব্রত' । ১. গঙ্গা নদী ২. যমুনা নদী ৩. তরোগাছ ৪. হাতে পো, কাঁখে পো ৫. উদ্‌বিড়াল ৬. পাখি ৭. ফুলগাছ ৮. ময়না পাখি ৯. বৈশাখ মাসে 'পৃথিবী পুজো'র আলপনা ১০. পাখি ১১. ধানের মরাই ১২. বশপুতুল।

পৃ ২৬৪ । ১. কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আলপনা ২. বিয়ের পিঁড়ি ৩. মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়ে আঁকা নক্‌শা ৪. 'যমপুকুর ব্রতে'র তুষের আলপনা ৫. শুবচনী ব্রতের পাখির ঝাঁক ৬. জোড়া পাখি।

পৃ. ২৬৫ । ১. শঙ্খলতা ২. কলমীলতা ৩. খুন্তীলতা ৪. বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জোড়া মাছ ৫. দেওয়ালে আঁকা পাখি ৬. কুলোর আঁকা ওপর লক্ষ্মীর জোড়া পা ৭. লক্ষ্মীর জোড়া পা ৮. দেওয়ালে আঁকা নক্‌শা ৯. হাট-মাট : সেঁজুতিব্রত।

পৃ. ২৬৬ । ১. চন্দ্রসূর্য : সেঁজুতিব্রত ২. ধানের মরাই ৩. শঙ্খ ৪. 'ধাতাকাতা' : সেঁজুতিব্রত ৫. বাঁশের কোঁড়া।

পৃ. ২৬৬ । ৬. সেঁজুতিব্রতের আলপনা।

পৃ. ২৬৭ । ১—৮ : সন্দেশ, আমসত্ত্ব প্রভৃতির ছাঁচ।

পৃ. ২৬৮ । ১. ওড়িশার আলপনা ২. ঐ ৩. ময়ূরভঞ্জের দেওয়ালের আলপনা ৪. 'সোনার হরিণ' : বারাণসীর লোকশিল্পের নিদর্শন ৫. বিয়ের ডালার ওপর আলপনা, ময়ূরভঞ্জ।

পৃ. ২৬৯ । ১. প্রাচীন মিশরীয় কল্পনায় 'চাঁদের নৌকো'। দু'পাশে দুটি চোখ দুটি তারার প্রতীক ২. প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের একটি মুদ্রাচিহ্ন ৩. ওরাওঁদের উল্কির নক্‌শা ৪. পৌষসংক্রান্তির দিন পাবনা জেলায় গোময় দিয়ে যে আলপনা দেওয়া হয়, তার একটি নিদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙলা ছড়া : সঙ্কলন ও সমীক্ষার ধারা

...১...

বাঙলা ছড়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণার জন্যে বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন ও সমীক্ষার ধারাটি জানা প্রয়োজন তবে, স্থানাভাবে আমরা কেবল প্রধান ধারাটিরই অন্বেষণ করব। এই আলোচনার উদ্দেশ্য কিন্তু পূর্ববর্তী সঙ্কলন-সমীক্ষার নিন্দা-সমালোচনা নয়, কোনো সঙ্কলন বা সমীক্ষার রীতির সঙ্গে আমাদের মতের মিল বা অমিলের এবং তার ফলজাত নিন্দা-প্রশংসার কথা এখানে ওঠেই না। কি পেয়েছি, এবং তার বিশেষত্ব কী নিরপেক্ষভাবে তার উল্লেখ করাই এ ক্ষেত্রে আমদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বাঙলা ছড়ার প্রথম সঙ্কলন কী বা কোনটি? উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা' ইত্যাদি ছড়াটিকেই আমরা সচেতনভাবে সঙ্কলিত প্রথম বাঙলা ছড়া বলতে চাই। ছড়াটির কথান্তর বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বইয়ের 'ষোল-কৈ' (সং ৮৫) নামীয় ছড়াটি এই ছড়াই বটে। ডঃ ভবতারণ দত্তের 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভূমিকায় 'শিশুবেদ' নামে প্রবন্ধে ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, এর রূপান্তর তিনি তাঁর শৈশবে (সম্ভবতঃ বর্ধমানে) শুনেছেন। তিনি তার আংশিক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (ছড়া। প্রথম সং ১৯৬৩। পৃ. ১০৪) ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই 'মুদ্রিত প্রথম বাংলা ছড়া' বলতে দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিক্রম নাটক' (বাং ১২৭১, ইং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)-এর অন্তর্ভুক্ত 'নিম তিতো কল্লা তিতো তিতো মাকাল ফল/তা হতে অধিক তিতো দু-সতীনের ঘর' ছড়াটিকে বুঝিয়েছেন। বাঙলা ছড়ার দ্বিতীয় সঙ্কলন বলতে তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন সংগৃহীত 'দুগ্ধ মিঠা, চিনি মিঠা, আরো মিঠা ননী' ইত্যাদি ছড়াটির উল্লেখ করেছেন (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭)।

উল্লিখিত দু'টি ছড়ার কোনোটিই স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত হয় নি; 'বিক্রম

নাটক' বা 'মানিকচন্দ্র রাজার গানে' কাহিনীর প্রয়োজনে, প্রাসঙ্গিক ভাবে, ছড়া দু'টি গ্রথিত হয়েছে। আর নাটকে উল্লিখিত ছড়াকেই যদি এই মর্যাদা দিতে হয়, তবে 'বিক্রমনাটকে'র পূর্বে প্রকাশিত, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের নামই করা উচিত।[১] উপর্যুক্ত কারণেই মধ্যযুগীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত ছড়াগুলিকে এই প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলে মনে হয়।

কেরীর 'কথোপকথন'ও সঙ্কলন গ্রন্থ নয়; কিন্তু নাম থেকেই বোঝা যায়, সংলাপের নমুনারূপে এখানে ছড়াটি সঙ্কলিত হয়েছিল, সে জন্যেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ছড়ারূপে এটিকে গ্রহণ করা যায়। তা ছাড়া, প্রকাশের তারিখের দিক থেকেও এটি প্রাচীন।

কেরীর সঙ্কলনের পর বহুদিন আর ছড়ার সঙ্কলনের বিষয়ে কোনো তথ্য মেলে না। বাঙলা প্রবাদের একাধিক সঙ্কলনে অনেক ছড়া সঙ্কলিত হয়। আমরা সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। এইজন্যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম মর্টনের সংগ্রহ; কিংবা ১৮৬৮ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ লং-এর 'প্রবাদমালা' নামে দু'টি সঙ্কলন, প্রভৃতিকে বাদ দিচ্ছি। তবে, ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এই মাত্র। একই কারণে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের 'Songs of Manik chandra'-এর অন্তর্ভুক্ত ছড়া বা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লালবিহারী দে 'Folktales of Bengal' বইয়ের ভূমিকায় 'আমার কথাটি ফুরলো' প্রভৃতি ছড়ার যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, তাও বাদ দিচ্ছি।

খাঁটি অর্থে বাঙলা ছড়ার প্রথম সঙ্কলক সম্ভবতঃ বৈষ্ণবচরণ বসাক। তাঁর বই আজ বিস্মৃতির গর্ভে। বহুদিন পর, 'ভারতী' (বৈশাখ, ১৩৩০) পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের 'পুঁটুরাণীর ছড়া' বইটির কথা উল্লেখ করেন। বহু অনুসন্ধানেও আমরা বইটি খুঁজে পাই নি। হাওড়ার বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকায় গ্রন্থটির নাম মিললেও, বইটি নিখোঁজ। বৈষ্ণবচরণের আর একটি বই 'আমোদ-প্রমোদ' (এটিও পাই নি)। এই বইতে কিছু ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে বলে শুনেছি। বৈষ্ণবচরণের 'পুঁটুরাণীর ছড়াই' কি 'খুকুমণির ছড়া'র নামকরণে প্রভাব ফেলেছে?

---

১ 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অধিকাংশ ছড়াই নাট্যকারের নিজস্ব রচনা বলে মনে হয়। তথাপি, কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রবাদ-মূলক ছড়ার প্রয়োগ দেখা যায়।

বাঙলা ছড়ার প্রথম বা প্রথম দিকের সঙ্কলনের প্রসঙ্গে বাঙলা ছড়া নিয়ে প্রথম আলোচনা-সমীক্ষার কথাও ওঠে। ছড়ার তত্ত্ব নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'জয়দেব' (নবজীবন। ফাল্গুন, ১২৯৩। পৃ. ৫০০-৫১২। চৈত্র, ১২৯৩। পৃ. ৫৬২-৫৭৪) নামে প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধেরই পাদটীকায় তিনি দুটি ছড়াও ('শ্লোক') সঙ্কলন করেছিলেন (দ্রঃ বর্তমান সঙ্কলনের ৪৭৭-সংখ্যক ছড়া)। 'জয়দেবে'র 'গীতগোবিন্দ' এবং তাতে পাঁচালীগানের কাঠামো অনুসৃত হওয়া—এই প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র 'ছড়া'র কথা উত্থাপন করেছিলেন।

পাঁচালীব কাঠামোতে থাকে গান এবং ছড়া (বা পয়ার)। এই জন্যেই পাঁচালী সম্পর্কে বলা হয়: 'খানিক তাব রাগবাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী'। এই 'মুখ-জবানী'ই হল ছড়া। পাঁচালীর যে গান বা 'পদ' তার মুখ-টুকুকে বলা হত 'ধ্রুবপদ' বা 'স্থিরপদ', গানের বাকী অংশকে বলা হত 'অন্তরা'। অন্তরায় অনেকগুলি 'কলি' থাকত, প্রত্যেক 'কলি'ব পর 'ধ্রুবপদ'টি গাইতে হত। একবার গান, একবার ছড়া—এই পর্যায়ে পাঁচালী গান হত। যে বিষয়ের গান, ছড়াটিও সেই বিষয়ের হত। বাঙলায় যাকে ছড়া বলে, সংস্কৃতে তাকে বলে 'শ্লোক'। "জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, ইহার পব সেই বিষয়ের শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে।"

অক্ষয়চন্দ্রের অনেক মন্তব্যই অনেকেই মানেন নি। তবে তাঁর আলোচনা থেকে এই মনে হয়: 'ছড়া' বলতে তিনি শিশু বা নারীর রচনাই কেবল বোঝেন নি; মধ্যযুগের গানের আসরে ছড়ার যে বিশিষ্ট একটি ভূমিকা ছিল, সে-দিকেও তিনি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছেন। ছড়াকে যদি 'সমাহার' বা 'সমষ্টি' রূপে গণ্য করতে হয়, তবে অক্ষয়চন্দ্রের ব্যাখ্যা ঠিকই। 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গে ছড়া বা শ্লোকের যোগ প্রথম কি না, সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তা নিয়ে বিবাদ করুন, আমরা কিন্তু ছড়ার ভূমিকা সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে দ্বিমত নই। ছড়াকে তিনি কেবল শিশু বা নারীর সম্পত্তি রূপেই দেখেন নি। আশ্চর্যের কথা এই, তাঁর সমকালে এবং পরে-পরেই বাঙলা ছড়া সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের যে ধারাটির পত্তন হল, তাতে ছড়া তার ব্যাপ্তি হারিয়ে কেবল শিশু বা নারীর ব্যাপার রূপে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ল এবং তার আলোচনাও হতে থাকলো সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই। অক্ষয়চন্দ্রের প্রবর্তিত ধারা উপযুক্ত মর্যাদা পেলে বাঙলা ছড়ার সঙ্কলনে ও

সমীক্ষার ক্ষেত্রে সুদিন ঘনাত না। বাঙলা ছড়াকে নারী ও নাবালকের হেপাজতে দেবার দরুণ, ছড়ার সঙ্কলন ও সমীক্ষার নাবালকত্বও আজ পর্যন্ত ঘোচে নি।

সাধারণভাবে বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন বিজ্ঞান-ভিত্তিক, যথাযথ ও সন্তোষজনক নয়। 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাই লোকসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধা-মমতা পোষণ করতেন। তাঁর এ বিষয়ে দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা ছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। পৃ. ২৪৭-২৫০) 'শিশুসাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধে অনাথনাথ বসু প্রসঙ্গত: মন্তব্য করেছিলেন : "অনেকদিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম কেহ কেহ ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, ·" এ বিষয়ে পাদটীকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন : "মুদ্রিত বাংলা ছড়ার বহি আছে। কিন্তু তাহা যথাযথ সংগ্রহ নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।"

এই মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

···২···

রবীন্দ্রনাথই বাঙলা ছড়াকে সাহিত্যের আসরে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন,—সকলেরই সে কথা জানা। লোকসাহিত্যের ভাষা ও ভাববস্তুর মধ্যে তিনিই জাতীয়-সাহিত্যের প্রাণ-বীজকে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু সঙ্কলন ও সমীক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-প্রীতি নিঃশেষিত হয় নি; লোকসাহিত্যের আত্মাকে আত্মস্থ করে আপন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উপকরণে পরিণত করেছিলেন তিনি এবং এখানেই লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতি-শ্রদ্ধার চূড়ান্ত বিকাশ।

ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি এই : 'মেয়েলি ছড়া' (সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১)। ১৩১৪ সালে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয়-ভাগে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তির সময় নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয় : 'ছেলেভুলানো ছড়া : ১'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ : 'ছেলে ভুলানো ছড়া' 'কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩০১ : তৃতীয় সংখ্যা। পৃ. ১৮৯-২০২)। তৃতীয় প্রবন্ধ : 'মেয়েলি ছড়া' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩০২ : তৃতীয় সংখ্যা পৃ. ৩৭৪-৩৭৯)। দ্বিতীয় ও

তৃতীয় প্রবন্ধ একত্র হয়ে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' হয়। "ভূমিকা ও ১-২৬-সংখ্যক ছড়া ১৩০১ মাঘে ও অবশিষ্ট অংশ ১৩০২ কার্তিকে মুদ্রিত। উক্ত মাঘ সংখ্যায় পত্রিকা-সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্ত, সঙ্কলিত তিনটি ছড়ার এক-একটি পাঠান্তর দেন ;...পরবর্তী কার্তিক সংখ্যায় 'বাঁকুড়া বেল তোড় হইতে সংগৃহীত' ২৬টি, 'মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত' ৮টি, 'বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত' ৮টি এবং 'সাঁওতাল পরগণার ছড়া' ১৬টি, রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহের পরিপূরক হিসাবে মুদ্রিত হয়। সংগ্রাহকেরা বলেন, এগুলি প্রধানতঃ পাঠান্তর বলিয়াই গণ্য হইবে।" এই তথ্যগুলি উল্লেখ করবার কারণ হল, ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ও 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র সচেতনতা এবং সাধারণভাবে বাঙালীর উৎসাহ। ছড়ার সঙ্কলনে 'পাঠান্তর' যে একটি বড়ো দিক, তখনকার সম্পাদক ও সঙ্কলক যে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এটি বিশেষ প্রশংসার বিষয়। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর আলোচনায় ছড়ার পাঠান্তরের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। পাঠান্তরের যে ধারাটির প্রবর্তন এইভাবে হল, পরবর্তীকালে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতে'ই যখন চট্টগ্রাম থেকে ছেলে-ভুলানো ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করেন আবদুল করিম-সাহিত্য বিশারদ, তখন তিনিও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

যাই হোক, অতঃপর ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ প্রবন্ধ 'গ্রাম্যসাহিত্য' (ভারতী। ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫। এই বছর পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'ভারতী' দু'মাস করে এক সঙ্গে বের হয়)।

লোকসাহিত্যের গবেষণার তিনটি স্তর : সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সমীক্ষা। ছড়ার প্রসঙ্গে এই তিন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই : সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কবি নিজে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ কর্মটি করেন নি। আত্মীয়-পরিজন এবং এষ্টেটের কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ছড়াগুলি কলকাতা থেকে সংগৃহীত, যদিও তাতে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়াও ছিল। তবে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষ এতে প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে জানিয়েছেন, গোটা চারেক ছড়া বিক্রমপুর থেকে সংগৃহীত। চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, "গ্রাম্য ছড়া-সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন" পত্রদ্বারা তাঁরা তাঁকে সংগ্রহকর্মের অসুবিধের কথা জানিয়েছেন।

সঙ্কলন প্রসঙ্গে কবির সচেতনতা ধরা পড়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে। সঙ্কলনই যে এখন কবির উদ্দেশ্য তা বোঝা যায় সঙ্কলিত ৮১টি ছড়াকে পৃথকরূপে প্রদর্শন করায়। 'ভূমিকা' অংশে সংগ্রহ ও 'পাঠান্তর' নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর এই উদ্দেশ্য স্ফুটতর হয়েছে। সঙ্কলনকে যদি আলোচনার অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়, তবে সঙ্কলনের স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্টতা, objectivity খোয়া যায়। পাঠক সঙ্কলনকে আলোচকের মন্তব্যের আলোকেই কেবল দেখতে বাধ্য হন। সাম্প্রতিক কালের অনেককেই দেখা গেছে (যেমন, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাইকে) আলোচনা ও সঙ্কলনকে মিশিয়ে ফেলতে। সে ভুল রবীন্দ্রনাথ করেন নি। প্রথম প্রবন্ধটির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এ বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম প্রবন্ধে আলোচনাই প্রধান, সেই আলোচনাকে পরিস্ফুট করতেই যতটুকু সঙ্কলনের প্রয়োজন, তাই করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলোচনা নেই, যতটুকু আছে তা সঙ্কলন প্রসঙ্গেই এবং 'ভূমিকা'তে পৃথকরূপে তা প্রদর্শিত। কবির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 'পাঠান্তর' সম্পর্কে (আমরা 'পাঠান্তর' শব্দের পরিবর্তে 'কথান্তর' শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী) সচেতনতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধের 'ভূমিকা'তে এ বিষয়ে আলোচনা ও উদাহরণ তো আছেই, প্রথম প্রবন্ধের শেষেও এ সম্পর্কে উদাহরণ আছে।

ছড়ার 'পাঠান্তর' সম্পর্কে কবির মন্তব্য বিজ্ঞান-সম্মত এবং নিতান্ত আধুনিক গবেষকের কাছেও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন: "একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই।" আধুনিক গবেষকগণ আর লোকসাহিত্যের কোনো বিশেষ নিদর্শনের Archetype বা আদিরূপ ব বিশুদ্ধরূপ অন্বেষণ করেন না, প্রাপ্ত যে কোনো রূপকেই তাঁরা লোকজীবন ও মানসের প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করে, তারই আলোচনা-সমীক্ষা করেন। অর্থাৎ Diachronic দিক অপেক্ষা Synchronic দিকের ওপর আধুনিক গবেষণায় জোর পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা আপন দূরদৃষ্টি দ্বারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বহুদিন আগেই।

তবে সঙ্কলন-কর্মে দু'-এক স্থানে তাঁকে পরিমার্জনা করতে দেখা যায়। আধুনিক গবেষক সেটা কোনোমতেই স্বীকার করে নেবেন না। কবি এখানে লোকজীবনের রুচিবোধকে আপন রুচিবোধের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন।

'ভাতারখাগী' শব্দ উচ্চারণ করতে তাঁর বেধেছে বলে 'স্বামীখাকী' শব্দ দিয়ে তিনি পঙ্‌ক্তির পাদপূরণ করেছেন। কিন্তু 'মাগী' শব্দ উচ্চারণ করতে তাঁর বাধে নি ; প্রথম দিকের কাব্যে এবং 'শাস্তি' গল্পের সংলাপে তিনি নিজেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অবাধেই 'তেলি মাগীদের পাড়া' লিখেছেন। আমাদের মনে হয়, এক্ষেত্রে কবি ব্যক্তিগত রুচিবোধ অপেক্ষা সমকালীন সাহিত্যরুচি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন বেশি। এ ধরণের পরিমার্জনা তখনকার দিনে কাঙ্ক্ষিতই ছিল। তা না হলে, 'খুকুমণির ছড়া' বইতে কোনো স্থানে মার্জনা করেন নি বলেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে তিরস্কার সইতে হত না। একালের গবেষক এ বিষয়ে কবিকে ক্ষমা করেন নি। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' ইত্যাদি রচনাতে কবি 'নদী'র জায়গায় 'নদেয়' লিখেছেন বলে ডঃ সুকুমার সেন মশাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ('পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি', পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭০, গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ. 'লোকসাহিত্যের ভাষা', পৃ ৭২-৭৭)।

ছড়ার সংগ্রহ ও সঙ্কলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, তবে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যও লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রবন্ধে মন্তব্য পাই : "তাহাদের [ছড়াগুলির] মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।" অর্থাৎ 'ভাষা' ও 'সমাজের ইতিহাস' অপেক্ষা সহজ কাব্যরসই কবিকে আকৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সহজ-স্বাভাবিক কাব্যরসকে বলেছেন 'বাল্যরস' এবং "শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ·এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা যে কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।" লক্ষ্য যখন 'কাব্যরস' ও 'বাল্যরস,' তখন সমীক্ষাও যে এই দৃষ্টিকোণদ্বারাই পরিচালিত হবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

সঙ্কলনের প্রসঙ্গে শ্রেণীবিভাগের কথাও ওঠে। স্পষ্টভাবে শ্রেণীর ভাগ করেছেন কেবল চতুর্থ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে ছড়াকে তিনি দু'টি (বা তিনটি) ভাগে ভাগ করেছেন : হরগৌরী-বিষয়ক, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক (এবং রামসীতা, রাম-রাবণ-বিষয়ক)। হরগৌরী-বিষয়ক ছড়ার মধ্যে বাস্তবতা এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়ার মধ্যে মানসিকতা ও 'ভাবের সৃষ্টি' প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম দুই

প্রবন্ধে স্পষ্ট ও সচেতনভাবে শ্রেণীভাগ নেই, যদিও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই এর মধ্যে 'ঘুমপাড়ানি ছড়া' ও 'ছেলেখেলার ছড়া'—এই দুই ভাগ লক্ষ করেছেন। এই বিভাগ কল্পনা ডঃ ভট্টাচার্যের, রবীন্দ্রনাথের নয়। 'শ্রেণী'র কথা কবি একেবারেই উল্লেখ করেন নি, একথাও অবশ্য সত্য নয়। প্রথম প্রবন্ধের এক জায়গায় কবি লিখেছেন: "এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল আর এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়।" এই মন্তব্য পড়ে অনুমান হয়, কবি শ্রেণী-ভাগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ছড়ার অন্তর্নিহিত 'ছবি' অনুসারেই হয়তো বা শ্রেণীবিভাগ করতে চেয়েছিলেন, যদিও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন প্রবন্ধে আর নেই। 'ছবি'-ভিত্তিক এই শ্রেণীভাগ ছড়ার রচনারীতি-ভিত্তিক শ্রেণীভাগেরই নামান্তর, অর্থাৎ ছড়ার কাঠামো সম্পর্কে কবির সচেতনতা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীভাগের ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন, অথচ পূর্ণরূপে নিজেই তার অনুসরণ করেন নি, পরবর্তী গবেষকদের উচিত, তাকেই পূর্ণতর করা। যে ধরণের শ্রেণীভাগের কল্পনা কবি করেনই নি, সেই ধরণের শ্রেণী ভাগ, অতএব কবির নয়,—তা আলোচকের নিজস্ব।

শ্রেণীভাগের প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি সংশয় আছে। সেটি অবশ্য স্বয়ং কবিরই ধারণা সম্পর্কে। স্পষ্টরূপে চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি ছড়ার তিনটি শ্রেণীভাগ করেছেন। এই শ্রেণীভাগ স্বতঃই অসম্পূর্ণ, কেননা, ছেলেভুলানো বা মেয়েলি কোনো ছড়াই এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে কি ছেলেভুলানো ও মেয়েলি ছড়ার ছবি-ভিত্তিক এবং অন্যগুলির বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণীভাগের কথা কবি বলেছেন? কিংবা 'ছেলেভুলানো ছড়া' নাবালকদের এবং হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ছড়া সাবালকদের! 'ছেলেভুলানো ছড়া'র প্রথম নামে 'মেয়েলি' শব্দও সংশয় সৃষ্টি করে। তবে কি মেয়েদের ও পুরুষদের ছড়া ভিন্ন? কিন্তু তাই যদি হবে, তবে হরগৌরী বা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ছড়া মেয়ে-পুরুষ সকলকেই কেন ব্যবহার করতে দেখা যায়? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।" পুরুষ গায়করাও যখন এই 'গ্রাম্য ছড়া' গায়, তখন এই ধরণের ছড়াকে মেয়েলি ব্যাপার বলছেন কেন? তবে কি গায় পুরুষ কেবল এবং শোনে স্ত্রীলোক কেবল?

এই প্রসঙ্গ কবি 'গ্রাম্যছড়া' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। এটিও সংশয়ের সৃষ্টি করে। যেহেতু হরগৌরী-রাধাকৃষ্ণ-রামসীতা-বিষয়ক ছড়ার প্রসঙ্গে অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং সিদ্ধান্ত হওয়া স্বাভাবিক, উক্ত বিষয়াত্মক ছড়াই 'গ্রাম্য ছড়া'। এর আগে কবি 'মেয়েলি ছড়া', 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রভৃতি দুই পদের ছড়ার কথা বলে এসেছেন। 'গ্রাম্য ছড়া' অভিধার ফলে তিন পদের ছড়ার নাম শোনা গেল। তবে কি কবি ছড়াকে তিনভাগে বিভক্ত করতে চান? তাই বা আবার বিশ্বাস করি কি ভাবে; 'মেয়েলি ছড়া' অভিধা তো তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন!

এই সংশয়ের শিকার হয়েছেন শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মশাই। রবীন্দ্রনাথের নজির টেনে তিনি তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন 'বাঙলার গ্রাম্য ছড়া' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)। রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী-বিষয়ক ছড়ার সঙ্কলন বলেই এই নাম দিয়েছেন। 'গ্রাম্য ছড়া' নাম যখন, কূট ব্যক্তি তা হলে 'শহুরে ছড়া'র নাম করে ফেলতে পারেন। যেন ছড়ার গ্রাম্য ও শহুরে এই দুই ভাগ আছে এবং যা 'গ্রাম্য ছড়া' নামে সঙ্কলিত হয়েছে, প্রচলিত ও পরিচিত ছড়া থেকে তা পৃথক। ছড়া বা ছড়া-কবিতার নানা আকার আছে, সে জন্যে তাদের 'ছড়া' বই অন্য নাম দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করাই ভালো। রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে এই 'গ্রাম্য ছড়া' পদটি ব্যবহার করেছিলেন, তাকে এতোখানি বিশেষিত করে বিমলবাবু ঠিক কাজ করেন নি।

এইবার ছড়া সমীক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বের কথা বলি। প্রথম প্রবন্ধটিতে সমীক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। ছড়াকে কবি বিচার করেছেন বালকের মনস্তত্ত্ব দিয়ে, এইজন্যে নিজেও তিনি পুনরায় বালকত্বে ফিরে তবে ছড়াকে লক্ষ করেছেন। এইজন্যেই তিনি 'বাল্যরস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সব ছড়াকে কেবল বালকের সাহিত্য বলতে স্বভাবতঃই কবিকে একপেশে বলে নিন্দে করা চলত; কিন্তু তিনি 'সহজরস'-এর কথা যখন তুলেছেন, তখন সে দোষ অনেকাংশে ঘুচে যায়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি গ্রামজীবনের পটভূমিকায় লোক-সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছেন। তৃতীয়তঃ, লোকসাহিত্যকে তিনি মার্জিত ও শিষ্টসাহিত্যের ভিত্তিরূপে দেখেছেন এবং এই দুই সাহিত্যধারার মধ্যে একটি যোগকে অনুভব করেছেন। চতুর্থতঃ, কবি পরোক্ষে ও অস্পষ্টভাবে ছড়ার পুনর্গঠনের কথা বলেছেন, যা পরবর্তীকালে স্পষ্টতর হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধে। 'শিবুঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির আলোচনায় কবি মন্তব্য করেছেন: "হয়তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতিক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর এক টুকরা থাকিতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ একই ভাব ও প্রসঙ্গকে ভিন্ন ছড়ার মধ্যে আবদ্ধ হবার কথাটুকুই কেবল তুলেছেন; অবনীন্দ্রনাথ ভাব ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী তাবৎ ছড়াকে পুনর্গঠিত করবার কথা বলেছেন। অতি আধুনিককালের transformational analysis-এর ভিত্তি কবির এই মন্তব্যে নিহিত আছে।

ছড়ার আলোচনার ভঙ্গিতে কবি কিন্তু উচ্চসাহিত্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে ছড়াকে গৌরব দান করেছেন। তিনি যে সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী, ছড়ার আলোচনাতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। মেঘদূত, কুমারসম্ভব বা বৈষ্ণবকবিতা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা, তা তিনি ছড়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। 'মেয়েলি', 'ছেলেভুলানো', 'গ্রাম্য' ইত্যাদি যে অভিধাই তিনি দিন, আলোচনার ভঙ্গিতে কিন্তু উচ্চতা ও স্বচ্ছতার কোনো অভাব নেই।

কিন্তু সমকালীন রবীন্দ্রসমালোচকগণ কবির এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে কবি পারিবারিক জীবনের স্নেহ ও হৃদয়-বেদনার কথা তুলেছিলেন। 'সাহিত্য' (কার্তিক, ১৩০১) পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখলেন: "'মেয়েলি ছড়া' [সাধনা: আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায় পঠিত হইয়াছিল,—কিন্তু রচয়িতা 'সাধনা'য় তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করি। 'মেয়েলি ছড়া',—"ছেলে ভুলাইবার জন্য বঙ্গগৃহলক্ষ্মীদের মুখে যে সব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট ছড়া শুনা যায়, তাহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে, সমালোচনার কিছু বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল ছড়ায় যে কোনও বিশেষ দার্শনিক বা নৈতিক তত্ত্ব নিহিত নাই, সে কথা না বলিলেও চলিত। এই ছড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্ন রাজ্য হইতে সংগৃহীত, ইহা সহজ বুদ্ধিমাত্রেরই বোধগম্য।..." সুরেশচন্দ্রের এই মন্তব্য ছড়া সম্পর্কে সাধারণভাবে তখনকার বাঙালীর মতামতকে প্রতিবিম্বিত করে।

ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বক্তব্য পাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

'মেয়েলিব্রত' (প্রথম প্রকাশ, ১৩০৩) বইয়ের ভূমিকায় (তারিখ: ৭ই কার্তিক, ১৩০৩। কাসিয়াং)। অঘোরনাথের বাড়ী ছিল বীরভূমের নলহাটিতে, তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক ও আচার্য। রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহ করতে থাকলে সাধারণভাবে উৎসাহ ও প্রশংসা পান নি। সে জন্যে তাঁর মনে যে ক্ষোভ ছিল, অঘোরনাথের বইয়ের ভূমিকায় তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন: "সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলিব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন,..."

"অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। "

"য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।"...

এই মন্তব্যে এক দিকে লোকসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অপর দিকে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেন লোকসাহিত্যের আলোচনা-গবেষণা বাঙলায় উচ্চমানের কিছু হয় নি এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোকসাহিত্যের সংগ্রহ-সঙ্কলনের ধারা অতঃপর শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ এখান থেকেই বোঝা যায়।

অপরকে ছড়া সংগ্রহে উৎসাহ-দানও ছিল রবীন্দ্রনাথের ছড়া-চর্চার এক দিক। এজন্যেই বিভিন্ন সঙ্কলনের ভূমিকা লিখেছেন। অঘোরনাথের সঙ্কলন ছাড়াও, পরমেশপ্রসন্ন রায়, বি.এ, বিদ্যানন্দের 'মেয়েলিব্রতকথা' (পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ পশ্চিম ঢাকা অঞ্চলের ব্রতকথা। প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র, ১৩১৫) বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ছড়া-

সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কাছেই উৎসাহ পান। সংগ্রহকর্মে ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে কবি বিশেষ সচেতন ছিলেন। প্রতিষ্ঠানগতভাবে সাহিত্য পরিষৎ ছাত্রদের দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিক, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (বঙ্গদর্শন। বৈশাখ, ১৩২২) নামে ছাত্র-সভায় পঠিত প্রবন্ধে তিনি তাই লিখেছিলেন : "··· গ্রাম্য ছড়া, ছেলেভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য পরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।" এই মন্তব্যে ছড়া-সংগ্রহের স্বাদেশিক দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। ছড়া-সংগ্রহের লক্ষ্য দুটি হতে পারে : ১. ছড়া-সংরক্ষণ এবং তার মাধ্যমে ছড়ার উচ্চতর গবেষণা ; ২. স্বাদেশিকতার জন্যে ছড়া সংগ্রহ। যদিও দুটি লক্ষ্য মূলতঃ এক, তথাপি বাঙলার ছড়া-চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মনস্তত্ত্বটিই প্রাধান্য পেয়েছে। এইজন্যেই সমীক্ষার চেয়ে সংগ্রহ বেশি হয়েছে।

এরপর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কে কোনো আলোচনা-মন্তব্য করেন নি। জীবনের শেষে এসে, 'ছন্দ' নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেন (যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়) তাতে প্রসঙ্গতঃ ছড়ার ছন্দের কথা তোলেন (উদয়ন পত্রিকা। বৈশাখ, ১৩৪১। পৃ. ১১৩)। তিনি বলেন :

"যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।"

"কাক কালো বটে পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ
তাহার অধিক কালো যে কন্যা
তোমার চিকণ কেশ।"

"এমন করে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হোতে হোত না। কিন্তু এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে, এ দুইয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ।···যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালী তাতে আনন্দ পায়।···"

ছড়ার প্রভাব রবীন্দ্রমানসে অক্ষুন্ন ধারায় সঞ্জীবিত ছিল। তাঁর শেষ বয়সের কাব্যেও তার প্রমাণ রেখে গেছেন। এ বিষয়ে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর 'বিচিত্রা' এবং 'প্রবাসী' (কার্তিক, ১৩৪৮। পৃ. ৯৮-১০০) পত্রিকায় পত্রস্থ প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে॥

...৩...

রবীন্দ্রনাথের পর ছড়া সংগ্রাহক ও সঙ্কলক হিসেবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া' (১৩০৬) এক সময়ে বাঙলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বহু সংস্করণ তারই প্রমাণ। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন (ভূমিকার তারিখ: ৮ই আষাঢ়, ১৩০৬। কলকাতা) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বাঙলা ছড়া সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে ক'টি প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, এটি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কাজেই এখন এ নিয়ে পুনর্বার আলোচনাব আবশ্যক নেই।

'খুকুমণির ছড়া' নাম থেকেই কিন্তু সংগ্রাহকের ও সঙ্কলনের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ছড়া যে নারীর জীবনেরই একটা বিশেষ বিশেষত্ব, এইজন্যে শৈশব থেকেই তার প্রস্তুতিব প্রয়োজন আছে,—এই বোধ মনের মধ্যে থাকাতেই এই ধরণের নামকরণ হয়েছে। নইলে 'খোকা'দেব কথা নামের মধ্যে নেই কেন? এই রকম 'পুঁটুরাণীর ছড়া' প্রভৃতি নামকরণের মধ্যেও সেই একই মনোভাব কাজ করেছে।

এ কালের গবেষক যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলনের মধ্যে নানা ত্রুটিই দেখতে পাবেন। প্রথমতঃ, বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্কলন এতে থাকলেও অঞ্চলের নামোল্লেখ নেই। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গের ছড়াই এতে প্রাধান্য লাভ করেছে। তৃতীয়তঃ, ছড়াগুলি যদৃচ্ছা পরিমার্জিত হয়েছে। চতুর্থতঃ, বিন্যাসের কোনো ক্রম বা আদর্শ এতে ধরা পড়ে নি।

বইটির প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য, আমবা দেখি নি। ষোড়শ সংস্করণে ৪১০টি ছড়া আছে। বইটি সচিত্র, চিত্র প্রথম থেকেই ছিল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করেছেন: "এই পুস্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই

শতকেরও কম।" পাদটীকায় যোগীন্দ্রনাথ লিখে জানিয়েছেন: "পরবর্তী সংস্করণে আরও দেড় শতকেরও অধিক ছড়া সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।— গ্রন্থকার।" বইটি "ডিরেক্টার মহোদয় কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত" হয়।

বইটি বের হবার পর বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এর সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনা থেকে সাধারণভাবে লোকসাহিত্য এবং বিশেষভাবে বইটি সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মতামত জানা যায়। নীচে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (খুকুমণির ছড়া। উৎসাহ পত্রিকা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। পৃ. ৩১-৩৯) এ বিষয়ে যে দীর্ঘ নিবন্ধটি লিখেছিলেন, তা তখনকার রস ও রুচিবোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। শিশুর আনন্দ ও শিক্ষার জন্যেই ছড়া সঙ্কলনের প্রয়োজন বলে তিনি অনুভব করেছেন, অন্য কোনো কারণে নয়। ভূমিকাতে রামেন্দ্রসুন্দর যে ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের আলোকে ছড়ার পর্যবেক্ষণের কথা বলেছিলেন, প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "এই সকল ছড়া এক সময়ের রচিত নহে; কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া প্রাচীন পদাবলী নিয়ত নবভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। পুরাতনের মধ্যে কেবল দুই চারিটি মানুষ বা স্থানের নাম পাওয়া যায়,—তাহাতেও কোন ঐতিহাসিক বিশেষত্ব নাই।"

যে পরিমার্জনার জন্যে একালের গবেষক যোগীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করবেন, সেই পরিমার্জনা না করবার জন্যেই অক্ষয়কুমার যোগীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করেছেন। অক্ষয়কুমারের মন্তব্য: "পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় এই সকল ছড়াও লোকশিক্ষার উপাদান বলিয়া ইহাকে ক্রমশঃ একটু আধটু সংশোধন করা কর্তব্য। এ হিসাবে সমালোচ্য গ্রন্থের অনেক কবিতা পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হইলে ভাল হইত। ·" এই সংশোধন কি ভাবে ও কোথায় করা হবে, অক্ষয়কুমার নিজেই তা প্রদর্শন করেছেন। 'বাড়ীতে আছে হলো বেরাল কোমর বেঁধেছে'—এর মধ্যে 'হলো' শব্দ অশালীন মনে হওয়ায় তিনি তার জায়গায় 'ক'টা' শব্দ লিখে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি: "সেকালের পিতামাতা যে সকল কথা তুলিয়া পুত্রকন্যার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন, একালের আমরা যখন সে সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন খুকুমণির ছড়া হইতেও কিছু কিছু ত্যাগ বা পরিবর্তন করিলে তেমন অন্যায় হইবে না··"।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের সমালোচনায় (নব্যভারত। আশ্বিন, ১৩০৬। পৃ. ২৯২-২৯৫) দু-একটি স্থান অক্ষয়কুমারের আলোচনা থেকে ভিন্ন। তাঁর বিশেষত্ব তিনটি: ১. ছড়াগুলি যে folk-lore-এর অন্তর্গত, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন; ২. "ইতিহাস রচনার পক্ষে ও দেশের প্রাচীন অবস্থা চিত্র করিবার জন্য খুকুমণির ছড়া অসামান্য সহায়।" কিন্তু কোথায় সেই ইতিহাসের উপকরণ ছড়ানো আছে, তা একবারও বলেন নি। তবে, সমাজচিত্রের দিকটি তিনি আলোচ্য ছড়াগুলি অবলম্বনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি মন্তব্য, "যখন মামীর সঙ্গে—আজকালের শালীর কি বড় ভাজের মত রহস্য চলিত, সে অনেক দিনের কথা।...ভারতচন্দ্র যে সুরে "আরে আ মামী" গাইয়াছেন, সে সুর এখন আর বাঙ্গালায় বাজে না। খোকন মামা পাত কাটতে যাইবার অবসর পাইয়া মামীকে চোরের হাতে দিয়া নিজের ছোট দুটি হাতে হাততালি দিতেছেন, এ ছবি বড় পুরাতন।" ৩. ছড়ার শব্দগুলির প্রতি ক্ষীরোদচন্দ্র বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন, এগুলির প্রাচীনত্ব ও ব্যাকরণগত বিশেষত্বও লক্ষ করেছেন। শেষে শব্দগুলির উল্লেখও করেছেন: ট্যাপর, নোটা, বিচুলী, শিকে, মেনাগাই, নড়ি, চুলকী, কাঁটি, হা ট্রশ, আড় প্রভৃতি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনা (প্রদীপ। অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। পৃ. ৩৮৬-৩৯০) মোটামুটিভাবে বিশেষত্ববিহীন। তবে তাঁর আলোচনার দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছড়াগুলির 'পাঠ' এবং শ্রেণীভাগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। "তিনি [যোগীন্দ্রনাথ] দুই এক স্থানে এরূপ পাঠ আরোপ করিয়াছেন যাহার সহজে অর্থবোধ হয় না। যেমন, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ" এটি আমার বিবেচনায় "নদেয় এল বাণ" এইরূপ হইবে। 'নদেয়'র অর্থ নবদ্বীপ। আর এক স্থানে "সুবলকে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে" এটি "দীঘনগর" হইবে। দীঘনগর কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মাঝামাঝি একটা গ্রাম। ..."নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্তী স্থানে অনেকগুলি ছড়ার যে উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ..দ্বিতীয় প্রমাণ ছড়াগুলির পরিভাষা। .." দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় বক্তব্য: "আমার বিবেচনায় বিষয় অনুসারে পুস্তকখানি [র] বিভাগ থাকা উচিত ছিল। যেরূপ ঘুম পাড়ানী গান, গল্প, খেলার ছড়া ইত্যাদি।..."[১] মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথও 'নদেয় এল বান' লিখেছেন।

ওপরের সমালোচনাগুলি থেকে তৎকালীন লোকসাহিত্যরুচিরও একটি পরিচয় মেলে।

…৪…

'খুকুমণির ছড়া'র পর দীর্ঘকাল কোনো উল্লেখযোগ্য সঙ্কলনের নাম মেলে না। কিন্তু খুচরো কিছু প্রবন্ধ পাওয়া গেছে, বক্তব্যের বিশিষ্টতার জন্যে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন: অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র মিত্র, যোগেশচন্দ্র রায়, ডঃ সুকুমার সেন এবং বুদ্ধদেব বসু।

অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেভোলানো ছড়া' (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩০। পৃ. ৪-১৫) প্রবন্ধটির উল্লেখ পূর্বে একাধিক বার আমরা করেছি। কাজেই এখানে সে-সব কথার পুনরাবৃত্তি আর করব না। এখন অন্যান্য দিকগুলির কথা বলি। অবনীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রকর, চিত্রকরের মন ও দৃষ্টি দিয়েই তিনি বাঙলা ছড়ার বিচার করেছেন। সমগ্র রচনাটির মধ্যে তিনি একটি চিত্রময় রসের জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথও ছড়ার অন্তর্নিহিত চিত্রের কথা উত্থাপন করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। তাঁর আলোচনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করলে পাই: ১. গ্রামজীবনের ল্যাণ্ডস্কেপ রূপে তিনি ছড়াকে দেখেছেন; এক-একটি ছড়া যেন এক-একটি গ্রাম। ২. এক-একটি গ্রামে যেমন নানা খবর আসা-যাওয়া করে, তেমনি একটি ছড়ার মধ্যেও থাকে নানা ছবি। যে গ্রাম্য পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁর আলোচনা শুরু করেছিলেন, সে গ্রামটি এর ফলে মুহূর্তে একটি অবাস্তব কল্পলোকের রাজ্য হয়ে গেল। ৩. এক একটি ছড়ার মধ্যে একদিকে থাকে অতীত কালের মানুষের মনের সুখদুঃখের ছবি, অপর দিকে থাকে বাস্তব ইতিহাস ও সমাজ থেকে আগত ছবি। এইজন্যেই ছড়া অতীতময়, স্মৃতিময়। কোথায় ইতিহাস, কোথায় মনের স্মৃতি জড়ানো-ছড়ানো আছে ছড়ায়, উদাহরণ প্রয়োগ করে অবনীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট করেছেন। ৪. অতীতের মন ও ইতিহাসের স্মৃতিকণিকা অসম্পূর্ণাকারে ছড়ায় ব্যক্ত হয়। বাস্তব জগৎ ও ইতিহাস অবিকৃত রূপেই ছড়ায় ধরা পড়ে না। ছড়ায় যে বর্তমানকালের জগৎটা, সে

শিশুকে ভয় দেখাবার আর অতীতকালের জগৎটা, সে শিশুকে গল্প শোনাবার। কখনো বা দেখা যায় ছড়ার ভেতর নাটকের আভাস।

ছাড়ার গঠনে অসংলগ্নতা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে ভিত্তি করে ছড়ার পুনর্গঠন সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "একটার আগা গেছে অন্যটার শেষে, অন্যটার শেষ এসে জোড়া লেগেছে একটার আগায় ! এই ছেলে ভোলানো ছড়ার সম্পূর্ণ রূপটা ধরতে হলে এটার এক অংশ ওটায়, সেটার খানিক এটায় জুড়ে না দেখলে উপায় নেই, কাজটা ভারি শক্ত কিন্তু ভারি চিত্তাকর্ষক।" অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, "ছড়াগুলিকে গুছিয়ে ধরার সময় এসেছে", এবং একাজ না করলে সংগ্রহ কর্মও সম্পূর্ণ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, টুকরো ছড়া থেকেও রস পাওয়া যায় ; এবং যে ভাবেই ছড়াগুলিকে সাজানো যাক না কেন, তা থেকে রস মেলে।

ছড়ার মধ্যে তিনি দুটো দিক দেখেছেন : একদিক বাস্তবতার দিক, অপরটি কল্পনার রাজ্য। ভাষার মিল আছে অথচ ভাবের প্রাসঙ্গিকতা নেই, এমন ছড়াকে তিনি বলেছেন 'পাকা ছড়া' অর্থাৎ খাঁটি ছড়া। ছড়ার মধ্যে এইজন্যে তিনি Cubism-এর ছাপ দেখেছেন। এভাবে ছড়ার একঘেয়েমিও কাটে। ছড়ার পুনর্বিন্যাসের প্রসঙ্গটিই অবনীন্দ্রনাথের এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তবে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকেরা তাঁর এই মতবাদ মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ। প্রাপ্ত যে কোনো রূপকেই নৃতাত্ত্বিকেরা লোকমানসের প্রতিবিম্ব বলে আজকাল গ্রহণ করে থাকেন ; এখন যদি কোনো শিষ্ট ও মার্জিত মন নিয়ে ছড়াকে নতুন করে বিন্যস্ত করা হয়, তবে তা কি আর লোকমানসের প্রতিবিম্ব বলে গৃহীত হবে ?[১]

অবনীন্দ্রনাথের ছড়ার আলোচনার কথা যখন উঠলই, তখন তাঁর 'বাংলার ব্রত' (প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫০)[২] বইটির অন্তর্গত ব্রতের ছড়ার কথাও বলে নিই। উপর্যুক্ত প্রবন্ধের তুলনায় এখানে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেক পরিপক্ব। 'ছেলে ভোলানো ছড়া'তে তাঁর দৃষ্টিকোণ কবির, রসিকের, চিত্র-

---

১ ছড়া সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী আলোচনা : দৃষ্টি ও সৃষ্টি (বঙ্গবাণী : বৈশাখ, ১৩২৯)। এটি পরের মাসে 'ভারতী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। পৃ. ১৭৮-১৮১) সঙ্কলিত হয়। বিষয়বস্তুতে তেমন অভিনব কিছু মেলে না।

২ প্রথম প্রকাশ 'ভারতী'তে (কার্তিক-চৈত্র, ১৩২৫)।

শিল্পীর। কিন্তু 'বাঙলার ব্রতে' তিনি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিতে পেরেছেন। ব্রতের ছড়া বিচার করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন : ১. ব্রতের ছড়ার মধ্যে অভিনয় ও নাট্যকলার একটি দিক আছে, ছেলে-ভুলোনো ছড়াতে যার অবকাশ নেই। ব্রতের ছড়ার মধ্যে অভিনয়ের দিকটিকে আবিষ্কারের মধ্যে তাঁর নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় আছে। ব্রত মাত্রই ম্যাজিক বা অভিচার, এবং অভিচার মানেই সাদৃশ্যাত্মক, অনুকরণাত্মক প্রভৃতি বিশেষ ধরণের কর্মের বা অনুষ্ঠানের অভিনয়। ২. সেই অভিনয়ের দিকটিকে কখনো বা চিত্রে ও আলপনায় প্রকাশ করা হয়। এইজন্তে আলপনা-চিত্রের প্রচুর দৃষ্টান্ত বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। তবে, আরো খুশি হওয়া যেত, চিত্রশিল্পী রূপে ওই আলপনার মধ্যে লোকজীবন ও মানসসম্ভূত Motif-গুলিরও বিশেষত্ব উল্লেখ করলে। সে কাজ অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারোরই বা করবার যোগ্যতা আছে!

শরৎচন্দ্র মিত্র মশাই বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর ছড়ার আলোচনাতেও তা ধরা পড়েছে। ছড়া-বিষয়ক তাঁর আলোচনাগুলি বের হয় Quarterly Journal of the mythic Society of Bangalore পত্রিকায়। গোটা তিনেকের নাম করছি : on an aetiological myth about the Indian House-crow (Vol. XVII, No 2. october, 1926. pp. 143-144) ; on a Bengali cumulative folktale of 'The Old Dame Lousy Type' (Vol. XIII, No 4, July, 1923. pp. 767-775) ; on an Ao Naga aetiological myth on the origin of the cock's crowing before sunrise (Vol. XXII, No 1, July, 1931. pp. 97-100). প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র মিত্র বিশুদ্ধভাবে ছড়ার আলোচনা করেন নি ; অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ বাঙলা ছড়ার সম্পর্কে আলোচনা-মন্তব্য করেন।

উল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে দ্বিতীয়টি একটি ক্রমপুঞ্জিত লোককথার অন্তর্গত ছড়া, যার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'উকুনে বিবি মরি গেইয়ে'। এই প্রসঙ্গে ক্রমপুঞ্জিত লোককথা সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধটি দুটিই উল্লেখযোগ্য। একটি পরিচিত ছড়ার পঙ্‌ক্তি হল : 'সাতটা কাকে দাঁড় বায়'। শরৎচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করেছেন, বাঙলার নাবিকদের

কোনো গোষ্ঠীর টোটেম ছিল 'কাক,' তাই একথা বলা হয়েছে। বক্তব্যটি চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র যদি নৃতাত্ত্বিক রূপে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝি-মাল্লাদের গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়ে দেখাতে পারতেন যে যথার্থ ই 'কাক' একটি টোটেম রূপে তাদের মধ্যে স্বীকৃত, তবে তাঁর এই উক্তি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হত। এইখানে বলা দরকার, H. H. Risley লিখিত The Tribes and Castes of Bengal বইতে যথার্থই দেখা যায়, পাখি বাঙলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর টোটেম রূপে গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধটির কথা প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি, এজন্তে আর তার আলোচনা করলাম না।

শরৎচন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিকোণ যদি নৃতাত্ত্বিক হয়ে থাকে, যোগেশচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিকোণ তবে পৌরাণিক। যে Mythological School একদা লোককথা বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় গবেষকদের (ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি) বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা যোগেশচন্দ্রকেও আচ্ছন্ন করেছে। অথচ, আশ্চর্যের কথা এই, যোগেশচন্দ্র যখন ছড়ার পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেন, তার বহুপূর্বেই Anthopological School-এর ধাক্কায় Mythological School-এর ভিত্ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্রও অন্য বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে ছড়ার আলোচনা করেছেন। তাঁর 'পৌরাণিক উপাখ্যান' (মাঘ, ১৩৬১) বইয়ে (পৃ. ৭২-৭৪) তিনি 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে' ইত্যাদি ছড়ার ব্যাখ্যা করেছেন: 'কমলাপুলী' মানে 'কমলাপুরী', কমলালয় বা আকাশ-সমুদ্র। প্রলয়কালীন মহা-সমুদ্র থেকে সূর্য ও চন্দ্রের উদ্ভব হয়েছে, অতএব তাঁরা সহোদর, এই অর্থে আমাদের মামা। ছড়াটিতে সূর্য-মামার বিবাহ-যাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্যাস্তকালে আকাশের রক্তিমবর্ণকে দেখেই এই ছড়ার রচয়িতার মনে এই বিবাহের কল্পনা জেগেছিল। সাধারণভাবে এই ছড়াটি যে অর্থ নিয়ে শ্রোতার মনে হাজির হয়, যোগেশচন্দ্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই। যোগেশচন্দ্রের ব্যাখ্যা হয়তো অনেকেই মানবেন না। কিন্তু যা লক্ষণীয়, তা এই: ছড়াটির ব্যাখ্যায় তিনি ছড়াকে 'শিশু' সাহিত্য বলেন নি; এবং দ্বিতীয়তঃ, একটি বিশেষ মতবাদের আলোকে তিনি এটির ব্যাখ্যা করেছেন, বাঙলা ছড়ার আলোচনায় যা দুর্লভ।

এই ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে 'টীকা'তে তিনি ছড়ার প্রকৃতি সম্পর্কেও মন্তব্য

করেছেন : "ছড়ার দুই লক্ষণ,—(১) বাক্য ছোট ছোট, (২) পর পর বাক্যের অর্থের যোগ নাই।"

তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' (বৈশাখ, ১৩৬১) বইয়ের অন্তর্গত 'বাংলা শিশুসাহিত্য' (পৃ. ৫৭-৮২। প্রবন্ধটি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু মশাই ছড়া সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ছড়াকে তিনি 'শিশুসাহিত্যে'র অন্তর্গত করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'কে তিনি বলেন : 'বাংলাদেশের অমর ছড়ার গল্পরূপ'। কিন্তু তিনি যখন এডওয়ার্ড লিয়রের 'লিমেরিক' ছড়ার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তখন তার পেছনে তৎকালীন সমাজ-প্রতিবেশকে অন্বেষণ করেন, তখন ছড়া আর 'শিশুসাহিত্য' নয়! বুদ্ধদেব বাবুর মতে, "ইওরোপে যন্ত্রযুগ এসে যখন বললো, 'সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করে দাও', সমাজের সেই স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠলো সাহিত্যের নানা বিভাগে। লিয়রের আপাত লঘু পঞ্চপদাবলী সেই প্রতিবাদেরই অন্যতম দলিল। এই 'ননসেন্স' আর কিছুই নয়, আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহ-ঘোষণা।"

ডঃ সুকুমার সেন মশাই লোকসাহিত্যের আলোচনা-গবেষণা পরিমাণে খুব বেশি করেন নি, কিন্তু তার মধ্যেই এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তির গভীরতা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বে একাধিকবার আমরা তাঁর প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করেছি, কাজেই এখন কেবলমাত্র প্রবন্ধের নামোল্লেখ করব। ডঃ সেনের লোকসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে মনে হয়, যে ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়, সেই দুই কারণের ফল হিসেবেই তিনি লোকসাহিত্যের গবেষণায় পদার্পণ করেছেন। লোকসাহিত্যের কোনো বাঙালী সমালোচককেই লোকসাহিত্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে সচেতন হতে দেখি নি, একমাত্র তিনি ছাড়া। এখানেই তাঁর প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব। এ বিষয়ে তাঁর 'লোকসাহিত্যের ভাষা' (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০। পৃ. ৭২-৭৭) প্রবন্ধটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহুদিন আগে 'বাঙলায় নারীর ভাষা' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৩৩, ৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ২৩৯-২৫০। প্রবন্ধটি এখন 'বিচিত্রসাহিত্য' [দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৩] বইয়ের অন্তর্ভুক্ত [পৃ. ১-১৭]। প্রবন্ধটির একটি ইংরিজি রূপও 'Journal of the Department of Letters' পত্রিকাতে

বের হয়) প্রবন্ধে নারীর ভাষা-ভঙ্গি নিয়ে আলোচনাকালে তিনি ছড়ার কথাও তুলেছিলেন। সুতরাং লোকভাষা, নারীর ভাষা, ইত্যাদির আলোকে লোক-সাহিত্যের বিচারপ্রবণতা বহুদিন থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

'লোকসাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছড়ার ভাষাতে নারীর মনোভাব এবং প্রতিধ্বনি শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করলেও, ডঃ সেন শব্দগুলিকে ঠিক-ঠিক, যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকেই কেবল দেখতে চান। Claude Levi'-Strauss প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিকগণ কিন্তু লোকসাহিত্যের আক্ষরিক ও আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা তার ব্যঞ্জনা-গত দিক এবং লোকমনস্তাত্ত্বিক দিকটির ওপর গুরুত্ব দিতে চান। এইখানেই ডঃ সেনের সঙ্গে Levi'-Strauss-এর তফাত। যেমন: 'আট কৌড়ে বাট কৌড়ে ছেলে আছে ভালো,' এর মধ্যে 'বাটকৌড়ে'কে নিছক অর্থহীন প্রতিধ্বনি শব্দ না ভেবে অর্থময় 'বাট কড়িয়া' (এই অনুষ্ঠানে যে কড়ি বেটে দিত) শব্দের রূপান্তর বলে মানেন। তেমনি, 'আঁটুল বাঁটুল সামলা সাঁটুল' ইত্যাদিও অর্থহীন নয়। 'আঁটুল=হাঁটু; বাঁটুল=বর্তুল, ভাঁটা, সাটুল=শক্ত সমর্থ।' 'আদুলে কুঁদুলের মাসী কুলতলাতে বাসা': এর মধ্যে 'আদুলে' শব্দকে স্থাননাম বলে সন্দেহ করেন। 'হলুদ বনে কলুদ ফুল,'—এখানে 'কলুদ' নিছক 'হলুদে'র প্রতিধ্বনিমাত্র নয়, তা 'কলম্ব' শব্দ থেকে আগত। তেমনি 'উড়্কি ধানের মুড়কি'র 'উড়কি' শব্দ এসেছে 'উড়ি' শব্দ থেকে, যা নীবার শ্যামাক ইত্যাদির মতো ঘাসবীজ, মধ্যমিলের অনুরোধে নারীর ভাষাতে 'উড়কি' হয়েছে। 'এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে, এক ছিয়লি খায়' ইত্যাদির 'ছিয়লি' শব্দকে 'ছেইলা' (=ছেলে) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'ছেউলি' থেকে আগত বলে মনে করেন।

ডঃ সেনের এই পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁকে যতোটা ভাষাতাত্ত্বিক বলে মনে হয়, অনেকের কাছে তাঁকে ততটা লোকমনস্তাত্ত্বিক নাও মনে হতে পারে। প্রতিধ্বনি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ, সে তো ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাই হল, 'লোকভাষার' আলোচনা হল কোথায়! কেন এই প্রতিধ্বনি শব্দের প্রাচুর্য, তার পেছনে কোন্ মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক কারণ ক্রিয়াশীল, বাক্যের মধ্যে তা ব্যবহারের ও প্রয়োগের বিশেষত্ব কোথায়, এই প্রয়োগ লোকজীবনের সঙ্গে কি ভাবে জড়িত—তা প্রদর্শন করাই হত 'লোকভাষা'র আসল আলোচনা। ভাষাতাত্ত্বিক রূপে ডঃ সেন তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে

পালন করেছেন, পরবর্তী ভূমিকা পরবর্তীকালে তিনি পালন করবেন (একমাত্র তিনিই পারেন সেই কাজ করতে), আমরা এই আশা পোষণ করি। যেমন, 'ছিয়লি' শব্দকে তিনি 'ছেউলি' শব্দজাত বলে মনে করেছেন। লোকচারণিক বা folkloristরা আজকাল কোনো ছড়া বা ধাঁধার আদি স্তরে বা বিশুদ্ধ স্তরে যেতে চান না। বর্তমানে যা মেলে, হোক তা আধুনিক, কিন্তু তাও তো লোকমানসেরই প্রতিবিম্ব। কাজেই অতীতের দিকে পিছিয়ে গিয়ে তার উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা আজকের লোকসাহিত্যের অনেক গবেষকেরই উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা 'ছিয়লি' শব্দের কথান্তর রূপে যে 'শিয়লি' শব্দ পাবেন,—দেখবেন, তাকেই সমগ্র লোকমনস্তত্ত্বের সঙ্গে মেলানো যায় কি না। তা করতে গিয়ে দেখা যায়, শিশুকে নানা জীব-জন্তুর প্রতীকে ছড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব এই সূত্র দিয়ে কেবল একটি ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র ছড়াসাহিত্যের একটি বিশেষত্বকে নির্দেশ করা গেল। সকারীভবনের ফলে 'ছিয়লি' 'শিয়লি' হয়েছে কিনা, কিংবা তার বিপরীতটি, আধুনিক গবেষক সে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; তিনি দেখবেন, শেয়াল-শেয়ালনী কিভাবে লোকসাহিত্যে Motif ও Motifeme হয়েছে।

তবু, ডঃ সেন যে আলোচনা-ধারার পত্তন করেছেন, বাঙলার লোকসাহিত্য বা ছড়া-সাহিত্যের আলোচনায় তা এক মূল্যবান সংযোজন। উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে তিনি ছড়ার ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কে অন্যান্য যে সব মন্তব্য করেছেন, তাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছড়া সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য রচনা এই : 'বিচিত্রসাহিত্য' (২য় খণ্ড। ১৩৬১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'লোকসাহিত্য' (পৃ. ১৯২-১৯৮) প্রবন্ধ, 'ছেলেভুলোনো ছড়া' (ঐ। পৃ. ১৯৯-২০৫) প্রবন্ধ, 'লোকসাহিত্যে গাথা' (ঐ। পৃ. ২০৬-২১৩), প্রভৃতি। এ ছাড়া, ডঃ ভবতারণ দত্তের 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভূমিকায় যুক্ত 'শিশুবেদ' নামীয় প্রবন্ধ। ভাষাতাত্ত্বিক দিক ছাড়া ডঃ সেন ছড়ার আলোচনায় অন্য যে দৃষ্টিকোণটির পরিচয় দিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে সাহিত্যিক দিক। ছড়াকে তিনি শিশু ও নারীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেই দেখেছেন কেবল, এবং নারীর কোমল বৃত্তির আলোকেই তা বিচার করেছেন। এইখানে কতকাংশে তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রানুসারী, সে কথা তিনি নিজেও উল্লেখ করতে ভোলেন নি। এইসব দিক বিজিত হয়ে প্রথম ধরা দিয়েছে (সম্ভবতঃ এ

বিষয়ে তাঁর প্রথম রচনা) তাঁর 'ঋগ্বেদে ঘুমপাড়ানো গান' (প্রবাসী। ভাদ্র, ১৩২৮। পৃ. ৭৭২-৭৭৩) প্রবন্ধে।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি, এখন কেবল 'শিশুবেদ' প্রবন্ধটির কথা বলি : ১. রবীন্দ্রনাথ যেমন আপন শৈশবের স্মৃতিকে পটভূমিকা রেখে ছড়ার বিচার করেছেন, ডঃ সেনও তাই করেছেন, ২. রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি' ছড়ার অনুকরণে তিনি 'ছেলেমি ছড়া'র কথা উদ্ভাবন করেছেন। তারপর এই ধরণের ছড়ার শ্রেণীভাগ করেছেন: 'ছেলেমি ছড়াকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ফেলা যায়,—ঘুমপাড়ানি, মনভোলানি ও খেলাচালানি।' উদাহরণ দিয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন, ৩. ছড়াকে জীবনের প্রাচীনতম সাহিত্য বলেছেন। ছড়ার উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'ছড়া মাত্রেই স্বয়ম্ভূ নয়। তার যেমন ভাববীজ আছে, বস্তুবীজও আছে। এমন কি কোন কোন ছড়ায় সাহিত্য বীজও আছে।' ৪ পরিশেষে ছড়ার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, যা নিয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি, ৫ তিনি দাবী করেছেন, 'তোদের হলুদ মাখা গা/তোরা রথ দেখতে যা' ইত্যাদি ছড়াটি তিনিই প্রথম ১৯২৮ সালে বাঙলায় মেয়েলি ভাষার আলোচনায় প্রকাশ করেছেন। 'বাঙলায় নারীর ভাষা' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৩৩ সনে প্রকাশিত হয়, সে হিসেবে '১৯২৮' এই ইংরেজি সাল মেলে না। দ্বিতীয়তঃ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছেলেভোলানো ছড়া' (ভারতী। বৈশাখ, ১৩৩০) প্রবন্ধে এটির উল্লেখ করেছিলেন।

ছড়ার ভাষা প্রসঙ্গে ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের লেখা 'বাংলার লৌকিক ভাষা' (পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০। পৃ. ৭৮-৮১) প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন : "অ, আ, ক, খ প্রভৃতি যাদের আমরা বিভাজ্যধ্বনি (Segmental Phoneme) বলি সেগুলির শ্বাসাঘাত, স্বর, স্বল্পবিরাম (Phonetic juncture) অল্পবিরাম (Phonemic juncture) প্রভৃতি ধ্বনিগত প্রভাব অনেক সময়ে ছড়া, কবিতা, গানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। শ্বাসাঘাত, স্বর বা বিরামের ভুল প্রয়োগে অর্থান্তর ঘটা বিচিত্র নয়। কবিতা ছড়ায় যেমন অনুপ্রাসের কাব্যালঙ্কার রয়েছে তেমনি টোন (tone) সেখানে (Phonemic contrast) সৃষ্টি করে, যেমন তিব্বতী-বর্মী প্রভৃতি ভাষা এবং তিব্বতী-বর্মী

প্রভাব যুক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষায় হয়তো tone বিশিষ্ট Phoneme-এর রূপ নিয়েছে। হয়তো আমরা দেখব যে, একই ছড়া-কবিতা তিব্বতী-বর্মী প্রভাব যুক্ত হয়ে মধ্য বা পশ্চিম বাংলায় এসেছে কেবলমাত্র শব্দ বা অর্থ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই, নয় tone বা যাকে আমরা Supra segmental Phoneme বলি তারও পরিবর্তন ঘটে গেছে।"

দৃষ্টিকোণ হিসেবে এসব কথা চমৎকার বটে, কিন্তু স-উদাহরণ বিশ্লেষণ ছাড়া এ দৃষ্টিকোণ 'অমূলতরু' বই আর কিছু নয়।

যাই হোক, কালানুক্রমকে উপেক্ষা করে, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়া সম্বন্ধে বিশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে, বাঙলা ছড়ার আলোচনার বিভিন্ন ধারাকে প্রদর্শন করা গেল। দুঃখের কথা এই, অক্ষয়চন্দ্রের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ, অবনীন্দ্রনাথের পুনর্গঠনের কথা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, শরৎচন্দ্র মিত্রের নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ কিংবা যোগেশচন্দ্রের পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ কিংবা ডঃ সুকুমার সেনের ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ—কোনো দৃষ্টিকোণই বাঙলা ছড়ার আলোচনা-সমীক্ষায় গৃহীত হয় নি। অথচ, উল্লিখিত দৃষ্টিকোণগুলির যে কোনো একটিও যদি বাঙলা ছড়ার আলোচনায় স্বীকৃত হত, তবে সামগ্রিকভাবেই লোকসাহিত্যের গবেষণা উন্নত হত। বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের দীনতম ও দুর্বলতম বিভাগ লোকসাহিত্যের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টি-কোণটিই বাঙলা ছড়ার আলোচনা-সমীক্ষায় প্রধান হয়ে উঠেছে। এবং দৃষ্টিকোণ এক বলে সবার আলোচনার ভাব ও ভাষাও মোটামুটি অভিন্ন, অতএব একঘেয়ে। সেই তুলনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছড়ার আলোচনা বৈচিত্র্যপূর্ণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে C.H.Rao-লিখিত Indian Nursery Rhymes' (The Quarterly Journal of the mythic Society of Bangalore : Vol. XVI, No 1, July, 1925. pp 32-35) প্রবন্ধটির নাম করা যায়।

···৫···

এইখানে, পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার আগে, বাঙলা সাময়িক পত্রিকায় বাঙলা ছড়ার সংগ্রহ-সমীক্ষার কথা বলে নিই। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকাগণ,

'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। 'সাধনা'র অবদানও অবিস্মরণীয়। সেই তুলনায় শক্তিশালী পত্রিকা 'সাহিত্য' ঠিক ততখানি সচেতনতা প্রদর্শন করে নি।

বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন-সমীক্ষার ক্ষেত্রে দুটি দিক প্রাধান্য পেয়েছে। সঙ্কলনের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা, সমীক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক দিক। পৃথিবীর অনেক দেশেই লোকসাহিত্যের সঙ্কলন-সংরক্ষণের পেছনে স্বাদেশিকতা কার্যকরী হয়েছে, আমাদের বাঙলাদেশ তার আর একটি উদাহরণ।

এবার সাময়িকপত্রে পত্রস্থ কিছু সঙ্কলন-সমীক্ষার তালিকা উপস্থিত করছি:

ভারতী: প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি (বৈশাখ, ১৩০৩। পৃ. ১৭-২৭)। প্রবাদ প্রসঙ্গ (আষাঢ়, ১৩০৭): দীনেন্দ্রকুমার রায়। গার্সী উৎসব (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৪): উপেন্দ্রনাথ সরকার। কৃষিকার্য (চৈত্র, ১৩০৪):: রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাদ প্রসঙ্গে (আশ্বিন, ১৩০৫) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। ষষ্ঠীব্রতের কথা (আশ্বিন, ১৩০৫): অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্রতকথা (কার্তিক, ১৩০৫): লেখকের নাম নেই। গ্রাম্য সাহিত্য (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নীলকুল বাসুদেবের ব্রতকথা (পৌষ, ১৩০৭): লেখকের নাম নেই। গ্রাম্য ছড়া ও প্রাদেশিক বাঙলা (ফাল্গুন, ১৩১৩). মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য। মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা (অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) শতদল বাসিনী বিশ্বাসজায়া। পল্লীবালিকাদের উৎসব (বৈশাখ, ১৩১৯): নিরুপমা দেবী। ব্রতমন্ত্র (আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, চৈত্র, ১৩১৯): রেণুকাবালা দাসী। মাতৃভাষা কি পেত্নী ভাষা? [ছড়ার ছন্দ নিয়ে আলোচনা] (শ্রাবণ, ১৩২৩। পৃ. ৪৭৮-৪৮১): নবকুমার কবিরত্ন। বাংলার ব্রত (কার্তিক-ফাল্গুন, ১৩২৫): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। [ছড়া সম্পর্কে আলোচনা] (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেভোলানো ছড়া (বৈশাখ, ১৩৩০): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বান্ধব: [ঘুমপাড়ানী ছড়া]: (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)।

প্রচার: বঙ্গে দশভূজা [বিজয়া দশমী সম্পর্কে রচিত একটি সাহিত্যিক ছড়া]: (আশ্বিন, ১২৯৩)।

সাহিত্য: 'কাহিনী' [লোককথার অন্তর্ভুক্ত ছড়া]: বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, ১৩০৯): ক্ষীরোদচন্দ্র রায়। প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা: (আশ্বিন, ১৩২৭): জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নব্যভারত : সুন্দরবনের প্রজা [ধানের সাধভক্ষণ-বিষয়ক একটি ছড়া] : (অগ্রহায়ণ, ১২৯১)। 'খুকুমনির ছড়া'র সমালোচনা (আশ্বিন, ১৩০৬): ক্ষীরোদচন্দ্র রায়। খণ্ডপাড়া (আষাঢ়, ১৩১১) : ক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সাধনা : পৌষসংক্রান্তি (মাঘ, ১৩০১) : দীনেন্দ্রকুমার রায়। চড়ক-সংক্রান্তি (বৈশাখ, ১৩০২) : ঐ। মেয়েলি ব্রত : দশ পুতুল ব্রত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২)। মেয়েলি ব্রত : হরিচরণ ব্রত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২)। মেয়েলি ব্রত : সাঁজ পূজনী (আষাঢ়, ১৩০২)। নন্দোৎসব (কার্তিক, ১৩০২) : দীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রদীপ : তুষলা (ফাল্গুন, ১৩০৪) : অবিনাশচন্দ্র দাস। [তুষলার ছড়া] (মাঘ, ১৩০৫). অবিনাশচন্দ্র দাস। গাস্বিব্রত (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৬) : যদুনাথ চক্রবর্তী। 'খুকুমণির ছড়া' [সমালোচনা] (অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : [উঁচড়া পূজার ছড়া] (মাঘ, ১৩০১। পাদটীকা) : রজনীকান্ত গুপ্ত। ছেলেভুলানো ছড়া [কলিকাতায় সংগৃহীত ৩০টি ছড়া] : (১৩০১, ৩য় সংখ্যা। পৃ ১৮৯-২০২). রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেয়েলি ছড়া (১৩০২, ৩য় সংখ্যা। পৃ. ৩৭৪-৩৭৯) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলে-ভুলানো ছড়া [সাঁওতাল পরগণার ছড়া] : (১৩০২, ৩য় সংখ্যা। পৃ. ৩৭১-৩৭৪) : রজনীকান্ত গুপ্ত। ছেলে ভুলানো ছড়া [বাঁকুড়া-বেলতোড়, মেদিনীপুর, বনবিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত] : (১৩০২, ৩য় সংখ্যা। পৃ ৩৬৭-৩৭১) : বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ। ছড়া [হুগলী ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত ১৮টি ছড়া] : (১৩০৩, ১ম সংখ্যা। পৃ ৬১-৬৪) · অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ছড়া [বর্ধমান-দেবগ্রাম থেকে সংগৃহীত ৪১টি ছড়া] : (১৩০৩, ১ম সংখ্যা। পৃ. ৫৬-৬১) : কৃষ্ণলাল রায়। ব্রতবিবরণ (১৩০৯, ২য় সংখ্যা। পৃ. ১০০-১২০) : রামপ্রাণ গুপ্ত। চট্টগ্রামী ছেলেভুলানো ছড়া : (১৩০৯, ২য় সংখ্যা। পৃ. ৭৩-৯১। ১৩১০, ২য় সংখ্যা। পৃ. ১১৩-১১৬। ১৩১৩, ২য় সংখ্যা। পৃ. ১০৭-১১৪) : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। শরৎ-কালী (১৩১০, ২য় সংখ্যা) : ব্রজসুন্দর সান্যাল। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা [কৃষ্ণের ননী চুরি বিষয়ে ছড়া] (১৩১১, ২য় সংখ্যা) : মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য। বাঙালীর মেয়ের ব্রতকথা (১৩১৩, ১ম সংখ্যা। পৃ. ২৩-২৪) : অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বাঘাইর বয়াত [মৈমনসিংহের পৌষসংক্রান্তির ছড়া] (১৩১৯, ৩য় সংখ্যা) যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক। শ্রীহট্টের পঁই (১৩২০, ১ম সংখ্যা। পৃ. ৭৭-৮০): দ্বারকানাথ চৌধুরী। দেলপূজার ছড়া : (১৩৪৭, ৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ২৬৪-২৭২) : তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ওলাবিবির গান [দক্ষিণ ২৪পরগণায় চলিত ওলাবিবির মাহাত্ম্যসূচক অনুষ্ঠানের ছড়া] (১৩৮৩, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ৩০-৪১): অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

উৎসাহ : [ঘুমপাড়ানী ছড়া]: (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)। 'খুকুমণির ছড়া'র সমালোচনা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়): বরিশালে নবান্ন [নবান্নের ছড়া]: (মাঘ, ১৩২০): মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

প্রবাসী : মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত [জয় মঙ্গলবার]: (অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩০৮): অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। [বদর-পীরের ছড়া]: (শ্রাবণ, ১৩১৪। পৃ. ১৯১-২০০)। বঙ্গের পগলা পৌষ (পৌষ, ১৩১৮). নিরুপমা-দেবী। বঙ্গের পৌষসংক্রান্তি (মাঘ, ১৩১৮): হরগোপাল দাসকুণ্ডু। পৌষ সংক্রান্তি (ফাল্গুন, ১৩১৮) শশিভূষণ দত্ত। বাজুবংশী দিগের কথা [পূজা-মন্ত্রের ছড়া]: (ফাল্গুন, ১৩১৮) : আশুতোষ বাগচী। পৌষ সংক্রান্তি : (চৈত্র, ১৩১৮): নলিনীনাথ দাসগুপ্ত। পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন : (চৈত্র, ১৩১৮) : কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। পৌষ সংক্রান্তি : (চৈত্র, ১৩১৮) : জগৎমোহিনী দেবী। পৌষ-সংক্রান্তি (বৈশাখ, ১৩১৯): হেমচন্দ্র বক্সী। পৌষ-সংক্রান্তি (বৈশাখ, ১৩১৯) প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌষ-সংক্রান্তি (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯): সুরেন্দ্রনাথ সেন। সূর্যের ব্রত (বৈশাখ, ১৩২১): সত্যভূষণ দত্ত। ভাদুপরব [ভাদুর ছড়া] (আশ্বিন, ১৩২১) · জীবনহরি সামন্ত। [পৌষ সংক্রান্তি]: (পৌষ, ১৩২৬): সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কোন্ মাসে কি খেতে হবে (মাঘ, ১৩২৮): উৎপলাক্ষী দাসী। তোষলা বা তুষু পূজা (ফাল্গুন, ১৩২৯) : রাধারমণ চক্রবর্তী। [বিভিন্ন ছড়া]: (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১): পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়। [বারোমেসে ছড়া]: (আষাঢ়, ১৩৩২): উমাপদ মুখোপাধ্যায়। [গাছ নোয়ান্যার ছড়া]: (শ্রাবণ, ১৩৩২। পৃ. ৫১৫)। [আড় বাঘের ছড়া] (শ্রাবণ, ১৩৩৫): নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী। [বাঘের মাগনের ছড়া]: (আশ্বিন, ১৩৩৫): সুধীরকুমার সেন। জাতীয় জীবনে ঠাকুরমার দান (কার্তিক, ১৩৪০): অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। [ছড়া]: (কার্তিক,

১৩৪৮): অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। বাঙলার লোকসংস্কৃতি—ব্রত ও উৎসব (আশ্বিন, ১৩৫৬): নলিনীকুমার ভদ্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা: ভ্রাতৃদ্বিতীয়া [এই বিষয়ের ছড়া]: (কার্তিক, ১৩১৮); সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রতিভা: মেয়েলিসাহিত্য [মাঘমণ্ডল]: (শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩১৮): দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।

সৌরভ: গোরক্ষনাথের পূজা (আষাঢ়, ১৩২০): রসিকচন্দ্র বসু। কুমারী ব্রতের স্মৃতি: মাঘমণ্ডল (মাঘ, ১৩২০): 'শ্রীমতী—দাসী'। ভাদ্রের শৈশবস্মৃতি (ভাদ্র, ১৩২১): চন্দ্রকুমার দে। প্রবাদের আবাদ (পৌষ, ১৩৩১। ভাদ্র, ১৩৩৪): কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য। টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য (কার্তিক, ১৩৩৪): রসিকচন্দ্র বসু।

মর্মবাণী। মানসী ও মর্মবাণী: মেঘের কথা (আশ্বিন, ১৩২২/১১শ সংখ্যা): অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সেকালের পল্লীচিত্র (ফাল্গুন, ১৩২৮। মানসী ও মর্মবাণী): প্রবোধচন্দ্র সেন। 'ভজার বাঁশী'র সমালোচনা (পৌষ, ১৩২৯। পৃ. ৪৭৮)।

ভারতবর্ষ: বাঙালায় মামী (শ্রাবণ, ১৩২১). 'নসীরাম দেবশর্মা'। নিরক্ষর কবি: জয়চাঁদ গা'ন [গাজীর গীতের ছড়া]: (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩): মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য। গ্রাম্যগাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ (মাঘ, ১৩২৩): হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বর-বরণের নূতন ছড়া [ব্যঙ্গ কবিতা, সাহিত্যিক ছড়া]: (শ্রাবণ, ১৩৩১): কামিনী রায়। নদীয়া হইতে সংগৃহীত মেয়েলী ছড়া [আগমনী-বিষয়ক ছড়া, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক] (ভাদ্র, ১৩৩৭)· শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ: প্রাচীন কবির কবিতা (ফাল্গুন, ১৩২২): বিজয়রত্ন মজুমদার।

মাসিক বসুমতী: মধ্যবঙ্গের গ্রাম্যগীতি/মাণিকপীর [মাণিকপীর সম্পর্কীয় ছড়া] (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭): নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। নদীয়া ও যশোহরের গাজনগীতি [গাজনের ছড়া]: (মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৭): শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামে ইাঁচড়া পূজার ছড়া (ভাদ্র, ১৩৪৯)। ইটাকুমারের ছড়া (বৈশাখ, ১৩৫৪): শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। স্মরণীয় বৈশাখ [বৈশাখমাস সংক্রান্ত ছড়া]: (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮): সোমেন্দ্রনাথ দাস কানুনগো।

বিচিত্রা: ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (আশ্বিন, ১৩৩৫): মোহাম্মদ এনামুল হক। শিশুমনের চলচ্চিত্র (বৈশাখ, ১৩৩৯): মতিলাল দাস।

বঙ্গলক্ষ্মী : দক্ষিণবঙ্গের মাঘব্রত (ভাদ্র, ১৩৪৬) : তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পল্লীক্রীড়াগীতের আলোচনা [খেলার ছড়া] (কার্তিক, ১৩৪৬) : বনীগোপাল দাস। প্রাচীন ছড়া (ফাল্গুন, ১৩৪৮) : মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : [মাঘমণ্ডল] (শ্রাবণ, ১৩৪৪) : কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী। রাজনগর ধ্বংসের কবিতা [বর্ণনা-বিবৃতিমূলক ছড়া] (বৈশাখ, ১৩৪৫। পৃ. ১-৮)। নিরানব্বই সনের পিরাইর কবিতা [বর্ণনা-বিবৃতিমূলক ছড়া] (মাঘ, ১৩৪৬। পৃ. ১৩৮-১৩৯)।

অলকা : রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকায় রঙ্গরস (বৈশাখ, ১৩৪৭) : তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন [গাজনের ছড়া] (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮) : তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

বসুধারা : বসুধারা ব্রত (বৈশাখ, ১৩৬৪) : বেলা দে। বাঙলার মেয়েদের ব্রত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪) : মিনতি মিত্র। পল্লীর বারমাস্যা (১৩৬৫-১৩৬৬, বিভিন্ন সংখ্যা) তুলসীদাস সিংহ।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা [হেটো কবির ছড়া] : (২১ বৈশাখ, ১৩৭০) : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিতান্ত সংক্ষেপে, বাঙলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছড়া সঙ্কলন-সমীক্ষার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা গেল। এই তালিকা যে নিঃশেষ নয়, তা বলাই বাহুল্য। কালের দিক থেকে, একেবারে সাম্প্রতিক কালের কথা কিছুই বলা হয় নি। তেমনি, কয়েকটি তথ্য পুনশ্চ উল্লেখযোগ্য : 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (৩ ফাল্গুন, ১২৬২) গ্রাহকবন্ধা কাব্য-ছড়া; 'সাধারণী' পত্রিকায় 'চনকচূর্ণ' বিভাগে প্রকাশিত (১৯ মাঘ, ১২৮১) পত্রিকার মূল্য চেয়ে ছড়া; 'নবজীবন' পত্রিকায় 'জয়দেব' (ফাল্গুন, চৈত্র, ১২৯৩) প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ছড়া।

সাময়িক পত্রে বাঙলা ছড়া-চর্চার যে দৃষ্টিকোণটি ফুটে উঠেছে, সাধারণভাবে বলতে গেলে তা প্রশংসনীয় কিছু নয়। সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দিকটি পুরোপুরিই অবহেলিত বা উপেক্ষিত। সঙ্কলনগুলির মধ্যেও কোনো পদ্ধতির অনুসরণ নেই, যদৃচ্ছা প্রকাশিত। 'ভারতী', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এবং 'প্রবাসী' এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকাদের সচেতনতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ছড়া প্রকাশিতও হয়েছে এই তিনটি পত্রিকাতেই সর্বাধিক। 'ভারতী', 'সাহিত্য

পরিষৎ পত্রিকা' এবং 'প্রবাসী'—তিনটি পত্রিকারই সম্পাদক-সম্পাদিকাগণ এ বিষয়ে পাদটীকায় মত-মন্তব্য-কথান্তর প্রকাশ করে নিজেদের সচেতনতা ব্যক্ত করছেন।

ছড়ার 'পাঠান্তর' বা 'কথান্তর' সম্পর্কে সচেতনতা একমাত্র দেখা গেছে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়। এজন্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। 'পৌষসংক্রান্তিকে' কেন্দ্র করে 'প্রবাসী'তে এবং বিভিন্ন ব্রতকে কেন্দ্র করে 'ভারতী'তে যে বিষয়ভিত্তিক ছড়া সংগ্রহের উৎসাহ প্রবর্তিত হয়, তার মধ্যে যেন একটি পদ্ধতির অনুসরণ আছে। সাময়িক পত্রের ছড়া-চর্চার পেছনে কাজ করেছে স্বাদেশিকতা, কাজেই তা আবেগসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। কোনো তত্ত্ব বা বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পায় নি বলেই এই প্রয়াস হালভাঙা নৌকোর মতো এলোমেলো পথে বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রায় সব আলোচনাই রবীন্দ্রানুসারী।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'তে (মাঘ, ১৩০১। পৃ ১৮৯-২০২) রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'এক্ষণে সাহিত্য পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিবেন।' রবীন্দ্রনাথের এই আবেদন বৃথা হয় নি। ১৩০৯, ১৩১০ এবং ১৩১৩ সালে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'তে মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ যখন চট্টগ্রামের অঞ্চল বিশেষ থেকে ছড়া সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকেন, তখন তিনি যে রবীন্দ্রনাথদ্বারাই প্রাণিত হয়েছেন, সে কথা বলেন: 'মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে চট্টগ্রাম আনোয়ারা অঞ্চল হইতে নিম্নপ্রকাশিত ছড়াগুলি সংগৃহীত হইল। ইহাদের রক্ষণের জন্য আমাদের যে একান্ত যত্নপর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে আর কথা কি?' রবীন্দ্রনাথ শালীনতা রক্ষার জন্যে দু-একটি ছড়ার পরিমার্জনা করেছিলেন, আবদুল করিমও তাই করেছেন। তবে করিমসাহেবের যুক্তি ছিল এই: চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য ভাষা সাধারণ বাঙালী বুঝতে পারবে না, এই আশঙ্কাতেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। যদি International Phonetic Script-এ এই ছড়াগুলি প্রকাশিত হত, তবে আজকের গবেষক ওই সঙ্কলন দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হতেন। না হয় ভাষা-গত টীকা-টিপ্পনীর পরিসর একটু বেড়ে যেতই!

তবু তার মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, গুরুসদয় দত্ত প্রণীত ছড়ার বই 'ভজার বাঁশী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে (মানসী ও মর্মবাণী: পৌষ, ১৩২৯, পৃ. ৪৭৮) সাধারণভাবে ছড়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। সমালোচক দেখিয়েছেন, পুনরাবৃত্তি ছড়ার একটি বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি যে বলেছেন, এই পুনরাবৃত্তি ইংরেজী ছড়া থেকে বাঙলায় সঞ্চারিত, তা সত্য নয়। যে কোনো দেশের ছড়াতেই তা দেখা যায়। অবশ্য বলা প্রয়োজন, তিনি সাহিত্যিক ছড়ার প্রসঙ্গে, বিশেষ একজনের (গুরুসদয় দত্ত) রচনা আলোচনা কালে তা বলেছেন। কিংবা 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গে ছড়া সম্পর্কে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর আলোচনা।

সাময়িক পত্রের প্রসঙ্গে সাময়িক আলোচনাচক্র ও স্মরণ সংখ্যার কথাও বলা যায়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টসনে শান্তিনিকেতনে এক 'সাহিত্যমেলা'র আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধাবলী ক্ষিতীশচন্দ্র রায় দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ('সাহিত্য মেলা': আষাঢ়, ১৮৭৯ শকাব্দ)। ছড়া সম্পর্কে এই আলোচনাচক্রে আলোচিত দুটি প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'লোকসাহিত্যের ত্রিধারা' (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬২-৫১) প্রবন্ধ। ছড়াসাহিত্যের নিদর্শন অন্বেষণ করতে তিনি মধ্যযুগ, অন্ত্যমধ্যযুগ এবং উনবিংশ-বিংশ শতকের অপ্রধান কবিদের পুঁথির রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, এবং কয়েকটি দুর্লভ তথ্যের যোগান দিয়েছেন। ছড়া সাহিত্যের ধারা যে বরাবর বাঙলা সাহিত্যে বলবতী ছিল এবং অক্ষুণ্ণ ধারায় তা সেদিন পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল, তাঁর তিন খণ্ডে পূর্ণ 'পুঁথিপরিচয়' গ্রন্থ (যার কথা পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি) থেকে এবং বর্তমান আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়। কোনো কোনো গবেষক ছড়ার প্রাচীন নিদর্শন অন্বেষণ করতে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত রচনার স্থান বিশেষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বা তাঁরা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছড়ারূপেই এইসব রচনাগুলির প্রতি দৃকপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নি। ডঃ মণ্ডল জানাচ্ছেন: "বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা পল্লী কবিদের হাতে ছোটখাট গাথা কবিতায় ও ছড়ায় রূপ পাইয়াছিল। যেমন, রঙ্গপুরের বর্ধনকুঠীর নয় আনির জমিদার সীতারাম রায়ের ব্যাপার লইয়া উত্তরবঙ্গে কবি কৃষ্ণহরি দাসের 'নয় আনার কবির পাঁচালী।'...উত্তরবঙ্গের কবি রামপ্রসাদ মৈত্রের রচিত ইংরাজলীলা

কাহিনীমূলক ঐতিহাসিক ছড়া মুদ্রিত হইয়াছে।" [এই জাতের রচনা রাইকৃষ্ণ দাসের লেখা বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়ার কথাও ডঃ মণ্ডল উল্লেখ করেছেন।]

"উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বিবিধ ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বগুড়া জেলার দ্বিজ গৌরীকান্তের মহাস্নান স্নানের বা পৌষ নারায়ণী স্নানের ছড়া, · " "পূর্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ সম্পাদিত · 'ভূমিকম্পের ছড়া,'···।" বান নিয়ে ছড়া অনেকেই লিখেছিলেন। একজন হলেন দ্বিজ দ্বারকানাথ, নিবাস কুকুটা গ্রাম। তাঁর পুঁথির লিপিকার শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লিপিকাল ১২৩৮ বঙ্গাব্দ।

উল্লিখিত আলোচনা চক্রের অপর প্রবন্ধ ডঃ কুঞ্জবিহারী দাশের 'বাংলা ও ওড়িয়া পল্লীসাহিত্যের ঐক্য' (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫২-৬০)। বাঙলা ও ওড়িশার কয়েকটি ছড়ার তিনি সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে। যেমন, বাঙলার 'দিদি লো দিদি, একটা কথা' (ওড়িয়া: 'কথাটিএ কহুঁ, কথাটিএ কহুঁ/কিস কথা, বেঙ্গ কথা'), 'আমার কথাটি ফুরোল/নটে গাছটি মুড়োল' (ওড়িয়া. মো কথাটি সারিলা/ফুল গাছটি মরিলা')[১]; 'তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি' (ওড়িয়া: 'দান্ত নাহিঁ বুঢ়া পাকুয়া পাটি বোউ কি লো'), 'আয় এতো রঙ্গ আছ্ এতো বড় বঙ্গ' (ওড়িয়া: 'ধোব চারি ছান্দ কহিলু নাগর তু মোর জীবর ধন'); 'জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢে বরিষাব জল (ওড়িয়া: 'মজুশিরে নুআ ভাত চুঙুড়ি মাছের রস'), প্রভৃতি। কোনো আলোচনা-বিশ্লেষণ নেই।

শ্রীযুক্ত প্রদ্যুতকুমার ভৌমিক তাঁর 'বাঙলার মৌল সাহিত্য' ('বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ': মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ: অক্টোবর, ১৯৭৪। প. ২২২-২৩২) প্রবন্ধে বাঙলা ছড়ার ছন্দের সঙ্গে সাঁওতালী ছন্দের মিল লক্ষ করেছেন। 'ওপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে' ইত্যাদি ছড়ার ছন্দের সঙ্গে এই সাঁওতালী ছড়াব ছন্দের মিল পেয়েছেন:

তিহিঞ্ পেড়া / ডাহেন সে সে / তিহিঞ্ তোয়া / দাকা

১ ওড়িয়া কথান্তর প্রদর্শন এই প্রথম নয়। ছড়াটির ওড়িয়া কথান্তর এর আগে পাই 'সাহিত্য' পত্রিকায়। (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, ১৩০৯),—ক্ষীরোদচন্দ্র রায় লিখিত 'কাহিনী রচনায়।

পাপা পেক্তা / তাহেন সে সে / পাপা জেল / দাকা
দিন্ সে পেড়া / তাহেন সে সে / দিন্‌সে রাপে / উতু ॥

[অর্থ : 'হে কুটুম, আজকে থাকলে ডুমভাত খাওয়াব। যদি কাল কের থাক তবে মাংসভাত খাওয়াব। আর চিরদিনের মত থাকলে রোজ রোজ ঝোলভাত খাওয়াব']

কোল-অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা দ্বারা বাঙলা ভাষা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ছড়া একটি আদিম সাহিত্য, তার ছন্দও কি তাহলে আদিম কোনো ভাষা দ্বারা প্রভাবিত? সুজনবাবু প্রসঙ্গটি কেবল উত্থাপন করেছেন, পর্যাপ্ত আলোচনা করেন নি। এই বিষয়ে অধিকতর গবেষণা হলে বাঙলা ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য মেনে নেবার সুযোগ হবে। 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে' ইত্যাদির অনুরূপ একটি সাঁওতালী ছড়া তিনি দিয়েছেন : 'এ সীম সীম, দেবুসাক মে, বুগিকে হিজুকানা, দোড় বাগিয়াম।' অর্থাৎ : মুরগী রে মুরগী,/তুই ডিমটা দিয়ে দে না,/আমরা নিয়ে পালিয়ে যাব / বর্গিরা আসছে করতে হানা।

আরো বেশি পরিমাণে উদাহরণ দিলে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যেত। এ বিষয়ে অপর নিবন্ধ 'উইলিয়াম কেরী ষ্টাডি অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টারে'র উদ্যোগে আয়োজিত (আগষ্ট, ১৯৭৬) আলোচনাচক্রে পঠিত ৬ : নীলরতন সেনের 'লোককাব্যের ছন্দ' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। পরে তা নিয়ে আলোচনা করছি ॥

···৬···

১৩০৬ সালে 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত হয়,—তারপর অর্ধশতকের মতো সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও উল্লেখযোগ্য কোনো ছড়ার সঙ্কলন গ্রন্থ মেলে নি। যে কটি মিলেছে, তা নাবালকের পাঠ্য ও পথ্যরূপে, সর্বপ্রকার বিশেষত্ববিহীন, উল্লেখেরও অযোগ্য।

বহুদিন পর শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীমশাই তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (বিশ্বভারতী। মাঘ, ১৩৪৯) বইতে (পৃ. ৬১-৬৪) এবং 'ছেলেভুলানো ছড়া' (পুনর্মুদ্রণ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৮) বইতে ছড়া সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা

করেন। প্রথম বইটিতে ছড়াকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন: খেলার ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া এবং বিবিধ ছড়া (এর মধ্যে শিব-দুর্গা-গোপাল এবং সাময়িক ও ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত ছড়াকে গ্রহণ করা হয়েছে)। দু-এক পঙ্‌ক্তি করে দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। আলোচনার ভঙ্গিতে কোনো নতুনত্ব নেই। 'ছেলেভুলানো ছড়া' মোট ৬০টি ছড়ার সঙ্কলন, একাদিক্রমে সঙ্কলিত, শ্রেণীবিন্যাসে বা সজ্জায় কোনো নীতি-নিয়ম নেই। নাম থেকেই সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের সঙ্গে আরো কিছু ছড়া যোগ করে এই সঙ্কলন প্রস্তুত হয়েছে। নন্দলাল বসুর আঁকা প্রচ্ছদ বইটির একটি আকর্ষণ।

অতঃপর উল্লেখযোগ্য বই ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাইয়ের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র-সংক্রান্তি, ১৩৬১। তৃতীয় সংস্করণ: চৈত্রসংক্রান্তি, ১৩৭৮)। তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৩১-২০৫) ছড়া নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তার সূচী এই; ছড়ার-সংজ্ঞা, লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দেশ, ছড়ার বিভিন্ন বিভাগ, ছন্দ; ছড়ায় শিশু, নারী ও প্রকৃতির বিভিন্ন দিক। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই লেখক জানিয়েছিলেন, ডঃ ভেরিয়র এল্‌উইনের নির্দেশেই তিনি লোকসাহিত্যের "আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে" পরিচিত হন। ভেরিয়র এল্‌উইন বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও অবিসংবাদিতভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ লোকচারণিক, লোকসাহিত্যের সম্পাদনা, সংগ্রহ, শ্রেণীভাগ ও বিশ্লেষণে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণের যোগ্য। কিন্তু তাঁর শিষ্যত্বগ্রহণ করে ডঃ ভট্টাচার্য কোনো দিকেই ভেরিয়র এলউইনকে অনুসরণ করেন নি। শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেই যে গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু এমন একটি বিশেষত্ব থাকা উচিত, যাতে শিষ্যকে গুরুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করা যায়। ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনা পদ্ধতিতে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, যাতে তাঁকে এল্‌উইনের শিষ্য বলা যায়। তৃতীয় সংস্করণে ডঃ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-প্রবর্তিত রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্য গবেষণার বৈজ্ঞানিকতার সমন্বয়ের কথা বলে নিজস্ব দৃষ্টিকোণের যে বিশেষত্বটি নির্দেশ করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত নিছক রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারারই উদাহরণ হয়ে গেছে, অন্য কিছু নয়।

তৃতীয় সংস্করণ থেকেই 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থখানি 'ভূমিকা' রূপে

গৃহীত হয় এবং প্রত্যেক শাখার একটি পৃথক খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন। পরিকল্পনাটি ভালোই। এই হিসেবে 'বাংলার লোক সাহিত্য : দ্বিতীয় খণ্ড—ছড়া' (প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৩। অশোক-ষষ্ঠী, ১৩৬৯) বের হয়। যদি ছড়া সম্পর্কে লেখকের তাবৎ বক্তব্য এই বইতেই বলা হয়, তবে 'ভূমিকা' রূপে অবার আর একটি খণ্ড রাখা কেন ?

বইয়ের বিষয়-সূচী এই : প্রথমে 'ভূমিকা'তে প্রাথমিক বক্তব্য। তারপর আটটি অধ্যায়ে 'ঘুমপাড়ানি', 'ছেলেভুলানো', 'খেলা', 'কন্যা', 'পরিবার', 'প্রকৃতজগৎ', 'অতিপ্রাকৃত' এবং 'সাহিত্যিক ছড়া'র ব্যাখ্যাধর্মী আলোচনা ও সঙ্কলন করেছেন। মনে হয়, এটাই তাঁর ছড়া সম্পর্কে শ্রেণীভাগ। সঙ্কলন ও সমীক্ষা তিনি একই সঙ্গে করেছেন, ফলে দুই-ই স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছি। তাঁর আলোচনা সাহিত্যিক দিককেই প্রাধান্য দিয়েছে। সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রবাক্য শিরোধার্য করেছেন, কোনো পাঠই উপেক্ষার নয় বলে একটি ছড়ার একাধিক রূপ প্রদান করেছেন। কিন্তু একটি ছড়ার 'পাঠান্তর' তিনি কেবল ছড়াটির প্রথম বা প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিকেই ভিত্তি করে প্রদান করেছেন, ফলে, পাঠান্তরটি একান্তভাবে উক্ত ছড়াটিরই পাঠান্তর কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। কেন পাঠান্তর ঘটে এবং তার ফলে কোনো সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব উদ্ভাসিত হয় কিনা, সে সম্পর্কে তাঁর লেখনী নীরব। ছড়াগুলির স্থানগত উৎস নির্দেশ এবং সংগ্রাহকদের নাম পূর্ণতর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। 'সাহিত্যিক ছড়া'র নিদর্শনের জন্যে এযুগের কোনো কোনো অর্বাচীন কবির রচনা সঙ্কলনের পরিবর্তে, পূর্বে উল্লিখিত পঞ্চানন মণ্ডল মশাইয়ের অনুসরণে বিংশ শতকের অন্যান্য গ্রাম্য কবিদের রচনা সঙ্কলন করলে তাঁর ইতিহাস-জ্ঞানকে সাধুবাদ দিতাম। বিষয় অনুসারে তিনি ছড়াকে যে ভাবে সাজিয়েছেন তাতে সব ধরণের ছড়া ঠাঁই পায় নি। তবে একথা বলতেই হবে, ছড়া সম্পর্কে এতো বড়ো ও মোটা বই বাঙলায় এর আগে আর লেখাও হয় নি।

এরপর পাই ডঃ ভবতারণ দত্তের 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট-শোভিত এবং সুচারুরূপে মুদ্রিত। বইয়ের দ্বিতীয় শিরোনাম 'শিশু-লালিকা ও প্রহেলিকা' এবং ভূমিকা রূপে যুক্ত ডঃ সুকুমার সেন-লিখিত 'শিশু বেদ' প্রবন্ধ থেকে ছড়া সম্পর্কে ডঃ দত্তের দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট হচ্ছে—ছড়াকে তিনি শিশু-সাহিত্য রূপেই

দর্শন ও প্রদর্শন করতে চান। মোট ৮৭২টি ছড়া এতে প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু শ্রেণী-বিভাগের কোনো বালাই নেই, প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমে ছড়াগুলি পর-পর গ্রথিত। ভূমিকাধর্মী প্রবন্ধটিতে ডঃ সুকুমার সেন মশাই মন্তব্য করেছেন: "শ্রেণীবিভাগের দুরূহতা স্মরণে রেখে সঙ্কলয়িতা এই সংগ্রহে ছড়াগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করেন নি। শ্রেণীবিভাগ না করার ত্রুটি আমি যথাসাধ্য এখানে মিটিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে ডঃ সেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ছড়াকে যে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা আমরা পূর্বেই করে এসেছি।

ভবতারণ বাবু ছড়ার মধ্যে ধাঁধাকেও গ্রহণ করেছেন,—করে এক হিসেবে ঠিক কাজই করেছেন, কেননা, ধাঁধার রচনাভঙ্গিতে ছড়াকেই মেলে। তবে, যেহেতু ধাঁধা-ধাঁধাই, ছড়া নয়, সেই হেতু এগুলি পৃথকরূপে প্রদর্শন করলে ভালো হত। একই ছড়াব রূপান্তর-কথান্তরও তিনি প্রদর্শন করেছেন। সঙ্কলনের পর 'টীকা', 'দুরূহ শব্দার্থ', 'প্রথম ছত্রের সূচী' ও 'নির্ঘণ্ট' দিয়েছেন।

'টীকা' অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। কোন্ ছড়া কার সংগ্রহ থেকে গৃহীত, তার নির্দেশিকা এটি। সঙ্কলনটি মূলতঃ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আবদুল করিম, কুঞ্জলাল রায়, বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতির সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'মেয়েলী ছড়া', এবং যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমণির ছড়া'র পুনর্সঙ্কলন। সামান্য কিছু আসানসোলের 'মহিলা বান্ধব' পত্রিকা এবং সঙ্কলকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহীত। বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বলে একটি cross-reference-এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভবতারণ বাবু ভাষা-বিজ্ঞানী, কাজেই, 'দুরূহ শব্দার্থ' অংশে বিস্তৃততর ভাষা-তাত্ত্বিক পরিচিতি প্রত্যাশিত ছিল। অবশ্য 'নির্ঘণ্ট' অংশে আমাদের সে আক্ষেপ তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন, ভাষা-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সুন্দর সামঞ্জস্য তিনি এতে করেছেন।

ইন্দুবিকাশ বসু মশাইয়ের 'বাংলা ছড়া' (বৈশাখ, ১৩৮০। এপ্রিল, ১৯৭৩) আসলে ৮৫০টি প্রবাদের সঙ্কলন। গ্রন্থের নামকরণে সঙ্কলক উনবিংশ শতকের ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, প্রবাদকে যখন 'ছড়া' রূপে ডাকবার রেওয়াজ ছিল। ভবতারণ বাবু ও ইন্দুবিকাশ বাবু—দু'জনের সঙ্কলনে একদিক থেকে মিল আছে,—একজন ধাঁধাকে অপরজন প্রবাদকে ছড়ায় অঙ্গীভূত করে

দিয়েছেন। বাঙলা ছড়ার সঙ্কলনের ইতিহাসে এটিকে একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলা যায়।

সঙ্কলনটির প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে, আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশীদের নিকট সংগৃহীত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম এবং বিহারের বাঙলা-ভাষা অঞ্চল হলো এগুলোর প্রচলন ভূমি। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় (১৩৩৭ থেকে ১৩৩৯ সনের একাধিক সংখ্যায়) এগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় এ বিষয়ে সঙ্কলকের যে প্রবন্ধটি বের হয় (ফাল্গুন, ১৩৩৮) আলোচ্য সঙ্কলনের প্রারম্ভে 'মৌখিক সাহিত্য: বাংলা ছড়া' নামে তা যুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটির বক্তব্য এই. ১ সাধারণ শিক্ষা এবং চরিত্র ও সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের ভূমিকা; ২. গ্রামবাসী, বিশেষতঃ নারী-কর্তৃক লোকসাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়াস ও পদ্ধতি; ৩. ছড়া সম্পর্কে মন্তব্য: 'ছড়া সম্ভবতঃ 'ছন্দ' শব্দের অপভ্রংশ।' ৪ ছড়ার শ্রেণীভাগ 'বারব্রতের ছড়া,' 'রূপকথা সহ ছড়া,' 'ঘুমপাড়ানো ছড়া,' 'জ্ঞানগর্ভ ছড়া', 'পাঁচ মিশালী ছড়া'—এই পাঁচটি ভাগ করেছেন। 'পাঁচ মিশালী' ছড়া বলতে ইন্দুবিকাশ বাবু কি বোঝাতে চান, তা স্পষ্ট নয়। এই ধরণের ছড়ার মধ্যে কখনো কখনো 'অশ্লীলতা'ও তিনি লক্ষ করেছেন। বইটি নিছকই সঙ্কলন, 'শব্দসূচী' পর্যন্ত নেই।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মশাই। 'সুভাষিত' বা 'সদুক্তি'র সঙ্গে তিনি ছড়া (প্রবাদে)-র মিল লক্ষ করেছেন। ছড়া (প্রবাদ)-গুলিকে তিনি মূলতঃ মেদিনীপুরের আঞ্চলিক সাহিত্য-পদার্থ বলে মনে করেন, এবং এর মধ্যে সেখানকার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ অন্বেষণের কথা তোলেন। তবে, সঙ্কলক স্থানে-স্থানে যে মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে বিকৃত করেছেন, ডঃ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

ছড়া সম্পর্কে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর 'সমীক্ষা' (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২) বইয়ের 'ব্রতের ফল' (পৃ. ১-১৮) এবং 'উত্তর পশ্চিম-ভারতের গ্রাম্যছড়া' (পৃ. ১৯-৩২) প্রবন্ধ দুটিতেও আলোচনা করেছেন। প্রথম প্রবন্ধটি বিভিন্ন ব্রতের বিবরণ ও ব্রতের ছড়ার সঙ্কলন, সেখানে তাঁর লক্ষ্য হল, ব্রতের মধ্যে নারীমনের বিকাশ পর্যবেক্ষণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও

সাহিত্যিক ও পারিবারিক পটভূমিকাটি আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কিছু বাঙলা ছড়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আবিষ্কার, তাদের স্বাভাবিকত্ব ও উপমায় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন, প্রভৃতিই তাঁর লক্ষ্য। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের ছড়াগুলি 'গেয় ছড়া' এবং তা নিতান্ত নাবালকদের জন্যে নয়।

শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলার গ্রাম্যছড়া' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইয়ের সঙ্কলন ও সমীক্ষা প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি।

অন্যান্য যে সব ছড়ার আলোচনা বা সঙ্কলন মেলে, তা খুচরো প্রবন্ধ,—অন্য প্রসঙ্গের অন্তর্গত। যেমন, পুলকেন্দু সিংহের 'মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য' (১ম খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩৭৭) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত কিছু ছড়া। কেবলই সঙ্কলন, সমীক্ষার কোনো দিক নেই। ছড়াগুলি এই: ইন্দুমতী ঘোষ-মৌলিক সঙ্কলিত বঙ্গনারীর ব্রতকথা অবলম্বনে বিভিন্ন ব্রতের ছড়া, ভাঁদুই ব্রতের ছড়া; 'বোলান'-এর ছড়া, প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের লেখা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত।

ব্রতের বিবরণ এবং সেই প্রসঙ্গে ছড়া প্রদান করে রচিত কয়েকটি বই পাই। সবই উল্লেখ-যোগ্য নয়। তবে এ খবর অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, এই সব বইয়ের এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি হয় নি,—অনেকগুলিরই একাধিক সংস্করণ হয়েছে। যেমন: পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ-সঙ্কলিত 'মেয়েলি ব্রতকথা' (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৩৮)। এটির ভূমিকায় ব্রতসাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। আশুতোষ কবিরত্ন সম্পাদিত 'সচিত্র মেয়েদের ব্রতকথা' (পরিবর্ধিত, সংস্করণ, ১৩৬২); শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর 'মেয়েদের ব্রতকথা' (সংস্করণ, শ্যামাপূজা, ১৩৬৫), জয়গোপাল সাহিত্য-শাস্ত্রীর 'ব্রতদর্পণ' (সংস্করণের তারিখ অনুল্লিখিত); 'ঘেঁটু পূজার ছড়া' (দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭১), মদনগোপাল গুপ্ত সঙ্কলিত। সব কটিরই লক্ষ্য হল ধর্মীয় দিক।

ডঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল 'The Rajbansis of North Bengal' ('The Asiatic Society', Calcutta, 1965) বইতে প্রাপ্ত উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সমাজে চলিত কিছু, ছড়ার সঙ্কলন করেছেন। ডঃ সান্যালের গ্রন্থ মূলতঃ নৃতত্ত্ব-বিষয়ক, কিন্তু ছড়ার সমীক্ষায় তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রন্থের কথা আমরা সঙ্কলন অংশে বারংবার উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক ডঃ গিরিজা-

শঙ্কর রায় 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ' (বীণা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, .জলপাইগুড়ি) বইতেও রাজবংশী সমাজের নানা ধরণের ছড়ায় সঙ্কলন করেছেন। এটিতেও সমীক্ষা অপেক্ষা সঙ্কলনের দিকই প্রাধান্ত অর্জন করেছে। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের 'বাঙলায় মুখ আমি দেখিয়াছি' বইতে বিবিধ বিষয়ের বিভিন্ন ছড়া উপযুক্ত নিষ্ঠায় সঙ্কলিত হয়েছে

ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য' (ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৭১) বইতে পাঁচালীর অন্তর্ভূক্ত ছড়ার নিদর্শন দিয়েছেন। পাঁচালীর মধ্যে ছড়ার ভূমিকা কি, তাও বিস্তৃতভাবে এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে। তেমনি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলাদেশে সঙ প্রসঙ্গে' (দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২) বইয়ের দ্বিতীয় অংশে নানা বিষয় ও প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত সঙের ছড়াব সঙ্কলন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ সঙের ছড়ার ইতিহাস ও প্রয়োগ-বিধি নিয়েও আলোচনা করেছেন। কিছুকাল ধরে তিনি 'হেটোব ছড়া' নামে হাট-মাঠ-ঘাটের ছড়া সঙ্কলন করেছেন,—প্রথম অধ্যায়ে সেগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিক লিখিত 'ভরাকরের ইতিহাস' (অক্টোবর, ১৯৭৫। ভরাকর স্থানটি ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত) বইতে (পৃ. ২৫-২৬) মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া ও আলপনাব নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে।

অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যে মা' (১৯৭৩) বইয়ের 'ছেলে ভুলানো ছড়ায় মা' প্রবন্ধটিতে ছড়ার এক পরিচিত দিকের ওপর আলোক-পাত করেছেন। প্রবন্ধের নামকরণ থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। ছড়ার মধ্যে মাতৃ-স্নেহের যে নির্ঝরটির দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, অধ্যাপক চক্রবর্তীর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গি এবং নিবিড় আন্তরিকতায় সেটি বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়েছে।

ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ এবং ডঃ অরুণ সান্যাল-সঙ্কলিত 'সাহিত্যকোষ' (১৩৭৯) গ্রন্থে ছড়ার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য পাই। এটি অভিধান-গ্রন্থ, কাজেই ছড়ার প্রচলিত সংজ্ঞা ও স্বরূপের কথাই এখানে লেখক-দের বলতে হয়েছে,—নতুন কোনো দিকের ওপর আলোক-পাতের অবকাশ স্বাভাবিক কারণেই এখানে নেই। তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় (পৃ. ১১৯-

১২১) ছড়ার চিত্রধর্মিতা, এক ছড়ার মধ্যে একাধিক ছড়ার মিশ্রণ, ছড়ার অসংবদ্ধতা ও তার আবৃত্তির দিকের কথা বলা হয়েছে।

ডঃ দুলাল চৌধুরী তাঁর 'বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (আশ্বিন, ১৩৭৬) বইয়ের 'ছড়ায় বাংলার সমাজ ও ইতিহাস' (পৃ. ২৬-৬০) প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রবন্ধের শেষে বাঙলা ছড়ার কয়েকটি সঙ্কলনের নাম করেছেন। সেগুলির সবই আমাদের বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যে দুটি প্রবন্ধ দেখি নি, সে দুটি হল: 'উপজাতীয় ছড়া' (প্রবাসী ১৩৬৮), আবদুস সাত্তার; 'চট্টগ্রামের ছড়া' (মাহেনও ১৩৭০), আনোয়ার রহমান। দুটোই পূর্ববঙ্গের।

পরিশেষে, শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস' (শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৪) বইয়ের অন্তর্গত 'বাংলা ছড়া-চর্চার ইতিহাস' (পৃ. ৬৫-১০৬) প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করি। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে, প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে, শ্রী চক্রবর্তী বাঙলা ছড়ার সঙ্কলন-সমীক্ষার ধারাটি পর্যালোচনা করেছেন— তাঁরই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, তাঁরই মতো করে॥

।৭।

বাঙলা ছড়ার সমীক্ষার ইতিহাসে অন্ততঃ একটি দিক বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ছড়ার ছন্দের দিক। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একালের ছান্দসিকগণ পর্যন্ত এদিকে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার সম্বন্ধে কেবল শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন না, তার ছন্দ নিয়েও আলোচনা করেছেন,—পূর্বেই আমরা তার উল্লেখ করেছি। ছন্দের আলোচনা ছাড়াও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এমন কি, কৌতুকের ক্ষেত্রেও ছড়ার ছন্দকে প্রয়োগ করেছেন। নিতান্ত সিরিয়াস বই 'শব্দতত্ত্ব'-এর 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে পরিচিত ছড়ার প্যারোডি বা লালিকা রচনা করেছেন এইভাবে:

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
কাশি বুক এল দেশে—
বানান-ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন দেবো কিসে॥

বাঙলা ছড়ার ছন্দের আলোচনা প্রথম কে করেছেন? যতদূর জানি, 'নবকুমার কবিরত্ন' এই ছদ্মনামে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মাতৃভাষা কি পেত্নী

ভাষা ? (ভারতী : শ্রাবণ, ১৩২৩। পৃ, ৪৭৮-৪৮১) প্রবন্ধে প্রথম এ কাজ করেছেন। অবশ্য, অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করতে গিয়েই তিনি ছড়ার ছন্দের কথা পেড়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য : "মাত্রাবৃত্তি বাংলা ছন্দে মাত্রা= স্বরযুক্ত বর্ণ+তৎপরস্থিত হসন্তবর্ণ" থাকে। উদাহরণ এই দিয়েছেন :

ছোট বউ্ লো। রান্না চড়া
বড় বউ্ ব। ড়ালের ঝি—প্রাচীন ছড়া
রাই্ উঠেছেন। রাই্ উঠেছেন।
বুড়ি গঙ্গার। ঘাটে
কার হাতে বে। শাঁখা সিঁদুর।
দাশ্‌গে রায়ের। হাতে—ব্রতকথা

রবীন্দ্রনাথের পর প্রবোধচন্দ্র সেন, দিলীপ রায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, নীলরতন সেন—প্রভৃতি অনেকেই ছড়ার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে সব আলোচনা অতি পরিচিত, কাজেই উল্লেখই যথেষ্ট। তবে, দিলীপকুমার রায়ের 'ছান্দসিকী' (:৩৪৭) গ্রন্থের (পৃ. ৫৩-৫৪) মন্তব্য ও ছন্দোলিপি এখানে একটু উদ্ধৃত করি। 'খুকুমণির ছড়া' থেকে ছড়া নিয়ে ছন্দোলিপি তৈরি করেছেন তিনটির :

খুকু্ যাবে। শশুর বাড়ি। সঙ্গে যাবে। কে ?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল্। কোমর বেঁধে। ছে
কে বকেছে। কে মেরেছে। কে দিয়েছে। গাল
তাইতে খোকা। রাগ করেছে। ভাত খায় নি। কাল
খোকা যাবে। নায়ে ০০। লাল্ জুতুয়া। পায়ে ০০
হাত্ ঘুরুলে। নাড়ু দেব। নৈলে নাড়ু। কোথায় পাব ?

লক্ষ করলে দেখা যাবে, সব ক'টি উদাহরণই চার পর্বের। দুই বা তিন পর্বের পঙ্‌ক্তিও যে ছড়ায় হতে পারে বা হয়ে থাকে, তার পরিচয় দিলীপ রায়ের আলোচনায় নেই। অবশ্য দুই পর্বের পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে আমরা কিছু অন্য ধারণা পোষণ করি। দেখেছি, ইচ্ছে করলেই বহু ক্ষেত্রে, পঙ্‌ক্তিতে দুই বা চার পর্বে প্রদর্শন করা যায়। কেননা, মৌখিক ছন্দকে ছন্দোলিপি-প্রস্তুত-কারক নিজস্ব রুচি অনুসারে সাজিয়ে থাকেন। প্রদত্ত উদাহরণগুলির যে কোনোটিকেই দুই পর্বের পঙ্‌ক্তিতে প্রদর্শন করা যেত। আরো লক্ষণীয়,

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও চার পর্বের পঙ্‌ক্তিরই উদাহরণ দিয়েছেন। এই জন্যেই বলছিলাম, দুই পর্বের পঙ্‌ক্তির উদাহরণ না দিয়েছেন, ক্ষতি নেই, তবে তিন পর্বের পঙ্‌ক্তির উদাহরণ থাকলে ভালো হত।

তা সে যাই হোক, এই ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই : "বাংলাভাষায় সব চেয়ে ঘরোয়া ছন্দ নিশ্চয়ই স্বরবৃত্ত—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন প্রাকৃত বাংলা ছন্দ। এর উদ্ভব হল ছড়াতে।"

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীদুলাল চৌধুরী প্রভৃতি গবেষকগণও ছড়ার ছন্দের আলোচনা করেছেন। ডঃ চৌধুরী তাঁর 'বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (আশ্বিন, ১৩৭৬) বইয়ের 'বাঙলা ছড়ার ছন্দ' (পৃ. ১৭৯-১৮২) নামের প্রবন্ধে ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দুই, তিন ও চার পর্বের পঙ্‌ক্তির উদাহরণ দিয়েছেন। ছড়ার তিন বা চার পর্বের পঙ্‌ক্তি প্রসঙ্গে একটা বিশেষত্ব আমাদের এই মনে হয় : প্রায় সব ক্ষেত্রেই শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে। অপূর্ণ মাত্রার পর্ব মানে মূল পর্বের বা বাড়তি হিসেবের পর্ব, গুরুত্ব তার অবশ্যই কিছু কম। তবে কি চার পর্বের পঙ্‌ক্তি তিন পর্বে এবং তিন পর্বের পঙ্‌ক্তি দুই পর্বেই মূলতঃ সমাপ্ত হয়ে যায়? এর কারণ কি? অথচ, দুই পর্বের পঙ্‌ক্তিতে সে অপূর্ণতার বালাই নেই। দুই পর্বের পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে আমাদের আরো একটি ধারণা এই : বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিন বা চার পর্বের পঙ্‌ক্তির ছড়ার শেষ পঙ্‌ক্তি দুই পর্বের হয়ে থাকে (আগা-গোড়া দুই পর্বের পঙ্‌ক্তি-সম্বলিত ছড়াও অবশ্যই মেলে)। ছড়ার ছন্দের আলোচনায় তা-হলে তিন এবং দুই পর্বের পৃথক গুরুত্ব সম্বন্ধে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি ডঃ নীলরতন সেন 'লোককাব্যের ছন্দ' (লোকায়ত সংস্কৃতি এপ্রিল ১৯৭৮, উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার প্রকাশিত। পৃ. ৭২-৮৫) নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। ছড়ার ছন্দের আলোচনায় তাঁর বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখিয়েছেন, ছড়ার ছন্দ বলতে যে বিশিষ্ট ছন্দটি, তার দুটি রূপ আছে : একটি রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল এবং পরবর্তী প্রতিভাবান কবিদের ছন্দ-চর্চার ফলে মার্জিত, সুনিয়ত ও সুনিরূপিত পরিচ্ছন্ন রূপাদর্শ,-ছন্দের দিক থেকে কোথাও কোনো শিথিলতা এতে নেই। শিষ্ট ও শিক্ষিত মানুষের সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ রীতি দ্বারা তা গড়ে উঠেছে। পল্লীর মানুষদের স্বরাশ্রয়ী উচ্চারণরীতি দ্বারা গড়ে ওঠা, পর্বের

মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে সহজেই তা শোধন করে নেয়া যায়। ডঃ সেন এই পালিশ-বিহীন ছন্দের মধ্যে স্বাভাবিকতা ও প্রাণের উত্তাপ অনুভব করেছেন। 'ছড়ার ছন্দ' বলতে খাটি লোকসাহিত্যের ছন্দ আর মার্জিত কবিদের নিয়ম-মাফিক ছন্দ যে একই পদার্থ নয়,—এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে ডঃ সেনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ও সাধুবাদ দিই। অনেকেরই ধারণা, লোককাব্য রূপে ছড়ার ছন্দ আর রবীন্দ্রসাহিত্যের ছড়ার ছন্দ অভিন্ন। এই ভুল ধারণা ডঃ সেন নির্ভুলভাবে ভেঙে দিয়েছেন।

· ৮···

লোকসাহিত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঢাকার বাঙলা একাডেমীর প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকসাহিত্যের গবেষণা মূলতঃ একক প্রয়াসের ফল, পূর্ববঙ্গের গবেষণা সেখানে প্রতিষ্ঠানগত। বাঙলা ছড়া সম্পর্কে এই একাডেমী এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে এই বইগুলো সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে যতখানি সচেতন, সমীক্ষা সম্পর্কে ততখানি নয়।

ছড়া সম্পর্কে বাঙলা একাডেমীর বই আমাদের চোখে পড়েছে পাঁচটি : মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (বৈশাখ, ১৩৬৯)। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে, কিন্তু চোখে দেখি নি। অধ্যাপক আলমগীর জলীল-এর 'রাজশাহীর ছড়া' (চৈত্র, ১৩৭০), শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'যশোর-খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন, ১৩৭১), খোদেজা খাতুনের 'বগুড়ার লোকসাহিত্য' (পৌষ, ১৩৭৭) বইতে ছড়া সম্পর্কে আলোচনা ও সংগ্রহ ; এবং বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য', ১২শ খণ্ড (ফাল্গুন, ১৩৮২)। এ ছাড়া রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য' (দ্বিতীয় প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৭৫) বইতে (পৃ. ৭৬-৭৯) পাই সামান্য কয়েকটি ছড়া। সবকটির অপর সাধারণ বিশেষত্ব হলো, জেলা বা অঞ্চলকে ভিত্তি করে সংগ্রহ-প্রকাশ। এতে আঞ্চলিক সর্বপ্রকার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পক্ষে সহায়ক হবে।

বাঙলা একাডেমী ছাড়া ছড়া সম্পর্কে আর দু'খানি বইয়ের আলোচনার কথা উল্লেখ করা যায়। একটি আশরাফ সিদ্দিকি লিখিত 'লোকসাহিত্য'

(স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা। নভেম্বর, ১৯৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে, কিন্তু চোখে দেখি নি), অপরটি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আলি নওয়াজ-লিখিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' (সিটি লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা। ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯) বইয়ের ভূমিকায় ছড়া সম্পর্কে আলোচনা।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোকসাহিত্যে ছড়া' খুব সহজ সাদা-মাটা ভঙ্গিতে লিখিত, গবেষণা অপেক্ষা লেখকের আন্তরিকতা ও নিবিড় পল্লী-প্রীতিতে স্নিগ্ধ। আলোচনা ও সঙ্কলন একই সঙ্গে করা হয়েছে, তবে সঙ্কলন-প্রবৃত্তিই এতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ছড়ার উৎস-স্থান ছড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে, তবে দেখা গেছে, ময়মনসিংহের ছড়াই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। ছড়াকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: শিশুবিষয়ক ছড়া; খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ছড়া; এবং বিবিধ ছড়া। প্রথম দুটি শ্রেণী সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু 'বিবিধ' নামের নীচে তিনি এমন ধরণের ছড়ার কথাও বলেছেন, যা নিয়ে স্বতন্ত্র এক-একটি শ্রেণীই হতে পারত। যাই হোক, এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, 'বিবিধ' এই শিরোনামের নীচে তিনি প্রায় নিঃশেষে সব ধরণের ছড়ার অন্ততঃ একটি করে নিদর্শন দিয়েছেন। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগ-পদ্ধতি দ্বারা পরে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী মশাই প্রভাবিত হয়েছেন। ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান-এর এই মন্তব্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে "লোকসাহিত্য সংগ্রহের অর্থ লোকসাহিত্যকে নতুন জীবনদান করা নয়। এ সংগ্রহের দ্বারা আমরা বিশেষ-বিশেষ জীবন-বিকাশের পরিচয় সন্ধান করি, ঐতিহ্যের মূল্য নির্ণয় করি এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আবেগকে আবিষ্কার করি।"

অধ্যাপক আলমগীর জলীল-এর 'রাজশাহীর ছড়া' বইয়েরও ভূমিকা লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান। তিনি প্রথমে জানাচ্ছেন: "সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ বিলুপ্তপ্রায় পল্লী-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়তঃ, সংগৃহীত উপাদান পরীক্ষা করে সমাজ-জীবন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।" এখন পর্যন্ত তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কিন্তু একথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্য আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে: "গ্রন্থটি সর্বাংশে গবেষণামূলক নয়। সাধারণ সংগ্রহের সঙ্গে কিছুটা আলোচনা এবং কোথাও

কোথাও ব্যাখ্যা-সূত্র, এভাবেই গ্রন্থটি নির্মাণ করা হয়েছে যাতে সকলেই গ্রন্থটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন।" এই চিত্ত-বিনোদনের দিক এবং "সমাজজীবন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া"—এই দুয়ের মধ্যে তাই সংযোগ নেই।

অধ্যাপক জলীল-এর শ্রেণী-বিভাগ এই : ছেলে ভুলানো ছড়া, কাহিনী-বিষয়ক, নৈসর্গিক, নৈমিত্তিক, মাঙনের ছড়া, বিদ্রূপাত্মক, ক্রীড়া-বিষয়ক, মন্ত্র জাতীয় ও প্রাকৃতিক ছড়া। এক-এক শ্রেণীর ছড়ার পর-পর বিন্যাসের পেছনে কোনো নীতি-নিয়ম নেই। একই ছড়া নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে একই বইতে একাধিকবার গৃহীত হতেই পাবে, কিন্তু সেজন্যে Cross reference দরকার। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ দিয়েছেন, কিন্তু শব্দসূচী নেই। রাজশাহীরই ভিন্ন ভিন্ন কোন্ অঞ্চল থেকে ছড়াগুলি সংগৃহীত, তার উল্লেখও বাঞ্ছনীয় ছিল।

দীর্ঘ ৭৫ পৃষ্ঠার ভূমিকায় অধ্যাপক জলীল ছড়ার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মন্তব্য : 'ছড়িয়ে আছে বলেই ছড়া।' ছড়ার নানা প্রয়োগ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজশাহীর সাংস্কৃতিক পটভূমিকার ওপর সঙ্গতভাবেই জোর পড়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে Folklore-এর বাঙলা করেছেন 'লোকচর্যা'। ছড়ার ছন্দ ও রাজশাহীর উপভাষা সম্পর্কে সামান্য ও সাধারণ আলোচনা আছে। উপভাষাকে তিনি ব্যাকরণের ভাষা রূপেই দেখেছেন, ছড়ার ভাষা রূপে নয়; ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গেও সেই মন্তব্য করা যায়। ছড়ার রূপভেদ-পাঠভেদ সম্পর্কে লেখকের যে সচেতনতা দেখা যায়, তা প্রশংসার্হ, যদিও এই পাঠভেদের আলোচনা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় নি। পরিশেষে বিভিন্ন ভাষায় ছড়ার সঙ্গে রাজশাহীর ছড়াব সাদৃশ্য ও সংযোগ প্রদর্শন করেছেন, এও প্রশংসা আকর্ষণ করে। সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসে ছড়ার প্রভাব সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন, তা আরো প্রসারিত হলে ভালো হত।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'যশোর-খুলনার ছড়া' বাঙলা একাডেমির ছড়া-বিষয়ক ভালো বই। ভূমিকায় পরিচালক সৈয়দ আলী আহ্সান পূর্ববর্তী গ্রন্থে যে কথা বলেছেন, এখানেও সেই কথারই আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করেছেন। এখানেও তাঁদের লক্ষ্য "সকলেই আনন্দের সঙ্গে" বইটি যাতে নিতে পারেন।

সব বইয়েরই যদি এই উদ্দেশ্য হয় তবে একাডেমির মাহাত্ম্য থাকে না। একাডেমিই যদি উচ্চস্তরের গবেষণার সুযোগ না করে দেন, তবে কে সে কাজ করবেন ?

শিবপ্রসন্নবাবুর বইতে মোট ২৮০টি ছড়া দেওয়া হয়েছে। একই বিষয়ক্রম অনুসরণ করে প্রথমে যশোরের, পরে খুলনার ছড়া পাই। বিস্তৃত পাদটীকায় শব্দার্থ, পাঠান্তর ও তুলনাত্মক ছড়া দিয়েছেন। পরিশেষে শব্দসূচী ও প্রথম ছত্রের সূচী। শব্দসূচীতে ভাষাতাত্ত্বিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ছড়াকে তিনি মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : ক. ছেলেমেয়েদের জন্য গই ছড়া খ. বয়স্কদের উদ্দেশে কথিত ছড়া। প্রথম ধরণের ছড়াকে ১৯টি ভাগে এবং দ্বিতীয় ধরণের ছড়াকে ১৪টি ভাগে উপ-বিভক্ত করেছেন। ছেলেমেয়েদের ছড়ার মধ্যে 'জামাতা সম্বন্ধীয়,' 'করুণ রসাশ্রিত,' 'অভিশাপমূলক,' 'নীতিকথা-বচন-প্রবচন'মূলক ছড়া খাপ খায় না। এগুলো বড়োদের বিভাগে দিলেই ঠিক হত। যেমনি আবার 'ভীতি প্রদর্শনমূলক' ছড়া বড়োদের বিভাগে মানানসই হয় না। একই ক্রমসংখ্যা গোটা বইতে তিনি ব্যবহার করে সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন।

ভূমিকা লিখেছেন মোট ১৭ পৃষ্ঠার। তার বিষয়-সূচী এই : 'ছড়াসমূহের বৈশিষ্ট্য,' 'বচন, প্রবচন এবং হেঁয়ালি', 'ছড়ার শ্রেণী ভাগ', 'ছড়ায় সামাজিক চিত্র,' 'ছড়াগুলোর সাহিত্যিক মূল্য,' 'ছড়ার ভাষাতত্ত্ব,' 'ছড়াসমূহের রচনাকাল'। ছড়ার বৈশিষ্ট্য তিনি মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে প্রদান করেছেন। ছড়া যে অসঙ্গতিতে ও অসংলগ্নতায় পূর্ণ, তিনি কিন্তু এই মত মানেন নি,—এখানেই তিনি বিশিষ্ট। কোনো বিশেষ ব্যক্তি এবং কখনো-কখনো কোনো বস্তু বা ঘটনা ছড়ার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে ছড়ার কাঠামো সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়। বচন-প্রবচন-হেঁয়ালিকে তিনি ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ভাষা নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, দুঃখের বিষয়, তা ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা হয়ে গেছে, ছড়ার তত্ত্ব ও সৌন্দর্যকে পটভূমিকা রেখে তা করা হয় নি।

খোদেজা খাতুনের বগুড়ার লোকসাহিত্য বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'গ্রাম্যছড়া' (পৃ. ৯৭-১৩২)। ছড়ার আগে বিশেষণ রূপে গ্রাম্য শব্দের

প্রয়োগ অকারণ এবং অনুচিত। আলোচনা-বিশ্লেষণ, শ্রেণী-বিভাগ—সবই অন্ত আর দু'পাঁচটা বইয়ের মতোই। সঙ্কলনও বিশেষত্ব-বিহীন। আলোচনা এবং সঙ্কলন একই সঙ্গে করা হয়েছে, সঙ্কলনের কোনো ক্রমিকসংখ্যা নেই। খণ্ডাংশ, 'কথান্তর' ইত্যাদি মিলিয়ে আমাদের গণনায় এতে ছড়া আছে মোট ৯০টি। শেষে আছে ক'টি (৭টি) খনার বচন। এইভাবে তিনি ছড়ার শ্রেণী-ভাগ করেছেন : ছেলেভুলানো, খেলাধুলো, গৃহচিত্র, সমাজচিত্র, কর্মপ্রেরণার উৎসরূপে ছড়া, রোদ ও বৃষ্টিবিষয়ক ছড়া, বিদ্রূপাত্মক ছড়া, ফলকুড়ানো-ফসল-কাটার ছড়া, মাগনের ছড়া। আমাদের বিবেচনায় কর্মপ্রেরণার উৎসরূপে যে ছড়া এবং ফলকুড়ানো ফসলকাটার যে ছড়া,—উদ্দেশ্যের দিক থেকে তা একই, কাজেই এই দুইকে ভিন্ন করে দেখবার দরকার নেই। লেখিকা জানিয়েছেন, কোনো কঠিন কাজ করবার বা ভারী বস্তু টানবার ছড়াকে বগুড়ায় 'শিকলী' (পৃ. ১২৭) বলা হয়। মধ্যযুগের বাঙলায় যে কোনো ছড়াকেই শিকলী বলা হত। বগুড়ায় যদি বিশেষ এক ধরণের ছড়াকেই কেবল 'শিকলী' বলা হয়, তবে তা একটি আঞ্চলিক বিশেষত্ব রূপে গণ্য করতে হবে। কিন্তু কথা হল, পূর্ববঙ্গেরই বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও যে কোনো ছড়া বলতে 'শিকলী' ('ছিকলি') শব্দই ব্যবহৃত হয়।

বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য-১২শ' সংগ্রহের দিক থেকে বাঙলা একাডেমির শ্রেষ্ঠ বই। ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী, ফরিদপুর, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর, নোয়াখালী, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জেলা বা অঞ্চল থেকে (জেলা বা অঞ্চলগুলির পর-পর বিন্যাসের মধ্যে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয় নি) মোট ৩১ ধরণের খেলার ছড়া জেলাওয়ারি ভঙ্গিতে সঙ্কলিত হয়েছে। একই ধারাবাহিক সংখ্যা গোটা বইতে ব্যবহৃত হয় নি, আমাদের গণনায় এতে ছড়া আছে ৫০০টি। প্রত্যেক জেলার সংগ্রাহক-দের নাম-ধাম পরম নিষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তৃত বিষয়-সূচী ও পরিশিষ্টটি মূল্যবান। দুরূহ ও আঞ্চলিক শব্দের অর্থ পাদটীকায় প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের কথা, শব্দসূচী নেই।

বদিউজ্জামান-লিখিত ১৫ পৃষ্ঠার ভূমিকা প্রধানতঃ উল্লিখিত ৩১ ধরণের খেলার পরিচায়ন। বিশ্লেষণ সমীক্ষা নেই। মনে হয়, বাঙলা একাডেমী তাঁদের কাজ দুই স্তরে ভাগ করে নিয়েছেন। এখন কেবল সংগ্রহ-সংরক্ষণ,

পরবর্তী স্তরে তার সমীক্ষা-বিশ্লেষণ। সত্যিই এই পরিকল্পনা থাকলে তা আশার ও আনন্দের কথা।

খেলার ছড়ার শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "ছড়ার মৌলিক বিভাগগুলোর মধ্যে শিশু-বিষয়ক ছড়া, প্রকৃতি-বিষয়ক ছড়া, নারী-জীবন অবলম্বিত ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খেলার ছড়ার মধ্যেও আমাদের উল্লিখিত ছড়ার মৌলিক বিভাগগুলোর—শিশু, প্রকৃতি, নারী ইত্যাদির যেমন মিশ্রণ ঘটেছে তেমনি প্রকৃতি বা শিশু ইত্যাদি ছড়ার মধ্যেও খেলার ছড়ার মিশ্রণ দেখা যায়।—পৃ. ৩

আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোকসাহিত্য' বইতে ছড়া নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর কিছু-কিছু মতামত সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, এখন তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। ছড়ার অন্য দিকগুলি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই : ধাঁধাকেই তিনি ছড়ার তুলনায় প্রাচীনতর রচনা বলে মনে করেন। 'সর্বপ্রাণবাদ' এবং 'পূর্বপুরুষের পূজো'র প্রসঙ্গ ছড়াতে নেই, এবং ধাঁধার ছন্দ-সৌন্দর্য ছড়া থেকে সঞ্চারিত। আমরা মনে করি, প্রথম উদ্ভবকালে লোকমানসে এই রকম শ্রেণী-ভেদের বোধ আদৌ ছিল না, কাজেই কোনটি আগে উদ্ভূত, সে প্রশ্নের উত্থাপন নিরর্থক। মন্ত্র, সর্বপ্রাণবাদ, পূর্বপুরুষের পূজোর প্রসঙ্গ ছড়াতেও আছে, বর্তমান সঙ্কলন থেকেই তার প্রমাণ মিলবে। ছড়ার কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ নেই, তা লোকমানসেরই একটি দিক, কাজেই ধাঁধার ছন্দ ছড়ার ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত, একথা জোর করে বলা যায় না। একটি আর একটির ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত, লিখিত সাহিত্য সম্পর্কে সে ধরণের অনুমান সম্ভব হলেও, মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কে বলা উচিত, একই লোকমানসজাত ছন্দ দ্বারা ছড়া ও ধাঁধা রচিত। ছড়ার ছন্দের প্রভাবেই যদি ধাঁধা নির্মিত হত, তা হলে সর্বত্রই ধাঁধাতে সে প্রভাব থাকত না, ধাঁধার নিজস্ব ছন্দ বলেও একটা পদার্থ তবে থাকত।

ছড়ার সঙ্গতি-অসঙ্গতির সঙ্গে সিদ্দিকী সাহেব কালানুক্রমের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর মতে, আদিস্তরে রচিত ছড়ায় অর্থের দিক থেকে এবং পটভূমিকার দিক থেকে অনির্দেশ্যতা আছে; কিন্তু পরবর্তী-কালীন ছড়ায় একদিকে আছে সঙ্গতি, অপরদিকে সুস্পষ্টতা। এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রথম অধ্যায়ে জানিয়েছি। তিনি বলেছেন, পরবর্তী-কালীন ছড়াতে যে

'রসামরস্যময় শব্দরাজি' (পৃ. ১১৪) ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছে, তাই শিশুর নিদ্রাকর্ষক। শিশু শব্দের সামঞ্জস্যের কি বোঝে? ঘুমের সঙ্গে তো বরং অসামঞ্জস্যমূলক অবাস্তব শব্দ-সজ্জারই যোগ বেশি। আর, ছড়া কি কেবলই শিশুর? তাঁর মতে, শিশুর কল্পিত ও অবাস্তব বিবাহের ছড়াই পরবর্তীকালে সত্যিকারের বিবাহের ছড়ায় রূপ নেয় (পৃ. ১৮৫)। কেউ যদি বলেন, উল্টোটাই সত্যি, তবে সিদ্দিকী সাহেবের জবাব কি? দেখা যায়, কারো মাহাত্ম্য খ্যাপন করতে গেলে তাঁর বংশবৃদ্ধির কথা বলা পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন সাহিত্যের একটি সাধারণ লক্ষণ, সেই জন্যেই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর বিবাহ-কথন,—সেই কারণেই শিশুরও বিবাহ-কথন। এর পেছনে আছে fertility cult. শিশু সত্বই ভূমিষ্ঠ বলে নতুন অপর শিশুরও জন্ম সম্ভাবিত করতে পারে—এই যাদুবোধ। সুতরাং শিশুর অবাস্তব বিবাহ পরবর্তীকালে বাস্তব বিবাহে রূপ নেয়, এই মত স্বীকার্য নয়। ছড়ার রচনারীতির মধ্যে ক্রমবিকাশ ও কালানুক্রমিকতার প্রসঙ্গে সিদ্দিকী সাহেব 'Terminus postquem-'-এর কথা তুলেছেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালে রচিত একটি ছড়া পূর্ববর্তীকালে রচিত ছড়ার থেকে কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, সেটি পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই সিদ্দিকী সাহেব এর জন্য আমাদের প্রশংসা-ভাজন, কারণ বাঙলা ছড়ার সমীক্ষায় একমাত্র তিনিই এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবার পর আমাদের একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়: আধুনিক কালের লোকসাহিত্যের গবেষণায় এই ধরণের ক্রমবিকাশ ও কালচেতনার কোনো গুরুত্বই আর স্বীকৃত হয় কি? আধুনিক গবেষক প্রতিটি রূপকেই স্বীকৃতি জানান, তা সে পূর্বকালেই রচিত হোক আর নিতান্ত সাম্প্রতিক কালেই রচিত হোক,—দুইই তাঁর কাছে লোকমানসেরই প্রতিবিম্ব বলে গৃহীত। জানি না, বইয়ের নতুন সংস্করণে সিদ্দিকী সাহেব এ বিষয়ে নতুন কথা উচ্চারণ করেছেন কি না। তবে সিদ্দিকী সাহেব যে বলেছেন, তন্ত্র-মন্ত্র-ইন্দ্রজালের প্রভাবমুক্ত হয়ে ক্রমেই অনেক ছড়া নিছক অনানুষ্ঠানিক আমোদের ছড়াতে রূপ নিচ্ছে, একথা ব্যতিক্রমসহ মানা যায়। কিন্তু এই বিবর্তনেরও কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নি। আমরা মনে করি, শিক্ষার প্রসার ও তন্ত্র-মন্ত্র সম্পর্কে অবিশ্বাস এর মূলে আছে। যাই হোক, ছড়া সমীক্ষার ক্ষেত্রে

সিদ্দিকী সাহেবের অনেক মতের সঙ্গে একমত না হলেও, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ সমীক্ষকের সম্মান দিতে আমাদের দ্বিধা নেই।

'ময়মনসিংহ গীতিকা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক আলী নওয়াজ ছড়া সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করেছেন এবং সে আলোচনায় নতুনত্ব প্রদর্শনও করেছেন। 'পুনরুক্তি' এবং 'প্রশ্নোত্তর-প্রবণতা' যে সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের (এবং ছড়ার) এক বিশেষ লক্ষণ, তা তিনি ইংরেজী ও বাঙলা ছড়ার নিদর্শন পাশাপাশি রেখে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। একজে অবশ্যই তিনি সাধুবাদের যোগ্য।

প্রায় এক নিশ্বাসে বাঙলা ছড়া-চর্চার ইতিহাস ব্যক্ত করা গেল, অনেকেই হয়তো বাদ পড়লেন। কিন্তু তার কারণ তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা নয়, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা।

বাংলা ছড়ার ভূমিকা

দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ ও সঙ্কলন

আনুষ্ঠানিক ছড়া

১

॥ পুণ্যিপুকুর ব্রতের ছড়া ॥

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী, সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী—
দোলায় আসি দোলায় যাই, জনম ভ'রে সিঁদুর পাই।
স্বামীর কোলে পুত্রের কোলে মরণ যেন হয় এক গঙ্গা জলে ॥[১]

২

॥ শিবের ব্রতের ছড়া ॥

শিল শিলাটন, শিলে বাটন
শিল অঝ্ঝর ঝরে।
স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব,
গৌরি! ওরা কি ব্রত করে ?
নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন।
হরগৌরী কোলে ক'রে গৌরী আরাধন ॥
কালা পুষ্প তুলতে গেলাম
সেথানে অনেক লতাপাতা।

১ বাঙলার মেয়েদের ব্রত : বসুধারা পত্রিকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ ; পৃ. ২০৫। শ্রীমতী মিনতি মিত্র।

"পুণ্যিপুকুরের জন্ত বাড়ির উঠোনে কিংবা ফুলবাগানে একটা ছোট গর্ত করে তাতে একটি বেলগাছের ডাল পুঁতে দিতে হয়। তারপর বোশেখের প্রতিদিন সকালে সেখানে গিয়ে হাতে ফুল, বেলপাতা, জল নিয়ে মন্ত্র পড়তে হয়...তারপর জল দিয়ে পুকুরটি ভরে দিতে হয়।"

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী সম্পাদিত 'মেয়েদের ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী : শ্যামাপূজা ১৩৬৫ সন) বইতে (পৃ. ৮) জল ঢালবার মন্ত্ররূপে কেবল প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দেওয়া হয়েছে। তেমনি প্রত্যেক বার ফুল-চন্দন দেবার মন্ত্ররূপে পাওয়া যাচ্ছে : এ পূজলে কি হয় ? /নির্ধনীর ধন হয় /সাবিত্রী সমান হয় /স্বামী আদরিণী হয় /পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, /মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।

শিব চরণে দেখা হ'ল,
    শিবের মাথায় অনেক জটা ॥
আকন্দ বিল্বপত্র ভোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর ॥[১]

৩

॥ দশপুতুল ব্রতের ছড়া ॥

ক. দশ পুতুল পূজে যে। দশফল পায় সে ॥

খ. মরিয়ে মনুষ্য হব। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লব ॥

গ. সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব,
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব, কৌশল্যা শাশুড়ী পাব,
দশরথের মত শ্বশুর পাব, দুর্গার মত মা পাব,
শিবের মত বাপ পাব, লক্ষ্মী-সরস্বতী বোন পাব,
কার্তিক-গণেশ ভাই পাব, লব-কুশ ছেলে পাব,
কুন্তীর মত ধীরা হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব,

১ বাঙলার মেয়েদের ব্রত : বসুধারা পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪, পৃ. ২০৫। শ্রীমতী মিনতি মিত্র।

"সাধারণত: আট থেকে বারো বছরের মেয়েরা (অনেক সময় এর বড় বয়সের মেয়েরাও) এইসব ব্রত করে থাকে।"

"খুব ভোরবেলায় উঠে মেয়েরা স্নান সেরে পাটের কাপড় প'রে পূজোর জোগাড় করে নেয়। গঙ্গা-মাটি দিয়ে শিব গ'ড়ে একটা রেকাবিতে বেলপাতার ওপর বসায়। শিবকে স্নান করিয়ে বেলপাতা দিয়ে গা মুছিয়ে, নৈবেদ্য দিতে হয়। তারপর হাতে ফুল জল নিয়ে তারা মন্ত্র পড়ে তিনবার এই মন্ত্র বলে তারা শিবের মাথায় জল ঢালে। তারপর শিবকে বেলপাতা দিয়ে হাওয়া করে শয়ন করায়।"

এটি বৈশাখ মাসের ব্রত।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী সম্পাদিত 'মেয়েদের ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী : শ্যামাপূজা, ১৩৬৫ স.) বইতে (পৃ. ৬) 'কালাপুষ্প তুলতে গেলাম' ইত্যাদি অবকটি 'অঞ্জলি দিবার মন্ত্র' রূপে উল্লিখিত হয়েছে।

কলাবৌয়ের মত লজ্জাশীলা হব,
বিউলীর ডাল বর্ণ হব, দূর্বার মত জড়িয়ে যাব ॥[১]

৪

॥ হরির চরণ ব্রতের ছড়া ॥

হরির চরণ হরির পা।
হরি বলেন ওগো মা,
আজ কেন গো শীতল পা?
কোন্ যুবতী পূজে পা?
সে যুবতী কি বর চায়?
রাজেশ্বর স্বামী চায়

১ 'মেয়েলি ব্রত : দশপুতুল ব্রত' : সাধনা . জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ ; পৃ. ২৮—৩২। বালিকাদের ব্রত। চৈত্রমাসের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। তুলসী মঞ্চের নীচে, মাটিতে কাঠির আঁচড় দিয়ে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি দশটি দেবদেবীর মূর্তি এঁকে এই ব্রত করা হয়। কোন্ অঞ্চলে করা হয়, তার উল্লেখ নেই।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবী 'মেয়েদের ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী : শ্যামাপূজা ১৩৬৫ সং) বইতে জানাচ্ছেন (পৃ. ৯) চৈত্র সংক্রান্তির দিন আরম্ভ করে ব্রতটি বৈশাখ মাস ভরে পালন করা হয়। আলোচ্য ছড়ার 'ক' ও 'খ' অংশ অন্নপূর্ণাদেবী দেন নি। 'গ' অংশ সেখানে এই রকম : 'এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব'। তারপর একই ভঙ্গিতে পর পর এঁদের নাম : সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৌশল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, দুর্গা, পৃথিবী ও ষষ্ঠীর উল্লেখ। শেষ দুই পঙ্ক্তি এই রকম : এবার মরে মানুষ হব, পৃথিবীর মত ভার সব /··· ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব। 'সমীক্ষা' (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২) বইতে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এর কথান্তর দিয়েছেন (পৃ. ১৫) · মরিয়া মনুষ্য হব/ রামের মত পতি পাব /মরিয়া মনুষ্য হব /সীতার মত সতী হব। শেষে মন্তব্য করেছেন : এই রকম দশটি মন্ত্রে দশ রকমের প্রার্থনা আছে। সেঁজুতি ব্রতের মধ্যেও দশ পুতুল পূজার নিয়ম আছে। তাহার মন্ত্রও প্রায় এক রকম। বস্তুত, সব কটি ব্রতের ছড়ার সঙ্গে সব কটি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, বিশেষ-ভাবে কোনো ছড়াই বিশেষ একটি ব্রতের ছড়া নয় যেন।

ঘর-ভরা ধন চায়
দরবার-জোড়া ছেলে চায়,
সভা-আলো জামাই চায়।
ঘরের ঘটি-বাটি ঝলমল করে,
আলনায় কাপড় দলমল করে।
গোয়ালে গোরু মরাইয়ে ধান—
বছর বছর পুত্তুর চান।
শুশনি কলমি 'ল' 'ল' করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারুক পক্ষী শুখাক বিল।
সোনার কৌটা রুপার খিল ॥[১]

১ বাঙলার মেয়েদের ব্রত · বসুধারা পত্রিকা: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪। পৃ. ২০৫-২০৬।

শ্রীমতী মিনতি মিত্র।

"মাটিতে বা চন্দন পিঁড়িতে চন্দন দিয়ে লক্ষ্মীর পা-এর মতো দুটি পা আঁকতে হয়, তাতে পাঁচটি করে আঙুল এঁকে দিতে হয়। তারপর দুটি তুলসী পাতা দুই পায়ে দিয়ে বলতে হয় ''

কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা: দরবার-জোড়া ছেলে চায়, /সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়, /প্রেমানন্দ ভাই চায়,/ঘরণী গৃহিণী বউ চায়, /রূপবতী কন্যা চায়/, ·· ঘরের বাসন ঝকমক·· করে, / না দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ /না দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ /হবে পুত্তুর মরবে না,/পৃথিবীতে ধরবে না,/চক্ষের জল পড়বে না, /ছেলে দিয়ে স্বামীর কোলে, /মরণ হয় যেন এক গঙ্গা জলে।—মেয়েদের ব্রতকথা, পৃ. ১৬-১৭। অপর কথান্তর: দরবার জোড়া বেটা চায় /সভাসুন্দর জামাই চায় /ঘরণী বউ চায়—'সমীক্ষা', পৃ. ১৪

শ্রীমতী মিনতি মিত্র-সংগৃহীত ছড়ার শেষ চার পঙ্‌ক্তি 'যমপুকুর ব্রতে'র জল ঢালবার ছড়ারূপে 'মেয়েদের ব্রতকথা' বইতে (পৃ. ৮২) উল্লিখিত হয়েছে। তার কথান্তর: সুসনি কলমী লক্ লক্ করে, রাজার বেটা পাখী মারে /মারে পাখী শুকোয় বিল, সোনার কৌটা, রূপার খিল।··

'যমপুকুর' ব্রত (দ্রঃ 'সমীক্ষা', পৃ. ১২) এবং ইতুপুজোর ছড়ারূপেও এই পঙ্‌ক্তি কটি মেলে। ইতুপুজোর ছড়া দ্রষ্টব্য। এই পঙ্‌ক্তি ক'টি বাঙলা ছড়ার সাধারণ সম্পত্তি। যে কোনো ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা হয়। ব্রতকথা এবং রূপকথাতেও এটিকে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

৫

॥ হরি' চরণ ব্রতের ছড়া ॥

হরি বোল্‌চেন—'ওগো মা !
আজ কেন আমার শীতল পা ?'
মা বোল্‌চেন—
'কোন সতী ভাগ্যবতী
সেই পূজেচেন তোমার পা।'
'সে কি বর চায় ?'
'আপনাকে সুন্দর চায়,
রাজরাজেশ্বর স্বামী চায়,
গুণবতী ঝি চায়,
সভা-উজ্জ্বল জামাই চায়,
অমর বর পুত্র চায়,
গিরিরাজ বাপ চায়,
মেনকার মত মা চায়,
দুর্গার মত আদর চায়।
রামের মত পতি,
সীতার মত সতী,
আল্‌না ভরা কাপড়,
মরাই ভরা ধান,
গোয়াল ভরা গোরু,
পাল ভরা মষ,
পায়ে আল্‌তা মুখে পান
পাট বস্ত্র পরিধান,
সুগন্ধ মল্লিকার ফুলে,
পূজব হরি গঙ্গাজলে,
থাকব হরির চরণ তলে।'
উযোতে পারি ত ইন্দ্রের শচী
না পারি ত শ্রীকৃষ্ণের দাসী।
এক গলা গঙ্গাজলে,

স্বামীর কোলে পুত্র দোলে,
মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।"[১]

৬

বসুধারা ব্রতের ছড়া :

১. বৃক্ষের দেবতার উদ্দেশে
বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে—
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল, শ্বশুরের কুলে তারা—
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে॥

২ স্নান করে, ঘটি ভরে
অষ্টবসু ইন্দ্রপুরী।
ইন্দ্র আছেন কোন্ পুরী?
ইন্দ্র ভানেন ধান।
অষ্টবসু গঙ্গার পুত ইন্দ্র বাঁধতে যান॥
ডুব দিয়ে উঠে বলবেন :
সোনার কলসী টলমল
ব্রতীর ঘটে গঙ্গাজল॥

৩ তুলসী গাছের চারদিকে আটটি ফুল ও ফল সাজিয়ে :
অষ্টবসু অষ্ট তারা তোমরা হলে সাক্ষী।
আটদিকে আট ফল আমরা রাখি।
অষ্ট বসু অষ্ট তারা তোমরা হলে সাক্ষী
আটদিকে আট ফুল আমরা রাখি॥

৪ এক হাতে ঘট এবং এক হাতে ঘটিতে জল নিয়ে বট-পাকুড় আর তুলসী গাছের ওপর জল ঢালবার সময় :

১ 'মেয়েলি ব্রত : হরিচরণ ব্রত' : সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ. ৩২—৩৫। চার বছর ধরে এ ব্রত করতে হয়, বৈশাখ মাসে। শেষ বছরে ব্রত প্রতিষ্ঠা। গুরু বা পুরোহিতকে তিনটি সোনা বা রুপোর চরণ গড়িয়ে দিতে হয় তখন। বালিকাদের ব্রত। কোন্ অঞ্চলে উদ্যাপিত হয়, তা অনুক্ত। কথান্তর : এক হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে পায় যেন শ্রীহরির চরণ—'সমীক্ষা', পৃ. ১৪

বসুধারা, বসুধারা, বৈশাখ যায়।
গঙ্গামায়ে কুলকুলিয়ে চায় ॥
গঙ্গামায়ের অষ্ট কোল।
অষ্টকোলে অষ্ট পুত ॥
অষ্টপুতে ঝাঁপুই খেলবে—
পৃথিবী জলে হাসবে।
গঙ্গা এলেন 'নাইয়রে' ছেলে নিবে কে ?
আমার মায়ে।
আমার মায়ের কোলে দেখি অষ্ট সোনা,
আট ভাই পেলেন যেন চাঁদের কোণা।
আমার মায়ের কোলে দেখি অষ্ট সোনা,
আট ভাই পেলেন যেন হীরার দানা ॥

৫. ব্রত উদ্‌যাপন করতে যাবার সময়

কালবৈশাখী আগুন ঝরে—
আট ভাইয়ে তীর্থ করে—
গঙ্গা গুরু-গুরু, আকাশে চাই—
ফিরে এলেন অষ্টভাই।
আট ভাই নিয়ে খেলতে যাই ॥

৬. প্রণামের সময় :

গঙ্গা গঙ্গা, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি,
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী ॥[১]

১ বসুধারা ব্রত : বসুধারা পত্রিকা : বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৮০-৮১। বেলা দে।

"জ্যৈষ্ঠ মাসে তাতেন ধরা, তখন ব্রত করি বসুধারা"—জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিন থেকে বসুধারা ব্রত নিতে হয়। আর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত ব্রত করতে হয়। এ ব্রত মেয়েরা করেন দুপুরে স্নানের সময়। বৃষ্টিকে কামনা করে দল বেঁধে তারা মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে, শিকের খোঁচায় ফুটো করে বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করেছেন [গান ১]। এরপর ব্রতী মেয়েরা সব স্নান সেরে, মাটির ঘট ধুয়ে পুকুর বা নদীর পাড়ে রাখবেন, তারপর আবার ডুব দিয়ে ঘটিটি ভরে নিয়ে মন্ত্র বা ব্রতের ছড়াগান গাইতে থাকবেন [গান ২]। এরপর মেয়েরা সবাই

৭

॥ জয়মঙ্গলবার ব্রতের ছড়া ॥

ক. হারালে পায় ম'লে পায়
যা মনে ক'রে করে তাই জয়যুক্ত হয় ॥

খ. হওয়া সতীন ম'লো
হারালে পেলে, ম'লে পেলে ॥

গ. মা আসছেন খুঁজতে খুঁজতে,
নির্ধনীকে ধন দিতে,
কুঁড়েকে গতর দিতে,
অন্ধকে চোখ দিতে,
বন্দিগণ খালাস করতে,
দূরের মানুষ নিকটে আনতে ॥[১]

৮

॥ অশথ পাতী ব্রতকথার ছড়া ॥

পরের মন্দে ভাল যে করে
ভাতে-পুতে সে বাড়ে।

ধোয়া কাপড় পরে ঘট নিয়ে তুলসীতলায় বসে পিটুলির আল্পনা আঁকবেন। আর ঘটের গায়ে আটটি তারা আঁকতে হবে [বসুধারা ব্রতের আলপনাটি উক্ত প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে]। আঁকা হলে তুলসী গাছের ডানদিকে বট আর পাকুড়টা পুঁতবেন। আটটি ফল আর ফুল তুলসী গাছটিকে ঘিরে চারদিক সাজিয়ে দিয়ে ছড়াগান করবেন [গান ৩]। এখন একহাতে ঘট আর একহাতে ঘটি বট পাকুড় আর তুলসীগাছের উপর ঘট ধরে জল ঢেলে মন্ত্র বা ছড়াগান গাইতে হয় [গান ৪]। যে কয়জন মেয়ে এই ব্রত করবেন, তাঁরা প্রত্যেকে পূজার সরঞ্জাম আলাদা আলাদা নেবেন। তবে, এই ব্রতের আলপনা আলাদা না ক'রে এক আলপনাতেই হবে। আগেই বলেছি, বসুধারা ব্রতটি করা হয় মেঘ ও বৃষ্টির কামনায়। তাই দেখি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে মেয়েরা সব চলেছেন এই ব্রত করতে [গান ৫]। সব শেষে প্রণামের মন্ত্র বলে বসুধারা ব্রতটি শেষ করতে হয়।"

১ মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত [জয়মঙ্গলবার] : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী : অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩০৮। পৃ. ২৯৫—২৯৭। এই ব্রতকথার অন্তর্ভুক্ত ছড়াগুলো এখানে উদ্ধৃত হল।

পরের ভালোয় মন্দ যে করে,
অন্ধ হয়ে সে মরে ॥[১]

৯

॥ ঢেরা পুজোর ছড়া ॥

বেরা ঘরে[২] ঢেরা পুজো,[৩]
ঘি চর্‌-চর্‌ কলমি ভাজা।[৪]
কলমি ভাজা খাব নি
বেরাদরকে[৫] যাব নি ॥[৬]

১০

॥ চাপড়া ষষ্ঠীর ছড়া ॥

চাপড় যায় ভাইসা
ছেলে থাকুক বাঁইচা ॥[৭]

১ পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ বি. এ : মেয়েলি ব্রতকথা (পঞ্চম সং ১৩৩৮। পৃ. ৫৪)। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পালনীয় নাগপঞ্চমী ব্রতের 'কথা'র অন্তর্গত ছড়া এটি।

২ 'বেরা'দের বাড়িতে। মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের একটি পদবী। ৩ ২২শে শ্রাবণ ঢেরা পুজো হয়। এজন্যে একে 'বাইশে ঢেরা'ও বলে। খই-নাড়ু ইত্যাদি উপচার দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। ৪ দ্বিপ্রহরে এ পুজো হয়। পুজো নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে যাবার সময় এ ছড়া বলা হয়। বেশি ঘি দিয়ে ভাজা কলমি শাক ৫। বেরাদের বাড়ির দুয়ারে ৬। রামরঞ্জন রায় (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)।

৭ পূর্ববঙ্গে চলিত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে চাপ্‌ড়া বা মন্থন ষষ্ঠী হয়। ঝিঙে গোল-গোল করে কেটে তাতে চিনি-পিটুলির চাপড়া দিয়ে পুজো করা হয়। পুজোর শেষে তা নদী বা পুকুরে ভাসিয়ে দেবার সময় এই ছড়া বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এর কথান্তর. চাপড়া গেল ভেসে/অমুক [ছেলের নাম বলতে হয়] এল হেসে।—জয়গোপাল সাহিত্য শাস্ত্রী সঙ্কলিত 'ব্রতদর্পণ' (নৃত্যলাল শীলস লাইব্রেরী, ২০২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬), পৃ. ১১৭

তুষতুষুলি ব্রতের শেষে হাঁড়ী ভাসাবার ছড়া এই প্রসঙ্গে তুলনীয় : তুষলা গেল ভেসে/আমার বাপভাই এল হেসে /তুষলা গেল ভেসে/আমার শ্বশুর স্বামী পুত্রেরা এল হেসে/ তুষলা গেল ভেসে /ধনদৌলত টাকা কড়ি এল হেসে।—মেয়েদের ব্রতকথা (১৩৬২। পৃ. ৩১) : আশুতোষ কবিরত্ন সম্পাদিত।

১১

॥ ভাঁজোর ছড়া ॥

১. ভাঁজো লো কলকলানি মাটির লো শরা।
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চ ফুলের মালা ॥

২. এক কলসী গঙ্গাজল এক কলসী ঘি।
বৎসরান্তে একবার ভাঁজো ! নাচবো না তকি।

৩. পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক।
গাছের গুগ্‌লি বলেন, আমি হব শঙ্খ ॥

৪. ওগো ভাঁজো ! তুমি কিসের গরব কর ?
আইবুড়ো বেটা ছেলের বিয়ে দিতে নার ॥

৫. ভাঁজো ! এই পথে যেও।
বেনাগাছে কড়ি আছে
দুধ কিনে খেও ॥[১]

১২

॥ ভাদুর ছড়া ॥

জল ঝমা-ঝম ঝম
সুখের ভাদ্রে ভাদু এল
সব দুঃখ ভেসে গেল—
বরষ পরে হরষ ভরে
দেব সমাগম গম ॥[২]

১৩

॥ আশ্বিন সংক্রান্তির ছড়া ॥

এল গুল গুল মান দাত
খাও লক্ষ্মী সাত-ভাত ॥[৩]

১ 'ইন্দ্রপূজা' : সাধনা ফাল্গুন, ১৩০১। পৃ. ৩৩৩—৩৪০

২ একটি প্রাচীন ভাদুগানের অংশ। 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : ভাদ্র, ১৩৬৫)। তুলসীদাস সিংহ। ভাদুগান মূলত ছড়াধর্মী।

৩ ডাক-সংক্রান্তি বা আশ্বিন-সংক্রান্তির দিন সাত ব্যঞ্জন দিয়ে ধান

১৪

॥ গাছ নোয়াবার ছড়া ॥

আম পাত চালিতা পাত।
ঘর নোয়াইলাম আড়াই হাত॥
যদি ঘর গঙ্গায় যায়—
বাঁদীর পাতে বসে খায়॥[১]

১৫

॥ গাব্‌সি ব্রতের ছড়া ॥

আশ্বিনে রাঁধিয়া কার্তিকে খায়
যে বর মাগে সেই পায়॥[২]

গাছকে ভাত দিতে হয়, তারই ছড়া। পশ্চিমবঙ্গে চলিত। 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : কার্তিক, ১৩৬৬). তুলসীদাস সিংহ। 'সাত-ভাত' কি 'সাধ-ভাত'? কেননা বহু অঞ্চলেই এই দিন ধানগাছকে 'সাধ' দেওয়া হয়।

তুলনীয়. প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের 'রান্না-বাটি' খেলায় ভাত রাঁধার ছড়া. গোদোর গোদোর মানার পাত / পানি আনিতে হইল্ ভাত।

১. প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩২। পৃ. ৫১৫। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন বিকেলবেলায় ঢাকা জেলাতে এই ছড়াটি বলা হয়। একটি চাল্‌তের পাতা নেড়ে-নেড়ে এটি বলা হয়।

২ পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ, বি. এ. মেয়েলি ব্রতকথা (পঞ্চম সং ১৩৩৮। পৃ. ৫৭)। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করা হয়। পূর্ব-বঙ্গেই এটি প্রচলিত. "সকলেই কলাই বা মুগের ডাল ভাত আহার করেন, পরদিন প্রাতঃকালে বালকবালিকা ও সধবাগণের পর্যুসিত অন্ন আহার করা বিধি।"

কথান্তর : আশ্বিনে রাইন্ধ্যা কার্তিকে খায়/যে যা চায়, সে তা পায়। পূর্ববঙ্গেরই কোথাও কোথাও দেখা যায়, আশ্বিন-সংক্রান্তির দিন রাতের বেলায় ওলের অম্বল রেঁধে পর দিন, কার্তিক মাসে, তাই খাওয়া হয়। আঁজলা ভরে সেই অম্বল খাবার সময় এই ছড়া বলা হয়। অম্বল খেতে খেতে এই ছড়া বললে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই ছড়া এখানে পুরোটাই মন্ত্র।

১৬

॥ 'পাসি' ব্রতের অপর ছড়া ॥

পোকা মাকড় দূরে যায়
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ঘরে আয় ।[১]

১৭

॥ পাসি ব্রতের অপর ছড়া ॥

জাগ' জাগ' জাগ'
যে কাজে লাগাই, সেই কাজেই লাগ' ।[২]

১৮

॥ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর মাগনের ছড়া ॥

আটভ ভুকাদের নকৃকী পূইছু
যাও গো ছুইটু ভাজা-ভুইছু ।[৩]

১ 'পাসি' ব্রত (প্রদীপ আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬ । পৃ. ৩৫৭—৩৫৯) : যতুনাথ চক্রবর্তী ।

পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও দেখা যায়, আশ্বিন-সংক্রান্তির দিন ভোর রাতে (অর্থাৎ 'পাবসি' ব্রতের দিন) গৃহিণীরা পাটকাঠি দিয়ে ভাঙা কুলো বাজিয়ে এই ছড়া বলেন : অলক্ষ্মী দূরে যাও 'লক্ষ্মী ঘরে আস । বাড়ীর ভেতর থেকে কুলো বাজাতে-বাজাতে এই ছড়া বলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে সেই কুলো ফেলে দিয়ে ভেতরে এসে হাত-পা ধুয়ে ফেলেন । যেন সত্যিই অলক্ষ্মী বিদেয় হল, এবং তার অশুচি স্পর্শ থেকেও গৃহিণী মুক্তি পেলেন হাত-পা ধুয়ে । পুরো যাদু-অনুষ্ঠান এটি ।

২ উপেন্দ্রনাথ সরকার · গার্সী উৎসব (ভারতী : কার্তিক অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ । পৃ. ৪২৭—৪৩০) ।

পাসি উৎসবের সময় যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হয়, সেই আগুনে বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ছোঁয়াবার সময় এই ছড়া বলা হয় । এই আগুনের যেন যাদু-শক্তি আছে, সেই বাক্তির দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন হয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদিও শুভ-কর্ম সম্পাদন-ক্ষম হয়ে ওঠে । 'জাগ' শব্দের মধ্যে অচেতন পদার্থের শক্তিবত্তা অর্থাৎ Animism-এর প্রমাণ স্পষ্ট ধরা পড়েছে ।

৩ কাদের আলী সরদার (বাকইপাড়া, তেহট্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া) । কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিন মুসলমান বালকেরা এই ছড়া বলে দ্বারে দ্বারে -নাড়ু-মোয়া চেয়ে বেড়ায় ।

১৯

॥ মশা তাড়াবার ছড়া ॥

ধা রে মশা ধা,
নলবনকে [১] যা।
নলের চোঙায় বসে বসে
স্বর্গে উঠে যা॥ [২]

২০

॥ 'হঁজর-পিঁজর' ছড়া ॥

ক. দাওদা বুড়ী দাদ লে
খোওসা বুড়ী খোস্ লে॥
খ. বাহিরারে মাছি
চোখকান পুঁছি॥[৩]

১ বনে। ২ কালীপুজোর দিন ভোরবেলায়, অন্ধকার থাকতে থাকতে, বালক-বালিকারা টিন বা অন্য কিছু বাজিয়ে এইভাবে মশা তাড়ায়।— রামরঞ্জন রায়, (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)। ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ভূমিকায় (পৃ. ।৶-॥০) ডঃ সুকুমার সেন এই ছড়ার কথান্তর দিয়েছেন: ধা রে মশা ধা /আমাদের বাড়ির যত মশা অমুকের বাড়ি যা। ছড়াটি ঠিক কোন্ অঞ্চলের ডঃ সেন তার উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি জানাচ্ছেন "কার্তিক-সংক্রান্তিতে সন্ধ্যাবেলায় কুলো বাজিয়ে" মশা তাড়ানো হত এবং "এ কাজ ছেলেরাই করত"।

৩ পুরুলিয়া জেলায় চলিত। কালীপুজো ও 'বান্দনা' পরবের সময় এটি অনুষ্ঠিত হয়। আগুনের কুণ্ড করে তিন বার লাফ দিয়ে তা পারাপার করবার সময় কিশোর বালকেরা এই ছড়া-গীতি গায়। প্রথমটিতে খোস ও দাদ রোগের দেবী এক বুড়িকে দাদ ও খোস থেকে মুক্তি দিতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে মাছি তাড়ানো হয়েছে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'মশা তাড়াবার ছড়া' এ-বিষয়ে তুলনীয়।

২১

॥ সাঁজ-পুজনী ব্রতের ছড়া ॥

ক. বারো ঘর পুজোর ছড়া .

সাঁজ পুজনী সেঁজোতি। বারো ঘরে তের বাতী।
সেই ঘরে মোর ঘরটী ॥
ঘরটী পুজি মাগি বর। ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর ॥

খ. গঙ্গাযমুনা পুজোর ছড়া .

গঙ্গাযমুনা যুড়ি হয়ে, সাত ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে, গঙ্গাযমুনা পুজ্যান্।
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু। শঙ্খের উপর স্বর্ণের খাড়ু ॥

গ. চন্দ্রসূর্য পুজোর ছড়া

চন্দ্রসূর্য পুজান। সোণার থালে ভুজ্যান ॥
সোণার থালে ক্ষীরের লাড়ু। শঙ্খের উপর স্বর্ণের খাড়ু ॥

ঘ. বরপ্রার্থনার ছড়া

বেণা বেণা বেণা। আমার ভাই গাঁয়ের সোণা ॥
সোণা সোণা ডাক পড়ে। গা শুচি শুয়ো পড়ে ॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে। অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায় ॥
শর শর শর। আমার ভাই গাঁয়ের বর।
আমার ভাই লক্ষেশ্বর ॥
লক্ষেশ্বর লক্ষেশ্বর ডাক পড়ে। গা শুচি শুয়ো পড়ে ॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে। অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায় ॥
কুলগাছ কুলগাছ কেঁকুড়ি। তিন বেটির সমাকুড়ি ॥
সাত সতীনের সাতটা কৌটো। আমার আছে নবীন কৌটো ॥
নবীন কৌটো নড়ে চড়ে। সাত সতীনে পুড়ে মরে।
ময়না ময়না ময়না। সতীন যেন হয় না ॥
হাতা হাতা হাতা। খাই সতীনের মাথা ॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি। সতীন মাগী চেরী ॥
পাখী পাখী পাখী। সতীন মাগী মরে যাচ্ছে ছাদে উঠে দেখি ॥

ঙ. স্ত্রীর সুখসৌভাগ্য প্রার্থনার ছড়া :

ঢেঁকি পড়শু উনন অনন্ত। বাপঘর শ্বশুরঘর একই চলন্ত ॥

বাসি গোবর খাসি খুসি। উননে না দিই ফুঁ।

বউ-রান্না ভাত খেয়ে চান্দপারা মু॥

চ. অলঙ্কারের আমনার উদ্দেশে ছড়া :

সাঁজ পূজনী! সাঁজ পূজনী!

তোমাকে দিলাম পিটলীর বালা।

আমি যেন পাই সোণার বালা॥

ছ. অঙ্কিত 'ছালা' বা বস্তাব উদ্দেশে ছড়া :

ঐ আসচে টাকাব ছালা। তাই গুণতে গেল বেলা॥

ঐ আসচে ধানেব ছালা। তাই মাপতে গেল বেলা॥

জ 'কাজললতা' ও 'বাসবঘব' পূজোব ছড়া ·

কাজললতা কাজললতা বাসরঘব

দাও মা মেলিনী যাই শশুবঘব॥

ঝ. পৌত্র-দৌহিত্রেব উদ্দেশে ছড়া

'কেন বে নাতি। এত বাতি?'

'কাদায় পড়িল ছাতি। তাই তুলতে এত বাতি'।

এস নাতি। বস খাটে। পা ধোও গে গ'ড়েব ঘাটে॥

সোণাব ভেঁটা দেব হাতে। খেল্ কববে পথে পথে॥

ঞ. 'ফুল কুড়ান' ও প্রণামেব ছড়া

অরুণ ঠাকুর বরণে। ফুল ফুটেছে চবণে॥

যখন ঠাকুর বব দেন। আপনাব ফুল কুড়িয়ে নেন॥[১]

১ মেয়েলি ব্রত সাঁজপূজনী (সাধনা আষাঢ, ১৩০২। পৃ. ১৩২-১৩৯)।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবী 'মেয়েদেব ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী, শ্যামাপূজা ১৩৬৫ সং) বইতে (পৃ. ৯৬—১০৯) সেঁজুতি ব্রতেব মোট ৫২টি পদেব ছড়া দিয়েছেন, বর্তমান ক্ষেত্রে সেখানে পাই মাত্র ১০টি। পর্যায়-পরম্পরার মধ্যেও মিল নেই। 'ক' অংশের কথান্তব: সাঁজ পূজন সেঁজুতি,/ষোল ঘবে ষোল ব্রতী/তার একঘরে আমি ব্রতী/ব্রতী হয়ে মাগি বব,—/ধনে পুত্রে বাড়ুক বাপ মায়ের ঘর। 'খ' অংশের কথান্তর: গঙ্গা-যমুনা জোড় হই/সাত ভাইয়ের বোন হই/ সাবিত্রী সমান হই / গঙ্গা-যমুনা পূজ্যান / সোনার থালে ভোজ্যান/সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু,/শাঁখার আগে সোনার খাড়ু। 'গ' অংশের কথান্তর: ভোজ্যান।

২২

॥ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ছড়া ॥

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে[১] পড়ল কাঁটা ;
যমুনা যেন যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা ,
আমার ভাই যেন হয় সোনার ভাটা ॥[২]

২৩

॥ নাটাই ব্রতের ছড়া, পাবনা ॥

আঁধারে মেড়ে জোনাকে খাই
যে বর মাঙি সেই বর পাই ॥[৩]

শাঁখার আগে সোনার খাড়ু। 'ঘ' অংশে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রদত্ত ছড়ায় একাধিক ছড়ার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কথান্তর : ডাক পাড়ে। কুড়িয়ে গেলে। বর বর ডাক পড়ে, গুয়ো গাছে গুয়ো ফলে। ফুলগাছটি কোঁকড়ী, সতীন বেটি কেঁকড়ী। তার মাঝে মোর অভ্রের কৌটা/অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি,/সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।... খা সতীনের মাথা। সতীন বেটী চেড়ী। সতীনকে ঘাটে নিয়ে যায়/আমি যেন বসে দেখি। 'ঙ' অংশের কথান্তর ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত। 'চ' অংশের কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা আমি দিই পিটুলির বালা/আমার হোক সোনার বালা/আমি দিই পিটুলির নথ/আমার হোক সোনার নথ, ইত্যাদি। 'ছ' অংশের কথান্তর মোহর এল ছালা ছালা/তাই তুলতে এত বেলা টাকা এল ছালা ছালা। 'জ' অংশের কথান্তর . মেলানি। 'ঝ' অংশ অন্নপূর্ণা দেবীর সংগ্রহে নেই। তবে শেষ ছড়ায় মেলে . কুঁচ কুঁচুতী কুঁচুই বোন/কেন বে কুঁচুই এতক্ষণ? 'ঞ' অংশের কথান্তর . যখন ঠাকুর আজ্ঞা পাই/ফুল কুড়িয়ে ঘর যাই।

১ কথান্তর . যমদুয়ারে ২ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় . ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (বামাবোধিনী পত্রিকা . কার্তিক, ১৩১৮। পৃ ২৩৪—২৩৬)।

৩ ব্রতকথা (ভারতী : কার্তিক, ১৩০৫। পৃ. ৬২৩—৬২৫)।

এই লেখক (লেখকের নাম অমুক্ত) পাবনা জেলায় প্রচলিত 'নাটাই

২৪

ইঁধু পুজোর ছড়া, হুগলি ॥

ক. শুজ্‌নি কল্‌মি লহ লহ করে[১]।
রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারতক পক্ষ শুকোক বিল।[২]
সোনার কৌটো রূপোর খিল ॥
ছোটো মরায়ে পা দিয়ে বড়ো মরায়ে হাত দিয়ে
কি করছ রাই থানে বসে।
আমার জল-তুলসী লাও নেমে এসে ॥

খ সবায় জল ঢালবার সময়ের ছড়া :
তুলসী তুলসী নারায়ণ, তুমি তুলসী বিন্দাবন।
তোমার শিরে ঢালি জল, অন্তিম কালে দিয়ো স্থল ॥

গ. সাধের ছড়া :
চাল ক'টা তুই রাঁদ্‌[৩] গো সখি,
ভাত ক'টা তুই খাই।
কুড়ির[৪] চুবড়ি মাথায় করে ছুতোর বাড়ী যাই ॥
ও ছুতোর ভাই, ও ছুতোর ভাই, বাড়িতে আছ?
আমার এঁপেল[৫] সাধ খাবে গো, ভালো চিঁড়ে চাই ॥[৬]

[এইভাবে, একই ভঙ্গিতে গয়লার কাছে দই এবং ময়রার কাছে মুড়কি চাওয়া হয়]

ব্রতে'র পরিচয় দিয়েছেন। অগ্রহায়ণ মাসে, শুক্লপক্ষের রবিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় সাধারণত কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে। ব্রতের উদ্দেশে উঠোনে একটি ছোটো পুকুর কেটে নেয়া হয়। সাতটি নুন-দেওয়া পিঠে, সাতটি নুন-না-দেওয়া পিঠে, মোট চোদ্দটি পিঠে এক সঙ্গে করে নিতে হয়। তারপর নাটাই চণ্ডীর পুজো করে, পুকুরের দিকে পিছন ফিরে, অন্ধকারে পিঠে নিয়ে খেতে হয়। আগে নুন-দেওয়া পিঠে খেলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। কুমারীর বিয়ে সেই বছরেই হবে কিনা তাও এতে জানা যায়। পিঠে খাবার সময় এই ছড়াটি বলতে হয়। পিঠের ওপর একটি যাদুগুণ আরোপ করা হয়ে থাকে।

১ কথান্তর : শুষনি কলমী লক্‌লক্‌ করে। পাবনা জেলায় প্রচলিত

ঘ. প্রণামের ছড়া :

তুলসী তুলসী, মাধব লতা।
কও গো তুলসী কিষ্ণকথা॥
কৃষ্ণের কথা শুনলুম কানে।
শতেক পরণাম তুলসীর চরণে॥[১]

১৫

তুষলার ব্রত

তুষ্ তুষলা, তুষলা গো রাই
তোমার দৌলতে আমরা
ছব্ড়ি পিঠে খাই॥
ছ ছ বুড়ি গাঙের নাড়ু,
গাঙ্ সিনানে যাই।
গাঙের জলে বাঁধি বাড়ি
মকরের জল খাই॥[১]

'যমপুকুর ব্রতে'র ছড়ায় দৈবের কলসী দদ্দম্ করে ('ব্রতকথা' ভারতী : কার্তিক, ১৩০৫। পৃ ৬২০) ২ কথান্তর. মারুক পাখি, শুকোক বিল ৩ বাঁধ্ ৪ কাড়ের ৫ ইতু। 'ইথু' উচ্চারণও মেলে ৬ কার্তিক-সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত এ ব্রত করা হয়। কুমারী, সধবা, সকলেই করতে পারে। ব্রতের শেষে নদী বা পুকুরে সরা ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করা হয়। রবি ও বৃহস্পতিবার দিন পুজো হয়। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন ব্রতিনীরা উপবাস করে থাকে। ঠাকুরকে 'সাধ' দিয়ে তবে খায়। 'সাধ' উপলক্ষে পিঠে-পুলি তৈরি করে। পুজোয় লাগে পাঁচ কড়াই, মানকচু, কলমীশাক, একটি নিখুঁত সরা, একটি ঘট। 'হরিবচরণ ব্রত' এবং 'যমপুকুর ব্রতে'র ছড়ারূপেও 'ক' অংশের প্রথম চার পঙ্ক্তি মিলেছে। জল ঢালা, স্নান করা, সরা ভাসানো, 'সাধ দেওয়া', পিঠে-পুলি খাওয়া, ভাদু-টুসু-ইতু প্রভৃতিকে কন্যা মনে করে তাদের বিয়ে দেওয়া, বাপের বাড়ী আসার বর্ণনা, স্নান করানো, সবই যাদু অনুষ্ঠান ১ উৎপলকান্তি পায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

২ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর 'মেয়েদের ব্রতকথা' (দেব লাইব্রেরী, শ্যামাপুকুর, ১৩৬৫ সং) বইতে (পৃ. ১২৮) এর কথান্তর : তুষলী গো রাই, তুষলী গো

২৬

বেগুন পাতা চলা চলা
তুষুর কানে চৌদ্দতোলা ॥

১৭

চৌদ্দ তোলা গো আগে
দাদার বিয়ে মাঘে ॥

১৮

তুষু মোর পাটেশ্বরী।
পৌষ মাসে পৌঝুরি।
ধান কাপাসে ঘর করি।
এঁড়ে গরুর সাবে,
তুষলা এলো ঘরে।
তিনটি সারের ঢেলা
তুষলা গো এলা ॥
ধান সব মাঠে গোঠে।
চল তুষলা ঘরে উঠে ॥

মাই/তোমার ব্রত করে কি ফল পাই ?/তোমার কল্যাণে পাই—/ছ' বুড়ি ছ গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু/আমার যেন হয় শাঁখার আগে সোনার খাড়ু। এই শেষ পঙ্‌ক্তি অন্যান্য ব্রতের ছড়াতেও মেলে।

'সমীক্ষা' (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-১২) বইতে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'তুঁষতুঁষলি' ব্রতের যে ছড়া দিয়েছেন (পৃ ১১-১১) তাতে কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা পাই. তুঁষতুঁষুলি কাঁধে ছাত/বাপ মার ধন যাচাযাচি/স্বামীর ধন নিজে পতি' ঘর করব নগরে/মরা গিয়ে সাগরে/জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে /তুঁষলি গো রাই./তুঁষলি গো মাই/তোমায় পূজিয়ে আমি কি বর পাই / ..তোমায় পূজিয়ে আমি ছ-বড়ি ছটপাই / ছ-বড়ি ছটা ক্ষীরের নাড়ু /শাঁখার আগে স্বর্ণের খাড়ু।

২৯

তুষলা এলেন ঘরে।
বিয়ে দেব চতুর্ভুজ বরে।
কতকাল করবে তুষু,
সূর্যদেবের পূত।
ঘরকে এলে দিবে বিয়ে
এই কথাটি বুঝ॥

৩০

এস পৌষ যেও না।
জনম জনম ছেড়ো না।
যদি বা ছাড়িবে তুমি,
পরাণে মরিব আমি।
পৌষুরী গো এস।
পিঁড়ের উপর বস।
হব তব দাসী।
আনন্দেতে ভাসি॥

৩১

আম কাঁঠালের পিঁড়েখানি
ঘী মৌ মৌ করে।[১]
তার উপরে রাই ঠাকরুন
ঝলমল্ করে॥

৩২

আশীর্বাদ করতে এসে
হ'ল দুপুর বেলা
কোথায় ছিল ননদিনী
গালে মরিল কিলা॥

১ এই পঙ্‌ক্তি বিভিন্ন ছড়াতে পাওয়া যায়।

৩৩

কুলগাছটি ঝাঁকুড়ি। সতীন মেয়ে মাকুড়ি॥
সাত সতীনের সাত কৌট। ভুবলা দেবীর নব কৌট॥
নব কৌট নড়ে চড়ে[১]। সাত সতীনের মুখটি পুড়ে॥
কৌট মধ্যে আছে কি। সীতারাম লক্ষ্মণ জী॥
সিংহাসনে বসে রাম কোন্ কার্য করে?
রাজার অন্দর মধ্যে পাশা খেলা করে।
খেলুক্ খেলুক্ পাশা, জিতে দিব কড়ি।
মরুক্ মরুক্ ননদিনী তাকে আমরা পারি।
সরার উপর জল রেখে তাতে ডুবে মরি॥
ভাল দেখে গাই কিনব কপিলা ঈশ্বরী॥
কপিলা, কপিলা, কেমন ঘাস খায়।
অজানা দ্বীপের ঘাস না পাওয়া যায়॥
ঘাসের গোড় ছিঁড়েছে, পড়েছে সাগরে।
সাগর শুকিয়ে গেছে মৎস্যের নগরে॥
মৎস্য অবতার দিতে হবে বর।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী, পূর্ণ হবে ঘর॥

৩৪

এক কড়া কড়ি নয়, দু কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা সোনার পৌষুরি॥
এস পৌষ যেও না,
জনম জনম ছেড়ো না।
দু কড়া কড়ি নয়, তিন কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা সোনার পৌষুরি॥

১ 'নড়ে চড়ে' এই সহচর শব্দ দুটি বাঙলার প্রায় সব অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের ছড়াতে মিলেছে। আশ্বিন থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত ব্রতগুলিতে কুলগাছের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই সময়েই কুল গাছে মুকুল ও ফল হয়। কুল গাছ এখানে প্রাচুর্যের প্রতীক, তবে তার অর্থ সর্বত্র স্পষ্ট নয়।

যদি বা ছাড়িবে তুমি,
পরাণে মরিব আমি[১]
তিন কড়া কড়ি নয়, চার কড়া কড়ি
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
পৌষুরী গো এস
পিঁড়ের উপর বস।
চার কড়া কড়ি নয়, পাঁচ কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
হব তব দাসী।
আনন্দেতে ভাসি।
পাঁচ কড়া কড়ি নয় ছ'কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
ভেবেছি মনে
তুষলা ধন।
ছয় কড়া কড়ি নয়, সাত কড়া কড়ি
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
দিব বিয়ে
বংশী বদন।
সাত কড়া কড়ি নয়, আট কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
আয় মা, তুষু,
আয় মা সদন।
আট কড়া কড়ি নয়, নয় কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা সোনার পৌষুরী ॥
মিলাব তোমায়,
বংশী বদন।
নয় কড়া কড়ি নয়, দশ কড়া কড়ি।
তা দিয়ে পূজি আমরা, সোনার পৌষুরী ॥
চিরদিন তুষু
রবে গো ঘরে।

১ ৩০-সংখ্যক ছড়ার তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তি এবং এই অংশ এক।

দশ কড়া কড়ি নয়, কুড়ি কড়া কড়ি
তা দিয়ে পূজি আমরা সোনার পৌঝুরী।
ব'লেছেন, হরেকৃষ্ণ হরে।
তুল ভাই কড়ির ঝারা,
মাথার উপরে তুল।
সকলেতে বদন ভ'রে
একবার হরিহরি বল॥

৩৫

চাল গোটা চার বাঁধ না, সখি,
ভাত গোটা দুই খাই
কড়ির ঝারা মাথায় ক'রে
বামুন পাড়া যাই॥[১]
বামুন দাদা, বামুন দাদা,[২]
ঘরে আছ গো।
আমার তুষলার বিয়ে,
শনি মঙ্গল বারে॥
পইতা দিতে হবে তোমায়
ভারে ভারে[৩]॥

১ কথান্তর: তাঁতী পাড়া যাই। শাঁখারি পাড়া যাই ২ কথান্তর: তাঁতী ভাই, তাঁতী ভাই / শাঁখারি ভাই, শাঁখারি ভাই ৩ কথান্তর: বারাণসী দিও, তুষলার /মঙ্গল আচারে / মনের মতন রাঙ্গা শাঁখা,/দিও তুষুর করে। ইতু পূজোর ছড়ারূপেও প্রথম অংশ পাওয়া গেছে। দ্রঃ ২৪-সংখ্যক ছড়ার 'গ' অংশ।

"এইরূপ "সিন্দুর মসলার" জন্য "বেনে পাড়া", "নানা রকম সন্দেশে"র জন্য ময়রা পাড়া, "দধি দুগ্ধের পশরা"র জন্য "গয়লা পাড়া", "দান সামগ্রী"র জন্য "কামার পাড়া", "মণ দশেক মৎস্যে"র জন্য "জেলে পাড়া ", "তুষলার এয়ো কামানে"র জন্য "নাপিত পাড়া", "পাঁচ মণ তেলে"র জন্য "কলুপাড়া", "বরাতী রঙ্গের হলুদে"র জন্য "চাষী পাড়া" যাইবার ছড়া আছে।"

অবিনাশচন্দ্র দাস (কোতুলপুর, বাঁকুড়া)। প্রদীপ: মাঘ, ১৩০৫। পৃ. ৫২-৫৪. (২৫ থেকে ৩৫-সংখ্যক ছড়া)।

৩৬

॥ তোষলার ছড়া, বর্ধমান ॥

তোষ্-তোষ্‌লা কাঁধে[১] ছাতি/কেনে তোষ্‌লা এত রাতি।
তালপোখাতে[২] পড়েছে ছাতি/তাই তুলতে এত রাতি।
তোষ্‌লা গো রাই,/তোমার পুণ্যেতে আমরা চোষ্‌ড়ি পিঠে খাই॥
চোষ্‌ড়ি লোষ্‌ড়ি গান শোনানে[৩] যাই
আগে গাছে গঙ্গার বালি তুলে তুলে খাই॥
ওঠো রাই, ওঠো রাই, বাইরে বসসে[৪]।
সোনার গাড়ুতে রাই মুখ ধুইসে[৫]॥
আমার রাই নেয়ে এলো, পরতে দেব কি।
ঘরে আছে ঢাকাই শাড়ী, তাই পরিতে দি॥
ওদের রাই নেয়ে এলো, পরতে দেব কি।
ঘরে আছে ছেঁড়া টেনা, তাই পরতে দি॥
আমাদের রাই খেতে এলো, খেতে দেব কি।
ঘরে আছে ক্ষীরের নাড়ু, তাই খেতে দি।
ওদের রাই খেতে এলো, খেতে দেব কি।
ঘরে আছে চোঁয়া মুড়ি,[৬] তাই খেতে দি॥
আমাদের রাই শুতে এলো, শুতে দেব কি।
ঘরে আছে শীতল পাটী, তাই পেতে দি॥
ওদের রাই শুতে এলো, শুতে দেব কি।
ঘরে আছে ছেঁড়া চেটা,[৭] তাই পেতে দি॥
গেয়ের[৮] গোবর সরষের ফুল—
আমরা পুজি যেন মা-বাপের কুল॥
মা-বাপের কুল নাড়ি-চাড়ি—
শ্বশুর কুলে রাজা করি॥[৯]

১ কাঁধে ২ খুব গভীর, কিন্তু মজা পুকুরে। ২১-সংখ্যক ছড়ার 'ঝ' অংশ দ্রষ্টব্য ৩ শুনতে ৪ এসে বসো ৫ এসো ধোও ৬ পোড়া মুড়ি ৭ চাটাই ৮ গাইয়ের, গরুর ৯ ৺কৃষ্ণকুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)।

৩৭

টুসু বিসর্জনের ছড়া ॥

রাই[১] উঠেছেন রাই উঠেছেন বড় গঙ্গার ঘাটে।
কার আছে গো হলুদ-তেল দাও গো রাইয়ের হাতে।
রাই উঠেছেন রাই উঠেছেন মেজ গঙ্গার ঘাটে।
কার আছে গো আয়না-চিরুন দাও গো রাইয়ের হাতে।
রাই উঠেছেন রাই উঠেছেন সেজ গঙ্গার ঘাটে।
কার আছে গো আমলা-তেল দাও গো রাইয়ের হাতে।
রাই উঠেছেন রাই উঠেছেন ছোট-গঙ্গার ঘাটে ॥
কার আছে গো ফুলচন্দন দাও গো রাইয়ের হাতে ॥[২]

৩৮

॥ বীরভূমে প্রচলিত একটি ছড়ার কিয়দংশ ॥

(সাধের) ইংরেজ বলব কি তোরে,
যত রাজ্যের লাইন এনে বাঙ্গা বাঙ্গালে, ইংরেজ বলব কি।
ইংরেজের বুদ্ধি বড় করলে আপিসখানা,
যত লোকে টিকিট কিনে করে আনাগোনা, ইংরেজ বলব কি,
ইংরেজের বুদ্ধি বড় করলে ডাক্তারখানা,
জনে জনের হাত দেখিয়ে দেয় সাওদানা, ইংরেজ বলব কি··· ৩

১ রায় অর্থাৎ সূর্য ২ পৌষ-সংক্রান্তির দিন ভোর বেলায় টুসুর সরাটি সাজিয়ে নদী বা পুকুর ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সূর্য উঠতে দেখলেই সূর্যকে উদ্দেশ করে সমবেতভাবে এই ছড়া গেয়ে টুসুর সরা বিসর্জন দেওয়া হয়। 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা · পৌষ, ১৩৬৮) : তুলসীদাস সিংহ। পূর্ববঙ্গের 'মাঘমণ্ডলের ব্রতে'র ছড়া এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। পৌষমাসে সূর্যের অয়ন হয় বলেই সূর্যের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

৩ নলিনীনাথ দাসগুপ্ত : পৌষসংক্রান্তি (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬০২)। ছড়াটি ঠিক কোন্ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কথিত হয়, লেখক তা জানান নি। ভাদু বা টুসুর ছড়া বলে মনে হয়।

৩৯

॥ পয়লা পৌষের 'হোরবোল'-এর ছড়া, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ॥

কালো তুলসী কালো তুলসী হোরবোল !
যে দেবে কাঠা কাঠা তার হবে সাত ব্যাটা,
যে দেবে মুঠি মুঠি তার হবে সাত বিটি,
যে দেবে আড়ি আড়ি—তার ঘরে লক্ষীর হাঁড়ি।[১]

৪০

॥ পয়লা পৌষের 'হোরবোলে'র ছড়া, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ॥

ওপারেতে কদম গাছটি কদম ঝুরঝুর করে,
তার তলাতে রাধাকৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা,
সকল লতা বলে আমার কৃষ্ণ গেল কোথা।
কৃষ্ণ গেল বিষ্ণুপুর না বোল বলিয়ে।
হেন সময়ে এলেন কৃষ্ণ পাচনি হারিয়ে।
পাচনি হারিয়ে কৃষ্ণ বেড়ান বনে বনে
নবীন কুশের অঙ্কুর ফুটিল চরণে।
ডাহিন্ হাতে তেলের বাটি কানে কদম্বের ফুল।
রাধা গেলেন স্নান করিতে কালীদহের কূল।
কালিদহে গিয়ে রাধা খুলে দিলেন কেশ
কেশপানে চেয়ে চেয়ে তনু হল শেষ।
আলি লো মা ডালে কেবা—কৃষ্ণ কেন গাছে।
সকল সখী নৃত্য করে বলরামের কাছে।[২]

১ নিরুপমা দেবী : বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ২৪১—২৪৩)। ছড়াটির মধ্যে একটি যাদুধর্মিতার পরোক্ষ দিক আছে. যে যে-পরিমাণ ধান-চাল দেবে সে সেই ধরণের ফল পাবে। এটাই এর যাদুর দিক। সব 'মাগন' বা 'চাঁদাসাধার' ছড়াই তাই।

২ নিরুপমা দেবী : বঙ্গের পয়লাপৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ২৪১—২৪৩)।

"পয়লা পৌষের প্রভাতে গ্রামের পথে ও গৃহস্থের অঙ্গনে স্বর্ণদ্যুতি গাঁদা ফুলে গ্রথিত মালো মণ্ডিত দীর্ঘ দীর্ঘ যষ্টিগুলি উত্তোলন করিয়া, এবং তাহাদের

৪১

॥ পয়লা পৌষে "হোরবোলে"র ছড়া, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ॥

একটা বুড়ি মাথে বসে পথে লয়ে একখান্ ডেলে
"ফল নাওসে ফল নাওসে যত গোপের ছেলে
বাবা সকল আয়রে তোরা"—বলে বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে "ওরে সুবল বুড়ী ডাকছে ক্যানে!"

ছিন্ন মলিন গাত্রবস্ত্রের উপর এক এক ছড়া গাঁদাফুলের মালা দোলাইয়া বালকের দল কলকণ্ঠে সমস্বরে গাহিয়া উঠে—"কালো তুলসী কালো তুলসী হোর্‌বোল্!"

"হরিবোল" বোধহয় "হোর্‌বোলে" রূপান্তরিত হইয়াছে। এ দেশের গরীব মুসলমান বালকেরাও ঐ দিনে 'হোর্‌বোল্' গাহিতে বাহির হয়। তাহারা "হোর্‌বোল্" না বলিয়া "ভাববোল" বলে। "ভাববোল" শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু "হোর্‌বোল্" বা "ভাববোল" গাওয়ার শেষে উভয় দলই বলিয়া থাকে—

হোর্‌বোল্ গাইতে গাইতে গলা হ'ল ভারি,
মুসলমানে আল্লা বলে হিঁদু বলে হরি।

"বেলা দ্বিপ্রহর হওয়া পর্যন্ত বালকেরা এইরূপে গ্রামস্থ সকলের নিকট পয়সা চাল ডাল তরকারী মিষ্ট প্রভৃতি আদায় করিয়া শেষে মাঠে নদীতীরে বা কোন বাগানের মধ্যে মহানন্দে "পোষলা" করিয়া থাকে।"

"হোর্‌বোল্"-গাওয়া বালকেরা প্রথমতঃ কৃষ্ণের নানা ভাবের বাল্যলীলার গীতই গাহিত, . । এখন হোর্‌বোল্ গায়ক বালকেরা প্রচলিত কয়েকটি 'পদ' এবং তাহাদের দলের মূল গায়নের যে দু একটি ছড়া মুখস্থ আছে তাহার এক এক পদের বিরামস্থলে কেবল সমস্বরে "হোর্‌বোল্" বলিয়া থাকে।"

নিরুপমা দেবী জানিয়েছেন, কৃষ্ণলীলার মতো রামলীলার ছড়াও গাওয়া হয়। তিনি রামলীলার ছড়াও সঙ্কলিত করেছেন এই সঙ্গে। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে তা উদ্ধৃত করি নি।

শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলার গ্রাম্য ছড়া' (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) বইতে 'গ্রাম্য ছড়া' বলতে যা বুঝিয়েছেন, এই ছড়া তাই। এই ধরণের ছড়া আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক,—নানাভাবেই মেলে। সংখ্যাতেও প্রচুর। কাজেই এই ধরণের ছড়াকে 'গ্রাম্যছড়া' বলে আলাদা নাম দেবার কী সার্থকতা, তা বুঝতে পারলাম না। পরবর্তী ৪১-সংখ্যক ছড়াটিও এই জাতের।

"বুড়ী তুই ডাকিস কেন করিস কলরব।
তোর বাণী শুনে আমরা ধেয়ে আসছি সব!"
"ডাকি কেন শোন গোপের বেটা
আম কাঁটাল পেয়ারা আর ফল এনেছি গোটা,
কিছু কিছু ধর শিশু মুখে দাও সুখের হোক তায়,
ঘর্‌কে গিয়ে মাকে বলে নিয়ে এস গে ধন!"
শুনে বুড়ীর কথা যান হরি যান যদুপতি
ঘরকে গিয়ে মা বলিয়ে ধরেন যশোমতী।
"সঙ্গে চল মা বাজার পথে কিনে দাও গে ফল
দিবা কি না দিবা রাণী সত্যি করে বল্।
তোর ভাঙব হাঁড়ী ভাঙব কুঁড়ী ভাঙব দুধের হোলা!
ঘর সর্বস্ব ভেঙে দেব তখন পাবি জ্বালা!
"এ কি জ্বালা" গোপের ঝি
"হারে লোকের ছেলে কত খাচ্চে তোরাই বা না খাচ্চিস কি?
এমন কথা বল্লে হেথা আমায় দিয়ে দোষ
পাকা পাকা ফল আনিবে ঘরকে আসুক ঘোষ।
আসুক নন্দ কৃষ্ণচন্দ্র ফল আনিবে পাড়ি,
কিসের জন্যে মিছে ধরের যোগাইবে কড়ি।
ঘরে বসে ননী খাও ওরে চাঁদের কোণা।
আমি কুম্ভকাঁখে যমুনাতে জল আনি গে সোনা!"
নন্দ গেল বাথানে—যশোদা গেল জলে
খালি ঘর পেয়ে কৃষ্ণ ননী চুরী করে।
ভাণ্ড ভাঙে ননী খায় উদুখলে পা,
যশোদারে দেখে কৃষ্ণের মুখে নাহি রা।
"হারে গোপাল হারে গোপাল ননী খেল কে!"
"আমি ত খাই নি মা বলাই খেয়েছে।"
রাণী দেখেন চাঁদ মুখে ননী লেগে রয়েছে।
"বলাই যদি খেত ননী ভালায় রাখত কড়ি,
সাত পুরুষের ভাণ্ড আমার যাচ্ছে গড়াগড়ি"।
আগে আগে পালান কৃষ্ণ যশোমতী পাছে,
লাফ দিয়ে ওঠেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে।

ডালে ডালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা,
তা দেখে যশোদা কপালে মারে ঘা !
গাছ হ'তে নাম গোপাল পেড়ে দেব ফুল,
ওখান থেকে পড় যদি মজাবে গোকুল !"
"তবে আমি নামি মা এই সত্য কর
নন্দ ঘোষ তোমার বাবা যদি আমায় মার।"[১]

৪২

। পয়লা পৌষে ব্যঙ্গের ছড়া, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ॥

এক ঠগ্ দুই ঠগ্ তিন ঠগের মেলা
ঠগের গুরু অমুক মোড়ল অমুক তার চ্যালা।
ওপারেতে কদম গাছে ঝুরো ঝুরো ফুল,
অমুক ঠাকুর পুজো করে আগাগোড়াই ভুল ॥[২]

৪৩

। পয়লা পৌষে ব্যঙ্গের ছড়া নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ॥

যার জননী ছেঁড়াকাঁনি পরে' ব্যাভার করে,
তার বেটার পরণে টিপের ধুতি 'বাবু' হ'য়ে ফেরে।

১ নিরুপমা দেবী . বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ২৪১—২৪৩)।

২ নিরুপমা দেবী বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী পৌষ, ১৩১৮। পৃ ২৪১—২৪৩)।

"চৈত্রমাসে গাজন ও মাঘমাসে সরস্বতী পূজার 'বোলানে'র পরিশিষ্টে যেমন গ্রামবাসী কাহারো দুর্ব্যবহার বা গ্রামের উপস্থিত কোন আন্দোলন লইয়া গায়করা শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ছড়া গাহিতে থাকে (অন্য কোন জেলায় আছে কি না জানি না কিন্তু উপরোক্ত দুই জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়) তেমনি এই বালকদলের মুখ দিয়া গ্রাম্য উপস্থিত কবি সেদিন গ্রামের অপরাধীদিগকে বিলক্ষণ সাজা দিত। সে মানহানির কোন "নালিশ করিদ্" ছিল না, উপরন্তু হাসিমুখে তাহাদের মিষ্টান্ন বা চাউলাদি দিতে হইত। .."

যার জননী গুগলির শাক আলুনো রেঁধে খায়,
তার বেটার পায়ে সাপাট জুতো 'বাবু' হ'য়ে যায়।
যার জননী অগ্নি জ্বেলে শীতের বেলা কাটে,
তার বেটার গায়ে শালের জোড়া ঘুময় ছাপোর খাটে!
'বাবু' হ'তে জানত যদি করত যদি বিয়ে
পুত্র হয়ে করত ত্রাণ গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে॥[১]

৪৪

। পয়লা পৌষে বঙ্গের ছড়া, নদীয়া [illegible]

দুশ্চারিণী যে রমণী তার কর্মফলে,
সোনার যাদু গিরিবালা ভাসছে বিলের জলে।
ননদ ভাজে কৌশল করে তিন বছরে[র] ছেলে,
মায়ের কোল শূন্য করে যমের কোলে দিলে।
মানবের বিচার হয় না শুধু পায়নি সাজা ঢের,
মরণ হলে তলব এলে তখন পাবে টের।[২]

৪৫

। পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, নদীয়া

পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস যেও না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেও না
পোয়ালে গাদায় থাক পৌষ যেও না

১ নিরুপমা দেবী বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী . পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ২৪১—২৪৩)।

"কে করে মাতাকে অন্ন না দিয়া এবং সংসার না করিয়া কুস্থানে বাবুগিরিতে কাটাইয়াছিল তাহার উদ্দেশে গ্রাম্য কবি ছড়া বাঁধিয়াছিল—"

২ নিরুপমা দেবী : বঙ্গের পয়লা পৌষ (প্রবাসী : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ২৪১—২৪৩)।

"একজন মহাপাপিষ্ঠার পাপ নিম্নলিখিত ছড়ায় প্রকাশ—" [সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]

লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেও না
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না ॥[১]

৪৬

পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, বিক্রমপুর ॥

আইল্যাম রে অবণে[২]
লক্ষ্মী মায়ের চরণে,
লক্ষ্মী মায়ে দিলেন বর
ধান চাউল বাইর কর।
ধান দিয়া না দিস কড়ি
ঐ বাড়ী পাইম্ সোনার লড়ি।[৩]
সোনার লড়ি পাইম্ রে
শ্যাম সুমারি কাইম্ রে ॥[৪]

১ 'পৌষ-সংক্রান্তি' (সাধনা মাঘ, ১৩০১। পৃ ২৫৫-২৬২)। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য ছিল "সন্ধ্যাকালে পল্লী বাসিনীগণ গৃহপ্রাঙ্গণ আলপনায় চিত্রিত করিতে লাগিল, । আলোক হস্তে বিনয়কুমারের কন্যা ও ছোট ভগ্নিটি আলপনার উপর চাউল গুঁড়া ও একটি করিয়া দূর্বামণ্ডিত ও সিন্দুর-রঞ্জিত গোবরের নুড়ি রাখিয়া যাইতেছে এবং বলিতেছে—" [অতঃপর ছড়াটির উল্লেখ]। নদীয়া জেলায় এটি প্রচলিত বলে লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের বহু অঞ্চলেই এটি প্রচলিত আছে।

২ হরণ করতে ৩ লাঠি ৪ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বিক্রমপুর)। প্রবাসী পৌষ, ১৩২৬। পৃ. ২৫৭। প্রারম্ভিক মন্তব্য এই ছিল, "বিক্রমপুর অঞ্চলেও পৌষ-সংক্রান্তির উৎসব আছে, তথায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষভাগে হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ দিবাবসানে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দলে দলে শ্রুতিমধুর বিবিধ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়া বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে কোন মাঠে গিয়া মহানন্দে "পোষলা" করিয়া থাকে। হিন্দু বালকেরা হরির নামে ও মুসলমান বালকেরা মাণিক পীর ফকিরের নামে উৎসবে ব্রতী হয়।"

"...কোন ছড়াতেই তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই, কষ্ট কল্পনায় অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করা কঠিন।"

৪৭

ছিকা[১] নড়ে, ছিকা চড়ে
ঝমঝমাইয়া টাকা পড়ে,
একটা টাকা পাল্যাম রে
বাইল্যা-বাড়ী গেলাম রে।
বাইল্যা-বাড়ী ঘুঘুর বাসা,
এক এক ঘুঘু নও নও বাসা,
নও নও বাসে নও নও পণ,
আমরা পাব কম পণ।

৪৮

আইব্যা[২] নলের বেড়া,
যাই উত্তর পাড়া,
উত্তর পাড়া ঘরটি
সোনার থাম খামটি।
সোনা চেয়ে রূপা ভালা[২]
ঐ বাড়ীখান্ দেখতে ভালা
দেখতে ভালা, উচা টুই
তারা আছে মোচা দুই।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে চাঁদা সাধার ছড়া বাংলার সর্বত্রই মেলে। তবে, কোথাও বলা পৌষ, কোথাও বা পৌষ মাস, কোথাও আবার পৌষের সংক্রান্তির দিন, সময়েরও স্থিরতা নেই। কোথাও ভোর বেলায়, কোথাও সন্ধ্যাবেলায়, কোথাও বা বিকেলে বা সকাল বেলায়।

১ শিকা। এই ধরণের সব ছড়াই সাদৃশ্য-সমন্বয়-মূলক আভিচার বা যাদু অনুষ্ঠান। এখানেও দেখা যাচ্ছে বেশি পরিমাণে চাঁদা দেবার জন্তে 'শিকে'র থেকে ঝমঝম্ করে টাকা পড়ছে সেই গৃহস্থের বাড়িতে। পাখির উল্লেখ এই ধরণের কয়েকটি ছড়ায় পাই। পাখি এখানে ধন-সম্পদের প্রতীক। বহু ছড়াতেই এই প্রতীক গৃহীত হয়েছে।

২ অন্ধকার বিশিষ্ট, 'হাঁড়িয়া' ও ভালো।

৪৯

দাদায় গেছে বাঘাইপুর
কিনা আনছে চাম্পাফুল,
চাম্পা না রে মতমান
এস গিরি কর দান।
এক ধান দুই ধান
মধ্যে মধ্যে হলদে ধান,
অবে[১] হলদে গুয়া[২]খা
পাড়ের বাঘ সবে যা।
কুলইর বর, কুলইর বর ॥[৩]

৫০

পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া 'ত্রিপুরা-ময়মনসিং'-শ্রীহট্ট।

যে না বোলে হরি হরি
তার গলায় যমের দড়ি
হরি বোল হরি
রাম তুলসী গঙ্গাজল
সর্বলোকে হরি বোল।[৪]

১ ওরে ২ সুপারি ৩ 'কুলাইর বর'-এর সঙ্গে কুলগাছের কোনো সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করি। দ্রঃ ৩-সংখ্যক ছড়ার পাদটীকায় আমার মন্তব্য।

৪৬ থেকে ৪৯-সংখ্যক ছড়াগুলি নেওয়া হয়েছে এখান থেকে : সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পৌষ, ১৩২৬। পৃ ২৪৭-২৪৮। এগুলি তিনি বিক্রমপুর জেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব ক'টি ছড়ার মিলিত রূপ উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত 'গোরখনাথের' ছড়া-গানে পাওয়া যায় (দ্রঃ জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত, ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের 'উত্তর বঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ' বইয়ের পরিশিষ্ট, পৃ. ৩০-৩১)।

৪ শশিভূষণ দত্ত. পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী. ফাল্গুন, ১৩১৮। পৃ. ৪৯৩)।

"ত্রিপুরা, ময়মনসিং ও শ্রীহট্টের পল্লী মধ্যেও ঐ উৎসব [পৌষ-সংক্রান্তির

৫১

(পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, বগুড়া)

কাল বাড়ীয়ে কাল বাড়ী
লাফ দিয়া উঠে গিরি বাড়ী।
কেমন গিরি জাগ হে
ভিক্ষা মাগি কার নামে
মাণিকপীর সাহেবের নামে।
যে ইট দিবি কাঠা কাঠা
তার হোবে সাত বেটা,
সাত বাটা আঠার নাতি
ঘরে ঘরে মোম বাতি
জ্বলুক বাতি পুড়ুক ত্যাল
আমশালুক পাকা ব্যাল।[1]

৫২

(পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, বগুড়া)

শ্যাম কই শ্যাম কই
আমরা আছি ছেলেপুলে।[2]
জাড়ে[3] কসমা[4] পাই,
মঙ্গল জ্ঞাও বাড়ী যাই,
গাধা[5] জ্ঞাও উড়্যা[6] যাই,
ঘোড়া দাও চড়্যা যাই।[7]

উৎসব] বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে অরুণোদয়ের প্রাক্কালেই দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা স্নান করিয়া উচ্চ কণ্ঠে সুর তুলিয়া বার বার নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলিতে থাকে' [তা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

১ হরগোপাল দাসকুণ্ডু : বঙ্গের পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী মাঘ, ১৩১৮। পৃ. ৩৯০-৩৯১)। শেষ দুই পংক্তির রূপান্তর উত্তরবঙ্গে চলিত নানা ছড়ায় খুব পাওয়া যায়। একটি এই : জ্বলুক বাতি, পুড়ুক ত্যাল। ব্যাল গেইল্ কাটিয়া, চুকাক খাইল্ চাটিয়া।

২ ছেলেপুলে ৩ শীতে ৪ বস্ত্র বিশেষ ৫ গাধা ৬ পরিধান করে ৭ হরগোপাল দাসকুণ্ডু : বঙ্গের পৌ-ষসংক্রান্তি (প্রবাসী মাঘ, ১৩১৮। পৃ. ৩৯০-৩৯১)।

৫৩

॥ পৌষ সংক্রান্তির ছড়া, বগুড়া ॥

আলো রে অরণি মা লক্ষ্মীর চরণি।
মা লক্ষ্মী দিল বর ধান কড়ি বার কর,
ধান দিবু না দিবু কড়ি তোক্ করমু নড়ি ধরি,
নড়ি ধরি রাম রে সোনার কড়ির ফল রে
সোনা না উপার মালা এ ঘরখান জগতমালা,
জগতমালা ইলিঝিলি হামার ঘরক খায় লিলি,
লিলি খাতে বড় মন পান্তাভাতে ঢালে নুন।
পান্তাভাত খ্যাড়খ্যাড়া খেড়াবাড়ী খ্যাড়খ্যাড়া,
খেড়খেড়াতে লাগলো ভুড় কে কে যাব বিরামপুর,
বিরামপুর পাতপাড়া তিছয় আঠার ঘোড়া,
ঘোড়া ঘুড়ি বুঝ্যা লব শ্যাল গোটা দুই মারা্যা লব।
শ্যাল মারতে আছি ও ছি।
সাত বামনের সাত স্যাট বুড়ো বামনের হাঁড়া প্যাট,
হাঁড়া প্যাটেত্ মারমু গুড়ি[১] ছেলে[২] বাড়াল আড়াই কুড়ি।
ছেলের নাম কি
আখাল গোপাল
বুড়ার নাম কি
বুড়া গোপাল
বুড়ির নাম ল্যাঙ্গকাটা ডোম্‌রি।[৩]

৫৪

॥ পৌষ সংক্রান্তির ছড়া, বগুড়া ॥

আইল রে আমশালুকা[৪] দাতে করা্যা কুট।
হাম্‌রা মাজিয়া খাই এই মাস পুষ॥
এই মাস পুষ রে বনে প'লো টাটি,
এক ঝাঁকে উড়ান দিলাম নও জোড়া পাখি।

১ লাথি ২ ছেলে ৩ হরগোপাল দাসকুণ্ডু বঙ্গের পৌষ-সংক্রান্তি (**প্রবাসী :** মাঘ, ১৩১৮। পৃ. ৩৯০-৩৯১)।

৪ রামশালিক।

নও জোড়া পাখি রে টকর বিকর
চোরা ব্যাটা করছে ভাঁসা[১] টুয়ের উপর।
টুয়েরি খ্যাড় গোছা কোরছে লোছাগোছা
আউর খায় বাউর খায় পত্তি[২] করে ভাসা।
চাষা ব্যাটার কামাই খায় বড় বড় আজা।
খায় আর মোচড়ে দাড়ি
আগুন লাগুক ভুমমাণের বাড়ী।
ছিকা নড়ে ছিকা চড়ে চুন্দুড়াতে ট্যাকা পড়ে,
এক ট্যাকা পাল্যাম রে বাক্সার বাড়ী গেলাম রে,
বাক্সার বাড়ী খুখুর চাঁসা একে ভাঁসা নও নও টাকা,
নও ট্যাকা দিয়া কিনলাম গাই,
গাইর নাম মোনামুন,
দুধ হয় আঠার হাঁড়,
আজা খায় বাজা খায়
কতক দুধ ঢেউ যায়।[৩]

১ চড়ুই পাখির বাসা ২ প্রতিদিন ৩ হরগোপাল দাসকুণ্ডু বঙ্গের পৌষ সংক্রান্তি (প্রবাসী মাঘ, ১৩১৮। পৃ ৩৯০-৩৯১)।

"বগুড়া জেলাতেও এ উৎসব [পৌষ-সংক্রান্তির উৎসব] আছে, তথায় কিন্তু সমস্ত পৌষমাস হিন্দু ও মুসলমান রাখাল বালকগণ দিবাবসানে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দলে দলে শ্রুতিমধুর বিচিত্রসুরে বিবিধ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে কোন মাঠে গিয়া মহানন্দে "পুষণা" বা পোষলা করিয়া থাকে। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সংক্রান্তির দিন অবশ্য মহা সমারোহে এই উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। হিন্দু বালকেরা হরির নামে এবং মুসলমান বালকেরা মাণিক পীর ফকিরের নামে উৎসবে ব্রতী হয়।"

"ছড়াগুলির বিষয় বিভিন্ন, কোনটি পাখি লইয়া, কোনটি ইন্দুর লইয়া, কোনটি লক্ষ্মীর নামে, কোনটি মাণিকপীরের নামে রচিত। ইহার কোনটিতে আশীর্বাদ, কোনটিতে তোষামোদ কোনটিতে বা বিদ্রূপ আরোপিত হইয়াছে।

"বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের এই উৎসবের সাধারণ ছড়া প্রকাশিত হইতে থাকিলে উৎসবটির সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগঠিত এবং উদ্দেশ্যও আবিষ্কৃত হইতে পারে। ছড়াগুলি ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পক্ষেও সুবিধাজনক।"

৫৫

॥ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'কুলাই'র ছড়া, পৌষ-সংক্রান্তিতে ।

ক. ঠাকুর কুলাই ভোঁ।
হবসিয়া, পরশিয়া
লডা বাইগুন তবাসিয়া।
লড়া বাইগুন খল পাতে
ভিখ দ্যাও আন্যা (আনিযা) লক্ষীর হাতে।
দ্যাও ভিখ্ ন্যাও বর
ধানে চাউলে বরুক গব।
হরুয়া নলের চাছ কলাই, মাণিকনালের বেড়া
লক্ষীর হাতে দ্যাও ভিখ যাই আল্যা (হালিয়া—কৃষক) পাড়া,
আল্যা পাডা যাইতে রে গাঙে লাগল ঠোস্
(কোবস) ঠাকুর কুলাই ভোঁ।

খ. অটি, অটি, /সোনায় বান্ধা লাডি (লাঠি)
সোনাও বালো (ভাল) রূপাও বালো,
এ গরহান (ঘরখানি) ছাইছে বালে।
এ গরহান ছাইছে ছোনে,/ লক্ষ্মী বইছেন চারিকোণে,
বইছেন লক্ষ্মী দিছুন বর, /ধানে চাউলে বরুক গব (ভরুক ঘর)
হরুয়া নলের চাছ কলাই, মাণিক নালের বেডা
লক্ষীর হাতে দ্যাও ভিখ যাই আল্যা পাডা,
আল্যা পাডা যাইতে রে গাঙ্গে লাগিল ভাডি (ভাটি)
এদেশের মানুষগুলা অক্ষয় লোয়ার (লোহার) কাডি (কাঠি) ॥[১]

৫৬

॥ পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, বগুড়া

কডাকড়া ভাতে কি কাম করে
বুড়া বুডি চেতন করে।
ক্যারে বুডা ক্যারে বুডি।

১ প্রফুল্লময়ী দেবী পৌষসংক্রান্তি (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২১২)।

কয়ডা গাই কয়ডা বলদ
বারডা গাই তেরডা বলদ।
একটা গাই নড়ে চড়ে
বাঘা আসা ঘারেতে পড়ে,
খায় বাঘা বনে
গায় আপন মনে
খায় আর কামড়ায়
দুই চোখ কড়মড়ায়।
দুই গানে দুই মূলা
ধান বাইর কর কুলা কুলা,
কুলা থিনি কাঠাত যাউক
গিরিনি খানেক বাঘে খা'ক।
ও বাঘ তুই খাসনা
গাভীর জাত মারিস না।[১]

৫৭

(শ্রীস্য কাঁশুর ছড়া, ময়মনসিংহ)

আইলাম রে ভাই কান্দি ভাইয়া
বাঘ বইছে হরিণ লইয়া,
হরিণ খাইয়া সেজ্ঞা খায়,
সোনার লাঙল ঘরে যায়।

১ হরগোপাল দাসকুণ্ডু বঙ্গের পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী মাঘ, ১৩১৮। পৃ ৩১০-৩১১)।

"বুড়াবুড়ি রাখালদিগকে পর্যাপ্ত অন্ন দিয়াছে বলিয়া বালকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে "তোদের কয়টা গাই বলদ?" যখন শুনিল বারটা গাই তেরটা বলদ তখন তাহারা বলিতেছে "এত দুধ এত ক্ষীর ছানা থাকিতে তোরা কিনা আমাদিগকে বাসিভাত খাইতে দিলি। বাঘ আসিয়া তোর গাই গরুর ঘাড়ে পড়িয়া বনে লইয়া যাইবে ও কড়মড় করিয়া খাইবে, এমন কি বুড়ি গিন্নিকেও খাইতে পারে। যাক—কাঠা কাঠা ধান দিলে আর তোদের ভয় নাই। ওরে বাঘ তুই এদের খাস না, গাভির জাতিকে মারিস না।"

২ সন্ধ্যা।

সোনার লাঙল রূপার ফাল
ঘর জামাইয়া জুড়ছে হাল।
জুড়ছে হাল জুড়ছে মই
আমোন ধানের গুড়িত[১]রে।
আমোন ধানের বড় বড় পাতা
—ও পোলা[২] আমার রে
বনবাসী যাযাম্[৩]রে—।
বনেতে বেরুয়া বাঁশ,[৪]সেখানেতে নীল হাঁস।
নীল হাঁস নীল পেয়রা,[৫] হাত বাড়াইয়া পাইলাম ঘোবা,
মাথা ভইরা[৬] পাইলাম তেল, শরীর জুড়াইয়া গেল।
আইট্টাকলা[৭] ডিঙ্গাব[৮]পাত, ঘরগুষ্টি সেলামে থাক। থুব থুব ॥[৯]

৫৮

পৌষ সংক্রান্তির ছড়া, বরিশাল।

ক আইলাম লো শরণে। লক্ষ্মী দেবীর বরণে॥
লক্ষ্মী দেবী দিলেন বর। ধানে চাউলে ভরুক ঘর॥
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি। কড়ি হৈল সোনার নড়ি[১০]॥

১ গোড়াতে ২ ছেলে ৩ যাব ৪ বাঁশ বিশেষ ৫ পায়রা ৬ ভরে ৭ বিচিঅলা কলা ৮ ঐ ৯ হেমচন্দ্র বক্সী পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩১৯। পৃ ৮৭)।

"ইহা ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে প্রচলিত। পৌষ মাসের প্রথম হইতে রাখাল বালকেরা সন্ধ্যাবেলা এই ছড়া গাহিয়া শহরের বাসায় বাসায় ঘুরিয়া চাল কড়ি সংগ্রহ করে। দলের সব চেয়ে বড় বালকটি প্রথম গায়, তারপর কোরাসে সকলে গাহিতে আরম্ভ করে।

"এইরূপে তাহারা চাল কড়ি সংগ্রহ করিয়া সংক্রান্তির দিন গরু বাছুর স্নান করাইয়া মাঠে লইয়া যায়। মাঠে গরু চরিতে থাকে আর তাহারা বনের ছায়াযুক্ত কোনো বৃক্ষের তলে সিন্নি রাঁধিয়া সকলে মিলিয়া হাসিয়া নাচিয়া পরিতোষ পূর্বক আহার করে।"

১০ যষ্টি।

সোনার নড়ি রূপার মালা। মাঝখাটালে[১] টাকার ছালা॥
একটা টাকা পাই রে। বাণ্যা[২] বাড়ী যাই রে॥
বাণ্যা বাড়ী খুপের মোচা[৩]। টাকা ভাঙ্গাইলাম স্থন পয়সা[৪]॥
স্থন পয়সা কত ধন। কুলাই[৫]রে দেবা কত ধন॥
(কোরাস) ঠাকুর কুলাই চৈ॥

৩ হাট্যা চল রে। ধ্রু॥
হাট্যা চল পাচিল পাড়। ঝপাং[৬] গিরি রে॥ ধ্রু॥
ঝপাং গিরি সজাগ হয়। সজাগ হয়্যা না করে রব॥
সুন্দরবনে[৭] রে। ধ্রু॥
সুন্দরবনে বাঘের ছা[৮]। হাদুর হুদুর করে রব॥

(বার বাঘের বর্ণনা)

য়্যাক বাঘ রে। ধ্রু॥
য়্যাক বাঘ চৈপা। বাওন[৯] মার্যা নিলো পৈতা॥
য়্যাক বাঘের গলায় দড়ি। হারা[১০] আটি[১১] লড়া লড়ি॥
য়্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর * *[১২] রাঙা ইন্দুর[১৩]॥
আর য়্যাক বাঘ চৈ চৈ। গোয়ালে মার্যা খাইল দৈ॥
আর য়্যাক বাঘ ঝোপার[১৪] আড়ে। লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে
আর য়্যাক বাঘের গলায় বাত। * * * *॥
আর য়্যাক বাঘ হিজল গাছে * * * *
আর য়্যাক বাঘ বাঁশের পুরে। * * * *
আর য়্যাক বাঘ রাইঙ্গা। কাড়[১৫] ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা॥

১ "খাটাল—খড়োঘরের মধ্যাংশ উহার একদিকে 'পাচতুয়ার' [পাছদুয়ার?], অন্যদিক 'বীর খাটাল' গড়া বা খুঁটীদ্বারা পৃথক করা থাকে" ২ বেনে ৩ খলে, পুঁলিন্দাবিশেষ ৪ স্থন—"(বোধ হয় সংস্কৃত ন্যূনং হইতে উৎপন্ন) কেবল" ৫ বাস্তুদেবতার নাম ৬ "ঝপাং বোধ হয় 'ধবল' অন্যথা অর্থহীন" ৭ সুন্দর বনে ৮ ছা, ছানা ৯ বামুন ১০ সারা, সমস্ত ১১ হাট ১২ "চিহ্নিত অংশগুলি অশ্লীল বলিয়া লুপ্ত করা হইয়াছে। পরবর্তী অংশেও এইরূপ কতকটা স্থল অশ্লীল বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না" ১৩ নেংটি ইঁদুর ১৪ ঝোপের, ঝাড়। ১৫ "গৃহের অভ্যন্তরস্থ উচ্চ মাচা বিশেষ"।

আর য়্যাক বাঘের হাতে মিঠা। মোরে য়্যাকখানা চিতৈ পিঠা[১]
আর য়্যাক বাঘ কাল্যা। গাঙ্গের[২] মারে জাল্যা[৩] ॥
আর য়্যাক বাঘের মাথা কাটা। ধান দেবা রে কত কাঠা ॥
বাব বাঘের লেখা পড়ি। চাউল দেও এক বুড়ি ॥
(কোরাস)—ঠাকুর কুলাই ভোঁ ॥

["অনেক সময় গায়কগণ এই ছড়ার সঙ্গে নূতন পদের বাঁধুনী দিয়া গৃহস্থকে ঠাট্টা বিদ্রূপও করিয়া থাকে। ঐ রূপ দুই একটী নূতন পদও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

আর য়্যাক বাঘ অমুক বায়।
জোতা[৪] পায় দিয়া বাহো যায় ॥
আর য়্যাক বাঘ অমুকের মায়
মায়্যা হৈয়া[৫] চসমা ছ্যায় ॥[৬]

১ আসকে পিঠে ২ নদীর ৩ জেলে ৪ জুতো ৫ মেয়েলোক হয়ে ৬ কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্ন (প্রবাসী চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬০০-৬০১)।

"বরিশালে পৌষ-সংক্রান্তি উৎসব বাস্তুপূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব অধিকাংশ স্থলেই সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এবং বয়োধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান, বাল বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষ্যে গ্রামের জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যহ রাত্রিযোগে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ছড়া গাহিয়া বেড়ায় এবং উৎসবের মূল বাস্তুদেবতার পূজার জন্য চাউল ভিক্ষা করে। কোন কোন স্থলে বাস্তু পূজার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিন সন্ধ্যা বেলা নলিয়া পূজা নামে অপর একটী উৎসবেরও অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষ্যে নানাবিধ অগ্নিক্রীড়া হইয়া থাকে।"

"আকৃতি দর্শনে বাস্তুকে ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দেবতা বলিয়াই মনে হয়, বাস্তুভিটার মালিকের প্রধান অবলম্বন লক্ষ্মীদেবীর সহিতও ইহার সম্পর্ক। তাই এই উৎসবের ছড়ার মধ্যে লক্ষ্মীর প্রসাদ ধনবিভবের উল্লেখ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির বর্ণনা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বরিশাল অঞ্চলে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ছড়া দুইটী গীত হইয়া থাকে"। [সে ছড়া দুটি ওপরে উদ্ধৃত করেছি]

"পৌষ-সংক্রান্তির উৎসব-উপলক্ষে 'চিতৈ পিঠা' খাওয়া বরিশালের

৫৯

পৌষ-সংক্রান্তিতে মুসলমান বালকদের ছড়া, বিক্রমপুর

আইলাম রে বরণে ঠাকুর-গোঁসাই-চরণে,
ঠাকুর গোঁসাই দিল বর[1] চাউল কড়ি বাইব কর,
চাউল আর দেও কড়ি ঐ ঘরেতে সোনার লড়ি,[2]
সোনার লড়ি রূপার থাল ঐ ঘরখান দেখতে ভাল,
ঐ ঘরের উঁচা[3] টুই টাকা আছে মোচা দুই।
বাইনা বাড়ী[4] গিয়া রে একটা টাকা পাইলাম রে।
বাইনা বাড়ী খুবুব বাসা টাকা ভাঙ্গায় দু' দু' পয়সা,
ন' ন' মাসে ন' ন' টাকা আমরা পাইলাম ছয় টাকা
টাকা দেও বাড়ী যাই বাঘের বয়ান এলা[5] গাই।
কুলার বউ—কুলার বউ ॥

["তৎপরেই বাঘের গান গাহিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেক কথা অশ্লীলও আছে, তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলি নিম্নে প্রকাশিত করিলাম"]

আর বাঘ—আর বাঘ ॥
এক বাঘ চৈত্তা[6] বাওন মাইর‍্যা[7] নিল পৈতা।
আর বাঘের গলায় দড়ি সারা আট লড়ালড়ি।[8]
আর বাঘ চৈ চৈ গোয়াল মাইর‍্যা খাইল দই।
আর বাঘের বাপেপুতে গাছে উঠ্যা গায়ে মুতে।
আর বাঘ অটট্যা[9] গোয়ালের দই খাইল লুইট্যা।[10]
আর বাঘেরা দিল লাফ ঐ ব্যাটা বুড়ীর বাপ।
আর বাঘের গলায় কাঁটা চাউল দিবা পাচবাউট্যা[11]।
না দিও যদি কাউলকা আইমু[12] বইকা[13] তোমাগো উদ্ধার করমু ॥[14]

জন্মেজয়, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মধ্যে প্রচলিত। পিঠা খাইবার পূর্বে বাস্তুদেবতার নামে উহা প্রত্যেক গৃহের কোণে কোণে পুতিয়া রাখার নিয়ম।"

১ এখানে 'আদেশ' অর্থে ২ যষ্টি ৩ উঁচু ৪ বেনে বাড়ী ৫ এখন ৬ চিত্রিত, চিতা বাঘ ৭ বামুন মেরে ৮ দৌড়াদৌড়ি ৯ "সম্ভবতঃ হটিয়া" ১০ লুটে ১১ বটুয়া। চাল রাখবার জন্যে বেতের তৈরি পাত্র বিশেষ ১২ কাল আসব ১৩ ব'কে ১৪ প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩১৯। পৃ. ৮৪-৮৯)।

৬০

॥ পৌষ-সংক্রান্তির ছড়া, পাবনা-রাজশাহী ॥

ক. ছত্তর ছত্তর সোনারায়ের চেলা আলো[1] এক বছর আন্তর[2]।
সোনারায়ের চেলা দেখে যে করিবে হেলা
তার দুই পায়ে গোদ বারাবে চখে বারাবে[3] ঢালা।
সোনারায়ের চেলা দেখা যে করিবে হেলা
তার কোলের ছেলে কারে নিয়া দিবে যম জ্বালা।

খ সাজ্‌ না গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই,
ডাক্ দে রে তোর ছিদাম বলাই কানু প্রাণের ভাই—বল,
সোনারায় উঠিয়া বলে মাণিকপীর[4] রে ভাই,
গোয়ালা নগরে চল দেখা করে যাই—বল,
সাজ্‌ না গোঠে রাখাল ভাই চল মাঠে যাই—
ডাক দেরে তোর ছিদাম বলাই কানু প্রাণের ভাই,—বল।

["এই প্রকার প্রত্যেক পদের সঙ্গে—"সাজ না গোঠে রাখাল ভাই" ইত্যাদি হইবে"]

গ সোনারায় সোনারায় মুখে চাপ দাড়ি
হেলিতে দুলিতে গ্যালা গোয়ালাজির বাড়ী,

"ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় মুসলমান বালকেরা পৌষ মাসে উৎসব করিয়া থাকে। পৌষ মাসের প্রত্যহ সন্ধ্যার পরেই মুসলমান বালকেরা দল বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া ছড়া আবৃত্তি করে। সঙ্গীতের সুরের মত এই আবৃত্তিরও এক রকম সুর আছে। এই বালকদলের নাম "কুলার বউর দল"। প্রত্যেক বাড়ী উপস্থিত হইয়া সব প্রথমেই সমস্বরে "কুলার বউ" "কুলার বউ" বলিয়া দুইবার উচ্চরব করিয়া উঠে। যে ব্যক্তি দলের সর্দার সে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রত্যেক পংক্তি গোড়ায় গাহিয়া দেয়, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য সকলেই সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে।" ..

"৩০শে পৌষ তারিখে বালকগণ সকল বাড়ী হইতে চাউল দাউল অথবা পয়সা সংগ্রহ করিয়া কোনও জঙ্গলের মধ্যে সমবেত হয়। জঙ্গলের কতক জায়গা পরিষ্কার করিয়া সেখানে রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করে। এইরূপ ভোজনকে তাহারা "জোলাভাতি" (চড়িভাতি) বলিয়া থাকে।"

১ এলো ২ অন্তর ৩ বের হবে ৪ মূলে আছে 'মাণিক পিড়' বানান। অন্যান্য স্থলে 'পীর' 'পিড়' রূপে লিখিত।

গোয়ালাজি, গোয়ালাজি, দধি আছে ভাঁড়ে ?
ঘোষ নাই, বাথানে গ্যাছে দধি নাই ভাঁড়ে।
কুবুদ্ধি গোয়ালার নারী কুবুদ্ধি ঘটিল,
ছিকার উপর দধি থুয়া পীরকে ফাঁকি দিল।
ধম, ধম, বলে রে পীর জিগির ছাড়িল১
শয়ানেতে ছিল কানু কাঁদিয়া উঠিল।
ঘরে মরে গোয়ালা, বাথানে মরে গাই
পালে পালে মরে ধেনু লেখা জোখা নাই।
কান্দে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া নোটা২
ধেনুর বদলে ক্যান না মরিল ব্যাটা।
কান্দে রে গোয়ালার নারী হাতে নিয়া দাও
ধেনুর বদলে ক্যান না মরিল মাও।
আগে যদি জানি বাছা তুমি এমন পীর
আগে দিতাম দধি, দুধ, পাছে দিতাম ক্ষীর।
সোনাপীর উঠিয়া বলে মা নকপীর রে ভাই,
গোয়ালা নগরে চল দৃষ্টি দিয়া যাই।
সোনার ছাটি দিয়া জ্বালাল বাতি
সাতদিনকার মরা ধেনু পাড়ে লোটাপুটি খায়।"

১ ছাড়িল — [illegible] আছে ২ দৌড়াদৌড়ি করে (কৃষ্ণমোহিনী দেবী : পৌষ সংক্রান্তি, প্রবাসী ১৩৩২ [illegible]। পৃ. ৬০০)।

"পাবনা ও রাজসাহীর পল্লীগ্রামে এক উৎসব [পৌষ-সংক্রান্তির উৎসব] আছে। পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ পৌষমাস কৃষক বালকেরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী নিম্নলিখিত ছড়াগুলি [সে গুলোই ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] গাহিয়া বেড়ায়। বালকদের মধ্যে যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাহার হস্তে বংশদণ্ডের অগ্রভাগে সোনার ফুল বাঁধা থাকে এবং ছড়াগুলির প্রত্যেক চরণ সে প্রথমে গাহিয়া যায়।...

"অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ছড়াগুলিও ভিন্ন প্রকারের হয়। সংক্রান্তির

৬১

॥ সোনারায়ের মাগনের ছড়া, নদীয়া ॥

হরিবোল হরিবোল,
সোনারায়ের ভার এল বাড়ির ভিতর।
বল ভাই শিবো,
এক কাঠা চাল ন'টা বড়ি নিবো ॥
যে দেবে ছালা ছালা,
তার হবে সাত গোলা।
যে দেবে কাঠা কাঠা
তার হবে সাত বেটা।
যে দেবে বাটী বাটী,
তার হবে সাত বেটী।
যে দেবে মুঠো মুঠো
তার হবে হাত ঠুঁটো।[১]

পূর্বদিন বালকেরা সকল বাড়ী হইতে প্রাপ্য সংগ্রহ করে এবং সংক্রান্তির দিন উহারা মাঠের মধ্যে আহারাদি আমোদে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। ঐ দিন হিন্দু বালক ও যুবকেরা মাঠের মধ্যে 'বাস্তুপূজা' করিয়া আহারাদি আমোদ প্রমোদে কাটায়। ঐ দিন ভোরে বালকেরা নিজ নিজ বাড়ীর গরুগুলিকে স্নান করাইয়া কপালে তৈল সিন্দুর দিয়া পরে পিষ্টক আহার করায়। মহিলারা ভোরে স্নান করিয়া প্রাঙ্গণগুলি আলিপনাদ্বারা সজ্জিত করে ও নানা প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদিগকে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পিষ্টক খাইতে হয়। ঐ সঙ্গে মেয়েদের পিষ্টক-প্রস্তুত-প্রণালী ও আলিপনার সমালোচনা হয়।"

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য "এই প্রকার ছড়া আর অল্পদিন পরেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং উহা সংগ্রহ করিবার এই সময়। যিনি যতদূর পারেন ইহা সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকিলে এইগুলি সংরক্ষণের উপায় করা হইবে।"

১ দীনেন্দ্রকুমার রায় পল্লীবৈচিত্র্য (তৃতীয় সং: চৈত্র ১৩২৯। প্রথম সং আশ্বিন ১৩১২, পৃ. ১১০-১১১)। "৩০এ পৌষের প্রভাত হইতে না হইতে পল্লীবাসী গোয়ালা, কৈবর্ত, জেলে, বাগ্দী প্রভৃতি শ্রমজীবী

৬২

। 'আড় বাঘের' ছড়া, বিক্রমপুর ।

আড় বাঘ আড় বাঘ
আড় বাঘ হৈ-হৈ
গোয়াল মাইরা খাইলাম দৈ,
আড় বাঘ অরকা
নিল বুড়ীর চরকা।
আর বাঘ হইরা
গোয়ালা মাইরা খাই ক্ষীরা ॥[১]

গাঁয়ের ছেলেরা তাহাদের 'আনকোরা' ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হই । এ তাহাদের সখের ভিক্ষা। প্রত্যেক দলে এক জন একটা ধামা লইয়া চলিয়াছে, আর দলের অবশিষ্ট সকলের হাতে এক একগাছি কাঁকি। এই কাঁকি বহুসংখ্যক সুপক্ক টাটকা লঙ্কা মরিচে পরিবেষ্টিত, সূতা দিয়া সেগুলি কাঁকের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহারা এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক সুর করিয়া বলিতেছে, - সকলে সমস্বরে এই ছড়া বলিয়া ভিক্ষা আদায় করিতেছে।'

'সাধনা' পত্রিকায় 'পৌষ সংক্রান্তি' (মাঘ, ১৩০১। পৃ ২৫৫-২৬২) নামে দীনেন্দ্রকুমার যখন এই রচনাটি প্রকাশ করেন তখন মন্তব্য ছিল, "আহারাদি শেষ হইতে না হইতে একদল চাষার ছেলে খুব আয়োজন করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিল, । এই ভিক্ষা লইয়া আজ ইহারা সকলে মিলিয়া প্রফুল্ল মনে 'পোয়ল' করিবে। পৌষের শেষদিন এই ভিক্ষা গ্রহণের নিয়ম। "

নদীয়া জেলায় এই প্রথা প্রচলিত বলে তিনি জানিয়েছেন।

১ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৩৫। পৃ. ৬১৮)। নিবারণচন্দ্র জানিয়েছেন, বিক্রমপুরে 'জাগ গানে'র অঙ্গরূপে এই ছড়া বাড়ী-বাড়ী কথিত হয়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের রাতে কৃষক শ্রেণীর মুসলমান বালক ও যুবকেরা দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী 'কুলাইবড' ছড়া বলে। "এই ছড়াটির সঙ্গে উহারা আর একটি ছড়াও গাহিয়া থাকে [।] তাহার নাম 'আড় বাঘ'। আমরা দেখিয়াছি, পূর্বে উহারা শুধু প্রথমোক্ত ছড়াটিই গাহিয়া ক্ষান্ত হইলে প্রাচীন বৃদ্ধারা গৃহাভ্যন্তর হইতে "আড় বাঘের" ছড়াটিও গাহিতে আদেশ করিতেন। তখন উহা গাহিত। আড় বাঘের ছড়াটি প্রথমোক্ত ছড়া

অপেক্ষা একটু অশ্লীল ভাষায় রচিত, তাই বোধ হয় গৃহস্থদের আদেশ না পাইয়া উহারা এই ছড়াটি আবৃত্তি করিতে সাহস পাইত না। এই ছড়াটি এখন খুবই কম শুনিতে পাওয়া যায়।... এ ছড়াগুলির কোন অর্থ করা সুকঠিন। এই সকল ছড়া গাহিয়া উহারা যে চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে তাহা দ্বারা সকলে মিলিয়া বন-ভোজন বা পিকনিক্ করিয়া থাকে।"

সুধীরকুমার সেন 'প্রবাসী' (আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৮৬৫) পত্রিকাতেই এ বিষয়ে আরো তথ্যের যোগান দিয়েছেন। এতে তিনি জানাচ্ছেন, জাগ গানের মতোই এক শ্রেণীর গান ত্রিপুরা জেলাতে চলিত আছে, তাকে বলে 'বাঘের মাগন'। মাঘ মাসে তা অনুষ্ঠিত হয়। " পূর্বে যখন সমস্ত দেশ জঙ্গল পূর্ণ ছিল, বাঘ এবং মানুষকে প্রতিদিন প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, তখন গ্রামবাসিগণ নানা ছড়া গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত ও সমবেতভাবে বাড়ী বাড়ী পাহারা দিত।" অতঃপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ-প্রকাশিত "ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষা" নামে বই থেকে বাঘের মাগনের একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন

গাও, গাও রে ভাই, বাঘের পাচালী।
পঞ্চকোটি ঝি-পুত লইয়া নামছে বাঘিনী॥
পঞ্চকোটি ঝি-পুতের তের কোটি ছাও,
ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া উঠে লক্ষীন্দরের নাও।
লক্ষীন্দর, লক্ষীন্দর, কি কাজ করিলা,
মাঘ মাসের তের দিন চাউল কড়ি মাগিলা।
চাউল কড়ি দিতে বেটী যেবা করে হেলা
দুই চোখ খাইব তার ঠিক দুপুর বেলা।
দুই চোখ খাইয়া বেটী আন্দি কুন্দি ভাই,
হাইএর কান্ধে দিয়া বাগ, গোয়াল বাড়ী যাই।
গোয়ালের সাত পুত নূতন কামেলা,
আরাগুড়া টাঙ্গা মরে মেড়ার চামড়া।
মেড়ার চামড়া নয় রে, ডাঙ্ দিল বাড়ী,
যতকিছু মেড়ামেড়ি উঠ্যা নড়ানড়ি॥

৬৩

(বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতির ছড়া, বর্ধমান)

শোন শোন ধনী রাধা বিনোদিনী,
বৃষভানু[১] রাজা-সুতা
বেলা থাকা-থাকি[২] জলে গিয়েছিলে,
এতক্ষণ ছিলে কোথা ॥
সঙ্গীর সহচরী কাঁকালেতে কুম্ভ করি'
কেথায় আইল তারা
আমি মনে জানি, রাধাবিনোদিনী
কুল মজাইল পাড়া ॥
ভালো জলে গেলি গো রাধে
করিয়ে সুবেশ
ভিজে কেন লো গায়ের বসন
এলো কেন কেশ ॥[৩]

৬৪

[illegible] বর্ধমান

শোন শোন সবজন, করি নিবেদন।
কৈলাস মন্দিরে সতীর গমনাগমন ॥
সপ্তমী অষ্টমী নবমী করিলাম বাস।
বিদায় কর গো মাতা যাবো কৈলাস ॥
মেনকা বলেন মাগো কি কথা কহিলি।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে কেন মেলি[৪] ॥
মা হয়ে মা কেমন করে করি গো বিদায়।
নিদারুণ কথা মা তোর সহ্য নাহি হয় ॥
মেনকা বলেন মাগো বিদায় না করিবে।
তোমার পাগল জামাই এখানে আসিবে ॥

১ বৃষভানু ২ বেলা থাকতে থাকতে ৩ তরুণ কুমার মাজিল্যা (কুড়মুন বর্ধমান)।

৪ মারলি।

এখানে আসিয়ে তিনি করিবেন বিবাদ।
পাড়া-প্রতিবেশী হেসে মেটাবেন সাধ॥
শুনিছি[১] মা পরম্পরে জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
ভিখারীর ঘরে আমি পাঠাব না তোমারে॥
তাই যদি জানো মাগো, তাই যদি জানো।
ভিখারীর ঘরে বিয়ে দিয়েছিলে কেন॥
ভিক্ষে করা চাল আমাদের অমূল রতন।
সেই চালের অন্ন প্রভু করেন ভক্ষণ॥
এই কথা শুনে রানী দুঃখিত হইলেন।
খই-দই ভোগ দিয়ে বিদায় করিলেন॥
পাড়া-প্রতিবাসী কাঁদে, কাঁদে গো রাজরানী।
যার মায়াতে জগৎ কাঁদে, কাঁদিলেন তিনি॥
চোক্ষে[২] জলে বক্ষ ভিজে, বসন ভিজে যায়।
গিরিরানী বসন দিয়ে নয়ন মুছায়॥
মহাদেবের কাছে গিয়ে হইল মিলন।
হর-গৌরীর নামে বল হরি-হরি সবজন॥[৩]

৬৫

জাত-ভাটির মাগনের ছড়া, ঢাকা।

জোলা যায় রে বাঁশ কাটিতে, হস্তে লইয়া দাও।
বাঁশের ছোপেতে[৪] যাইয়া দেখে, খেঁকশিয়ালের ছাও
খেঁকশিয়ালের ছাও না[৫] দেইখ্যা লইয়া আইলা বাড়ী।
জুলানী কয়, ওরে জোলা, এডা আনছস কী?
জোলা কয়, ওরে জুলনী, জামাই আইন্যাছি।
খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া জামাই থুইল মাথার তলে
রাত্রি না দুপুরের কালে হুয়া-হুয়া করে॥
হুয়া-হুয়া শুইন্যা জোলা গেল নয়ার হাটে।[৬]

১ শুনেছি ২ চক্ষু ৩ তরুণ কুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)।

৪ ঝাড়েতে ৫ নিরর্থক, অব্যয় পদ ৬ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ হাট। গো-মহিষাদির ক্রয়-বিক্রয় হয়।

দশ টাকার গোফ জোলা বিশ টাকা কয়
হাটেয়া মাইনষে[১] তারে লাথ্‌খি-গুঁতা দেয় ॥
লাথ্‌খি-গুঁতা খাইয়া জোলা জলে দিল ঝাঁপ।
ইচা মাছে[২] লাথ্‌খি দিয়া ভাঙল জামাব[৩] দাঁত ॥[৪]

৬৬

[illegible]

জোষ্ঠিনো-আষাঢ়ো মাসে ঝাঁকে চলে মাছ।
শাখে যায় রে স্নান করিতে, কানাই লাগল পাছ ॥
বাঁশিটি থুইয়া কানাই নামল নদীর ঘাটে।
অকলে ছাঁপিয়া বাঁশি, বাঁশি নিল বাঘে।
বাঁশিটি হারাইয়া কানাই গেল গোয়ালপাড়া।
অগো গোয়ালের ঝি, বাঁশি নিছস্ তরা।

১ হাটের মানুষ ২ চিংড়ি মাছ ৩ সম্মুখের ৪ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (দীর্ঘগ্রাম, জয়কৃষ্ণপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা সদর)।

'চড়ুইভাতি'কে ঢাকা জেলার অঞ্চল বিশেষে বলে 'ডালা-ভাত'। খাল-নালাকে 'জোলা' বলে। রাখাল বালকেরা অগ্রহায়ণ পৌষ-মাসে, নতুন ধান ওঠার পর, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ওপরের ছড়াটি আবৃত্তি করে (একটু সুরের আভাসসহ) বাড়ী-বাড়ী ধান-চাল পয়সা-কাড় মাগে। তাই দিয়ে খাল-নালার পাড়ে 'চড়ুই ভাতি' করে।

এই ছড়ার কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা মেলে অধ্যাপক আলমগীর জলীল সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (বাঙলা একাডেমী ঢাকা। চৈত্র, ১৩৭০) বইতে (পৃ.৩৩)। তিনি এটিকে 'কাহিনী বিষয়ক ছড়া' বলেছেন। সেটি এই, বাঁশ কাটিতে গেল রে জোলা হাতে কইর্যা দাও,/বাঁশের তলে পইড়া পাইল খেঁকশিয়ালের ছাও/একদিন থাকে দু'দিন থাকে করে হয়া হুয়া/তার পরের দিন খুলে দেখে বড় বড় রোঁয়া/জোলানি দেখিয়া বলে ওটা ভালা কী?/চ'ক করে[১] খাক খাইতায় বেটী জামাই পেয়েছি/সেই কয়া খাইয়া জোলা হ'ল বড় বীর,/মুরগীর উপর সওয়ার হইয়া ব্যাঙকে মারে তীর।

১ চুপ করে।

আমরা নেই নাই বাঁশি, কইয়া দিতে পারি।
অকলে ছাপিয়া বাঁশি, বাঁশি নিছে রাখি ॥[1]

৬৭

পৌষ-সংক্রান্তির সংঘটনা-মূলক ছড়া, ফরিদপুর ॥

ভক্তিভরে শুন সবে করি নিবাদন,[2]
মহিম বাবুর গুণির[3] কথা শুন বিবারণ[4]
মহিম বাবু ছান[5] করেন শানবান্ধা ঘাটে
হান্‌কালে[6] চাপরাসী আইসে[7] রসিদ[8] দিলেন হাতে।
হাতে দিলি[9] রে হাতকড়া পায়ে দিলেন বেড়ি
(মহিম বাবুরে) ঠেল্‌তি ঠেল্‌তি নৈয়া চলল[10]
ফইরাদপুরির বাড়ী[11]।
মহিমবাবু ডাইকা[12] বলেন ওসমান রে ভাই,
গাড়ী ভইরা[13] আন্‌বে টাকা খালাস হইয়া যাই।
গাড়ী ভইরা আন্‌ল টাকা খালাস না রে পাইল
ঠেল্‌তি ঠেল্‌তি মহিম বাবুরে ম্যাদে নিয়া চল্‌ল।
মহিম বাবুর মায়[14] কান্দে হাতে নিয়া দৈ—
তোমরা সবে আইলা আমার সোনার মহিম কৈ।
মহিম বাবুর বুনি[15] কান্দে রাজপথে দাঁড়াইয়া—
আর বুঝি আইল না দাদা ফুলকোচা ঢুলাইয়া[16]
মহিম বাবুর বউ কান্দে পালঙ্কে শুইয়া—
আর বুঝি আইল না স্বামী সীতাসিন্দুর নৈয়া[17]।
খোপে কান্দে খোপ কবুতর, জলে কান্দে হাঁস,
বারবারি-দরজায়[18] কান্দে সোনার গুলাইল বাঁশ[19] ।[20]

১ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (দীর্ঘগ্রাম, জয়কৃষ্ণপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা সদর)।

২ নিবেদন ৩ গুণের ৪ বিবরণ ৫ স্নান ৬ হেনকালে ৭ এসে ৮ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা (warrant of arrest) ৯ দিলেন, দিল ১০ ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে চলল ১১ ফরিদপুর শহরে ১২ ডেকে ১৩ ভরে ১৪ মা ১৫ বোন ১৬ ঝুলিয়ে ১৭ সীঁথির সিঁদুর ১৮ বাড়ীর বাইরের দরজায় ১৯ "পক্ষী মারিবার উদ্দেশ্যে বংশ নির্মিত অস্ত্র বিশেষ, গুলতি ধনুক" (এই ব্যাখ্যা সঠিক বলে মনে হচ্ছে না) ২০ নলিনীনাথ দাসগুপ্ত : পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬০২)।

৬৮

১ পৌষ-সংক্রান্তির পিঠে ভাজার ছড়া, নদীয়া ।

উনানে পিঠে কোলে
'কান্টা'য়[২] শিয়াল কোলে ।[১]

"তণ্ডুল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের কৃষকশিশুগণ পৌষ মাসের সন্ধ্যাকালে দ্বারে দ্বারে যে সকল ছড়া গাহিয়া বেড়ায়, তাহারই একটী ছড়া প্রেরণ করিতেছি। বাল্যকালে যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখন এই ছড়াটি ঐ শহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কৃষক বালকগণ কর্ত্তৃক বহুবার গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। ছড়াটী কোনও সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল অথচ নামগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। ছড়াটী এই" [সেটি পরে উদ্ধৃত হয়েছে, সং ৬৭]

এই ছড়াটির প্রসঙ্গে রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ফরিদপুরের গ্রাম্য ছড়া" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ ২১২-২১৩) নামে একটি প্রতিবাদমূলক পত্র লেখেন। হরেন্দ্রনাথের মন্তব্য এই "নলিনী বাবু যেখানে যেখানে "মহিম বাব" লিখিয়াছেন সেখানে সেখানে "ললিত বাবু" হইবে এবং "ওসমান ওরে ভাই" না হইয়া "ঈশান ওরে ভাই" হইবে।"

"ফরিদপুর সদরের অন্তর্গত মাণিকদহ ইতঃপূর্বে বেশ একখানি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ছিল। এই পল্লীতে জমিদার ৺মহিমচন্দ্র রায় ওরফে মহিমবাবু বাস করিতেন। ইনি শরিকী বিবাদের ফলে তাঁহার জ্ঞাতি ললিত বাবু কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে হত হন। ৺ললিতবাবু ৺মহিম বাবুকে হত্যা করিয়া পুলিসের চক্ষু এড়াইয়া বহুদিন পলাতক ভাবে কলিকাতায় নাকি কোন্ জমিদার ভবনে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন—পরে সেখানে ধৃত হইয়া ফরিদপুরে আনীত হন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ছড়াটি রচিত হইয়াছিল—প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে।"

১ ঘরের আনাচে-কানাচে ২ দীনেন্দ্র কুমার রায়: পল্লীবৈচিত্র্য (তৃতীয় সং চৈত্র ১৩২৯। প্রথম সং আশ্বিন ১৩১২), পৃ. ১২০। "পিঠে ভাজা শেষ হইলে একখানি পিঠে আস্তাকুঁড়ে শৃগালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইল, আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্য সরা সমেত সংরক্ষিত হইল।"

৬৯

বরিশালে পৌষ-সংক্রান্তিতে 'নলিয়া' পূজার ছড়া।

ক. বাস্তুপূজো আরম্ভ হবার পূর্বে পূজাস্থান পরিষ্কার করতে এবং ফুল তুলতে তুলতে স্বর্গের হাড়িকে এই ভাবে আহ্বান করে

স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া, রে।
মর্ত্তে নামিয়া[১] খোলা[২] চাচ্যা[৩] দে
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা খোলা চাচ্যা দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া, রে।
মর্ত্তে নামিয়া ছড়া ঝাঁট দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ছড়াঝাঁট দে।
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া, রে।
মর্ত্তে নামিয়া ফুল তুল্যা[৪] দে।
বাস্তুদেবী খাইবেন পূজা ফুল তুল্যা দে।

খ. আয়রে নলিয়া/ অস্তি[৫] ঘোড়ায় চড়িয়া॥
অস্তি ঘোড়ায় কি কাজ করে / রাজার মায়না[৬] খাইয়া মরে॥
রাজার বাড়ী হাজার বাসা/ তা দেখ্যা[৭] ওড়ে হাঁসা
হাঁসা ওড়ে দিয়া যোড়া/ পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া॥
ও পায়রা তরাসিয়া[৮]/ লোয়ার[৯] বাইগন তরাসিয়া॥
লোয়ার বাইগন সকল পথে/ লিখ দেও আন্যা[১০] লক্ষ্মীর আতে॥[১১]

৭০

মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া। পূর্ববঙ্গ

ক কুয়া[১২] ভাঙ্গি কুয়া ভাঙ্গি আচলার[১৩] আগে,
সকল কুয়া গেল বরই[১৪] গাছটির আগে

১ মর্ত্তে নেমে ২ পূজার স্থান ৩ চেঁছে ৪ তুলে ৫ হস্তী ৬ মাইনে, বেতন ৭ দেখে ৮ ত্রাসিত হয়ে ৯ লোহার ১০ এনে ১১ সুরেন্দ্রনাথ সেন: পৌষ-সংক্রান্তি (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২১৩)।

১২ কুয়াসা ১৩ "পূর্ববঙ্গে ঘরের চালের নিম্নভাগকে আচলা বলে । এইখানে সর্বাগ্রে সূর্যরশ্মি পড়িয়া কুয়াসা ভঙ্গ হয়। বালিকাগণ তাহারও আগে কুয়াসা ভাঙ্গিতে উঠিয়াছে এবং এই সময় কুলভরা গাছ দেখিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" ১৪ কুল।

দে দে বরই গাছটি ভরসা দে,
ছয় কুড়ী ছয়টা বরই লিখিয়া দে।
লিখিতে পড়িতে একটা হ'ল উনা,
কেটেকুটে ফেলা লো শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা না লো নদীয়ার পিতল।
কতকাল থাকবো আমরা বত্তের ভিতর!
বত্তের ভিতর নানা বরন জলে,
পাড়া ভরে লো জয় জোকার[1] পড়ে।
আমরা জয় দেব না লো যোকাড়[2] দেব,
সোনা দুইটা ভাই বোন কোলে তুলে নেব।

খ. চোখমুখ ধোবার ছড়া-গান :

চ'খে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?
সজনা মজনা দুটি ফুল লাগে।
ও পাড় থেকে জিজ্ঞাসে মালী,
কি কি ফুলে মুখ পাখালি?
ভাই এনে দিয়েছে সরষার ডালি
তাই দিয়ে আমরা মুখ পাখালি।
যে জল ছোঁয় না লো কাগে আর বকে,
সে জল ছুঁই আমরা দূবার আগে।
সরস্বতী জিজ্ঞাসেন কি বর মাগে।
পাশা খেলিয়া জিনিলাম কড়ি :
তাই দিয়ে কিনিলাম কপিলেশ্বরী।
কপিলেশ্বরী গাই কি বা ঘাস খায়,
পুকুরের চারি পাড়ের দূর্বা খায়।
কি দিয়ে পালবো আমরা বাইজের ঘরের পুত।
বাইজের[3] ঘরের পুত না লো বেড়ার মাটি,
ব্রতীদের ভাই বোন লোহার কাঠি।

১ জয়কার ২ হুলুধ্বনি ৩ "সম্ভবতঃ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের উপাধি"।

গ. সূর্যের উদ্দেশে :

উঠ সূর্য উদয় দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া।
সূর্য উঠে কোন খান দিয়া ?
বামুন বাড়ীর কাছ দিয়া
বামুন মেয়ে বড় সেয়ান,
পৈতা যোগায় বেয়ান বেয়ান।
পৈতার ঘোলা জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মালিনী হাসে।
হাসিস না লো মালিনী তুই আমার সই,
মাঘমণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট ভূঁইমালী বাড়ীর কাছে,
রাত পোহালে ভূঁইমালী-মেয়ে কোদাল ধোয় তাতে।
কোদাল ধোয়া জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে বামুন ঠাকরুণ খলখল হাসে।
হাসিস না লো বামুন মেয়ে তুই আমার সই,
মাঘমণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট মালী বাড়ীর কাছে,
রাত পোহালে মালিনী বুড়ী ফুল ধোয় তাতে।
ফুল ধোয়া ঘোলা জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মালিনী মেয়ে খল খল হাসে।
হাসিস না লো মালিনী তুই আমার সই,
মাঘমণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাবো কই।
আছে আছে লো ঘাট নাপিত বাড়ীর কাছে,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত আমরা করবো সেই ঘাটে।

ঘ. দূর্বা দিয়ে খেলবার জাল তৈরি ক'রে

রাইলদের পুকুরে ফেলিলাম জাল,
তাতে উঠল না কিছু মাছ।
মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে উঠল রাঘব বোয়াল।

পেয়েছি পেয়েছি মাছ নেবে কে ?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে, খালুই হাতে ক'রে।
থাক থাক বামুন মেয়ে, আপনি নেব ধ'রে।
যেমন তেমন করে।
এনেছি, এনেছি মাছ, কাটবে কে ?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে বঁটী হাতে করে।
থাক থাক বামুন মেয়ে আপনি কাটব
যেমন তেমন করে।
কুটেছি, কুটেছি মাছ, ধোবে কে ?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে জলের ঘটী নিয়ে।
কুটেছি, কুটেছি মাছ রাঁধবে কে ?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে কড়াই হাতে করে।

৭ ভাইদের প্রতি আশীর্বাদ, পিতার সৌভাগ্য কামনা

সরকা মুড়ুম, কাটুম কুটুম, মুঠে ধরি মাজা,
ভাইটি আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা।
দধীশ্বর দধীশ্বর বাপ, ভাই আমার লক্ষেশ্বর,
বারটি কেটে পাটটি পেলাম
তার শত্রু দুই নাগ কেটে দিলাম।

৮ মাটির তৈরী পুতুলের (নাম—শালা) বিয়ে

হালা ধ'র, মালা ধ'র, তুলে ধরি ছাতি।
শিব শঙ্কর বিয়া করে গৌর পার্বতী[1]।
আর গৌরীকে ডাক দিয়া,
যুঁথি মালতীর তলা দিয়া,
যুঁথি মালতীর নাই ফুল,
গৌরীর মাথায় দীঘল চুল।
এপাড়া ওপাড়া কিসের বাদ্য বাজে ?
রাজার বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে।
সাজ সাজ রে বাইল মাথায় মুকুট দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দর কন্যা তুলে দিব বিয়া।

১ "এক প্রকার সুতা"।

সাজ সাজ রে রাইল পায়ে নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দর কন্যা তুলে দিব বিয়া।

ছ. পথ, ঘাট, বৃক্ষ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে
আমরা পূজি ঘাট
আমাদের হবে সোনার পাট।
আমরা পূজি পথ
আমাদের হবে সোনার রথ।
আমরা পূজি মান্দার
আমাদের বাপ ভায়ের ঘর ধানে চাউলে ভাণ্ডার।

জ ঘাট থেকে উঠোনে এসে, আলপনার কাছে বসে
মাঘমণ্ডল, মাঘমণ্ডল,
সোনার কুণ্ডল, সোনার কুণ্ডল,
মাঘমণ্ডলের কোটে ঢেলে ঘি
আমরা হব বড় মানুষের ঝি।
মাঘমণ্ডলের কোটে ঢেলে মধু
আমরা হব বড় মানুষের পুত্রবধূ।
আমরা পূজি মেটে কোট
আমাদের হবে সোনার কোট।
আমরা পূজি মেটে আয়না,
আমাদের হবে সোনার আয়না।
আমরা পূজি মেটে চিরুনী,
আমাদের হবে সোনার চিরুনী।
আমরা পূজি মেটে কৌটা
আমাদের হবে সোনার কৌটা।[১]

১ শতদলবাসিনী বিশ্বাস-জায়া "মাঘ মণ্ডলের ব্রতকথা" : (ভারতী অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। পৃ. ৩৭৫-৩৭৮)। 'মেয়েলী সাহিত্য' (প্রতিভা শ্রাবণ, ১৩১৮। পৃ. ২১৫-২২০। ভাদ্র, ১৩১৮। পৃ ২৪৭-২৫১) নামে একটি দীর্ঘ ও সচিত্র নিবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মশাইও মাঘমণ্ডলের ব্রতের ছড়া সঙ্কলিত করেছেন। তাঁর 'ঠান্‌দিদির থলে' বইতে এই ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে বলে এখানে তা আর উদ্ধৃত হলো না।

৭১

[শীতব্রতের মাগবনের ছড়া]

১. পিঁথিম গেলা ভাসিয়া
নুই বড় কক সিংহাসনে বসইয়া ॥

[এই বলে বসবার অঙ্কিত আসনে একটি ফুল দিতে হয়]

২. চাঁদ পূজু চান্দনে, সূর্য পূজু বন্দনে
থাল, ঝাং, ভিঙ্গার, পানি
ক্রমে ক্রমে আয়বাণী ॥

[অঙ্কিত চন্দ্র, সূর্য, থালা ও ভৃঙ্গারে এই ছড়া বলে ফুল দিতে হয়]

৩. পিঁথিম্ পূজি তিন কোণ, রাজা পূজি সমকোণ,
এরে পূজইতে পাইমু বর, বিষ্ণুপুরী মোর ঘর ॥

[ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রে ফুল দিয়ে এটি বলতে হয়]

৪. ক মাগ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল,
বাপ রাজা, ভাই পঞ্জা ॥

[চতুর্দিকে রেখাঙ্কিত স্থানের মধ্যেকার পুরুষ মূর্তিগুলোকে এক-একটি ফুল দিয়ে এটি বলতে হয়]

খ আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িত্ কাটা
ক্রমে ক্রমে ভাইব বাটা ॥

[বেগুন গাছ ও গুঁড়ো দিয়ে তৈরি বেগুনাকৃতি মণ্ডলে ফুল দিয়ে বলতে হয়]

গ. আট পূজ আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর ॥

[আয়তক্ষেত্রের বর্গগুলোতে ফুল দিয়ে বলতে হয়]

৫. তিন কুণ্ডলী পূজু মুই, তিন রাজ পূজু মুই।
আগে পূজু বাপের রাজ দুধে-ভাতে খাইয়া,
তারপর স্বামীর রাজ মইচ্ছে-মাংসে খাইয়া
তারপর-পুত্রের রাজ ঘিরতে-ভাতে খাইয়া ॥

[একত্রীকৃত তিনটি কুণ্ডলীতে পূজা করতে হয় এই বলে]

৬. মুই দিনু গুঁড়ির সাড়ী
মোর লাগি থাউক পাটের সাড়ী ॥

[বিভিন্ন অলঙ্কার ও সাড়ী পূজো করতে হয় এই বলে]

৮. ঢেউ দুয়ার, ঢেউ দুয়ার, পূজি' উঠি স্বর্গ-দুয়ার ॥

[রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রের নীচে পুরুষ মূর্তিগুলির মাঝখানের জায়গায় ফুল দিয়ে এই বলে প্রণাম করতে হয়]

৫. দূর্বার গুচ্ছ দিয়ে জল আলোড়নের ছড়া .

আভাঙ্গিলা পানি ফুটি ভাঙ্গু[১] রে,
মাই-বাপুর রাজকিনি[২] পূজু রে।
মাই-বাপে দিয়া পাঠাইলা চাম্পা ফুলের ডালি,
তারে দিয়া মুখকিনি পাখালি।[৩]
ছলে না চলে লক্ষীর জলে[৪]
ল ল সুরুযাই ল ল পানি।[৫]
লেখিয়া-জুখিয়া (সাতকুরা পানি)
সাতকুরা পানি মোর সাত ঢালে[৬] যায়
এককুরা পানি মোর বাইছালি খালায়[৭]।
বাইছালি খালাইতে রে ফুটি আইলু কাঁটা
ঘাইটুবিলা কর রে সুরুযাই বেটা।[৮]
এক হাত ঘাইটবিলা আর হাত তৈল,
(তেনকালে সুরুযাই নাইবারে গেল)
নাইয়া-ধুইয়া রৌদ্র দিলা পিঠ,
তাতে পড়িয়া গেলা বরমার দিঠি।[৯]
বরমা সাত ভাই পানিরে যাইতে,
কুরুয়ার[১০] ডাক শুনি কুর উঠি আইতে।[১১]
থাক্ থাক্ কুরুয়া ভাঙ্গড়িমু[১২] তোর বাসা,
কাইল কেনে আইলে না সপ্তমীর দশা।

১ অনালোড়িত জলটুকু আলোড়িত করি ২ রাজ্যটি ৩ তাই দিয়ে মুখখানি ধুই ৪ কোনো ছল বা কৌশল করে লক্ষীরূপ জলে চল যাই ৫ হে সূর্য, জল নাও ৬ সাত দিকে ৭ 'বাইছ খেলে,' অর্থাৎ আন্দোলিত হয় ৮ হে সূর্য, তুমি গ্রন্থিস্থিত খিলা দিয়ে ঘষে, কাটা-বেঁধা ক্ষতস্থান সুস্থ কর ৯ তাতে ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়ে গেল ১০ মাছ-খেকো পাখি বিশেষ ১১ কূলে উঠে আসতে ১২ ভেঙে ফেলব।

সপ্তমী-অষ্টমী নায়ে পড়ে কুয়া,[১]
(মাঘাইর বরতী[২] ভইন[৩] পাত্থর কুয়া)।
মাঘ মাস ভরিয়া মাঘাইর সেবা।
দেউল পূজি দেউলেশ্বর, মোর বাপ-ভাই লক্ষেশ্বর।

৬. 'উদ' (অকারান্ত উচ্চারণ) পূজোর ছড়া

গাইয়ে গুবরী উঠানে মণ্ডলী,
উঠ উঠ শালতা শৃয়াল চলিতা
শৃয়াল চল রে উদ পূজায়।
উদ পূজিলে অন্ন না যায়,
শিয়াল ডাকতে চাউল না খায়,
কাকে ডাকতে ঘুম না যায়।[৪]

৭১

[illegible]

ক লো লো সুরুযাই লো ভূবের পানি,
শিখিয়া লো পুঁকিয়া লো সাত বোল পান,
সাত বোল পান না রে এক বোল সোনা
এক বোল সোনা না রে লাডিয়াব পিত্তল,
দেওয়া দিয়া যাইব কর বাড়ীর ভিতর,
বাড়ীর ভিতর না রে হাটুগুড় পানি
ফাটে দিয়া আইলাম সুবাইবে সাত বৈল পানি।

খ. ফুল দেওয়া শেষ হলে ফুলের নাম করে ছড়া

গেন্দা ফুল রে সকল ফুলের রাজা তুমি
ডাল মেলিয়া দাও।

গ. নানা ধানের নাম করে ছড়া

আমুন ধান্যের বড় বড় ছড়া
লো লো সুবাই ফটিক ছড়া,...

১ কুয়াশা। ২ ব্রতী ৩ বোন ৪ শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী সঙ্কলিত : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪। পৃ. ৪৫-৬৯)-থেকে উদ্ধৃত । স্তবক ও বানান আমাদের।

ঘ. পুকুর ঘাট থেকে ফিরবার সময় ছড়া :

সুরুষ উঠে রক্ত হৈয়া বামুন ঘরে পিড়া চাইয়া,
বামুন ঘরের বৌ খুন্দতি মাগ্যা আনলাম চাউলের কচি
চাউলের কচি শাইলের ভাত সূর্যে না খায় শুধা ভাত,
সুরুষ ভাত খাও আইয়া কাপড় বানাইয়া দিমু,
সুরুষ ভাত খাও আইয়া —রস্যা ডোড়া দিয়া

ঙ. "তদনন্তর অনশনে তণ্ডুলচূর্ণ, আবীর প্রভৃতি নানা বর্ণের চূর্ণ দ্বারা প্রাঙ্গণে বঙ্কিমচন্দ্র-সমন্বিত সূর্য মণ্ডল, ধান্যবৃক্ষ, বস্ত্রালঙ্কার, ঘোটক প্রভৃতি অঙ্কন করিয়া পরে বর্ণিত ছড়াগুলি দ্বারা "ব্রত পূজিয়া" থাকে।"

মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী
খাল পাট ভৃঙ্গারের পা ন,
জনমে জনমে আয়রাণি,
চান্দ পূজি চন্দনে সুরুয পূজি চন্দনে,
চান্দ পূজ্যা ঘরে যায় সুরুয পূজ্যা দুধভাত খায়,
উত্তল ঘোড়া নকল ঘোড়া বোল বোনের ঘোল ঘোড়া,
তেল কলসী হাতে ঘি কলসী মাথে
পরথম পুতে করে কায পরথম বৌ ভোগে রাজ,
মুই পূজ্যা আইলাম শ্রী কৈলাস।
মামায় দিল পুষ্করণী ভাইয়ায় দিল পার
সোণ্ডয়া পক্ষে পানি খায় দেখ রে সংসার।

দোলায় আইলাম দোলায় গেলাম
মার বাড়ীত গিয়া ঘি ভাত খাইলাম
উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা

দিবত হাত কর্পূর মাত, পূজিলাম শ্রী কৈলাস।
এ ঘরে কে জাগে নীলাবতী তারা জাগে
জাগে তারা— মাগে বর
খুজ্যা আনলাম পুতের বর
শাস্ত্র শান্তি রটে ভাতন্তি।[১]

১ শশিভূষণ দত্ত : প্রবাসী (ফাল্গুন, ১৩১৮। পৃ. ৪৯৩-৪৯৪)।

৭৩

মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, বিক্রমপুর।

ক. উঠ উঠ সূর্য্যিমামা ঝিকিমিকি দিয়া
বামুন বাড়ীর পূব দিক দিয়া,
আইস আইস সূর্যি মামা আমাগো বাড়ী আইস
আমাগো উঠানে রৌদ ছড়াইয়া বইস।
বড়শি বাইতে গেলাম পুকুইরে[১] আজ
রাগল বোয়াল পাইলাম মাছ।
পাইলাম পাইলাম কুটব কে?
ওরা[২] আইল কুটনী দা হাতে কইর‍্যা
অগ[৩] দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে কুটলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
কুটলাম কুটলাম রাঁধবে কে?
ওরা আইল রাঁধুনী কড়াই হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে রাঁধলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
রাঁধলাম রাঁধলাম খাইব কে?
ওরা আইল খাওনী থাল হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে খাইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
খাইলাম খাইলাম কাঁটা কুড়াইব কে?
ওরা আইল কাঁটা কুড়ানী গোবর হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
কুড়াইলাম কুড়াইলাম থালা ধুইব কে?
ওরা আইল থাল ধুয়নী জল হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া
নিজে ধুইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।

১ পুকুরে ২ অন্য যে কোনো লোক ৩ ওদের।

খ. মাঘ মণ্ডল—সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইল্যা[১] ঘি
আমরা বড় মানুষের পুত্রের ঝি।
(পুনঃ) মাঘমণ্ডল—সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইল্যা মধু
আমরা বড় মানুষের পুত্রের বধূ।
(প্রণাম) সূর্যি ঠাকুর প্রণাম
পূরে যেন মনস্কাম।
সূর্যি ঠাকুর বৈঠ,[২] বৈঠ, বৈঠ ॥[৩]

১ ঢেলে ২ বোসো, বোস ৩ প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩১৯। পৃ. ৮৬)।

"এখানে [বিক্রমপুরে] বালিকাদিগের মধ্যে "মাঘমণ্ডলের ব্রত"ও প্রচলিত আছে। পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে মাঘমাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া বালিকাগণ পুকুরের ধারে আসিয়া বসে। হাতে এক মুঠা দূর্বা লইয়া জল সিঞ্চন করিয়া গানের সুরে ছড়া আবৃত্তি করে।"...

"তৎপরে বালিকাগণ পুকুর হইতে বাড়ীতে আসিয়া মাটিতে গোলাকৃতি "আঁক" কাটিয়া তাহাকে লাল নীল সবুজ রঙ্গের গুঁড়ি দ্বারা চিত্রিত করে। যে বালিকা যত বৎসর ধরিয়া ব্রত আরম্ভ করিয়াছে, সেই বালিকা ঐ রূপ ততটী "আঁক" কাটিবে। সেই আঁকের ঊর্ধ্বদিকে একটী সূর্য এবং নিম্নে একটী অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করা হয়। সকলগুলিকেই ঐরূপ চিত্রিত করা হয়। সকলের নিম্নে ব্রতকারিণীর বসিবার আসন অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। সেই আসনে বসিয়া ফুল হাতে লইয়া ব্রতকারিণী নিম্নলিখিত ছড়া কহিয়া সেই আঁক পূজা করিয়া থাকে। এই ছড়া গানের সুরে বলিতে হয় না, শুধু আবৃত্তি করিয়া যায়।" ..

"এই ব্রত পাঁচ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। সেই বৎসর ব্রত সম্পূর্ণ হয় (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়) সেই বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন চন্দ্র সূর্য বিশিষ্ট পূর্ব কথিত গোলাকার "পঞ্চমণ্ডল"কে অতি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়া পূজা করা হয়।..."

৭৪

(মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, পূর্বময়মনসিংহ)

ক. সূর্যোদয়ের সময় দূর্বা হাতে নিয়ে কাক-বককে এই বলে জল দেওয়া হয় :

কাকে না ছুঁইতে বকে না ছুঁইতে
ছুঁইলাম ছুঁইলাম দূর্বার আগে
দূর্বা সরস্বতী কি বর মাগে
আইবর ভাইবর বিয়ার বর মাগে।

[এই ছড়া বলতে বলতে দীঘির জল নাড়তে হয়, পরে দূর্বা জলে ফেলে দিতে হয়। প্রত্যেক দিন নতুন দূর্বা নিতে হয়। কাক-বককে জল দিয়ে ফল ভাসাতে হয়। সাত দিনে সাত রকম ফল দিতে হয়]

খ. ফল ভাসাবার ছড়া :

সুশীলা আইতে সুশীলা যাইতে
কইও চিত্রগুপ্তের মায়ে
বার বছর পরে ফলটা পাঠাইয়া দেয়।

[ব্রতের প্রথম সাতদিন নিরামিষ খেতে হয়। অষ্টম দিনে ফুল-পাতা দিয়ে সাজিয়ে ভেলা ভাসাতে হয়। অন্যান্য দিনে মণ্ডল এঁকে পূজো করতে হয়]

গ. পূজোর মন্ত্র-ছড়া :

(মণ্ডল স্পর্শ করে) : মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী
থালে ভাতে ভৃঙ্গারে পানী
জন্মে জন্মে এয়োরানী।

(চাঁদে হাত দিয়ে) : চান্দ পূজি চন্দনে
(সূর্যে হাত দিয়ে) : সুরুজ পূজি বন্দনে
চাঁদ পূজিয়া ঘরে যাই
সুরুজ পূজিয়া ঘি ভাত খাই।

(উদয়ে হাত দিয়ে) : উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা
ঘৃত-ভাত কর্পূর হাত
মুই পূজি উদয় হাত ॥

(খাটে হাত দিয়ে) : খাটে আইলাম, খাটে গেলাম
বাপের বাড়ী গিয়া দুধ ভাত খাইলাম ॥

(পুষ্করিণীতে হাত দিয়ে) . মামায় দিল পুকরিণী ভাগিনায় দিল পাড়
সোয়া পাখী পানী খায় দেখ রে সংসার ॥

(পানে হাত দিয়ে) · পান গঙ্গাজল গুয়া ঋষিফল
তারে খাইয়া বর্তী[১] বইনে[২] বর্ত কর ॥

আমি পূজি গু'ড়িব শাড়ী আমার লাগিয়া আইব[৩] পাটের শাড়ী
" " " আয়না " " " আভের আয়না
" " " কটুয়া " " " কাঠের কটুয়া
" " " কাঁকই " " " হাড়ের কাঁকই
" " " মচকা " " " কাঠের মচকা
" " " শাঁখা " " " শঙ্খের শাঁখা ॥

খড়মে . পুষ্করমে দিয়া পাও স্বামীর ঘরে চলে যাও ॥

পাজি : পাজি পুঁথি পাজীশ্বর, বাপ ভাই লঙ্কেশ্বর ॥

ত্রিকোণা : তিন কোণা পৃথিবী যায় ভাসিয়া
মুই বর্তীর বর্ত করি সিংহাসনে বসিয়া ॥

কুরাল[৪] . ওরে ওরে কুরাল, ডালে তোর বাসা
খালে তোর আশা
মুই বর্তীর গু'ড়ি খাইতে তোর বড় আশা ॥

তালগাছ : তাল পূজি তালেশ্বর, বাপ ভাই লঙ্কেশ্বর ॥

ঘোড়া : উতল ঘোড়া নকল ঘোড়া
ষোল ভাইয়ের ষোল ঘোড়া
তেল কলসী হাতে, ঘি কলসী মাথে
প্রথম পুতে করে কাজ
প্রথম বউ ভোগে রাজ
অন্তকালে শ্রীকৈলাস ॥

১ ব্রতধারিণী ২ বোন ৩ আসবে ৪ কুরর পাখি।

ঘ. দূর্বাগুচ্ছ দিয়ে সূর্য প্রণামের মন্ত্র-ছড়া :

নও সূর্যাই নও তোমার পানী
সেখিয়া ভূলিয়া ছয় কুড়ি পানী
ছয় কুড়ি পানীর মধ্যে এক কুড়ি উনা
উনা সোনা ভরিয়া দিলাম মেঘের কানের সোনা।
মেঘের কানের সোণা না রে নাড়িয়া পিত্তল[1]
ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিলাম[2] বাড়ীর ভিত্তর[3]।
বাড়ীর ভিতর নারে আড়ু গাড়ু পানী
তাত্তেকা[4] দিয়া আইলাম সূর্যের পানী।
সুরুজ ঠাকুর, সুরুজ ঠাকুর দিয়া যাও বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর॥

ঙ. সাত দিনের সাত নক্ষত্র ও সাত উদয় পশ্চিম দিকে এঁকে পূজো করতে হয়। তার মন্ত্র-ছড়া.

উদয় পূজি অর্থ না জানি
সন্ধ্যা হইলে ভাত না খাই
গোয়ালে গাই-গরু বাঁধি
ঘৃত-ভাত কপূর হাতে
মুই পূজি উদয় হাতে॥

(চাঁদে হাত দিয়ে) : চান্দ পূজি চন্দনে
(সূর্যে হাত দিয়ে). সুরুজ পূজি বন্দনে।
(নক্ষত্রে হাত দিয়ে) : ওরে ওরে তারা তুই মোর সাক্ষী ঘৃত মাখি পঞ্চ গ্রাসী
এই ঘরে কে জাগে তারা বালি[5] ফু ভইন[6] জাগে
জাগে বালি মাগে বর খুঁজিয়া লইলাম বিয়ার বর।
শাস্তা শাস্তি বাড় ভাতস্তি মাইল পুতস্তি
তারা পূজিয়া ঘরে যাই যে বর মাগি সেই বর পাই॥[7] :

১ খেলো পেতল ২ ফেলে দিলাম ৩ ভেতর ৪ তার থেকে ৫ বালিকা ৬ ফু বোন ৭ শ্রীমতী—দাসী : কুমারী ব্রতের স্মৃতি : মাঘমণ্ডল (সৌরভ মাঘ, ১৩২০। পৃ. ১৩৩-১৩৫)। "এখনও আমাদের পূর্ব-ময়মনসিংহের অনেক পরিবারের মেয়েরা এই সকল ব্রত করিয়া থাকে।"

৭৫

॥ 'মাঘব্রতে'র ছড়া, দক্ষিণবঙ্গ ॥

ক. এক জল ভাঙ্গি আমরা কাগে আর বগে,
আর জল ভাঙ্গি আমরা দূর্বার আগে ॥
ডুবুল ডুবুল সরস্বতী নড়ে না চড়ে
গিরিরগো ঝি বৌ শিত্তিরে মরে ॥[১]

খ. জলে পিঁড়ি ভাসাবার ছড়া :
আম কাঁঠালের পিড়িখানি গঙ্গাজলে ভাসে,
সেই পিড়িতে আমার ভাই, বাইল ঠাকুর বসে ॥
বাইল গেল ভাসে
ভাই আলো হাসে ॥

গ. সূর্যের জাগরণের ছড়া :
উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
—না উঠিতে পারি আমি নিশিরের লাগিয়া ॥
নিশিরের পঞ্চবটী শিয়রে রাখিয়া,
সূর্য উঠ্‌বেন কোনখান দিয়া ?
বামন বাড়ীর ঘাটখান দিয়া ॥
বামনের মেয়েটি বড় স্যায়ান,
পৈতা যোগান বিয়ান বিয়ান ॥

ঘ. সূর্যের বিয়ের জন্যে কনে দেখার ছড়া :
বাওন ঘরে দুটি মেয়ে মেলে দেছে কেশ।
তা' দেখে সূয্যি ঠাকুর বেড়ান দেশ দেশ ॥
বাওন ঘরে দুটি মেয়ে শুয়ে আছে খাটে।
তা দেখে সূয্যি ঠাকুর নাও লাগালেন ঘাটে ॥
বাওন ঘরে দুটি মেয়ে মেলে দিছে শাড়ী।
তা দেখে সূয্যি ঠাকুর বেড়ান বাড়ী বাড়ী ॥

১ সঙ্কলক ফরিদপুরে প্রচলিত এই সময়ের ছড়ার তুলনা করেছেন : যে জল ছোঁয় না লো কাগে আর বগে / সে জল ছুঁই মোরা দূর্বার আগে ॥ / দূর্বা দূর্বা সরস্বতী নড়ে আর চড়ে, ' নড়িয়া চড়িয়া কি বর মাগে ? / সাত সতীনের পায়ে পড়ে।

যাওন ঘরে ছুটি মেয়ে মলখাড়ু পায়।
তা দেখে শষ্যি ঠাকুর বিয়ে করতে যায়॥[১]

ঙ. শূর্বের বিয়ের ছড়া :
নাড়া বনে কাড়া বাজে / লোকে বলে কি?
শষ্যি ঠাকুর বিয়ে করে / রাইল ঠাকুরের ঝি॥
বিয়ে করলে শষ্যিঠাকুর / ব্যাভার পাইল কি?
ব্যাভার পাইলাম আমড়ার আঁঠি / গামছা হারাইছি॥

চ. চিত্রিত 'কোঠে'র সম্মুখে 'রাইলে'র মূর্তি নিয়ে ছড়া :
এবার বড় মাঘ মাস তাতে বড় কুয়ো
আম গাছটি বলইছে ভালো / ডালে ডালে শুয়ো॥
ছ'বুড়ি ছ'টি আম পালাম / তার একটি গেল পোকা।
তা' দিয়ে কেনব আমরা / রালির কাণের সোনা॥
রালির কাণের সোনা না লো / লড়িয়ার পিতল।
আছে আছে লড়িয়ার পিতল, / ঐ আমাদের বেস্তের পিতল॥[২]

ছ. পিতা-ভ্রাতা ও নিজের সৌভাগ্য কামনা করে ছড়া :
কাটে কুটে ফেল্‌লাম / খরকো মুটমের মাজা
আই কাটে ভাই পালাম, / ভাইয়ের শত্তুর দুই নখে কাটলাম।

মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল,
সোনার কুণ্ডলে ঢেলে ঘি,
আমরা হলাম বড় মানুষের ঝি॥
সোনার কুণ্ডলে ঢালে মৌ।
আমরা হলাম বড় মানুষের বৌ॥

১ 'সকাল বেলায় মুখ প্রক্ষালন বিষয়ে নানারূপ প্রশ্নোত্তর ফরিদপুরের মেয়েদের ব্রত-ছড়ার মধ্যে প্রচলিত আছে"। ওপারেতে ভিগায় মালি, কি কি ফুলে মুখ পাখলালি? / কাল দিছিলাম শর্ষার ডালি সেই সেই ফুলে মুখ পাখলালি? / পশ্চিম পাড়ে মালির ঝি জাগো নি। / আমারগো ফুলের ডালা রাখো নি। / হাতে কলসী কাঁকে পোলা, / কেমন করে রাখুম পদ্মফুলের ডালা ২ ফরিদপুরের ছড়া : লাড়ো ফেরে বাড়ী বাড়ী / হেদে রে লাড়ো তোর পাকাদাড়ী॥ / দধির সর দধির সর / ভাইটি আমার রাজা।

সোনার কুণ্ডলে চালে বালি
আমরা হলাম বড় মানুষের শালী।
সূর্যি পূজি দিবাকর
চন্দ্র সমান মিলুক বর।[১]

৭৬

॥ হেঁচড়া পুজোর ছড়া ॥

হেঁচোড়া ঠাকরুণ লো ক্যাটোড়া চুল।
তাতে কি শোভা লো গাঁদা ফুল।
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া।
পাড়া পড়সী লো জয় জোকার দিয়া।
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোনার যাদুধন কোলে তুলে নেব।[২]

৭৭

॥ ঘেঁটুর চাঁদার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥

আলুর মালুর চালুর
চাল গুচ্চেং[৩] দাও গো—
না হয় খোস গুচ্চেং নাও গো।[৪]

১ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় : দক্ষিণবঙ্গের মাঘব্রত · (বঙ্গলক্ষ্মী ভাদ্র, ১৩৪৬। পৃ. ৫৬৯-৫৭১)।

২ রজনীকান্ত গুপ্ত . (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : মাঘ, ১৩০১। পৃ. ১৯২) (পাদটীকা)।

"··· মাঘ মাসে কোন কোন প্রদেশে হেঁচোড়া ঠাকরুণের পূজা হইত।··· বাড়ীর উঠানে কুলগাছ পুতিয়া, ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলি একমাস কাল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা কোমল কণ্ঠে ছড়া গাইয়া হেঁচড়া পূজা করিত।···"

ভাষা দেখে এটিকে পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয়।

৩ গুচ্ছের ৪ ফাল্গুন-সংক্রান্তির দিন ঘেঁটু (বা ঘণ্টাকর্ণের) পুজো হয়। এক ডেলা গোবরের মধ্যে কড়ি বসিয়ে এবং সিঁদুর মাখিয়ে একটি সরা বা খোলা চাপা দিয়ে ঘেঁটুর মূর্তি গড়ে, ঘেঁটু ফুল দিয়ে পুজো করে, লাঠির আঘাতে তা চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলা হয়। কিশোরেরা তারপর যায় বাড়ি-বাড়ি চাল-কড়ি চাইতে। সংগৃহীত চাল ভেজে খেলে খোস-পাঁচড়া হয় না। তুলসী দাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : ফাল্গুন, ১৩৬৬)।

৭৮

[পাগলা পীরের পূজার টাকা চাইবার ছড়া, জলপাইগুড়ি]

পাগেলা পীরের নিমাস্তে বোলো আল্লা[১]।
খুছনী বজার[২] বড়য় বিষ—
ফাইক্ করি' চাইট্টা ভিকা দিস্।
ইকা করে টোঁচত্-টাড়াত্
ছিলিমের পুরুটিত্[৩] ছাই।
এই বাড়ীর ভিক্ষা পাইলে
অইন্ন বাড়ী যাই॥[৪]

৭৯

[ছিবচনী অর্থাৎ শুবচনীর ছড়া, কোচবিহার]

দেওয়ায়[৫] করে মেঘ মেঘালি
তলাত্ পুবাল বাও[৬]।
ভর আঙিনাত্[৭] পূজা করে
ছিবচনীর মাও[৮],
ছিবচনীর গুয়া খায়য়া
ফ্যালেয়া দিলেক[৯] পিক্।
দক্ষিণ বাড়ীর মাও এলা[১০]
হাবেয়া ফেলাইল্[১১] দিক।
নয়া কইনা, নয়া বর
দুই-জোগাবে[১২] ছিবচনী মাওর
আতি[১৩] ঘর কর্॥[১৪]

১ কথান্তর : কালীপীরের নামস্তে ভুল্লালা ২ ছোটো বোল্ভাব। কথান্তর ভাঙ বল্লার ৩ কথান্তর : কটিত্ ৪ কালীনন্দন ভট্টাচার্য (জমিদার পাড়া, জলপাইগুড়ি)।

৫ আকাশে, মেঘে ৬ তলে 'পুবাল' বাতাস ৭ মধ্য আঙিনায়, গোটা আঙিনা জুড়ে ৮ শুবচনী মায়ের ৯ ফেলে দিল ১০ এখন ১১ হারিয়ে ফেলল ১২ জোগার অর্থাৎ 'উলু'র সহচর শব্দ ১৩ রাতি, রাত ১৪ কোচবিহার জেলার অংশ বিশেষে চলিত।

৮০

॥ নীলকুল বাসুদেবের ব্রতের ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥

ক. যখন যেমন তখন তেমন
ডাক বলে হয় কেমন
খেতে বারি খেতে যায়
আগুন আন গে পুইয়ে বত্তাই ॥

খ. বাপ গেল আনে
মা গেল বনে
শোন, গাঁ-কোটালে, দুটি কানে ॥[১]

৮১

॥ চড়কের ছড়া-গান, খুলনা ॥

ক. বড়ো প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা-দিগম্বর।
বউ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর ॥
উমারাণী সতীরাণী, বলেছে—করব নাকো স্বামীর ঘর।
বড়ো প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা-দিগম্বর ॥

খ. আমায় বড়ো ছায় দাগা।
সারা রাত কি পাগ্‌লা নিয়ে
যায় গো মা জা'গা?
সারা রাত মা সিদ্ধি ঘুঁটি
ছুতে খায় মা বাটি-বাটি।
কেমন করে ঘর করি বল্
নিয়ে এ ন্যাংটো নাগা?[২]

১ নীলকুল বাসুদেবের ব্রতকথা (ভারতী · পৌষ, ১৩০৭। পৃ. ৫০২-৫০৭)।

২ শুভ্রা বসু (সাতক্ষীরা, খুলনা)।

চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন 'নীলে'র পুজো করা হয়। 'নীল' অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শিব। এই দিন শিবের সঙ্গে 'লীলাবতী'র বিয়ে হয়। চড়কের দিন সং সেজে সে বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের নানা দিক নিয়ে ছড়া-গান গাওয়া হয়। বালক-বালিকাদের শিব-দুর্গা সাজিয়ে গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে নিয়ে গিয়েও এই ছড়া-গান গাওয়া হয়। ওপরের দুটি ছড়া-গানে সেই প্রসঙ্গই আছে। গান ও ছড়া এগুলিতে মিশে গেছে।

৮২

॥ বারোমেসে ষষ্ঠীর ছড়া ॥

ক. বাটীর তেলে মাথা ভরা
বাটীর সিন্দুরে মাথা ভরা
বাটী ম'লে সেবা করবে কে ?

খ. যে শোনে যে করে যে কয়
তার এম্নি হয় ।[1]

৮৩

॥ জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পূজা-মন্ত্রের ছড়া ॥

১. শালশিরি মহারাজার[2] পূজোর মন্ত্র :

ওঁ হিন্দ গোবিন্দ, নীলবরণ চক্র, সুবরণ (বর্ণ) চক্র, দেবচক্র আসনকর । খাট বাট সিংহাসন, তাহারি উপর শালশির মহারাজা আসন কর, ফল্নার উপর ছত্র ধর ।

২ বলির মন্ত্র

সোনার বলি হীরার ধার, এই বলি গেল শালশিরি মহারাজা তোমার দুয়ার , এই বলি হাত কর, ভক্তের উপর ছত্র ধর ।[3]

১ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় · ষষ্ঠীব্রতের কথা (ভারতী . আশ্বিন, ১৩০৫ । পৃ. ৫১৮-৫২২) । প্রথমটি ষষ্ঠীব্রতের কথার অন্তর্ভুক্ত ছড়া , দ্বিতীয়টি কথার শেষে বলতে হয় ।

২ "সাকার নিরাকার দুই ভাবেই ইহার পূজা হইতে পারে । সাকারে ইহার ধূমপানরত মনুষ্যমূর্তি, নিকটে ব্যাঘ্র ; প্রহরী না থাকিলেও চলে । দেখা যাইতেছে, ইহার সহিত কালাকাটার অতি নিকট সম্পর্ক । জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সময় এবং নদীতে কাঠ ভাসাইবার সময় শালশিরি মহারাজার পূজা হইয়া থাকে । যাহারা বনে গোরু মহিষ চরায়, তাহারাও শালশিরির পূজা করে । সময় সময় বিনা পুরোহিতেও পূজা হইয়া থাকে । পূজার দিন শনি মঙ্গলবার ।" ৩ আশুতোষ বাগচী : রাজবংশীদিগের কথা (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩১৮ । পৃ. ৪৮২-৪৮৬) ।

এই প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটি তুলনীয় : শলেশ্বরী মহারাজা, আজলদৈ, ফুলমতী গণেশ্বরী, নাশাতী, খপাতী, সহদৈ, মহাদৈ, রক্তি, শক্তি, ভুক্তি, সনারায়,

৮৪

॥ জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পূজা-মন্ত্রের ছড়া ॥

১. 'ফালাকাটা' দেবের[১] ছাগবলির মন্ত্র :

বাঘে ভালুকে নদীয়া লালা[২] ঝাড়ে জঙ্গলে ইলুয়াই কাশি[৩] চইলে যায় সে বলি ঘাসও খায় ঘাসও না খায়, সোনার বলি রূপার ধার,—সে বলি দিছু তোমার দুয়ার।

২. পায়রা বলির মন্ত্র :

হীরার বলি সোনার ধার, কবুতরের বলি তোমার দুয়ার। এই বলি হাত কর্, 'ফল্নার'[৪] উপব ছত্র ধর[৫]।[৬]

৮৫

॥ জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের পূজা-মন্ত্রের ছড়া ॥

১. তিস্তাবুড়ী[৭] দেবীব পূজার মন্ত্র

ধরতি[৮] ফাটে শিত্‌লি[৯] পিত্‌লি, মহামায়া তিস্তাবুড়ী, তাহার তলে শুয়ে থাক।

২ বলিব মন্ত্র :

মহামায়া শিত্‌লি পিত্‌লি, মহামায়া তিস্তাবুড়ী, এই বলি হাত কর, ফল্‌নার উপব ছত্র ধর। সোনাশায় তোমরা কি করেছেন নিশ্চিন্ত বসে,' পাঁচ বহিন তোমবা বলি লহ এসে।[১০]

উপরায়, বিপদাস, জগবন্ধু, জগন্নাথ।—'জনমত' পত্রিকা (জলপাইগুড়ি : শারদীয়া-সংখ্যা, ১৩৬৫)।

অধ্যাপক ডঃ গিবিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজেব দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ' (বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, জলপাইগুড়ি থেকে মুদ্রিত, প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই) বইতে (পৃ ১২২) এর কথান্তর দিয়েছেন : শলেশ্বরী মহামই[১], গায় গারাম[২] সন্ন্যাসী ঠাকুব, তিস্‌সালগুড়ি দেবতাগণ/সহাই আছেন[৩] বাবা।

১ মহামায়ী ২ গাঁয়েব গ্রামদেবতা ৩ সহায় রহুন, থাকুন।

১ "জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে এক পরগণাব নাম "আমবাড়ি ফালাকাটা"। ··ইহার নামেই পরগণাব নাম হইয়াছে। · ফালাকাটা উচ্চবেদীর উপর বসিয়া দক্ষিণ হস্তে গড়্‌গড়ার নল ধরিয়া সুখে ধূমপান করিতেছেন। বেদীর নিম্নে দুইটি ব্যাঘ্রমূর্তি ; ইহারা মুখব্যাদান পূর্বক ফালাকাটার দিকে তাকাইয়া আছে। ··ফালাকাটা অপুত্রককে পুত্রদান ও রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া

৮৬

* 'বারোমেসে ছড়া' সংকলন ঃ

আশ্বিনে—অম্বিকা-পূজা, পড়ে মোষ পাঁঠা।
কার্তিকে—কালিকা-পূজা, ভাই দ্বিতীয়া কোঁটা॥
অঘ্রাণে—নবান্ন, নূতন ধান কেটে।
পৌষ মাসে—পৌষ পার্বণ, ঘরে ঘরে পিঠে॥
মাঘ মাসে—শ্রী পঞ্চমী, বালকের হাতে-খড়ি।
ফাগুন মাসে—দোল-যাত্রা, ফাগ ছড়াছড়ি॥
চৈত্র মাসে—চড়ক সন্ন্যাস, গাজনেতে ভরা।
বৈশাখ মাসে—তুলসী-গাছে দেয় বসুধারা॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে—ষষ্ঠীবাটা, জামাই যত জড়।
আষাঢ় মাসে—রথযাত্রা, লোকের ভিড় বড়॥
শ্রাবণ মাসে—ঢেলা-ফেলা, খই আর মুড়ি।
ভাদ্র মাসে—টক-পান্তা খান মনসা বুড়ী॥[১]

থাকেন, 'বৈশাখ ও আষাঢ় মাস পূজার কাল" ২ নদী-নালা ৩ উলুখড় ৪ যে পুজো দিচ্ছে, তার নাম বলতে হবে ৫ রক্ষা করো ৬ আশুতোষ বাগচী, রাজবংশীদিগের কথা (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩১৮। পৃ ৪৮২-৪৮৬)।

৭ "দন্তহীনা যষ্টিহস্তে সম্মুখে অবনতা বৃদ্ধার মূর্তি। ইনিও পুত্রদান, রোগোপশম এবং রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন। শনি মঙ্গলবারে দিবাভাগে পূজা হয়। সময় সময় মূর্তি ব্যতিরেকেও তিস্তাবুড়ীর পূজা হইতে দেখা যায়।" ৮ ধরিত্রী ৯ শীতলা ১০ জলপাইগুড়ির উপভাষা লেখকের কলমে কিছু আধুনিকতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করি। আশুতোষ বাগচী, রাজবংশীদিগের কথা (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩১৮। পৃ. ৪৮২-৪৮৬)।

পূজা-মন্ত্রের এই ছড়াগুলি সঙ্কলনের উদ্দেশ্য হল, ছড়ার রচনাগত একটি বিশেষত্বকে নির্দেশ করা। এগুলিকে বলি গদ্যাত্মক ছড়া। যদিও অন্ত্যমিলের ক্ষীণ আভাস এগুলিতে আছে, তথাপি এর গদ্যবৎ রূপ এবং অন্যান্য ছড়ার মতো তার উচ্চারণ রীতি, দুটোই লক্ষ করবার বিষয়।

১ "সংগ্রাহক—শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়"। প্রবাসী (আষাঢ়, ১৩৩২। পৃ. ৩২৪)। "পল্লীপার্বণ" নামে মুদ্রিত। পাদটীকায় মন্তব্য, "বুড়ী দিদিমার মুখে এই ছড়া শুনেছি। এই কবিতাটির রচয়িতা কে তাহা আমার জানা নেই।" যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং) বইতে (পৃ. ২২৪) এই ছড়ার কথাগুলি মেলে।

৮৭

॥ দীপান্বিতা-অমাবস্যায় 'ধিন্দোল'-এর ছড়া, মেদিনীপুর ॥

আঁধারে আঁধারে এসো, জ'নে জ'নে[১] খেও
ধিন্দোলটি[২] খেও ।[৩]

আনুষ্ঠানিক ছড়া, দ্বিতীয় পর্যায় : কৃষিকর্ম ও কৃষিজীবন

৮৮

॥ গোরক্ষনাথের ছড়া, উত্তরবঙ্গ ॥

ঘরখানি মোর চিকিকিনি[৪]
গোরু কিনি' আনলু,[৫] দেখো নি ।
ঘাস খায়, পানি খায়—
আইল বগল যুঝি বেড়ায় ।[৬]
বিশকরম[৭] পুজিয়া
ধান গুনু আজিয়া ।[৮]

১ জ্যোৎস্নায়-জ্যোৎস্নায় ২ মেদিনীপুরে দীপান্বিতা অমাবস্যাকে বলে 'জালা অমাবস্যা'। এদিন পিঠে খেতেই হবে, নইলে 'গোকর্ণ ভোজনে'র পাপ হবে। নারকেলের 'পুর' দিয়ে 'ভাপা' পিঠে তৈরি করা হয়। "রাত্রি প্রায় প্রহরেকের সময় গৃহিণীগণ মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশে পুষ্করিণীর ঘাটে কিঞ্চিৎ পিষ্টক রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে এক একখানি 'পাকাটী কাটী' জালিয়া রাখিয়া আইসে। এই পিষ্টক 'ধিন্দোল্' নামে অভিহিত হয়। গৃহিণীগণ প্রত্যাগমন সময়ে প্রত্যেক মৃত আত্মীয়ের নামোচ্চারণ পূর্বক এক অদ্ভুত হাস্যকর 'ছড়া' বলিতে বলিতে আইসে। যথা" [তারপর ওপরের ছড়াটি লেখক সঙ্কলন করেছেন] ৩ তারকনাথ দাস. দীপান্বিতা অমাবস্যা (ভারতী : মাঘ, ১৩১১। পৃ. ১০০১-১০০৭)। 'ধিন্দোল' 'ধেন্দুলি' রূপেও স্থানে স্থানে উচ্চারিত হয়। ছড়াটি ভ্রমক্রমে যথাস্থানে সঙ্কলিত হয় নি।

৪ চিক্কন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৫ কিনে আনলাম ৬ শিং দিয়ে ধানের আল ও পার্শ্ববর্তী স্থানে যুদ্ধ করে বেড়ায় ৭ বিশ্বকর্মাকে ৮ রোপণ করে।

বিশ্‌কর্মে বিষাণ আছে
ঘরত্‌ বেটা খাড়ায় নাচে।
খাড়া নাচে আনন্দে ধান—
চোরের কাটো নাক-কান।
নাকে নথ, পইরণে খাড়ী[১]
বাইরাও রে গৃহস্থের নারী।
গারস্থ ভাই বিদায় দে—
সনার নাঙল বানেয়া নে।[২]
সনার নাঙল উপার ফাল
ঘরতে বেটা বউক হাল।
হাল খোউক, ফাল খোউক—
ঘরর্‌ চালত্‌ পেনাটি[৩] খোউক।
ওই দিয়া যাউক ঘরের পাছ
কাটিয়া আসুক কেলার পাত্‌।
গন্‌গনা ভাত[৪] ডাকানী গান্ধী[৫]
পূরিয়া উঠুক বুকের মাঞ্জি[৬] ॥[৭]

৮৯

॥ গোরক্ষনাথের আর একটি ছড়া, কোচবিহার ॥

হস্তা বে হস্তী
ধান খায় গন্‌নী।
গোরক্ষনাথক পূজিবা[৮] চাই ॥

১ পরণে শাড়ী ২ সোনার লাঙল বানিয়ে নে ৩ গোরু খেদাবার লাঠি ৪ সুসিদ্ধ, গরম ভাত ৫ পুরুষদের গায়ের বস্ত্র (?) ৬ বুকের মধ্যস্থল বা মাঝখানে ৭ উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস (ভাষা খণ্ড। জলপাইগুড়ি, ১৩৬১। পৃ. ১৬-১৭)। ফাল্গুন মাসে নতুন ধান ঘরে এনে, বাড়ী-বাড়ী ঘুরে চাঁদা তুলে গোরক্ষনাথের পূজো করা হয়। এটি সেই চাঁদা চাইবার ছড়া। গৃহস্থের দ্বারে এসে সকলে প্রথমে সমস্বরে বলে, 'বলো রে ভক্তে'। একজন একটি পদ প্রথমে সুরাত্মক ভঙ্গিতে বলে, বাকী সবাই তারপর সেটি বলে।

৮ পূজো করতে।

চাটা ভরা[১] গুয়া-পান
কুলা ভরা দেও ধান,
থাউক গৃহস্থের মান ॥…
হাইচাও[২]·রে ধেনী গাই
তোর পসাতে[৩] শুন-ভাত[৪] খাই।
আঁজুলে-আঁজুলে[৫] খই ছিটাই।
গোটা কতক কলা বাড়াই ॥[৬]

৯০

। গোরক্ষনাথের ছড়া, টাঙ্গাইল ॥

ক. "গোয়ালে রাখালেরা 'অব্বো' দিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল জিজ্ঞাসা করে" :

তোরা কে ?
আমরা গোরক্ষের রাখাল।
গিছিলি কোথায় ?
গাই বাছুর আশীর্বাদ করবার।
দেখ্‌লি কি কি ?
বার শ বলদ তের শ গাই।
বাছুর কত লেখা জোখা নাই।
ডেকরা গরু পারাইয়া[৭] মারল
ঝাপ খুইলা দে বাড়ীৎ[৮] যাই।

["এই উত্তর দিয়া গোয়ালঘরের রাখালেরা দরজা খুলিয়া বাহির হয়। উহারা বাহির হইতে আরম্ভ করিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল উহাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়। এইরূপে গোরক্ষের ধার শোধ হয়"]

১ ডালা ভরা ২ ? ৩ প্রসাদে ৪ ? ৫ অঞ্জলি করে ৬ কোচবিহারের বিশেষ অঞ্চলে চলিত।

৭ পা দিয়ে মাড়িয়ে ৮ বাড়ীতে।

খ. 'রণা'[১] :

১. রণা রণা হেচ্চ। ফুল্কো রণা হেচ্চ। ফুলের কড়ি[২] হেচ্চ
নয় নয় বুড়ি ,,। তাই দিয়ে কিনলায় ,,। কপিলেশ্বরী ,,
দুধ হয় কি ,,। হাড়ী হাড়ী[৩] ,,। অন্তে পানাইলে[৪] ,,
ছিট ফোটা[৫] ,,। গিরস্থে পানাইলে ,,। হাডী হাড়ী ,,
এক বানের[৬] দুধ ,,। গোরখে খায় ,,। এক বানের দুধ ,,
বাছুরে খায় ,,। এক বানের দুধ ,,। গিরস্থে খায় ,,
আর এক বানের দুধ ,,। পাইতা দই[৭] ,,। মইলা ঘি[৮] ,,
তাই দিয়া লাগাইছি মোমবাতি। হেচ্চ বল রাখালরা শাব শুবইব।

২. সাত পাচ রাখালে ভুইলা মাটি হেচ্চ।
হাট বসাইল সিন্দুইরা হাটি ,,
অরে অরে সিন্দুইরা ভাই ,,
আমার গোরখের সিন্দুর চাই ,,
তোমার গোরখে কেমনে চিনি ,,
হাতে নড়ী[৯] মাথায় টিক ,,
গাছের কুলে পারেন পিক[১০] ,,
পিক পাইরা পাইরা ভুইলা মাটি ,,
হাট বসাইল কুমাইরা হাটী ইত্যাদি।
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৩. শাব শুবইর শুব সাজে হেচ্চ।
কাণা কড়িটা ঝুনইর বাজে ,,
বাজে ঝুনইর বাজুক তাল ,,
এই গিরিহান[১১] জগত মাল[১২] ,,

১ "রণা শব্দের অর্থ নির্ণয় করা গেল না। ইহা গোরক্ষনাথের পূজার ইতিহাস ও মন্ত্র উভয়ই বলা যাইতে পারে। রণার সংখ্যা এগারটি। প্রত্যেক রণার শেষেই—'বল রাখাল সাব সুবইর'—এই কথা বলিতে হয়। 'সাব সুবইর'—অর্থ বুঝা গেল না" ২ কুড়ি ৩ হাড়ী হাডী ৪ অন্তে দোয়ালে ৫ ছিটে ফোঁটা ৬ বাঁটের ৭ পেতে দই ৮ তৈরি করে ঘি ৯ লাঠি ১০ অর্থ জানা যায় নি ১১ এই গৃহস্থটি ১২ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জগত মাজে রাণী ঘণী[১] হেচ্চ।
সোনাবান্ধা পাচখলী „
সোনা হে ভাক গুয়া „
মোর গোরখে খায় গুয়া „
গুয়া খাইতে লাগল চুন „
অমনি গেল বিক্রমপুর „
বিক্রমপুর পাইক পাড়া „
তিন ছয় আঠার ঘোড়া „
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝিব „
গোরখের ধার শুঝিব „
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৪. মালী বলে মুইন্‌সা[২] মোর কথা শোন্—
পরথম বৈশাখে পাট বোন্ „
যখন পাটে অঙ্কুর „
গোবক্ষনাথ ব্যাকুল „
যখন পাটে কর্‌ল গেড়া „
গোরখনাথ দিল বেড়া „
যখন পাটে কর্‌ল মাথি „
গোরখনাথ ধরল ছাতি „
যখন পাটে বাও খেলায়[৩] „
গোরখনাথ কাচি[৪] গড়ায় „
আগা ফালাইয়া[৫] গোড়া ফালাইয়া „
তার মাঝখানে জলে ফালাইয়া „
জলে ফালাইলে হইব কুইয়া[৬] „
ছায়ে লোয়ে[৭] লইও ধুইয়া „
ধুইয়া লইয়া দিও রৌদ্র „
পাট হইবে যোড়া চৌদ্দ[৮] „

১ ঘরনী (?) ২ মিন্‌সে (?) ৩ হাওয়া খেলে ৪ কাস্তে ৫ ফেলে ৬ পচে উঠবে (?) ৭ ছায়ায় নিয়ে (?) ৮ পরিমাণ বিশেষ।

পাট বলে মুই বড় বীর হেচ্চ
হাতী বান্ধুম[১] হাতী থির ”
গরু বান্ধুম গরু থির ”
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৫. বাঁশ বাঁশ আরাইলা বাঁশ[২] হেচ্চ
বাঁশের জন্ম কার্তিক মাস ”
গোরখ পেলেন হাতে দাও[৩] ”
বাঁশ কাটিল পুবের পাব ”
আগা ফালাইল নিল মালী[৪] ”
তাই দিয়া বানাইল ফুলের ডালি ”
গোড়া ফালাইল নিল মালী ”
তাই দিয়া বানাইল শলা আটী[৫] ”
হেটে নড়া উপরে দাও[৬] ”
নড়ী চাছে[৭] এই পাও[৮] ”
সোনার নড়ী বিফল গুণে ”
রাখাল ছোড়াইল গোরখে পুণ্যে ”
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৬ গোরখের রাখাল বজর বাটা[৯] হেচ্চ।
ভাইঙ্গা আইল[১০] কুশা কাটা[১১] ,,
গোরখের রাখাল বজর বাটা ,,
ভাইঙ্গা আইল ঢেউরা কাটা[১২] ,,
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৭. রাখালের মাথায় সোনার জটা হেচ্চ
খসাইয়া ফালাও কুশা কাটা ,,
বল রাখালরা শাব শুবইর।

১ বাঁধব ২ বিশেষ ধরণের বাঁশ ৩ দা ৪ মূল (?) ৫ এক আঁটি শলাকা ৬ নিচে লাঠি, ওপরে দা ৭ চাছে ৮ এই রকম ৯ বজ্র ব্যাটা (?) ১০ ভেঙে এল ১১ কাটা বিশেষ ১২ কাটা বিশেষ।

৮. এই গিরিহান উবয়নাট হেচ্চ। গরুএ করুল পুব ঘাট হেচ্চ
বল রাখলরা ··

৯. ধান কাটি কাটি হেচ্চ। পারাইয়া[১] নাড়া হেচ্চ
ই গায়েব আপদ যাইক[২] „ । উত্তর পাড়া „
বল রাখালরা ··

১০. উত্তর চকে হেচ্চ। বগা চরে হেচ্চ
চরুক বগা „ । পিউক পানি[৩] „
আজ গোবথের „ । নাড়ু বিলানি „
বল রাখালরা...

১১. আসল গোরখনাথ হেচ্চ। বসল পাটে হেচ্চ
হাতে হাতে „ । প্রসাদ বাটে „
বল রাখালরা···[৪]

১ পা দিয়ে মাড়িয়ে ২ এ গাঁয়ের আপদ যাক্ ৩ জল খাক ৪ রসিকচন্দ্র বসু: গোরক্ষনাথের পূজা (সৌরভ আষাঢ়, ১৩২০। পৃ. ২৮১-২৮৮)।

"বাঙ্গালার অনেক মন্ত্রে গুরু গোরক্ষনাথের 'দোহাই' আছে। এই 'দোহাই' হইতেই তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারা যায়।···সদাশিবের আজ্ঞার মত, গুরু গোরক্ষনাথের আজ্ঞা ও হাড়ীঝী চণ্ডীর আজ্ঞা, বাঙ্গালার স্থাবর, জঙ্গম, ভূত প্রেত, দৈত্যদানবেরা মানিয়া চলিত।"···

"গৃহস্থ ও রাখালের নিকট গোরক্ষনাথ গো-রক্ষা কারী দেবতা।··সুতরাং যাহার গাই আছে সেই গোরক্ষ-নাথের 'ধার' শোধ করে। বৈশাখ মাসে স্বীয় গাভীর দুগ্ধে ক্ষীরের লাড়ু করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ—যাহাদের গাই বিয়াইয়াছে —গোরক্ষনাথের ধার শোধ করে। গোরক্ষনাথের 'ধার' শোধই, গোরক্ষনাথের পূজা।···রাখালগণ ইহার পুরোহিত, 'হেচ্চ' ইহার বীজমন্ত্র।···সন্ধ্যাকালে পাড়ার সকল রাখাল বা কোন প্রাচীন কৃষক, গোরক্ষনাথের 'রণা' গাইতে থাকে [আসলে ছড়ার মতোই বলা হয়]। রণার এক একটি চরণ বলা হইলে সকল রাখাল সমস্বরে 'হেচ্চ' বলে। 'রণা'র পর নাচাড়ী গাওয়া হয় [এই নাচাড়ী অংশ বর্তমান ক্ষেত্রে সঙ্কলিত হয় নি] 'রণা' ও 'নাচাড়ী' গান সমাপ্ত হইলে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু গোরক্ষনাথের উদ্দেশে আড়াইধার মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।···অধিকাংশ রাখালই হাত দিয়া এই লাড়ু তুলিয়া লয়,

৯১

। গোরক্ষনাথের ছড়া, উত্তরবঙ্গ ।

আমবোলা[১] রে হরিবোলা
গোগোল বাড়ীত্[২] কাঁচাকেলা।
কাঁচাকেলার বড়ো পীর
লাউ ফলিছে গিরাগির্[৩]।
ফলুক কুমড়া থুমপুর
দেওয়ায়[৪] নামাইল্ হাতীর শুঁড়
হাতীর শুঁড়ে নামাইল্ পানি
শুকান্[৫] কাদো[৬] টানাটানি।
শুকান্-কাদো গেইল্ গাড়া
মাচা পাতেক ধান থয়া[৭]।
মাচাত্ না ধরে ধান
গটা চারিক ডেলি[৮] আন্।

কেহ কেহ চিং হইয়া পা ও হাতের উপর ভর করিয়া মুখ দিয়া এই ভূ-পতিত লাড়ু তুলিয়া থাকে। এইরূপে লাড়ু তুলিয়া লওয়ার নাম 'বাঁকের লাড়ু খাওয়া'।"

"লাড়ু খাওয়ার পর, একজন ব্যতীত সমুদয় রাখাল গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া 'অব্বো' দেয়। মুখ অল্প ফাঁক করিয়া 'অ-ও' শব্দ করিতে করিতে হাতের তালু দিয়া মুখের উপর আস্তে আস্তে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়, উহার নাম 'অব্বো'।..."

গোরক্ষনাথের 'ধার' শোধ করবার মন্ত্রগুলি যে ছড়াই, তার প্রমাণ রসিক চন্দ্র বসুরই অন্য একটি মন্তব্যে মেলে: "রাখালেরা এই আসনের সম্মুখে সারি দিয়া বসিয়া গোর্খনাথের মাহাত্ম্য-সূচক ছড়া গায়। এই ছড়াই এ পূজার মন্ত্র। একজন ছড়ার চরণগুলি বলে,—অন্যান্য রাখালেরা একযোগে প্রত্যেক চরণের পরেই "হেচ্চ" বলে"—রসিকচন্দ্র বসু: টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য (সৌরভ: কার্তিক, ১৩৩৪। পৃ. ২৪৩-২৪৭)।

১ 'রাম' বলো ২ সব বাড়ীতে ৩ খুব বেশি পরিমাণে লাউ ফলেছে ৪ মেঘ ৫ শুকনো ৬ কাদা ৭ থোওয়া, রাখা ৮ ডালি।

ডেলি না ধরে ধান
গটা চারিক পুড়া[1] আন্।
পুড়ায় না ধরে ধান—
গৌরীনাথক করেক দান ॥[2]

৯২

কৃষিকার্য সম্পর্কীয় ছড়া ॥

১. ওলে কুটি মানে ছাই / এরূপ চাষ করগে ভাই।
২. ছাইয়ে লাউ উঠোনে ঝাল / কর বাপু চাষার ছাওয়াল।
৩. কচু বনে যদি ছড়াস ছাই / খনা বলে তার সংখ্যা নাই।
৪. লাউ গাছে মাছের জল / ধেনো মাটিতে বাড়ে ঝাল।
৫. নারিকেল গাছে দিলে নুনে মাটি / শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি।
৬. গোয়ে গোবর বাঁশে মাটি / অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি।
৭. শুন হে চাষার বেটা / বাঁশে দিও ধানের চিটা ॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে / বিঘে ভূঁই বেড়্বে ঝাড়ে ॥
৮. ধর্ম হয় না করলে উপাস / কোদাল পাড়লে হয় না চাষ।
৯. সরিষা বনে কলাই মুগ / বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।
১০. শীতের ঘাস / বর্ষার পাশ।
১১. ভূঁয়ের জল ভূঁইতে মরে ঘন ফেলে পা।
যার মা ভাল তার ঝি ভাল বাওরে ভাইবা ॥[3]

৯৩

॥ কৃষিকার্য বিষয়ক ছড়া ॥

ডাক দে বলে খনা / ভাদ্রে নারিকেল ঝুনা ॥[4]

১ ধান রাখবার পাত্র, খড় দিয়ে তৈরী ২ 'গৌরীনাথ' নামীয় কৃষিদেবতার পূজোর চাঁদাব ছড়া। উত্তরবঙ্গে চলিত।

৩ রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়: কৃষি-কার্য (ভারতী: চৈত্র, ১৩০৪। পৃ. ৬৮৩-৬৯৪)। শেষ ছড়াটি গরু চেনা সম্পর্কে। যে গরুর পা ছোটো, তারাই দুগ্ধবতী হয়।

৪ চন্দ্রকুমার দে: ভাদ্রের শৈশবস্মৃতি (সৌরভ: ভাদ্র. ১৩২১। পৃ. ৩৫৯-৩৬৪)।

৯৪

। কৃষিকাজ-সংক্রান্ত ছড়া ।

ক. ডাক দিয়ে কয় রাবণ, কলা পোতে আষাঢ় আর শ্রাবণ,
কলা পুতে না কেটো পাত, তাতেই হবে কাপড় আর ভাত।

খ. দেড় হাত গভীর, সওয়া হাত গাই,
কলা পুতো চাষা ভাই।[১]

৯৫

। কৃষিকাজ সংক্রান্ত ছড়া ।

ক. ক্ষেতের কোণা/ বাণিজ্যের সোনা ॥

খ. পাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অবেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে, 'হা ভাত' ॥

গ. দূরের সোনা / নিকটের লোনা।[২]

৯৬

। পাট-কাটার সম্পর্কে ছড়া ।

হলে ফুল কাট্ শন।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ ॥[৩]

১ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (কৃষক : কার্তিক, ১৩২১। সঙ্কলন. প্রবাসী : পৌষ, ১৩২১। পৃ. ৩৫৭)।

২ রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষিকার্য (ভারতী : কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৪। পৃ. ৪৭১-৪৭৪)।

"অল্প চাষে বাণিজ্যের অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায়।...নিকটের খারাপ জমিও দূরের উর্বরা জমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।..."

৩ রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার পাটের চাষ (ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৪। পৃ. ২১১-২১৪)। "শনের ফুল হইলেই কাটিবে ও পাটে ফল পাকিলে কাটিবে।",

৯৭

॥ মেঘ ও বৃষ্টি বিষয়ক ছড়া ॥

ক. পূর্বেতে উঠিল কাঁড়
ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥

খ. চাঁদের সভার মধ্যে তারা
বর্ষে পানি মুষলধারা ॥

গ. দূর সভা নিকট জল
নিকট সভা রসাতল ॥

ঘ. পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা
পূবের ধনু বর্ষে ঝড়া ॥

ঙ. বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয় ॥

চ. বেঙ ডাকে ঘন ঘন
বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান ॥[১]

৯৮

॥ বৃষ্টি আনবার জন্যে চাদার ছড়, জলপাইগুড়ি ॥

শিব রে শিব সাজে
কানা খড়িটা ঝুমুর বাজে।
বাজুক ঝুমুর, বাজুক তাল
এই গিরিটা জগৎ ভাল্[২]।
জগতের উনি-ঝুনি
সনায়ে[৩] বান্ধিছে টানি'।
সনারে কেরুয়া[৪] হার
আসুক বৃষ্টি আসুক ঝড।
না আসিলে শিবের দহাই
বেলা নাই বেলা নাই
চলো রে সগায়[৫] বাড়ী যাই ॥[৬]

১ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ. মেঘের কথা (মর্মবাণী : প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা : আশ্বিন, ১৩২২। পৃ. ২৪৭-২৫১)।

২ এই গৃহস্থটি জগতের মধ্যে ভালো ৩ সোনা দিয়ে ৪ সোনারই কেয়ূর ৫ সকলে ৬ নিরঞ্জন দত্ত : উত্তরপথ (জলপাইগুড়ি। পৌষ, ১৩৭৪)। দল

৯৯

॥ বৃষ্টির ছড়া, কোচবিহার ॥

আয় রে দেওয়া[১] ডাকিয়া, দৈ-চুঁড়া কেং[২] মাখিয়া।
দোলা-বাড়ীত্[৩] চেংড়ীগিলা, ঝাঁপালি পাড়ে[৪] ডুবিয়া॥

বেঁধে ছেলেবুড়ো স্নান করে, হাতে ধানভানবার দীর্ঘ মুষল ('গাইন') নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর অঙ্গনে গিয়ে এই ছড়া আবৃত্তি করে থাকে। ছড়ার তালে তালে হাতের 'গাইন' মাটিতে ফেলা হয়। এভাবে অঙ্গনে গর্ত হয়ে গেলেও গৃহস্থ কিছু মনে করে না। তাতে শিব রুষ্ট হবেন। ক্রমাগত তিনদিন ধরে বাড়ী বাড়ী ঘুরে এটি বলা হয়। যে চাঁদা উঠবে, শেষের দিন তাই দিয়ে পূজো করা হবে বৃষ্টি নামাবার জন্তে। তুলনীয়: ৯০-সংখ্যক ছড়ার তৃতীয় অংশ।

ডঃ শ্রীচারুচন্দ্র সাস্তাল মহাশয়ের 'দি রাজবংশী'স্ অফ্ নর্থ বেঙ্গল' (১৯৬৫) গ্রন্থে (পৃ. ১৫৫-১৫৬) এই ছড়াটির কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা পাওয়া যায়। তিনি এটি জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং গোবোর্ধনাথের গান বলে নির্দেশ করেছেন: শিব নাচোরে শিব সাজে/কানা কড়িটা ঝমুর বাজে/বাজেকো ঝুমুর বাজকো তাল/এই গিরিটা জগত ভাল্/জগতেরও কনিঝুনি/সোনায়ে বান্ধিছু টুনি/সোনাবে থেরুয়া বাঁশ/আাক দুয়ারে নাাপো হাঁস/হাঁস ঙ্যাখো জোরে জোর/পারোয়ার ডাক শুয়া/গিরির বউটা না খায় গুয়া/খায় গুয়া তে না খায় চুন/পন্থা ভাতত্ ঢালে নুন/পন্থা ভাত ছলবলায়[১]/গিরির বউটা খ্যাল্খ্যালায়[২]/খ্যাল্খালাইতে খ্যাল্খাইতে/নাগিল ভোগ/কুন্ঠে নাগিছে পূজার ভোগ/দোদোর খাইবে মদনপুর/ক্যামন করি যাবে মদনপুর/মদনপুরের পাইকপাড়া/ছয় বুড়ি আঠারো ঘোড়া/ঘোড়ায় ঘোড়ায় জু-জাগ্রি[৩]/পাঁচ বামুনটা বু-জাগ্রি[৪]/পাঁচ বামুনটা নে-বেরি[৫]/গিরির বউটা ছে-বেরি[৬]/ভাল্কাটাখান[৭] না পায়/বিলাইক মারলেক থপ্কায়া[৮]/হিপার হপার[৯] মন্তিয়া[১০]/বিলাই আসিল্ বড়িয়া॥

১ চট্চটে, আঠালো হয় ২ জোরে হাসে ৩ যুদ্ধ ৪ মিশ্রণ ৫ লোভী ৬ নোংরা ৭ ভালো ছুরি বা দা খানি ৮ জোরে ৯ এদিক, ওদিক ১০ মন্ত্র ব'লে ১১ আবার জীবন পেয়ে। ঘোড়ায়-ঘোড়ায় যুদ্ধের প্রসঙ্গে ৯০-সংখ্যক ছড়ার তৃতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

১ মেঘ ২ দেব ৩ ধানের জমিতে ৪ ঝাঁপ দেয় ৫ সাঁতার কাটে।

ইন্দ্র রাজার মাও কান্দে, চেংড়ীপিলা পইরেক ফান্দে[১]—
হল্-হলিয়া পড়ে ঝড়ি,[২] চেংড়ীপিলা আসিল্ বাড়ী ॥[৩]

১০০

প্রথম জন ॥ আয় রে পানি ঝিম্-ঝিম্
পাঠা মারিয়া[৪] দিম্ দিম্[৫] ॥
দ্বিতীয় জন ॥ যারে পানি ঘুরিয়া।
শিদল[৬] দিম্ পুড়িয়া ॥
প্রথম জন ॥ আইসেক পানি ঝাঁকে-ঝাঁকে
শিদল খাবো[৭] গাছে গাছে ॥[৮]

১০১

প্রথম জন ॥ কচুব পাতায় নল,
জোবে মার চল।
দ্বিতীয় জন ॥ কচুব পাতায় করমচা,
এই মেঘখান উড়ে যা।[৯]

১০২

॥ বর্ষার উৎপত্তি ও অবস্থিতি সম্পর্কে ছড়া ॥

আষাঢ়ে উৎপত্তি
শ্রাবণে যুবতী

১ ফাঁদে পড়ল ২ হুড-হুড় করে ঝড় বয়ে চলে ৩ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

৪ কথান্তর : কাটিয়া ৫ দেব, দেব ৬ কচু ও শুকনো মাছের গুঁড়ো করা তরকারি বিশেষ ৭ খাবি ৮ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। বর্ধমান জেলা থেকে এই ছড়ার রূপান্তর পেয়েছি : আয় রৌদ্র হেনে, ছাগল দিব টেনে,/ বকরীর মা বুড়ি, কাঠ কুড়ুতে গেলি।—গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী : বাঙ্গালা ভাষা (নব্যভারত : ভাদ্র, ১৩০৩। পৃ. ২৭৬-২৮০)।

৯ দীনেন্দ্রকুমার রায় : পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম সং ১৩১১। পৃ. ৬৫)। বর্ধমানে এর কথান্তর : কলাপাতা, কলাপাতা, কয়জা/ অম্‌নী শোম্‌নী পেয়ে খেয়ে থেমে যা।—গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী : বাঙ্গালা ভাষা (নব্যভারত : ভাদ্র, ১৩০৩।পৃ. ২৭৬-২৮০)।

ভাদ্রে পোয়াতি
আশ্বিনে বুড়া
কার্তিকে দেয় উড়া ॥[১]

১০৩

॥ ডাকলক্ষ্মী, অঘন লক্ষ্মী'র ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

সুয়া, সুয়া,—
ধড়েয়া, নেন্দুর, পকা,[১] মাকড়, দূর হ' ।
আকশোর হা,
মহালক্ষ্মী খেইল্ খেলা ॥[৩]
ঘাটো নাঙল দীঘল ইশ
হামার ধানের বড়ো বড়ো শীষ্ ।
সোগার ধান আউল-বাউল[৪]
মোর ধানে খালি চাউল ॥

১ চন্দ্রকুমার দে : ভাদ্রের শৈশবস্মৃতি (সৌরভ, ভাদ্র, ১৩২১ । পৃ. ৩৫৯-৩৬৪) ।

২ বড়ো ইঁদুর, ছোটো ইঁদুর, পোকা ৩ খেলা খেলল, লীলা দেখাল ৪ সকলের ধান যেমন-তেমন । কথান্তর : আকশোর হা, আকশোর হা,/পকা-মাখড়[১] দূর হ' / সাগরে ধান টনা-মনা[২]/হামার ধান কাইঞ্চার সনা[৩] / সাগরে ধান ছিত্তি-হত্তি[৪], হামার ধান বাড়ীর ভিত্তি ॥[৫]

১ পোকা মাকড় ২ যেমন-তেমন ৩ কাঁচা সোনা ৪ এদিকে-সেদিকে ছড়ানো ৫ বাড়ীর দিকে । অপর কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : শীষতে বিশ[১] হউক /ছোটো-বড়ো সামান হউক / আজি হাতে[২] লোহার ডাং/হারা কাটি বাইরাউক ধান ॥

১ ২০-'কাঠায়' এক 'বিশ' ধান হয়, তাই হোক ২ আজ হতে ৩ ধানের গর্ভকোষ থেকে ধান বের হোক ।

'দি রাজবংশী'স্ অফ নর্থ বেঙ্গল' বইতে (পৃ. ১৪২) ডাক্তার শ্রী চারুচন্দ্র সান্যাল-প্রদত্ত কথান্তর : ক. সোর-হা, সোগারে ধান আউল-বাউল/মোর ধান মোলঠা চাউল খ. সোর-হা, সোগারে ধান টোনা মোনা/মোর ধান পাকা সনা, সোর-হা গ. আকশোর-হা/পোকা মাকড় নেন্দুর ভেন্দুড় দূর হ'/ছোটো লাঙলের বড় ঈশ/হামার ধানের হল্‌হল্ শীষ ঘ. এ্যাক-শোর-

১০৪

॥ ধানের 'সাধ' দেবার ছড়া, সুন্দরবন ॥

আশ্বিন যায়, কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গড্ভে[1] বসে।
সাধ খাও বর ছাও হে—
আরের[2] ধান নটী-পটি[3]
আমার ধান বায়ায় পটি
মা লক্ষ্মী সাধ খাও হে ॥[4]

১০৫

॥ প্রথম ধান-কাটার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

কলোর পাতে বান্দি' ধান
কাটি' উঠাচুঁ ঘরে[5] ,

হা'সগারে ধান হিতি, মোর ধান গোলার ভিতি। উনশেষ কথান্তরটি অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার একটি থানা, দেবীগঞ্জ থেকে পাওয়া। দেবীগঞ্জ এখন বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত। শেষ কথান্তরটিও রঙপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।

আবদুস্ সাত্তার তাঁর 'আরণ্য জনপদে' (দ্বি. স' বৈশাখ, ১৩৮২। এপ্রিল, ১৯৭৫। ঢাকা) বইতে (পৃ. ৫০৩) উত্তর বঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে চলিত উপর্যুক্ত ছড়ার যে কথান্তর দিয়েছেন, তা এই আগ শুওর হট/পোকা মাকড় দূর যাওক্/সবার ধান আওল বাওল/আমার ধান শুদ্ধ চাউল।

ওপরের এই ধরণের সব ছড়াই মন্ত্রধর্মী। এই মন্ত্রের প্রভাবে অপরের কম বা খারাপ ধান হয়ে নিজে বেশি ও ভালো ধান হবে, এই বিশ্বাস এখানে কার্যকরী। একই সঙ্গে Black ও white Magic। প্রতি কথান্তরের পূর্বে ধ্বন্যাত্মক শব্দ যাদু-ধর্মিতাকে বাড়িয়েছে। অনুকার ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাঙলা ও ভারতীয় মন্ত্রে খুব ব্যবহৃত হয়।

১ গর্ভে ২ অপরের ৩ নষ্ট ও যেমন-তেমন ৪ 'সুন্দরবনের প্রজা': লেখকের নাম নেই. (নব্যভারত · অগ্রহায়ণ, ১২৯১। পৃ. ৩৪৯-৩৫৩)। "ধান গাছকে লক্ষ্মীর ন্যায় ভাবিয়া গর্ভে থোড় দেখিয়া আশ্বিন মাসের শেষ দিনে সাধ দেয়।" সে দিন পিঠে তৈরি করা হয়। রাত থাকতে উঠে সবাই ক্ষেতে যায় ধানের 'সাধ' দিতে। শোলার ফুল, এবং 'নল' নিয়ে ক্ষেতের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে, চালের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে, উচ্চৈঃস্বরে এই ছড়া আবৃত্তি করা হয়।

১৩-সংখ্যক ছড়াটি এইখানে সঙ্কলিত হওয়া উচিত ছিল, ভ্রমক্রমে পূর্বে সঙ্কলিত হয়েছে।

৫ মরশুমের প্রথম ধান কাটে কৃষকের পত্নী। কলাপাতার অগ্রভাগ দিয়ে ধানের গোড়া মুড়িয়ে বাঁ হাতে প্রথম ধান কাটা হয়।

ভরিয়া অহ মাগে ডোলা বেড়ি,'[১]
ভরিয়া অহ গোলা ঘরে।
ধড়েয়া বান্দি, নেন্দুর বান্দি
বান্দি আজ নেকেনাই।[২]
বারো মাসের তের পার্বণ
তমার[৩] বরে পাই।[৪]

১০৬

সুতো দিয়ে ধানের 'পুঁজি'কে ঘিরবার সময় বলতে হয় যে ছড়া, জলপাইগুড়ি।

হলুদ দিয়া ছুবায় সুতা
দেয়া দিচুঁ পুঁজে,
বছির ঘুরিয়া আসিস্ মাগে
জাবা দিমো[৫] তোকে।
পিঠা দিমো, মিঠা দিমো
দিমো দুধের ক্ষীর।
অচল হয়্যা[৬] অহিস্ মাগে
মোর ঘরতে থির[৭]।
পৌষ লক্ষ্মী মহা লক্ষ্মী
হলুদো বরণ।
পঞ্চবহিনী[৮] এক ঠাঁই
আথো[৯] আজি চরণ।[১০]

১০৭

নবান্নের ছড়া, বরিশাল।

কো কো কো,[১১] আমাগো বাড়ী শুভ নবান্ন।

১ 'ডোলা' বা 'ডোল' ভরে ওগো লক্ষ্মী তুমি থাকো ২ নানা আকারের ইঁদুর, যারা পাকা ফসল খেয়ে ফেলে ৩ তোমার ৪ গুরুদাস রায় (বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি)।

৫ পূজা দেব ৬ হয়ে ৭ স্থির ৮ 'গুছিলক্ষ্মী', 'ডাকলক্ষ্মী', 'অঘন লক্ষ্মী' 'পৌষ লক্ষ্মী' ও 'তিস্তাবুড়ী'—এই পাঁচ বোন ৯ রাখো ১০ গুরুদাস রায় (বেরু-বাড়ী, জলপাইগুড়ি)।

১১ পাখির ডাকের অনুকৃতি।

শুভ নবান্ন খাবা   কাক বলি লবা
পাতি কাউয়া লাথি খায়,[১]
দাঁড় কাউয়া কলা খায়,
কো কো কো, মোরগো[২] বাড়ী শুভ নবান্ন ॥[৩]

১০৮

। নবান্নের অপর ছড়া, বরিশাল ।

দাঁড় কাউয়ারে[৪] আহ্বান করা
পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া
কোঁ কোঁ কোঁ
আজ কৈলাম[৫] মোগো[৬] বাড়ী শুবো নবান্নো[৭] ॥
আইয়ো খাইয়ো কাক বলি লইয়ো
আত বর‍্যা সন্দেশ দিমু[৮]
পেট্‌টা বর‍্যা খাইয়ো ॥[৯]

১ পাতি কাক নবান্নে অনিমন্ত্রিত থাকে, তাই তাকে অনাদর জ্ঞাপন ২ আমাদের ৩ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা · বরিশালে নবান্ন (বঙ্গদর্শন : মাঘ, ১৩২০। পৃ. ৭২১-৭২৬)। " নবান্নের পূর্বরাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সকল গৃহের বালক-বালিকাগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং দলে দলে ঘরের বাহির হইয়া পক্ষিগণের কলরবের সঙ্গে তাহাদের বালকণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে একপ্রকার সুর ধরিয়া দাঁড়কাক দিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছে : সে নিমন্ত্রণের সঙ্গীত বা ছড়া এই,·· " [অতঃপর ছড়াটির উদ্ধৃতি]।

৪ কাককে ৫ বললাম কিন্তু ৬ আমাদের ৭ শুভ নবান্ন ৮ হাত ভরে সন্দেশ দেব ৯ কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত. পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্ন (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩১৮। পৃ. ৬০০-৬০২)।

'প্রবাসী' (বৈশাখ, ১৩১৯। পৃ. ৮৭) পত্রিকাতেই কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত এই ছড়ার কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা প্রকাশ করেন :.. কাক বলি লইও, / ডোঙ্গা ভরা চাউল দিমু / প্যাট্‌টা ভর‍্যা খাইও, / এট্টি এট্টি কলা দিমু, / পুব দিকে লইয়া যাইও।

"নবান্নের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে 'পার্বণ' করিয়া কাককে 'বলি' (ডোঙ্গাপূর্ণ চাউল, কলা ইত্যাদি) দেওয়ার নিয়ম। ঐ বলি কাক কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের আহার করা অধর্ম। বলির কলা মুখে করিয়া

১০৯

॥ বঁড়শি দিয়ে মাছ-ধরার পূর্বে কথিত মন্ত্রধর্মী ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

থু-ফেলা।
সোগারে১ খলৈ২ নড়ে-চড়ে
হামার খলৈ উথুলি পড়ে।৩

১১০

॥ ছিপ দিয়ে মাছ মারবার সময় মন্ত্রধর্মী ছড়া, উত্তরবঙ্গ ॥

প্রথম জন ॥ আল্সিয়া রে আল্সিয়া,
খলই৪ গেইল্৫ তোর ভাসিয়া ॥
যে মাছ মারছে ॥ যাউক খলই ভাসিয়া,—
তুলম এলায়৬ ডুবিয়া ॥
প্রথম জন ॥ ভাসি' গেইল্ তে ভালে হইল্,
কানার নাঠি হারেয়া গেইল্ ॥৭

কাক পূর্বদিকে গমন করিলে গৃহস্থের কল্যাণ সূচিত হয়। তাই, নিমন্ত্রণ কালেই কাককে শুভ পথ অবলম্বনে অনুরোধ করা হইয়াছে। ''

১ সকলেরই ২ মাছ রাখবার বাঁশের তৈরি পাত্র ৩ মনোমোহন রায়, 'বুড়াবুড়ীর কথা' (জলপাইগুড়ি, পৃ. ১৭)। কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা: থু থু আট্টা—/ধরিস্ একটা বুড়া মাছটা/সোগারে খলই নড়চড/মোর খলইটা ডিকিয়া ভর্ (তাড়াতাড়ি ভর)। রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

মাছ পাওয়া-না-পাওয়া সম্পর্কে নানা সংস্কার ও taboo আছে। বিশেষ যাদু-মন্ত্রের প্রভাব এর পেছনে ক্রিয়াশীল। বিশেষ অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে যেমন মাছ ওঠে, তেমনি তার অভিশাপে মাছ ওঠেও না। পূর্ববঙ্গে, মাছ ধরতে গিয়ে প্রথম যে মাছ পাওয়া যায়, তা থুথু লাগিয়ে তবে মাছ রাখবার পাত্রে রাখা হয়। সেই সময় মুখ দিয়ে এক প্রকার শব্দ করা হয়, তাকে বলে 'খুরিবাইস' (বাকরগঞ্জ) বা 'থুরিবুরি' (ঢাকা)। এতে মাছ বেশি পরিমাণে ধরা পড়ে বলে বিশ্বাস আছে।—দ্রঃ 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক বাঙলা ভাষার অভিধান' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা)।

৪ যে বাঁশের তৈরি পাত্রে মাছ রাখা হয় ৫ গেল ৬ এখনই তুলব ৭ কানার লাঠি হারিয়ে গেল। কথান্তর: আল্সিয়া, খলই যায় তোর ভাসিয়া / যায় যানে১ ভাসিয়া, /আরো গড়াইম্ মুই ডিয়াং২ বসিয়া।

১ যাক না কেন ২ উঁচু জায়গায়।

১১১

। মাছ ধরার মন্ত্রধর্মী ছড়া, জলপাইগুড়ি ।

প্রথম জন । বঁড়শি রে হ্যাং,[1]
টানিয়া অঠা[2] ব্যাং ।
যে মাছ মারছে । বঁড়শি রে হ্যাং,
টানিয়া অঠা চ্যাং[3] ।

আনুষ্ঠানিক ছড়া, তৃতীয় পর্যায় : মানবজীবন ও জগৎ

১১২

। ভূত তাড়াবার মন্ত্রধর্মী ছড়া ।

ভূত আমার পুত, শাকনী আমার ঝি,—
মাছ-পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছি করবি আমার কি ?[4]

১১৩

। ভূত তাড়াবার মন্ত্রধর্মী ছড়া ।

ঠিক দুপ্পুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা,
পায়ে পড়ল রশি, ঘাঁটু গেড়ে বসি ।[5]

১ অর্থহীন ২ টেনে ওঠা ৩ মাছ বিশেষ। ঈর্ষাপরায়ণ প্রথম জন যখন বাঁড়শিকে মাছের বদলে 'ব্যাং' তুলতে বলে, যে মাছ ধরছে, সে তখন এই বিপরীত ছড়া বলে বঁড়শিকে 'চ্যাং' মাছ তুলতে বলে। জলপাইগুড়ি (ধূপগুড়ি)-তে চলিত। নানা অশ্লীল ছড়াও এই সময় বলা হয়।

৪ দীনেন্দ্রকুমার রায় : পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং : ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম সং ১৩১১ : পৃ. ১৫)। প্রচলিত কথান্তর : পেত্নী আমার ঝি/রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কি ? 'মাছ পোড়া' দিয়ে ভাত খেলেই ভূতে ধরে।

৫ যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় : পুরাতন বর্ষের স্বপ্ন : (ভারতী : চৈত্র, ১৩০০। পৃ. ৩৩৮)।

"বালিকাদ্বয় চমকিয়া উঠিল।...দেখিল চতুর্দিক জনশূন্য, উত্তরে ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যাহ্ন বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে বালকটিও কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া গেল। তাহারা তিনজনে এক কালে সমস্বরে বলিয়া

১১৪

বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা।
নারকোল গাছে কড়ি ফুটেছে, গুণে রেখে যা ॥[১]

১১৫

ক. ভিয়ালা্যা[২] রে ভাই!
আগা কাডম[৩] চাগা চাগা[৪]
ঝবৃষ্ট পরের[৫] দাগা দাগা[৬]।

উঠিল—[অতঃপর সেই ছড়াটিই ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] এই বলিয়া তাহারা তিনজনে অবনত জানু হইয়া ভূতলে বসিল, আবার উঠিয়া, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে একটু অগ্রসর হইয়া চলিল।"

এ বিষয়ে এই মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য: "···সেই ছেলেবেলা, দুই প্রহরের সময়ে বাগানে গেলে ভয়ে গা চৌক্ চৌক্ করিত; তখন—"ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা, পঞ্চানন্দের খেলা"—এই মন্ত্র বলিতে বলিতে নেমাজ করিবার মত সকলে কত হাটু পাতিয়া বসিতাম।"—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ভেক ভুজঙ্গ (জন্মভূমি · মাঘ, ১২৯৯। পৃ ৯৭-১০৮)। 'ঢেলা'র পরিবর্তে 'ঠেলা'ও মেলে।

১ অজয় কুমার ভট্টাচার্য (বৈদ্যবাটী, হুগলি)। 'বিশ্বকোষে' এ বিষয়ে তথ্য ও কথান্তর পাওয়া যায় "আমাদের দেশের বালক বালিকাগণের বিশ্বাস যে, বকজাতির আকাশভ্রমণ কালে প্রার্থনা করিলে তাহারা আমাদের নখের উপর সাদা লম্বা দাগ দিতে পারে।" পাদটীকায় ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে: বকা মামা বকা মামা ফুল দিয়ে যা / চার কড়া কড়ি দেব গুণে নিয়ে যা ॥

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অপর কথান্তর: নারকেল গাছে কড়ি আছে/গুণে নিয়ে যা। নদীয়া জেলা থেকে পাওয়া অপর একটি কথান্তর: বক মামা, বক মামা, দুধ দিয়ে যাও/বেনা গাছে কড়ি আছে, গুণতে গুণতে যাও। বক উড়ে যেতে দেখলে বালক-বালিকারা নখ সাদা হবার কামনায় দু হাত উপুড় করে এই ছড়া বলে। বকের রঙ সাদা, দুধের রঙও তাই, নখের রঙও তাই হবার জন্যে কামনা করা হচ্ছে। এটি সাদৃশ্য-মূলক যাদু'র অন্তর্ভুক্ত।

২ এক প্রকার সারস জাতীয় পাখী, গলা দীর্ঘ। দীর্ঘগলিয়া, ভিয়ালা্যা আগা কাটিব ৪ চাকা-চাকা করে ৫ ঝড়-বৃষ্টি পড়ছে ৬ র'য়ে র'য়ে।

হাত্‌ কুরি হাউত্যা[১] পাক ন খাইলে[২]
তোর গুরুর দোহাই।

খ. সোনার ডাবা[৩] নাইরকলর পানি[৪]
ভিয়ালা্যা খাইতে[৫] জাল মেলানি[৬]।[৭]

১১৬

ঝড় মামা ঝড়। একটি আম পড়্‌।[৮]

১১৭

কাউয়া নানা, এক আম দেনা
দু আম লে না।[৯]

১ সাত কুড়ি সাতটি ২ না খেলে ৩ হুঁকো ৪ নারকেলের জল ৫ খাবার সময় ৬ জালের মতো বিস্তৃত হয়ে ৭ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন : (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮–৫৭৫)। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। দল বেঁধে এই সারস জাতীয় দীর্ঘ-গ্রীবার পাখীরা যখন বৃষ্টির দিনে উড়ে যায়, তখন এই ছড়া বললে সত্যিই তারা নাকি 'সাত কুড়ি সাত বার' পাক খায়। ছড়ার খ-অংশ বিপরীতার্থক মন্ত্র, এতে ওই পাখিদের আবার স্বাভাবিকভাবে উড়ে চলে যেতে বলা হয়। মুরুল ইছলাম চৌধুরীর 'চট্টগ্রামের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬৫। চট্টগ্রাম) বইতে (পৃ. ২৩) এই ছড়াটির কথান্তর পাওয়া যায়. আগা কাডম চাগা চাগা/সত্যপীরের ডাগে (ডাকে),/সাত কুড়ি সাত্‌তোয়া (সাতটি) পাক দে/তোর গুরুর দোয়াই। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। বৈশাখ ১৩৬৯) বইতে (পৃ. ১২০) নোয়াখালি থেকে পাওয়া এই ধরণের ছড়াকে 'বক-বন্দী'র ছড়া বলেছেন। তার 'কথা' এই : দাড়ি রে রাঁড়ীর পুত।/কচু পাতায় থইলাম দূত॥/দূত পড়ে নালে।/দাড়ি বানলাম মালে॥/মালা গেল ছিড়্‌ইয়া।/দাড়ি বানলাম ভিড়্‌ইয়া॥/সাতপাক ঘুরইয়া যা।/গুরুর দোয়াই মাক্কা যা॥

৮ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৯ সাহাবুদ্দীন আহমেদ (মেহেরাপুর, কালিয়াচক, মালদহ)। আম গাছের তলাতে গিয়ে এই ছড়া বললে আম পড়ে বা কাক আম ফেলে দেয়।

১১৮

বুল্‌বুল্ আমার কাকা
কুল ফেল পাকা ।[১]

১১৯

। বাদুড়ের প্রতি কথিত ছড়া ।

বাদুড় বাদুড় মিতা
ফল খায় তিতা ।[২]
ঘোড়া খায় ঘাস
বাদুড় যায় উপাস ।[৩]

এই ছড়ার কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা পাওয়া যায় : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙলার লোকসাহিত্য : দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম সং, ১৯৬৩), পৃ. ৬৪৯।

১ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : 'বুলবুল্' : (প্রতিভা : পৌষ, ১৩১৮। পৃ. ৪৭৮-৪৮০)। এই ছড়া বললে বুলবুলি পাখি নাকি পাকা কুল ফেলে দেয় গাছ থেকে। ছোটো বুলবুলি-কে ঢাকা-ময়মনসিংহে বলে 'টকা'। সেখানে তাই বালক-বালিকারা ছড়া কাটে : টকা আমার ঠাকু ভাই/বরই ফেলা বাড়ীত্ যাই। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীবৈচিত্র্য' (তৃতীয় সং চৈত্র, ১৩২৯। প্রথম সং আশ্বিন ১৩১২) বইতে (পৃ. ১৫৬) মেলে : বুলবুলি মোর কাকা···। এটি নদীয়া জেলায় প্রচলিত বলে দীনেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন। অপর কথান্তর : শিব ঠাকুরের বর/একটি বরই পড়্।—মতিলাল দাস : শিশুমনের চলচ্চিত্র (বিচিত্রা : বৈশাখ, ১৩৩৯। পৃ. ৫২১)।

২ কথান্তর : 'যা খাবি তা তিতা' ৩ সাহাবুদ্দীন আহমেদ (মেহেরাপুর, কালিয়াচক, মালদহ)। বাদুড় কোনো ফল নষ্ট করতে থাকলে, এই ছড়া বললে তার মুখে তা তিক্ত লাগে এবং সে উড়ে চলে যায়। এই ছড়ার কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা মেলে : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : বাঙলার লোক-সাহিত্য : দ্বিতীয়খণ্ড (প্রথম সং ১৯৬৩), পৃ. ৪১৫। অপর কথান্তর : বাদুড় বাদুড় হিতো/যে ফলটি খায় বাদুড়/সে ফলটি তিতো।—রামরঞ্জন রায় (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)।

১২০

॥ 'পানিয়াল' পাকাবার ছড়া ॥

আম পাকে, জাম পাকে—
হাতে-হাতে পানিয়াল পাকে ॥[১]

১২১

॥ কুল-সুলপোর ছড়া ॥

কুল-সুলপো হ'লো,
ধোপা মাগী ম'লো,
ধোপা মাগীর কাঁধে খা,
তেল নুণ দিয়ে চেটে খা ॥[২]

১২২

॥ আগুন জ্বালবার জ্বালানী আনবার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥

ক. লাগ বোম্বা লেগে যা,
ইঁদুর-মাটি খেয়ে যা ॥[৩]

১ এক বিশেষ ধরণের ফলকে 'পানিয়াল' ('পানিফল' নয়) বলে। দু হাতের তালুতে ঘষে নিয়ে তবে তা খেতে হয়। তালুতে ঘষবার সময় এই ছড়া বলতে হয়, নইলে 'পানিয়াল' পাকে না। উত্তরবঙ্গ থেকে সংগৃহীত। খুলনা জেলাতেও চলিত আছে। অনুরূপভাবে বেতের ফল 'পাকাবার' ছড়া প্রচলিত আছে পূর্ববঙ্গে।

২ দীনেন্দ্রকুমার রায়: পল্লীবৈচিত্র্য (তৃতীয় সং: চৈত্র, ১৩২৯। প্রথম সং আশ্বিন, ১৩১২। পৃ. ১৬৪.)।

"সরস্বতীর খাতিরে যাহারা এত দিন কুল খাইতে পারে নাই, তাহারা খুব ঘটা করিয়া কুল খাইতে লাগিল। অনেকে শুধু কুলে সন্তুষ্ট হইল না, 'কুল-সুলপো' করিবার প্রলোভন তাহাদের পক্ষে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল।...তাহারা 'কুল-সুলপো' করিবার উদ্দেশে পাড়া হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া 'সুলপো'র পাতা লইয়া আসিল; কুলগুলি ছেঁচিয়া বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রথমে পাথরের বাটীতে রাখিল, তাহার পর তাহাতে তেল, নুণ, মরিচ ও সুলপোর পাতা মিশাইয়া গামছা বা বস্ত্রখণ্ডে ঐ পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া তাহা ক্রমাগত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে সমস্বরে বলিতে লাগিল" [সেটিই বর্তমান ছড়া]

৩ শীতের রাতে খড়-পাতা দিয়ে আগুন জ্বালবার সময় 'মন্ত্র'-রূপে এটি বলতে হয়।

খ. আমী কুমী নারাণজলে বসি
নারাণঠাকুর মারলে বাণ
কাঠ খড় কুটো পাতা
কুড়িয়ে বাড়িয়ে আন্ ।[১]

১২৩

রইদানী[২] রে রইদানী, চাদার মা পুতানী,[৩]
চাদার আগাত্[৪] বইল ফুল,[৫] চিচ্চিয়াইয়া[৬] রইদ্ তোল,
র'উ্ আস্যে[৭] ঘামাইয়া,[৮] ছাত্তি ধর মামাইয়া,
র'উর[৯] ঘ'াডাত্[১০] চল্ বাঁশ,[১১] ঘর তুলি দে আঘন্‌মাস[১২];
আঘনমাস্যা কউর্‌গা তেল,[১৩] তেলইন্[১৪] ফুটি হুরগা গেল্[১৫];
হুর্‌গা খাইয়্যে বিলাইয়্যে,[১৬] বউয়রে ধরি কিলাইয়্যে[১৭],
বউয়র্ মার কাঁদনে মকাগুলা[১৮] আননে,
কুড়ুর্ কুড়ুর্[১৯] চাবানে[২০] ।[২১]

১ কাঠ-খড়-পাতা কে আনবে, তা নিরূপণ করতে এই ছড়া বলা হয় গোল হয়ে বসে থাকা সকলের বুকে আঙুলের টোকা মারতে মারতে। যার বুকে আঙুল দেবার সময় শেষ শব্দ উচ্চারিত হবে, সেই আনবে কাঠ-খড়-পাতা। তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : পৌষ, ১৩৬৬)।

২ রোদের স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ ৩ পুত্রহারা, হতভাগা ৪ অগ্রভাগে, এখানে মধ্যে ৫ বকুল ফুল ৬ চিক্ চিক্ করে ৭ এসেছে ৮ ঘর্মসিক্ত হয়ে ৯ মামাদের ১০ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ১১ এক রকমের বাঁশ ১২ অগ্রহায়ণ মাসে ১৩ সরষের তেল ১৪ ব্যঞ্জনের পাত্র ১৫ ব্যঞ্জনের পাত্র ফুটো বা ছিদ্র হয়ে ঝোল পড়ে গেল ১৬ বিড়ালে ১৭ কিল মেরেছে ১৮ ভুট্টাগুলি ১৯ কুড় কুড় শব্দ করে ২০ চিবোনো ২১ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮-৫৭৫)।

"শীতকালে দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া রৌদ্র উঠিতে যখন বিলম্ব হয়, তখন আমাদের ছেলে মেয়েরা রৌদ্র সেবন করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়া শীঘ্র রৌদ্র উঠিবার জন্য নাচিয়া নাচিয়া রৌদ্রকে ডাকিতে থাকে। তাহাদের এই ডাকিবার ছড়াটিকে তাহারা মন্ত্রের মত কার্যকরী বলিয়া বিশ্বাস করে।"

১২৪

॥ অভিশাপের ছড়া, টাঙ্গাইল ॥

নড়ি-খড়ি-খাইস্[১]—
এক সের চাইল তুই ছয় মাসে খাইস্ ॥[২]

"...তাহারা [বালকেরা] এহেন শীতের প্রাতে তাহাদের ভগ্নী রৌদ্রের নিকট হিম-সখা চন্দ্রের কুৎসা রটনা করিতেছে। চন্দ্রের মধ্যে যে কলঙ্ক রেখা যায়, তাহাকে শিশুরা বকুল ফুলের গাছ বলিয়া কল্পনা করিতেছে,..."

"চট্টলার কোন কোন স্থানে, উল্লিখিত ছড়াটির শেষ অংশটুকু একটু পরিবর্তিত আকারে গীত হইতে শুনা যায়...থাইয়মগই[১]রে থাইয়মগই, / বজ্জা[২] তেলত্ দিয়ম্‌গই[৩] ; / বজ্জা খাইয়ে বিলাইয়ো। / বউয়রে ধরি কিলাইয়ো ; / বউয়র মার কাঁদনে / নাউক্যাকেলা[৪] আননে / কুড়ুর কুড়ুর চাবানে।

১ আমি চলে যাব ২ ডিম ৩ তেলে ভাজব ৪ কাঁচাকলা।

ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' (১২শ। ফাল্গুন, ১৩৮২) গ্রন্থে নানা জেলা থেকে সংগৃহীত 'রোদ তোলার' ছড়া সঙ্কলিত হয়েছে। এসব ছড়াকে এই বইতে 'খেলার ছড়া' বলা হয়েছে, আমরা মন্ত্রাত্মক ছড়ায় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমাদের সঙ্কলিত ছড়াটির কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা উক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৬২-৬৩) মেলে, সেটিও চট্টগ্রাম থেকেই সংগৃহীত। তা এই : রইদলে রইদ্যানী / চাঁদার মারে পুতানী[১] / চাঁদা গেইয়ে আগারে[২] / ভাউয়া বেঙে[৩] পাছারে[৪]। / ভাউয়া বেঙে লাড়ে চাড়ে / কোনো বেঙে ডাক ছাড়ে। / তেলইনর ভুতর ধোরা হাফ[৫] / ফাল দি উইঠে /[৬] বউয়র বাপ। / বউয়র বাপ চতুরা / থালর পানি মথুরা / থালর ভুতর লইল্যা ইচা[৭] / সুরগা[৮] রাধি দে ॥

১ পালি বিশেষ ২ গগনে ৩ কোলা ব্যাঙ ৪ আছড়ায় ৫ ঢোঁড়া সাপ ৬ লাফ দিয়ে ওঠে ৭ চিংড়ি মাছ ৮ ঝোল।

১ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি ২ পূর্ববঙ্গে চলিত। অভিশপ্ত ব্যক্তি এতোই কৃশ হোক যে, এক সের চাল খেতে যেন তার ছ'মাস লেগে যায়!

১২৫

॥ শপথ কাটাবার ছড়া, পাবনা ॥

ক. সাপের দুধ, বাঘের পানি[১]
তবে সে মি কিরা কাটি ॥[২]

খ. নদীর পারে কলা গাছ
কিরা কাটি খ্যাচ্-খ্যাচ্ ॥[৩]

১২৬

জাল জাল ইন্দ্রির[৪] জাল—
ওপর বন্ধ চৌদ্দ তাল
নাম্[৫] বন্ধ স্বর্গ-মর্ত-পাতাল।
এই জাল পড় তুই

১ প্রস্রাব, বীর্য ২ আশিস সান্যাল (পাবনা, সদর)। অর্থাৎ যে শপথ করা হল, সাপের দুধ (!) এবং বাঘের 'পানি' নিয়ে এলেই তা ভঙ্গ করা যাবে, নতুবা নয় ৩ হেমন্ত লাহিড়ী (পাবনা, সদর)। শপথকারীর শপথ ভঙ্গ করবার ইচ্ছে হলে এই ছড়া বলে। জলের ধারে দাঁড়িয়ে তা বলতে হয়। কলাগাছ যেমন সহজেই কাটা যায়, শপথকেও তেমনি কাটা হল,—সমধর্মী যাদুর দৃষ্টান্ত। ওঝা ও গুণীদের মুখে শুনেছি, কোনো মন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে তারা কোনো বটের পাতায় চন্দন দিয়ে সেই মন্ত্রটি লিখে নদীর জলে তা ভাসিয়ে দেয়, তবেই ওঝা ওই মন্ত্র-রক্ষা বিষয়ে সকল taboo থেকেও নিষ্কৃতি পায়। বৈদিক যুগে বিশ্বাস ছিল, নিরানব্বুইটি নদীর নাম উচ্চারণ করলে যে কোনো প্রকার বিষ ধুয়ে যায়। মন্ত্র কাটানোর সঙ্গে জলের সংশ্রব লক্ষণীয়। যেন জলে তা ভেসে বা ধুয়ে গেল। এও যাদু।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর 'ধনপতির উপাখ্যানে' দেখা যায়, রম্ভাবতী বশীকরণের জন্যে কাঁচা মাটির সরায় সাপের বিষ দিয়ে জমানো দইকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সাপের বিষ নানাপ্রকার ঔষধে লাগে। যে সাপের বিষে মানুষ মরে, তাই আবার ঔষধে গৃহীত হয়,—এই বৈপরীত্যই সম্ভবতঃ সাপের বিষের ওপর যাদুধর্ম আরোপ করতে মানুষকে সাহায্য করেছে। বাঘের হাড়-চর্বিও ঔষধ ও মাদুলি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪ ইন্দ্রের ৫ নীচের।

বাড়ীর চার কোণ চেপে পড়্
এই আগন্যার[1] চার কোণ চেপে পড়্
এই ঘরের চার কোণ চেপে পড়্
এই জাল পড়বি তোর
ষাট দিন, ষাট রাতের মতো পড়্ ।
কার দোহাই ? মা কালীর দোহাই ॥[2]

১১৭

॥ সহজ প্রসবের 'জলপড়া'র মন্ত্র-ছড়া ॥

চাল কাটি, চালন কাটি, কাটি দুশমনের বিভ্যা[4] ;
লক্ষ লক্ষ চালনের কি করিতে পারি আমি—
কাঁউরি[5]-কামাখ্যা দিলেন বর
আমার হাতের জলপড়া শিগ্‌রে ধর্[6]
কাঁউরি-ক্যামাখ্যা মায়ের বর ॥

১১৮

॥ কু-নজরে শিশুর কান্না-রোধের মন্ত্র-ছড়া ॥

খটক ডুমুর[7] তিরশূল[8] মাল ছাড়িয়ে বাঁধিলি[9]
বোধ্ রে[10], বোধ্ রে, ছেল্যা, আছো মায়ের কোলে
এখনি বধিবে[11] ছেল্যা ষষ্ঠী মায়ের বোলে
কার দোহাই ? ষষ্ঠী মায়ের দোহাই ॥[12]

১ অঙ্গনের ২ অধ্যাপক মোহাম্মদ বাহাতুল্লা (মহল্ল অনন্তপুর, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ)। এই মন্ত্র-ছড়া এখনও এঁদের বাড়ির প্রবীণ মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন।

৩ এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করে, জলটুকুতে ফুঁ দিয়ে প্রসূতিকে খাইয়ে দিতে হয় ৪ প্রসবে বিঘ্ন হলে মনে করা হয়, অপর কেউ শত্রুতা করে, কু-মন্ত্রের প্রভাবে এটি করাচ্ছে। এই ভাবে মন্ত্র-নিক্ষেপকে বলে মন্ত্র 'চালা' বা 'চালন' করা ৫ কাউর, কামরূপ ৬ শীঘ্র এই জলপড়া কার্যকরী হোক।

৭ শিবের ডমরু ৮ ত্রিশূল ৯ বাঁধলাম ১০ রে ছেলে, বোধ-যুক্ত অর্থাৎ সুস্থ হও ১১ 'বোধ' নেবে, জ্ঞান হবে ১২ তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

১২৯

৫ 'নজর-দৃষ্টি', উনবাতাস, প্রভৃতির 'জলপড়া'র মন্ত্র-ছড়া।

আনিলাম পানী, ছুড়িলাম বাণ,—
ষোলো ডাকিনীর বধিলাম পরাণ।
এই জলে ক্রিয়া করে, ডাইন-ডাকিনী পুড়ে মরে।
আজ মারণ পুড়ে, দক্ষিণে চাপিয়া পুড়ে কিচ্ বাণেশ্বর
মকরে চাপিয়া পুড়ে জাহ্নবী মা।
রোগের কাঁধে বলদ দায়,
তারা নামে[১] আগে পালায় ভূতাভূতী
পিছে পালায় ডাইন-ডাকিনী।
আগমতে ছিল বুড়ী ছিল অন্ধকার
আগমতে ডাক দিয়া পিছে আইলেন ধায়া।
জয় ক্ষেত্রী মড়া মশান
কালীর দোহাই, করিলাম ছারখার।[২]

১৩০

৭ 'ঝিল্‌মিলা'৩ আঙুল পটা'৪ প্রভৃতির মন্ত্র-ছড়া।

আড় কাটি নব নাড়ী বাসুদেবের কোঠা
হামি-ঝিল্‌মিলা, হেমাছুমা[৫], পড়াসুয়া[৬], জুনকাটি[৭]
চৌদিকে করে লাঠালাঠি[৮]
শুনলে শীতল উড়ি' ঝমকা[৯]
বায় বিরল[১০] গলাকণ্ঠ[১১] কি?
যেইখানে জনমিলি চৌষট্টি রোগ, সেইখানে মর্
কার আইজ্ঞায়? কাউর[১২] কামকেলাই চণ্ডীর আইজ্ঞায়।

১ কালীর নামে ২ রোগকে 'ছারখার' করলাম।

৩ হাম ৪ আঙুল-হাড়া রোগ। কথান্তর: আঙুলবেড়ী ৫ মাথাব্যথা, মাথাধরা প্রভৃতি রোগ ৬ আখের গাছের দেবতা বা অপদেবতা। আখ মাড়াই করবার আগে এঁর পুজো দিতেই হবে, নইলে গুড় হবে না ৭ অপদেবতা বিশেষ ৮ বিভিন্ন রোগ বা রোগের অপদেবতাগণ যুদ্ধে মেতে উঠেছেন যেন, তারই ফলে রোগীর বর্তমান অবস্থা হয়েছে ৯ এই মন্ত্র শুনে রোগী শীতল হও, তোমার রোগ আচমকা ঘূর্ণি বাতাসের মতো যেন উড়ে যায় ১০ ঘূর্ণিবাতাস ১১ গলগণ্ড, রোগবিশেষ ১২ কামরূপ, কাউর।

১৩১

॥ ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণাদি কাটাবার মন্ত্র-ছড়া ॥

ক. কোথা হতে এলে ব্যথা, কোথায় তোমার ঘর ?
স্বর্গ হতে এলে ব্যথা, স্বর্গে তোমার ঘর।
এ ব্যথা কে ঝাড়ে ? রামচন্দ্র-সীতা ঝাড়ে।
এ ব্যথা আমি ঝাড়ছি, শীঘ্রে[১] ছাড় ॥

খ. 'আড়াই কলি'র[২] মন্ত্র-ছড়া, উপরোক্ত মন্ত্রের 'জোড়া' :
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, তিন-চার জন পথে—
রাম-লক্ষ্মণ দোহাই, ব্যথা ছাড়ে ॥

১৩২

॥ পথে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের মন্ত্র-ছড়া ॥

আহাণ্ডি-অহমুণ্ড অপ্-থপ্ থপর্-থপর্ করে পা[৩]—
এ সীমা ছাড়ি তু[৪] অন্ত সীমা যা।
গন্ঢা-গমল[৫] দূর পালা, উড়্ শিকাল বেড়া[৬] ॥

১৩৩

॥ পথে সাপের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের মন্ত্র-ছড়া ॥

চলে যেতে ঘুঙুর বাজে, নূপুর বাজে পায়।
পথ ছেড়ে দে বাসুকী-মা,
তোর গরুড় গোঁসাই যায় ॥[৭]

১ শীঘ্র ২ 'আড়াই' শব্দের যাদুধর্মিতা লক্ষণীয়।

৩ বাঘ যে ভাবে মাথা নেড়ে, পায়ে-পায়ে পথিকের দিকে এগিয়ে আসে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে ৪ তুই ৫ 'গন্ঢা' অর্থাৎ গণ্ডার এবং তৎ-শ্রেণীর প্রাণী ৬ এই মন্ত্ররূপ শৃঙ্খলে তোকে বেড় দিয়ে বাঁধলাম, তুই উড়ে পালা।

৭ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় : ভেক-ভুজঙ্গ (জন্মভূমি : অগ্রহায়ণ, ১২৯৯। পৃ. ৭১৩-৭২৩)।

"শুনিতে পাই বহুকাল পূর্বে বাঙ্গলার ও বিহারের লোকে রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে উক্ত মন্ত্র পড়িয়া পায়ে নূপুর ও ঘুঙুর পরিতেন তাহার পর ঘরের বাহির হইতেন।"

১৩৪

॥ সাপ-কাটার মন্ত্র-ছড়া ॥

ক. গুণীর গা-বাঁধা[১] :

সায়া[২] কুন[৩] ভায়া, রক্ত বন্ধন ছায়া,

আগ্‌লি বন্ধম্[৪] বারো কোণা, পিছনে বাঁধলাম তের কোণা

নদী সে বাঁধলাম, নালা সে বাঁধলাম, বাঁধলাম চৌ-দুয়ারা।

ঘুট্‌টা চুন-কো[৫] ভাজা করো

রামজীকা পঞ্চ রথ্‌কা,

মেরা হাড় করো বজ্র, মাঁস করো বজ্জর[৬]

মেরাকো কাটে-ফুটে,[৭] দোহাই রাজা রামচন্দ্র ॥

খ. গুণীর যাত্রাকালে রাস্তা-বাঁধা[৮] :

জীবজন্তু ছাড়হ বাট, গরুড় অন্ত কাট্[৯]

সাপসাপিনী বাঘভালুকে লাগ্ দাঁত কপাট।

কার আইজ্ঞায়? বড়ো বীর নরসিংয়ের আইজ্ঞায়।

শীগি্‌গির্ লাগ্ শীগ্‌গির লাগ্।

গ. সাপ-কাটা রোগীর দেহে কাঁসার থালা বন্ধন[১০] .

কংস কংস কংস পড়ি

কংসা চাপড় বিষ মারি।

আছে বিষ তাপে জুড়ে, নাই বিষ আয় জুড়ে

কার আইজ্ঞায়? কংসাসুর রাজার আইজ্ঞায়।

১ রোগীর বাড়িতে ঝাড়তে এসে গুণীরা প্রথমে নিজের দেহকেই অপরের বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ওঝার এবং অপদেবতার কু-নজর থেকে মুক্ত করে নেন ২ ছায়া (?) ৩ কোন্ ৪ আগে বাঁধব ৫ ভেলা চুন। হিন্দীপ্রভাব লক্ষণীয় ৬ বজ্র ৭ আমার এই মন্ত্রে যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর বা অপদেবতার নজর কেটে চৌচির হয় ৮ শুধু দেহ-শুদ্ধিই নয়, রোগীর গৃহে যাত্রাকালেও নানা অশুভ শক্তির হাত থেকে গুণীকে পরিত্রাণ পেতে হয়। এ তারই মন্ত্র ৯ এমন কি গরুড় হেন শক্তিশালী পাখি, তাও যেন এই মন্ত্রে কাটা পড়ে ১০ একটি নতুন কাঁসার থালা রোগীর পিঠে লাগিয়ে এই মন্ত্র পড়া হয়। দেহে বিষ থাকলে ওই থালা দেহের সঙ্গে লেগে যায় এবং সব বিষ টেনে নেয়। যতক্ষণ দেহে বিষ থাকে, ততক্ষণ ওই মন্ত্র-পড়া থালা কিছুতেই খুলে পড়ে না।

কাঁসা ঠুকলে করে ঝাঁই, কাঁসার লেপ্‌টনে বিষ নাই
নাই বিষ মা মনসার চরণে।
কাঁসার লেপ্‌টনে কাঁসা সার
কাঁসার লেপ্‌টনে বিষ নাই আর
নাই বিষ মা মনসার চরণে।
কাঁসা লাড়ি[১] কাঁসা ঝাড়ি, কাঁসা পড়ে করিলাম সার
কাঁসার লেপ্‌টনে বিষ নাই আর।
নাই বিষ মা মনসার চরণে॥[২]

১৩৫

॥ পাচুয়া[৩] মন্ত্র-ছড়া ॥

ক. ছু ধারে ছুটি দাঁড়, দৃষ্টি দিলেন ঈশ্বরের ভাই
নজর-বিজর[৪] ছেড়ে যা, কূট-কপোত[৫] ভাসিয়ে যা,
চালান-কুজ্ঞান[৬] খসিয়ে যা,—
ভোল করি ভোলানাথ, রাম লক্ষণের দোহাই।
আমি যেই রাস্তা চলি, সঙ্গে যায় বাপ বড় বিগড়া[৭]
বাহুড়ি ধরবি[৮], বরঞ্চ পায়ে পড়ি, ছাড়বি না।
পাঠায়েছেন বীরবাহুতি মা,[৯]
যদি ছাড়ো বাপরা হাড়ী,[১০] সিদ্ধি চণ্ডীদেবী গাড়ি,[১১]

১ নাড়ি ২ অধরচন্দ্র দাস (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। ১২৮, ১২৯, ১৩০-সংখ্যক ছড়া।

৩ 'পাকুয়া,' 'পেঁচো,' অপদেবতা বিশেষ। কাউকে পেঁচোয় পেলে তখন একটি নিমের ডাল দিয়ে তার আপাদমস্তক ঝাড়তে ঝাড়তে ওঝা এই ছড়া বলে ৪ কু-নজর। 'বিজর' সহচর শব্দ ৫ 'কূট' অর্থাৎ বিষ। 'কপোত' সহচর শব্দ ৬ শত্রুতা করে যে রোগ 'চালনা' করে দেওয়া হয়েছে, যে কাজ কু-জ্ঞানের ফল। কথান্তর: শিক্ষার কুজ্ঞান ৭ সকল ওঝা-গুণীর পিতৃতুল্য নরসিংহ বিগড়ে গেছেন ৮ বেড়ে বা বেষ্টন করে ধরবি ৯ ওঝা-গুণীদের মাতৃতুল্যা দেবী ১০ রোগীর বাড়ী থেকে ওঝার কাছে খবর আসবার পর ওঝারা সর্বপ্রথমে নিজের দেহ-শুদ্ধ করে নেন। এটি দেহ-শুদ্ধির মন্ত্র-ছড়া। অপর কোনো ওঝার কু-মন্ত্রে যেন পথে তাঁর কোনো বিপদ না ঘটে। যদি তখন ওঝাকে দেবী এবং অন্যান্য শক্তি রক্ষা না করেন তবে দেবীর বাপ হাড়ী জাতিতে পরিণত হবেন এবং তিনি শিব-গণেশের মাথা খাবেন ১১ ওঝা এর অর্থ করতে পারেন নি।

বিগাড়্-বিগাড়্ ন ছাড়িবু, বকবকি-বকবকি যাব্
শিবাই-শঙ্কু-গণেশের মাথা খাবু ॥

ঘ. কহিল পার্বতী অচম্বিতে অঘোর নিশারাত্রে—
ডিম্বুর[১] বাজে ভয় নাই তাতে
কাত্তিকশরের[২] অপঘাত হয়ে গুপতে[৩]
ঝাড়িতে বসিলেন নর্‌সিং মুরারি
উঠ কাত্তিকশর, তোমার ডিম্বুর ধরি কৈল[৪] গান ;
শ্মশানবাসী ধুয়ে যান
ধান-ধুকুড়ি ধায়ে যা, সাতটি বাঁধন বাঁধি থা[৫]
বাঁধ্ ন বাঁধো বলি—
হাড়ীর কি চণ্ডীমার আইজ্জায়[৬] ॥

ঙ. নিমতলে থাকে পাঙ্কু[৭]
তোর ডাকে ছেলে কান্দে, কি করি উপায় !
ওরে ছাইল্যা কান্দিস না, আমি যাই ঘর—
মায়ের কোলে দুধ খেয়ে সুখে নিদ্রা যা।
খাটে বসি' নধা-নোধনী[৮] করন্তি বিচার :
তোকে মারি ঝাঁটার বাড়ি, কৃষ্ণ করেন পার—
কৃষ্ণের দোহাই পাঙ্কু, ছাড়্ একবার[৯] ॥

১ ডম্বরু ২ কাত্তিকেশ্বর ৩ গুপ্তভাবে অপঘাত হয়েছে ৪ করিল ৫ বেঁধে রাখ ৬ আজ্ঞায়। এটি মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ। সাদৃশ্যাত্মক যাদুর নিদর্শন। একদা কাত্তিকের অপঘাত হয়, নরসিং তাঁকে সুস্থ করেন। তেমনি কাত্তিকের মতোই আজকের রোগীকেও বর্তমান ওঝা নরসিংয়ের প্রসাদে সুস্থ করে তুলবেন ৭ মন্ত্রের তৃতীয়াংশ, পাঙ্কুর জন্মকথা। নিমগাছে তার অধিষ্ঠান। মঙ্গলকাব্যে যেমন দেবদেবীর তুষ্টি বিধানের জন্যে তাঁদের জন্ম, বিবাহ ইত্যাদি কথিত হয়, মন্ত্রের অপদেবতার ক্ষেত্রেও তাই। উভয়ত্র একই মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল ৮ নোধা নোধ্‌নী। এই মন্ত্রের উৎসভূমি যে নোধা-অধ্যুষিত অঞ্চল, তা অনুমান করা যায় ৯ এটি এই মন্ত্রের ধুয়ার মতো বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। ঠাকুরের দোহাই এবং ঝাঁটার প্রহার দু'দিক থেকেই পেঁচোকে দূর করবার চেষ্টা। অপদেবতা সম্পর্কে আদিম মানুষের বিশ্বাস : অপদেবতা অপরের দেহে সঞ্চারিত হতে এবং বিদূরিত হতে পারে, একই দেহে দু'জন বাস করতে পারে, এক দেহেই দুটি আত্মা থাকতে পারে।

ঘ. আমি যেই রাজা চলি সঙ্গে যায় বাপ বীর বিগড়া
বাহড়ি মোর সঙ্গে বিবাদ করি
ধরবি বয়ক ছাড়বি না, পাঠায়েছেন বীরবাহুতি মা,
আব্ আব্ বল্ বল্ গোজাই[1] দিল পা
সাত পুত্র পূজিল, কোলের বুলুত্[2] গোজা ছাড়ায়ে পালাল।
ধর্ম বোলছি, সাক্ষী শুন মোর কথা
সাত শূলে উড়াইব রাবণের মাথা।
বেটাই, কষে মারব ঝাঁটার বাড়ি, কিষ্ণের দোহাই,
পিঠে মারি পিঠ করি ফাল
হকুমাল্লার দোহাই খোদার,[3] পাক্কু, ছাড়্ একবার॥

ঙ. বড়ো ঘরের বউ জলকে গেলাই
দেশের কাব্‌টি[4]
তাহা দেখি পাক্কুয়ার ভূত পুল-পরিপাটি[5]॥
আরে পাক্কু, আরে ভূত, মারিব শিরামের[6] বাণ
পাক্কুয়াকে ঝাঁটার মুণ্ডা পিঠে করি প্রহার।
ছাড়্ ছাড়্ পাক্কুয়া বেটা, ছাড়্ একবার॥

চ. তোর থেকে চলে পাক্কু 'অমুকা'র[7] ডোর
তোর অঙ্গে ভিড়িয়াছে নজর সকল
ভিড়িয়াছে তোর উজরে,[8]
না ছাড়িবু, তলকু না ভিড়িবু,
আরে মাঝেতে বাঁধিবু,
তোর বড়ো নীলা,[9] বুকে মারি ঝাঁটার বাড়ি—
কিষ্ণ করেন পার, তোকে কিষ্ণের দোহাই
খোদার পাক্কু ছাড়্ একবার॥

১ গেঁড়ি-গুগলি এই দিয়ে পেঁচোকে পূজো দেওয়া হয় ২ কোলের আঁচল বা কোঁচড় থেকে গেঁড়ি-গুগলি পালিয়ে গেল ৩ অধিকাংশ মন্ত্রেই একাধিক দেবতার দোহাই থাকে, এখানে ইসলাম ধর্মও বাদ যায় নি ৪ ওঝা অর্থ করতে পারেন নি ৫ পুলকে আত্মহারা হল ৬ শ্রীরামের ৭ রোগী বা রোগিণীর নাম বলতে হয় ৮ উদরে ৯ লীলা।

ছ. পূবে আইল পাকু পূবে দিয়া ভর
কোন্ কোন্ দেবতাকে পাকু না করিবু ডর
বেটাই, কবে মারব ঝাঁটার বাড়ি, পিঠে করি প্রহার
ছাড়্ ছাড়্ পাকুয়া ছাড়্ একবার ॥

জ. শনি-মঙ্গলবারে পাকুয়ার জনম
চতুর্দিকে বন্ধ করে পাপিষ্ঠ জীবন
চতুর্দিকে বন্ধ করে পা না নিয়ে চায়[1]
হেনকালে মামু আইল দেখিবারে পাই
বেটাব মুখ করিছে ঝাঁক্‌বাঁক্, চোখ করিছে ছাই
মারিব শিরামের বাণ, ছাড়ে দিব নাই
ছাড়্ বে পাকুয়ার ভূত, পিঠে মারি লাথ—
তোকে কিষ্ণের দোহাই, খোদার পাকু ছাড়্ একবার ॥

ঝ. পিঢা[2] দিল, পানি দিল, বসতে দিল আসন
সাত গাই কেটে দিল, করিল মার্যমান[3]
বেটাই, কবে মারব ঝাঁটার বাড়ি, পিঠ করি ফাল[4]
হকুমাল্লার দোহাই খোদার পাকু, ছাড়্ একবাব ॥

১৩৬

১ ঢ়া'নও ছাড়াবার মন্ত্র ছড়া

ক. গুণীর গা-বাঁধা[৬] ,
অচলে কার শব্দেব সার, বিষহরি মনসা মাকে কোটি কোটি নমস্কার
তোর ঘরে পাড়িয়া মোর ঘরে লকাও[৭]—
মারি দেো মেঘনাদ ডুমুব[৮], চলে যাক ঝাঁপান।
স্বর্গে হড়-হড়, মর্ত্যে[৯] জয়জয়কার—
মনসা মাকে কোটি কোটি নমস্কাব।

১ ওঝা এই অংশেব অর্থ কবতে পাবেন নি ২ পিড়ে ৩ 'মর্যাদা' প্রদর্শন করল ৪ প্রহার করে পিঠ 'ফালা ফালা করে দেব'।

৫ ডাইনী ৬ গুণীর মন্ত্র যাতে পুরোপুরি কার্যকবী হতে পারে, অপর কারো দু-প্রভাবিত না হয়, সে জন্যে গুণীর নিজের দেহ-শুদ্ধির মন্ত্র ৭ সঞ্চারিত হও ৮ মেঘের মতো শব্দকারী ডমরু ৯ মর্ত্যে।

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর
সাক্ষাৎ গুরু পরম ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রীগুরু দেবায় নমঃ।
আসন শাসন বুলি[১] যাও ব্রহ্মাংকর অস্থির কপাট।
মড়া নাচে কিচ্‌কিচায়, ডাইনী নাচে ঘিচ্‌ঘিচায়—
নো পো[২] বাট্, র' র' কাট্
চেদ্ গুরুনাথের আজ্ঞায় নাগ অন্ধকার।
ব্রহ্মার কুমণ্ডল[৩] গলায় শীতল
কুচকুর বাপ নাই কুমণ্ডলের ভিতর।
রামকে স্মরি মাইন্নু[৪] তাল, চৌদিক বেড়্‌নু মহাজাল।
কার আইজ্ঞায়? সীতা-শিরামের আজ্ঞায়—
চৌদিকে বেড়্‌নু লোহার জাল॥

খ. গুণীর যাত্রাকালে রাস্তা-বাঁধা[৫] :
সদাইয়ের[৬] হাতের কোদাল, কানাই চাঁচে বাট্[৭]।
নাগ-নাগিন্[৮] ছাড়ো বাট্—
পেছু আসছে বীর হনুমান, হাতে লোহার ডাং[৯]॥

গ. ডা'ন ছাড়ানো :
করাত করাত রামের করাত[১০], আসতে কাটে যা'তে কাটে,
সকলের কুজ্ঞান[১১] কাটে, আসিলেক কারবার কাটে,
ভূত কাটে প্রেত কাটে, মড়া কাটে, মশান কাটে,
চিট্‌-মিট্ কুজ্ঞান কাটে, কার আজ্ঞায় কাটে—
বড়ো বাপ নরসিং গুরুর আজ্ঞায় কাটে করে[১২] খান্‌খান্।
উলাট চাপড় চড়্‌-চড়ানি, পালট চাপড় ঝাঁই—
আপনার পো কান্‌ছে ঘরকে চলে যা[১৩]।

১ ঘুরে ঘুরে ২ নয় পোয়া ৩ কমণ্ডলু ৪ মারলাম ৫ রোগীর গৃহে আগমন কালে পশু-পাখি এবং অপদেবতারা গুণীকে যাতে বাধা না দেয়, তার মন্ত্র ৬ সদ্‌গুরুর ৭ কোদাল দিয়ে কানাই রাস্তা চাঁচছে, অর্থাৎ পরিষ্কার করে, গুণী যাতে নিরাপদে রোগীর বাড়িতে যেতে পারেন ৮ নাগ-নাগিণী ৯ লোহার দণ্ড ১০ করাতের মতো এই রোগ মন্ত্রের ফলে কেটে যাক, যাদুধর্মিতা ১১ কুনজর ১২ কেটে করে ১৩ ডাইনীকে বলা হচ্ছে, তোর নিজের ছেলে ঘরে কাঁদছে, রোগীকে ছেড়ে ঘরে যা।

কার আজ্ঞায় ? বড়ো বাপ নরসিং গুরুর আইজ্ঞায়।
কাল সাপিনী মনোমোহিনী যোগীর ভণ্ড[১]—
দেখে দেখল নয়ন-কনী
জীব্-বদিনী[২] হো[৩], কি সাপে কামড়াইলো,
দিবে খেয়ে জিল, আড়-পড়শী চেলে দিল—
দেখল নয়ন-কনী[৪]।
এই সাপের পদ্[৫] কি ?
গুরুর চরণ নিত্যি বাঁধি, নিত্যি ভোজি[৬]
এই সাপের বিষ নাই
বাদিনী হো কাল ভুজঙ্গিনী, বাদিনী হো, বাদিনী হো।
ওঁ হ্রীং ক্রীং স্বাহা। ওঁ শব্দে দৃষ্টি উড়ি পালা।
ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরো। উড়্ দৃষ্টি, আমি যাই ঘরো।
ওঁ শঙ্খ চক্র গদাধরো। উড়্ দৃষ্টি, আমি যাই ঘরো॥[৭]

১৩৭

॥ শিশুর ঘুমোবার আগের ছড়া, হুগলি ॥

মুতন মুতন ঝাড়া।
দিনে মুতে সাতবার, রাতে মুতে একবার॥[৮]

১ ভণ্ড যোগী ২ জীবের শত্রু ৩ হে, সম্বোধন ৪ সাপের বিষের মতো কু-দৃষ্টি, যার ফলে এই রোগ হয়েছে ৫ বিষের ঔষধ ৬ ভজনা করি ৭ কমলকান্ত মাহাত (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৫-সংখ্যক ছড়া।

স্থানাভাবে কেবল একটি জেলা থেকেই রোগ-যন্ত্রণা-চিকিৎসার মন্ত্র-ছড়া দিলাম। আমার 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭) বইটিতে জলপাইগুড়ি থেকে সংগৃহীত এই ধরণের কিছু মন্ত্র-ছড়া পাওয়া যাবে। এই ধরণের ছড়া আসলে Folk-medicine-এর অন্তর্গত। Indian Folk-lore congress (Calcutta : June, 1977)-এর অধিবেশনে পঠিত আমার 'Bengali Folk-medicine : A particular aspect' প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

১ রাতে বিছানায় শিশুর প্রস্রাব বন্ধ করবার জন্যে শোবার আগে তিনবার এই ছড়াটি বলে মায়েরা শিশুর মাথায় ফুঁ দেয়। উৎপলকান্তি গায়েন (জনাই-পুর, হুগলি)।

১৩৮

[বরের ছড়া, চট্টগ্রাম]

ইজ্‌লা[১] রে ইজ্‌লা !
কন্যার মারে নেঅলা,[২] দুলার[৩] মারে ঘল্লা[৪] ,
দুলার মারে নেঅলা, কন্যার মারে ঘল্লা ॥[৫]

১৩৯

পিতৃ-কর্তৃক কথিত বিয়ের[৬] ছড়া, বর্ধমান

শুনুন শুনুন মহাশয়, করি নিবেদন।
শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ-কার্য দেখুন সর্বজন ॥
পিঁড়ের ওপর চেপে বর, মনে বড়ো খুশি।
নর-সুন্দর বসনে বদন ঢাকি' দিলেন আসি ॥
ব্রজাঙ্গনা বেড়ে সাত পাক বদনে পান ধরি'।
চারি চোহে[৭] চেয়ে দোঁহে মাল্য বদল করি ॥
গিরিরাজ মালা দিয়ে যাবেন অন্তঃপুরে।
সুলোক কুলোক দেন চালের বাতা ছেড়ে ॥

১ বিবাহের বা অন্য কোনো উৎসবের সময় অন্তঃপুরচারিণীদের গান ২ বের কর্ ৩ পাত্রের, বরের ৪ ঢোকাও, ভেতরে নিয়ে এস ৫ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮–৫৭৫)।

"এই ছড়াটিতে চট্টগ্রামের একটি কুৎসিত প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাই। এখন কিন্তু এই প্রথাটি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে ,·· কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি এখনও বিবাহে এই ছড়াটি নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করে,..। এই কুৎসিত প্রথাটি "বিবাহে বামাকণ্ঠের রাগিণী"। মেয়েদের দ্বারা সমস্বরে বিবাহ বা অন্য কোনো আনন্দ উৎসবে এই "ইজ্‌লা" গান গীত হইত।..."

৬ বর-কনের শুভদৃষ্টির সময় এই ছড়া বলা হয়। 'চোখ' ও 'দৃষ্টি'র সঙ্গে যাদুর একটি যোগ আছে। বর-কনের প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের সময়ে কুলোক যাতে কু-দৃষ্টি দিতে না পারে কিংবা দিলেও তা কার্যকরী না হয়, তারই প্রতিষেধক রূপে (Apotropaic Remedy) এই ছড়া কথিত হয় ৭ চোখে।

এ সময়ে শুভ-কর্মে মন করিবে যে।
চৌরাশি নরক-কুণ্ডে পড়িবে সে।
তারে উহুঁ উহুঁ টিকে ডেকে বলব আমি।
সপ্তম পুরুষ তার হবেন অধোগামী।[1]

১ তরুণকুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : মানবজীবন সম্পর্কীয়

প্রথম পর্যায় : ছেলেভুলানো ও শিশু সম্পর্কান্বিত ছড়া

১৪০

॥ ঘুমপাড়ানী ছড়া ও গান ॥

নিদ্রাবতী মাসী তুমি
মোদের বাড়ী এস ;
খাট নাই, পালঙ নাই,
খুকুর চক্ষে পেতে ব'সো।
ছানা দেব ননী দেব
দেব মিঠে কথা ;
ঘুম-ঘুমালী হবে তুমি
পেয়ে খুকুর গাথা ॥[1]

১৪১

হাহি[2] আস্য দিতে, চল্ সদাগর তুতে—
কছু-ঝুছু কপাট আছে দিতে
মনহর[3] রুটি আছে খাতে ॥

১৪২

আয় রে ঘুম আয়—
ভালুকে হুন কুথা[4] পায়, ভালুকে ত্যাল কুথা পায় ;
আলুনা-মালুনা[5] খায্যে ভালুক
বন্‌কে পালায় যায়।
আয় রে ঘুম আয় ॥

১ বান্ধব পত্রিকা : (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। পৃ. ১০১)। সমস্ত ঘুমপাড়ানী গানে মাসী-পিসীর ওপর যে রহস্য আরোপিত হয়েছে, তাতে এদের প্রায় যাদুকরী বলা যায়।

২ হাই ঘুমের পূর্বলক্ষণ ৩ সুন্দর কপাট—এই অর্থে মনোহর।

৪ কোথা ৫ নুন না থাকায় খাবারের যে স্বাদহীনতা। বহু ছড়াতেই পশু-পাখির নুন খাবার কথা আছে। যেমন, বর্তমান সংকলনেরই ১৭৭-সংখ্যক

১৪৩

ও-ও-ও—
ছেলি[১] ঘুমালো।
ছেলির নাম বাগলা[২]
ও কুড়িয়ি[৩] খাবলা ॥[৪]

১৪৪

ঘুমুলে ঘুমুলে পান খেলে না,
পান সেজেছি এলাচ-দানা :
ছোট বলে কি মনে ধরে না,
ছোট কি কখন বড় হবে না ![৫]

১৪৫

এক তারায় ঝারাবারা[৬], দু তারায় মানুষ মারা।[৭]
তিন তারায় কোষে কোষ, চার তারার নাহি দোষ ॥[৮]

ছড়াতে। পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া একাধিক ছড়াতে শেয়ালের কুল বা তেঁতুল খাওয়ার পর নুন না পাবার কথা আছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' (১৬ শ সং)-য় ৯০-সংখ্যক ছড়াতে শেয়ালের শশা খাবার পর নুন না-পাবার কথা পাই : তারা নুণ কোথা পায় ? আলুণ আলুণ খেয়ে বনেতে পালায়। সেখানেও প্রথম পঙ্‌ক্তি . আয় ঘুম আয়। ভালুকের নুন খাবার প্রসঙ্গে দ্র. ভবতারণ দত্ত : বাঙলা দেশের ছড়া (ভাদ্র, ১৩৭৭), ৭১ ও ৭২-ক সংখ্যক ছড়া।

১ ছেলে ২ 'বাবলা' নাম বিশেষ ৩ কুড়িয়ে ৪ আবদুর রর (সরমস্তপুর, মুর্শিদাবাদ)।

৫ উৎসাহ : (তৃতীয়বর্ষ : চৈত্র, ১৩০৬। পৃ. ২২৫)।

৬ ঘুমোবার আগে, বা ঘরে ঢুকবার আগে, এক তারা দেখে ঢোকা অমঙ্গলজনক। মতিলাল দাস "শিশুমনের চলচ্চিত্র" (বিচিত্রা : বৈশাখ, ১৩৩৯। পৃ. ৫২৬) প্রবন্ধে এর কথান্তর দিয়েছেন : 'এক তারা, বামন মারা'। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস আছে, শিবচতুর্দশীর পরদিন ব্রতীনীর। 'পারণ' সেরে আকাশে তারা না দেখে ঘুমুতে পারবে না। ঘুমুলে পরজন্মে কুকুর হয়ে জন্মাতে হবে ৭ দুটি তারা দেখে ঘরে ঢুকলে মানুষ হত্যার পাপ হয় ৮ ঘুমপাড়ানি ছড়া হলেও এর মধ্যে মন্ত্রের বা যাদুর দিক আছে।

১৪৬

কাঁদুনে মাসী[১], কাঁদুনে মাসী নিমতলাতে বাসা—
ছেলে কাঁদাবে বলে তুমি মনে করেচ আশা ?
শোলা ডুবে পাথর ভাসে। কাঁদুনে ছেলে ফিক্ করে হাসে[২] ॥

১৪৭

॥ শিশুকে আদর এবং অপরের কু-নজর কাটাবার ছড়া ॥

কে ধনকে মার্যে দিল দুধের গতরে[৩]—
দুধ লাড়ু পাকা পান গালের ভিতরে ॥

১৪৮

ধন ধন ধন, লট্টইয়াখাডার[৪] বন
কে ধনকে মার্যো দিল, পুড়ুক তাদের মন ॥

১৪৯

আলো রে ঝালো রে আঁধার ঘরে বাতি জ্বলে,
যে আমার খোকাকে খোঁড়ে, যেন তার মুখখানা পোড়ে ॥[৫]

১৫০

ধন ধন এম্‌নি তদের[৬] মন—
আমার ধন কে মারেছে, কে ধরেছে

১ যে অপপ্রভাব মন্ত্রবলে শিশুদের কাঁদায় ২ সুষমা গুছাইত (জ্যোৎঘনশ্যাম, মেদিনীপুর)। শিশুর জাগরণ ও কান্নার জন্যে এক রহস্যময় অশুভকারী শক্তিকে দায়ী করা হয় সাধারণতঃ। এজন্য ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রও আছে, বর্তমান সঙ্কলনেই তা সঙ্কলিত হয়েছে।

৩ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে।

৪ নটে শাকের।

৫ নন্দোৎসব: (সাধনা: কার্তিক, ১৩০২। পৃ. ৪১০)। মধ্যবাঙলায় এবং নদীয়া অঞ্চলে চলিত। 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-তে কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা: সাঁঝের বাতি নড়েচড়ে, / খোকনকে যে খোঁড়ে, তার / মুখটি পোড়ে! / আর যে খোঁড়ে মনে মনে, / পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে।

৬ তোদের।

যে দিয়েছে গালি
আন্ গুঁ'জে উনুনপোড়া কাঠটা[১]
তার মুখে গঁাসিদি[২] ।[৩]

১৫১

। শিশুকে আদরের ছড়া ।

বেটা ছেলেটা সোনা-ভেলাটা
টপ্ করে নিয়ে কোলে ফেলাটা।
মেয়ে ছেলেটা কাদা-ভেলাটা
টপ্ করে নিয়ে জলে ফেলাটা ।[৪]

১৫২

দিদির মাথায় লটকা চুল[৫] কোথায় পাবো গাঁদাফুল ?
গাঁদা ফুলের ছড়াছড়ি, আয় গাঁদাফুল আমার বাড়ি—
বসতে দেব লাল মাদুরি[৬]
খেতে দেব মিঠে পান, গেয়ে শোনাবো অনেক গান ।

১৫৩

। শিশুর সঙ্গে কৌতুকের ছড়া ।

কি ! নাকের ঘি !
নাক শুকালে খাবি কী ![৭]

১৫৪

এক কড়া কড়ি দেব
—দাঁত দেখি ![৮]

১ উনুনের পোড়া কাঠটা ২ মুখে গুঁজে দিই ৩ হীরালাল মাহাত (জয়পুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

৪ গ্রন্থ-সমালোচনা : মানসী ও মর্মবাণী (পৌষ, ১৩২৯ । পৃ. ৪৭৮)। 'বিচিত্রসাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড । ১৩৬৩) বইতে (পৃ. ২০১) ডঃ সুকুমার সেন এর কথান্তর দিয়েছেন : মেয়েছেলে কাদার ডেলা / ধপাস্ করে জলে ফেলা।

৫ লম্বা চুল ৬ মাদুর ।

৭ কোনো শিশুর সর্দি হলে, তার সঙ্গে কৌতুক করে এটি বলা হয় ।

৮ শিশুর নতুন দাঁত উঠলে প্রিয়জনেরা এই বলে দাঁত দেখতে চান ।

১৫৫

তিনটি পিঁড়ির পরে, যাদুমণি খেলা করে
গাল বেয়ে লাল পড়ে ॥[১]

১৫৬

ন্যাংটা ঘুতুম্, বিলাই হুতুম্, সাত ছাওয়ালের মা !
ঘুতুম্ কাপড় পরে না ॥[২]

১৫৭

॥ শিশুকে সস্নেহ শাসন ও ভীতি প্রদর্শন ॥

ও ছেলের কুবুদ্ধি !
ফ্যাল্‌ব কুয়োর মধ্যি ![৩]

১৫৮

॥ শিশুকে ভয় দেখানোর ছড়া ॥

চোপ্ রে চোপ্,
শিয়াল কান্দেছে ;
কালা কুত্তাটা[৪] দুয়ারে ভুকেছে[৫] ॥[৬]

১৫৯

হুয়াক্কা হুয়াক্কা হুয়াক্কা হুয়া—
ছেলে-পিলেদিকে বাগিয়ে-গুছিয়ে শোয়া ॥[৭]

১ শিশুর মুখ থেকে লাল। পড়তে থাকলে প্রিয়জনেরা এই ছড়া বলে কৌতুক করেন।

২ আশিস সান্যাল (পাবনা,সদর)। শিশু উলঙ্গ হয়ে থাকলে এই ছড়া বলা হয়।

৩ শৈলবালা বসু (খুলনা)।

৪ কুকুরটা ৫ ডাকছে ৬ কথান্তর : আগাতি পছিমতি শিয়াল ডাকেছে/ কুন্ঠে গেইল্ গে বাহোমারী / তোর ছোয়া কান্দেসে—দি রাজবংশী'স্ অব্ নর্থ্ বেঙ্গল, পৃ. ৯১।

৭ তুলসীদাস সিংহ : পল্লীর বারমাস্যা (বসুধারা পত্রিকা : মাঘ, ১৩৬৬)। রাঢ়বঙ্গে চলিত।

১৬০

হলো-নৈ[১] গে হলো-নৈ—
বাবুরির গে ফুল[২] ;
কানকাটা কুকুরটা আইসে কতোদূর ॥[৩]

১৬১

আগাত্তি[৪] হরিণ কান্দেছে[৫] ।
ওগে বাহামারী[৬], তোর ছোয়া কান্দেছে ॥[৭]

১৬২

হসন ডীঘি[৮], হসন ডীঘি, ডুবুরা রাজার পাট।
কোর্তো নদীর[৯] হাট পড়েছে[১০] মীরনগরের ডাকাত্ ।
শূয়োর-মারা ভের্ভেরী, আরো ভিতরগড়—
পূর্বে ছিল জগ্দলের হাট, জঙ্গলে কড্-কড়্[১১] ॥
এ'কেলায়-দোকোলায় না যায় আরো হাঁটা।
ডাকাত্তি করিয়া নেছে[১২] ভাল্-মানুষির[১৩] টাকা ॥[১৪]

১ 'ওই-যে ওই আসছে'—এই অর্থে ২ ফুল গাছ বিশেষ ৩ কথান্তর :

হলো-নৈ গে হলো-নৈ—'বাবুরির গে পাত[১] ; / কানকাটাটা আইসেছে[২], ঝিত্ মারিয়া[৩] থাক্ ॥[৪]

১ পাতা ২ আসছে ৩ চুপ করে ৪ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। অপর কথান্তর : আয় ঘুম, যায় ঘুম, পাইকরের পাক/কানকাটা কুকুরটা আইস্চে/ঝিত্ করিয়া থাক।

৪ পূর্বদিকে ৫ কাঁদছে ৬ পাড়া-বেড়ানী । কথান্তর : বাহোমারী। ৭ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। অপর কথান্তর ; আগত্তি হোরিণ কান্দেসে হে হে / হোদ্দেগো বাহোমারী তোর ছোয়া কান্দেসে—দি রাজবংশী'স অফ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৬৯।

৮ হোসেন দীঘি, স্থান বিশেষ ৯ করতোয়া নদীর ১০ হাট অবস্থিত ১১ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ১২ নিচ্ছে, নেয় ১৩ ভালো মানুষের ১৪ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

১৬৩

॥ ক্রন্দনরত শিশুকে চুপ করাবার ছড়া ॥

কাঁদিস না রে ধন, তর[১] মা গেছে বন।
কাঁদিস্ না রে গইরা[২], তর মা গেছে ঝরুইরা[৩] ॥

১৬৪

আরে হোকর[৪] ছোওয়া,
তোর মাও গেইছে বাহো মারিবা[৫]'।
বাহো মারিয়া আনিবে টাকা—
তাক্ দি' কিনিসে নালভুমি ফোতা[৬]।
চুপ্‌রে চুপ্ বাউ, কান্নিস্[৭] না ॥[৮]

১ তোর ২ 'গাগরা' : আদরার্থে শিশুকে সম্বোধন ৩ ঝোরাতে, ঝর্ণাতে।

৪ বিরক্তি-সূচক অব্যয় ৫ তোর মা গেছে পাড়া বেড়াতে ৬ তাই দিয়ে কিনেছে 'নালভূমি ফোতা' ('ফোতা' : জলপাইগুড়ির রাজবংশী স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ) ৭ কাঁদিস ৮ কৃথা হাজরা (হাজরাপাড়া, জলপাই-গুড়ি)। কথান্তর : চোপ্‌রে চোপ্ হোকোর ছোয়া, / তোর বাপ গেইচে[১] শূয়োর চরেবা'[২]/শূয়োর চরাইতে[৩] পাইসে[৪] টাকা / তোর মাও-র বাদে কিনি' আনিবে ঘুঙ্‌নি ফোতা।

১ গেছে ২ চরাতে ৩ চরিয়ে ৪ পেয়েছে।

অপর কথান্তর : চুপ্‌রে চুপ্‌রে হোকোশ[১] ছোয়া / তোর বাপ গেইসে সোর[২] মারিবা। /সোর মারিতে পাইসে টাকা / কিনিয়া আনিসে মালদই ফতা[৩]।

১ 'হোকর'ও 'হোকোশ' সমার্থক ২ শূয়োর ৩ মালদহ থেকে কিনে আনা 'ফোতা'।

তৃতীয় কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : চুপ্‌রে হোকোশ ছাওয়া / তোর বাপ গেইসে সোর চরেবা / সোর চরাইতে পাইসে টাকা / টাকাক্ মাইচ্চে পাক্‌তার[১] / ছাওয়ার মাও ধরিসে ভাতার[২] ॥[৩]।

১ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ২ ছেলের মা অপর পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে ৩ ডঃ চারুচন্দ্র সান্ন্যাল : 'দি রাজবংশী'স অফ নথ বেঙ্গল' পৃ. ৬৮.

১৬৫

বাপ গেল ঠ্যাঁঠা হাল[১] নিয়ে—
মা গেল তিতা শাগ তোড়ে[২] ;
না কাঁদিস বাছা রে,
সুড়্কি অ্যাসেন[৩] পিঠা বনায়[৪] দিব ॥

১৬৬

বৈষ্ণব ভিখারী ॥ টুক্কি[৫] বাজাং টুঙুং, চাউল প্যাবে পাং[৬] ।
রাজার বেটী ভাত আন্দিছে,[৭] মুকুর-মাকার খাং[৮] ॥
একটা-দুইটা ভাত ফেলাইতে ডাক্কালি[৯] নাগাং[১০] ॥
গৃহিণী ॥ বরগী[১১] তুই টুক্কি বাজাইস না—
নিজের ছাওয়া উঠিলে বর্গী, ভিক্কা পাবু না[১২] ॥

১৬৭

॥ শিশুকে নাচাবার ছড়া ॥

ছোয়া নাচাও[১৩] মুই খেতেই-খেইয়া
খাবার স'ম্[১৪] মুই খেইয়া-পেটা[১৫] ॥[১৬]

১৬৮

হামার বাউ[১৭], হামার বাউ, নাচন পখিয়া[১৮]—
যতো মাইয়া ভাত খায়[১৯] নাচন দেখিয়া ॥

১ যে লাঙলের ('হাল') কোনো শ্রী নেই, কাজের অনুপযুক্ত, ঠুঁটো (?)
২ তিক্ত শাক বিশেষ তুলতে ৩ চমৎকার, সুন্দর প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত ৪ বানিয়ে।

৫ এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, যা বাজিয়ে বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষে করা হয়
৬ এক সের চাল পাই ৭ রেঁধেছে ৮ খাই ৯ আঘাত করবার দণ্ড বিশেষ
১০ লাগাই ১১ বৈরাগী ১২ পাবি না।

১৩ নাচাই ১৪ সময়ে ১৫ যার পেট বড়ো, খায় বেশি ১৬ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

১৭ আমার, আমাদের ছেলে। কথান্তর: হামার মাই, হামার মাই ১৮ নাচন দেখে। পাখির মতো নাচন (?) ১৯ কথান্তর: যতো বুড়া ভাত খাঁছে।

চালত্ কান্দে ভুয়া, হামার মাই নাচমজানে
হামরা পাবো[1] শুয়া ॥[2]

১৬৯

হাড়্গোয়ল[3] গে হাড়্গোয়ল,
তোর মাও কোঠে গেইছে[4] ?
—ছয় কুড়ি ছোয়া নিয়া গান শুনিবা' গেইছে[5] ॥
গাজের পানি ইতল-পিতল[6]
সাত খান পিতলে গড়ায় নাও
চলিয়া গেইল্[7] গাজর মাও ॥
গাজর মাও-কেনা[8] হাসিবে
উমুর-ঝুমুর করি' নাচিবে ॥[9]

১৭০

বেরুবাড়ীর হাট যদি গেমু হয়[10],
দুন-পানি-পাথরখান[11] যদি নাই আসিল্ হয়[12],
ইস্কুল ঘরটাত্ যদি নাই সোন্দাছু হয়[13],
টাংহা[14] সিপাইটা যদি নাই আসিল্ হয়[15],

১ পাবো ২ কুথা হাজরা (হাজরা পাড়া, জলপাইগুড়ি)। অতিরিক্ত কথা : হামার মাই নাচেছে—/টাকা দান পড়ে গে / টাকা দান পড়ে। অপর কথান্তর : এ নাচোন পখিয়ায় / যত বাড়ীর বুড়ালা[1] আসে / নাচোন দেখিয়া।

১ বুড়োরা। দ্রঃ ডঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল লিখিত 'দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল' (১৯৫৬), পৃ. ৭০। এই গ্রন্থের উক্ত পৃষ্ঠাতে কথান্তর : চালোত্ কান্দে ঝেঁচু / মোর দিদিটা নাচোন করে / হামরা পামু কিছু। সেখানে এটি শিশুকে তেল মাখাবার ছড়া বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৩ হাড়গিলে পাখি (?) ৪ মা কোথায় গেছে ৫ গান শুনতে গেছে ৬ উথাল পাথাল ৭ গেল ৮ মা-টি ৯ বিজয় ফকির (পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)।

১০ যদি না যেতাম ১১ ঝড়, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি ১২ যদি না আসত ১৩ ইস্কুল ঘরটিতে যদি প্রবেশ না করতাম ১৪ ঢাকা, লম্বা ১৫ যদি না আসত।

হিঙ্গুং চন্দলাল ছোওয়া[১] কোটে পাছু হয়[২]—
খেইয়া খেইয়া করি কাক্ নাচাছু হয়[৩] ।[৪]

১৭১

টোকোরাই ঝুমঝুম, টোকোরাই ঝুমঝুম্
ছাওয়া বুল্বুল্, ছাওয়া বুল্বুল্ ।
ছে রে ছাওয়া[৫], কান্দিস্ না ।
দাদা গেইছে[৬] অজিরকুল[৭]
কিনিয়া আনিবে নাকফুল ।
নাকফুল তোর শুভায় না[৮]
অস্তি-যতন[৯] মিলে না—
নয়া বউ[১০] আসিয়া কাথা জুড়াইসে[১১] ।[১২]

১৭২

১ পশু-পাখি সম্পর্কীয় ছড়া • শিশুকে ভোলানো ।

হামার বাউ[১৩] কান্দে হাতীর কান্দোত্ চড়ি'[১৪] ।
হাতী মাইরে নেথা[১৫], বাউ যায়া পইল্ হতি[১৬]—
একথান পা'লে[১৭] ধুতি ।[১৮]

১ এই রকম চন্দনের মতো রাঙা ছেলে ২ কোথায় পেতাম ৩ কাকে নাচাতাম ৪ অবনীবালা রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) ।

৫ ওরে ছেলে ৬ গেছে ৭ কাল্পনিক স্থান বিশেষ ৮ শোভা পায় না ৯ কানের অলঙ্কার বিশেষকে 'অস্তি' বলে। অস্তিজোড়া (?) ১০ নতুন বউ (বউদিকে লক্ষ্য করে ননদ এই উক্তি করছে) ১১ কথা জুড়েছে, কথা শোনাচ্ছে ১২ মুকুলদেব রায়কত (রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি) ।

১৩ আমাদের ছেলে ১৪ কাঁধে চড়ে ১৫ মারল লাথি ১৬ ছেলে গিয়ে পড়ল ওদিকে ১৭ পেল ১৮ বিজয় ফকির (পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি) । কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : টুল্-টুল্-টুলে, টুল্ কদমের তলে, / হাতীর পিঠিত্ চড়ে ; / হাতী মাইরে লাথি, কুড়িয়া পাইলে ধুতি / স্যাও ধুতি রাঙা / হামার বাউটা ট্যাঙা ।

১৭৩

আয় রে ভালুক লাপ্-ঝাঁপ দিয়েঁ্য
হামদের[১] মুন্থু[২] পান খায়েঁ্যছো
শাহ্ড়ী[৩] বাঁধা দিয়েঁ্য।[৪]

১৭৪

ইঁদুর রে ইঁদুর, তোর মা এসেচে!
দক্তাখাকী[৫] ঠক্‌রাবুড়ী কেন এসেচে?
ইঁদুর রে ইঁদুর, তোর বাপ এসেচে!
তামুকখেকো ঠক্‌রাবুড়ো কেন এসেচে?
ইঁদুর রে ইঁদুর, তোর দিদি এসেচে!
পান্তাবুড়ী গরমমুড়ি কেন এসেচে?
ইঁদুর রে ইঁদুর, তোর দাদা এসেচে!
লাল নৌকো[৬] ছেড়ে দিয়ে কেন এসেচে?[৭]

১৭৫

বাহনির ভাই বহনি বিড়ালের দুটা চইখ[৮]—
আগুর কুণে[৯] চাল চিবাছো বল্যে দিব রইস্।
বলিস না ভাই, বলিস না ভাই, আর দুটি চাল দিব
কি হবেক ওই দুটি চাল, বাবাকে বল্যে দিব॥

১ আমাদের ২ শিশুটির নাম, নির্বিশেষ শিশু ৩ শাশুড়ী। এই পঙ্‌ক্তি অন্য অনেক ছড়াতে পাওয়া যায়। তুলনীয়: বন-ভালুকের বাচ্চা আমার শুইয়া নিদ্রা যায় (টাঙ্গাইল-মীর্জাপুর)—লোকসাহিত্যে ছড়া (ঢাকা, ১৩৬৯। পৃ. ১৬): সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী। পুনশ্চ: আমার যাদু বীরের বেটা বন-ভালুকের ছাও (নেত্রকোণা), ঐ, পৃ. ২৬। শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে পান খাবার কথা 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-তেও পাওয়া যায়: সং ৩৮০।

৫ দোক্তাখেকো ৬ নৌকো ৭ সুষমা গুছাইত (রামচন্দ্রপুর, মেদিনীপুর)। তুলনীয়: শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সঙ্কলিত 'যশোর-খুলনার ছড়া' (বাঙলা একাডেমী ১৯৬৫): সং ১৬৮ (পৃ. ২১৫)।

৮ চোখ ৯ কপাটের আড়ালে, অর্গলের কোণে।

১৭৬

তোরা দেখবি যদি আয় রে চলে
ব্যাঙের মাথায় পিদীম জ্বলে ![1]

১৭৭

আয় রে পাখি আয়, কালো জাবা গায়।
হনুমানেতে তেঁতুল খায়, নুন কোথা পায়।
মামাদের শাওড়াগাছে নুন—
আমাদের খুকুর চোখে ঘুম ॥[2]

১৭৮

এতোটালা বেতোটালা, তা-থেই-থেই ফুলের মালা।
ফুলের মালাখানা ভাল্[3], গাঁতি' আনিল্ যোত্তিনাল[4]
শাল বাগানের লাল ফুল, গালাত্ দিলেক বুলবুল।
বুলবুল্ গেইল্ উড়িয়া, মালা গেইল্ ছিঁড়িয়া।
ছিঁড়ি গেইল্ তে ভালে হইল্[5], শুকিয়া মালা পড়িয়া অইল্ ॥[6]

১৭৯

নয়া চান্[7] নয়া চান্—
কাপড়-খেত্তা[8] ভিড়ি' বান্[9] ;
কাপড় নিগাইল্[10] চোরে
বগধুল[11]-ধুল্ করে।
বগধুলক্ পিঁ টুবাঃ[12] গেছু
ডাঁড়াইস্ সাপের[13] নাগাল পাছু।

১ দীনেন্দ্রকুমার রায়: পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম সং ১৩১১)। পৃ. ৬৭.

২ উৎপলকান্ত সায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৩ ভালো ৪ যোত্তিলাল গেঁথে আনল ৫ তো ভালোই হল ৬ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

৭ নতুন চাঁদ ৮ কাঁথা ৯ জড়িয়ে বাঁধ ১০ নিয়ে গেল ১১ বাদুড় ১২ যাচ্ছে ১৩ ঢাঁড়াস্ সাপের।

ভাঁড়াইল্ সাপের বড়র[1] বিষ
এমুন খায়[2] ভ্যাড় বিশ[3] ।

১৮০

ঘুঘু ঘুরু / চৈন্দ পুত !
ভাঁহো হুখ ![4]

১৮১

আম খাবো, জাম খাবো, সাঁতার দেব জলে
বোলপুরেতে পুকুর হল, রাজহাঁসটি চরে ॥

১৮২

। শিশুর তেলমাখা, স্নান, খাওয়া ।

আড়ে বাড়ে, লম্বে বাড়ে
শিব ঠাকুরকে পরণাম করে ।[5]

১৮৩

ও পাখি, নাইতে যাবি, নাইতে যাবি ?
না ভাই, না ভাই, মা বকেছে, পা ফুলেছে ॥

১৮৪

এক শিয়ালী আন্দে-বাড়ে, দুই শিয়ালী খায় ,
আজার বেটা নখিন্দর[6] ঘোড়াত্ চড়িয়া যায় ।

১ বড়োই ২ রমুন খেলায় ৩ দেড় কুড়ি । কথান্তর : এমুন খা ··· । ১১ মনো-মোহন রায় : 'বুড়া-বুড়ার কথা' (জলপাইগুড়ি) : 'সূচনা' থেকে উদ্ধৃত। কথান্তর : আয় রে চান্, কাপড় ঘিরিয়া যান্ ; / কাপড় নিয়া গেইল্ চোরে, বুক ফুল-ফুল করে / বুকে দিল লাথি / চোরে হইল্ ভরতি । / বাড়ী গেইল্ পুড়িয়া, কাপড় গেইল্ ফাড়িয়া / ফাড়ি' গেইল্ তে ভালে হইল্, চুরি করা বন্ধ হইল্ ॥

৪ ভবু দুঃখ । কুথা হাজরা (হাজরা পাড়া, জলপাইগুড়ি) ।

৫ শিশুকে তেল মাখাবার সময় ছড়াটি বলা হয় । শিশুর হাত দুটিকে জড়ো করে তার কপালে ঠেকানো হয় । উৎপলকান্তি পায়েন (জগৎপুর, হুগলি) ।

৬ রাজার ছেলে লখিন্দর ।

ঘোড়া হাত্তে[১] পড়িলে শরম বড়ো পায়—
কইনামতী ধায়।
কইনামতী, কইনামতী, কি করিস্ বসিয়া ;
তোর ছোয়া কাটা গেইছে[২]·ঘোড়া হা'তে পড়িয়া॥
মাও কান্দেছে নাটু-মুটু, বইনি কান্দে সুয়া ,
আজি হা'তে খামো হামেরা[৩] নিত্যি গাছের গুয়া॥
এড়ি কান্দে, বেড়ি কান্দে, আরো কান্দে সুয়া ,
কইনামতীর মাও কান্দে[৪] মুশুরি টানেয়া[৫]॥[৬]

১৮৫

ফুলমালা আর অংমালা[৭], ভাত আন্দিবেন[৮] কুন্ বেলা।
বেলা হইল্ দুই প'র, খাবার আসিবে কপ্‌পুর[৯]।
কপ্‌পুরের আগ ভারি[১০], চলি' যাবে ভাত ছাড়ি'।
ভাত থাকবে হাঁড়ত্, চাল যাবে গাড়াত্॥

১ ঘোড়া থেকে ২ তোর ছেলে কাটা পড়েছে, কেটে গেছে ৩ আমরা ৪ মা 'কইনামতী' কাদে ৫ মশারি টাঙিয়ে ৬ অবনীবালা রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

মধ্যাংশের কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : ঢ্যাপা-ঢ্যাপা[১] কচুর পাত, তাত্[২] ফেলাছু ছাই / হাত্তী আসিল্, ঘোড়া আসিল্ ফুলমাণিকের ভাই। / ফুলমাণিক, ফুলমাণিক, কি করেন ঘরত্ বসিয়া ? / তোমার বেটা কাটা যায়ছে নাড়া[৩] পড়িয়া। / নাড়া বাড়ির জলকোনা[৪] টিনিমিনি করে[৫]··

১ বড়োবড়ো ২ তাতে করে ৩ ধান গাছের গোড়ার অংশ ৪ জলটুকু ৫ ছলবল করে।

এই ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তি বাঙলা ছড়ার এক বহু পরিচিত পঙ্‌ক্তি। নানা ধরণের ছড়াতে এই পঙ্‌ক্তিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথান্তরও মেলে অনেক, যেমন, 'শিয়ালী'র বদলে 'শালিখ' বা 'কন্যা'। লক্ষণীয়, ছড়ার মধ্যাংশে 'কইনামতী' শব্দটি মিলছে। 'কন্যা'রই প্রতীকার্থে এইসব মানবেতর প্রাণীর নাম গৃহীত হয়েছে।

৭ রংমালা ৮ রাঁধবেন ৯ ব্যক্তিনাম ১০ রাগ বেশ।

১৮৬

তাক্ থেইয়া-থেইয়া, মণ্ডলের ভাইয়া।
মণ্ডল গেইছে হাট, করিল্ বারোবাট[১]।
কাউয়ায় আনলেক্ খ্যাড়-খড়ি[২], বগুলায় আন্দিল্[৩] ভাত—
হামার বাউটা[৪] যে ভাত খা'ছে[৫], ওই এ্যাখেকিনা[৬] দাত।[৭]

১৮৭

আগ্ দুয়ারে, পাছ্ দুয়ারে সোদর আসিসে[৮] —
কানত্ মন্দিয়া দিয়া[৯] খাবা' বসিসে[১০]।[১১]

১৮৮

ট্যাপেরি মাই[১২], ট্যাপেরি মাই, হামার[১৩] বাড়ী যাইস—
আম দিম্[১৪], কাঁঠোল দিম্, দুয়ারত্ বসি' খাইস।
সরু সুতা কাটিয়া দিম্, বালার হাট যাইস।
না যাও[১৫] না যাও বালার হাট, নাও ডুবিছে—
নাওয়েব উপর টঁড়া সাপ ফ্যাপ্ পেয়া উঠিছে[১৬]।[১৭]

১ নানা স্থানে ঘুরল ২ রান্নার কাঠ-খড় ইত্যাদি ৩ বক রাঁধল ৪ আমাদেব ছেলেটি ৫ খাচ্ছে ৬ একটি মাত্র ৭ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। কথান্তর : থেই থেই থেইয়া, মণ্ডলের ভেইয়া। /মণ্ডল গেইছে হাট, কিনি' আনিলো খাট। /খাটের উপর চড়িয়া দেখা যায়[১] বেরুবাড়ীর হাট।

১ কথান্তর : দেখো। প্রথম পঙ্‌ক্তির কথান্তব ও অতিরিক্ত কথা : তাক তৈ-তৈ-তৈয়া / চাম্‌টা-সিদল খায়া / বুড়ি মাইয়া ভাতার ধবে / তাকেও নাগে শাঁখা। —দি রাজবংশী'স্ অফ্ নর্থ-বেঙ্গল, পৃ. ৬৯।

৮ আত্মীয়-স্বজনাদি এসেছে ৯ হাত দিয়ে কান ঢেকে ১০ খেতে বসেছে ১১ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

১২ 'ট্যাপেরি' নামীয় মেয়ে ১৩ আমাদের ১৪ দেব ১৫ যাব না ১৬ নৌকোর ওপর ঢোঁড়া সাপ ফণা তুলে উঠেছে ১৭ মাণিক রায় (হলদিবাড়ী, কোচবিহার)। কথান্তর : এ্যালো রে ব্যালো, ফুল তুলিবার গ্যালো[১] /ফুলের মাথোত্ গোমা সাপ ফপ্ পেয়া উঠিলো[২]।

১ ফুল তুলতে গেলি ২ ফুলের মাথায় গোখ্‌রো সাপ ফণা ধরে উঠল।—দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৮২। সেখানে এটি 'হা-ডু-ডু' খেলার ছড়া রূপে উল্লিখিত।

১৮৯

পিঠে খাবো, পুলি খাবো, আর খাবো লুচি
পায়েস খাবার বেলায় খাবো বাটি-বাটি ॥

১৯০

। শিশুর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের উল্লেখ ।

বাপোই, রে বাপোই, তোর গোরু গেইছে[১] দূর :
বাপ ডেকায়[২], মাও ডেকায়, কানশিসার ফুল[৩] ।
গসা হয়া[৪] না যান বাপোই, ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ॥
মাও গেইছে হাট, বাপ গেইছে হাট
মাও আনিবে নাড়ু-মোলা[৫], বাপ আনিবে খাট ।
ওই খাটোত্ চড়িয়া যাইম্[৬] মুই বিন্দাবনের হাট ॥
বিন্দাবনের হাটোতে পাইক বসিসে[৭] ;
পাইকর হাতোত্ না খাইম গুয়া, দাড়ী মুছিসে[৮] ॥[৯]

১ গেছে ২ ডাকে ৩ বন্য ফুল বিশেষ ৪ গোসা করে ৫ নাড়ু-মোয়া ৬ যাব ৭ বসেছে ৮ মুছেছে ৯ ভবনাথ রায় (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ।

কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা . বাপো গেইসে হাট মাও গেইসে হাট / মাও আনিবে মোলার নাড়ু বাপ আনিবে খাট ।' ওই খাটত্ চড়িয়া যামু বিন্দাবনের হাট । / বিন্দাবনের হাটতে নাউ ফলিসে[১] / নাউর উপর ঢোঁড়া সাপ ফপেয়া উঠিসে[২] । / দুইকোনা পিতলের খুরি ভাসিয়া বেড়াসে[৩] / একনা নিগিল্[৪] ধরম ঠাকুর, একনা নিগিল্ টিহা[৫] / টিহার বিটির বিহাও হসে নাল খারিখান[৬] দিয়া/ নালখারিখান খোটোর-মোটোর[৭] মদ্ধে আজার ভোর[৮] / প্যাটমাঙ্গিটা ফর্ফরাসে[৯], ভাতার নিগা[১০] ভোর ।[১১]

১ লাউ ফলেছে ২ ফণা ধরে উঠেছে ৩ দুটি পেতলের খুড়ি ভেসে বেড়াচ্ছে ৪ একটা নিয়ে গেল ৫ টিয়ে ৬ লাল শাড়ীখানা ৭ যেমন-তেমন ৮ মধ্যে রাঙা ভোর ৯ পেটের জন্তে যে বাড়ি-বাড়ি মেগে বেড়ায়, ভিখিরি ; সে ফরফর করছে ১০ স্বামী নিয়ে যা ১১ দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ . ২১২ । সেখানে এটি অবশ্য বিয়ের ছড়া রূপে উল্লিখিত ।

১৯১

হামার মাইটা[১] ভালা, আম পাড়িবা' ভেলা[২] ;
আমত্ নাগাইল্ কোটা[৩] ।
উয়ার[৪] বাপ ঘোড়া-চড়া, উয়ার মাও[৫] শাঁখামুঠি[৬]
উয়ার বইনি গালারকাঠি[৭], উয়ার পিসাই[৮] পচা কাঠি ।[৯]

১৯২

একটা তারা দুইটা তারা, তারার মাও[১০] মোতিহারা ॥
চল্ গে ভাউজ[১১] পানি আনিবা'[১২]—
পানি আনিতে গড়িল্ কাঁটা[১৩],
কতয় শুনিমো সতোনীর কথা[১৪]
সতোনী গেইল্[১৫] অ্যানেক দূর—
ফিকিয়া মারিমো চাম্পার ফুল[১৬] ॥[১৭]

১৯৩

কিসের আবো[১৮], কিসের পিসাই[১৯] ,কিসের বিন্দাবন
কিসের টাকা নিয়া গেইল্ দিয়া নয়া ধান ।
আবো আসিল্ সাতে[২০], না খাং[২১] তার পাতে ।
পিসাই আসিল রথে, না খাং তার হাতে ।
আমপাত, জামপাত, ছিরি আঙ্গুট[২২] দে হাত ॥

১ আমাদের মেয়েটি ২ অনেক আম পাড়তে পারে ৩ আমে লাগাল আকষি ৪ ওর ৫ মা ৬ একাধিক শাঁখার সমষ্টিকে বলে 'শাঁখামুঠি' ৭ গলার অলঙ্কার বিশেষ ৮ পিসিমা ৯ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) ।

১০ মা ১১ ভ্রাতৃজায়া ১২ জল আনতে ১৩ কাঁটা বিঁধল ১৪ সতীনের কথা কতোই শুনব ১৫ গেল ১৬ চাঁপা ফুল ছুঁড়ে মারব ১৭ বিজয় ফকির (গোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি) ।

১৮ দিদিমা ১৯ পিসিমা ২০ সাথে ২১ খাব না, খাই না ২২ "শ্রীআঙটি" । তুলনীয় : কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন / মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড়ো ধন ।

১৯৪

তা'—তা'—তা'
নানার বারীত্[১] যা,
নানীয়ে ন দেয়[২] ফুলছাতি[৩] রইদে পোরের[৪] গা
হাতত্তার্‌গান্[৫] বাঁধা দি ছাতি কিনি[৬] যা ।[৭]

১৯৫

। দাদা-বউদি ও মামা-মামীর উল্লেখ ।

একটি তারা দুটি তারা, ওই তারাটা পাইখমারা[৮] ।
আন্‌ন দাদা কাঁড়বাঁশটা[৯] বিঁধে দিব-চুঁটুরটা[১০] ।
চুঁটুর গেল ধারে-ধারে, অক্ত পড়ে ছি-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌ করে'। ।

১৯৬

মাক্‌লা বাঁশের[১১] পিতারি,[১২] ওইঠে[১৩] দাদার কাচারি[১৪]
আজি দাদা দেওবার[১৫], কিনিয়া দে মোক দইয়ের ভার :
হামরা যামো[১৬] ময়না দিদির বাড়ী,
মাক্‌লা বাঁশের পিতারি ।[১৭]

১৯৭

দাদার ঘরের[১৮] বগোরিগিলা[১৯] ঝুম্‌ঝুম্ করি' ফলিছে
একটা-দুইটা ছিঁড়াইতে[২০] দাদার মনত্ পড়িছে[২১] ।
না কান্দিস্, না কান্দিস্ দাদা, গামছা মুখত্ দিয়া

১ মাতামহের বাড়ীতে যা ২ মাতামহী দেয় না, দিচ্ছে না ৩ ফুলের ছাতা ৪ রোদে পুড়ছে ৫ হাতের 'তার' নামক অলঙ্কারখানা ৬ কিনে ৭ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫ ।

৮ পাখিমারা ৯ ধনুকটা ১০ ছোটো ইঁদুর বিশেষ ।
(কাঁটিবাধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর) ।

১১ বিশেষ এক ধরণের বাঁশ ১২ পাতা ১৩ ওইখানে ১৪ বাসস্থান অর্থে ১৫ রবিবার ১৬ আমরা যাব ১৭ সুরেন্দ্রনাথ রায় (বাগগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) ।

১৮ দাদাদের ১৯ কুলগুলি ২০ ছিঁড়তে ২১ মনে পড়ছে ।

ফিরা বার[১] তোর বিয়াও দিবো জোড় কইনা দিয়া।
জোড় কইনা নড়ে-চড়ে, জোড়া বালিহাঁস দহলাত্[২] পড়ে ॥

১৯৮

দাদার মাইয়া[৩] ভাউজী,[৪] ভাত চড়াইছে[৫]—
গিজ্জি' আসিল্[৬] দেওয়ার ঝড়ি,[৭] ধান ভিজিছে[৮]।
পাছিলা বাড়ীত্ নোটাটা জলত্ পড়িছে[৯]
তোল্ তো দিদি[১০] নোটাটা, দৌড়ি' আসিল্ ভাতারটা[১১] ॥

১৯৯

হোর্ আখেক্[১২] মামা আইসেছে[১৩]:
বাঁশের পাতারি করি'[১৪] নাড়ু আনেছে[১৫]—
পুকিনাতি ছামটা[১৬] তড়্পিয়া উঠেছে[১৭] ॥
তা-তুর্-তুর-তুরা রে ভাই, তা-তুর্-তুর্-তুরা
ঘরে নাচে শ্যাম-সুন্দরী, বাহেরে[১৮] নাচে বুড়া ॥
বুড়া গেইল্ বাইগন বাড়ী,[১৯] কাঠ-কাউয়া ঠকাইলেক দাড়ী[২০]
হামার বাউ নাচে, নাচতে নাচতে গান ধরে—
পান্তার হাঁড়ী বাইর করি' খাবার ধরে ॥[২১]

১ আর একবার ২ ধান চাষের জমিতে, নিম্ন-ভূমিতে।

৩ বউ ৪ বউদি, ভ্রাতৃজায়া ৫ কথান্তর: চড়াইসে ৬ গর্জন করে এল ৭ কথান্তর: দেওয়া-ঝড়ি। মেঘবৃষ্টি, ঝড় ৮ ভিজছে ৯ বাড়ীর পেছনে ঘটিটা জলে পড়েছে। কথান্তর: পড়িসে ১০ কথান্তর: 'বাই' ১১ স্বামীটা দৌড়ে এল।

১২ ওই দেখ্ ১৩ আসছে ১৪ বাঁশ-পাতায় করে। কথান্তর: পিতারি ১৫ আনছে ১৬ ধান ভেনে-ভেনে যে উদূখলটির ('ছাম'টির) মধ্যে অনেকখানি গর্ত হয়ে গেছে ১৭ লাফিয়ে উঠছে ১৮ বাইরে ১৯ গেল বেগুন-ক্ষেতে ২০ কাঠ-ঠোকরা দাড়ী ঠোক্রাল ২১ কথান্তর: চোপ্ রে চোপ্ তোর মামা আইসেছে / বাঁশের পাতারিত্ করি' নাড়ু আনেছে / নাড়ু নাই, টাড়ু নাই, খালি আইসেছে ॥[১] *

১ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

অপর কথান্তর: চুপ্ রে চুপ্ রে বাউ, তোর মামা আসেছে / বাঁশের পাতোত্ নারু আনেছে ॥[১]

১ দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৬৯

২০০

আমবাড়ী কলাবাড়ী, ওই ডাখ তোর মামা-বাড়ী।
মামা আসিল্[১] ভাসিয়া, ভাত খায় ঠাসিয়া।
ভাত খায়া হইল্ খলই-প্যাট,[২]—
খলই-প্যাট নড়ি-ধরি, ভাত বিরি' যায়[৩] হাড়ী-হাড়ী॥

২০১

হামার এগিনায়[৪] অলগিলা হমার[৫] এগিনায় যায়—
তাক দেখিয়া ছোটো মামা আগ করিয়া[৬] কয়।
ছোটো মামার আগ দেখিয়া আসিছু মুই বাড়ী –
পাছিলা বাড়ীত্[৭] চেক্সেড়ীগিলা করে হুড়াহুড়ি[৮]।
নাঠি নাই, ঠেঙ্গা নাই, কি দিয়া ডাঙ্গাং[৯]—
দুয়ার-বান্ধা নড়িটা দিয়া ঘ্যাগত্ গুতাং[১০]॥

২০২

চান্[১১] ঘুঘু, চান্ ঘুঘু, তোর্হে[১২] দোহাই,
এক বেটী বিহাছু[১৩], ষোলো জামাই॥
কাহার[১৪] রে বেপার[১৫], ঠ্যাং-ধোয়া পানি;
ছোটো মামার বিয়াও হ'ছে[১৬] ফুল-টুং-টুং বাইজ্জ॥[১৭]

১ এল ২ বাঁশের তৈরী, মাছ রাখবার পাত্রকে বলা হয় 'খলই' (পূর্ববঙ্গে 'খালই'। উত্তরবঙ্গে কোথাও-কোথাও 'খলাই') সেই 'খলই'-য়ের মতো পেট ৩ বের হয়ে যায়।

৪ আমাদের আঙিনার ৫ ওঁদের ৬ রাগ ক'রে ৭ বাড়ীর পেছন দিকে ৮ মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে ৯ মারব ১০ দরজা দেবার লাঠিটা দিয়ে গলগণ্ডে গুঁতো দিই।

১১ চাঁদ ১২ তোরই ১৩ বিয়ে দিলাম ১৪ পাল্কী-বাহক ১৫ ব্যক্তিনাম (?) ১৬ বিয়ে হচ্ছে ১৭ কুথা হাজরা (হাজরাপাড়া, জলপাইগুড়ি)। কথান্তর: কাউয়াটাতে কলো খাসে[১], মোক না দে বিচি[২] / বড় মামার বিয়াও হসে'[৩] নেরাম-খেরাম ধুতি[৪]/ ছোটো মামার বিয়াও হসে, কুমুর-কুমুর বাজী[৫]রে / কুমুর-কুমুর বাজী।[৬]

১ কাকটি কলা খাচ্ছে ২ আমাকে বিচিটাও দিচ্ছে না ৩ বিয়ে হচ্ছে ৪ এলোমেলো করে পরা ধুতি ৫ বাজনা ৬ দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ২১২। সেখানে এটি বিয়ের ছড়া রূপে উল্লিখিত।

২০৩

মামা-মামী দোলে
হাঁস-পুকুরির[১] কোলে।
মামা নাইকু[২] ঘরে
কে ডাকাডাকি করে।
মামীর মাথায় সরু সুতু[৩]
মামুর মাথায় পাগ—
হেই মামী, তুমি কেঁদু না[৪]
মামু তুমার বাপ ॥[৫]

২০৪

একটা তারা, দুটো তারা
তারার ভাই বাগ মারা।
টো-টি-টি দিলু ঘোড়া
চলি' গেলাম দক্ষিণ পাড়া।
দখিন পাড়ার ছোঁড়ারা বলে, কে রে
গুড়গুড়ি-হুঁকু সেজে দেরে!
সেই হুঁকু খেতি খেতি
চলি' গেল মামাদের বাড়ি।
মামারা দিল পোড়া মুড়ি,
সেই মুড়ি খেতি খেতি
চলি' গেলাম মুচিদের বাড়ী।
মুচিরা দিল ভাঙা ঢোল;
মাঝমাঠে হরিবোল (আল্লা বোল্) ॥[৬]

২০৫

সূয্যিমামা গো, রাগ করো না গো—
তোমার শাউড়ী বলে গেছে, ঘেঁচু কুটো না গো ॥

১ পুকুরের ২ নেইকো ৩ সুতো ৪ কেঁদো না ৫ আবদুর রব (সয়বতপুর, মুর্শিদাবাদ)।

৬ আবেদা বিবি (সয়মতপুর, মুর্শিদাবাদ)।

ঘেঁচু হল কালাকালা, বউ পালাল ছুক্কর বেলা ॥
ছাগলের মা বুড়ী, ছ'খান কাপড় পেলি।
দু'বউকে দিলি ॥
আপনি মরিস্ জাড়ে, কলাগাছের আড়ে।
কলা পড়ে টিপ্‌টাপ্, বুড়ো খায় গুপ্‌গাপ্ ॥
বুড়ী মরে ভাগে[১], বুড়ো মরে খাগে ॥
বুড়ো খায় চপাটি[২], বুড়ী খায় শাঁসটি।
বামুনের ঘরে চাকরি করে কুন শালা।
ভিজে ভাত খাইয়ে মাবে দুই বেলা
ছেঁড়া কাপড় পরতে দিলে বেরিয়ে পড়ে এঁড়তাল ॥[৩]

১০৬

কুল মামুন,[৪] কুল মামুন, সাতখান পিতল।
সাতখান পিতলেব গড়ায় নাও—
নাওত্ চড়ি' যাছে[৫] দুর্গার মাও।
দুর্গার মাওকোনা[৬] হাসেছে,
কালা-কালা চেঙ্গড়ীগিলা[৭] নাচেছে।
আইসো হোর্ মাইয়াগিলা, জলক যাই[৮]
জলক যাইতে[৯] ছিরিফল[১০] খাই।
ছিরিফল খাইতে বিন্ধাইল্ কাঁটা
কতো-কতো শুনিবু[১১] সতিনীর কাথা।
সতীন গেইছে অ্যানেক দূর,
পিন্দি' আইচ্চে[১২] চাম্পার ফুল[১৩] ॥[১৪]

১ রাগে ২ খোসাটি ৩ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৪ মামা ৫ নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে ৬ মা-টি ৭ মেয়েগুলি ৮ জল আনতে যাই ৯ গিয়ে ১০ শ্রীফল ১১ শুনবি ১২ পরে এসেছে ১৩ চাঁপা ফুল। দ্র. ১৯২-সংখ্যক ছড়া ১৪ কথান্তর: চ্যাপ-চ্যাপা মানার[১] পাত, ভাত্ ফেলায় ছাই / আইসো হায় চেঙ্গেড়ীগিলা জলক যাই। / জলক যাইতে বিন্ধাইল্ কাঁটা / কতয়[২] শুনিবু সতোনীর কাথা / দুর্গার মাওকোনা আইসেছে[৩] / ঢালা-কালা চেঙ্গেড়ীগিলা নাচেছে[৪]।

১ মান কচুর ২ কতোই ৩ আসছে ৪ চলচলে, কালো মেয়েগুলি নাচছে। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে চলিত। তবে ভাষায় মধ্যবঙ্গের ছাপ আছে।

২০৭

॥ শিশুর (ছেলে-মেয়ের) বিবাহ-প্রসঙ্গ ॥

যাই গো যাই, বিহা[১] দিলি নাই—
রেলগাড়ীটায় চাপো[২]·যাব, আইন্‌তে পাবি নাই ॥

২০৮

ছোটো দাদা, বড়ো দাদা, হাল ছাড়িয়া দে
নদীর পারোত্‌[৩] কইনা কান্দে, মোকো বিয়াও দে[৪] ॥[৫]

২০৯

ডালিম গাছে কুটুম নাচে[৬]
চাকরি পাবে বলে ভাই সিলেট চলে গেছে।
দাদার গলায় তুলসী দানা। বৌ পালাইচে চাঁদাই কোণা।
দাদা তোমার পায়ে পড়ি। এ'টু এ্যাটডা বৌ এনে দাও খেলা করি
এ'টু টুক্ ঘরখানা বেতের বান্ধন[৭]
তারই মধ্যে বসে থেকে ময়না বিবির কান্দন[৮]
আর কেঁদ না ময়না বিবি, বেলা হল শেষ ,—
বাপ-মায়েকে সেলাম দিয়ে চল আপন দেশ ॥[৯]

অপর কথান্তর · ঢ্যাপা-ঢ্যাপা কচুরপাত্‌, তাত্‌ ফেলায়ু ছাই / আইসো হায় চেঙড়ীগিলা, কালাই[১] খাবার[২] যাই। / বেশি করি' কালাই না খান প্যাট বিষাবে[৩] / আন্তিত্‌ সেলা পাথার গেইলে বাবা মারিবে[৪]।

১ কলাই ২ খেতে ৩ পেট ব্যথা করবে ৪ রাতের বেলায় তখন মাঠে গেলে বাবা মারবে।

১ বিয়ে ২ চেপে, চড়ে।

৩ পারে ৪ আমার বিয়ে দে ৫ কথান্তর : বাচ্চা দাদা রে হাল ছাড়িয়া দে / পাকড়ির তলত্‌ কাউয়া কান্দে / মোকে বিয়া দে।—দি রাজবংশী'স অফ্‌ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৬৯।

৬ "এ অঞ্চলে (পাবনা জেলায়) হাঁড়িচাচা (কুটুমপক্ষী) যে বাড়ী ডাকিয়া থাকে সেই বাড়ী সেই দিন আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া থাকে, ডালিম গাছে কুক্কুট নাচা ও ডাকা একটা শুভ লক্ষণ" ৭ বাঁধন ৮ কাঁদন ৯ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)।

২১০

ও ফলটি খেয়ো না, তেতো হয়েছে
ও বাড়িতে যেয়ো না, কনে রয়েছে।
আজ কনের গায়ে হলুদ, কাল কনের বিয়ে
ও দিদি দেখ না,
বর আসছে ছাদনা-তলা দিয়ে।

২১১

গাই তুলে গোবরার জল, বাছুর তুলে ফেনা
নন্দরাণী নাইতে যাবে, ঘোর ঘোটার বাজনা[১]।
আজকে যাবে নন্দরাণী গুড়-পান্তা খেয়ে
কালকে যাবে নন্দরাণী সংসার কাঁদায়ে।

২১২

উপারে[২] একটি খোঁপা, ইপারে[৩] একটি খোঁপা
খোঁপা খুলে দেখ না, খুকী হয়েচে।
আজকে খুকী আলস-দালস, কালকে খুকীর বিয়ে
কত্ দিয়ে[৪] মা-বর যাবে?—চড়কতোলা[৫] দিয়ে।
চড়কতোলার পাখিগুলি কিচির-মিচির করে
ময়নার মা বসে বসে কঁফি[৬] চুরি করে।[৭]

২১৩

জল পড়ে, পাতা নড়ে, খড়ি বনে কে
হ্যালো সখি চুপ কর না, বর আস্‌তেছে।
বরের মাথায় লাল টুপি, মেয়ের মাথায় ঠাকা[৮]
এমন দেখে দিলি মা, গোঁফ-দাড়ি তার কাঁকা।

১ ঘন ঘটাময় বাজনা।

২ ওপারে ৩ এপারে ৪ কোন্ খান দিয়ে ৫ চড়কতলা ৬ (?) ৭ সুষমা সংগৃহীত (জ্যোৎঘনশ্যাম, মেদিনীপুর)।

৮ বাঁশের ঝুড়ি।

২১৪

তেঁতুল পাতা, তেঁতুল পাতা, তোমার নাকি বিয়ে।
হাওড়া থেকে বর এসেছে, টুপুর মাথায় দিয়ে ॥
বাগলা পাতা তারে গাঁথা, ধারে শুব না ॥
ঠেলে[১] দিলে পড়ে যাব, তাও তো জানো না ॥[২]

২১৫

আশা লতা পালং পাতা, আজকে আশার বিয়ে।[৩]
আশা যাবে শ্বশুরবাড়ি কাগজি তলা দিয়ে ॥
কাগজি ফুল কুড়াতে গিয়ে পেয়ে গেলাম মালা।
হাত ঝুম-ঝুম, পা ঝুম-ঝুম, সীতা-রামের খেলা ॥

২১৬

ওই টিয়া রে টিয়া,
তোর বেটীক দিলু বিয়া নাল খাড়ীখান[৪] দিয়া।
দুইটা বিলাই জোকার[৫] দেয় কেঁথা ঘোডর দিয়া[৬]।
একটা কুকুর ঢাক বাজায় চর্কাত্ বসিয়া।
দুইটা শিয়াল শানাই বাজায় রান্ধন ঘরত্[৭] যায়া।
দুইটা হরিণ পাল্কি উবায়[৮] প্যাট ভরেয়া খায়া[৯] ॥

২১৭

ঘুঘু মলো মলো / আলো চাল[১০] খ্যায়া[১১]
ঘুঘুর বিয়ায় যাব আমি / লাল সাড়িখান ফিন্দ্যা[১২]
মায়ে দিল তেল-সিন্দুর / বাপে দিল বিয়া
পরের ব্যাটা ধরে নিল, / মাল-কোঁচা দিয়া ॥[১৩]

১ ঠেলে ২ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৩ প্রথম পঙ্‌ক্তির কথান্তর: আশালতা পানের বাটা…। তুলনীয়: চাকুলাটা পানের বাটা…।—বাংলাদেশের ছড়া (ভাদ্র, ১৩৭৭। পৃ. ১৩৭)।

৪ লাল শাড়ীটা ৫ জয়কার, উলুধ্বনি ৬ কাঁথা ঘোমটা দিয়ে ৭ রান্নাঘরে ৮ উদ্বহন করে ৯ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে।

১০ আতপ চাল ১১ খেয়ে ১২ লাল শাড়ীটি পরে ১৩ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন: প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী: ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৮)। পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত।

২১৮

আমতলায় ঝামুর-ঝুমুর কাঁঠালতলায় বিয়া।
দেখতে আসছে[১] নব জামাই গামছা মুড়া[২] দিয়া।[৩]

২১৯

উলু-উলু, কইনার[৪] বাড়ী কতয় দূর !
কইনা আসিল[৫] ঘামিয়া[৬]
ছাতা ধর টানিয়া।
ছাতির উপর গামছা
তিনো বইনি[৭] তামচা[৮]।
গাড়ু আনো, পানি খাই
কইনাক্ ধ'রি[৯] বাড়ী যাই।[১০]

২২০

ঘুঘুব ঘুঘ ময়না, আজিও বিয়াও হয়না।
কইনা গেইল্ কতদূর, এলকথা মদনপুর।

১ এসেছে ২ মুড়ি ৩ পূর্ববঙ্গে চলিত। কথান্তর: কলাগাছতলায় ঝামুর-ঝুমুর আসতেছে জামাই বেটা ছেমই / (=সেমই) পিঠে নিয়ে।—যশোর খুলনার ছড়া (ফাল্গুন, ১৩৭১। পৃ. ১৫৫, সং ৯১)। তুলনীয়: উক্ত গ্রন্থের (পৃ. ১৬০) ৯৩-সংখ্যক ছড়ার একটি পঙ্‌ক্তি: ওই আসছে গোদা জামাই গামছা মুড়ি দিয়ে।

৪ কন্যের ৫ এলো ৬ ঘেমে (?) ৭ তিন বোনে ৮ তামাশা ৯ কন্যেকে নিয়ে ১০ আসামের গোয়ালপাড়া সীমান্ত থেকে শ্রী বুদ্ধদেব রায়কত (রায়-কতপাড়া, জলপাইগুড়ি)-কর্তৃক সংগৃহীত। কথান্তর: উলু-উলু মান্দারের ফুল / কইনার বাড়ী কতর দূর ? / কইনা আসিল্ ঘামিয়া, ছাতি ধর টানিয়া / ছাতির উপর গামছা, তিনো বইনি তামশা। অতিরিক্ত কথা :··· ছাতির উপুরা গামছা, দেখ কইনার তামশা / ঝারি আন্, পানি খাই, কইনাক ধরি' ঘরবার যাই। / কইনার মাও হোচা-গালী[১], আম পাড়ে ভেলি ভেলি[২]।/ একটা আম জলত্ পইল্, কইনার মাও ডুবিয়া মইল্।

১ যার গাল হাঁড়ীর মতো ফোলা ২ ডালি-ডালি।

কইনা আসিল্ থামিয়া, সেও ছাতাটা টানিয়া।
ছাতার উপর গামছা, তিন-এর ভাই তাম্‌শা ॥[১]

২২১

বাবা কেন কাঁদছিস রে টাকার থলি নিয়ে
সেই বাবা টাকা নিয়েছিলে মনের আশা মিটিয়ে ॥
মা বড়ো নির্বুদ্ধি, কেঁদে কেটে মর
আপনি বুঝিয়া দেখ, কার ঘর কর ॥[২]

২২২

একটা গুয়া দুইটা পান, খায়া গেইল্ সনার চান্[৩]।
সনার চানের মাথাত্ মুকুট, ঘোড়াত্ চড়ি' মারে চাবুক।
চাবুক মাইরেক ভালে হইল্[৪], এখ্‌খে দমে হাট গেইল্[৫]।
হাটোত্ দেখিল্ ময়না, কিনিল্ কানের গয়না।
গয়না কিনি, বাড়ী গেইল্, আতি পহালে বিয়াও হইল্[৬]
বিয়া গেইল্ ফুরিয়া[৭], কইনা গেইল্ উড়িয়া ॥

২২৩

হেনা হেনা হেনা, টাট্‌কা দুধের ফেনা।
শিম চাটা চাটা, বিচি গোটা গোটা।
রাম-সীতার বিয়ে, সিঁদুর দিয়ে।
ও অলকা, বুক ঝলকা ॥[৮]

১ বার্তা পত্রিকা (জলপাইগুড়ি। ২৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)। (হল্‌দিবাড়ী, কোচবিহার) অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

২ ছড়াটির একাধিক কথান্তর মেলে।

৩ সোনার চাঁদ খেয়ে গেল ৪ চাবুক মারলে তো ভালোই হল ৫ এক লাফেই (নিঃশ্বাসে) হাটে গেল ৬ রাত পোহালে বিয়ে হল ৭ বিয়ে শেষ হল

৮ অবিবাহিত মেয়েরা পরস্পরকে এই ছড়া বলে ঠাট্টা করে। কথান্তর: হেনা হেনা হেনা / তপ্ত দুধের ফেনা / চিনি চাটা চাটা / শশা কাটা কাটা / লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিয়া / সিন্দুর দিয়া।অপর কথান্তর :··· শিম ছটা ছটা /বেগুন গোটা গোটা / হরপার্বতী · / সিঁথের সিন্দুর দিয়ে / ··· ও অলকা, নাক তেলকা / ···—বাঙলা দেশের ছড়া (ভাদ্র ১৩৭৭। পৃ. ২৫৮)।

২২৪

দিদি ভাই যাবে শ্বশুর বাড়ি, খেয়ে যাবে কি ?
বাড়িতে আছে কিছু ময়দা, শিশি-ভরা ঘি।
একটু খানি দাঁড়াও দিদি লুচি ভেজে দি'—
আরো খাও গরম মুড়ি, মেখে গাওয়া ঘি ॥

২২৫

কে যাও গো, কে যাও গো, ছোলা-বাড়ি দিয়ে
ছোলা-শাক রেঁধে দেব, ঘি-মৌরি দিয়ে।
ঘি-মৌরির বাসে—
জামাই এলো রাসে ॥

২২৬

কে রে ছলা-বাড়িয়ে[১] কাঁদার-গুঁড়ুর করো[২]
ছলা শাগ রাঁধ্‌ইব হিং-মশলা দিয়ো।
হিং-এর বাসে[৩] জামাই গেল কযেঁ্য[৪]
জামাইকে আন্‌ইব জড়্‌-ধুতি[৫] দিয়েঁ্য।
বিটীকে আন্‌ইব শাঁখা-শাড়ি দিয়েঁ্য ॥
আজ থাক রে বর-কন্‌ইয়ারা হ্যাট্‌-ম্যাজুর হয়েঁ্য[৬]
কাইল যাবি রে বর-কন্‌ইয়ারা সংসার কাঁদায়েঁ্য।
আগে কাঁদে মাসী-পিসী, পেছু কাঁদে পর
পর দেবতায় জেথ্যো দিল, যাবি পরের ঘর।
পরের ব্যাটায় মার্‌ইল চড়, কাঁদ্‌ইতে-কাঁদ্‌ইতে বাপের ঘর
বাপে দিল সরু শাঁখা, মাএ দিল শাড়ি
আর যাব না গো বাপু সেই শ্বশুরের বাড়ি ॥

২২৭

বর বর বর, আতা তলে ঘর
আতা পাকা খায়েঁ্য বরের সারারাত জ্বর ॥

১ ছোলা-শাকের ক্ষেতে ২ গুন-গুন স্বরে, চাপা গলায় কে গল্প করছে, এই অর্থে ৩ গন্ধে ৪ কষ্ট হয়ে ৫ জোড়া ধুতি ৬ মাথা নত করে, কষ্ট করে।

২২৮

বাক্-বাকুম পায়রা,/মাথায় দিয়ে টায়রা—
বউ সাজবি[১] কালকি[২],/চড়বে সোনার পাল্কি ॥[৩]

২২৯

॥ শিশুর কল্পিত কর্ম-জীবন ॥

চুল্ চুল্ চুলানী, গাছ যারে তেইলানী[৪]।
ত্যাল ধরিয়া[৫] হাট যায়, তেলুয়া মাথাত্ ত্যাল দেয়।
ত্যাল হইচে বয়া[৬], তেলীক দিম্ কয়া[৭] ॥

২৩০

চুল্‌বুল্ ভুলানী, তেলুয়া মাছের তেলানী।
মাছ খায় তো ফেলানী, হাটিয়া যায় তো নেলানী[৮]।
ন্যালে-ন্যালে কাথা কয়[৯], পান ধরিয়া হাটত্ যায়[১০]
পান হইল্ পাকা, গুণিয়া নেয় টাকা।
একটা টাকা জলত্ পইল্[১১], ফেলানী অত্তি কান্দি' অইল্[১২] ॥[১৩]

২৩১

ওই হোলো রে হোলো[১৪], মাছ মারিবা' গেলো[১৫];
শোল মাছের গুঁতা খায়া বিচা[১৬] আউলিয়া আসিলো।[১৭]

১ সাজবে ২ কালকে ৩ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

৪ তেলীর বউ ঘানি-গাছ ঘুরিয়ে তেল তৈরি করে ৫ তেল নিয়ে ৬ তেল হয়েছে বদ্ধ বা খারাপ ৭ তেলীকে এ কথা বলে দেব।

৮ দেহের লীলায়িত ভঙ্গি-কারিণী, অর্থাৎ আদুরে ও ন্যাকা ৯ লীলায়িত ভঙ্গি করে কথা বলে ১০ পান নিয়ে হাটে যায় ১১ জলে পড়ল ১২ 'ফেলানী' নাম্নী সেই মেয়েটি সেখানে কাঁদতে থাকল ১৩ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)। ১৬৬, ১৭৮, ১৮১, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ২ ০, ২০১, ২০৬, ২১৬, ২২০, ২২২, ২২৯-সংখ্যক ছড়া।

১৪ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি ১৫ মারতে গেলি ১৬ Testes ১৭ এজি। সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

২৩২

ওই হিলা রে হিলা[১], মাছ নিকাউক[২] চিলা[৩] ;
গাও-কেনা[৪] তোর হড়্‌র্‌-হুর্‌, নাচন কেনে টিলা[৫] ।[৬]

২৩৩

চল্‌ রে ছানা-পুনারা[৭], মাছ ধর্‌ইতো যাব—
মাছের কাঁটা পায়ে লাগ্‌ইলো দোলায় চাপ্যে যাব।
দোলায় আছে ছ' পণ কড়ি, গুণতে গুণতে যাব ॥
চার কড়ি বেশি হলো গাই-বাছুর লিব।
গা-এর নাম হাসি, বাছুরের নাম দাসী,
বাগাল[৮]-ভাইকে কিনে দিব টুপ্‌-রাঙার বাঁশি[৯] ॥

২৩৪

আয় রে পাড়ার ছেলেরা, মাছ ধরতে যাবো,—
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চেপে যাবো।
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি, গুণতে গুণতে মামার বাড়ি ॥

১ অর্থহীন সম্বোধন ২ নিয়ে যাক ৩ চিল ৪ দেহ-টি ৫ নাচন কেন ভালো নয় ৬ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

৭ ছেলে-মেয়েরা ৮ গোরুর রক্ষক ৯ বাঁশি বিশেষ। এই ছড়ার প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ধরণের ছড়াতে মেলে। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তির পর সব অঞ্চলেই ছড়াটি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে, খুকুমণির ছড়া'তে (১৬৪ সং। পৃ. ৭৫) যে 'কথা' মেলে তার সঙ্গে বাঁকুড়া-মেদিনীপুর থেকে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক-সংগৃহীত (যা ভবতারণ দত্তের 'বাঙলা দেশের ছড়া,' ১৩৭৭, বইয়ের ১০৩-সংখ্যক ছড়া) ছড়ার কিছুদূর পর্যন্ত মিল পাই। বসন্তরঞ্জনের সংগৃহীত ছড়া আকারে দীর্ঘ, মনে হয়, আর একটি ছড়া তাতে ঢুকে পড়েছে। তুলনীয় : মাছের কাঁটা পায়ে ফুটেছে / দোলায় উঠেছে, / দোলায় ছিল চাকন কড়ি/চাকা ভরেছে—শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সঙ্কলিত 'যশোর খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন, ১৩৭১, সং ১৬১)। তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটিকে নানা ছড়ায় মেলে। যেমন এই সঙ্কলনেরই ১১৪-সংখ্যক ছড়া।

২৩৫

হোলো, হোলো[১] মাণিক রে—
কে ক্যাল্‌লো পানিত্‌[২]-রে।
এত রাতে বাঘের ভয়, তাও মাণিক জাল বয়,
নিভরে[৩] ভিজিল গাও,[৪] মাণিক তুল্যা কোলে ল্যাও[৫] ॥[৬]

২৩৬

দোলিতে দোলিতে আইল বান—
ভাস্যাঁরে নিয়ে গেল বাবুর পাকা ধান ॥
লেগুক[৭] ধান, থাকুক নাড়া,[৮]
তবু কাইট্‌ব[৯] বত্রিশ আড়া ধান ॥[১০]

২৩৭

ডিং-ডিংগা-ডিং-ডিং / কিসের বাদ্যি বাজে
খোকন যাবে পাঠশালাতে/ তাইতি[১১] এতো সাজে
আগে যায় গাড়ী-ঘোড়া পিছে যায় হাতী
তারি সাথে চলে ব্যাং কাঁধে ধরে ছাতি ॥[১২]

২৩৮

ঠাকরদাদা-ঠাকুরমা ॥

বাজারে বুড়ি মরেছে, বড়ো দাদা খবর এনেছে,
বড়ো বৌদি কাঁদতে বলেছে, ছায়া দিদির ছেলে হয়েছে,
ঠাকুমা বলে, টাক-ডুমা-ডুম, নাতি হয়েছে ॥[১৩]

১ নিরর্থক শব্দ ২ জলে কে কেলি করল, খেলা করল ৩ নিহর, নীহার, শিশিরে ৪ গা' ৫ তুলে কোলে নাও ৬ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেলে থেকে সংগৃহীত। সঙ্কলন-কর্ত্রী জানাচ্ছেন, জেলে-পাড়ার জেলেনী-মেছুনীরা এই ভাবে ছেলেকে আদর-সোহাগ করে থাকে।

৭ নিয়ে যাক ৮ নাড়া, ধানের গোড়া ৯ কাটব ১০ মনোরঞ্জন মাহাত (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৩, ১৭৫, ১৯৫, ২০৭, ২২৬, ২২৮, ২৩৩, ২৩৬-সংখ্যক ছড়া।

১১ তাইতে ১২ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

১৩ রামরঞ্জন রায় (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)। ১৫২, ১৫৫, ১৮১, ১৮৩, ১৮৯, ২১০, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৩৪ ২৩৮-সংখ্যক ছড়া।

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : মানবজীবন সম্পর্কীয়

দ্বিতীয় পর্যায় : খেলা ও কৌতুক-বিদ্রূপের ছড়া

২৩৯

। কৌতুকের ছড়া : ধ্বনি ও নৃত্যের অনুকৃতি ।

চড়ক চড়ক ড্যাডাং ড্যাং
পাব্‌দা মাছের ছুটো ঠ্যাং ॥[১]

২৪০

জামবাটিতে কে কের কেঁ
শাউড়ী-বৌয়ে কে কের কেঁ ॥[২]

২৪১

মামা আছে, ভয় নেই
মামা আছে, ভয় নেই ॥[৩]

২৪২

ঝে-চু-চু-চু,[৪]—
বাঁশের গোড়ত্‌ হাগি' থুইছে
কাঁয়[৫] ফেলাবে গু ?

১ দীনেন্দ্রকুমার রায়: 'চড়ক সংক্রান্তি' : (সাধনা: বৈশাখ, ১৩০২। পৃ. ৫৪০)। মূল প্রবন্ধে মন্তব্য ছিল : "সংক্রান্তি যতই নিকট হইয়া আসে ঢাকের বাদ্য ততই উচ্চ হয়…। ছোট ছোট ছেলের দল ঢকাধ্বনি তাহার অনুকরণে সুর করিয়া বলে…"[অতঃপর ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে তা সঙ্কলিত হল]।

২ সোঁদাল পাতার বাঁশিতে যে স্বর বাজে, তা এই ছড়ার অনুরূপ। তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)।

৩ বৃষ্টির জল পড়ার ছন্দের অনুকরণে ছড়া। তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা (বসুধারা পত্রিকা : শ্রাবণ, ১৩৬৫)।

৪ ঝিঙের ডাকের অনুকরণে অনুকার শব্দ ৫ কে।

বান্দী-চেঊড়ী[১] বাড়ীত্ আছে
তায়[২] ফেলাবে গু ।[৩]

২৪৩

কুকুরুক্ কুরুক্[৪] !
আত পোহাইল্[৫] রে তুরুক[৬] !
চ্যাট[৭] খা'র তুরুক ।[৮]

১ চেড়ী ২ সে ৩ পুষুনী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি)-র কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত। প্রথম পঙ্‌ক্তির কথান্তর (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি) : 'ঝে-চু-চু-চ্যাট্'। অপর কথান্তর : ঝেচু-চু-চু, বাঁশ বাড়ীতে[১] গু। / টেওরা[২] হাগিল্, টেউরী[৩] হাগিল্ / কাঁয় ফেলাবে গু ॥ নেউল আছে, বেজি আছে— /তাঁয় ফেলাবে গু ॥ / এক কুলা ধান দিয়া ফুরু-রু-ত্ ॥

১ বাঁশ বনে ২ চড়ুই পাখি.৩ চড়ুইনী।

অপর কথান্তর : ..টেওরা আসে, টেউরী আসে/তাঁয় ফেলাবে গু। / মামা গিসে হাল বোয়ার না / বউ চরাইসে ভাত/বউর মাথাত্ ওগুন নাগিল্ বাপ্ বে হে বাপ ॥

অপর কথান্তর : ঝেচু চু চু/বাঁশ বাড়ীত্ হাগি' থুচু / কাঁয় কেলাবে গু/ মামা গে ছ/ এ্যাক কাঠা ধান দো কাটে ফ্যালা গু।

শেষ দুটি কথান্তর ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল লিখিত 'দি রাজবংশী'স্ অফ নর্থ বেঙ্গল' (১৯৬৫) গ্রন্থে পাওয়া যায় (পৃ. ৭৪)। তিনি এটিকে 'চোর-চোর' খেলার ছড়া রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁরই প্রদত্ত অপর কথান্তর : হে চু চু চু/ ...মামা গেইসে মাছ ধোরিবার / বউ জুরিসে খলা / বউর মাথাত্ ওগুন নাগিসে / সারা হোইসে বেলা।

অপর কথান্তর : ফিংকা রে টু / আলের মাতাত্ গু / মামা আছে মামী নাই / কে তুলবে তোর গু। —রাজশাহীর ছড়া (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : চৈত্র ১৩৭০। পৃ. ৭১) : আলমগীর জলিল-সম্পাদিত।

৪ মুরগীর ডাকের অনুকার শব্দ ৫ রাত পোহাল ৬ যবন, মুসলমান ৭ পুরুষ অঙ্গ-বাচক শব্দ ৮ ললিতকুমার বর্মণ (সাকোয়াডাঙ্গাপাড়া, বোদা, দিনাজপুর)।

২৪৪

ঘোকল ডিং[1] !
বিচা চুল্‌কা, চাউল দিম্‌।[2]

২৪৫

ঢেব্‌ চু[3]-চু-চু[4] !
এ্যাত রাইতে আলি[5] বহনাই[6] ট্যাকশালটায় শু'[7] ।
ঢেঁকিভাতে লড়া-পড়া,[8] কদ্দাল[9] চড়্‌চড়ি[10]—
ভাত খায়্যো লও,[11] ভাত খায়্যো লও কুটুম, নতুন তরকারী ।[12]

২৪৬

ফেক্সা ফ্যাং চু চু চু
এত রাতে এলি ফেক্সা
ঢেঁকিশালে শু[13] ।[14]

২৪৭

আক-পাক[15] খোকার মাগো,
খোকা কাঁদে,—কাঁদুক বাছা

১ পাখি বিশেষ ২ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। এই বিশেষ পাখি 'ঘোকলডিং' বলে ডাকলেই বালকেরা তার উদ্দেশে এই ছড়া বলে।

৩ ফিঙে পাখি ৪ ফিঙের ডাকের ধ্বন্যাত্মকরূপ ৫ এতো রাতে এলি ৬ ভগ্নীপতি ৭ ঢেঁকিশালে শুয়ে থাক ৮ শিল-নোড়া ৯ কদলী ১০ তরকারী বিশেষ ১১ খেয়ে নাও ১২ শকুন্তলা মাহাত (বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। তুলনীয়, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী-সঙ্কলিত 'যশোর-খুলনার ছড়া' (ফাল্গুন, ১৯৫৬) বইয়ের ২১১-সংখ্যক ছড়া : পেঁপের সুক্ত কদুর বীচি,/কদলি চচ্চরি,/জামাইবাবু ভাত খেয়ে নাও নতুন তরকারি।

১৩ শো ১৪ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে স্ত্রী-ফিঙের বুলি। তুলসীদাস সিংহ : পল্লীর বারবাতা (বসুধারা পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩৮৫)। বৈশাখে স্ত্রী-ফিঙের বুলি হয় : 'ফেক্সী তোর মুখে আগুন'। রাঢ়-বঙ্গের বিশ্বাস।

১৫ নিরর্থক।

বাপ-ঘর যাবো,—
বাপ-ঘর গেলে কাপড় পাবো ।[১]

২৪৮

খা রে ব্যাটা খা,—
বাচুর-বাচুর ডুব পাড়ে,[২]
ও তার নেংটি ভেজে না[৩] !

২৪৯

ভশ্-শালিকেরা ছুই ভিম
ফিঙে রাজা টিম্‌টিম্ ।[৪]

১৫০

হাতী মামা দোল্ দোল্
পান-খিলিটা খোল্ খোল্ ।[৫]

১ সাধারণতঃ বিকেল বেলায় যখন পাখি-বিশেষ ডাকতে থাকে, তখন বালক-বালিকারা ওই ডাকের তালে তালে এই ছড়া বলে থাকে। ছড়াটি ঠিক পাখির ডাকের শব্দ ও তালের সঙ্গে মিলে যায়। পূর্ণিমা মাহাত (বেল-পাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

২ বারবার ডুব দেয় ৩ পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত। 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা) এটি পাবনা থেকে প্রাপ্ত বলে উল্লিখিত। সেখানে এর কথান্তর : 'খায় ব্যাটা খা ···'। আমি খুলনা জেলায় চলিত এই ছড়ার একটি কথান্তর পেয়েছি : 'রাজার পুকুরে চান করে/ও তার নেংটি ভিজে না'। কচুর পাতায় এক বিন্দু জল নিয়ে পাতা শুদ্ধ নাড়তে-নাড়তে এই ছড়া বলা হয়। কচুর পাতায় জল লাগে না, এই জন্যে বলা হয়, 'নেংটি ভেজে না'।

৪ 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে' (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা) এটি খুলনা জেলায় চলিত বলে উল্লিখিত।

৫ বাঁকুড়া অঞ্চলে (?) চলিত। তুলনীয় : 'হাতী তোর পায়ের তলায় কুলের বিচি'। ধ্বনি ও দৃশ্যের অনুকৃতি-মূলক ছড়াগুলি লোক-মনস্তত্ত্বের সুন্দর নিদর্শন। এই রীতিও লক্ষণীয়। লোকমানস প্রতিটি বস্তুর, তা ধ্বনি, দৃশ্য, বা অপর যা কিছুই হোক না, তার প্রতিরূপ, প্রতিধ্বনি, সাদৃশ্যমূলকতা,

২৫১

॥ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া ॥

নাঙ্গটে-পাড়ী ধুৰা[১], বাপে খাইল্ চুৰা ;
বাপে দিলেক তাড়ি'[২]—
যা ভাতারের[৩]বাড়ী ॥

২৫২

বমু[৪]-বমু বমু, ইটা বাড়ীত্ পমু[৫] .
হাত ধরিয়া অঠা[৬] বমু—
তোরে মাইয়া হমু[৭] ।[৮]

২৫৩

পালাড্ডিং[৯] মাইয়া পালায় রে—
কালাই বাড়ী[১০]দিয়া রে ,
কালাই নিগাইল্[১১] চোরে
ওকিনা[১২]মাইয়া মোরে ॥

সমধর্মিতা, পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তির মধ্যে একটি মেল-বন্ধন বা জোড়া, জুটি, বা counter part খুঁজে নিতে চায়, যার ফলে একটি symmetry রচিত হয়। এই প্রতিসাম্য রচনা করবার প্রবণতা লোকসাহিত্যেই কেবল নয়, Material Folklore-এর মধ্যেও প্রবলভাবে বর্তমান।

১ নেংটি-পরা ধেড়ে ছেলে বা মেয়ে ২ তাড়িয়ে'৩ স্বামীর।

৪ ভগ্নিপতি ৬ ইটের ওপর পড়ে গেলাম ৬ ওঠা ৭ তোরই স্ত্রী হলাম ৮ কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : বমু বমু বমু, মুই কি আগুন নাগামু / দোলা-বাড়ীত্[১] আসিয়া কেনে ধুপ্ করিয়া পমু। / ধর্ তো 'বমু হাতটা, জলে ভরিল্[২] প্যান্টটা। / তুল্লু তে করলু ভাল্, তোরে সুদে[৩] কাটাইম্ কাল। / চল্ এলা [৪] যাই ঘর, আজি থাকি' হলু বর ॥

১ ধানের ক্ষেতে ২ ভরল ৩ সাথে, 'সহিতে,' সঙ্গে ৪ এখন।

৯ খেলায় হেরে পালিয়ে যাচ্ছে যে, পলায়ন-রত ১০ কলাই ক্ষেত ১১ নিয়ে গেল ১২ ওটি। তুলনীয়, এই ধরণের আর একটি ছড়া : চোর নিয়ে বাড়ী যায়, ব্যাঙ পুড়িয়ে ভাত খায় / সেই ব্যাঙ কাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা!

২৫৪

ঠগালু তে ঠগালু[১], মাল পুকুটি[২] দেখালু;
নাল পুকুটিত্ এক ভড়ি[৩]—
ছাওয়া হউক তোর ড্যাড়[৪] বুড়ি
সেই ছাওয়ার বাপ মুই—
ও ফেলা ভাণ্ডারী তুই ॥

২৫৫

পাগলা নিগায়[৫] নাঙল-জোয়াল
পাগলী নিগায় মই।
বেলাব ভিত্তি[৬] দেখিতে পাগলী
চিতোর হয়া পইল্[৭] ॥[৮]

২৫৬

নাইড়া মুড়া ত্যাল কামুইড়া বাইট্‌কা মাছের[৯] ঝোল।
নাইড়া গেল পাট কাইট্‌বার, শান্‌কি নিয়া দৌড় ॥[১০]

২৫৭

অউগ্যা বঅর অউগ্যা ঝি[১১]
কি নাম থোয়াইল্[১২] মজ্জাম্‌বি,[১৩]
বালুশ দিয়ম্[১৪], পাড়ি[১৫] দিয়ম্, দুই হাতত্ দুই বালা দি[১৬]।[১৭]

১ ঠকালি তো ঠকালি ২ নিতম্ব। কথান্তর: পুটকি ৩ লাথি ৪ দেড়।

৫ নিয়ে যায় ৬ সূর্যের দিকে ৭ চিত হয়ে পড়ে গেল ৮ কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা: বাপোই পোই পোই, শৌনি ধানের[১] খই/বুড়া উবায়[২]নাঙল-জোয়াল, বুড়ী উবায় মই/বুড়াক্ দেখিয়া বুড়ীটা খ্যাট্‌কেয়া পইল্[৩] ॥

১ শালি ধানের (?) ২ বহন করে ৩ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

৯ ভেটকি মাছের ১০ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত। প্রায় এই ধরণের আর একটি ছড়া: 'অমুক' ব্যাটা পেট কাটা, মাগুর মাছের ঝোল / সব ব্যাটাকে বলে দেব অমুক ব্যাটা চোর ॥

১১ এক বাপের এক মেয়ে ১২ নাম রাখল ১৩ মরিয়ম বিবি ১৪ বালিশ দেব ১৫ পাটি ১৬ দু হাতে দুটি বালা দিয়ে ১৭ মোহাম্মদ এনামুল হক: ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা: আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮-৫৭৫)।

২৫৮

॥ ঘরে বসে খেলার ছড়া ॥

এজে ঘুঘু, বেজে ঘুঘু
সকল ঘুঘুর চোর।
মাটিয়া ঘুঘু[১] ডিমা[২] পাড়ে
নোটোর পোটোর ॥
নোটকো রে নটুয়া, উঁইষের খটুয়া[৩]
উঁইষের তলে বারো বাতি জলে।
জলুক বাতি পড়ুক ত্যাল
আম কুড়িতে পাকা ব্যাল[৪]।
ব্যাল গেইল্ ফাটিয়া
চুকারু[৫] খাইল্ চাটিয়া ॥[৬]

"আমাদের ছেলে মহলে যখন কোন বালক অপরাপর বালকদের সহিত মিশিতে চাহে না, বা মিশিলেও খেলিতে হাঁফাইয়া পড়ে বা একটু আঘাত পাইলেই কাঁদিয়া ফেলে, তাহাকে আমাদের শিশুরা নিম্নলিখিত ছড়াটি গাহিয়া ঠাট্টা করে" [সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

১ ঘুঘু বিশেষ ২ ডিম ৩ কথান্তর : নোকটো রে নটুয়া ৪ কথান্তর : আম বাড়ীখান পাকা ব্যাল। অপর কথান্তর : গছত্ আছে পাকা ব্যাল ৫ ব্যক্তি নাম। কথান্তর : চিকালু ৬ অতিরিক্ত কথা : আয় রে ভাই ঘর যাই, দুধ মাখি' ভাত খাই। কথান্তর : আয় ভাই ঘর যাই/ দহি-চূড়া মাখি' খাই। অপর অতিরিক্ত কথা : পাকা না কাঁচা/ তাও একটা ছিড়িয়া।

প্রথম স্তবকটি স্বতন্ত্র ছড়া রূপে মেলে। অনেক সময় দ্বিতীয় স্তবকটিকে ছড়ার আরম্ভ ধরা হয়। মনে হয় দুটি ছড়ার মিশ্রণ ঘটেছে। প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের বহুল চলিত ছড়া এটি। অপর কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা :
হড়্ কুড় নাটুয়া, ভৈষের খটুয়া ;/তাম্বি জলে, নিভুক ত্যাল ; / গাং মইস্তা পাকা ব্যাল /ভেবাক রে ভেবাক, আম কন্‌টে পালু ? কিসোত্ বসিয়া খালু ?/ তাবা তোলোর মাঝে, সাক্ষী আছে কে কে ?/দলকুমারীর দাসী।/তোর বেটার নাম কি ?—অম্বল গোপ্ পাল/তোর বেটীর নাম কি ?—খলিসামুঠি।

অপর কথান্তর : হাটু-নাটু উঁইষের খাটু/উঁইষের তলে পরবাতি জলে / নিবুক বাতি, জলুক ত্যাল/আমখড়িখান পাকা ব্যাল।/ব্যাল গেইল্ ভাঙিয়া, ময়না আজিল্ হাসিয়া।

অপর কথান্তর : ঘুঙুরুর নেটু, মইষের কেটু/গাং সম্রিবা পাকা ব্যাল, ছুদি[১] খাইস্ তে যালাই[২] আন্/যালাই নিয়া গেইল্ শিয়ালে, কানা মইল্[৩] বিয়ানে/ মইল্ কানা তে ভালে হইল্[৪], কানার নাফট[৫] আগ্রোন [৬] হইল্ ॥

১ ক্ষুদ, ভাঙা চাল ২ নারকেলের খোলা ৩ মরল ৪ ভালোই হল ৫ নেংটি ৬ রাজবংশী যুবতীর বক্ষ-বন্ধনী।

অপর কথান্তর: নোটটু[১] নোটটু কে রে/আজা ঘরের বউ রে/আমার বউটা চাকেনাই/নোক্‌টু এ্যালার পাকে নাই/কাচ্চা না পাকা/উপরেরটা ছেরা।

১ লটকা, টক ফল বিশেষ।

শেষাংশের কথান্তর : আমবারিখান পাকা ব্যাল / পাকা না কাচ্চা/তাও একটা ছিরিয়া : ভুইটুস্। শেষ দুটি কথান্তর : দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ ৭৯.

বাঙলা ছড়ায় 'মহিষে'র উল্লেখ একাধিক বার মেলে। মহিষের সঙ্গে 'বাত্তি'র উল্লেখও খুব পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃীত এই ছড়াটিও তুলনীয় :

ভাকুস্ ভাকুস্[১] কৈঁয়ারা[২], মইষে ভাইঙ্গে[৩] টেঁয়ারা[৪] ; / মইষ মারি দিতাম গেলাম দে[৫], কৈঁড়া ফুড়ি[৬] মইলাম রে / কৈঁড়ার তলে ভাউ্যা বেঙ[৭] ,— / অ ভজি[৮] অ ভজি ফিরি চা, গরুর ঠেংগান্[৯] এরি যা[১০]। / অ ভজি অ ভজি চুরা দুক্[১১],—। চুরাত ক্যা[১২]—ধান ? চুলত্ ধরি আন্ ; / চুল্ ক্যা—কালা ? নাক কাড়ি ফেলা ; / নাকত্ ক্যা—লউ[১৩] ? বর্ ভাইয়র্[১৪] বউ ! / বর্ ভাই বর্ ভাই গর্জং[১৫] তলে,ছঁড ভাই ছঁড ভাই তেতই তলে[১৬]। / রাজার বউ্যর্ লম্বা চুল্, মেই্লতে মেই্লতে[১৭] চাম্পা ফুল[১৮]। / চাম্পা গাছর্ তলে দুয়া বাত্তি[১৯] জ্বলে : / বাত্তি চাইতাম গেলাম্ দে হাফর্/ ছাতি[২০] তলে , /এক হিয়ালে[২১] রাঁধে বাড়ে, আর এক হিয়ালে খায়, / আর এক হিয়াল ছাতি ধরি হউর বারিত্[২২] যায় ॥[২৩]

১ বড়ো বড়ো ২ কাঁকড়া ৩ মোষ ভেঙেছে ৪ ক্ষেতের চার দিকের বেড়া, আঞ্চলিক ভাষায় 'টেংরা' ৫ 'দে' ক্রিয়ার পর বসলে অর্থ হয় কাজের পর, কোথাও কোথাও 'পে' ব্যবহার করা হয় ৬ কাঁটা ফুটে ৭ কোলা ব্যাঙ ৮ ও বউদি ৯ ঠ্যাংখানা ১০ রেখে যা ১১ চিঁড়ে কোট্ ১২ কেন ১৩ রক্ত ১৪ বড়ো ভাইয়ের ১৫ এক রকম গাছ, এর তেল অনেক কাজে লাগে, চট্টগ্রামের রপ্তানীর একটি প্রধান পণ্য ১৬ ছোটো ভাই তেঁতুল গাছের তলে ১৭ খুলতে খুলতে ১৮ চম্পা ফুল ১৯ দুটি বাতি ২০ ওল ২১ শেয়ালে ২২ শ্বশুর বাড়ীতে ২৩ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫ পৃ. ৫৫৮-৫৭৫)।

২৫৯

ভমনা রে ভুমনী[১]
নিছা মাছের ঘুমনী[২] ।
শাক খায়, শুকাতি[৩] খায়
ভমনা ব্যাটা কুনঠে লুকায়[৪] ।
যেইঠে আছে, সেইঠে বুঝ্
নাইতে[৫] খাবো ঘোড়ার মুত ॥[৬]

২৬০

ইছন-বিছন ধাপুরি বিছন[৭]
তাতে আছে মোগলকাটা[৮] ;
মোগলকাটা নড়ে-চড়ে
আইকুমারী[৯] ডাক পাড়ে ॥
এলে রে, বেলে রে—
ফুল ছিঁড়িবা' গেলো[১০] রে ;
ফুলের মাওলা ফুল
ছিরি[১১] আংটি হাত কাট্ ॥[১২]

১ বুলবুলি এবং স্ত্রী-বুলবুলি পাখি ২ চিংড়ীমাছের ঘুগ্‌নী। কথান্তর : 'শোড়া (পচা) মাছের ঘুমনী'। এই শেষ শব্দের মিলের জন্যে 'ভুমনী' বলা হয় ৩ পাটের শুকনো পাতাকে 'শুকাতি' বলে ৪ কোথায় লুকোয়। কথান্তর : 'কুনঠে অয়' (রয়, থাকে) ৫ নয়তো ৬ বুলবুলি লুকিয়ে আছে, স্ত্রী-বুলবুলি তাকে খুঁজছে। পুষুণী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি)-র কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত। অন্যান্য কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা :

ভোমনা রে ভুমনী ··সর খায় সুকাতি খায় / ক.চুপ্‌চাপ্ নিচ্‌চুপ/কানা··· কুকুরী ভুলটুলুত্ ॥ খ. চাপ্‌চুপ্ নিচুপ/কুকুরের পুচ্ছ ॥ গ. করে কাউয়া কু/নিচুপ চাপ্‌চুপ/কনঠলের বিচি ভুটুস ॥ ঘ. নিচুপ্ চুপ্ চুপ্/চুয়াত্ ডুপ্/ কনঠে আছে সেইঠে বুচ।—দি রাজবংশী'স্ অফ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৭৫।

৭ বীজ, শাস্ত্রাদির বীজ ৮ একটি স্থানের নাম, বর্তমান ক্ষেত্রে কাল্পনিক নাম ৯ কথান্তর : ডাউকিমারী। এও একটি স্থানের নাম ১০ ছিঁড়তে গেলি ১১ শ্রী ১২ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বহুল প্রচারিত ছড়া। কথান্তর : ইচন-বিচন

২৬১

॥ ঠেলাঠেলি খেলার ছড়া ॥

ঠেইল্-মেইল্ বুচি খেইল্ / রাই সরিষা কদম তেল
তেলী বুঢ়িয়ে তেল দেই নাই / বনে বস্তে—হাবলুস্ ॥[১]

২৬২

॥ 'চাবি খেলা'র ছড়া ॥

এতল বোতল তামাক তেতল
ধর ত তেল ধর না
ক দাপ খাব বল না
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্ ॥[২]

ধাপ্‌রি বিচন / তার তলত্ হইল্ মোগলপাটা। / মোগলপাটাখান নড়ে-চড়ে / কাউয়ার বেটা ঠোকর মারে। / আয় গুদুরী ভাত খাই— / দুধ মাখা ভাত খাই। / না খাই তোর হাতে / গুদুরী গোন্দায় হাত। /এল্‌পাত ব্যালপাত / ছিঁরি আংটি তুল্ হাত ॥

শেষাংশের কথান্তর : এ্যালো রে ব্যালো, ফুল তুলিবার গ্যালো।/ফুলের মাথাত্ গোমাসাপ[১] ফ্যাপ্‌পেয়া[২] উঠিল।

১ গোখরো সাপ ২ ফণা তুলে। 'হা-ডু-ডু' খেলাব ছড়া রূপে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে এটি মেলে। কখনও বা 'হাত-পাতা' খেলার ছড়া রূপে।

অপর কথান্তর : ক. ইচন বিচন ধাপুরি বিচন / তাত্‌কে আছে মগব কাটা ॥ খ. ইচন বিচন ধাউরি বিচন / তাতে আছে মজলকাঁটা ॥ গ. ·· ফুল তুলিবার গেলে রে·· ॥ ঘ. ফুলের মাগুালা পাত· ॥—দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৭৬।

১ পাঁচ-ছয় জন ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধভাবে এক জায়গায় বসে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে করতে, এই ছড়া বলে খেলা করে। কথান্তর : ঠেইল্-মেইল্ বুচি মেইল্ / জামদাদিগে জল বরষিল—হাবলুস্ ॥

২ ননীগোপাল দাস : পল্লী ক্রীড়াগীতের আলোচনা : (বঙ্গলক্ষ্মী : কার্তিক, ১৩৩৬। পৃ. ৬৮৪-৬৮৭)।

২৬৩

অকবুল মকবুল কড়িফুল ফুটে—
বানিয়া রাজা ছুল্-ছুল্ কাঁপে।
কাঁপে-কুপে নিমের ডাল—
টোনেয়া পাখি[১] মোনেয়া ব্যাল।
হেল্ লতা হোকা-দোমা—
গোরুর পিঠিত্ পইল্ চোর
হাড়কোল[২] পাতিলা কোল্।
হল্দি বাটা ঘুগী চোর ॥[৩]

২৬৪

॥ 'গুটি' বা পাথরের নুড়ি নিয়ে খেলার ছড়া ॥

ক. ফুলন ফুলন ফুলনাটি / দোলন তেলন তেলনাটি
ঝাম ঝাম ঝামাটি / জোড় ঝামাটি।
বকুল বকুল বকুলটি / জোড় বকুলটি।
সুসম সুসম সুসমটি / জোড সুসমটি।
হাত পোড়া পোড়া / বেগুন পোড়াটি।
ঘণ্ট, ঘণ্ট, শাক ঘণ্টটি / পক্ষে পাখা, ছয়ে রেখা
সাতে শালিক নাচে, / আট বাঁধা ঘাটে
নয়ে নয়টি ঘোড়া / দশে পড়ল জোড়া,
এগারয় এক-মলি / বারয় ক্ষীরের পুলি
তেরয় তেজ কাটা / চোদ্দয় চৌশিকটা
পোনরয় রুপার বাটা / ষোলয় সতরঞ্চি ॥

খ. ফুলন ফুলন ফুলনাটি / একে দোলনাটি
একে তেলনাটি / ঝাম ঝাম ঝামটি
একে জোড় ঝামটি / সুসম সুসম সুসমটি
একে জোড় সুসমটি / কদম কদম কদমটি

১ টুনটুনি পাখী ২ হাড়গিলে (?) ৩ কথান্তর : ।অগডুল্ বগডুল্ কার ফুল ফুটে / কোট্কা-কোইকি নিমের ডাল/। টোনেয়া রাজার মোনেয়া মাল/। রাম লক্ষণ সীতা, বানর হইল্ মিতা ॥

বকুল বকুল বকুলটি / এক জোড় বকুলটি
তারা তারা তারাটি / মুখ পচা মুখ পচা মুখ পচাটি
একে জোড় মুখ পচাটি / হাত চাপড়া বেগুন পোড়া
হাত চাপড়াটি, /হাত চাপড়া বেগুন পোড়া হাত চাপড়াটি।
নোড়া কসা ভাত পয়সা নোড়া কসাটি
হাড়ীকে বদলে বদলে বস।
পকে পাখা / তোমায় মুখে ঢাকা
ছয়ে রেখা / সাতে শালিখ নাচে
আটে বাঁধা ঘাটে / নয়ে নয়টি ঘোড়া
দশে দিলাম জোড়া / এগারয় একফলি
বারয় ক্ষীরের পুলি / তেরয় তেজ কাটা
চোদ্দয় চৌকি খাটা / পোনেরয় পানের বাটা
ষোলয় ষষ্ঠী বুড়ি ॥[১]

২৬৫

॥ 'খাটানো'র ছড়া ॥

একে ইঁদুর, দুয়ে দাঁত, তিনে তেলী, চারে চোর
পাঁচে প্যাঁচা, ছয়ে ছুঁচো, সাতে শালিক, আটে আটকুঁড়ো
নয়ে নাপিত, দশে দামড়া[২], এগারোয় একঘরে, বারোয় বিয়ে[৩]॥

১ ননীগোপাল দাস : পল্লী-ক্রীড়াগীতের আলোচনা (বঙ্গলক্ষ্মী : কার্তিক, ১৩৪৬। পৃ. ৬৮৪-৬৮৭)। সাধারণতঃ সবাই এক জায়গায় বসে ৪/৫ জন মিলে খেলে।

২ এঁড়ে গোরু ৩ বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত, বর্তমান রূপটি মধ্যবঙ্গ থেকে সংগৃহীত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশেও এটির প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ মার্বেল বা 'ডাংগুলি' খেলায় যে বালক হেরে যায়, তাকে বাকী খেলুড়েরা 'খাটায়'। তাকে 'খাটানো' মানে নাজেহাল করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। এই 'খাটানো' থেকে মুক্তির জন্যে তাকে বারোটি (কোথাও সাতটি, আবার কোথাও কুড়িটি) সুযোগ দেওয়া হয়। যতো বার সে সুযোগ হারাবে, তত বারের সংখ্যা উল্লেখ করে, তার সঙ্গে মিল রক্ষা করে, ওই পরাস্ত খেলুড়েকে গাল-মন্দ করা হবে। এমন কি, এগারোয় তাকে 'একঘরে' করবার কথা আছে। খেলার মধ্যে এখানে সামাজিক প্রথার ছাপ পড়েছে। কৌতুক-

২৬৬

॥ প্রশ্নোত্তর-মূলক খেলার ছড়া ॥

: মাওই[১], তাওই[২] গ্যাছে কোনে[৩] ?
: বাঁশ বাড়্যার হাটে।
: ঘরখান ক্যা[৪] নড়ে ?
: বাবুই ঠেলা পাড়ে।
: কান্‌চিত্ত[৫] কি ?
: সজ[৬] বুনেচি।
: সজের মধ্যি কি ?
: বেজী পুজেছি[৭]।
বেজীর দয়লতে[৮] আমি নাচন শিখেছি ॥[৯]

২৬৭

কায় গেছলু ?—দামড়ালেলে
কি খালু ?—তামুকঝোল
কে দিল ?—শঙ্করী
হাথে কি ?—খঞ্জরী
ডিংলাফটং চৌধুরী / মাঝ-ধরাকে গড় করি ॥[১০]

বিদ্রূপ যে খেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ও উদ্দেশ্য, তা কৌতুক বিদ্রূপাত্মক তাবৎ ছড়া লক্ষ করলেই বোঝা যায়। সংখ্যা গণনা খেলার এক বৈশিষ্ট্য ; বহু ছড়াতেই তা দেখা যায়। এর মধ্যে যে কঠোর ও গাণিতিক পারম্পর্যবোধ আছে, তা লোকমানসেরই একটি বিশেষ দিক।

১ ভাই বা বোনের শাশুড়ী ২ ভাই বা বোনের শ্বশুর ৩ কোথায় গেছে ৪ কেন ৫ ঘরের পেছনে ৬ সব্জী বিশেষ ৭ পুষেছি ৮ দৌলতে ৯ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত।

১০ কয়েকজন ছেলেমেয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ায়। তারপর পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে এই ছড়া বলে খেলে। প্রশ্নোত্তর-মূলক প্রায় সব ছড়াই এখন কেবল দুই জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; এই রকম সমবেতভাবে দলবদ্ধ হয়ে, প্রশ্নোত্তর-মূলক ছড়া বলার উদাহরণ অতি কম,—এ জন্যেই এটিকে প্রাচীন ধরণের ছড়া বলে অনুমান করা যায়। কারণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিকাশ ঘটেছে পরবর্তী কালে। সমবেতভাবে সব কাজই আদিমতাবাহী।

২৬৮

ক. ও মিয়া, কি কর ?—গাছ কাটি।
কি গাছ ?—খেজুর গাছ।
গুড় কি কর ?—আমি খাই।

খ. ও মিয়া, কোথায় যাও ?—মেয়ের বাড়ী।
হাতে কি ?—গুড়-মুড়ি।
আমাকে একটু দাও !—নীচের এসে নাও ![১]

২৬৯

একটা কথা শুনবি ?—
কি কথা ?—ব্যাঙলতা
কি ব্যাঙ ?—টুরি ব্যাঙ
কি টুরি ?—বামহনী বুঢ়ী
কি বামহন ?—চণ্ডী বামহন
কি চণ্ডী ?—পিঠা কণ্ডী
কি পিঠা ?—তাল পিঠা
কি তাল ?—খেজুর তাল
কি খেজুর ?—পাইক মেজুর
কি পাইক ?—সোনা পাইক
কি সোনা ?—গু খা' না
কি গু ?—দামড়া গু
কি দামড়া ?—পিছা কামড়া ॥[২]

১ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

২ পূর্ণিমা মাহাত, জ্যোৎস্না মাহাত (বেল পাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম), শকুন্তলা মাহাত (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। বাঙলা দেশের সব অঞ্চলে থেকে এই ধরণের ছড়া বহু পাওয়া গেছে। 'ব্যাঙ' এবং 'ঘুঘু' এই প্রকারের ছড়াতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'ঘুঘু'র সঙ্গে সন্তান ও শিশুর আসঙ্গ খুব দেখা যায়, হয়তো শিশুকে এখানে 'ঘুঘু'র সঙ্গে সমীকরণ করে নেবার ফলে এটি ঘটেছে। তেমনি ব্যাঙের সঙ্গে 'কথা'। বর্ষা কালে ব্যাঙের এক নাগাড়ে ডাক এবং 'কথা'র একঘেয়েমি এর মধ্যে থাকতে পারে। প্রশ্নোত্তর-মূলক খেলা মানেই যে ঘরের ভেতরে বসে খেলা, এমন মনে করবার কারণ নেই। মাঠেও এ খেলা হতে পারে। তেমনি দু জনের বদলে দু দলে মিলেও হতে পারে। খেলুড়েরা

২৬৯

এক কাঁ'শা খাবি?
কোথা?—ব্যাঙলতা।
কি ব্যাঙ?—খুড়ি ব্যাঙ।
কি খুড়ি?—মাখাল বুড়ী।
কি মাখাল?—চণ্ডী মাখাল।
কি চণ্ডী?—পিঠে চণ্ডী।
কি পিঠে?—তাল পিঠে।
কি তাল?—সোনা তাল।
কি সোনা?—গু খা' না।
কি গু?—মানুষ গু।
কি মানুষ?—বন মানুষ।
কি বন?—শাওড়া বন।
কি শাওড়া?—গু কামড়া।[১]

২৭০

চল গে চল, আই-মাই[২], মাটি আনিবা'[৩] যাই।
মাটি আনিয়া করিমো[৪] কি?—ডুকি[৫] বানাই।
ডুকি বানেয়া[৬] করিমো কি?—দহি পাঝাই[৭]।
দহি পাঝেয়া করিমো কি?—বেট্টীর বাড়ী যাই।
বেটীর নাম চাপো। সোদর খাবা' যাবো[৮]?[৯]

দু দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে এই ছড়া বলে খেলে।

১ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)। তুলনীয়: উত্তরবঙ্গের ছড়া: এ্যাকনা কাথা/ব্যাংএর মাথা/কী ব্যাং/হোলা ব্যাং/ কী হোলা/বামোন হোলা/কী বামোন/ঘোট.বামোন/কী ঘোট/গুয়া ঘোট/কী গুয়া/নীল গুয়া/ কী নীল/গু গিল্।—দি রাজবংশী'স অফ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৭৮।

২ মা ও মেয়ে ৩ আনতে ৪ করব ৫ হাঁড়ী ৬ বানিয়ে ৭ দই পাতি, দই পাতব ৮ নিমন্ত্রণ খেতে যাবি? ৯ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

২৭১

নোটকো-নোটকো কাঁয় যায়[1] ?
—আজার[2] বেটা পাইক যায়।
—কাঁচা না পাকা, দে একটা টাকা
কিনিয়া আনন্থ শাঁকা[3]।
—দে একখান ছাড়িয়া ।[4]

২৭২

কাঁয়[5] খাবে ?—মোর বাউ[6] খাবে।
বাউর নাম ?—চুনিয়া চন্দন।
কান্দে কেইনং ?[7]—কহা-কহা[8] ॥

২৭৩

একখান্ কুঞ্চি[9] হ্যাকা-ব্যাকা, / কুল ধরিছে[10] ঝোঁপা-ঝোঁপা,[11]
কোন্ কামারে গড়াইছে[12], / সোনা দিয়া মোড়াইছে,[13]

১ কে যায় ? ২ রাজার ৩ কিনে আনলাম শাঁখা ৪ দু'জনের কথোপকথন। কথান্তর: নোটকো নোটকো পান খায়/আজার ঘরের খেল খ্যালায়/কাচ্চা না পাকা/দে একটা ছিরিয়া।—দি রাজবংশী'স অফ্ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ১৯।

৫ কে ? ৬ আমার ছেলে ৭ কেমন করে কাঁদে ৮ ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কথান্তর: •বাউ রে বাউ, তোর মামা আইসেছে: / বাঁশের পিঠাবিত্ করি নাড়ু আনেছে / কাঁয় খাবে ?—হামার বাউ খাবে। / কান্দে কেইনং ? —কহা-কহা ॥ অপর কথান্তর: বাই গে বাই[1], কুঠে যাছিত্[2] ?—হাট যাছুঁ[3]। / কি করিবা'[4] ?—নাড়ু আনিবা'[5]। / তোর নাড়ুলা[6] কাঁয় খাবে ? —বাউ খাবে / ওই বাউর নাম কি ?—চনিয়া চন্দন। ·

১ দিদি গো দিদি ২ কোথায় যাচ্ছিস ৩ যাচ্ছি ৪ করতে ৫ আনতে ৬ নাড়ুগুলি। সর্বত্রই একেবারে প্রথম থেকেই প্রশ্নোত্তর-মূলকতা দেখা যায় না। একটা কিছুর বর্ণনা-বিবরণ দিয়ে পরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হয়। এই রীতি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের ছড়াতে দেখা যায়। এটি প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়ার এক অন্য দিক।

৯ কঞ্চি ১০ ধরেছে ১১ থোকা-থোকা ১২ গড়িয়েছে ১৩ মুড়িয়েছে।

বাবুর বাড়ী বৈঠকখানা, / পান বানাইছে—রঙ্গদানা,
(আমি) সাধ করে বানাইছি[১] পান
(তুমি) মান করে খাও না ক্যান্ ?
কোন্ কামেলী[২] কর্‌ছে[৩] মানা / তুমি খুলে কেন বল না ?[৪]

২৭৪

॥ 'হাত জিরানি' খেলার ছড়া ॥

তোর নাম কি ?—বাঁশ পাতা
উড়ে উড়ে যা কলকাতা।
তোর নাম কি ?—ডাব
তোর সঙ্গে আমার খুব ভাব।
তোর নাম কি ?—কপাট কোণ :
টাকা পড়ে ঝম্-ঝম্।
তোর নাম কি ?—কাঁচের গেলাস :
তোর বউ ফাস-কেলাস[৫]।
তোর নাম কি ?—ঘুঁটে
যা স্বগ্‌গে উঠে।
তোর নাম কি ?—ঝড়ি
চাল দিয়ে যা গড়িগড়ি।
তোর নাম কি ?—মুড়ির টিন :
সোমবারে তোর বিয়ের দিন।
তোর নাম কি ?—পায়রা কাবু
হনুমান[৬] তোর দাদাবাবু।
তোর নাম কি ?—হেঁসো :
হনুমান তোর মেসো।
তোর নাম কি ?—পাথর বাটি :

১ বানিয়েছি ২ যে স্ত্রীলোক কাজ করে ৩ করেছে ৪ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেলায় চলিত।

৫ First-class ৬ হনুমান।

মারব তোকে একচাটি।
তোর নাম কি?—খুঁটে :
জানলা-গোড়ায় মুড়ি পড়ে আছে—
নিয়ে[১] আয় তো খুঁটে।
তোর নাম কি?—মুজে :
তোর বউকে নিয়ায়[২] তো খুঁজে।
তোর নাম কি?—গৌর :
গাদা-গোড়ায় হেগে এসেছি
মালসা নিয়ে দৌড়।
তোর নাম কি?—গামছা :
গু খা' খামচা-খামচা।
তোর নাম কি?—আমড়া
কাচা গু'য়ে কামড়া।
তোর নাম কি?—তক্তবোস[৩]:
তোর বউকে নিয়ে পড়তে বোস।
তোর নাম কি?—ঘর :
আমার পায়ে ঝিন্-ঝিনে,
তোর পায়ে জাড়' ধর্।
তোর নাম কি?—ঝাট কট্‌াক :
যা হড়্‌াক ॥[৪]

২৭৫

ক. প্রথম জন ॥ বল্ তো, পাথরের বাটী।
দ্বিতীয় জন ॥ 'পাথরের বাটী'
প্রথম জন ॥ তোর বউকে নিয়ে সাঁতার কাটি!

১ নিয়ে ২ নিয়ে আয় ৩ তক্তপোশ ৪ এরপর, যতজন খেলুড়ে থাকবে ততজনকেই এটি বলতে হবে। শেষে থাকবে কেবল একজন। সেই-ই হবে 'চোর'। 'চোর'কে উদ্দেশ করে ছড়া বলা হয় : আড়া পাড়া বামুন পাড়া / চোর ধরেছি, সোবাই[১] পালা ॥[২]

১ সবাই ২ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

খ. প্রথম জন ॥ বল্ তো, 'পিঁড়ির তলে দোয়ানি'।
দ্বিতীয় জন ॥ 'পিঁড়ির তলে দোয়ানি'
প্রথম জন ॥ এই দেখ্ তোর সোয়ামী ![1]

গ. প্রথম জন ॥ বল্ তো, 'হাবাজাবা'
দ্বিতীয় জন ॥ 'হাবাজাবা'
প্রথম জন ॥ আমি তোর বুড়া বাবা ![2]

১ এটি বালক-বালিকাদের মিশ্রিত খেলা ২ এই ধরণের খেলা মূলতঃ উত্তর ও পূর্ববঙ্গেই দেখা যায়। বদিউজ্জামান কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' (১২শ খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩৮২) বইতে সম্ভবতঃ এই ধরণের ছড়া প্রথম সঙ্কলিত হয় (পৃ ২৬-৫০)। তাঁরা এ ধরণের ছড়া রঙপুর জেলা থেকে সংগ্রহ করেছেন। রঙপুরে এই ছড়াকে বলে 'চাইব জিতের ছড়া'।

ওপরে সংগৃহীত ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া। শব্দের অন্ত্যমিলকে উপলক্ষ করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করাই এ ধরণের ছড়ার কৌতুকময় দিক। নানা অশ্লীল কথাও বলা হয়। সব সময়েই যে প্রথম জন অর্থময় শব্দ ব্যবহার করে, তা নয়। তার উদ্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে মেলে এমন অনর্থময় শব্দও প্রয়োগ করে থাকে।

খেলার মূল উদ্দেশ্যটি লক্ষ করলে কিন্তু দেখা যায়, এটি অন্যভাবেও প্রচলিত আছে। বাঙলার সব অঞ্চলেই তা পাওয়া যায়। যেমন, 'কি কথা ?—ব্যাঙের মাথা' ধরণের ছড়া। এই প্রকারের সব প্রশ্নোত্তর-মূলক ছড়াতেই দেখা যায়, দুই পক্ষ প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শেষে এমন এক স্তরে এসে পৌছোয় (এবং সেই স্তরে পৌছোনোটাই ছড়ার লক্ষ্য) যে এক পক্ষকে মিলের টানে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতেই হয়, যা তাকে জব্দ করে ফেলে। সব ছড়ারই একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। একটি দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্র বা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিশেষ অবস্থাকে তুলে ধরা সব ধরণের ছড়ারই লক্ষ্য। আলোচ্য শ্রেণীর ছড়ার লক্ষ্য তেমনি কঠোর পারম্পর্য এবং অন্ত্যমিলকে উপলক্ষ করে কৌতুক করা। কাজেই ছড়ার গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যে মনস্তত্ত্ব অন্যান্য ধরণের ছড়াতে ক্রিয়াশীল, এখানেও তা সক্রিয়।

২৭৬

॥ কোন্দলের ছড়া : দুই পক্ষের ॥

ক. নদী ধারে বিছুতি[1] বন, তকে[2] মারুইতে কতখন ॥

খ. সরু সরু বালি, তুই আমার শালী ॥

গ. কুড়্চি কাঠের পাইনা, তুঁই কি আমার কইনা ॥

ঘ. তালগাছে চেচেঙ্গা, তকে বিহা করেঙ্গা ॥

ঙ. বড়ো বড়ো খড়-গাদা, তুঁই কি আমার ঠাকুরদাদা ॥

চ. তালগাছের কটরে, বউ আন্‌ইব মটবে ॥[3]

২৭৭

॥ ঘরের বাইরে খেলবার ছড়া ॥

প্রথম জন : দুই দিকে দুই কলাগাছ
মধ্যিখানে মহারাজ ॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন দুই দিকে দুই পাথর
মধ্যিখানে মেথর ॥

২৭৮

রাণী যায় ঢুলতে-ঢুলতে[4]—
পানের পিকুটি[5] ফেলতে-ফেলতে ॥[6]

১ এক প্রকার লতানে গাছ। এর পাতা গায়ে লাগলে গা চুলকোয়। বিছুটি ২ তোকে ৩ 'হা-ডু-ডু' খেলার ছড়া রূপেও ব্যবহৃত হয়।

৪ কথান্তর : হেলতে-দুলতে। কিংবা, দুলতে-দুলতে ৫ কথান্তর : 'পেকুচি'। কিংবা, 'পেচ্‌কি' ৬ তিন জন বালিকা মিলে এই খেলা খেলে। একজন রাণী সাজে : জোড়াসন করে বসে, নিজের দু হাতে দু পায়ের বুড়ো আঙুল শক্ত করে ধরে থাকে। তার দুই বাহু অপর দু জনে দু দিক থেকে ধরে দোলাতে দোলাতে এই ছড়া বলে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এটি চলিত আছে। অনেক সময়, অন্য খেলার পরবর্তী অংশরূপেও এটি খেলা হয়।

২৭৯

॥ 'ছাগলদানী' খেলার ছড়া ॥

ছাগলদানী[1], দানী—
কেনে রে ভাই রাখালদানী ?
তর[2] ছাগলে খাল্য ধান
খায়্যেছে ত বাঁধ্যে রাখ্[3] ॥[4]

২৮০

॥ 'সারি-সুয়া' খেলার ছড়া ॥

সারি রে সুয়া, কার হাতে পাওয়া ?
বল্যে দে রে খেড়ীর বাজা, কার হাতে পাওয়া ?[5]

১ ছাগলওয়ালী ২ তোর ৩ খেয়েছে তো বেঁধে রাখ্। ছড়াটি রাখাল ও ছাগলওয়ালীর কথোপকথন ৪ শকুন্তলা মাহাত (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। খেলাটির নিয়ম এই :

কয়েকজন বালক-বালিকা হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে বা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায়। বৃত্তের এক প্রান্তের খেলুড়ে ঠিক বিপরীত প্রান্তের খেলুড়েকে ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বলে, দ্বিতীয় জন দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বলে। অর্থাৎ ছাগল-ওয়ালী ও রাখালের কথোপকথন চলে। ছাগলওয়ালী যেই বলে 'খায়্যেছে ত বাঁধ্যে রাখ্,' অমনি রাখাল এবার নিজেই ছাগল হয়ে, যে ছাগলওয়ালী সেজেছে, তার এবং তার পরবর্তী খেলুড়ের হাতের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যাবে, অর্থাৎ বাঁধা পড়বে। এবার অপর একজন রাখাল হবে এবং একই ভঙ্গিতে খেলা চলবে। ছাগলওয়ালী কিন্তু বরাবর একজনই থেকে যাবে।

এই ধরণের প্রায় সব খেলারই মধ্যে রয়েছে একটি বৈচিত্র্যবিহীন পুনরাবৃত্তি। বাঙলা খেলার নামকরণের মধ্যেও আছে সেই পুনরাবৃত্তির ছাপ। যেমন, 'চোর-চোর,' 'থুকু-থুকু', 'সারি-সুয়া' প্রভৃতি। নামকরণের এই পুনরাবৃত্তি দুটি বিষয়ের সূচনা করে: প্রথমতঃ একটি অভিনয়ের দিক; দ্বিতীয়তঃ পুনরাবৃত্তির দিক। ছড়ার রচনারীতির মধ্যেও পুনরাবৃত্তির নানা বিচিত্র আয়োজন থাকে। খেলার ভঙ্গি এবং ছড়ার রচনারীতি এইভাবে একাত্ম হয়ে যায়। খেলার ভঙ্গিই ছড়ার রচনারীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫ সারিবদ্ধভাবে দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে বসে। তারপর এক জন দশ কুড়ি তিরিশ অর্থাৎ দশক ধরে প্রত্যেকের গা ছুঁয়ে একশ' পর্যন্ত বলে যায়। যার

২৮১

॥ খেলার ছড়া ॥

আপন-থাপন ঘি মউটা / চুট্‌কা বামনের তে তেউলা
আছি আছি ভালোই আছি / কদম তলে ঘর করেছি
শী মাকুড তুলা—
রাজা গেছে কটকদার / পান খাবে কে ?
আমি রাজার পান খাঁয়েছি / আর, হুড়ুড়-গুডুম দে ॥[১]

কাছে একশ' হবে, সে উঠে যাবে। এমনি করে বার-বার গুণে শেষে যখন কেবল একজন থাকবে, সেই হবে 'হাডী'। এরপর ওই হাড়ী-খেলুড়ে, সারি বেঁধে দাঁড়ানো দশ-বারোজনের প্রত্যেকের কাছে যাবে। তার হাতে থাকবে একটি ঘুঁটি৷ সেটি নিয়েসে প্রত্যেকের কাছে পর্যায়ক্রমে যাবে। দাঁড়ানো খেলুড়েরা দু হাত জুড়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে থাকবে। হাডী-খেলুড়ে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের কাছ দিয়ে যাবার সময়, একজনের অঞ্জলিতে, সবার অলক্ষ্যে, সেই ঘুঁটিটা (এখন যা পান্তুয়া) ফেলে দেবে। এইবার সে প্রত্যেককে ওপরের ছড়াটি বলে জানতে চাইবে 'কার হাতে পান্তুয়া ?' যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে (বলা বাহুল্য, যার হাতে সেই ঘুঁটিটা আছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না) সেই সারি থেকে বেরিয়ে এসে উপরোক্তভাবে খেলা চালিয়ে যাবে। তার জায়গায় দাঁড়াবে পূর্বের হাড়ী-খেলুড়ে। এইভাবে খেলা চলতে থাকবে। এর মধ্যেও পুনরাবৃত্তি ও অভিনয় লক্ষ করবার বিষয়।

১ চার-পাঁচ জন খেলুড়ে ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে। এক জন ওপরের ছড়াটি আবৃত্তি করতে থাকে। জানুতে ও হাতের কব্জিতে চাপড় দিয়ে চলে। এইভাবে আবৃত্তি করতে-করতে শেষ শব্দ 'দে' যার হাতে পড়বে, সে সেখান থেকে উঠে যাবে। এইভাবে, একবার করে আবৃত্তি করে-করে, অবশেষে যখন দেখা যাবে, কেবল একজন মাত্র বসে আছে, তখন সেই হবে 'হাডী'। এইবার হাড়ী-খেলুড়ে বাকী আর সবাইকে ছোঁবার চেষ্টা করবে। ছুঁতে হবে কানে, অন্য কোথাও নয়। এইভাবে সব খেলুড়েকে ছোঁওয়া শেষ হলে আবার নতুন প্রস্থ খেলা শুরু হবে।

২৮২

॥ 'ঘা ঘোর জানি' খেলার ছড়া ॥

"[...বৃত্তের আকারে হাত ধরাধরি করে অন্য সবাই দাঁড়িয়ে যায়। আর একজন রাজা হয়ে সেই বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে ছড়া বলে। অন্যান্য সবাই সুন্দর ছড়ায় তার উত্তর করে"]

রাজা : এতটুকু পানি
অন্যান্য সবাই : ঘা ঘোর জানি
রাজা : এতটুকু কাদা
অন্যান্য সবাই : মণিবে বাজা
রাজা : এতটুকু বক্ত
অন্যান্য সবাই : ইটে মাবি শক্ত
রাজা · এতটুকু জলে আমাব হাব হারাল
অন্যান্য সবাই . কোন কোন্ বাজার ছেলে নিয়ে পালাল
বাজা : এদিক দিয়ে যাব
অন্যান্য সবাই · কুড়াল ছুঁড়ে মারব
বাজা : এদিক দিয়ে যাব
অন্যান্য সবাই . আগুন ছুঁড়ে মাবব
বাজা . এ ধাবটা কাটব
অন্যান্য সবাই : দাদা এলে বলে দেব ।[১]

২৮৩

॥ খেলার ছড়া ॥

শাঁক লো ছড়া লো, পোদ্ম ফুলের গড়া[২] লো
যন[৩] পোদ্ম ফুইট্‌ল, যত ছানা ডঁইট্‌স[৪] ॥

১ ননীগোপাল দাশ : পল্লী-ক্রীড়াগীতের আলোচনা (বঙ্গলক্ষ্মী : কার্তিক, ১৩৪৬। পৃ. ৬৮৪-৬৮৭)। দ্রঃ ২৮৭-সংখ্যক ছড়া।

২ পদ্ম ফুলের গোড়া ৩ যখন ৪ এক পায়ে ছুটতে থাকল।

খেলার নিয়ম : কয়েক জন খেলুড়ে সমবেত হবে। একজন জোড় হাত করে দাঁড়াবে। অন্যান্য খেলুড়েরা ওই জোড় হাত করে দাঁড়ানো খেলুড়ের হাত স্পর্শ করে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, ওপরের ছড়াটি সমবেতভাবে আবৃত্তি করতে থাকবে। ছড়াটি শেষ হওয়া মাত্রই সবাই এক পায়ে ছুটতে থাকবে। যে খেলুড়ে সবার আগে মাটিতে দু পা ছোঁয়াবে, সেই হবে 'হাড়ি'। এই 'হাড়ি'কে নিয়েই অতঃপর মূল খেলা। এবার 'হাড়ি'র পিঠে অন্য একজন হাঁটু দিয়ে একটি ছড়া বলবে। ছড়াটি প্রশ্নোত্তর-মূলক :

ইলির-মিলির ঝিলির কাঁটা
তর মামা-ঘর কন্ পথটা[১] ?

'হাড়ি'-খেলুড়ের উত্তর: 'ওই পথটা'। আবার প্রশ্ন: 'যাতেই' কত কাঁটা ?[২] উত্তর : 'দমেই[৩] কাঁটা'। প্রশ্ন : 'যাতে পাইবুব ন নাই ?' উত্তর : 'নাই'। প্রশ্ন : 'তর কাঁধে কি ?' উত্তর : 'তর‍্যাল'[৪]। প্রশ্ন : 'কাকে কাটবি ?' উত্তর : 'তকে'। প্রশ্ন : 'কাকে ক' কুলা মাংস দিবি ?' উত্তর · 'সোবকে[৫] দিব কুলা-কুলা, তকে দিব চইখ্‌টা'[৬]। প্রশ্ন : 'শিল না লঢা[৭] ?' উত্তর : 'লঢা'। প্রশ্ন : 'খই না মুড়কি ?' উত্তর : 'মুড়কি'। প্রশ্ন : 'উঠা ন বইসা[৮] ?' উত্তর : 'বইসা'।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সব খেলুড়ে বলে উঠবে : 'বইসা বলেছো, উঠলে ছুঁবে'। এর পর সেই 'হাড়ি'-খেলুড়ে অন্য সব খেলুড়েকে ছোঁবাব চেষ্টা করবে। 'হাড়ি' খেলুড়ে যদি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অন্য খেলুড়েকে ছুঁয়ে দেয়, তবে সেই হয়ে যাবে তখন 'হাড়ি' ; এবং পূর্ববৎ অন্য খেলুড়ে তাব পিঠে হাঁটু দিয়ে প্রশ্নোত্তবমূলক ছড়াটি আবৃত্তি করে। এইভাবে খেলা চলতে থাকে।

'হাড়ি'-খেলুড়ে যদি অন্য খেলুড়েকে ছোঁবাব চেষ্টায় বিরত থাকে, তবে তাকে উত্যক্ত করবার জন্যে বাকি সব খেলুড়েরা ছড়া কাটে,

খেল্ দেয় নাই হুলা-হুলা
গোরু মাঁস খায় কুলা-কুলা।

কিংবা, 'ভাত খায় খায় গবব (গোবব) দিই—' ইত্যাদি।

২৮৪

। খেলাব ছড়া ॥

ইঁকিড়-মিকিড় দাঁত কিড়্-কিড়্ লহালতি বেলপাত—
বাড়ীয়ে আছে নিমগাছটা, নিম ঝোব্-ঝোব্ করে ;
সদা সতীনেব বিটি, লিত লিয়ায় লাগে[৯] ॥
—খাঁখড়া না কুঁচ্যা ?

১ তোর মামা-বাড়ি কোন্ পথে ২ যেতে ৩ প্রচুব ৪ তবোয়াল ৫ সবকে ৬ চোখটা ৭ 'নোড়া,' শিল-নোড়ার ৮ ওঠা না বসা।

৯ নিত্যই 'নিয়াই' (ন্যায়) অর্থাৎ ঝগড়া হয়।

খেলার নিয়ম : চার-পাঁচজন খেলুড়ে সমবেত হয়। এক জনকে দলনায়ক করা হয়, তাকে বলে 'বুড়ী'। 'বুড়ী' প্রত্যেক খেলুড়ের দুটি হাতই মাটিতে

পাততে বলে। তারপর ওপরের ছড়াটি সে আবৃত্তি করে। আবৃত্তি করবার সময় 'বুড়ী' প্রত্যেকের হাতে চিমটি কাটতে থাকে পর্যায়ক্রমে। যার হাতে চিমটি কাটবার সময় ছড়াটি শেষ হবে, তাকে উত্তর দিতে হবে। উত্তর হবে 'খাঁখড়া' বা 'কুঁচ্যা'র যে কোনো একটি। 'খাঁখড়া' বললে 'বুড়ী' খেলুড়েকে মাথায় একটি হাত রাখতে বলবে; আর 'কুঁচ্যা' বললে বগলে হাত রাখতে বলবে। এইভাবে ছড়া বলে-বলে সমস্ত খেলুড়ের এক হাত মাথায় এবং এক হাত বগলে রাখা হলে 'বুড়ী' সবাইকে স্নান করে আসতে বলবে। একে একে সবাই স্নানের অভিনয় করে বুড়ীর সামনে এসে হাজির হবে। 'বুড়ী' একে একে সবাইকে প্রশ্ন করবে 'কি জলে সিনান করো আলি?' সব খেলুড়ে একই উত্তর দেবে: 'গুহা-জলে সিনান করে আলি'। 'বুড়ী' বলবে 'চলো না। সনার জলে সিনান করো আসবি যা'। তখন একের পর এক সবাই সোনার জলে স্নান করবার অভিনয় করে বুড়ীকে এসে বলে: 'সনার জলে সিনান করো আলি'।

এরপর বুড়ী প্রশ্ন করে: 'ব্যাটা-বিটি লিবি?' খেলুড়েরা একের পর এক উত্তর দেয় 'লিব'। 'বুড়ী' বলবে 'ব্যাটা-বিটি দিলাম'। তারপর বলবে: 'ব্যাটা-বিটি তুপো আইসবি, যা'। তখন খেলুড়েরা কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে বুড়ীকে জানাবে যে তারা 'ব্যাটা-বিটি তুপো' এসেছে। এরপর আরম্ভ হয় বুড়ী ও অন্যান্য খেলুড়েদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া:

—কথা তুপ্‌লি[১]? কুমহার গাঢ়ায়[২]।
—কুম্‌হারে কি দিল? হাঁড়ি-কলসি।
—হাঁড়ি কলসি কাকে দিয়ো আলি? তেলিকে।
—তেলিয়ে কি দিল? তেল দিল।
—তেল কাকে দিলি? রাজার ব্যাটাকে দিলি।
—রাজার ব্যাটায় কি দিল? হাত্থি-ঘড়া দিল।
—তর হাত্থি-ঘড়ায় কত জল খায়? তিন বাঁধ জল খায়।
—তর হাত্থি-ঘড়া কত থুর[৩] ছুটে? সেই নাঢা বেলতল পিঁপড়া গাঢ়া[৪]॥*

এখানেই খেলাটির সমাপ্তি। এরপর আবার প্রথম থেকে খেলা হয়।

১ কোথায় মাটি চাপা দিলি? ২ গর্তে ৩ কতদূর ৪ ন্যাড়া বেলতলার পিঁপড়ের গর্তে।

২৮৫

খেলার ছড়া ॥

ঝিম্-ঝিমালো ঝিমালো ভালুক লাটা-পাটা[১] লো,
বড়ো বহুকে[২] বড়ো ঠর্‌কা ছট[৩] বহুকে ছট ঠর্‌কা[৪]
হাড়ার-হুড়র[৫] বাজে কি : রাঙি ধানের খই—
বাগাল ভাইকে কিনে দিব টুপ্ রাঙার বাঁশি ॥

১ ঝোপঝাড় থেকে ভালুক এলো ২ বউকে ৩ ছোটো ৪ গোরু-মোষের অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে তাদের গলায় যে কাঠ বা টিনের শব্দকারী যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে 'ঠর্‌কা' ৫ 'ঠর্‌কা'র আওয়াজ।

খেলার নিয়ম : চার-পাঁচজন খেলুড়ে সমবেত হয়। তাদের মধ্যে একজনকে 'বুড়ী' (অর্থাৎ দলনায়ক) নির্বাচিত করে নেওয়া হয়। খেলুড়েদের অলক্ষ্যে বুড়ী তার হাতের যে কোনো একটি আঙুল ফুটিয়ে খেলুড়েদের সেই আঙুল ধরতে বলবে। খেলুড়েরা আঙুল ধরলে সেই অবস্থাতেই বুড়ী ওপরের ছড়াটি আবৃত্তি করবে। 'টুপ্ রাঙার বাঁশি' পর্যন্ত ছড়াটি আবৃত্তি করবার পর বুড়ী তার ফোটা আঙুলের হাত-ধরা প্রত্যেককে আবার ছড়া কেটে বলবে : 'হলইদ্ ত্যাল হলইদ্ ত্যাল,'/'ডাব্‌ডুব্-ডাব্‌ডুব্'। খেলুড়েরাও বুড়ীর সঙ্গে-সঙ্গেই তার পুনরাবৃত্তি করবে। এরপর বুড়ী প্রত্যেকের হাত ধরে আবার ছড়া কেটে বলবে : 'একে ধরম্, তাকে ধরম্, এইটিকে ধরম্' —অর্থাৎ যে ছেলেটি যথাযর্থই ফোটানো আঙুলটি ধরেছে, সেই তাকেই ধরবে। সেই ছেলেটিই হবে 'হাড়ি'। বুড়ী তখন সেই 'হাড়ি'কে সামনে রেখে তার চোখ বন্ধ করবে, অন্যান্য খেলুড়েরা তখন 'হাড়ি'র মাথায় 'টোকা' মেরে আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে। সকলের লুকোনো হলে বুড়ী 'হাড়ি'কে ছেড়ে দেবে। 'হাড়ি' এবার খেলুড়েদের খুঁজে বের করে ছোঁবার চেষ্টা করবে। এদিকে খেলুড়েরাও 'হাড়ি'কে এড়িয়ে বুড়ীকে ছোঁবার চেষ্টা করবে। তাহলেই একপালা খেলা শেষ হলো। বুড়ীকে ছোঁবার আগেই যদি কোনো খেলুড়েকে 'হাড়ি' ছুঁয়ে দেয়, তবে তখন সেই হবে 'হাড়ি'। তখন আবার বুড়ী তার চোখ বন্ধ করে অন্যদের লুকোতে বলবে। পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার এ-এক জনপ্রিয় খেলা। খেলাটি আসলে 'লুকোচুরি' খেলা, পূর্ববঙ্গে যাকে বলে 'চোর-পলান্তী' বা 'চোর-চোর' খেলা। এখানে যা 'হাড়ি', পূর্ববঙ্গে তাই 'চোর'। নিম্নবঙ্গে এই খেলার বুড়ীকে 'মাসী' বলতেও শোনা যায়। কোনো লোক না হয়ে, কোন কোন সময়ে কোন বাঁশ বা খুঁটিকেও 'বুড়ী' বা 'মাসী' করা

২৮৬

॥ 'কাঁঠাল চুরি' খেলার ছড়া ॥

কাঁঠাল গাছে জল দিচ্ছি—হাব্‌লস্[১] !
ময়রাবুটীর ছানা কাঁদ্‌ইছে।[২]—কঁক্ কঁক্ ![৩]

ভয়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে একে বলে 'কাণা'। 'Hide and seek' অর্থাৎ লুকোচুরি খেলা সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়। খেলাটি যেমন আদিম, তেমনি ব্যাপক। নানা দেশে এর নানা রূপান্তর দেখা যায়। সব রূপান্তরগুলি একত্র করতে পারলে লোক মনস্তত্ত্বের এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত হবে বলে মনে করি।

১ জল ঢালবার অনুকার শব্দ ২ কাঁদছে ৩ পূর্ণিমা মাহাত, জ্যোৎস্না মাহাত (বেলপাহাড়ী, ঝাড়গ্রাম) এবং শকুন্তলা মাহাত (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

খেলার নিয়ম . প্রথমে একজন কাঁঠাল গাছ সাজবে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে কেউ হাত ধরে, কেউ তার পা ধরে, কেউ কেবল ছুঁয়ে থাকবে। এরা কাঁঠাল। এবার একজন সাজবে ময়রাবুড়ি। সে সেই কাঁঠাল গাছের চারদিকে, এক-পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে, ছড়াটির প্রথম পঙ্‌ক্তি বলে গাছে জল দেবার অভিনয় করবে। এইবার আর একজন, সে ছড়াটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি বলে ময়রা-বুড়িকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবে : কেননা, তার ছেলে কাঁদছে। ময়রা বুড়ি যেই ছেলে সামলাতে নেপথ্যে চলে যাবে, অমনি যে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি বলেছে (অর্থাৎ কাঁঠাল চোর) সে এসে প্রত্যেক ছোট ছেলেমেয়ের (অর্থাৎ কাঁঠালগুলির) মাথা টিপ্‌তে-টিপ্‌তে বলবে: 'এইটা পাক্যেছে', 'এইটা পাক্যেছে'। তারপর একটি কাঁঠাল (অর্থাৎ ছেলেকে) নিয়ে পালাবে। এদিকে ময়রাবুড়ী ফিরে আসবে, এবং আগের মতোই ছড়া বলে জল ঢালতে থাকবে। তখন কাঁঠাল-চোর বলবে : 'এ বুটী, তর ঘরে আগুন লাগ্যেছে'। বুড়ী চলে যেতেই আবার আগের মতো ভঙ্গিতে আর একটি কাঁঠাল নিয়ে চোর পালাবে। বুড়ী ফিরে আসতে চোর আবার বলবে : 'এ বুটী, তর ঘরে কুটুম আস্তেছে'। এবং আবার কাঁঠাল চুরি করবে। এইভাবে এক-একটি অছিলায় বুড়ীকে সরিয়ে দিয়ে এক-একটি কাঁঠাল চুরি করে নেওয়া হবে। শেষে দেখা যাবে, গাছে একটি কাঁঠালও নেই; গাছ-শুদ্ধই চুরি হয়ে গেছে। ময়রাবুড়ী তখন গাছের শেকড়টাতেই

জল দেবে, আর দুঃখ করে বলবে: 'আমার সব কাঁঠাল চুরি হয়্যে গেছে। আমি এত কষ্ট করো লাগাইছিলি, কিন্তু খা'তে পালি নাই।'

তারপর ময়রাবুড়ি বুঝতে পারল, কে তার কাঁঠাল চুরি করেছে। নানা ছল করে সে বারবার তার বাড়ীতে (অর্থাৎ কাঁঠালচোরের বাড়ীতে) যাবে। ছলগুলো এই: 'এ বুঢ়ী, একটু আগুন দে'। বুড়ী ময়রাবুড়ীকে আগুন দেবার অভিনয় করে, সেও হাত পেতে আগুন নেবার অভিনয় করে। আগুন নিয়ে ময়রাবুড়ী কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এসে বলে: 'রাস্তায় একজন লক (লোক) চঁটা (চুটা, বিড়ি জাতীয় পদার্থ) ধঁরাই আগুনটা নিস্‌হাই (নিবিয়ে) দিল'। আবার আগুন দেওয়া-নেওয়া। এবার বুড়ী বলে: 'শিয়ালে নিস্‌হাই দিল'। এমনি করে আগুন নেবার অছিলায় বারবার যাওয়া-আসা করতে থাকে ময়রাবুড়ী। একবার বলে ওঠে: 'তর (তোর) ঘরে কাঁঠাল-কাঁঠাল বাসাছে (গন্ধ বা বাস বেরুচ্ছে)'। কাঁঠাল-চোর বুড়ী দোষ ঢাকবার জন্যে বলে: 'আমি শিল্‌দার থেক্যে কাঁঠাল কিন্যে আন্যেছিলি'। ময়রাবুড়ী বলে: 'ওইটাই দে'। চোর বলে: 'খাঁয়্যে ফেলেছি'। তারপর রীতিমতো সংলাপ। বুড়ী: 'বুথিটাই দে'। চোর: 'বুথিটা ক্ষতকড়ায় (আস্তাকুঁড়ের ধারে) ফেলাঁয় দিয়েছি'। বুড়ী: 'ওইটায় আমাকে কুঁঢ়ায় (কুড়িয়ে) আন্যে দে'। চোর: 'কাওয়াই (কাক) নিয়ে গেছে'। বুড়ী: 'দেখি তোর ঘরটা'।

বুড়ী চোরের ঘরে ঢোকার অভিনয় করে। ঢুকেই দেখে সেই ছোটো ছেলে মেয়েরা এবং গাছ সকলেই সেখানে। বুড়ী বলে: 'ই যে (এই যে) আমার কাঁঠাল!'

এইবার কাঁঠাল ফেরত দেবার পালা। চোর বুড়ীর হাঁটুতে হাত দিয়ে বলে, 'এতটা লিবি'? বুড়ী বলে: 'নাই (না)'। তারপর একই ভঙ্গিতে প্রশ্নোত্তর চলে। হাঁটুর পর কোমর, বুক, গলা, মাথা এমনি করে ক্রমেই চোর উঁচুতে উঠতে থাকে, বুড়ী সেই একই উত্তর দিতে থাকে। দৈহিক উচ্চতা শেষ হলে চোর বলে: 'ঘর-সমান লিবি?' 'নিমগাছ-সমান লিবি?' 'মেঘ-সমান লিবি?' 'সোনা-দানা লিবি?' বুড়ীর সেই একই উত্তর: 'নাই'। চোর তখন বিরক্ত হয়ে বলে: 'নাই লিবি ত চল্যে যা'। বুড়ী চলে যায়।

এই খেলাতে লোকনাট্যের এক সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। লোকনাট্যের

উদ্ভবের মূলে যাঁরা খেলাকে খোঁজেন, এটির থেকে তাঁরা তার প্রমাণ পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, এই খেলার ভঙ্গির মধ্যে যে পুনরাবৃত্তির দিকটি ধরা পড়েছে, সেই পুনরাবৃত্তিই অন্য যে কোনো ছড়ার রচনারীতিতেও সক্রিয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে লোকমানস খেলাটি আবিষ্কার করেছে সেই লোকমানসই অন্য যে কোনো ধরণের ছড়ার রচনারীতিও নির্ধারণ করে নিয়েছে। লোকসাহিত্যের রচনারীতি বুঝতে গেলে কেবল Formalized Folklore-এর মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না, Material Folklore-এর সঙ্গেও তাকে মিলিয়ে নিতে হবে,—তবেই দেখাটি পূর্ণ হবে। একেই বলে লোকসাহিত্যের 'Rounded study.' লক্ষ করবার বিষয় এই, অধিকাংশ লোকক্রীড়াতেই একই ভাষা ও ভঙ্গির বৈচিত্র্যবিহীন পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

১৮৭

॥ খেলার ছড়া ॥

চাঁক দোল-দোল হিন্দোল দোল[১]
চুল্হার মাটি[২] ছোল-ছোল[৩] ॥

১ চক্রাকারে হিন্দোল দোলে (?) ২ চুলো বা উনুনের মাটি ৩ অর্থহীন।

খেলার নিয়ম: কয়েকজন খেলুড়ে সমবেত হয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ওপরের ছড়াটি বলতে-বলতে একটি বৃত্ত রচনা করবে। তার পর, তাদের মধ্যে একজন সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে বলবে: 'এতটুকু পানি'। বাকি সবাই সমস্বরে বলবে: 'ঘাঘর ঘানি'। মধ্যের জন আবার বলবে: 'এতটুকু কাদা'। বাকিরা সবাই বলবে. 'ঠাকুরদাদা'। অনেক সময় এই ধরণের সংলাপ আরো কিছুক্ষণ চলে। যাই হোক, মাঝের খেলুড়ে এবার নিজের হাতদুটি জোড়া করে, বৃত্তাকারে দাঁড়ানো খেলুড়েদের হাত যেখানে ধরা থাকে, ঘুরে-ঘুরে সেই জোড়ের স্থান স্পর্শ করবে আর বলতে থাকবে: 'এই পথটা কাইটুব'। অন্যেরা বলবে: 'মাইকে বল্যে দিব'। 'এই পথটা কাইটুব'। অন্যেরা বলবে: 'জুমচা জাঁকা (উনুনের পোড়া কাঠের ছেঁকা) দিব।' সে আবার বলবে: 'এই পথটা কাইট্‌ব'। অন্যেরা বলবে: 'মুচা জাঁকা দিব'। এইভাবে বলতে-বলতেই হঠাৎ এক সময়ে সুযোগ বুঝে দু জনের হাতের বাঁধন খুলে সে পালিয়ে যাবে। অন্যেরা তখন বলবে: 'পালাইল্য' 'পালাইল্য'। এই বলে চীৎকার করতে করতে পালানো ছেলেকে তাড়া

করবে। যে আগে ছোঁবে সেই আবার আগের মতো ছড়াটির পুনরাবৃত্তি করে নতুন করে খেলা আরম্ভ করবে। তুলনীয়, ২৮২-সংখ্যক ছড়া।

এই খেলাটির ভিন্ন রূপ বাঙলার অন্যত্রও দেখা যায়: বালক বা বালিকারা হাত ধরাধরি করে একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্ত রচনা করে। এক জন এদের থেকে পূর্ব থেকেই পৃথক হয়ে থাকে। সে তখন রাস্তা দিয়ে পথ চলার অভিনয় করে পথ চলতে থাকে। যারা বৃত্ত রচনা করেছে, তারা তাই দেখে সমস্বরে বলে: 'রাজা মশাই, রাজা মশাই, যাচ্ছ কোথা?' পথিকের অভিনয়কারী (অর্থাৎ রাজা উত্তর দেয়: 'চান করতে'। অন্যেরা বলে: 'এসো না, আমাদের পুকুরে চান করো'। রাজা বলে: 'এ পুকুর বড়ো ছোটো'। অন্যেরা বলে: 'তাতে কি, ওই ফুলটা ফেলে দাও, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' রাজা তখন যা হোক একটা কিছু ফুল হিসেবে মাঝখানে ফেলে দেয়। দেওয়া মাত্রই দেখা যাবে সঙ্কীর্ণ পুকুর বিস্তৃত হয়ে গেছে, অর্থাৎ সবাই হাত প্রসারিত করে পূর্ণ বৃত্ত রচনা করেছে। রাজা তখন ভেতরে ঢুকে স্নানের অভিনয় করে। তারপর পুকুর থেকে ওঠবার সময় সবাই তার পথ রোধ করে। পরের ব্যাপার পূর্ববর্তী খেলার মতোই। অভিনয়, ইন্দ্রজাল, খেলোয়াড়দের পূর্বাপর ব্যবহারে বিরোধ, প্রভৃতির মধ্যে লোকনাট্যের আভাস আছে। 'কথাসরিৎসাগর,' 'হিতোপদেশ,' 'পঞ্চতন্ত্র'—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় তাবৎ কথাসাহিত্যে পুকুর ও কুয়ো ঘটনার আবর্তন সৃষ্টিতে নানা যাদুধর্মী ভূমিকা নিয়েছে। ইন্দ্রজালের ক্ষেত্রে পুকুরের ভূমিকা কুয়োর চেয়ে জটিলতর এবং ব্যাপকতর। 'জল' ইন্দ্রজাল সৃষ্টির একটি উপকরণ, কুয়ো-পুকুরের তলদেশ রহস্যময় অন্তরাল সৃষ্টি করে—ইত্যাদি কারণেই কুয়ো-পুকুরের প্রসঙ্গ আনা হয়। পাশ্চাত্ত্য লোককথাতেও এই ব্যাপার দেখা যায়। 'রাজা'র ভূমিকা রূপকথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩ ও ২৮৪ সংখ্যক ছড়াতেও রাজার ভূমিকা আছে।

২৮৮

॥ খেলার ছড়া: হা-ডু-ডু ॥

হা-ডু-ডু খেল্‌ইতে গেলি,[১] কুড়ায় পালি[২] বেল।
বেলের ভিতর লেখা আছে নানা রঙের খেল্‌॥

১ গেলাম ২ কুড়িয়ে পেলাম।

২৮৯

হা-ডু-ডু খেলিয়া বাগ্‌ মারি তেলিয়া
বাঘের তেলে পদ্‌দীপ[১] জলে
জলুক পদ্‌দীপ, উঠুক ধুলা[২] ॥

২৯০

ক. চু-রে কুকুটী,[৩] বেগ্‌না[৪] বুদায়[৫] লুকুটী[৬] ॥
খ. ডু-ডু-কৃ-কে ডু-ডু-ডাঙ্‌, চিটা মাটি[৭] টাঙ্‌-টাঙ্‌
গ. আমি যাব রঙ্গে, সীতা আন্‌ইব সঙ্গে[৮] ॥

২৯১

ক. চু রে রাম ডাং—সোনায় বাঁধাবো ডাং।
মারবো ডাঙেব বাড়ি—পাঠাবো যমের বাড়ি।
বাড়ি—ই—ই—হ ॥

খ. ডা-ক-ডু-ডু খেলতে গেলাম
কুড়িয়ে পেলাম বেল।
লেগে যা মজার খেল ॥

১ প্রদীপ ২ ধোঁয়া।

৩ চোর? নিসিন্দে গাছ ৪ ঝোপে ৫ লুকানো? ৬ এটেল মাটি ৭ মনোরঞ্জন মাহাতো (ঝাঁটিবাঁধ, ঝাড়গ্রাম, মে.দনীপুর)। ২৬১, ২৬৭, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০-সংখ্যক ছড়া।

রচনাভঙ্গির দিক থেকে ঠিক এই ধরণের হা-ডু-ডু খেলার ছড়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যেও মেলে। তুলনার জন্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করছি: (ক) ছি রে ধাই চ্যাং মাগুলাই, চান্দের গোরে ধুল ধুলাই/ধুল্‌ধুলাইতে মানুষ ধাই দেখাহুকু মারে ভাই (খ) খোচা করে টান টান, / চোখুতে নাগিবে হান (গ) ছির ছির ছিব ছিলান ডাকে / হাবিয়া কোণাব বাঘ ডাকে (ঘ) আঠিয়া কলোর খোপ্‌ / থপ্‌কে মারিন্‌ তোক (ঙ) কালা কচুর আঠা দেখবো / তোর তামাসা (চ) কালো কচু লোহাডাং কোমোর ভিরিয়া বান্‌ (ছ) এতাক নোরি বেতাক নোরি /চান্‌ চিল্‌কা সোনার নোরি (জ) এলটুকু বেলটুকু দেখিমো তোর / বাপ মাও ক্যাতো বড়ো খেলটুকু।—দি রাজবংশী'স অক্‌ নর্থ বেঙ্গল, পৃ. ৮২

গ. ডাকডুডু খেলিয়ে বাঘ মারে ভেলিয়ে
বাঘের তেলে পিদিম জ্বলে
জ্বলুক পিদিম উঠুক ধোঁয়া
ডাক দে রে ছুঁচামুয়া[1]
গা-ডু-উ-উ[2]

২৯২

॥ খেলা, কৌতুকের ছড়া : বিচিত্র ॥

আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই।
বুড়ো দাদা মরে গেলে ডুব্ ডুবি বাজাই ॥[3]

২৯৩

আমপাতা কাট্টল পাতা,[4] তারা সোদ্দর্ ভাই ,—
রাজাঝিয়র্[5] কথা ফুইন্‌লে,[6] মাথাত্ উডে[7] বাই্[8] ॥[9]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া ; মানবজীবনসম্পর্কীয়

তৃতীয় পর্যায় : দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন

২৯৪

॥ ঘটক অভ্যর্থনার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

নিধিরাম পণ্ডিত পাট কাটছেন বসে।
এমন সময়ে খেলারাম মুকুয্যি উত্তরেত্তে এসে[10] ॥

১ ছুঁচোমুখো ২ তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা · পৌষ, ১৩৬৬) : রাঢ়-বঙ্গে চলিত।

৩ তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা চৈত্র, ১৩৬৬)

৪ কাঁঠাল পাতা ৫ রাজার ঝিয়ের, মেয়ের ৬ শুনলে ৭ মাথায় ওঠে ৮ বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া ৯ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮-৫৭৬)।

১০ উত্তর দিক থেকে আসে, এল।

'এস এস, মশাই এস' বলতে দিলাম আসন

—ছেঁড়াই কম্বল।

'মশাই, আপনার নিবাস কোথায়—'

'নিবাস, বেলে—বসিরহাট।

মশাই, আপনার কাছে একটা নিবেদনের জন্যে এইচি

মশাই, আপনার নাকি এট্টা অবিবাহিত কন্যা আছে।'

এমন সময়, মাগী ছিল কপাটের আড়ে

উল্টো-বস্ত্র হয়ে মাগী জলে-পুড়ে ওঠে।

কি বল্‌লি পোড়ার-মুখো আর একবার বল্‌

গোণ্ডা ছুচ্চার[1] থাব্‌ড়া মারলি নিধিরাম এ কপালে গে বসে।

তখন মাগী ঘটা করে ঘটকের স্বন্‌খি[2] পিঁড়ে পোদে দে বসে॥

'হ্যাঁ দেখ ঘটক-ঠাকুর,

আমার মেয়ের রূপের কথা কি দিব তুলনা।

রোদে পড়লে উনিয়ে ওঠে[3] কেবল কাঞ্চন-সোনা॥

আঁধার ঘর আলো করে যেন পিরতিমের থানা[4]॥

হ্যাঁ দেখ ঘটক-ঠাকুর,

আমি এমনি মেয়ের ঝাঁই—

জেইজির[5] বুকে হাটু দিয়ে ঘর করছি তাই॥

আমার নাম কাঁদন হেটে,

যেখানে ছুঁই[6] চলে না সেখানে চালাই বেটে[7]

সংসারটা চালাই আমি[8] হাত-কাট্‌না কেটে॥

হ্যাঁ দেখ ঘটক-ঠাকুর,

আমি এমনি বাপের বেটী,

গাছের পাড়ি, তলার কুড়ুই, ফুঁদে' উড়ুই কাদা।

হেল্‌কি দিয়ে ভেকি নাচাই হদ্দ হল বাবা॥

ও মুখো কত্তা[9] কুলীন, দেব না কুলীনের ঘরে।

নটবহরা দেখব কুলীন, দেব কুলীনের ঘরে॥

১ গোটা ছ-চার ২ সম্মুখে ৩ উঙ্ক হয়ে ওঠে, রোদে ঘেমে ওঠে, রোদ সইতে পারে না ৪ প্রতিমার মতো ৫ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ৬ ছুঁই, ছুঁচ ৭ পাটের মোটা সুতোর বড়ো ছুঁচ ৮ কথান্তর. 'ধান ওয়াজা করি আমি' ৯ ওদিকে কর্তা।

চারকুণ পিরথিমী[১] বেড়িয়ে আলাম[২]
নেইকো কুলীনের ঘরে অন্ন।
জামাই হবে দেখ্‌তে ফটিঙ্,
হাতে বাজাবে শিঙে, দাঁতে গুঁজবে মিশি।
সুখে-সম্পদে ঘর করবে, মুখে মিষ্ট হাসি॥

২৯৫

॥ বিবাহ-বিষয়ক, চট্টগ্রাম॥

বাড়ীর পিছে ডালম[৩] গাছে একটি ডালম ধরে।
একটি ডালম ছিঁড়ি, রাজা কন্যাদান করে॥
কন্যাদান করি' রাজা কোঁপাই'[৪] কোঁপাই' কাঁদে।
বড় ভাইয়ে কাঁদন করে ঝালির খুণ্ডা ধরি'[৫]॥
ছোট ভাইয়ে কাঁদন করে দোলার খুণ্ডা ধরি'।
ছোট ভইনে কাঁদন করে খেলার ঘরে বসি'॥
আমার দিদি কোনে[৬] নিল খেলা ভঙ্গ করি'।
বড় ভাইজে[৭] কাঁদন করে পাক ঘরেতে[৮] বসি'॥

২৯৬

॥ বিয়ের ছড়া-গান, পাবনা॥

বা'র বাড়ী[৯] গুবার গাছ করড়-মরড় করে,
তারি তলে বসে দামাদ্[১০] অধিবাস করে।
থালি দিলাম, বাসন দিলাম, তাও দামাদ গোসা-ই করে॥

২৯৭

॥ বিয়ের ছড়া-গান পাবনা॥

ছোট্ট ছোট্ট করল্যার ফুল/দামাদ্[১১] যাবে কতদূর?
দামাদ্ এল ঘামিয়া/ছাতি ধর হানিয়া।

১ পৃথিবীর চারকোণ ২ এলাম।

৩ ডালিম ৪ ফুঁপিয়ে ৫ বেড়ার খুঁটি ধরে ৬ কে বা ৭ ভা'জ, বউদিকে, 'এ' কর্তায় ৮ রান্না ঘরে। সঙ্কলকের মতে ছড়াটি অসম্পূর্ণ।

৯ বাহির-বাড়ী, বাড়ীর বাইরের অংশে ১০ বর, পাত্র।

১১ জামাই, বর।

২৯৮

॥ বিয়ের ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

কইনা কান্দে গুহুর-গুহুর[১], নাই চখুর[২] পানি
দে রে দামান্[৩] মরুচ[৪] ভাঙি[৫] বিরাউক[৬] চখুর পানি ॥[৭]

২৯৯

॥ জামাই-বিষয়ক, মেদিনীপুর ॥

জামাই বাবু, জামাই বাবু, কমলালেবু একলা খেয়ো না
দিদি আমার ছোটো ছেলে, কিছু জানে না ॥[৮]

৩০০

॥ জামাই-বিষয়ক, মেদিনীপুর ॥

জামাই বাবু, জল সাবু, পাতিলেবু,
ইষ্টিশানের মিষ্টি ফুল, শখের বাদাম গোলাপ ফুল।
রাম দুই সাড়ে তিন,
আমাবস্যা ঘোড়ার ডিম ॥[৯]

৩০১

॥ জামাই-বিষয়ক, পাবনা ॥

মালের ফুল[১০] তিলের ফুল, জামাই গ্যালা[১১] কতদূর?
জামাই এল ঘামিয়া, ছাতা ধর টানিয়া,
ছাতার উপর জোমলা, দেখ বিবির কমলা,
এনছান বিবির খাড়্যা পায়, জামাই দেখে নিবার[১২] চায় ॥

১ গুন-গুন করে ২ চোখের ৩ বর, জামাই ৪ 'মরিচ' ৫ ভেঙে ৬ বের হোক ৭ অবনীবালা রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। কথান্তর: 'আনো তো ভটবা-মরুচ'।

৮ বালিকারা এই ছড়া বলে জামাইবাবুর সঙ্গে তামাশা করে।

৯ বালিকারা জামাইবাবুকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে এই ছড়া বলে। শেষ দুই পঙ্‌ক্তির কথান্তর মেলে একটি খেলার ছড়ারূপে: হাতা পাটি হা-হা/কাক ডাকে কা কা/রাম দুই সাড়ে তিন/অমাবস্যার ঘোড়ার ডিম। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিকেও অন্য ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

১০ সর্ষের ফুল ১১ গেল ১২ নিতে।

৩০২

জামাই-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ॥

ঝিঙ্গা ফুল[১] ফুটে[২] বেল্ নাই[৩] ।
জামাই আস্ছে[৪] তেল নাই ॥
জামাই দিছে[৫] ভাতের হারা[৬]
হউরী দিছে টেঁকিত্ বাড়া[৭] ॥
বধূত্তে দিছে কড়াইত্ তেল ।
এৈকক[৮] ছোঁতে[৯] উড়িয়ে গেল্[১০] ॥

৩০৩

॥ জামাই-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ।

তালতলাত্ আসি' জামাই তালেব লড়ি[১১] পাইল ।
ঘাটার আগায় আসি' জামাই ষোড় কলসী পাইল ॥
বড উঠানে আসি' জামাই আঁক-প্রদীপ[১২] পাইল ।
ভিতব উঠানে আসি' জামাই বেদীর লগন্ পাইল[১৩] ॥
বারাণ্ডাতে উঠি' জামাই ধানে দূর্বা পাইল ।
হাতিনাতে[১৪] উঠি, জামাই দুধে কলা খাইল ॥
পাকঘবে যাইয়া জামাই রাঁধনীরে[১৫] পাইল ।
উয়াইর তলে[১৬] যাইয়া জামাই বিলাইর[১৭] লাথি খাইল ॥

৩০৪

॥ জামাই-বিষয়ক, মেদিনীপুর ॥

গেঁড়ী[১৮] বউ দরজা খোল, জামাই এসেছে
চিংড়ি মাছের খোলায় কবে গয়না এনেছে ॥

১ ঝিঙে ফুল ২ ফুটছে ৩ বেলা নেই ৪ এসেছে ৫ দিয়েছে ৬ ভাতের ফরমাস ৭ শাশুড়ী ঢেঁকিতে ধান ভানতে শুরু করেছে ৮ এক-একটি ৯ সোঁ করে ১০ উড়ে গেল।

১১ লাঠি, নড়ি ১২ বরণ-প্রদীপ ১৩ বেদীর নিকটে এল ১৪ ভেতরের ঘর ১৫ এখানে স্ত্রীকে ১৬ জলের কলসী রাখবার মাচার নীচে ১৭ বেড়ালের ।

১৮ বেঁটে, ছোটো।

৩০৫

॥ জামাই-বিষয়ক, ২৪ পরগণা ॥

আলুর পাতা থালু থালু বুন্দার পাতা দৈ
সব জামাই এলো আমার মেজ জামাই কৈ।
সোই[১] আসচে, সোই আসচে, লাল গামছা গায়।
ও গামছা দুবুনি[২], বেটির বে' দুবুনি[৩]।
গায়ের মাটি[৪] চাকা চাকা, বৌ তুলবে তার ষোল টাকা।
বৌ-র কত মণ[৫]?—বৌর ষোল টাকা মণ ॥[৬]

৩০৬

॥ বধূ-বিষয়ক, ২৪ পরগণা ॥

খট্ খট্ খড়ম পায়,—কে যায়?
ডাক্তারনীর স্বামী যায়।
তালতলা দে[৭] টান যায়, পুঁটি মাছে ঝাঁক নেয়
খরবা পাখি তামাক খায়, বাদুড় বলে—হায় হায়;
পান্তাভাতে চাপাচাপি, গরম ভাতে মৌ[৮]
মনসুর দাদা বে' করেছে দাঁত-ক্যালানো বৌ ॥[৯]

৩০৭

॥ বধূ-বিষয়ক, চট্টগ্রাম ॥

অউগ্যা[১০] বউ আইয়েন্দে[১১] খলীচ্ছরাত্তুন[১২]।
পাইন্ত্যা ফুলর্ খোশ্‌বু উডের্[১৩] বউয়র্ ঝুঁডাত্তুন[১৪]!

১ 'সেই' এবং 'ঐ' মিলে 'সোই' ২ দেব না ৩ দেব না ৪ কথান্তর: গাঁয়ের মাটি ৫ কথান্তর: 'পণ'। বাঙলার বহু পরিচিত একটি ছড়া। কিন্তু এটির কিছু ভিন্নতা থাকায় সঙ্কলিত হল। দ্রঃ: ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত 'বাংলা দেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ১১০ ক, খ, গ ও ঘ সংখ্যক ছড়া ৬ শেখ সা'আজুল ইসলাম (তিলপী, জয়নগর, ২৪ পরগণা)।

৭ থেকে ৮ যে অঞ্চলে ছড়াটি পাওয়া গেছে, মধু দিয়ে সেখানে ভাত খাওয়া হয় ৯ শেখ সা'আজুল ইসলাম (তিলপী, জয়নগর, ২৪ পরগণা)।

১০ একটি ১১ আসছে ১২ 'খলী' নামের কোনো 'ছড়া' অর্থাৎ ছোটো নদী থেকে ১৩ 'পাইন্যা' ফুলের অর্থাৎ শালুক প্রভৃতি জলজ ফুলের সুন্দর গন্ধ উঠেছে ১৪ বউয়ের খোঁপা থেকে।

ফইরা হাডর[১] লম্বা ইচা,[২]
বউয়ে খায় কাট্টল বিচা[৩] ॥

৩০৮

'রমণী-মাজান,' চট্টগ্রাম ॥

আনিল সোনালী দাবর[৪] খুলিল ঢাকনী।
ইছিয়া[৫] বাছিয়া লইল সোনার কাইকন[৬] ফনি[৭] ॥
আচুরি বিচুরি[৮] কেশ করিল লড়া লড়া[৯]।
তার মধ্যে চড়ায়ে দিল মণিমুক্তার ছড়া[১০] ॥
এমন ঝোঁটা[১১] বান্ধিল যে বামেতে টানিয়া।
সেই ঝোঁটা না দেখিলাম ত্রিজগৎ বেড়াইয়া ॥
গলায় তুলিয়া দিল গজমতির হার।
দুই বাঁয়েবাত[১২] চড়াই দিল কুলুপ দিয়া তার ॥
হাতেতে চড়াই দিল দুইগাছি বালা।...
পায়েতে চড়াইয়া দিল মুড়ামারা খারু[১৩]।
তার লামাতে[১৪] চড়াই দিল চৌবাশী ঘুংগুরু[১৫] ॥
হাজার টাকার সাড়ি আনি কেমাইল[১৬] মজাইল।
হাটতে লাগে ঝিমুক ঝামুক (?) দেখতে লাগে শোভা।
মেঘের আড়ে[১৭] পড়ে যেন বিদ্যুতের আভা ॥[১৮]

৩০৯

॥ গহনার ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥

ওহে কান্ত একান্ত মনে করি বাসনা,
পরিবারে আভরণ, শুন ওহে প্রাণধন,
স্বর্ণকারে গড়িবারে দাও স্বর্ণ গহনা।

১ ফকীরের হাটের। চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত ফকীরের হাট বড়ো ও বিখ্যাত ২ লম্বা লম্বা চিংড়ি মাছ ৩ কাঁঠালের বিচি।

৪ বাক্স ৫ ইচ্ছানুসারে ৬ কঙ্কন ৭ চিরুণী ৮ আঁচড়ে ৯ বেণীযুক্ত ১০ মালা ১১ খোঁপা ১২ বাহুতে ১৩ 'অনন্ত' নামীয় বাহুর অলঙ্কারমল ১৪ তার নীচে ১৫ নূপুর ১৬ কোমর ১৭ আড়ালে ১৮ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : 'প্রাচীন পল্লী সঙ্গীত ও কবিতা' : (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪২৭-৪২৮)। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। সঙ্কলনে নাম ছিল : 'রমণী মাজান'।

গড়াও গড়াও জড়োয়া সিঁতি, ঝালরেতে দিয়ে মোতি,
না করি ঠাট্টা, কহি দিতে ঝাপ্‌টা
বাঁধা কেশে ফুল বিনা সাজেনা।
হয়ে সুমতি, দিও প্রজাপতি,
পিন্‌ চিরুনী নইলে হবে না।
তুই কর দিয়ে কাটা ডাইমন,
নথের-মুক্তা হয় যেন পাকা দানা।
কান বালা, কর্ণ ফুল, এয়ারিং চৌদানী দুল,
ন-নরি চিক্‌, গড়ে যেন ঠিক্‌।
বলি আর, দিও দড়া হার
কণ্ঠ মালা দিতে যেন ভুলে যেয়ো না।
তাবিজ বাজু বশমেতে, দশে যেন বশে তাতে,
ভাল করে বলো তারে গড়িবারে মরদানা।
কিসের অপ্রতুল, দিতে নারিকেল ফুল
মাছিদানা, ছারপোকা, যেন ভুলো না।
ওহে তোমায় বলি, দিতে লবঙ্গ কলি,
পরে দিও যবদানা।
বাউটি পৈছে, বাঁধা নোয়া
আংটি হয় যেন হীরা দেওয়া
ওহে হীরা শুনে যেন ভয় পেয়ো না।
দেবে দশতোলা, রবে সব তোলা
ওহে জলে কিছু পড়বে না।
হস্তে দিও রতন চোক, কহি দিতে চাবি থোক্‌
হয়ো ধীর, দিও চাবি জিঞ্জির,
মোটা গোট একছড়া বিনা চন্দ্রহার সাজে না।
গুজরি পঞ্চমে, দিও ক্রমে ক্রমে
পাইজোরের ঘুমুর দিতে ভুলো না।
দিও চরণ পদ্ম, হয়ো আমার বাধ্য,
গোল গোল মল দিতে যেন গোল করো না।
দিও রাইটিং বাক্স, তাতে রাখব গহনার বাক্স,
কিন্তু তার চাবি কাকেও দেব না।

হবে পরিপাটি, দিও বারানসী শাটী,

চাইলাম বারাণসী বলে, যেও না ঢাকাই দিতে ভুলে

একশত দুইশত দাম নইলে কাপড় নিও না।[১]

৩১০

॥ গহনার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

ভারি-ভুরি[২] সাত ন'লী[৩] ডায়মন্[৪]-কাটা চিক্।

যে দেয়না নারীর গয়না, সেই পুরুষে ধিক্ ॥

কাঁকালে চন্দ্রহার, সকলি সোনার।

কপালে সিঁথেপাটী, গজমোতি-হার ॥

৩১১

॥ রান্নার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

মূলো রেঁধেছে কেডা ?—বউ।

—তাইতে মূলো তুলো-তুলো ॥

মা রাঁধে জল-জল, বুন রাঁধে ছাই।

ওই আবাগীর বেটী রাঁধে, চিনির পানা খাই ॥

আন্ মূলো, কাট্ মূলো,

রাঁধ্ মূলো, খাই মূলো ॥

৩১২

॥ রান্নার ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

কালো কচু, ধলো কচু, কচু এক জাত

কচু-শাক রান্‌তে[৫] গিয়ে পু'য়ে গেল[৬] রাত ॥

কী জ্বালা হলো রে বিষম কচু-শাক ॥

১ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ: 'সেকালের পল্লীচিত্র' (মানসী ও মর্মবাণী: ফাল্গুন, ১৩২৮। পৃ. ১৬-২৬)।

"তখনকার গহনার ছড়া যাহা যুবতীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে তখন কি কি গহনা ব্যবহৃত হইত, · । ছড়াটি নিম্নে লিখিয়া দিলাম" [সেই ছড়াটিই ওপরে সঙ্কলিত হয়েছে]।

২ ভারী-ভারী ৩ নহরের, নহরের ৪ ডায়মণ্ড।

৫ রাঁধতে ৬ পোহাল।

কচু-শাক কুটতে গিয়ে হাতে লাগল এঁশো[১]।
ঘরে এসে কাচাল করবে ভাতারের মেসো॥
কচু-শাক রান্‌তে গিয়ে তাতে দেয় নি কাঠি।
ঘরে এসে কাচাল করবে ননদিনী টাঁঠী[২]॥
কচু-শাক রান্‌তে গিয়ে তাতে দেয় নি নুন।
ঘরে এসে কাচাল করবে ভাশুরির[৩] বুন[৪]॥
কচু-শাক রান্‌তে গিয়ে তাতে দেয় নি ঝাল।
পিটির উপর পড়বে এসে ভাদ্দোর-মেসে তাল॥

৩১৩

॥ সজনের ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

আহা মরি, সজনের ডাঁটা
আগা সরু, গোড়া মোট্টা।
তি-শির[৫] লাঠির আকারে
কী শোভা চৈত্র মাসে ;
বোঝা বোঝা লইয়ে আসে।
কোণের কোনো পতি-বউ-ঝি কেনে
কোটেন গাদা-গাদা, রাঁধেন হাঁড়ী-হাঁড়ী
খান বাটি-বাটি।
ডাঁটাগাছটির ডিগে[৬] ধরে
দক্ষিণ হস্তে করে
চিবোচ্ছেন ধীরে ধীরে।
যদি হয় চচ্চড়ি আরো স্বাদ বাড়াবাড়ি
রসময়ী রুই মাছের তেলে
অগ্নিটান, মহাটান—
অধিক খেলে চক্ষু-কান॥

১ আঁশ ২ দুষ্ট, ঠেঁটা, পাড়া-বেড়ানী ৩ ভাশুরের ৪ বোন।
৫ ত্রি-শির ৬ প্রান্ত, ডগা, মাথা।

৩১৪

॥ সধবার ব্যথা, চট্টগ্রাম ॥

আধা গরুরে[১] বাঁধা দিয়ম্[২], জেবনীরে[৩] বিয়া দিয়ম[৪],
জেবনীত্তো[৫] হাত্ ভাই[৬], নাইয়র্ নিত কেহ নাই ॥

৩১৫

॥ সধবার ব্যথা, চট্টগ্রাম ॥

আকাশের বুলবুলি পাইক[৭]
আমার সোদর ভাই,
মা-বাপের সমাচার কইও
আমারে নিতে আই[৮]।
এ বৎসর থাক রে ভইন[৯]
নদীর কূলে চাইয়া,
আর বৎসর লইয়া যাইব
জোয়ারে নৌকা বাইয়া ॥[১০]

৩১৬

॥ সধবার ব্যথা, পাবনা ॥

প্রশ্ন : কুটুম পক্ষী[১১], কুটুম পক্ষী, বাড়ী যাব্যা কবে ?
উত্তর : সাম[১২] শুক্রবারে,/বাজার-খরচ করে থুচি[১৩] মেজ-মামার ঘরে।
মেজ-মামার বৌ যেন কেমন কেমন করে ॥

১ 'অন্ধ' গরু, অর্থাৎ যে দুগ্ধবতী গাইকে সারা দিন ঘরে বেঁধে রাখা হয় অন্ধের মতো ২ বন্ধক দেব ৩ জেবুন্নিছা নামীয়া মেয়েকে ৪ বিয়ে দেব ৫ জেবুন্নিছার নিকটে ৬ সাত ভাই।

৭ বুলবুলি পাখি ৮ আমাকে এসে নিতে ৯ বোন ১০ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭)। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। ২৯৫, ৩০২, ৩০৩, ৩০৮, ৩১৫-সংখ্যক ছড়া।

১১ হাঁড়িচাঁচা। "যেদিন সকাল বেলা হাঁড়িচাঁচা যে বাড়ীতে ডাকে সেদিন সেই বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়া থাকে।· পাবনা জেলার প্রায় লোকেই হাঁড়িচাঁচাকে 'কুটুমপক্ষী' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে" ১২ সম্মুখের, আগামী ১৩ রেখেছি।

৩১৭

॥ সধবার বাথা, চট্টগ্রাম ॥

ভাইয়রে পাল্যাম্‌দে[১] হুরুম্ খাবাই খাবাই[২]'
ভইনরে নিলদে বাজন্ বাই বাই[৩]।
ভইনর উত্তর্‌দি অলিম্নিছার ঘর্[৪],
অলিম্নিছারে বাঁধি এইযুগ্যো ঢিলাদি মইঘর[৫]।
বাজাঙ্গার উত্তরদি ছখিম্নিছার ঘর্,
ছখিম্নিছা কাঁদেদ্দে ঝর্ ঝর্ ঝর্ ॥[৬]

৩১৮

॥ সধবার বাথা, কোচবিহার ॥

দিদি রে হে দিদি, তোক দুঃখের কাথা কং[৭]—
এইমন্ ঘরোত্ ব্যাচেয়া খাইল্[৮], ভাত-কাপড়ে না পাং[৯]।
তোর বাড়ীত্ শাগাই[১০] গেইলে প্যাট ভরেয়া খায়—
হামার বাড়ীত্ শাগাই আসিলে অম্‌তে-অম্‌তে যায়[১১]।
বাপোক যুদি খবর দেওং[১২], না আইসে মোর বাড়ী
দাদাক যুদি খবর দেওং, নাই দেখে মোক ফিরি'।
মাওক যুদি খবর দেওং কান্দিয়া মাও কয় :
তোর দুঃখের কাথা মোর দেহাতে[১৩] না সয়[১৪] ॥

১ ভাইকে পালন করলাম ২ মুড়ি খাইয়ে খাইয়ে ৩ বোনকে নিয়ে গেল বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে ৪ বোনের বাড়ীর উত্তর দিকে অলিম্নিসার বাড়ী ৫ অলিম্নিসাকে মোষ-বাঁধা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে ৬ ছখিম্নিসা ঝর্-ঝর্ করে কাঁদছে মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন (বিচিত্রা : আশ্বিন, ১৩৩৫। পৃ. ৫৫৮–৫৭৫)। ৩০৭, ৩১৪, ৩১৭-সংখ্যক ছড়া।

৭ কথা কই ৮ এমন ঘরে বিয়ে দিল (বাবা-মা)। যেহেতু কন্যার পিতাই বরপক্ষের কাছ থেকে পণ নেয়, সেইহেতু মেয়ের বিয়ে দেবার নামান্তর প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে হয়েছে, 'ব্যাচেয়া খাওয়া' ৯ পাই না ১০ আত্মীয়-স্বজন ১১ এমনি এমনি, না খেয়ে চলে যায় ১২ দিই ১৩ শরীরে ১৪ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

৩১৯

॥ স্বামী-স্ত্রীর কোন্দলের ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

শুন সবে একভাবে গঙ্গাস্নানের কথা।
মাগী বলে 'যাবো যাবো', মিন্‌সে ভাঙে মাথা ॥
মাগী চোটে-চাটে চিঁড়ে কোটে আপন-মত মতে।
রাস্তাপানে চেয়ে দেখে লোক চলেছে পথে ॥
মাগী চাল-চিঁড়ে, বোঁচ্‌কা-পিঁড়ে আর তামাকের পাতা।
মিন্‌সে বলে, ওর মার মাথা খেয়ে শুনবে আমার কথা ?

৩২০

॥ স্বামী-স্ত্রীর কোন্দল, কোচবিহার ॥

বাঁশের আগালত্‌ কাউহাটা[১] কা-কা করে
একটা ভাতার দুইটা মাইয়া[২] ঝগড়া করি' মরে।
ভাতারটা টেপ্‌সি,[৩] খাইয়া[৪] দুইটা খাপ্‌সী[৫]—
কাথায়-কাথায় গরম, মাবি' দেয় খড়ম ॥[৬]

৩২১

॥ দাম্পত্যজীবন, মেদিনীপুর ॥

সাজ রে বউ সাজ, খুড়ীব কাঁসা মাজ।
খুড়ী হলো কানা, বউকে মারে ঠোনা ॥

৩২২

॥ দাম্পত্যজীবন, মেদিনীপুর ॥

শ্যামা, মুড়ির ধামা।
খেতে খেতে যাই চন্দ্রকোণা ॥
চন্দ্রকোণায় ছিল লাঠি, শ্যামার ভাতার মারল লাথি ॥[৭]

৩২৩

॥ বধূর উদ্দেশে, মেদিনীপুর ॥

হাজার টাকার বউ এনেচি খ্যাঁদা নাকের চূড়ো ॥
খ্যাদা হোউ, প্যাঁচা হোউ, সব সইতে পারি।
খাবার বেলায় খোঁটা দিলে তা সইতে নারি ॥[৮]

১ কাকটা ২ বউ ৩ জেদী, একগুঁয়ে ৪ যারা খায়, এ ক্ষেত্রে বউ দুটি ৫ কলহপ্রিয় ৬ হরেন রায় (মাণিকগঞ্জহাট, হলদিবাড়ী, কোচবিহার)।

৭ সুষমা গুছাইত (জ্যোৎঘনশ্যাম, মেদিনীপুর)।

৮ রামরঞ্জন রায় (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)। ২৯৯, ৩০০, ৩০৪, ৩২১, ৩২৩ সংখ্যক ছড়া।

৩২৪

॥ সতীন প্রসঙ্গ, কোচবিহার ॥

নাউ-কুমড়া ঘোলোর-মোলোর, কুসলা মাছ[1] দিয়া—
সতীন গেইছে বাপের বাড়ী মোক সে আন্দন দিয়া[2]।
আন্দি'র না পাং বাড়ি'র না পাং[3] পিঠির গেইছে ছাল[4]—
এনং ঘরোত্ ব্যাচেয়া খালেক[5], বাপটা না-হায় ভাল্[6] ॥[7]

৩২৫

॥ শাশুড়ী-বউয়ের কোন্দল, ২৪-পরগণা ॥

এক বউ ছিল কপাটের আড়ে—
লাফ দিয়ে পড়িল বউ ভাশুরের ঘাড়ে।
ঘাড় ভাঙলি বেশ করলি সর্বনাশীর মেয়ে
আসুক আগে হেলা পুত্, দিব তারে ক'য়ে।
এল হেলা সন্ধ্যে বেলা ভুঁই নিড়িয়ে বাড়ী
হেলার কথা শুনে বুড়ী করছে তাড়াতাড়ি।
সাধ করে করেছি বউ ফেণে-ভাতে খাবো—
ফেণে-ভাতে রেঁধে বউ সকলের আগে খেয়ে
পাড়া বেড়াতে যায়।
পাড়া বেড়িয়ে এসে বউ হয় না কেন ছড়া-ঝাঁট্[8]।
ছড়া-ঝাঁট্ বিষম পোড়া সকল কাজের আড়ি
অমনি বউয়ের মুখে মারি উল্টো ঝাঁটার[9] বাড়ি।
ক্ষুদ গাল্লি[10] চাল গাল্লি যেখানে যা রাখি
সর্বনাশী মেয়ের জ্বালায় ফিরে নাহি দেখি।
ননদ মলো ভালো হলো শাউড়ী মলো কোণে।
ক্ষুদ গাল্লি খাতি দেয়নি তাও উঠেছে মনে[11] ॥

১ 'কুরুসা' মাছ, বাটা মাছের মতো। কাব্যে খুব উল্লিখিত হয়েছে ২ আমাকে রাঁধা-বাড়ার ভার দিয়ে ৩ রাঁধতে পারি না, বাড়তে পারি না ৪ পিঠের গেছে ছাল ৫ এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছে ৬ বাপটি ভালো নয় ৭ রাজেন অধিকারী (দিনহাটা, কোচবিহার)।

৮ দেয় না কেন গোবর-ছড়া এবং উঠোন ঝাঁট ৯ উল্টো ঝাঁটার, অর্থাৎ ঝাঁটার মুঠোর দিকের ১০ গোটা চাল ও ক্ষুদ পৃথক করলে ১১ মনে হয়েছে, মনে আছে।

৩২৬

শাশুড়ীর প্রতি বউ, মুর্শিদাবাদ ॥

উঁচ-কপালী চিরোল-দাঁতী দেখতে পারে না,
সকাল বেলায় পান চিবিয়ে বাড়ায় বাতনা।
তুই শাশুড়ী, কুমলা শাড়ী, পায়জা-ভরা ভাত,
আমার কথায় মন ভরে না, এঁটো-কাঁটায় পাত ॥[১]

৩২৭

শাশুড়ী-বউয়ের ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

শুন সবে একভাবে পবিত্র বাণী
শাশুড়ী-বউয়ের কোঁদল আমি ভালো জানি ॥
"ঢেমন-ঢোসড়ের জাত[২] কল্লা[৩] জাতির মেয়ে
ওর মা-মাসী যেমন বেড়ায়, তেম্‌নি বেড়ায় চেয়ে ॥"
"এত যদি জানো ঠাকরুণ, এত যদি জানো
ঢেমন-ঢোসড়ের জাত ঘরকে কেন আনো ॥"
"কি বল্‌লি নেয়ের-খাগী[৪], খা নেয়ের মাথা।
পুনর্বার ক'স্[৫] তুই এই সকল কথা ॥"
"আমার নেয়ের খাগী" তোর কতো লাগবে মিষ্টি!
তোর ঝি-জামাইরি[৬] খেয়ে দেখ গে কতো লাগে মিষ্টি।
"ঝি-জামাইর গু তোর হাতে,
ঝি-জামাইর গু তোর দাঁতে
তোই ভাই-বাপরে কেটে দিব পুনর্বার তোর পাতে" ॥[৭]

১ আবদুর বর (সরমস্তপুর, মুর্শিদাবাদ)।

২ দুশ্চরিত্র ও নীচু জাতের ৩ ঝগড়াটে ৪ নাইয়র-খাগী, জাতি-খাগী, বাপের বাড়ির মানুষ-খাগী ৫ বলিস খেলে ৬ ঝি-জামাইকে ৭ শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাঁটাপুকুর, বাসরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৩৫৮ সনে সংগৃহীত। ২৭৪, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৭-সংখ্যক ছড়া।

৩২৮

॥ শাশুড়ী-বউ প্রসঙ্গ, মেদিনীপুর ॥

পানকৌড়ি, আড়ায় উঠ্যা না—
তোমার শাহ্ড়ী[১] বলো গেছে কদ[২] কুট্যনা[৩]।
চালে আছে চাল কুমড়া শিঁকায়[৪] আছে ঘি—
ভালো কর‍্যে রাঁধ্ গো সদাগরের ঝি।
আমি কি মন্দ রঁধ্যেছি—
বাড়ীর কাঁচকলা দিয়েঁ্য পটল ভাজ্যেছি[৫] ॥[৬]

৩২৯

॥ শাশুড়ী-বউ প্রসঙ্গ, কোচবিহার ॥

নদীর পাড়ের ধুল্ধুলা মাটি, চাউল কাঁড়ে[৭] সরকারের বেটী।
চাউলোত্তো পাড় দেয়[৮], ছাওয়াকো কোলত্ নেয়।
কোলত্ নিয়া দেয় দুধ, শাশুড়ীক্ দেয় কামের বুঝ্[৯] ॥[১০]

৩৩০

বউ ননদের প্রসঙ্গ, পাবনা।

চ্যারার[১১] মাটি দল দল,/ কুক্‌রা[১২] নাচে কদমতলা,
ঝি-বৌএর কি এমন জ্বালা/ ঝি-বৌএর কি এমন জ্বালা ॥

১ শাশুড়ী ২ কদো, এক ধরণের ঘাস ৩ কোটো না ৪ শিকেয় ৫ ভেজেছি ৬ হঁ।রালাল মাহাত (জয়পুর, ঝড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

৭ ধানের খোসা উঠে যাবার পর চাল পরিষ্কার করাকে 'কাঁড়ানো' বলে ৮ ঢেঁকিতে পাড় দেয়। কোচবিহার-রঙপুর-দিনাজপুরেই ঢেঁকির চলন আছে, জলপাইগুড়িতে নেই। এটি কোচবিহার-রঙপুরের ছড়া ৯ পুত্রবধূ ধান ভানতে গিয়ে সন্তানকে স্তন দেবার অছিলায় জিরিয়ে নিচ্ছে ; শাশুড়ীকে ফাঁকি দিচ্ছে ১০ সুরেন রায় (হলদিবাড়ী, কোচবিহার)।

১১ কেঁচোর ১২ মোরগ। শেষ পঙ্‌ক্তি মোরগের উক্তি। ঝি-বউয়ের প্রতি তার সমবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।

৩৩১

ভাশুর-ভাদ্রবউ প্রসঙ্গ, ২৪-পরগণা ॥

পানকৌটি পানকৌটি ডাঙায় ওঠ না
তোমার ভাশুর ভাত খায় নে[১], বেগুন কোট না।
বেগুন হল ঝালাপালা, বৌ পালালো দুকুর বেলা[২]
হালের গোরু পালে থুয়ে বৌ খুঁজতি গ্যালো
বৌ-র কপালে ডাঁড়া সাপ ফুঁপিয়ে মেরেচে[৩]—উঁহু, বড্ড লেগেচে।
কে দেখেচে, কে দেখেচে?—মামা দেখেচে
মামার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেচে—উঁহু, বড্ড লেগেছে[৪] ॥[৫]

৩৩২

॥ ভাশুরের প্রতি ভাদ্রবউ, হুগলি ॥

ভাশুর ভাশুর কুক্‌। দেখ না ভাশুর নক্‌।
ভাশুরকে দেখলে হাসি পায়। ভাশুর আবার ভাতার হ'তে চায়।
উঁগিঝুঁগি[৬] মারো কি? ই তো[৭] তোমার ভাইয়ের ধন—
তোমাকে দিতেই কতোক্ষণ ॥[৮]

৩৩৩

॥ ভাদ্রবধূ প্রসঙ্গে, পাবনা ॥

কলা বুনল্যাম সারি সারি, মধ্যি বুনলাম জিরা,
ভাশুর দেখ বৌ পালাল, তসর গেল ছিঁড়্যা।

১ খায় নি ২ কথান্তর : বেগুন হল ফালাফালা, বৌ পালায় দুপুর বেলা : বাংলা দেশের ছড়া (ভাদ্র, ১৩৭৭), সং ৬৩৮ঘ ৩ দাঁড়াস সাপ ফণা তুলে মেরেছে। বউকে দাঁড়াস সাপ কামড়ানো, বা কোনো স্থান থেকে সাপ বেরিয়ে পড়া বাঙলার সব অঞ্চলের ছড়াতেই পেয়েছি। এই সাপকে পুরুষাঙ্গ বিশেষের প্রতীক বলে মনে হয়। সাধারণতঃ বিয়ে এবং নারীর সংসর্গে সাপের উল্লেখ করা হয় ৪ ছড়াটি একটি বহু পরিচিত ছড়া, অনেক কথান্তরও মিলেছে। মনে হয় দুটি ছড়ার সংমিশ্রণ ঘটেছে এতে। দ্র : ভবতারণ দত্ত সঙ্কলিত 'বাংলাদেশের ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৭৭) বইয়ের ৬২৫ ক, খ এবং ৬৩৮ক, খ, গ, ঘ-সংখ্যক ছড়া ৫ শেখ সা'আব্দুল ইসলাম। (হিলপী, জয়নগর, ২৪-পরগণা)।

৬ উঁকিঝুঁকি ৭ এ তো ৮ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৩৩৪

। শ্বশুর-ভাশুর ও বউ, জলপাইগুড়ি ।

ছোটো পিড়াখান্ বড়ো পিড়াখান ডালিমগাছের তলে—
ভশুর[১] আইসে শ্বাশুর আইসে, কই খারিবারে আলে[২] ।
কই খায়েছে[৩] গোটা-গোটা, শোলাবাড়ী দি' বাটা[৪] ।
শোলার আগাল ভাঙি' পড়ে, ঘিত-মধুর বাসে
জাঙোই ছাওয়া[৫] হাসে ॥

৩৩৫

। দাম্পত্য জীবনপ্রসঙ্গে, হুগলি ।

আস্দ গাছে[৬], টিকটিকিটি, মরিজ গাছের[৭] ছাই
সরে যাও গো গুণের ভাশুর, চাল ধুতে যাই ।
দেখলি ভাতার তুললে না, তোর ঘর করবো না ।
দাঁড়িয়ে সিঁদুর পরবো না ॥
নাকের জঁটে[৮] চাল্তা ফুল, ঘুরিয়ে দিল বড়্ঠাকুর
বড়্ঠাকুরের ভাজা মালা[৯] আমরা ফুলের গেঁথেচি
কোলের ভাতার পরকে দিয়ে বুক বেঁদেচি[১০]
আমার ভাতার ভেল্কি জানে, আঁকুড় ক'রে কাল্কে টানে ।

১ ভাশুর ২ অছিলায়, জন্যে ৩ মারছে ৪ পথ ৫ জামাই ছোঁড়া । তৃতীয় পঙ্ক্তির পর কথান্তর : কই মারং[১] গোটা গোটা, ঘুঘু মারং ডালে/এই ছুকুনা[২] ক্ষুদির ভাত থুকুর-বুকুর করে । / তাক ছাড়িয়া গলামের[৩] বেটা মোর ছাওয়াক মারে । / আজি মারিবু, কালি মারিবু, ফেলা হাতের নড়ি/আর একদিন মারিবু খুদি ধরিম পাকা দাড়ি । / বাপের বাড়ীর কৈতর জোড়া মোরে বাড়ীত্ পড়ে/ ব্যাত-বাড়ী[৪] দিয়া কৈতর জোড়া উড়িয়া যা রে ।/ ব্যাতের আগাল আন্দো[৫] মুই ঘিত-মধু দিয়া/জাঙোই[৬] আসিছে ঘিত্র-মধুর বাসেনা[৭] পায়া ।/খা জাঙোই গুয়া-পান, বেটিক দিয়া করিম দান।/কইনা আসিল্ হাসিয়া, ছাতি ধর টাঙেয়া/ ছাতির উপর গামছা, টিলিমিলি তাম্শা । ১ মারি ২ এইছুটি ৩ গোলামের ৪ বেতের বন ৫ রাঁধি ৬ জামাই ৭ বাস ।

৬ গাছ বিশেষ ৭ 'মরিচ' গাছের ৮ ডগায় ৯ (?) ১০ বেঁধেছি ।

গেঁদা ফুল দাও বদনে, যত সুখ[1] হয় ছুঁইলে
ভমরি গাছের তল, পড়ে ঝন্‌ঝন্—
ভাতার এমন ধন, কে জানে রে মন।[2]

৩৩৬

॥ জ্যেঠা-ভাইপোর সংলাপ, হাওড়া ॥

জিজ্ঞাসছেন জ্যেঠা—
ভাইপো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হয়ে আসছে মোটা।
হ্যাগো জ্যাঠা, শ্বশুরবাড়ি কী রসুইয়ের ঘটা॥
যাওয়া মাত্র আয়না, তেলের বাটি, কিবা আসবেন পরিপাটী।
মাটি, তার জল ছড়িয়ে তাতে পেতে শীতলপাটী॥
কেউ জেলেছে চুলো, ঝাড়ছে চালের গুঁড়ো॥
খেয়ে-দেয়ে রইলাম বসে সকল বর্ত্তমান।
শাশুড়ী তৈরী করে পাঠাইলেন পান॥
হ্যাগো জ্যাঠা, শ্বশুরবাড়ি কী রসুইয়ের ঘটা॥[3]

৩৩৭

মাসীর প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ ॥

ক. মাসী বড় টসটসাল, বোন-পোকে দেখে মাসী খুদ চড়াল ;
তাহে কিছু অকুলান হ'ল !—তাই শেষে জল ঢালিল !

খ. খুদের এত নাড়া :
থাকত ডাল, ভাঙত হাঁড়ি, যেত পাড়া পাড়া॥

গ. মাসীর বড় টস্—মেসোর বড় টস্—
এক খোরা খুদ-সিদ্ধ, লঙ্কা গোটা দশ।[4]

৩৩৮

॥ প্রেম-মূলক ছড়া, বর্ধমান ॥

কে জানে কার পোষা পাখি—
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা।

১ সুখ ২ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৩ দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম: সীমচক। ধুরখালি, হাওড়া)।

৪ নসীরাম দেবশর্ম্মা: বাঙ্গালার মাসী (ভারতবর্ষ: শ্রাবণ, ১৩২১। পৃ. ৩০৭-৩১২)।

লোকে বলে কালো কালো
কালো বরণ দুটি পাখা ॥
পাখি এমন সর্বনেশে, কাজল-চৈত্রে আসে—
হত যদি বারোমেসে, যৌবন রাখা দায়ের কথা ॥[১]

৩৩৯

॥ বৈধব্য প্রসঙ্গে ॥

একাদশী বাঘের মাসি,
বাঘ বলেছে যেতে, তাদের বাড়ি খেতে।
একাদশী আর করব না, সাদা কাপড় আর পরব না ॥

৩৪০

॥ বিদায়কালীন উক্তি, হুগলি ॥

যাও যাও, করি না মানা। বিদায় দিতে মন সরে না ॥
সোনা ধরে দিব্যি করো। আবার কবে আসবে বলো ॥
উ কোথাটি[২] বলো না রাধে। আসব আমি ছ'মাস বাদে ॥[৩]

৩৪১

যাবে যাও, থাকবে থাক, থেকেই বা কি কর্‌বে ?
এখনও ত বেলা আছে, / গেলেও যেতে পার্‌বে ॥[৪]

৩৪২

॥ বিবাহের জন্য ঈর্ষা, পাবনা ॥

ছোটভ গাঙের ঢেউ, বড় গাঙের ঢেউ
এ-টু-টু ছুঁড়িয়া জমিদারের বৌ।[৫]

১ তরুণকুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)।

২ ও কথাটি ৩ উৎপলকান্তি গায়েন (জগৎপুর, হুগলি)।

৪ নসীরাম দেবশর্মা : বাঙ্গালায় মাসী (ভারতবর্ষ : শ্রাবণ, ১৩২১। পৃ. ৩০৭-৩১২)।

৫ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গ-লক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। ২২৬, ২৯৭, ৩০১, ৩১৬, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪২-সংখ্যক ছড়া।

"অধিকাংশ বাল্য বিবাহ ধনী লোকের মধ্যেই সংক্রামিত। উহাই দর্শন করিয়া (ঈর্ষাপ্রযুক্তা হইয়া) একটী দরিদ্র যুবতী (উপযুক্ত বয়স্কা) প্রতিবেশী জমিদার গৃহিণীকে (বিবাহিত বালিকা) লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত ছড়াটী বলিতেছে।—লেখিকা।"

৩৪৩

॥ বিবাহের আকাঙ্ক্ষা, ২৪ পরগণা ॥

খেলাকুচি মালাকুচি দাই পুতুলির বে'
দাদা, বে' দিস্ তো দে।
সকলার[১] দিলি আশেপাশে, আমার দিলি বনবাসে[২] ॥[৩]

৩৪৪

মন-আগুন জ্বলছে ত্রিগুণ
ফাগুন মাসের লগন বয়।
আর কবে হবে বিয়ে
যৌবনও বয়ে যায় ॥[৪]

৩৪৫

নাপ্‌তে বউয়ের ছড়া, পশ্চিমবঙ্গ ॥

আমি নাপ্তে বউ, কর্তা, সব জায়গায় যাই।
ভালমন্দ সুখের জিনিস সব দেখ্‌তে পাই ॥
পয়সা পেলে কুলের কুসুম অকূলে ফুটাই।
লুটীর ভিতর চিটি রেখে দুয়ের মন যোগাই ॥
কেউ চাইলে আল্‌তাপাত্ত বেঁধে দিই মোহর রেখে ভিতরে।
বলি এমন সরস আলতা দিদি নাইক কারু ঘরে ॥
যদি মন হয় খরচ কর, নইলে ফিরে দিও।
দেখ দিদি ভালো জিনিস নষ্ট নাহি করো ॥
যদি মুচ্‌কি হেসে বলে 'বউ' না ফিরিবে আর।
মনে বলি টোপ্ গিলেচে যাবে কোথা আর ॥[৫]

১ সকলের ২ ছড়াটি কুমারীর আক্ষেপ। সমবয়সীদের বিবাহ দেখে দাদাকে বিয়ে দিতে বলছে একদিকে; অপর দিকে দূরে বিয়ে হবার জন্যে তাকে দোষারোপ করছে ৩ শেখ সা'আদুল ইসলাম (তিলপী, জয়নগর, ২৪ পরগণা)।

৪ দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম: সীমচক্। ধূরখালি, হাওড়া)।

৫ কৃষ্ণা (উপন্যাস): (বান্ধব: একাদশ সংখ্যা, ১২৮৮। পৃ. ৫২২-৫২৮)। এই উপন্যাসের একটি দৃশ্যে, গাজনের দিন, জমিদার বাবুকে শুনিয়ে ছড়াটি বলেছে এক নাপিত-বধূ। রচনাটির দ্বিতীয় নাম ছিল 'কলিকাতা শতাব্দীপূর্বে'। সে হিসেবে এটি রচনাকালীন যুগ থেকে শতবর্ষ পূর্ববর্তী।

৩৪৬

তোমরা আমার কে?
আদর করিয়া ভোজন করাইয়া সুখেতে রাখিছ যে॥
কত পরিপাটি বিছানা করহ আমার দেহের লাগি।
কাঠের উপরে কাঠেতে চাপিবা উড়ি গেলে জীউ[১] পাখী॥
ব্যজন লইয়া আদর করিয়া ব্যজহ[২] আমার গায়।
তোমারই লোক উজাল[৩] লইয়া আগুন লাগাইবা তায়॥
কভু যদি মোর গায়ে ব্যথা হয় আদরে টিপিতে থাক।
তোমারই লোক হলকা[৪] লইয়া ভাজিবা আমার দেহ॥
কত মত রসে রান্ধিয়া বাড়িয়া আমারে ভুঞ্জাইয়া থাক।
ঘরের কোণেতে ছাই কাঁটা দিয়া চেই চেই[৫] কৈক[৬] দেখ॥
আজিকার সুখ, সুখ কিছু নহে, পরে যদি নাহি থাকে।
সুজন হইতা[৭] সুবুদ্ধি যোগাইতা সুপথে চালাইতা মোকে[৮]॥[৯]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া: মানবজীবন সম্পর্কীয়

চতুর্থ পর্যায়: কর্মজীবন ও অবসর যাপন

৩৪৭

॥ কাঠ বা কোনো ভারী জিনিস টানবার ছড়া, খুলনা॥

এই আল্লা বল : হেইয়োঁ
এই রসুল বল : „
এই রসুলে পানি : „
এই আমরা জানি : „
এই জেইনে-শুনে[১০]: „
এই মা পায় সুর[১১]: „[১২]

১ প্রাণ ২ বীজন কর ৩ মশাল ৪ শবদাহ করবার বংশদণ্ড ৫ দূর্ দূর্ ৬ বলবে ৭ হ'লে ৮ আমাকে ৯ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত: 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' .(সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪২৬)। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

১০ জেনে-শুনে ১১ দেবতা (?) ১২ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপ নগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

৩৪৮

॥ কাঠ বা কোনো ভারী জিনিস টানবার ছড়া, খুলনা ॥

এই বাম্‌-ঝুমরো : হেঁইয়ো
এই ঝামুটি চাদর : „
এই দিয়ে গায় : „
এই বো'ল্‌ মাছটা[১] : „
এই দিলে তারে : „
এই পান্তা ভাতে : „
এই গিলে খায় : „[২]

৩৪৯

॥ ধানভানার[৩] ছড়া, বর্ধমান ॥

চলল পিরিতের ঢেঁকি গুস্‌করা[৪]—
কে ধান ভানবি, আয় লো তোরা।
যেমনি ঢেঁকি, তেমনি পোয়া[৫]
মুষুলিটা[৬] তেল পারা—
চলল পিরিতের ঢেঁকি গুস্‌করা ॥[৭]

৩৫০

॥ ধানভানার ছড়া, পাবনা ॥

কাতলা[৮] উঠিয়া বলে, আমরা দুটি ভাই—
রাজকন্যা বাড়া ভানে,[৯] আমরা গান গাই।
আম্বলি[১০] উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়
আমি না থাকিলে ঢেঁকি চেতর হয়ে[১১] পড়।
মোনাই[১২] উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়,—
আমাক্‌ দিয়া গৃহস্থের ধান-চাল গুঁড়া কর।

১ বোয়াল মাছটা ২ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপ নগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

৩ আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে 'বাদাই'-এর ছড়া। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়াকে বলে 'বাদাই' ৪ বর্ধমানের একটি জায়গা ৫ ঢেঁকির অংশ বিশেষ ৬ মুষলটি ৭ তরুণকুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)।

৮ ঢেঁকির দু পাশের খাঁজ কাটা দুটি কাঠ, যাদের ওপর ঢেঁকি থাকে ৯ ধান ভানে ১০ আকগুলি ১১ চিত্‌ হয়ে ১২ ঢেঁকির অঙ্গ বিশেষ।

ঢেঁকি উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়
আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করে পার ?
সাপ্‌টা[১] উঠিয়া বলে, আমি সকলের বড়
আমাক্ দিয়া ধান-চাল পরিষ্কার কর ॥[২]

৩৫১

॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

হেইসো বাড়ার ভুকি[৩]
হালুয়া[৪] মুখামুখি ॥
যেত্‌কে[৫] হালুয়া কিচ্‌কিচায়[৬]
তেত্‌কে[৭] বাড়ার ভুকি ॥
হালুয়া আসিল্ বাড়ীত্
চাউল খিয়াছু হাঁড়ীত্[৮] ॥
আন্ সোয়ামী পাত কাটিয়া
দেছি[৯] হামরা ভাত বাড়িয়া ॥
ভাতো ক'ছে[১০] গরম
শাগো ক'ছে গরম,—
হের্ দেখ্[১১] শালী ‍ঃড়ম ॥

৩৫২

॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

চল্‌টুং মোর দতরা[১২] রে
কইরো[১৩] মুই পাছু রে ॥
হেইসো বায়ার ভুকি কে
ওইঠে[১৪] না মুই থুইসু[১৫] রে ॥[১৬]

১ ঝাঁটা ২ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত।

৩ ধান ভানাকে 'বাড়া ভুকানো' বলে ৪ কৃষক, গৃহস্থ ৫ যখন ৬ তিরস্কার করে ৭ তখন ৮ হাঁড়ীতে চাল চড়ানোয় ৯ দিচ্ছি ১০ করছে লাগছে ১১ এই দেখিস্।

১২ 'চল্‌টুং' করে শব্দ হওয়া আমার দোতারা, ১৩ কোথায়, কই ১৪ ওই স্থানে ১৫ রেখেছি ১৬ সুরেন্দ্রনাথ রায় (ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)।

৩৫৩

॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

চিকা[১] করে চিক্
কইন্না[২] ভাতোত্ দিস্।
কইন্না করে ঘাচাউ-ঘাচাউ[৩]
নুনের ছিটা দিস্ ॥

৩৫৪

॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

ওই চিকা[৪] কইলে চিকিং[৫]
মাঝিয়া[৬] কইলে টিকিং।
আন্ বেহানী[৭] বেও[৮]।
চিকাটা মারিয়া দেও ॥
খা বেহানী খা
ঝোলে-ঝোসে খা।
ঝোলে-ঝোসে খায়া বেহানী
বাড়ী চলিয়া যা ॥

৩৫৫

॥ ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

চাউল কাঁড়াও মুই চিকিত্-চাকাত্[৯]
গকোলাতি ছাম[১০]
বইনার[১১] নাঙে[১২] আনিয়া দিছে
টেঙ্গা[১৩] গাছের আম ॥
বইনা রে হুঁ,
মুই নাইয়র যাবা' চাওঁ[১৪]।
মাগে মা,
কাজল-মন্দির ঘরটা কাঁক্[১৫] দিয়া যাওঁ[১৬] ॥

১ ছুঁচো ২ করলা, তরকারি বিশেষ ৩ সেদ্ধ না হবার জন্যে 'ঘচ্-ঘচ্' করছে।

৪ ছুঁচো ৫ ছুঁচোর ডাকের শব্দ ৬ ঘরের মেঝে ৭ বৈবাহিকা ৮ জোনার যাদু।

৯ চাল কাঁড়াবার ধ্বন্যাত্মক শব্দ ১০ যার মধ্যে ধান থাকে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে তাকে 'ছাম' বলে। যে 'ছামে'র গর্ত অনেকটা তাকে 'গকোলাতি ছাম' বলে ১১ বোনের ১২ উপপতি ১৩ টক ১৪ বাপেরবাড়ীতে যেতে চাই ১৫ কাকে ১৬ যাই।

৩৫৬

। ধান ভানার ছড়া, জলপাইগুড়ি ।

স্যাও স্যাও স্যাও[১], তিলা নাড়ু খাও।
তিল হইল্ গটা, মোখোলিয়ার[২] হইল্ ব্যাটা।
মোর হইল্ নাতি, কাম করিবার হাতি ॥

*

হেইলো হেইলো হেইলো[৩], তিলের নাড়ু খাইলো।
তিল হইল্ গটা, মোর হইল্ ব্যাটা।
তোর হইল্ নাতি, ধান ভুখা[৪] হাতী ॥

*

স্যাও স্যাও স্যাও, তিলের নাড়ু খাও। ··
তোর হইল্ বেটা মোর হইল্ নাতি—
কলাত্ করিয়া থাকি ॥

*

স্যাও স্যাও স্যাও,
দুয়ারের আগত্ ভইষ[৫], ধান বাখর[৬] হইস্।
দুয়ারের আগত নাড়া—চাউল হইস্ কাঁড়া ॥
ওই দিয়া যারে ভইষ, ধান বাকড় হইস।
বাঁশের গোড়ত্ তারা, চাউল যাউক মোর কাঁড়া ॥

*

ওই দিয়া যারে দুটি[৭], তোর চাউল হউক ক্ষুদি[৮] ॥
ওই দিয়া যারে ভইষ্, মোর বাড়া হইস্[৯] ॥
ওইদিয়া গেইল্ বোল্‌দিয়া, মোর চাউল হল্‌দিয়া ॥
ওইদিয়া যায় হাতী, তোর বাড়া হউক আতি[১০] ॥
মোর ধান দিয়া যাউক নাড়া, চাউল যাউক মোর কাঁড়া ॥

১ চাল কাঁড়াবার ধ্বন্যাত্মক শব্দ ২ রাখালের ৩ ধান ভানবার সময় মুখে করা শব্দ ৪ ধান ভান্ ৫ মহিষ ৬ কাঁড়ানো। 'বাকল' এবং 'কাঁকড়' মিলে (?) ৭ ছোটো লাল পিঁপড়ে ৮ তোর চাল ভেঙে 'ক্ষুদ' হয়ে যাক ৯ আমার ধান ভানা তাড়াতাড়ি হ'স্ ১০ তোর ধান ভানতে-ভানতে রাত হয়ে যাক।

*

ন্যাও ন্যাও ন্যাও,
ধান ভুকাইতে আউলিল্ খঁপা[১]—খঁপা বান্ধিয়া দাও ॥

*

ভুষা ভুষা ভুষা, বাঘে খাইল্ চুষা।
মাও দিলে দান, আন্ বেটা পান।
ভুষা ভুষা ভুষা ॥[২]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : মানবজীবন সম্পর্কীয়

পঞ্চম পর্যায় : বৃত্তিবিষয়ক

৩৫৭

॥ বৃত্তি-বিষয়ক ছড়া : রাঢ়বঙ্গের কুমোরদের প্রসঙ্গে ॥

বারোমাস ফল ধরে, এক মাস মানা।
যতগুলি ফল ধরে, ততগুলিই কানা ॥[৩]

১ ধান ভানতে গিয়ে খোঁপা এলিয়ে পড়ল ২ একই ছড়ার মোট আটটি কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশে এক-একটি রূপ চলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলাতে ঢেঁকির প্রচলন নেই। সেখানে হাত দিয়ে উদূখলে ('ছাম-গাইন') ধান ভানা হয়। এতে খুব পরিশ্রম হয়। তালে তালে 'গাইন' ফেলতে হয়। ছড়ার শ্বাসাঘাতের সঙ্গে এই কাজটি বেশ মিলে যায়। প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের ধান ভানার ছড়া এই জন্যে খুব ধ্বন্যাত্মক শব্দময় ও শ্বাসাঘাত প্রধান।

৩ তুলসীদাস সিংহ: পল্লীর বারমাস্যা (বসুধারা পত্রিকা: বৈশাখ, ১৩৬৫। পৃ. ৫৭-৬৫)।

বৈশাখমাসে কুমোরদের চাকা ঘোরানো 'মানা'। শিবের গাজন শেষ হয়ে গেলেই শিব ঠাকুর কুমোরদের মাটিশালে গিয়ে ওঠেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এই জন্যে বছরের অন্য সব মাসে কাজ করা যায়, কিন্তু বৈশাখমাস সম্পর্কে একটি বৃত্তিগত taboo আছে। তবে এই নিষেধ মানে কেবল 'রাঢ়ী' ও 'চৌ-রাঢ়ী' কুমোররা,—'খট্টা' ও 'মগয়া' কুমোররা তা মানে না।

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক

প্রথম পর্যায় : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিষয়ক

৩৫৮

। রাজা প্রতাপাদিত্যের কর্মচারীদের প্রসঙ্গে, যশোহর ॥

'ল' 'শ' 'স' 'ঢালী'
(শেষে) রাজার মা কালী ॥[১]

৩৫৯

॥ প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্তী প্রসঙ্গে ॥

শঙ্করকে খেলে বাঘে (শের শব্দ ব্যঘ্রত্ব জ্ঞাপক)
অন্য সবাই কিসে লাগে (কিসে—কার্যে) ।[২]

৩৬০

। রাজা সীতারাম রায় ও 'মেনাহাতী'র ভূমিকা প্রসঙ্গে ॥

ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর ।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর ॥[৩]

১ যতীন্দ্রমোহন রায় : শঙ্কর চক্রবর্তী (ভারতী : পৌষ, ১৩১১ । পৃ. ৮৮৩-৮৯২)। 'ল' = লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (রাজস্ব সচিব) ও রায়মঙ্গল নদীতটস্থ টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। উক্ত টঙ্কশালার অবস্থানকে এখনও 'ল'-এর মোহনা নামে জনসাধারণ উল্লেখ করে থাকে। 'শ' = শঙ্কর চক্রবর্তী (মন্ত্রী)। 'স' = সূর্যকান্ত (সেনাপতি)। 'ঢালী' = মদন (ঢালীপতি)। শেষে = সর্বোপরি। রাজার মা কালী = প্রতাপের ইষ্টদেবী, অভয়া ভবানী দেবী। এঁদের নিয়েই ছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য।

২ যতীন্দ্রমোহন রায় : শঙ্কর চক্রবর্তী (ভারতী : পৌষ, ১৩১১। পৃ. ৮৮৩-৮৯২)

প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্তী ছদ্মবেশে তদানীন্তন মোগল রাজধানী রাজমহলে গেলে সেখানকার মোগল-শাসনকর্তা শের খাঁ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। জনসাধারণ এতে উত্তেজিত হয়, তারই পরিচয় ওপরের ছড়াটি।

৩ সরলা দেবী : সাময়িক কথা : মেনাহাতী (ভারতী : ফাল্গুন, ১৩১১। পৃ. ১০০৩)।

অনেকের ধারণা 'মেনাহাতী' মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল নাম :

৩৬১

॥ রাজা সীতারাম রায় সম্পর্কে ছড়া, যশোহর ॥

দাতার মধ্যে খেলারাম
বদমায়েসে সীতারাম ॥[১]

৩৬২

॥ কেদার রায় সম্পর্কে ছড়া, বীরভূম ॥

রেতের ঠাকুর কেদার রায় / রেতে আসে রেতে যায় ॥[২]

রূপরাম ঘোষ। "মেনাহাতীর সহায়তায় সীতারাম রায় দস্যুদমন করিয়া দেশময় যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তৎসময়ে বিরচিত এই দুইটি পঙ্‌ক্তিতে দৃষ্ট হইবে—" [তা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]

১ রাজা সীতারাম রায় [লেখকের নাম নেই] : (বান্ধব : মাঘ, ১২৮১। পৃ. ১৮৯-২০১)।

"মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সীতারাম অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠেন। এই ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতেই যশোর প্রদেশে 'সীতারামি সুখ' নামে একটি কথা প্রচলিত হইয়াছে। এবং অনেকের মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও শুনা যায়—" [সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

২ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)।

"আমাদের বীরভূমে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—[ওপরে উদ্ধৃত ছড়াটির উল্লেখ] এই কেদার রায়ের নিবাস ছিল সিউড়ি মহাম্মদাবাদের নিকটবর্তী 'আঙ্গারগড়' গ্রামে। ইনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন। জননীর গঙ্গাস্নানে গমনের সুবিধার জন্য স্বীয় বাস-গ্রাম হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এক পথ নির্মাণ সে কালে ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। দিবাভাগে নবাব-দরবারে কার্য করিয়া রজনীযোগে অশ্বারোহণে বাটী প্রত্যাগমন করিতেন এবং রাস্তার কার্যাদি পরিদর্শন ও মজুর বিদায় করিয়া প্রাতে পুনরায় মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেন। তাই জনসাধারণ তাঁহার পরিচয় দিয়া গিয়াছে, 'রেতের ঠাকুর কেদার রায়'।..."

৩৬৩

॥ আলি নকী খাঁ সম্পর্কে ছড়া, বীরভূম ॥

আলি নকী বাহাদুর পাগড়ী সে বাঁধে তলোয়ার
এক ঘরি মে লুঠ লিয়া কলকেত্তা বাজার ॥[১]

৩৬৪

॥ সুবেদার সলিম খাঁ পন্নি সম্পর্কে ছড়া, চট্টগ্রাম ॥

সলিম পন্নি বাঘ মার
চাটগাঁওকা সুবেদার ॥[২]

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ: মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)।

"প্রবাদ,—রাজনগরের যুবরাজ আলি নকী খাঁ কিছুদিন নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে কার্য করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের সময় সেনাপতি আলি নকীও তাহার সহযাত্রী ছিলেন এবং কলিকাতা-যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে "আলিপুর" তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হৃতবৈভব, বিগতগৌরব রাজনগরের—বীরভূমের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানীর লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানগণ আজিও একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র "লুঠের কাপড়" বলিয়া থাকেন; বস্ত্রখণ্ড বৎসরের মধ্যে একবার—মহরমের সময়—"তাজিয়ায়" বাঁধিয়া দিয়া গৌরবোৎফুল্ল হৃদয়ে অতীত স্মৃতির তর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।"

গৌরীহর মিত্র তাঁর 'বীরভূমের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, ১৩৪৩) বইটিতেও এই ছড়াটির উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৯১)। তবে তিনি লিখেছেন, 'পগ্ড়ীমে' 'এক ঘড়িমে', এবং 'কলকাত্তা'।

২ রসিকচন্দ্র বসু: সইদ খাঁ পন্নি (সৌরভ: শ্রাবণ, ১৩২১। পৃ ৩০৫-৩১১)।

"সইদ খাঁ পন্নি আটীয়াতে আবাস বাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন,…। কিন্তু পৌত্র সলিম খাঁ চৌধুরী আটীয়ার আবাস পরিত্যাগ করিয়া কোহস্তানে ঢাকার সন্নিকটে সলিমনগর নামে এক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথন বসতি করেন। সলিম খাঁ পন্নি প্রথমে আটিয়া ও আলেপশাহীর চৌধুরী ছিলেন, শেষে চট্টগ্রামের সুবেদার হইয়া তথায় গমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন চট্টগ্রামেই যাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে" [সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

৩৬৫

॥ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ও কান্তমুদী সম্পর্কে ছড়া ॥

কান্তবাবু হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায়,
তুড়ুং লাগাতে তার রেজাগিরংয় যায়।
হেষ্টিংস্ যাহার হাত তারে করে কাবু
বাঙলায় হেন লোক আছে কে হে বাবু ?[১]

৩৬৬

॥ কোম্পানীর সাহেবদের ভেটদান প্রসঙ্গে ছড়া ॥

বাঘ ভালুকে নাই ভয় /টেঁকি দেখলে প্রাণ যায় ।[২]

১ প্রমথনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা (সুবর্ণবণিক সমাচার : ভাদ্র, ১৩২৮। সঙ্কলন : প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩২৮। পৃ. ৮৮৩-৮৮৪)।

"ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার গভর্ণর হইয়া আসিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ তাঁহার উর্দ্ পার্শি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সহিত কান্তমুদির বড়ই মেশামেশি ছিল। প্রবাদ যে তিনি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।·· ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বের গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। নন্দকুমারকে এক জাল মোকদ্দমায় ফেলিয়া কলিকাতায় ৫ই আগষ্ট ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কুলিবাজারে ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে তখনকার অধিবাসিগণ তিন দিন উপবাস করিয়াছিল। অনেকে গঙ্গাস্নান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শিবপুর, বালি, উত্তরপাড়া আদি অপরপারে বাস করিয়াছিল। এই ফাঁসির ব্যবস্থায় নবকৃষ্ণ, কান্তমুদি ও দেওয়ান কাশীনাথ সাক্ষী আদি দিয়া হেষ্টিংসের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন শোনা যায়।. কলিকাতার আদালতের জাতিঘটিত বিচারের ভার কান্তমুদির উপর ছিল। সে হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, জাতিতেও তাহা করিবার অধিকার তাহার ছিল না, ইহা হেষ্টিংস্ নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন ; অথচ জাতিনাশ ও বিবাহসংক্রান্ত বিচারাদি সেইই করিত।... হেষ্টিংস অপেক্ষা সে সময় সে কোন অংশে ছোট ছিল না। কলিকাতা কাউন্সিলের মেম্বারগণ সমন জারি করিয়া তাহাকে হাজির করিতে পারেন নাই। সে স্পষ্ট বলিয়াছিল, হেষ্টিংস তাহাকে তাহা অমান্য করিতে বলিয়াছিল। তাহাতে তুড়ুম ঠুকিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। হেষ্টিংস তাহা করিতে দেন নাই। উহাতে এই ছড়া তখন বাহির হইয়াছিল।—"[অতঃপর যে ছড়া উদ্ধৃত হয়েছে, ওপরে তা সঙ্কলিত করেছি]

২ প্রমথনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা (সুবর্ণবণিক সমাচার : অগ্রহায়ণ, ১৩২৮। সঙ্কলন : প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৮। পৃ. ৫৪৯)।

"তখন ঠাকুর-দেবতাকে কিছু দিবার আগে কোম্পানির ভেট আগে দিতে

৩৬৭

॥ নুন ও কার্পাসের আমলাদের সম্পর্কে ছড়া ॥

নুনে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর ॥[১]

৩৬৮

॥ জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ ও গোবিন্দ রাম সম্পর্কে ছড়া ॥

জগৎ শেঠের কড়ি (অর্থ)
উমিচাঁদের দাড়ি
গোবিন্দরামের ছড়ি (লাঠি)।[২]

হইত। তীর্থযাত্রার উপর কর হওয়ায় সাধু ফকিরেরাও বিদ্রোহী হইয়াছিল। কলিকাতায় সেই সময়ে সাধক রামপ্রসাদ কালী মাতার গান গাহিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর কোম্পানির এই সকল বেনিয়ান মহাপ্রভুরা মা কালীর কাছে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জোড়া পাঠা বলিদান, কবির গান, ফুল আখড়াই প্রভৃতি বাড়ীতে দিয়া আমোদ করিতেন। ইহাদেরকে দেখিয়া লোকে তখন হিংস্র পশু অপেক্ষাও বেশী ভয় করিত। তখন লোকে ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিত [অতঃপর যা সঙ্কলিত করেছেন লেখক, ওপরে তা উদ্ধৃত হয়েছে]

১ সেকালের হাকিমদের ও আমলাদের কথা : (নবজীবন : বৈশাখ, ১২৯৪। পৃ. ৬১২-৬৩০)।

"ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে পূর্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃত কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সে কালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে [সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] নিমক মহাল ও কাপড়ের কুঠি উভয়েই সেকালে (pagoda tree) টাকার গাছ ছিল। · "

২ কলিকাতা আক্রমণ : হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (ভারতী : বৈশাখ, ১৩০০। পৃ. ৩৬-৪২)। হরিসাধন মন্তব্য করেছেন : "একটি প্রবাদ ছিল —সেকালে এই তিনটি জিনিসকে লোকে বড় ভয় করিত।"

৩৬৯

॥ মহারাজ নন্দকুমার সম্পর্কে ছড়া ॥

ভাতুরের নন্দকুমার, / লক্ষ বামুন করলে শুমার।
কেউ পেলে মাছের মুড়ো, / কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো ॥[১]

৩৭০

॥ বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহ সম্পর্কে ছড়া ॥

কারুর কিছু হারিয়েছে।
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে ॥[২]

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙালীর সমাজ বিন্যাস (বঙ্গবাণী : পৌষ, ১৩২৯। পৃ. ৫২৫-৫৩৫)।

"ভাতুরের অর্থাৎ রামপুরহাটের নিকট ভদ্রপুরের নন্দকুমার (মহারাজ নন্দকুমার) মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবী সেরেস্তায় বড় চাকরী পান। নূতন বড় মানুষ হইয়া তিনি একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং আচ্ছাদন মুর্শিদাবাদ হইতে খরিদ করিয়া আনেন। ভাতুরের তন্তুবায়ের দল বলিল,...আমাদের বয়ন করা কাপড় লইবে না?.. তন্তুবায়ের দল তাঁহার [মহারাজ নন্দকুমারের] বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিল,.. পশ্চিম বাঙ্গালার তন্তুবায় সমাজ পণ করিল যে, মহারাজ নন্দকুমারকে আমরা কাপড় যোগাইব না; ক্রমে অন্য শিল্পীজাতি সে ধর্মঘটে যোগ দিল। শেষে মহারাজকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। মহারাজের উপর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এই হইল যে, তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং নবশাখ ও অন্য শিল্পীজাতি সকলকে জগন্নাথ দেবের আটকে ভোগ খাওয়াইবেন। মহারাজ নন্দকুমারের এই প্রায়শ্চিত্ত রাঢ়দেশে একটা বড় জাঁকের ব্যাপার হইয়াছিল; নানা প্রকারের ছড়া এবং পাঁচালী এই উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। একটা শ্লোক মনে আছে—" [সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]

২ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত : কলিকাতার ইতিবৃত্ত : ১৩ (নব্যভারত : অগ্রহায়ণ, ১৩১০। পৃ. ৪০৫-৪২০)।

"বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহের

৩৭১

॥ পাবনা জেলায় প্রজা-বিদ্রোহের ছড়া ॥

গোপালনগরের মজুমদাররা তারা কেঁদে ম'ল
ডোমরা হইতে বাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল ;
কাশী কাঁদে, মহেশ কাঁদে, কাঁদে তাহার খুড়ি,
গোলামের বেটা বিক্রক আ'সে লুটল সকল বাড়ী ;
বিক্রক এসে লুটে নিল থাছে নাইকো পাতা
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থেকে ফুচকি পারে[১] মাথা ॥[২]

নিকট হইতে মদনমোহন বিগ্রহ এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যখন রাজা মদনমোহনকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুল মিত্র আর একটি মদনমোহন প্রস্তুত করিয়া পাশাপাশি দুইটি মূর্তি রাখিয়া রাজাকে নিজের বিগ্রহ তুলিয়া লইতে বলেন। কোন কোন লোকের মতে রাজা নকল মদনমোহন লইয়া গিয়াছেন, আবার কোন কোন লোক বলে রাজা তাঁহার নিজ ঠাকুরকেই আনিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি গীতাংশ প্রচলিত আছে, যথা :—

সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোনার মদনমোহন বাঁধা দিয়ে গেল ॥

আর একটি কথা বালকেরা ব্যবহার করে, যথা :—" [সেটি ২০৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]। কথান্তর : কার কি হারিয়েছে / চোখের জল বেরিয়েছে ॥

১ উঁকি দেয় ২ রাধারমণ সাহা : পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্রোহ (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। পৃ. ২০৫-২১০)।

১২৭৯-৮০ সালে পাবনা জেলার জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রায়তগণ বিদ্রোহ করে। ১২৭৯ সালের চৈত্র এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহিদলের 'রাজা' বা নায়ক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায়। রুদ্রগাতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল ছিলেন তাঁর সহকারী। গঙ্গাচরণের পিতার নাম কালীচরণ, তিনি মোক্তার ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের সম্পর্কে পাবনায় তখন 'পল্লীগাথা' শোনা যেত :

ও চাচা বিদ্রোহিদলের কথা কব কি!
নূতন আইন, নূতন দেওয়ান কালু পালের ব্যাটা
সকলের আগে চলে মাথা বাঁধ্যা ফ্যাটা।

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া
দ্বিতীয় পর্যায় : সমাজ ও সামাজিক ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া

৩৭২

॥ হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গার ছড়া ॥

ফাটল হাটে হাঁড়ী
ছড়াল কুচ্ছার[১] ভুঁড়ি ও নাড়ী,
দূর দূর ছোঁড়া ও ছুঁড়ী ॥[২]

এই বিদ্রোহিদল মাছ শিকারের ভান করে ডাকাতি করত। কাঁধে বাঁশের লাঠির আগায় একটি 'পলো' বেঁধে নিত। এজন্যে এদের বলা হত 'পলোওয়ালা' বা 'পলমাথ কোম্পানী' :

লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্ল সারি সারি
সকলের আগে জা'য়ে (যেয়ে) লুটিল বিশির কাচারি।

প্রথম প্রথম সিরাজগঞ্জের অধীনে সাহাজাদপুর থানাতেই বিদ্রোহ দেখা দেয়। ক্রমে তা নাকালিয়া, সারাসিয়া, হাটুরিয়া, গোপালনগর প্রভৃতি স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। "সর্বশেষে গোপালনগরের মজুমদাব মহাশয় দিগের বাড়ী লুঠ কবিতে গিয়া বিদ্রোহিদলের ২।৪ জন সাজ্যাতিকরূপে আহত হয় এবং কয়েকজন ধৃত হওয়ায় বিদ্রোহিগণের অত্যাচার ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে। এখনও গোপালনগরের মজুমদাবগণেব বাড়ী লুঠ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়" [সে ছড়াটি ২১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]

১ কুৎসার ২ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংলার সমাজ-শাসন (গোড়ার কথা) : (বঙ্গবাণী : ফাল্গুন, ১৩২৯। পৃ. ২২-২৯)।

'হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা'র সামাজিক তাৎপর্য কি, তারই প্রসঙ্গে ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে। কোনো সম্প্রদায়ের কাউকে 'ঠেকো' অর্থাৎ একঘরের মতো করতে গেলে পূর্বে কি-কি অনুষ্ঠান পালন করা হত, পাঁচকড়ি এই প্রবন্ধে তার বর্ণনা দিয়েছেন : "এই পদ্ধতি কুম্ভকার সম্প্রদায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিত। একটা হাঁড়িতে সিন্দুর মাখাইয়া "লুইয়ের হাঁড়ি" বলিয়া উহার স্থাপনা করা হইত। লুইপাদ একজন প্রসিদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ়দেশে প্রবল আছে। একটা খাসি বলিদান দিয়া তাহারই নাড়ীভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পোরা হইত। খানা-পিনা শেষ হইলে,

৩৭৩

॥ রাণী রাসমণির শ্বশুর পীরিতরাম প্রসঙ্গে ছড়া ॥

ছুলোল হলো সরকার[১], অক্রুর হলো দত্ত[২]।
আমি কিনা থাকবো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত ॥[৩]

৩৭৪

॥ কুল প্রসঙ্গে ছড়া ॥

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল।
তবু না হবে মুস্তৌফির কুল ॥[৪]

অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া "ঘোঁট" ["ঘোঁট শব্দের অর্থ debate, discussion ; বিষটাকে ঘুঁটিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার খাটি বাঙলা শব্দ হইল "ঘোঁট"] হইত। প্রায়শঃ লাম্পট্যের অভিযোগই করা হইত। পত্নী, ভাগনী, কন্যা কাহারও সহিত ঘরের বাহির হইলে, নর-নারী উভয়ের বিরুদ্ধে হাঁড়ি স্থাপনা হইত। তাহার পর এই নাড়ীভুঁড়ি পূর্ণ হাঁড়ী মাথায় করিয়া হাটের দিনে একটা কেন্দ্রস্থ বড় হাটে উপস্থিত হইতে হইত। হাট যখন জমজমা চলিতেছে তখন হাটের মধ্যস্থানে কুৎসা কীর্তন করিয়া আছাড় মারিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গিলেই লম্পট নর-নারীর আর কুত্রাপি স্থান মিলিত না, তাহারা সকলে অস্পৃশ্য "ঠেকো" হইয়া থাকিত। একটা মজার প্রবচন এই উপলক্ষে প্রচলিত ছিল—[অতঃপর ছড়াটি ২১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]···হাটে হাঁড়ি-ভাঙার আরও নানাবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।···"

রাঢ়ের স্থান বিশেষে এই পদ্ধতি অনুসৃত হত বলে পাঁচকড়ি জানিয়েছেন।

১ রামদুলাল সরকার (?) ২ অক্রুর দত্ত ৩ রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর :](সুবর্ণবণিক-সমাচার : পৌষ, ১৩২৯। সঙ্কলন : প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৯। পৃ. ৪৮০)।

" 'রাণী' রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র মাড় পীরিতরামের পুত্র।...পীরিত রাম কায়েত হইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।···"

৪ সে কালেরদারোগার কাহিনী : (নবজীবন : শ্রাবণ, ১২৯৩। পৃ. ১-১০)।

কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী উলাগ্রামের মুস্তফীদের প্রসঙ্গে এটি লিখিত হয়েছিল। "মুস্তৌফি মহাশয়েরা দক্ষিণ বাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে মিত্র-বংশোদ্ভব

৩৭৫

॥ ভাটদের ছড়া ॥

ক. গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষ মালা।
পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা॥

খ. জাতির কর্তা রাজীব রায় মুলুকের সুবা।
তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত হলেন ধোবা॥[১]

৩৭৬

॥ কুলবিষয়ক ছড়া : কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিবাদ ॥

ক. দত্ত কারো ভৃত্য নয়সঙ্গে আগমন[২]/বিপ্র সঙ্গে থাকি করে তীর্থ পর্যটন॥

খ. ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী/অভিমানে বালির দত্ত যানগড়াগড়ি॥

গ. গোড়পাড়ার নন্দকিশোর দেবগ্রামের পাঁচু।
আর যত মিত্র আছেন কচু আর ঘেঁচু॥

ঘ. হাত ঘুরায়ে বলে মুলো[৩] আ মরি এই কি তোমার কুল।
দেখ—ছিল ঢেঁকি, হলো তুল, আরো পরে হবে যে নির্মূল॥[৪]

-এবং অত্যন্ত মানী ও সম্পত্তিশালী, ··কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাঁহারা কোন সময়ে মাধব বসু নামক একজন কায়স্থকুলের ঘটকের মাথা মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই আক্রোশে ঘটক মহাশয় প্রতিশোধ লইবার মানসে কুলজী পুঁথিতে নিম্ন কবিতাছন্দ লিখিয়া তাঁহাদের কুলে খোঁটা দিয়াছেন—" [২১২ পৃষ্ঠায় তা উদ্ধৃত হয়েছে]। অনাথকৃষ্ণ দেব লিখিত 'বঙ্গের কবিতা' (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে (পৃ. ৩৭৫) এই ছড়ার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির কথান্তর মেলে : মুস্তফীর হবে না কখনো কুল।

১ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩৭৩-৩৭৪)।

"ভাটগণ বিবাহাদি উপলক্ষে পাত্রপাত্রীর গৃহে (পারিবারিক) যশঃগান করিত; অনুষঙ্গক্রমে সময়ে সময়ে অপাত্রের অযশ গানও হইত। ইহা কুলজী বিশেষ। বঙ্গের পাল-ভূপতিগণের স্তুতিব্যঞ্জক কবিতা কতক কতক পাওয়া যায়—বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন রচনা। ···ইহাও ছড়ার হিসাব। পদকল্পতরুর অনেক গীতে এই ভাট-গাথার উল্লেখ আছে।"

"অপেক্ষাকৃত আধুনিক—তিন-চারিশত বৎসরের প্রাচীন—ভাট-গাথার কিঞ্চিৎ নমুনা—" [লেখক যে দুটি নমুনা দিয়েছেন, ওপরে তা উদ্ধৃত হয়েছে]

২ কথান্তর : সঙ্গে এসেছে ৩ "এই 'মুলো' প্রসিদ্ধ ঘটকরাজ—মুলো পঞ্চানন"

৪ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩৭৪-৩৭৫)।

"প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রীতিমত ইতিহাস গ্রন্থ নাই। রাশীকৃত কুলপঞ্জী

৩৭৭

বাপ-পিতা মোর লিখিত 'দে', কেটে করলেম 'দাস';
অবশেষে 'দাসগুপ্ত', বৈদ্য জাতে পাশ।[১]

৩৭৮

আগে থাকে উল্লা, তুল্লা, শেষে হয় উদ্দীন;
তলের মামুদ উপরে যায়, কপাল ফিরে যেদিন।[২]

বা 'কারিকা' পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে, প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। সেগুলি হইতে কতক মত কিংবদন্তী-মিশ্রিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়; সেগুলিকে বাঙ্গালীর সাগা বলা চলে।"

"এই শ্রেণীর অনেক পুঁথির নাম 'ঢাকুর'। ঢাকুর পদ্যও আছে, গদ্যও আছে।·· ঢাক বা ঢক্কা হইতে ঢক্কুর, ঢক্কুর হইতে ঢাকুর। জনশ্রুতি এইরূপ —পূর্বতন কুলাচার্যগণ যখন কুলকাহিনী আওড়াইতেন, তখন বাজনা বাজিত, ঢাকে ঘা পড়িত, তাঁহারা বাদ্যসহ অঙ্গভঙ্গীকরতঃ কুলকাহিনী কীর্তন করিতেন। এখনও নাকি কোন কোন স্থলে কুলাচার্যগণ (ঢাকের অভাবে?) তাকিয়ায় আঘাত পূর্বক কুল-পরিচয় বর্ণন করেন।"

"কুলজীগ্রন্থের কতক কতক কৌলীন্য-বিধাতা বল্লাল সেনের আমল হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মেল-বন্ধনের সময় হইতে কুলপর্যায় লিপিবদ্ধ রাখা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।· কুলাচার্য ঘটকঠাকুরগণই এই শ্রেণীর কাব্যের কবি। নমুনা স্বরূপ রসাল অংশ দু এক ছত্র দেখাইয়া যাই,—" [সেই নমুনাগুলিই ২১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]।

১ 'জনৈক বাঙ্গালী': বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী: শ্রাবণ, ১৩১৪। পৃ. ১৯১-২০০)। মন্তব্য ছিল: "অধুনা নিম্নশ্রেণীজ হিন্দুদেরও অনেকে পূর্ব পুরুষানুসৃত বংশগত উপাধি বদলাইয়া কুলীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।"

২ 'জনৈক বাঙ্গালী': বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী: শ্রাবণ, ১৩১৪। পৃ. ১৯১-২০০)।

"অধিকাংশ পোদ, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীজ হিন্দু এই ধর্মান্তর [মুসলমান-ধর্ম] গ্রহণ করিয়াছে।··· ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে নামান্তর ঘটে, তাহাতে পূর্বনামের যথাসম্ভব আভাস থাকে। যথা,—শ্যামাচরণ মুসলমান ধর্মে প্রবেশ করিয়া সমসের উল্লা নাম পায়। অনন্তর অবস্থার উন্নতির সহিত উপাধিও পরিবর্তিত করিয়া লয়। কথায় বলে,—" [অতঃপর লেখক যে ছড়াটি উদ্ধৃত করেছেন, ওপরে তা সঙ্কলিত হল]

৩৭৯

॥ মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে ॥

ছিলে বিলে তিন জোগ্[১]/মুসলমানের তিন মোগ[২] ॥[৩]

৩৮০

॥ 'ভিক্টোরিয়া যুগারম্ভ' : কলকাতা প্রসঙ্গে ছড়া ॥

গুরুমশায়ের মারধোর ঘুচে গেল জারি জুরি,
ডফ্ কেরী পাদ্রীরা সবায় পাড়ায় ধরি ধরি।
বিলিতি খানা খাইয়ে তারা ছেলেদের মাথা খেলে,
মুরগী-ভেড়ার ছেনাগুলো কাঁটা-চামচেয় গেলে।
দীঘি-জল হলো চল, পয়সা দিয়ে জল খাওয়া।
গঙ্গাজলে বিষ্ঠা ভাসে, বন্ধ হলো নাওয়া খাওয়া।
টেবিল চেয়ার ছেড়ে আর কেও যে চায় না খেতে,
আসন পেতে বস্‌লে খেতে বলে 'ধুলো পড়ে পাতে'।
শুকনো ডাবা গঙ্গায় দিয়ে ধরে সবে গুড়গুড়ী,
হেঁকে চলে পাল্কী ছেড়ে বেনীয়ান বাবু করে' গাড়ী।
গঙ্গাস্নান, ধ্যান কবা নিবামিষ খেয়ে পৈতা তুলে
চল্‌বে না জাবিজুরি বেদাদিব সূক্ষ্ম মর্ম ভুলে।
"মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণ" আর্য ঋষিবা লেখেন নি,
এই সিদ্ধান্ত জাহির কবে ধর্মশাস্ত্র চূড়ামণি[৪]।
ব্যাস মনু যা পাবেন নি জাহির হল আইন-বলে
মাছেব মায়েব পুত্রশোকে 'সত্যধর্ম' গেল চলে।
নেড়ের দলেব রাম বাজা বিলেতে তাতেই গেল,
হিন্দুব আজি বিলাত গিয়ে তাই ফাঁস হয়ে গেল।
মূর্খ বাদ্‌শা তায পাঠালে ভিক্ষা কবে' 'রাজা' হতে,
কোম্পানি হলে দেশের রাজা সেই তার দাসখতে।

১ জোঁক ২ মাগ, বউ ৩ সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাকমা জাতির সংস্কার কর্ম (প্রবাসী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। পৃ. ৪৫৪-৪৬৪)। লেখকের মন্তব্য ছিল : "অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জোঁক যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক।..."

৪ শশধর তর্কচূড়ামণি ?

মানহারা শুধু বেড়ে গেল আবৃত্তি করার ফলে,
সতীর শাপে ম্লেচ্ছের দেশে তাই যাচ্ছে পচে মলে'।[১]

৩৮১

॥ রাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাসমণি এবং রাণী কাত্যায়নীর প্রসঙ্গে ছড়া ॥

ঠাকুরে বিনোদী লাল, চাকরে ধনাই।
দেওয়ানে রাজীব রায়, বলিহারি যাই ॥[২]

৩৮২

॥ রাজা রামমোহন সম্পর্কে ছড়া ॥

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জেতের দফা করলে রফা,
মজালে তিন কুল ॥[৩]

১ রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর: (সুবর্ণবণিক-সমাচার: পৌষ, ১৩২৯। সঙ্কলন: প্রবাসী: মাঘ, ১৩২৯। পৃ. ৪৭৯-৪৮০)।

"ভিক্টোরিয়া যুগারম্ভ। সেই সময়ের কলিকাতার সমাজের চিত্র ও লোকের মনের ভাব একটা পুরাতন ছড়ায় পাওয়া যায়, তাহা দেওয়া গেল—" [আমরা সেটি ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি]

২ রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর: (সুবর্ণবণিক-সমাচার: পৌষ, ১৩২৯। সঙ্কলন: প্রবাসী: মাঘ, ১৩২৯। পৃ. ৪৮০)।

"কলিকাতার রাণী কাত্যায়নী ও রাসমণি দানধ্যান করিয়া বেশ নাম কিনিয়া গিয়াছিলেন। রাণী কাত্যায়নী বিখ্যাত লালাবাবুর স্ত্রী। · মুর্শিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের কথায় অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন, কাত্যায়নী তেমনি তাঁহার গুরু বিনোদীলালের ও রাসমণি ধনা খানসামার কথায় সৎকার্য করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতায় ছড়ায় সেই সকল উপদেষ্টাদের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল:—" [সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]

৩ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধি (নব্যভারত: বৈশাখ, ১৩২০। পৃ. ১২-২৩)।

"রাজর্ষি রামমোহন যখন প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তিনি রাস্তায় বাহির হইলেই একদল বালক তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত আর—[ওপরে উদ্ধৃত ছড়াটির উল্লেখ] এই বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিত।..."

৩৮৩

॥ বিপিনচন্দ্র পালের উদ্দেশে ছড়া ॥

তেলি'য়ে পড়িলে পাল নমশূদ্রে চণ্ডাল
নাপিত পড়িলে হয় চন্দ।
এই তিন মতিনাশে যে করে বিশ্বাসে
বিধির সহিত তার দ্বন্দ্ব ॥[১]

৩৮৪

॥ কৃষ্ণদাস পাল সম্পর্কে ছড়া ॥

তেলি, হাত পিছলে, গেলি
অনরেবল হলি ॥[২]

৩৮৫

॥ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের সম্পর্কে ছড়া ॥

বেলগেছের বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা কি জানি!
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।[৩] ..

১ বিপিনচন্দ্র পাল : সমসাময়িক কথা (নব্যভারত : বৈশাখ, ১৩২৯। পৃ. ১২-২০)।

"আমাদের বাড়ীর [শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার তিন মাইল দূরে, পইল গ্রামে] নিকটেই একজন বেশ বড় ধনী জমীদার ছিলেন। জাতিতে ইঁহারা তৈল-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহাদেরও পদ 'পাল' ছিল। ছেলেবেলা লোকে আমাকে এই পাল-চৌধুরী দিগের জাতি বলিলে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতাম। সমবয়স্করাও এই বলিয়া আমাকে ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিত। সেকালে আমাদের অঞ্চলে এ সম্বন্ধে একটা কবিতাও প্রচলিত ছিল [অতঃপর বিপিনচন্দ্র ওপরের ছড়াটি উদ্ধৃত করেছেন] এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াও সমবয়স্কেরা আমাকে ক্ষেপাইত। ."

২ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ (বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। পৃ. ১৭২-১৭৪)। "কৃষ্ণদাস পাল যখন বঙ্গদেশে প্রধান ব্যক্তি, তখন তাঁহার নামে একটি ছড়া উঠিয়াছিল—" [অতঃপর ছড়াটির উদ্ধৃতি। ওপরে আমরা তা সঙ্কলিত করেছি]।

৩ সৌদামিনী দেবী : পিতৃস্মৃতি (প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২৩২-২৩৫)। "পিতামহ প্রথম বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বেলগাছিয়ার

৩৮৬

। শিক্ষকদের প্রতি : কালীপ্রসন্ন সিংহ ।

Sturgeon সাহেবের class-এ পড়্‌তো লাহা
তার নীচে ঈশ্বর সাহা ॥
তার নীচে জয়গোপাল সেট ॥
জয়গোপাল সেটের লম্বা ঠ্যাঙ্গ।
তার নীচে বেণী ব্যাঙ্গ ॥
তার নীচে বুনো কালো
বুনো কালো মারে বড়।
তাব নীচে গুপী দড় ॥
গুপী মিত্র, খাতায় চিত্র,
Blank ও বুকে Black ও মার্ক ॥[১]

বাগান য়ুরোপের ধনীদের প্রমোদ কাননের অনুকরণে সাজাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। ··এই বাগানে প্রতি শনিবাব রাত্রে পিতামহ শহরের বড় বড সাহেব মেমদের ভোজ দিতেন, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও গোপনে তাহার ভাগ লইয়া যাইতেন। তখনকার কাগজে বিদ্রূপ করিয়া একটা কবিতা বাহির হইয়াছিল তাহার এক অংশ আমার মনে আছে—" [সেটি ২১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে]।

১ মন্মথনাথ ঘোষ : সেকালের গল্প (ভারতী : ফাল্গুন, ১৩২৪। পৃ. ৯৯১-৯৯৮)।

"দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাব 'সুরধুনী' কাব্যে' কালীপ্রসন্ন সিংহের রসভাবের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"রহস্য-কৌতুক হাস রসিকতা-ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন্ ধরা।"

"কালীপ্রসন্নের এই কৌতুকপ্রিয়তা অতি অল্প বয়স হইতেই দেখা গিয়াছিল। ··কালীপ্রসন্ন যখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পড়িতেন, তখন তিনি "আন্দোলন-পত্র" নামক একটি দৈনিক পত্র বাহির করিতেন। ·· কালীপ্রসন্ন তাহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রে অনেকের প্রতি বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি থাকিত। উহা শ্লেটের উপর "হস্তদ্বারা মুদ্রিত" হইয়া দুই তিন ক্লাসের ছাত্রগণের মধ্যে চালাচালি করিয়া প্রচারিত হইত। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ

৩৮৭

জমিদারের মুখুটি।
ঘোষালের ডিপুটি ॥[১]

৩৮৮

রাজার মধ্যে মুরারী চাঁদ আর যত কুয়া
(আর) হাওরের মধ্যে হকোলকি আর সব ভূয়া ॥[২]

৩৮৯

রায় মহাশয়ের পুষ্কুণি
বাড়ীত্ থাইক্যা ডাক শুনি
নিত আজুল্যা এক ঘাট
উঠ্তে নামতে জান্ ফাট্ (প্রাণ যায়)

হইতে তাঁহার সতীর্থ ও শিক্ষকগণও নিষ্কৃতি পাইতেন না। 'আন্দোলন-পত্রে'র সম্পাদক বিরচিত একটি কবিতা এখনও প্রতাপবাবুর [প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্নের সতীর্থ ও সহচর, 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' প্রণেতা] স্মরণ আছে— [অতঃপর সেই কবিতাটির উদ্ধৃতি, পূর্বে তা সঙ্কলিত হয়েছে]।

হিন্দু কলেজের পুরোনো রিপোর্ট থেকে তৎকালীন কয়েকজন শিক্ষকের নাম পাদটীকায় উদ্ধৃত হয়েছে : মিষ্টার টি. এইচ্. ষ্টার্জন, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, বাবু জয়গোপাল শেঠ, বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বনমালী মিত্র, বাবু গোপীকৃষ্ণ মিত্র।

১ ধর্মানন্দ মহাভারতী : অজয় সর্দার (ভারতী : ভাদ্র ১৩১৩। পৃ. ৪৩১-৪৪২)।

"অর্থাৎ জমিদারের মধ্যে যেমন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটির মধ্যে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।" ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের অন্য মন্তব্য : "ইনি যেমন পরিশ্রমপরায়ণ, তেজস্বী, সাহসী, বীর এবং দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকারী ছিলেন, তেমনি ঘোরতর দুর্দান্ত শাসক বলিয়া গণ্য হইতেন।"

২ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩২৪। পৃ. ১২৪-১২৭)।

"শ্রীহট্টের রাজা মুরারীচান্দ ছাড়া আর যাহারা বড়লোক তাহারা কুয়া (কুমার), হকোলকির মত বড় হাওরও আর নাই।"

শেওড়া পাতার বর্ণ জল,
বেঙে করে থলথল
আইত্যা বুরাইলে লোডা[১]
জল না উঠে এক কোডা[২] ।[৩]

৩৯০

শিরোমণিরে খাইল বাঘে
আর মানুষ কিসে লাগে ।[৪]

৩৯১

॥ শ্যাম বাউল সম্পর্কে ছড়া, নদীয়া ॥

বাজলো শ্যাম বাউলের খোল
যত মাগী চরকা তোল ।[৫]

১ খুব চেপে 'লোটা' অর্থাৎ ঘটি ডোবালেও ২ কোঁটা ৩ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩৩৪ । পৃ. ১৯৪-১৯৭) । মন্তব্য : "জনৈক সমৃদ্ধিশালীর পুষ্করিণীর স্বরূপ বর্ণনা এখনো লোকপ্রবাদরূপে শুনিতে পাওয়া যায় ।"

৪ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : পৌষ, ১৩৩১ । পৃ. ২৭২-২৭৪) ।

"নওয়ার কমলাকান্ত শিরোমণি, খুব জোয়ান জবরদস্ত মানুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন "বাঘ—ছাগ," অর্থাৎ যেমন তেমন বাঘকে তিনি গণ্য করিতেন না। অনেক বাঘকে তিনি তাঁহার নিত্য সহচর যষ্টির সাহায্যে লোক চিনাইয়াছিলেন। এহেন ব্যক্তিকে একবার "বাঘে খাইয়াছে" এরূপ গুজব উঠে। এই কথা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি ।"

৫ দীনেন্দ্রকুমার রায় : শ্যাম বাউল (ভারতী : কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ । পৃ ৪২০-৪২৪) ।

"শ্যাম বাউলের নাম একালে আর কাহারো মুখে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্যাম বাউল নবদ্বীপের কোন 'কীর্তনীয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল, সে নিজে বৈষ্ণব। ...তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহেই এক একটা চরকা থাকিত, ব্রাহ্মণীগণ অবসর পাইলেই চরকা কাটিতেন,...অনেক উপায়হীনা বিধবা ব্রাহ্মণী

৩৯২

॥ লাঠিয়াল রাম মালিক সম্পর্কে ছড়া, বিক্রমপুর ॥

রাম মালিকের লাঠি ।/ রঘুরায়ের মাটি
উঠলে লাঠির ডাক ।/ দৌড়ে পালায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে ।/ রামের লাঠির পাকে ॥
মালিক ধরে লাঠি ।/ যম যেন সে খাটি ॥[১]

শুদ্ধ পৈতা বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সুতা কাটার এই রকম প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া কোন কোন গ্রামে শ্যাম বাউলের কীর্তন হইবার কথা উঠিলে পল্লীবাসিগণ বলিত [অতঃপর সেই ছড়াটি ২২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে] রমণীসমাজে শ্যাম বাউলের কীর্তনের এতই প্রতিপত্তি ছিল।"

কিন্তু নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁর "রূপচাঁদ অধিকারী" (জন্মভূমি : মাঘ, ১৩০১। পৃ. ৭৭-৭৯) নামে প্রবন্ধে জানিয়েছেন, এই ছড়া রূপচাঁদ অধিকারীর প্রসঙ্গে কথিত হত। রূপচাঁদ মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, ঢপ গান গেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কথকতাও করতেন। ভালো 'ডুব্কী' বাজাতে পারতেন। "বেলডাঙ্গার লোক বলিয়া থাকে, রূপের ডুবকীর মোহিনী শক্তি ছিল। আজিও লোকে বলিয়া থাকে,—বাজল রূপ অধিকারীর খোল, / মাগীরা সব চরকা তোল।

প্রায় একই ধরণের ছড়া দুই শিল্পীর প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে ছড়াটির ব্যাপকতা, লোকমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বোঝা যায়।

১ চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় : আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার/পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস (ভারতী : আষাঢ়, ১৩১২। পৃ. ২৫৩-২৭৬)।

বিক্রমপুরের এক অধিপতি ছিলেন, রঘুরাম রায়। রঘুরামের লাঠির দলের সর্দার ছিলেন রাম মালিক। সোনার গাঁয়ের মুসলমান রাজ প্রতিনিধি রঘুরামকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলায় রঘুরাম অস্বীকার করেন। যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রাম মালিকের লাঠি পরিচালনায় মুসলমান পক্ষের হার হয়। "লাঠি পরিচালন কার্যে রাম মালিকের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে শত্রু পক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে মালিক একমাত্র লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রাম্য ছড়া এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার চারিটি ছড়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।" [সে ছড়াগুলো ওপরে উদ্ধৃত করেছি]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া

তৃতীয় পর্যায় : সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া

৩৯৩

গুরু ম'শায় গুরু ম'শায়, তোমার পোড়ো উড়ে যায়!
বাঁশ-বাগানে বিয়ে বাড়ী বেগুন পোড়া খায়।[১]

৩৯৪

গুরু মশায়, গুরু মশায় আর বল'ব কি,
বেত্ বোনের আসামী হাজির করে'ছি।
রাম তুলসী, রাম তুলসী, রাম তুলসীর পাতা
গুরু মশায় ক'য়ে দেছেন কাণ মলার কথা।[২]

৩৯৫

॥ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া ॥

আয়রে সবে দেখ্‌বি আয়
বুড় গরু ধূলা খায়॥[৩]

১ দীনেন্দ্রকুমার রায় : পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং : ফাল্গুন ১৩৪৬। প্রথম সং ১৩১১। পৃ. ২৯)। তুলনীয় : মশায়, মশায় তোমার প'ড়ো হাজির/একদণ্ড ছেড়ে দাও জল খেয়ে আসি।—বিদেশে রামমোহন রায়েব পদাঙ্ক : মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (ভারতী : বৈশাখ, ১৩০০। পৃ. ৩০-৩৬)।

২ বাসবিহারী সেন : সেকালেব পাঠশালা (দাসী। অক্টোবর, ১৮৯৫। চতুর্থ ভাগ, দশম সংখ্যা। পৃ. ৫৬০-৫৬৫)।

"এখনও কোন ছাত্র পাঠশালে না আসিলে অন্যান্য ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে। দুই তিন জনে ধৃত বালকের হস্ত এবং দুই তিন জনে তাহাব পদদ্বয় ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে [অতঃপর লেখক ছড়াটি উদ্ধৃত করেছেন]—এইরূপে ধৃত বালকের কাণ মলিতে মলিতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া বালকগণ আইসে।"

৩ পশুপতি-সংবাদ (বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১২৯০। পৃ. ৪৯-৬৬)।

"আর একদিন গুরুমহাশয় ধৌত বস্ত্র পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছিলেন,

৩৯৬

॥ বিদ্রূপাত্মক ছড়া ॥

কালী মসী এক জোড়া
মধ্যে মধ্যে ভীমে খোঁড়া। ১

৩৯৭

বাঁশ বাগানে ডাকে ডাক
মালি কাটে কপি শাক।
ঈশ্বর তুমি পরম দয়ালু
তোমার কৃপায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খাই শাকালু॥ ইত্যাদি[২]

পথের ধারে গাছের উপর থাকিয়া পশুপতি তাঁহার গায়ে একরাশি ধূলা এবং এক প্রকার সুগন্ধি জল ঢালিয়া দিয়া গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইলে সে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের কাছা ধরিয়া টানে, গুরুমহাশয় ধূলায় পড়িয়া দেশের ছেলের পিতামাতা সম্বন্ধে নানা প্রকার মিষ্ট কথা কহিতে থাকেন সেই অবসরে পশুপতি উচ্চৈস্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলায়ন করে—" [অতঃপর ছড়াটি উদ্ধৃত করা হয়েছে]

১ বিজয়রত্ন মজুমদার প্রাচীন কবির কবিতা (নারায়ণ : ফাল্গুন, ১৩২২। পৃ. ৪৩৪-৪৩৮)।

"[রংপুরের জমিদার] কালীচন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাঁহার নাম কাশীচন্দ্র, তাঁহাদের এক অমাত্য ছিল—সে ব্যক্তি খঞ্জ ছিল, তাহার নাম ভীমচন্দ্র। লোকে এখনো বলিয়া থাকে—[অতঃপর ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]। এটি কালীচন্দ্রের রচনা বলে কথিত।

২ "[রামদুলাল দেবের পুত্র] ছাতুবাবু খুব শৌখিন বাবু, সঙ্গীতজ্ঞ, রসিক ও দাতা ছিলেন। মুখে মুখে গান বাঁধিতে পারিতেন। তৎকালীন কোনো দলকে ঠাট্টা করিয়া তিনি এই ছড়াটি বাঁধেন ছড়াটি আরও বড় ছিল সবটা মনে নাই।" —'ছাতুবাবুর কথা' (বসুধারা পত্রিকা : বৈশাখ, ১৩৬৭) : "যমদত্ত'।

৩৯৮

॥ বিদ্রূপের ছড়া ॥

বোষ্টম টম টম,
ঝুলির ভিতর মালা থুয়ে পাঁটা খাবার যম ।[১]

৩৯৯

॥ দারোগার ঘোড়ার প্রতি ॥

ও ঘোঁড়া তোর নাকে দড়া
নিয়ে যাব বাগনা পাড়া ॥[২]

৪০০

খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং
কার হাঁড়িতে ফ্যান খেয়েছিস্ কে ভেঙেছে ঠ্যাং ।[৩]

১ সেকালের নাজীর : (ভারতী : শ্রাবণ, ১৩০৩। পৃ. ২০৩-২১৪)।

"…কোন বৈষ্ণবকে বাড়ীর সম্মুখে দেখিতে পাইলেই তাহার শিশুহৃদয়ে বিদ্রূপ-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিত, সে উক্ত বাবাজীউর আজানুলম্বিত, নাভিকুণ্ডল নিম্নগামী বহির্বাস, বর্তুল উদর, মুণ্ডিত মস্তকে তরমুজের বোঁটার মত সুদৃঢ় টিকির গোচ্ছা ও সর্বাঙ্গে ফোঁটা তিলকের চটক দেখিয়া কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না, একটু তফাতে গিয়া দেশস্থ বালকবর্গের সহিত সুর করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিত :—" [অতঃপর তা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

২ গঙ্গাধর শর্মা/ওরফে/জটাধারীর রোজনামচা [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত] উপন্যাস থেকে গৃহীত। (দ্রঃ বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১২৮৫। পৃ. ২১)।

"দারগার ভয় প্রবল, তবু কেহ কেহ সুমৃদুস্বরে "ঘোড়া মুখে নড়া" কেহ "ঘোঁড়া বাগনা পাড়া—নাকে দড়ি" কহিয়া কপচাইতেছে। আবার কেহ বচন সংশোধন করিয়া দিতেছে—" [অতঃপর ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে]।

৩ দীনেন্দ্রকুমার রায় : সেকালের পাঠশালার কাহিনী (ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৩। পৃ. ৪)।

"পাঠশালার ছেলেরা গুরুমহাশয়কে যমের মত ভয় করিত ; কিন্তু তাঁহাকে খোঁড়াইতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না, গুরুমহাশয় কিছুদূর যাইবামাত্র তাহারা নাচিতে নাচিতে অনুচ্চস্বরে সুর করিয়া বলিত :—[অতঃপর ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] দৈবাৎ কোনদিন বাল-মুখোচ্চারিত এই কবিতা গুরুমহাশয়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তিনি বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া রোষকষায়িত লোচনে ফিরিয়া চাহিতেন, ছেলেরা তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া যে যেখানে পারিত অদৃশ্য হইত।"

৪০১

প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকী অবতার (অর্থাৎ সটান দীর্ঘ)
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার (" কিঞ্চিৎ বক্র)
তৃতীয় প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলী (" শীতে জড়সড়)
চতুর্থ প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী (" একেবারে চক্রবৎ)।[১]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-বিষয়ক ছড়া
চতুর্থ পর্যায় : স্থানের খ্যাতি-কুখ্যাতি-বিষয়ক ছড়া

৪০২

॥ উত্তরবঙ্গের পীঠস্থান ভবানীপুরের প্রসিদ্ধি-বিষয়ক ছড়া ॥

ক্ষীরতক্তি, ঝাঁটা, পাঁঠা, / মেটে কেশুর[২], প্রসাদ বাঁটা,
মদ, গাঁজা, সন্ন্যাসীঠাকুর, / এই আট নিয়ে ভবানীপুর ॥[৩]

১ দীনেন্দ্রকুমার রায়: প্রবাদ প্রসঙ্গ (ভারতী · আষাঢ়, ১৩০৪। পৃ. ১৪৩-১৫১)।

সশিষ্য এক বামুন ঠাকুর অপর এক শিষ্যের বাড়ীতে গিয়ে আপন ব্রহ্মচর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যে দারুণ শীতের রাতে ভূমি-শয্যায় রাত কাটাতে চাইলেন। রাত বাড়বার সঙ্গে শীতও বাড়তে থাকে, এবং ভণ্ড বামুন ঠাকুর ক্রমেই শীতে কাতর হতে থাকেন, শীতে তাঁর শয়নভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। এক শিষ্য ঠাকুরের সেই শয়নভঙ্গির কথা পরদিন সকলের কাছে এই ছড়ায় ব্যক্ত করছে।

অরবিন্দ দত্ত-রচিত 'বামুনবাগদী' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের এক অংশে (প্রবাসী : চৈত্র, ১৩৩১। পৃ. ৭৭০-৭৭৪) এই ছড়ার কথান্তর মেলে : প্রথম রাত্রিতে · । তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে সেখানে 'কুকুর কুণ্ডলী' এবং চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে 'বেনের পুঁটুলি' হবার কথা আছে। ছড়াটি বাঙলা দেশে সুপরিচিত।

২ শাঁকালু ৩ হরগোপাল দাসকুণ্ডু : 'উত্তরবঙ্গে রাম নবমী' : (মানসী ও মর্মবাণী : আষাঢ়, ১৩২৬। পৃ. ৪৭০-৪৭৬)। কোনস্থানের সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি-বিষয়ক ছড়া রচনা করা বাঙলাদেশের এক বৈশিষ্ট্য। এগুলিকে

৪০৩

সাজনে এগার সিন্দুর, বাজনে টোক,
গোদে বাদিয়া, ঢেঙে থামা
তায় করিস্ তো হাজরাদী সামা ॥[১]

৪০৪

সংলগ্ন 'কুলাউড়া'/ইটস্ত 'ননজোড়া'
ইন্দ্রেশ্বর 'খলাগ্রাম'/কপাল পোড়া তিনই গ্রাম ॥[২]

বলতে পারি 'গ্রামের কুলজি'। এই ধরণের ছড়া (সংখ্যায় ২৪টি) সংগ্রহ করেছেন ডঃ সমীরকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কার ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে' (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে, পৃ. ২১১-২৩৪) প্রবন্ধে। ডঃ ঘোষ এগুলির রচনাভঙ্গিতে 'তিন' সংখ্যার প্রভাব দেখেছেন।

১ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য: প্রবাদের আবাদ (সৌরভ: পৌষ, ১৩৩১। পৃ. ২১২-২১৪)।

"ব্রহ্মপুত্রতীরে এগারসিন্দুর এক সময় দেওয়ান ইশা খাঁর এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তখন হইতেই এখানকার মানুষ সাজসজ্জার পারিপাট্যের প্রতি একান্ত আগ্রহান্বিত। টোকের লোকসকল গান-বাজনায় খুব সৌখীন। টোক ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সম্মিলন স্থানে, ঢাকা জিলায় অবস্থিত এগার সিন্দুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে। বাহাদিয়া বা বাদিয়া এগার সিন্দুরের নিকটবর্তী গ্রাম, এখানে 'গোদ'ওয়ালা লোকের সংখ্যা অনেক। 'ঢেং' অর্থে অত্যধিক মাত্রায় চতুর ও বক্তা। 'থামা'র লোক বেজায় ধূর্ত—ভারি টেট্‌না। আর কূট তর্কে হাজরাদির লোক পটু।…"

২ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য: প্রবাদের আবাদ (সৌরভ: ভাদ্র, ১৩৩৪। পৃ. ১৯৪-১৯৭)। শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত।

"সংলগ্ন পরগণার কুলাউড়া গ্রাম, ইটা পরগণার ননজোড়া গ্রাম, এবং ইন্দ্রেশ্বর পরগণার খলাগ্রামের লোক নাকি খুব ধূর্ত ও ফাঁকাবাজ!"

৪০৫

বব, আঠারব (গলাচিপা) পনাব
ওরে, রাজা খানিক র, (গের গেরাইতে) গেরাব,
পান খাবি ত—বিড়াব—১

৪০৬

ভায়ুগাছ স্থানি বিপ্রা সন্ধ্যাপূজা বিবর্জিত
মধ্যাহ্নে দারুক বৃত্তি, সায়াহ্নে শুট্‌কি ভোজনম্‌ ।২

১ রসিকচন্দ্র বসু-লিখিত ইতিহাস-বিষয়ক নিবন্ধ 'শ্রুতকথা' (সৌরভ : পৌষ ১৩১৯ । পৃ. ৮১-৮৫)-র পাদটীকায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের টিপ্পনী থেকে (পৃ ৮৫-৮৬) উদ্ধৃত ।

ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের জঙ্গলে অনেক প্রাচীন রাজার আবাস ছিল বলে কথিত হয় । এঁদেব মধ্যে কোনো কোনো রাজা মঘ ছিলেন । আলোচ্য সময় 'বেলাব' গ্রামে ভোজবর্মার একটি তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হয় । উক্ত অঞ্চলের গ্রাম-নামগুলি ব-অন্তক । সম্পাদকের মন্তব্য : "একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই অঞ্চলের কোন রাজা তাঁহার নিম্ন কুলোদ্ভবা পত্নীকে সমাজ ভয়ে পরিত্যাগ করিলে, সে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রার্থনা করে । রাজা এই প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইয়া তাহাকে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি গ্রামের নাম বলিতে আদেশ করেন । পত্নী, এক শ্বাসে যত গ্রামের নাম বলিতে পারিবে তাহাই সে প্রাপ্ত হইবে জানিয়া বলিতে থাকে :—" [অতঃপর সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]

"অর্থাৎ রাজার পরিত্যক্ত পত্নী 'বব' ও 'আঠারব' নামক দুইটি প্রকাণ্ড গ্রামের নাম বলিবামাত্রই রাজা পত্নীর গলা চিপিয়া ধরিলেন, পত্নী এই অবস্থায়ই 'পনাব' নামক স্থানটির নাম লইয়া বলিলেন, 'ওহে রাজা আর খানিক অপেক্ষা কর । রাজা কিন্তু ছাড়িলেন না—পত্নী গুঁরাইয়া গুঁরাইয়াই (গের গেরাইতে) 'গেরাব' নামক গ্রামের নাম উচ্চারণ করিলেন; এবং রাজা যখন গোপনে তাহার নিকট যাইতেন তখন রাজাকে পান খাইবার জন্য সমাদর করিতে 'বিড়াব' নামক গ্রামখানা দিতেও অনুরোধ করিলেন ।"

"গ্রামগুলি এখনও বর্তমান থাকিয়া প্রবাদ কাহিনীটির সম্মান রক্ষা করিতেছে । বিড়াবর পান এখনও প্রসিদ্ধ ।..."

২ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র ১৩৩৪ । পৃ. ১৯৬–১৯৭) । শ্রীহট্টে প্রচলিত ।

৪০৭

॥ চর-দখলকারী পদ্মা-পারের লোকদের উদ্দেশে ছড়া ॥

পদ্মাপার‍্যা রায়ৎগোর লাঠি হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরায়্যা ভাত মাখেন পাতে,
মাথা·ভাতটি নাই ফুরাত্যে ভাইঙা পড়ে ঘর,
সান্‌কির ভাত কোছে ভর‍্যা খুঁজেন আরেক চর ॥[১]

৪০৮

॥ উক্ত ছড়ার জবাবে পদ্মা-পারের লোকদের ছড়া ।

টান দেশী গিরস্তগোর বাপকালান্যা ঘাটি,
আঠু জলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি
আপনেবা পাও মেইলা বস্যা হুকায় মাবেন টান,
এক শহরের পথ ভাঙ্গা বউ, জল আন্‌ব্যার যান ॥[২]

"ভাদুগাছ পরগণার অনেক ব্রাহ্মণ নাকি মধ্যাহ্নে দারুক বৃত্তি (কাষ্ঠ সংগ্রহ) ও বিকালে শুট্‌কি ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভোজনও করেন।"

১ সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য : বক্‌শীস্ (গল্প) : (সবুজপত্র : মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৮। পৃ. ৪৪৪-৪৫৯)।

এই গল্পটি 'মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত'। পদ্মা-পারের প্রজারা অপরের চর দখল করতে দক্ষ। তাদের উদ্দেশ করে 'টান দেশী'রা অর্থাৎ যেখানে চর নেই, তারা এই ছড়া বলে। "পদ্মাপারে যে সব রায়ৎ বসৎ করে তাগোরে কাম খালি মনিবের হৈয়্যা চর দখল করণ।·· হাল গরু বেবাকের নাই, পাকা বাঁশের টুকটুকা একখান কর‍্যা লাঠি ক'ল বেবাকেরি আছে। টান দেশী গিরস্তেরা পদ্মাপার‍্যাগোরে ঠাট্টা কর‍্যা কয়·" [অতঃপর সে ছড়াটি উদ্ধৃত হয়েছে]।

২ "আবার পদ্মাপার‍্যাও টান মুলুকের মানুষের নামে [উদ্ধৃত ছড়াটি] এই ছড়া আওড়ায়্যা তাগোরে খ্যাপাতে রেয়াৎ করে না।"

৪০৯

৭ চট্টগ্রামের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া ॥

হাতে কাঁচি[১] কোমরে দা
ভাত খাইলে রাউন্যা[২] যা ॥[৩]

১ কাস্তে ২ রাউন্যা বা রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রামের একটি স্থানের নাম। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চাকমারা পরিত্যক্ত 'জুম' ক্ষেত্রকে 'রান্যা' বলে ৩ সতীশচন্দ্র ঘোষ: চাকমার ভাগচক্র (ভারতী: মাঘ, ১৩১৩। পৃ. ৯১৮-৯৩৯)।

"নূতন আবাদিত জমির স্থায় রাঙ্গুনিয়ার উর্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। অন্নাক্লিষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও আসিয়া বসতি স্থাপন করিতেছে। চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে,—" [ওপরে উদ্ধৃতি ছড়া]।

"সারার্থ এই—'যদি স্বচ্ছন্দে উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা থাকে, তবে হাতে কাস্তে ও কোমরে দা লইয়া রাঙ্গুনিয়ায় যাও।' এই বাক্যে আরও কিছু, সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষিব উপকরণ দা এবং কাস্তে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে; এই দুইটী উপকরণ জুমিয়া-দের অনন্যোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ এদেশে [চট্টগ্রামে] চাকমাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল।"

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সাহিত্যবিষয়ক

প্রথম পর্যায় : মধ্যযুগীয় ও ঊনবিংশ শতকীয়

৪১০

॥ গাজীর গীতের অন্তর্ভুক্ত ছড়া ॥

অহুপ সহরে রাজা চন্দ্রভানু নাম
সুযিাউজল কন্যা তার রূপে দিনমান।
একদিন সাঁজের বেলা বসে সরোবরে
ফুল তুলি মালা গাঁথে বিনিসুতার তারে
'দুলদুল্ ঘোড়া' চড়ি হানেফ সেথায়
ভাঙা চাঁদ উঠিলো যেন আসমানের গায়।
কন্যা বলে, ওরে নেড়ে, মরতে এলি ক্যান
জানবাচ্চা কেটে রাজা করবে খান্‌খান্!
হানেফ বলে, শুন বিবি, বলি যে তোমায়
বাপজান মরেছে তোমার করিয়ে লড়ায়।
শুনে বিবি পটের ছবির মত হয়ে যায়
আস্তে গিয়ে হানেফ মরদ ছুঁইল তাহায়।
লজ্জাবতী লতার মত আমরিয়া পড়িল
বিবির বাঁদি ধরল এসে বুঝি কন্যা গেল।
বাঁশীর মুখে দোম দিলে যেমন ধারা হয়।
ছাড়িল নিশ্বাস বিবি তেমনি করে হায়।
তা দেখিয়া হানেক মরদ ব্যাকুব হলো
প্রণাম করি সভার লোক পালা সাঙ্গ হলো।...[১]

১ ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, 'কাব্যবিনোদ : নিরক্ষর কবি: জয়চাঁদ গা'ন (ভারতবর্ষ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। পৃ. ৯৬২-৯৬৭)। 'গাজীর গীত' সম্পর্কে মোক্ষদাচরণ কয়েকটি তথ্য জানিয়েছেন : গাজীর গীতকার সাধারণতঃ মুসলমানগণ, তবে কিছু নমঃশূদ্রও আছেন। মূল গায়ককে বলে 'খেড়ো'। সভার মধ্যস্থলে গাজীর 'খুন্তী' প্রোথিত করে সহকারীদের নিয়ে তিনি গান গেয়ে যান নানা ভাব ও ভঙ্গিতে। সাধারণতঃ মুসলমানী রাজা-বাদশাহের

৪১১

কবিগানের ছড়া : ভোলা ময়রা ॥

নাটুর নীচে নড়ে নড্ডু নয় ভাই।
বৃন্দাবনে বসে দেখ বস্থ ঘোষের রাই ॥
ঘোম্‌টা খুলে চোম্‌টা মারে কোম্‌টা বড় ভারি।
তিন লম্ফে লঙ্কাপার, হাস্‌চে শুকসারী ॥
বাঁঝা মেয়ের বেটা হলো, অমাবস্যার চাঁদ।
আণ্টুনি জবাব দিও, নৈলে বাঁধ্‌বে বড় ফাঁদ ॥[১]

কেচ্ছা-কাহিনীই গাজীর গীতের বিষয়। অনেক নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান হবার কামনায় গাজীর গীতের আয়োজন করে থাকেন, কেননা, জনশ্রুতি আছে, গাজী কালু ফকিরের আশীর্বাদে এক অপুত্রক বাদশাহের পুত্র হয়েছিল। অতঃপর তিনি যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার 'কটুকি' নদীর তীরস্থ মেন্দেপাড়া গ্রামের নমঃশূদ্র কবি জয়চাঁদ গা'নের কবি-পরিচয় দিয়েছেন।

শেষে মোক্ষদাচরণের মন্তব্য : "গাজির গীতের যতকিছু বাহাদুরি তাহার ছড়ার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই কারণ আমার জানা একটি গাজির গীতের ছড়া উদ্ধৃত করিলাম [সেটিই ওপরে উদ্ধৃত করেছি] ছড়াটি হিন্দু নায়িকা আর মুসলমান নায়কের বাদ-বিসম্বাদে পূর্ণ।..."

"গাজির গীতের ছড়া এইরূপ। এই গীতের এই স্থানেই বিশেষত্ব, এই ছড়াতেই ব্যাখ্যা সমাপ্ত, এই স্থানেই কবিত্ব। ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য গীত গান করিয়া থাকে।..."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গাজীর গীতের মতো জারী গানের মধ্যেও ছড়া সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন এম্. এম্. লুৎফর রহমান : জারী-গানের গীত-পদ্ধতি (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা : মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬। পৃ. ২২-৫২)। স্থানাভাবে জারী-গানের অন্তর্ভুক্ত ছড়ার নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া গেল না।

জারীগান শিয়া-শ্রেণীর মুসলমানদের ধর্ম-গীতি হলেও, কার্যতঃ তা সাহিত্য-শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ববঙ্গে দেখা যায়, খুলনা-যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ গান নিছক গীতি রূপেই শ্রুত হয়, যদিও মৈমনসিংহ এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। জারীগান মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত, অতএব একে 'আনুষ্ঠানিক' ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করি নি। গাজীর ছড়া সম্পর্কেও সেই একই কথা।

১ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৫৮৬)।

"তাঁহাদের [কবিওয়ালাদের] গাহনায় ওস্তাদী গান ছিল ; স্থলে স্থলে

৪১২

॥ ভোলা ময়রার ছড়া ॥

লাগ্‌লো ধুম, গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌, শোভাবাজারের পূজা।
বড় ব্যয় (লোকে কয়), কর্বে শোভাবাজারের রাজা ॥[১]

৪১৩

॥ ভোলা ময়রার ছড়া ॥

১. কৈ, চৈ[২], নীল। /যশোরেতে মিল ॥
২. গরু গুরু কৈবর্ত। /মেদিনীপুরের স্বত্ব ॥
৩. রাঢ়ের রাঁধুনী বামুন, বদ্যিদেব পৈতে।
নদীয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে ?
৪. আগুরী, মজুরী আর বাজার-সরকার।
বর্ধমানে পাওয়া যায় অতি চমৎকার ॥
৫. ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো খই।
ঢাকার ভালো পাতা-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভালো দই ॥
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহের ভালো আম।
উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম ॥
রঙ্গপুরের শ্বশুর ভালো, রাজসাহীর জামাই।
নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই ॥

ছড়া কাটাকাটি হেঁয়ালীও থাকিত। বিশেষতঃ যখন মধু ফুরাইয়া আসিতেছিল, তখন 'কবি' অর্থে ছড়া-কাটাকাটিই দাঁড়াইয়াছিল—(এখনও কতকটা তাই) [মেয়ে কবিওয়ালাদের মধ্যে ছড়া-কাটাকাটি ও হেঁয়ালী বেশি হত]…। ভোলা ময়রার দলের পালা হইতে এই ধাতুর ছড়া একটি শুনাই—" [অতঃপর তিনি যে ছড়াটি সঙ্কলিত করেছেন, ওপরে তা উদ্ধৃত হয়েছে]।

১ ধর্মানন্দ মহাভারতী : ভোলা ময়রা (সাহিত্য-সংহিতা : বৈশাখ, ৩১১। পৃ. ২১-২৬)।

"কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভোলা গাহিয়াছিল—[ওপরে তা উদ্ধৃত করেছি]. এই ছড়ার শেষ অংশ পাই নাই। ‥"

২ ডালের সঙ্গে ভোজ্য পদার্থ বিশেষ।

দিনাজপুরের কায়েৎ ভালো, হাবড়ায় ভালো শুঁড়ি।
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি॥
বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ পরগণার গোপ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীঘ্র বংশ লোপ॥
হুগলির ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো ঘোল।
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভালো, হরি হরি বোল্!![১]

৪১৪

॥ মেয়ে-কবিওয়ালার ছড়া কাটা-কাটি॥

["ভোলা ময়রার সময়ে বাঙ্গালা দেশে "পুরুষ কবিওয়ালা" এবং "মেয়ে কবিওয়ালা" এই দুই প্রকার কবির দল প্রচলিত ছিল।.. দুইটা মেয়ে কবি-ওয়ালীর দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া যখন আসর-মধ্যে ছড়া কাটিত, তাহা দেখিয়া দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকিত। মেয়ে কবিওয়ালীদিগের ছড়া কাটা-কাটি কিরূপ ছিল, তাহার একটি নমুনা দিতেছি। মনে করুন প্রথমে একপক্ষ প্রশ্ন করিল—

হৈ হৈ বল্ দেখি লো—
যোগী নয়, ঋষি নয়, ছাই মাথে গায়।
মাচার উপরে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যায়।

অপর পক্ষ যদি বুদ্ধিমতী হয়, তাহা হইলে উত্তর দিল "কুষ্মাণ্ড"। তাহার পরে উত্তরদাত্রীর দল, প্রশ্নকর্ত্রীর দলকে কহিল—

এক থাল সুপারী।
গণতে নাহি পারি।

উত্তর হইল "আকাশের তারা"। অন্য পক্ষ প্রশ্ন করিল—

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
বৃক্ষের পল্লব নহে কিন্তু বৃক্ষশাখে রয়॥

উত্তর হইল "পাখি"। তাহার পর প্রশ্ন হইল—

১ ধর্মানন্দ মহাভারতী: ভোলা ময়রা (সাহিত্য-সংহিতা: চৈত্র, ১৩১১। পৃ. ৬৫৮-৬৬০)।

"ভোলার অনেক ছোটছোট ছড়া আছে, তাহার কতকগুলি প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম [ওপরে সেগুলি উদ্ধৃত করেছি]। বরাহনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা আন্টনী ফিরিঙ্গির নামেও অনেক ছড়া শোনা যায়।"

তিন বীর, বার শির, বেয়াল্লিশ লোচন।
চার জাতি সেনা যোরে, ছেয়াল্লিশ ভবন॥
কহ কহ মাধবীলতা হিঁয়ালীর ছন্দ।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ॥

উত্তর হইল "দাবা খেলা"। তাহার পরে পুনরপি প্রশ্ন হইল—

দল্‌পিপি দল্‌পিপি দলের ভিতর বাসা।
হাড্ডী নাই, হুড্ডী নাই, মানুষ খাবার আশা॥

"এইবারে এক পক্ষ হারি মানিল; উত্তর দিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। যতক্ষণ পর্যন্ত ছড়া কাটা-কাটিতে এক পক্ষের পরাজয় না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চলিতে থাকিবে। ..."[১]

৪১৫

॥ পাঁচালির অন্তর্ভুক্ত ছড়া: দাশরথি রায় ॥

॥ বসুদেব যোগমায়ার রূপ দেখছেন ॥

যেমন—তীর্থের সেরা কাশীধাম কর্মের সেরা নিষ্কাম
নামের সেরা রামনাম তারকব্রহ্ম জানি।
খাদ্যের সেরা ঘৃত ক্ষীর দেশের সেরা গঙ্গাতীর
বেশের সেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ বেশখানি॥
বলের সেরা যোগবল ফলের সেরা মোক্ষফল
জলের সেরা গঙ্গাজল খলের সেরা ফণী॥
পুরাণের সেরা ভারত রথের সেরা পুষ্পক রথ
পুত্রের সেরা ভগীরথ বংশ-চূড়ামণি॥
মুনির সেরা নারদমুনি ফণীর সেরা অনন্তফণী
নদীর সেরা মন্দাকিনী পতিত-পাবনী।
পূজার সেরা আশ্বিনে পূজা মূর্তির সেরা দশভুজা
যুক্তির সেরা শেষ থাকে যার সেই যুক্তি গুনি॥
চুলের সেরা চাঁচর চুল কুলের সেরা ব্রহ্মকুল
ফুলের সেরা কমল ফুল কয়েন কমলযোনী।

১ ধর্মানন্দ মহাভারতী: ভোলা ময়রা (সাহিত্য-সংহিতা: চৈত্র, ১৩১১; পৃ. ৬৫৮-৬৬০)।

তন্ত্রের সেরা নির্বাণ তন্ত্র মন্ত্রের সেরা হরি-মন্ত্র
যন্ত্রের সেরা বীণাযন্ত্র বাজান নারদ মুনি ॥
তিথির সেরা পূর্ণিমা তিথি ব্রতীর সেরা যজ্ঞে ব্রতী
স্থিতির সেরা হরি-স্থিতি বিপদনাশিনী।
মেঘের রৌদ্র ধূপের সেরা রামচন্দ্র ভূপের সেরা
তেমনি দেখেন রূপের সেরা হর-মনমোহিনী ॥[১]

৪১৬

॥ বিদ্রূপাত্মক ছড়া : রামপ্রসাদের প্রতি আজু গোঁসাঞি ॥

ক. রামপ্রসাদ :
আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥
আজু গোঁসাঞি :
পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখ্‌বি রে তোর মেসো আর মাসী ॥

খ. রামপ্রসাদ : মুক্ত কর মা মায়া জালে।
আজু গোঁসাঞি :
বদ্ধ কর মা খ্যাপ্‌না জালে।
যাতে চুনো পুঁটি এড়াবে না মজা মাবব ঝোলে ঝালে ॥

গ. রামপ্রসাদ :
এই সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
আজু গোঁসাঞি :
এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি ॥

১ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)।

"কবিওয়ালাদের পর পাঁচালীকারদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাদের পাঁচালী প্রাচীন পাঁচালী গান হইতে স্বতন্ত্র প্রথায় বিরচিত..। এই পরবর্তী পাঁচালীতে দুই প্রকার রচনা থাকিত, এক ছড়া, অপর গান।...ছড়া কিঞ্চিৎ শুনাইব। পাঁচালীর এই সকল ছড়াও সুর করিয়া গাওয়া চলে, গানের মতই শুনায়।" [অতঃপর লেখক দাশরথি রায়ের দুটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি ওপরে উদ্ধৃত হল]।

যার যেমন মন, তার তেমনি মন কর রে পরিপাটি ॥[১]
ওহে সেন, অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ॥
ওরে, শিবের ভাবে ভাব না কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি ॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া, ভাব্‌ছ মায়ের বেড়ী কাটি।
তবে অভেদ জেনে শ্যামের পদ, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি ॥[২]

৪১৭

॥ 'সমস্যা পূরণ' বা 'হেঁয়ালী-পূরণে'র ছড়া ॥

ক. "বড় দুঃখে সুখ" :

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে। নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥
চখা কহে চখি প্রিয়ে এ বড় কৌতুক। বিধি হইতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ ॥

খ. "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর" :

কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির। বারোয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির। গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥

১ অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি : 'যদি ধোঁকাই জান তবে কেন তিনবার কেঁচেছ ঘুঁটি।' "পুত্র না হওয়াতে রামপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন —তাই এই শ্লেষ।" ২ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ২৭৭-২৭৮)।

"রামপ্রসাদের মর্মস্পর্শী হৃদয়-উচ্ছ্বাসকে একজন [আজু গোঁসাঞি] ভেঙ্গচাইয়াছেন।...ভক্ত-সাধকের প্রাণের কাহিনীর উত্তরে দন্তবিকাশের নমুনা কিঞ্চিৎ দেখাই,—" [তা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ওপরের রচনাগুলি ছড়াধর্মী গান। তবে, সুর-ছাড়া এগুলি ছড়াই বটে, সেজন্যেইএগুলি সঙ্কলিত হল। ছড়ার বিচিত্র প্রকৃতির এও এক দিক। রামপ্রসাদের রচনারীতির মধ্যে, হোক তা গান, তথাপি তাতে ছড়ার রীতির আভাস দেখেছেন সমালোচক কালিদাস রায় তাঁর 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' (দ্বিতীয়াংশ। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭) বইতে (পৃ. ৩৩১)।

গ. "বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে" :

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে,—বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে ॥[১]

৪১৮

আয়ান ঘোষ বিয়ে কল্লেন রাজকন্যা রাধা
নন্দের বেটা কৃষ্ণ তাতে ভাগ বসালেন আধা,

১ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩৮৬-৩৮৭)। প্রথম দুটি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর, শেষেরটি কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের।

"রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজা গিরীশচন্দ্রের সুরসিক সভাসদ একজন ছিলেন কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। ইনি উপাধি পাইয়াছিলেন 'রস-সাগর'। ইঁহার রচিত হেঁয়ালী-পূরণ বা সদ্যপ্রস্তুত উদ্ভট কবিতা বিলক্ষণ আমোদ-জনক। তাঁহার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করিলে তিনি ছন্দোবন্ধে চমৎকাররূপে পাদপূরণ করতঃ উত্তর দিতে পারিতেন। ইঁহার কোন কোন উত্তর সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ভাবানুবাদ।"

"...কবিতায় এইরূপ সমস্যাপূরণ কবিওয়ালাদিগের মধ্যেও চলিত ছিল। কথিত আছে, একবার মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে কোন সভায়—'বঁড়শী বিঁধেছে যেন চাঁদে'—এই পদটি পূরণ করিবার প্রস্তাব উঠে ; সভাস্থ বড় বড় পণ্ডিত যখন ন্যায়-তর্কের অগাধ সলিল হাতড়াইয়া, হাবুডুবু খাইয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন তখন কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের ডাক পড়িল ; তিনি গামছা কাঁধে স্নানে যাইতেছিলেন, সেই বেশেই সভায় আসিয়া সদ্য-সদ্যই উত্তর রচিয়াছিলেন—" [সে উত্তর ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ণচন্দ্র দে-র সম্পাদনায় 'রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের সমস্যাপূরণ' (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসসাগরের সমস্যাপূরণ' (মানসী ও মর্মবাণী : আশ্বিন, ১৩২৮। পৃ. ১৬৭-১৭২) নামে একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন : "'আর্যদর্শন' মাসিক পত্রে, গ্রাহক পাঠকেরা সমস্যা পাঠাইয়া লিখিত—"বিদ্যাভূষণ, পূরণ কর"। সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সমস্যাপূরণে একজন ওস্তাদ ছিলেন, তিনি পূরণ করিয়া সেগুলি আর্যদর্শনে ছাপিতেন।"

আর শুনেছ দুঃখের কথা আর শুনেছ দৈ
'যার ধন তার ধন নয়কো নেপোয় মারে দৈ'।[১]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সাহিত্যবিষয়ক

দ্বিতীয় পর্যায় : বর্ণনা ও বিবৃতিমূলক ছড়া

৪১৯

॥ দুর্গাপুজোর ছড়া ॥

হিঁদুর দেবতা দুগ্‌গা ঠাকুর, দশখানি তার হাত ॥
ডাইনে-বাঁয়ে আছে তার কার্তিক-গণপতি।
দুটো মেয়ের নাম রেখেছে লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
যে ছেলেটার প্যাট মোটা, বে'ন বেলা[২] ভাত খায়।
কলা গাছের[৩] শাদী করে শুঁড় বাগায়ে রয় ॥
যে ছেলেটার সিঁথে কাটা জুতো পেঁদা[৪] পায়।
সেই ছেলেডা বড়ো ভাবের ভেস্তা চেপে যায় ॥
বড়ো বড়ো কাঠের থালা, তাইতি[৫] সব চাল-কলা ॥
এলপাতা বেলপাতা, লুচি করছে হাতে—
যতো সব বামন আসছে, সেলাম ঠুকছে তাতে ॥
বিবি গেল পাতালপুরী[৬], হাবলো[৭] আঁধার করে
বিবির প্রাণ গেল কোকিলের ঠোকরে ॥[৮]

১ দীনেন্দ্রকুমার রায় : প্রবাদ প্রসঙ্গ (ভারতী : আষাঢ়, ১৩০৪। পৃ. ১৪৫)।

"একদিন মহারাজা [কৃষ্ণচন্দ্র রায়] কথা প্রসঙ্গে তদীয় সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ওরফে রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যার ধন তার ধন নয়কো নেপোয় মারে দৈ" কথাটা কি রকম রসসাগর? রসসাগর তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে উত্তর করিলেন :—" [অতঃপর সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

২ বিহান বেলায় ৩ গাছকে ৪ জুতো পরা ৫ তাইতে ৬ প্রতিমা বিসর্জনের পরে প্রতিমা জলের তলে ডুবল, যেন পাতালে চলে গেল ৭ হাভেলি, বাড়ী-ঘর ৮ কোনো মুসলমানের রচনা, স্পষ্টই বোঝা যায়। এই ধরণের রচনা পূর্ববঙ্গেও মেলে। শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাঁটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত।

৪২০

॥ দুর্গাপুজোর ছড়া ॥

আশ্বিনে অম্বিকে দেবী আইলেন ঘটে
'যাও হে গিরিবর, গৌরী আনিতে।'
আচার্য ডাকিয়া, ভালো দিন দেখিয়া
চলিলেন গিরিবর গৌরী আনিতে।
'কোথায় মা উমাপতি, বাহির হয়ে দেখ্ দেখি নিতে এয়েচি।
যাবৎ এসোচো, মাতা শয়নে শুয়ে থাকে
গৌরী বলে কেঁদে ওঠে, মুখে নেই তার অন্য কথা।'
'যাও পিতা পতি হরের কাছে।'
'যাবো না ভাঙড়ের বেটার কাছে।
ঊর্ধ্বপুচ্ছ বলে পাছে
তা হলে কি নিস্তার আছে
তোমার মেনকার কাছে।'
—এত বলে গিয়ে বসলেন হরের বাঁয়।
আজ যদি যাও দুর্গা এককালে সব তোমায়।
আগে যায় কার্তিক-গণেশ,
শেষে যায় লক্ষ্মী-সরস্বতী
পাতিয়ে ঘটক স্থাপ[১]
মুখের 'পর নারকেলের ফল[২];
কেউ নেয় কুলো-ডালা, কেউ নেয় ঝারি
'এই দেখ'সে পাড়ার লোক, আসছে আমার গৌরহরি।
এই ধন কোলে লয়ে—
আঁচল দিয়ে মুখ মুছায়ে
এই ধন পাঠায়ে বনে
কি নিয়ে থাকবো ঘরে।'
আঁখি দুটি ছল ছল, পতি বলে চল্ চল্
তিন দিন না গত হতে এসেছে মা পতি নিতে
আজ উমা ধনকে বিজয়া দিতে
কেমন করে মন কাঁদে রে॥[৩]

১ ঘট পেতে ও স্থাপন করে ২ ঘটের মুখে নারিকেল দিয়ে ৩ শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত।

৪২১

পুণ্যধাম বাপের বাড়ী যাইতে চাহে সকল নারী।
ঐ দেখ না দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশেরে কোলত্ করি[১] আস্তন[২] যে জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের[৩] আশাসোটা ধরি।
ভৃঙ্গী চলে পিছে ধুতুম্ তুতুম্ করি[৪]॥
মেনা আইলা বারাই[৫] নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আইন্সে[৬] পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আক বাড়াইয়া[৭] নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর।
পূজা দিল বলি খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিনর দিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চার দিনর দিন বিদায় দিল যাইতে নিজের বাড়ী॥
শিবে বলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনী কচু শাক টুনী[৮] পোড়া পানি ভাত[৯]
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন॥[১০]

৪২২

গোয়ালিনী সকল মিলি করে কানাকানি।
কি পোলা[১১] পাইল আমাদের নন্দরাণী॥
এক চুমুকে দুধ খাই মাইল্য[১২] পুতনারে।
একৈক টানে বকাসুরে খান খান করি[১৩] চিরে॥
ঘরে যাইতে না দেখিলুম কেমনে খাইল ননী।
বাঁশী বাজাই মন মজাইল কৈল্য[১৪] পাগলিনী॥
যমুনা উজান চলে বাঁশের বাঁশীর স্বরে।
যে বলে হরি হরি যমে তারে ডরে॥

১ কোলে করে ২ আসছেন ৩ আসছে ৪ ধুপ ধাপ করে ৫ অগ্রসর হচ্ছে ৬ এনেছে ৭ অগ্রসর হয়ে ৮ টুনীপাখি ৯ পান্তাভাত ১০ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত: 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪২৫)। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

১১ ছেলে ১২ মারল ১৩ খণ্ড খণ্ড করে ১৪ করল।

বল হরি বল, বল হরি ভাই।
হরি নাম লইয়া থৈ থৈ খাই ॥[১]

৪২৩

॥ কলিযুগের ছড়া ॥

হরি, কতো রঙ্গ দেখালে এই কলিতে।
গুরু এলি[২] নোয়ায় না মাথা পাছে টেরি ভেঙে যায়।
শ্বশুর-শাশুড়ী এলে পরে পড়ে থাকে তাদের পায় ॥
পিতা-মাতাকে অন্ন দিতে দিনে হয় দৈন্য-দশা
বনিতে[৩] গহনা দিতে রাতে হয় জমিদার।
শালীকে দেয় শখের শাড়ী মুখের কথা না খসিতে।
হরি, কতো রঙ্গ দেখালে এই কলিতে ॥[৪]

৪২৪

কলি জাগ্রত কলি, কলি বিবরণ।
কলিযুগের কথা করিয়া স্মরণ ॥
শুন সর্বজনে একমনে কলিযুগের কথা।
পেটের বাছার কষ্ট দেখে কাঁদে মাতা-পিত্র ॥
কতো কীর্তিজন[৫] আনে ধন উপার্জন করে।
ব্যাগ ভ'রে আনে ঘরে মেগেরই হুজুরে[৬] ॥
অল্প টাকায় বদন বাঁকা বদন কেন ভারি?
শোনো প্রিয়, দেখ চেয়ে, আমি আজ্ঞাবাহী।
এনেছি কুরূপ সোনা, চিনির পানা কিনে আনা গেছে।
আগাম দেখ, তুলে রাখ, ওই ব্যাগেতে আছে ॥
এনেছো সোনা? দাও গহনা, ঘুচুক গায়ের জ্বালা।
চেন-চুড়ি, রতন চূড়, আঙুল কাঁসের বালা ॥

১ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত: 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২১। পৃ. ৪২৫-৫২৬)। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

২ এলে ৩ বনিতাকে ৪ শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাঁটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত।

৫ কীর্তিমান ব্যক্তি ৬ স্ত্রীর কাছে।

তাবিজ-তাগা গয়না নেব, কানেতে কান বাড়।
মাথায় দিয়ো সোনার বাগান কড়ি নেকলেস হার॥
তোমার ভালোবাসি, বংশ কলি, মাত্র একটি দোষ।
বাপ-মায়ের প্রতি কেন করো অতো তাপিত খরচ॥
ভাই-ভাদোরবউ তাদের কেন দেবে—
বাড়তি খরচ করতে গেলে কোথায় তুমি পাবে?
সে তো আমারই ভাই, ভাবি তাই, তাকে দিলে কাজ হবে।
আমার নামে বিষয় করলে অসময়ে পাবে॥
চি্ক সাতনল বিছে দাইবন-কাটা[১]।
টাকায় যদি না কুলোয় বেচ' সদর কোটা[২]॥
কালাপেড়ে খড়কী ডুরে ইলেকটারি[৩] চাই।
বেনারসী ভালোবাসি, সিল্কের চাদর চাই॥
খাট-দেওয়া তক্তপোষ গড়িয়ে নতুন মিস্ত্রি।
শিমুল তুলোর গদি করে তাতে দুটো পাশ-বালিশ॥[৪]

৪২৫

॥ পয়সার ছড়া ॥

পয়সা যার নাই ভাই সংসারেতে মরণ ভালো।
পয়সা-শূন্য হলে পরে লোকে তারে ঘৃণা করে—
প্রাণের সহোদর কথা কয় না সমাচারে॥
পিতামাতা কয় না কথা, সদা দেয় অন্তরে ব্যথা॥
গিন্নীর পাশে বলে, 'এট্টু আগুন দেও না'।
চেয়ে আগুন, হয়ে আগুন, এ গয়ার পাপ[৫] কেন আসলে॥
সেই পুরুষের পয়সা হলে তখন গিন্নী ঘোমটা খুলে—
"কত্তাকে জলখাবার দাও, জলখাবার দাও।
জলখাবার না খেলে পরে পিত্তি পড়ে হবে পীড়ে[৬]

১ ডায়মণ্ড-কাটা ২ বাড়ির সম্মুখের কোঠা ৩ ইলেকট্রিক আলো ৪ দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম: সীমচক। ধূরখালি, হাওড়া)।

৫ গয়াতে পিণ্ড না পেয়ে যে প্রেতাত্মা ভূত হয়ে আছে ৬ পীড়া।

এই ভূমণ্ডলে
ভুবন বলেন[১], ভূমণ্ডলে কেবলি পয়সার পিরিতি ॥[২]

৪২৬

॥ পাখির বিবরণ ॥

অ্যাং সারো[৩] প্যাং সারো দেখি আরো দেখি পোড়া সারো[৪] ;
তার পাছত্[৫] দেখিয়া নিলে গিরস্তের পারো[৬] ॥
বোগদুল্[৭] ভ্যাট্‌রেঙ্গা[৮] দেখিল তলপাখে[৯] মুখ ।
মাছের লোভত্ মাদ্‌রেঙ্গা[১০] জলত্ মারে ডুব ॥
মাছো চিনে মাদ্‌রেঙ্গা, পঙ্খী চিনে ডাল ।
মাছের লোভত্ কানী বগুলা[১১] ধরিছে ধিয়ান ॥
চিক্কণ বাগেডা[১২] দেখিল্ লেখা-জোখা নাই ।
চিত্র করি' খঞ্জনী পাখী আইচ্চে[১৩] ঠাঁই ঠাঁই ॥
এক পাখে[১৪] নেখা আছে কালু বিন্দাবন ।
এক পাখে নেখা আছে দশমুণ্ড রাবণ ॥
ঝেঁচু[১৫] বেটা পড়া-মুহা[১৬] পরার খায় অগলা[১৭] ।
শুকান ডালে বসিয়া কান্দে বাজ আর বগুলা ॥
পখীর মইধ্যে পোড়া সারো তিরির মইধ্যে[১৮] ত্যালকালো[১৯]
পুরুষো মইধ্যে অসিকো ভমরা[২০] ॥[২১]

১ 'ভুবন' নামীয় কোনো পল্লীকবির রচনা এটি ২ শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাঁটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত ।

৩ সারিকা, শালিক ৪ শালিক বিশেষ ৫ পেছনে ৬ গৃহস্থের পারাবত ৭ বাদুড় ৮ চামচিকে ৯ নীচের দিকে ১০ মাছরাঙা ১১ বক ১২ বাগৌড়ি পাখী ১৩ এসেছে ১৪ দিকে ১৫ ফিঙে ১৬ পোড়ামুখো ১৭ পরের মুখের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ১৮ স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৯ তৈলচিক্কণ ২০ রসিক ভ্রমরা ২১ বিজয় দাস ফকির (পোড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি)-এর কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত। ছড়াটি পাখীর তালিকা। বস্ত্র বা বস্তু বিশেষের ওপর অঙ্কিত পাখীর চিত্রাবলী একজন অপরজনকে দেখাচ্ছে। মূলতঃ ছড়াটি বিবরণধর্মী ।

৪২৭

॥ বানভাসীর ছড়া-গান[১], বীরভূম ॥

নদী সে দামোদর, বড়াকরে, করছে আনাগোনা।
দু' ধারে মিশায়ে তাজে শেরগড় পরগনা ॥
এল বান পঞ্চকোটে,—
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙলো রাজার গড়।
ছুড়্ ছুড়্ শবদে ভাঙে পর্বত পাথর ॥
মিশায়ে নালা খোলা—
মিশায়ে নালা খোলা, বানের খেলা, নদীর হল বল।
দামোদরে অড় হলো চৌদ্দতাল জল ॥
নদীতে আঁটবে কত,—
নদীতে আঁটবে কত, শত শত, নৌকা ভাসে জলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
ভাঙলো আদগাঁ ভাড়া—
ভাঙলো আদগাঁ ভাড়া, গোপের পাড়া, ভাঙলো বাবুই জোড়।
তারপর ভাঙিল যে নপুর বল্লভপুর ॥
যত সব ডুবলো গোলা—
যত সব ডুবলো গোলা, হাতে খোলা, নিলেক মহাজন।
দামোদরের বল দেখে উঠলো সিঙ্গেরণ[২] ॥

১ 'বানভাসীর গান' নামে মুদ্রিত। মন্তব্য ছিল: "সন ১২৩০ সালে পঞ্চকোট হইতে অম্বিকার ঘাট পর্যন্ত দামোদর নদের যে দেশপ্লাবী প্রবল বন্যা হইয়াছিল, এই পল্লী-কবির সঙ্গীতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। একশত তের বৎসর পূর্বে [বর্তমান হিসাবে ১৫৪ বছর আগে] রচিত পল্লী-কবির এই ছড়া বা গান, এখনও স্থানে স্থানে লোকমুখে রক্ষিত হইয়া ঘটনার জীবন্ত সাক্ষ্য রূপে বর্তমান রহিয়াছে।..."

"কায়স্থ কবি নফর দাস, বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অন্তর্গত বড়রা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার রচিত আরও ছড়া বা গান এখনও লোক মুখে প্রচলিত আছে।" ২ রাণীগঞ্জের নিকটে একটি ছোট নদী।

চল্‌লো বান যোজন জুড়ে—

চল্‌লো বান যোজন জুড়ে, ত্বরা করে, যেমন টাঙ্গন ঘোড়া।

আদগাঁ কুলুই[১] ভাঙ্গে মেজে ময়নাডাঙ্গা[২]॥

করলে চিপেপুরি—

করলে চিপেপুরি, আহা মরি, কি করলে ঠাকুর,

তারপর ! ভাঙ্গলো গিয়ে পুব্‌ড়া মদনপুর॥

চল্‌লো বান পূর্বমুখে, আপনসুখে, চল্‌লো দামোদর।

ছু' ধার মিশায়ে ভাঙ্গে, কাঞ্চন নগর॥

বাবুদের কাঠগোলাতে—

বাবুদের কাঠগোলাতে, নাটশালাতে, প্রবেশ করলো বান।

বাঁকার সঙ্গে সালিশ ক'রে ভাঙ্গলো বর্ধমান॥

বাজারে নৌকা চলে—

বাজারে নৌকা চলে, কুতূহলে, প্রলয় দেখি বান।

যে যেখানে আছে, পালায় ছাড়ি বর্ধমান॥

ভাঙ্গলো রাণীর হাটা—

ভাঙ্গলো রাণীর হাটা, দালানকোঠা, জজসাহেবের কুঠি।

রাজবাড়ী ছাড়ি বান যান গুটিগুটি॥

এবারে বান বাহির হলো—

এবারে বান বাহির হলো, রাত পোহালো, চল্‌লো মাঠে মাঠে।

গঙ্গায় মিশায় বান অম্বিকার ঘাটে॥

বারশ' ত্রিশ সালে—

বারশ ত্রিশ সালে, বরষাকালে, ভাঙ্গলো নফর দাস।

কেউ হলো পাতুড়ে রাজা—কারো সর্বনাশ॥[৩]

১ "'রামায়ণ', 'দুর্গাপঞ্চ রাত্র', 'আত্মবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা সুবিখ্যাত প্রাচীন কবি জগন্নাথ রায়ের নিবাস ভূমি" ২ বাগিগঞ্জ থেকে বাঁকুড়া যাবার রাস্তায় দামোদরের অপর তীরবর্তী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গ্রামসমূহ ৩ গৌরীহর মিত্র: বীরভূমের ইতিহাস: ১ম খণ্ড (১৩৩৩। পৃ. ১৯৮-২০১)। গৌরীহরের পিতা শিবরতন মিত্র এটি এর পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩২০। পৃ. ৭৪৪) পত্রস্থ করেছিলেন।

'বীরভূমের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৪৫) গৌরীহর একটি সাঁওতাল

৪২৮

বাববো বহবঃ সন্তি/ বাবুয়ানা পরায়ণা

হাবুবাবু সমো বাবু/ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।[১]

বিদ্রোহের ছড়া (পৃ. ১৬০-১৬৭) সঙ্কলিত করেছেন। রচনারীতির দিক থেকে দেখলে বর্তমান ছড়াটির সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়ার কোনোই পার্থক্য নেই। সেখানেও পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তি অবিকৃত রূপে পরবর্তী পঙ্‌ক্তি রূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের ভট্ট কবিদের কবিতার কথা উল্লেখযোগ্য। এইসব ভাট কবিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিলেন। ভাটেরা যে কোনো সমকালীন বিষয় নিয়ে ছড়া-কবিতা রচনা করে দ্বারে-দ্বারে তাই গেয়ে বেড়াতেন। এটাই এঁদের পেশা ছিল। এই রকম দুটি ভট্ট কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে. 'রাজনগর ধ্বংসের কবিতা' (শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা · বৈশাখ, ১৩৪৫। পৃ. ১-৮), 'নিরানব্বই সনের গিবাইর কবিতা' (শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : মাঘ, ১৩৪৬। পৃ :৮৬-১৩৯)। আমার সম্পাদিত 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) বইতে (পৃ ৪০০-৪০৮) সে দুটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য প্রাবন্ধিকের আলোচনাও উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বাল্যকথা (ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। পৃ. ২১৪-২১৮)।

একবার ১১ই মাঘের উৎসবে সত্যেন্দ্রনাথেরা জগমোহন গাঙ্গুলীর পলতার বাগানে যাচ্ছিলেন বনভোজন করতে। "আমাদের বাহনগুলি সারি সারি চলেছে—৮।১০টা বোট—আমরা রাত্রিশেষে পলতার বাগানে দলবলে গিয়ে উপনীত হলুম। বোটে আমাদের বিদূষক ছিলেন নবীনবাবু,··· তাঁর বিদ্রূপের বাণ বিশেষরূপে যাঁর উপর প্রয়োগ করা হচ্ছিল সে লোকটি বে—বাবু। আমি তাকে হাবু বলব। বাবু শব্দের নবীন বাবু এক ছড়া বেঁধেছিলেন তা হাবু বাবুতে বেশ খেটে যায়—[অতঃপর তিনি যে ছড়াটি উদ্ধৃত করেছেন, ওপরে তা সঙ্কলিত হয়েছে·]।

ওপরে উল্লিখিত 'নবীনবাবু' হলেন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন 'দেবেন্দ্র-সভার' একজন বিদূষক। নবীনচন্দ্র-রচিত অন্যান্য দু-একটি ছড়ার কথাও সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন (দ্রঃ ভারতী : পৌষ, ১৩১৯। পৃ. ৯৩৭-৯৪৮)।

৪২৯

হাঁড়ি কোণে মেঘ জমেছে, উড়ে যায় গরু।
বাগান বাড়ীতে ফুল ফোটে নাই, মুখটা কেন সরু ?
হাঁড়ি কোণে মেঘ নেমেছে, মামীর মামা পিসে।
কাপড়খানা কেড়ে নেবো, ঘাস কাটবি কিসে ?[১]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : সাহিত্য-বিষয়ক

তৃতীয় পর্যায় : কাহিনীর আভাসযুক্ত/অন্তর্ভুক্ত ছড়া

৪৩০

॥ শেয়ালের কাহিনীর ছড়া

সেইলী[২] রে সেইলী,
জমি যখন চষে, সেইলী উঠে বসে।
জমি যখন রোয়[৩], সেইলী তখন শোয়।
কাঁকুড় যখন চারায়,[৪] সেইলী থাকে পাড়ায়।
কাঁকুড় যখন লতায়, সেইলী বেড়ায় পাতায়-পাতায়।
কাঁকুড় যখন ফুল, সেইলী বাঁধে চুল।
কাঁকুড় যখন জালি, সেইলী বেড়ায় আলি-আলি।
কাঁকুড় যখন ডাব[৫], সেইলী মারে লাফ।
কাঁকুড় যখন ফুটি, সেইলী হেসে কুটি-কুটি।
—সেইলী করে ছুটোছুটি ॥[৬]

১ প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি : (ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৩। পৃ. ১৭-২৭)। লেখক এটিকে "বাঁকুড়া বনবিষ্ণুপুরের ভাষায় এক গ্রাম্য "কবিওয়ালা"র এক হাসির কবিতা" বলেছেন।

২ শিয়ালী ৩ রোপণ করে ৪ চারা হয় ৫ ডাঁশা হয় ৬ শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী (কাঁটাপুকুর, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা)-র কাছ থেকে অক্টোবর, ১৯৫৮ সনে সংগৃহীত। এই ছড়াটিতে যে কাহিনী বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে সে গল্পটি চলিত আছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা থেকে এ বিষয়ে যে 'কথা' টি পেয়েছি, তা এই : এক খেঁকশেয়াল মহাজনের কাছ থেকে টাকা

৪৩১

॥ খণ্ড-চিত্র ও চরিত্র-মূলক ছড়া ॥

আষাঢ়ো-শ্রাবণ মাসে নদীত্ নাগিল্ ভীড়[১]
যত গোদা বুদ্ধি করি' কাটিল্ বঁড়শীর ছিল্[২] ॥
কাঁহো নিলে[৩] সুতা-বঁশ্শী, কাঁহো নিলে চ্যারা[৪]
নদীর পাড়ত্ পড়ি' থাকা কটিকারীর[৫] মুড়া ॥
মাছো না পাইল্, টাছো না পাইল্, ঘুরি' আসিল্ বাড়ী।
আথার পাড়ত্[৬] বসিয়া গোদা গপ্প দিলেক ছাড়ি' ॥
এই কথা শুনিয়া গুছুনী রাগে হইল্ টং ;
ভাত-ঘাঁটা নাখিরি[৭] দিয়া মাথাত্ মাইরে ভাং।
ও গোদা চলিয়া গেইল্ ॥[৮]

৪৩২

বাঁশের আগালোত্[৯] ময়নাকোনা[১০] টেউ-টেউ করে।
ধরি' আনিয়া দিনু তাক্, ধ্যাপের্-ধ্যাপের্ করে।
হাট নিয়া গেনু তাক্, দেড় পাইসা কবে।
বঁটি দিয়া কুটে তাক্, ঘ্যাচের ঘ্যাচের করে।
নাউ দিয়া রান্দিনুং তাক্[১১], বেইশ সুন্দর নাগে ॥

ধার নিয়েছিল। ধান উঠলেই টাকা শোধ করে দেবে, এই ছিল শর্ত। খেঁকশেয়াল ধান রোপণ করল। ধানের শীষ্ বের হবার সময় যেই হল, অমনি সে বলতে থাকল: 'ধান, ভ্যার্-ভেরা,' অর্থাৎ ধান তুই বের হ'। ধান যেই লাল হল, অমনি সে বলতে থাকল : 'ধান, পাক্ পাক্ পাক্'। ধান যেই কাটা হলো, সে বলতে থাকল : 'ছাটিয়া ঠক্ ঠক্ ঠক্।' খেঁকশেয়াল ঋণের কিছুই শোধ না করে পালালো। তুলনীয় : 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-র 'বাজী ও শেয়ালনী' (সং ১১০) ছড়া।

১ নদীতে জল প্রচুর হল ২ বঁড়শীর জন্তে বাঁশের কঞ্চি কাটল ৩ কেউ নিল ৪ কেঁচো ৫ কাঁটা গাছ বিশেষ ৬ উনুনের ধারে ৭ ভাত নাড়বার 'নাকড়ি' অর্থাৎ কাঠি ৮ ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির পর অতিরিক্ত কথা : একটা মাছ ফক্সি গেইছে (ফস্কে গেছে), দুইটা মাছ টোপ খাইছে।

৯ আগায় ১০ ময়না পাখিটি ১১ লাউ দিয়ে তা রাঁধিলাম।

ভেক্কীর বেটী, ভেক্কীর বেটী, আর একনা দেও,[১]—
নাই বাপু, নাই বাপু, নিছি-কোছে খাও[২]।[৩]

৪৩৩

চেংড়াগুলা আইন্‌লেক[৪] দুরা[৫], বাইগন নাই গাছোতে[৬]—
থাক্‌ রে দুরা, তোক খামো ফির্‌ হাটে।[৭]
সগায়াগুলা[৮] যুক্তি করি' দুরাক থুইল্‌ বান্ধিয়া
থাক্‌ রে দুরা, তোক খামো রান্ধিয়া॥
বাইগন আনিলং হাট হাতে দুরা খাবার আশায়—
দড়ি ছিঁড়িয়া দুরা পালায়।
দুরা গেইল্‌ পালেয়া[৯], বাইগন গেইল্‌ শুকিয়া :
থাক বাইগন, তোক খামো পেল্‌কা[১০] করিয়া॥

৪৩৪

তামাকু পাতা লক্ষ্মীপাতা সেই পাতার বিনে[১১]।
পোদর লেঙ্গি[১২] বেচি সেই পাতারে কিনে॥
এক চুলুম[১৩] তামাকু ভরি তিন জনে খায়।
পথের পথ্যোয়া[১৪] বেটা ফিরি ফিরি চায়॥
ছালামালা[১৫] এড়ি বুর্গ্যা[১৬] বেটা হোক্‌কার[১৭] কাছে যায়।
একৈ টানে হাতত্‌ যেন গোডা[১৮] স্বর্গ পায়॥

১ আর একটু দাও ২ চেঁছে-পুছে খাও ৩ কোচবিহার জেলায় চলিত। অপর একটি ছড়ার শেষাংশে এই ছড়ার কথান্তর মেলে : বাঙার গছের[১] টুনিকোনা[২] টিউ-টিউ করে/হাট নিগি'[৩] বেচাং[৪]তে ড্যার পাইসা[৫] করে/হুনে ত্যালে আন্দোং[৬] তে বেশ মজা করে/ছেকা[৭] দিয়া আন্দোং তে ঘ্যাচের ঘ্যাচের করে।

১ কার্পাস তুলোর গাছের ২ টুনটুনি পাখিটি ৩ নিয়ে গিয়ে ৪ বেচি, বিক্রয় করি ৫ দেড় পয়সা ৬ রাঁধি ৭ কলাগাছের গোড়া পোড়ানো ছাইয়ের ক্ষারজল।

৪ আনল ৫ কচ্ছপ ৬ গাছে বেগুন নেই ৭ পরের হাটবারের দিন ৮ সকলে ৯ পালিয়ে ১০ রাজবংশীদের তরকারী বিশেষ।

১১ সেই পাতা বিনে ১২ পরণের নেংটি ১৩ কল্কী ১৪ পথিক ১৫ ঝুলিটুলি ১৬ বুড়োটা ১৭ হুঁকোর ১৮ গোটা।

হোকা গেছে মক্কা পুরে, নাগল[১] গেছে বনে।
কোল্‌কী গেছে শ্রীবৃন্দাবনে তামাকু খাবে কিসে॥
এ জনমে না খাইলুম তামাকু মনে হেলা করি।
মরিলে আর জন্ম যাবে হোকা-হোকা[২] করি॥[৩]

৪৩৫

আলুক মালুক শালুক রে, বন শালুকের পাতা
হরিণ বলে কেটে ফেলেছি, ছোটো ঠাকুরের মাথা॥
ছোটো ঠাকুরের জামা জোড়াটি রঘুনাথকে সাজে[৪]
রঘুনাথের মরণ হল বেলতলার ঘাটে॥[৫]

৪৩৬

॥ কাহিনীর সার-সঙ্কলনমূলক ছড়া ॥

কুম্ভকারে ধূম্রকার/ ধূম্রকারে মেঘাকার
মেঘাকারে উঠ্‌লো বাও/ তাতে ডুবাল সদাগরের না'ও॥[৬]

৪৩৭

হ্যাঁ, বুঝছি[৭] অনুমানে—
বুড়া চোরে নিছে[৮] ঢেঁকি ঘন জিবানে[৯]॥[১০]

১ হুঁকোর ডাঁটি ২ 'হুয়া হুয়া' অর্থাৎ শেয়ালের ডাক ৩ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' : (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২৭। পৃ. ৪৩০)।

৪ রঘুনাথের গায়ে মাপে ঠিক হয় ৫ রামরঞ্জন রায় (খুকুড়দহ, ঘাটাল, মেদিনীপুর)।

৬ হরগোপাল দাসকুণ্ডু · 'উত্তরবঙ্গে রামনবমী' (মানসী ও মর্মবাণী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। পৃ. ৩৮৩-৩৮৯)। "ভবচন্দ্রের রাজ্যে এক সদাগরের নৌকাডুবি হয়, সদাগর রাজার কাছে গিয়া কান্নাকাটি করিতে থাকে। রাজা মন্ত্রী গবচন্দ্রের প্রতি নৌকাডুবির কারণানুসন্ধানের ভার দেন। গবচন্দ্র অনুসন্ধান বা গবেষণা করিয়া রিপোর্ট দেন,—[অতঃপর সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] অবশেষে বেচারী কুম্ভকারকে লইয়া টানাটানি! · "

৭ বুঝেছি ৮ নিয়েছে ৯ ঘন-ঘন বিশ্রাম করতে করতে ১০ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। কাহিনীটি এই : রাতের বেলায়, গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাতী চলে যায়, তার পায়ের দাগ থেকে যায়। গ্রামের কেউ কখনো হাতী দেখে নি, কাজেই তার পায়ের

৪৩৮

ঘুঘু সই।
আপন পুত বুকে থুই / পরের পুত পিঠে থুই।
আপন পুত বানে ভাসে/পরের পুত জী'তে থাকে।
পুত্-পুত্-পুত্ ॥[১]

৪৩৯

ইতি-ঝি পুরুর পুরুর, টুক্লে বাকলে টুকাইয়া তুল্!
টুক্লে বাকলে টুকাইয়া তুল![২]

৪৪০

চৈতার বউ গো, ও চৈতাব বউ।
টেকা দে গো, টেকা দে গো।
তোর পোলা নে গো, তোর পোলা নে গো![৩]

ছাপ নানা কৌতূহল সৃষ্টি করল। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে ওই ছাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, সে যা উত্তর দেয়, তাই বর্তমান ছড়াটি। তার মতে, একটি বুড়ো চোর শারীরিক অসামর্থ্য বশতঃ ঘন ঘন বিশ্রাম করতে করতে একটি ঢেঁকি চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই ঢেঁকিরই ছাপ সেগুলো। মতান্তর: একটি হরিণ পায়ে 'চাকী' (রুটি গড়বার) বেঁধে নিয়ে দৌড়ে গেছে।

১ তরঙ্গিণী বসু-মজুমদাব (টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ)-এর কাছ থেকে সংগৃহীত। নিজের ছেলেকে বুকে এবং সতীনের ছেলেকে পিঠে নিয়ে 'ঘুঘু' নদী পার হচ্ছিল, নদীর স্রোতে বুকের ছেলে ভেসে যায়, কিন্তু পিঠের ছেলে জীবিতই থাকে। 'ঘুঘু' সন্তানের জন্যে হাহাকার করছে।

২ পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়: (প্রবাসী। অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। পৃ. ২৪৬)। ঘুঘুর ডাকের অনুকরণে ছড়া। পূর্ববঙ্গে চলিত।

৩ পূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়: (প্রবাসী। অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। পৃ. ২৪৬)। 'চৈতার বউ' বা পাপিয়ার ডাকের অনুকরণে ছড়া। পূর্ববঙ্গে চলিত।

৪৪১

যায়[১] নাই খায়[২] টিপ্‌টিপার ঘাও[৩]
তারে আগত্‌ যায়া[৪] টিপ্‌টিপাও।
একদিন উঠিনু[৫] মুই জ্যাঠ্‌ মাসের বানে[৬]
হাড়ী ব্যাটা ব্যাচেয়া খাইল্‌ মোক এক কাঠা ধানে।
ধুলাত্‌ নট্‌পটেয়া[৭] কাটিল্‌ কানকাশা[৮]
চিলা ব্যাটা দেখাইল্‌ মোক স্বর্গ-মর্ত্তে তামাশা॥
যে গুণেন[৯] চিলা ব্যাটা মোক নিয়া গেইল্‌ বিলে
ঝট্‌পটিয়া[১০] কোপালগুণে পড়িনু আবার জলে॥[১১]

৪৪২

দুফরি রান্দন[১২] ছাওয়ার কান্দন[১৩]
ছাগলটা আবো মেল্‌-মেলায়[১৪]—
পানিয়া-মড়া[১৫] হাল বাড়ীত্‌[১৬] ডেকায়[১৭]।[১৮]

১ যে ২ খায় নি ৩ বঁড়শিতে গাঁথা টোপ, মাছেরা যা ঠুক্‌রে-ঠুক্‌রে খায় ৪ তারই সম্মুখে গিয়ে ৫ উঠেছি, উঠেছিলাম ৬ জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্যায় ৭ ধুলোয় মাখামাখি করে ৮ কান্‌কো কাটল ৯ যে জন্যে ১০ ঝট্‌পট্‌ করে ১১ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত একটি 'ছিল্‌কা'। সাধারণতঃ প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিই বলা হয়। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (বাঙলা একাডেমি, ঢাকা। বৈশাখ, ১৩৬৯) বইতে (পৃ. ১৩৫-১৩৬) 'কচ্ছপ, শউল ও চ্যাং মাছের ছড়া' নামে প্রায় এই ধরণেরই একটি ছড়া সঙ্কলিত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ছড়াটিতে একাধিক চরিত্র আছে। কাহিনীটি 'কথা সরিৎ-সাগরে'র কোনো বিশেষ কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে আমার মনে হয়। ওই ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি এই : যে না জানে টিপের বাও / তার কাছে গিয়া টিপ্‌টিপাও।

১২ দুপুর বেলায় রাঁধা ১৩ কান্না ১৪ ছাগলের ডাকের অনুকার শব্দ ১৫ রুগ্ন, অসুস্থ, গালি বিশেষ ১৬ ধানের ক্ষেতে ১৭ ডাকে। গৃহবধূর কর্ম-ব্যস্ত জীবনের ছবি। দুপুরের রান্না রাঁধতে হবে, ছেলে কাঁদছে, ছাগল ডাকছে এবং কৃষিকর্ম-রত স্বামীকে ক্ষেতে ভাত-জল দিয়ে আসতে হবে। ঠিক সময়ের কাজ ঠিক সময়ে না করলে এমন কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে পড়তে হয় ১৮ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে চলিত।

৪৪৩

॥ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছড়া ॥

ইড়্‌কি বিড়্‌কি টাম্‌ টিড়্‌কি
টামের গছত্‌[১] বান্ধিনু ঘোড়া।
সেই ঘোড়া হইল্‌ পঁচকোল্‌[২]।
পাঁচ নাই দির্ঘল
শিশু বামন, শিশু চোর—
ট্যাঙ্‌না[৩] ব্যাটা হারামখোর ॥[৪]

৪৪৪

চিট্‌কন্‌ পোখি,[৫] চিট্‌কন্‌ পোখি, চিট্‌কন্‌ আধার খায়[৬]।
আজার বেটি ফান্দত্‌ পইস্‌সে[৭] তাক ছাড়েবা'[৮] যায় ॥[৯]

৪৪৫

ভাড়েয়া[১০] রে ভুড়ুৎ[১১]—
ছোয়ার বাদে[১২] চাউল ভাজিলো[১৩] নিজে কুড়ুৎ-কুড়ুৎ[১৪]![১৫]

৪৪৬

ফুৎ করি' উড়াইল্‌[১৬] তিতিলি পাখি,[১৭] গালাত্‌ গজমতি হার[১৮]
আরে হরিণা, কেনে নট্‌ফটাইস্‌[১৯] কান'—
তোর ক্ষুরে যে বধিলো হয়[২০] মোর প্রাণ ॥[২১]

১ পেয়ারা গাছে ২ চালতে ৩ ট্যাংরা মাছ ৪ পুষুণী দেবী (টুপামারী, জলপাইগুড়ি)-র কাছ থেকে জুলাই, ১৯৭২ সনে সংগৃহীত।

৫ পাখি বিশেষ, খঞ্জন ৬ অল্প পরিমাণে আহার করে ৭ রাজার বেটি ফাঁদে পড়েছে ৮ তাকে ছাড়াতে ৯ মনুলাল সিংহ (রাজগঞ্জ, জলপাই-গুড়ি)। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছড়া।

১০ পাখি বিশেষ ১১ ওই পাখির উড়ে যাবার অনুকার শব্দ ১২ ছেলের জন্যে ১৩ চাল ভাজলি ১৪ নিজেই তা কড়্‌মড়্‌ করে খাচ্ছিস ১৫ মনুলাল সিংহ (রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি)। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছড়া। কথান্তর: ছাওয়ার হাতত্‌ নাড়ু দিয়া / আপনে কুড়ুৎ-কড়ুৎ।

১৬ ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল ১৭ তিতির পাখি ১৮ তিতির পাখির গলার চতুর্দিকে যে দাগ আছে, তাকে গজমতির হার বলে কল্পনা করা হয় ১৯ নাড়াস ২০ বধ করতি ২১ মৃদুল দেব রায়কত (রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি)-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

৪৪৭

.. প্যাক্কেত্ শাকের ফুল[1] নিয়া সাঁহেব ডেকাছে[2] ।
না যাও মুই,[3] না যাও মুই, ঘাউয়া বিষাছে[4] ॥
এওার গাছোতে[5] টেঙুরি[6]'—'[7] ॥[8]

৪৪৮

ছেং প্যাং[9] তের—খাইত ক্যান বার।[10]
জুলী, আবো পিঠা দের[11] ॥[12]

৪৪৯

ক. সাত বোয়ের সাত আস্কে, খড়কের আগায় ঘি !
খুঁং খুঁং খুঁং করছ কেন, খেতে লাবছ কি ?
দাও দাও, ঢেকে রেখে দি ॥

খ. ভাত কড়-কড, ব্যন্নন বাসী, দুধ বিড়ালে খায়
তোমার খেলবার সাথী উপবাসী যায় ॥

৪৫০

কিচ্ছা, মিচ্ছা,[13] নাইর্ কলর চুচ্চা,[14]
বাপ্ ন হইতে পোয়া গেইয়ে মুচ্ছা[15] ।
এক্ সের মুন্, কিচ্ছা হুন্[16] ।

১ কচু গাছের হলদে রঙের ফুল, তা দিয়ে তরকারি রেঁধে খায় অনেকে ২ ডাকছে ৩ আমি যাব না ৪ ঘা ব্যথা করছে ৫ এরও গাছে ৬ চড়ুই পাখি ৭ অলেখ্য শব্দ ছিল ৮ ৺ ঢোকো রায় (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)-এর কাছ থেকে সংগৃহীত। ছড়াটির প্রারম্ভ ও প্রান্ত পাওয়া যায় নি, তবে আছে বলে শোনা যায়। শেষ পঙক্তিটি অন্য ছড়া থেকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করি।

৯ পিঠে ভাজার ধ্বন্যাত্মক শব্দ ১০ তের বার পিঠে ভাজার শব্দ পেলাম, খাবার বেলায় কেন বারটা ? ১১ দাও ১২ প্রতিভা : ১৩২২, মাস বা সংখ্যার নাম অনুল্লিখিত। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছড়া।

১৩ কেচ্ছা বা কাহিনী মিথ্যে ১৪ তা নারকোলের খোসার মতো অসার ১৫ বাপের জন্ম না হতে ছেলে মূর্চ্ছা গেল ১৬ শোন্।

এক্ সের মরিচ, কিচ্ছা ধরিছ্[১] ।
এক্ সের্ তেল, কিচ্ছা গেল্ ॥[২]

১ ধরিস ২ মোহাম্মদ এনামুল হক : ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন : বিচিত্রা। আশ্বিন, ১৩৩৫ । পৃ. ৫৫৮- ৫৭৫)। "রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া নানাবিধ গল্প গুজব করার পর ছেলে-মেয়েদের মাতামহীরা যখন ঘুমাইয়া পড়েন, ঔৎসুক্য পরবশ নাতি নাতিনীরা অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়াও যখন কোন উত্তর পায় না, তখন নিম্নলিখিত ছড়া গাহিয়া তাহারা মনকে প্রবোধ দেয়—[সেই ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

প্রথম পর্যায় : ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয়ক

৪৫১

চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম ;
বৈশাখেতে শশা মিঠা শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল,
শ্রাবণেতে খৈ দৈ, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে নারিকেল, কার্তিকেতে ওল ;
অগ্রহাণে নব অন্ন, চিঙ্গড়ি মাছের ঝোল।
পৌষ মাসে মূলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা।
ঘন আউটা দুধের সাথে বাসি পোড়া পিঠা।
মাঘেতে মকর মিঠা তেলে ভাজা সীম ;
ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্তাকুতে নিম॥[১]

৪৫২

চৈত্রে 'গিমা তিতা', বৈশাখে 'ঘিরত নালিতা'
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাঢ়ে দই, শাওণে 'ঘোল-পান্তা',
ভাদ্রে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে ওল, আঘণে খলিসার ঝোল,
পুষে কাঞ্জি, মাঘে 'তেল', ফাল্গুনে গুড়, আদা, বেল॥[২]

১ উৎপলাক্ষী দাসী : কোন মাসে কি খেতে হবে (প্রবাসী : মাঘ, ১৩২৮। পৃ. ৫৫৬)। "গত কার্তিকের [১৩২৮] প্রবাসীতে [পৃ. ৭৮] শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্ত মহাশয় পূর্ববঙ্গের সাধারণ গিন্নি মহলের চলতি কথা দিয়ে শিক্ষিতা গিন্নিঠাকুরুণদের পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন—'কোন মাসে কি খেতে হবে'। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন গিন্নি-মহলের মধ্যেও অনুরূপ একটি ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি এখানে দেওয়া গেল—"[ওপরে তা দিয়েছি]।

২ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩৩৪। পৃ. ১৯৪-১৯৭)। 'প্রত্যেক মাসের উৎপন্ন ফল খাওয়া উচিত'। এইজন্যেই বলা হয় : বার মাসের বার ফল / যে না খায়, সে যায় ঠেকের তল।

৪৫৩

বৈশাখে কাঁকুড় খাবি, খাবি পাকা আম
জষ্ঠেতে দিবি রে ডুব কমিবে যে হাম ।[১]

৪৫৪

ভাদ্র মাসে কুড়ার রাও, ঢুকে ঢুকে পানি খাও ।[২]

৪৫৫

ভাদ্রে তালের পিঠা, বড় মিঠা
খাইলে নাকি যায় যমের জেঠা ।[৩]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া

দ্বিতীয় পর্যায় : স্বাস্থ্য-বিষয়ক ছড়া

৪৫৬

ভাদ্র মাসের আট থেকে কার্তিক মাসের আট
এর মধ্যে যার জ্বর হল না, সে খয়ের গাছের কাঠ ॥[৪]

১ সোমেন্দ্রনাথ দাস কানুনগো : স্মরণীয় বৈশাখ (মাসিক বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ । পৃ. ২১০-২১২) ।

২ চন্দ্রকুমার দে : ভাদ্রের শৈশব স্মৃতি (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩২১ । পৃ. ৩৫৯-৩৬৪) । "ছেলেবেলায় ঠাকুরমার এই উপদেশটি মানিয়া চলিতাম । দুপুরবেলায় আকাশে যখন কুড়া পাখী সূক্ষ্ম চীৎকারে আকাশটাকে ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া দিত, তখন জলভরা গ্লাস মুখের কাছে ধরিয়া রাখিতাম , প্রত্যেকটা শব্দে এক এক চুমুক জল খাইয়াছি, পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তথাপি পানে বিরতি নাই ।" এটিকে একটি ডাকের বচন বলা হয়েছে ।

৩ চন্দ্রকুমার দে : ভাদ্রের শৈশব স্মৃতি (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩২১ । পৃ. ৩৫৯-৩৬৪) ।

৪ ভাদ্র মাসের আট তারিখ থেকে কার্তিক মাসের আট তারিখ পর্যন্ত মানুষের খুব অসুখ-বিসুখ হয় । যার হয় না, তার স্বাস্থ্য খয়ের কাঠের মতো দৃঢ় । তুলসীদাস সিংহ : পল্লীর বারমাস্যা (বসুধারা পত্রিকা : কার্তিক, ১৩৬৬) ।

৪৫৭

দাঁতে[1] তিত দাঁতে নুন, পেটের তরে তিন কোণ।
কানে কচু নাইরে[2] তেল, তার বাড়ীতে বৈদ্[3] না গেল্ ॥[4]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া
তৃতীয় পর্যায় : বাস্তুনির্মাণের বিধি-নিষেধ-বিষয়ক ছড়া

৪১৮

দক্ষিণ মুখো ঘরের রাজা / পূর্বদিক তার প্রজা।
পশ্চিম-মুখের মুখে ছাই / উত্তর-মুখের খাজনা নাই ॥[5]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া
চতুর্থ পর্যায় : শিক্ষা-বিষয়ক ছড়া

৪৫৯

যদি পড়া না শিখে পো / তবে সহবতে থো ॥[6]

১ অন্নে ২ নাভিমূলে ৩ বৈদ্য ৪ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : পৌষ, ১৩৩১। পৃ. ২৭২-২৭৪)।

৫ গুরুদাস সরকার : সেকালের গৃহস্থালী (ভারতী : বৈশাখ, ১৩২৪। পৃ. ৭৩-৮৫)। "যাহারা যশঃ কামনা করে তাহারা পূর্বদিকে গৃহদ্বার নির্মাণ করিবে। যাহারা পুত্রকন্যা ও গবাদি প্রার্থনা করে, তাহাদের গৃহ উত্তর-দ্বারী হইবে এবং যাহারা সকল প্রকার কাম্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহারা দক্ষিণ দ্বারী গৃহ নির্মাণ করিবে। পশ্চিম দিকে গৃহদ্বার নির্মাণ সেকালে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।... গৃহের পূর্বে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ (পাকুড়), পশ্চিমে ন্যগ্রোধ এবং উত্তরে উড়ুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষাদি রাখা অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইত।"

৬ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহবৎ শিক্ষা : (ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০০। পৃ. ৪৯৯)। এর কথান্তর মেলে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (প্রথম প্রকাশ : ১৮৬৩। 'বিংশ শতাব্দী' প্রকাশনী সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৩৬৮। পৃ. ৬০) বইতে : যদি না পড়িল পো / তবে নে গে সভায় থো।

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া
পঞ্চম পর্যায় : কৃষি-বিষয়ক ছড়া

৪৬০

কাজ নাই রে দাদা আমার এঁটেল-মাটির চাষকে।
কাড়ার[১] মতো গতর আমার শোলের মতো ভাসছে॥[২]

অনানুষ্ঠানিক ছড়া : নীতি, প্রবাদ, সুভাষিত উক্তিমূলক ছড়া
ষষ্ঠ পর্যায় : মানবচরিত্র-বিষয়ক ছড়া

৪৬১

মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পক্ষীর মধ্যে কাউয়া,
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত, যায় না ধরা পাওয়া॥[৩]

৪৬২

মুখ হল্‌সা ভেতর বুঝো দীঘল ঘোমটা নারী
পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল অতি মন্দকারী॥[৪]

৪৬৩

বাপ ভালা তার বেটা ভালা/ মা ভালা তার ঝি,
গাই ভালা তার বাছুর ভালা/ দুধ ভালা তার ঘি॥[৫]

১ মহিষের ২ যারা অপরের ক্ষেতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লাঙল চালায়, তাদের সুবিধে-অসুবিধে বিষয়ক ছড়া এটি। এঁটেল মাটিতে লাঙল চালানো বড়োই কষ্টের। তুলসীদাস সিংহ: 'পল্লীর বারমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা: আষাঢ়, ১৩৬৫)।

৩ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩৩৪। পৃ. ১৯৪-১৯৭)।

৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)। খনার বচন রূপেও এটি পরিচিত।

৫ প্রবাসী : আশ্বিন, ১৩৩৬। পৃ. ৫৬৭।

৪৬৪

ওলাউঠার নাড়ী, পণ্ডিতের দাড়ী
অবলের গাই—এ তিনের বিশ্বাস নাই ।[১]

৪৬৫

বিধবার হাতের কড়ি—কলস আর দড়ি ।[২]

৪৬৬

এক পয়সা নেই ঝুলিতে / লাফ মারছে কুলিতে[৩] ।[৪]

৪৬৭

নূতন নূতন তেঁতুল-বিচি, পুরাণ হোলে বাতায় গুঁজি ।[৫]

৪৬৮

যারে দিয়ে রামের মা, তারে তুমি চিন্‌লে না ![৬]

৪৬৯

সুপণ্ডিতের চাইর পুত / একটা মাতাল,—দুইটা ভূত ।
যেও একটা কিছু ভালা / সেও বাপেরে ডাকে শালার শালা ।[৭]

১ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : মাঘ, ১৩৩৩ । পৃ. ২১-২২) ।

২ কেদারনাথ মজুমদার : স্বামীসেবা (গল্প) (সৌরভ : কার্তিক, ১৩২৭ । পৃ. ১৫) ।

৩ পথে ৪ তুলসীদাস সিংহ : 'পল্লীর বারোমাস্যা' (বসুধারা পত্রিকা : চৈত্র, ১৩৬৬) ।

৫ নসীরাম দেবশর্মা [ছদ্মনাম] : বাঙ্গালায় 'মাসী' (ভারতবর্ষ : শ্রাবণ, ১৩২১ । পৃ. ১০০-১১২) ।

৬ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার : প্রবাদ প্রসঙ্গ (ভারতী : আশ্বিন, ১৩০৫ । পৃ. ৫৬১-৫৬৭ । উপকারীর উপকার বিস্মৃত হলে অথবা তাকে অবজ্ঞা করলে সে এই ছড়া বলে । রামের মা সুসন্তান রামকে নিয়ে গর্ব করত, কিন্তু যে স্বামী সেই সন্তানের জনক, তাকে অবজ্ঞা করত—এই কাহিনী থেকে ছড়াটির জন্ম ।

৭ কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য : প্রবাদের আবাদ (সৌরভ : ভাদ্র, ১৩৩৪ । পৃ. ১২৪-১২৭) ।

৪৭০

ক. আর গাব খাবো না। গাব তলায় যাবো না॥

খ. গাব খাবো না খাবো কী। গাবের মতন জিনিষ কী॥[১]

৪৭১

কাঁঠাল পাকা ভাইংগ্‌লে[২] আঠা, খালেই[৩] মধু মিঠা।
যারা ভাব জানে, যারা প্রেম জানে—
তারা মূলেই লিল[৪] কিনে॥[৫]

৪৭২

কি কথা কইতে কী কথা কব / কথা কয়ে কি মান খোয়াবো?
যখন কথার যোগ্য হব / তখন এক কথাতে বশ করব[৬]॥

৪৭৩

নদীর শভা[৭] ধান-বরিষা, ভীথির[৮] শভা ফুল।
বামনের পৈতা শভা, নারীর শভা চুল॥[৯]

৪৭৪

ঘরের শোভা ছিকোয়া[১০] পাতিলা[১১] বেড়ার শোভা আর[১২]।
তাহাতুন[১৩] অধিক শোভা সোয়ামী আছে যার॥

১ কাক 'গাব' ফল খেতে ভালোবাসে। পাকা গাবের বিচি কাকের গলায় বেঁধে গেলে কাক অস্বস্তি অনুভব করে, 'ক'-অংশে তাই বলা হয়েছে। তারপর গাবের বিচি নেমে গেলে কাকের মনোভাব 'খ'-অংশে ব্যক্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে চলিত। শেষ পঙ্‌ক্তির কথান্তর (প্রতিভা : ১৩২২, মাসের নাম অনুল্লিখিত) : গাবের চেয়ে মিঠা কি?

২ ভাঙলে ৩ খেলেই ৪ নিল ৫ হীরালাল মাহাত (জয়পুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

৬ দিবাকর ভৌমিক (গ্রাম : সাঁমচক্। ধূরখালি, হাওড়া)।

৭ শোভা। কথান্তর : শোভা; ৮ বীথির ৯ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে চলিত।

১০ শিকা ১১ মাটির হাড়ি ১২ বেড়া বাঁধবার 'বাকাটি' ১৩ তার চেয়ে।

নিশির শোভা শশী যেন মাথার শোভা চুল।
আকাশের শোভা তারা যেন গাছের শোভা ফুল॥
দারগার শোভা দারগগিরি। পেয়াদার শোভা লালপাগড়ি॥
হালিয়ার[১] শোভা হালেতে। জালিয়ার[২] শোভা জালেতে॥
নারীর শোভা অলঙ্কারে—যার যে শোভা করে॥[৩]

৪৭৫

আলসিয়া রে আলসিয়া, তোর খোলোই গেইল্ ভাসিয়া।
যাউক ক্যানে ভাসিয়া, মুই গড়াইম্ একটু বসিয়া॥[৪]

৪৭৬

মাছ, কেনে আট্‌কিটাইস্[৫] তুই জলত্?
জাখইত্[৬] মারিম্, খলইত্ ধুইম্,
কাটারী খেকেরেয়া[৭] কাটিম্, কাঠ খোলাত্ ভাজিম্,
দাঁতের সুখে চাবাইম্, জিহ্বার সুখে নড়্বড়াইম,
গলা দিয়া মোর পেটত্ ডুবাইম্।
পেটের আগুনে করডে করডে[৮] হজম কবিম্,
পুকটি দিয়া ডাঙ্গাত্ ফেলাইম সাজেয়া গু
সেলাছিনি[৯] চিনিবো তুই কেমন বঁধু
কাউয়ায়-চিলায় ঠোঁতৎ করি[১০] খাবে তোক
তাতেও তোর শেষ না হবে ভোগ॥[১১]

১ চাষার ২ জেলের ৩ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত: 'প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা' (সাহিত্য। আশ্বিন, ১৩২১। পৃ. ৪২৬-৪২৭)। সঙ্কলনে নাম ছিল: 'শোভার বিবরণ'। চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

৪ বার্তা পত্রিকা (জলপাইগুড়ি। ২৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চলিত।

৫ লুকিয়ে থাকিস ৬ মাছ মারবার বাঁশের যন্ত্র বিশেষকে বলে 'জাকই' ৭ দা দিয়ে ঘষে ৮ ক্রমে ক্রমে ৯ তখন তো ১০ ঠোঁটে ক'রে ১১ মনোমোহন রায় সঙ্কলিত 'বুড়া বুড়ীর কথা' (জলপাইগুড়ি) বই থেকে উদ্ধৃত (পৃ. ২০)।

৪৭৭

॥ ছড়া সম্পর্কে ছড়া ॥

ক. শোলোক মোলোক বাঁশের গোঁজা।
ভাতটি খেলেই পেটটি সোজা ॥[১]

খ. শোলোক শিখিনু বালক কালে।
শোলোক ভুলিনু ঘর কুটিলে ॥[২]

৪৭৮

॥ পান-গুবাকের ছড়া ॥

প্রশ্ন : পান খাও পান্ত্যা[৩] ভাই, কথা কও ঠারে
পান-চুণ-সুপারীর জন্ম কি প্রকারে ?
পান খাওয়ার পর যদি না কও কথা
ছাগ হয়ে মুড়ে খাও সড়া গাছের[৪] পাতা।

উত্তর : গুয়া ধরে থোপা-থোপা / পান ধরে বরে[৫]—
সেই পান লিয়া ব্যাচে সহর বাজারে,
পানের উৎপত্তি কথা যদি কৃষ্ণ কয়,
দিনে দিনে বারে[৬] পুত্র যত বৃষ্টি পায়,
সভার মধ্যে কৃষ্ণ কথা কয়,/পান শুদ্ধ হয় ॥[৭]

১ "বালক কালের মামুলি বিদ্রূপ এই যে, যদি কেহ শ্লোক বলিতে বলিল অমনিই বলিতে হইবে—" [ক-সংখ্যক শ্লোকটি] ২ "এই সকল স্থলেই শ্লোক অর্থে—ছড়া"। এটিকে "প্রাচীনদের একটি শ্লোক" বলা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার : জয়দেব (নবজীবন : চৈত্র, ১২৯৩। পৃ. ৫৬২-৫৭৪)। 'ক' অংশটি এবং তার অতিরিক্ত 'কথা' 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-তেও মেলে (সং ৪৩১) : পানটি খেলে আরো মজা।

৩ যে পান বিক্রয় করে ৪ ? ৫ বরজে ৬ বাড়ে (?) ৭ মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন : প্রাচীন ছড়া (বঙ্গলক্ষ্মী : ফাল্গুন, ১৩৪৮। পৃ. ১৫২-১৫৪)। পাবনা জেলায়-চলিত। প্রশ্নোত্তর-মূলক ছড়ারও অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

৪৭৯

॥ বর্ণ লেখার ছড়া ॥

গণ্‌শা কৃড়ি ক ·· / মাথায়-পাগ্‌ড়ী ঙ···
ছেলে-কাঁকালে ঋ··· / পালান-পিঠে ঞ···
হেঁটভাজা দ ·· / কান-মোচ্‌ড়ান ধ···
পেট-কাটা ষ ·[১]

৪৮০

হাঁটুয়া[২] ভাঙা দ / গাল-চিরা[৩] প / কানমুচড়ি ধ
নারিয়লের থোকা[৪] শ / প্যাট্‌কাটা ষ ॥[৫]

৪৮১

স্বরে-অ, স্বরে আ, ইন্দুর ধরেয়া,
ধইর্‌তে ধইর্‌তে গেইল্‌ পলেয়া ॥[৬]

৪৮২

এক ছিল আনো /তার পিঠে চেপেছে দানো ॥···[৭]

১ দীনেন্দ্রকুমার রায় : পল্লীচিত্র (চতুর্থ সং : ফাল্গুন, ১৩৪৬। প্রথম সং ১৩১১। পৃ. ২০। দ্রঃ সেকালের পাঠশালার কাহিনী : ভারতী : বৈশাখ, ১৩০৩। পৃ. ৮)। কথান্তর ও অতিরিক্ত কথা : 'হাঁটুয়া-ভাঙা দ' : জলপাইগুড়ি। 'গাল-চিরা প' (ঐ)। 'কাঁধে বরফি ধ'। অতিরিক্ত কথা : ক্তে পুঁটুলে শ /হল্‌হলে হ।—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় : শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ : (আর্যদর্শন : অগ্রহায়ণ, ১২৯১। পৃ. ৪৮৮)।

২ হাঁটু ৩ গাল-চেরা ৪ নারকেলের কাঁদি ৫ বিভিন্ন বর্ণের আকৃতির বিশেষত্বকে উল্লেখ করে তা মনে রাখবার জন্যে রচিত ছড়া। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত।

৬ আবুল হোসেন (ডাউকীমারী, জলপাইগুড়ি)। কথান্তর : সলেয়া—সলেয়া[১],···/···পলেয়া ॥

১ ইঁদুর।

৭ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার বেথাপ বর্ণমালা (সবুজপত্র : অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। পৃ. ৬৬৭-৬৮১)। এই প্রবন্ধে 'আনো'র প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে : "অ-র" "আনো" নাম থেকে অনুমান হয় যে ওর পূর্বতন উচ্চারণের

৪৮৩

॥ গণনার ছড়া, জলপাইগুড়ি ॥

ওড়া[১], বড়ো হিসাবের গোড়া।
ওটা,[২] মানষিক বেদি-সেদি[৩] ভাথে দেয় ঘাটা[৪] ॥ ··

৪৮৪

॥ কালীপ্রস্তুতের ছড়া ॥

তিল ত্রিফলা সিমূল ছালা[৫] / ছাগদুগ্ধে করি মেলা
লৌহপাত্রে লোহায় ঘসি[৬] / ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি[৭] ॥[৮]

৪৮৫

হাতে কালী মুখে কালী—
লিখে এলি, আমার বনমালী।[৯]

সঙ্গে বাংলার এককালে পরিচয় ছিল। দাক্ষিণাত্যে এই বর্ণ মূর্ধ থেকে উচ্চারণ হয় এবং সেখানে বর্ণমালা আওড়াবার সময় ওকে "অণ" বলে পড়া হয়। টাকরার উপর দিকে জীভ নিয়ে যেতে গেলে ণ শব্দ বার হবার আগে একটা অ শব্দ আপনি এসে পড়ে। ·"

১ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি। যা কিছুই গুণতে হয়, এই অঙ্গুলির প্রথম পর্ব থেকেই গুণতে হয় ২ তর্জনী ৩ এখান-ওখান, এদিকে-সেদিকে ৪ পথ দেখিয়ে দেয়। তর্জনীর কাজ হল, মানুষকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। হাতের পাঁচটি আঙুল সম্পর্কেই প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে এইরকম ছড়া আছে। বাকীগুলি সংগ্রহ করতে পারি নি।

৫ শিমূলের ছাল ৬ ঘর্ষণ করি ৭ মসী ৮ গৌরীহর মিত্র: বীরভূমের ইতিহাস: ১ম খণ্ড (১৩৪৩। পৃ. ১৪২)।

তুলনীয়: 'খুকুমণির ছড়া' (১৬শ সং)-র 'কলি ঘোটন' (সং ২৩৭। পৃ. ১৬৬) ছড়া।

৯ রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: রাম-অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারম্ভ (ভারতী: জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। পৃ. ৯৯-১২৩)। "বিহারী পাঠশালার বালকগণের মধ্যে এইরূপ সংস্কার আছে যে পট্টী [কাষ্ঠ ফলক] মুছিয়া যে যত খড়ী মুখে ও শরীরে রাখিতে পারিবে, তাহার বিদ্যা তত অধিক শীঘ্র বাড়িয়া যাইবে। ব্যবস্থা

৪৮৬

দ-কে হল জ্বর/২২ জন ডাক্তার এল
বসতে দিল লাঠি, খেতে দিল বটি।
উপর দিয়ে ছিট্‌নী দিলে হল একটি পাখী ॥[১]

৪৮৭

॥ মিশ্রভাষার ছড়া ॥

শ্যাম going মথুরায় গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়
বলে your okroor uncle is a great rascal[২].

দেশের পাঠশালায়,'তালপত্রে লিখিতে লিখিতে শিশুগণের "ক লেখো—মুছে ফ্যালো" ইত্যাদি বলিয়া, হস্তদ্বারা মুছিয়া, মুখে, পেটে ও মস্তকের কেশে কালী মাখিবার অভ্যাস, বহুদিন পর্যন্ত দৃষ্ট হইত। কিন্তু পূর্বপ্রথার নিদর্শন স্বরূপ, একটি মেয়েলী ছড়া বঙ্গ কুলকামিনীদের মুখে আজও শ্রুত হওয়া যায়। পাঠশালা হইতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া গৃহ প্রত্যাগত শিশুপুত্রকে জননী সস্নেহে বলিতেছেন—" [সেটি ২৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]। কথান্তর : হাতে কালি, মুখে কালি / ছেলে আমার লিখে এলি।

১ অমৃত : শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ : ১৩৬৯। পৃ. ৫২৮। কথান্তর : দ-র হল মাথা-ব্যথা/সঙ্গে এল জ্বর/দিল সে লেপমুড়ি।/দাঁড় বেয়ে গেল ডাকতে/এল ২২ জন কোবরেজ/বসতে দিলে পিঁড়ি/খেতে দিলে বড়ি ॥

২ অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা (দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ. ৩২৭-৩২৮, পাদটীকা)। তিনি এ ধরণের ছড়াকে 'কৌতুক করিয়া' রচিত 'দো আঁশলা ছড়া' বলেছেন। এই ধরণের ছড়াকে বলা যায় 'Macaronic' ছড়া অর্থাৎ পাঁচমিশেলি বা 'জগা খিচুড়ি' ছড়া। এ এক পুরোনো সাহিত্যিক ষ্টাইল, সংস্কৃত এবং অন্যান্য সাহিত্যেও তা দেখা যায়। উনবিংশ শতকে কৌতুক করবার জন্যে অনেকেই এ রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন, রূপচাঁদ পক্ষীর নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌতুক করবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথও বাঙলা-হিন্দী, বাঙলা-ইংরিজি মিশিয়ে কবিতা লিখেছেন।

৪৮৮

Two men ধাপুস্ ধুপুস্ / one man বেঁকে দেয়
তবে সাহেব rice হয় ।[১]

৪৮৯

॥ সেকালের ইংরেজী শিক্ষার ছড়া ॥

লার্ড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর/ প্লৌম্যান চাষা ।
এলিফেন্ট হস্তীরে কহি/ কোকম্বর শশা ॥[২]

৪৯০

চার্চ চার্চ উডেন চার্চ/আলমাইটি নো হাথ,
থৌজেণ্ড মেন ক্রাই ক্রাই / জয় জগন্নাথ জগন্নাথ ॥[৩]

৪৯১

॥ পত্রিকার মূল্য চেয়ে ছড়া ॥

সভাজন শুন, গ্রাহকের গুণ, পড়িতে আগ্রহ দড় ।
পড়া হলে শেষ, পৈসা দিতে ক্লেশ, মনের আক্ষেপ বড় ॥
'সপ্তা'—'হপ্তা' 'সিন্ধু'—'হিন্দু' এক যদি হয় ।
'গ্রাহক' 'গ্রাসকে' তবে ভেদ কেন রয় ॥
শুন গো গ্রাহক কি তব রীতি ।
টাকা দিবে নাক এ কোন নীতি ॥

১ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর : চাল (মাসিক বসুমতী : আশ্বিন, ১৩৬৩ । পৃ. ৯৯৬-৯৯৮) । " · ইংরাজরা কিছুকাল পূর্বে চাল সম্বন্ধে এতটা অনভিজ্ঞ ছিল যে, কোম্পানীর আমলে যখন বড় 'সাহেব' তাঁহাব আফিসের বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, rice বা চাল কি কবিয়া তৈয়াবী হয়—বড বাবু তখন বেশ জবাব দিয়াছিলেন—"[সেটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে] ।

২ "এইরূপ ছড়ায় তখনকার ইংরেজি শিক্ষা হইত, বাক্যাবলীতে এইরূপ ছড়াও থাকিত । তখন সাহেবের কাছে রথযাত্রাব ছুটির কথা বলিলে, রথের রহস্য সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে হইত ।"

৩ কাশীনাথ (উপন্যাস) : (প্রদীপ : চৈত্র, ১৩০৮ । পৃ. ১০৫-১১৩) । দ্রঃ রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' । দ্রঃ বঙ্গের কবিতা, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৩২৭ ।

জয় গ্রাহক নিচয়, জয় গ্রাহক নিচয়।
রোকা কড়ি চোকা মাল আনিহ নিশ্চয়।
দাম দাও, নাম চাও, তত তব চাই রে।
মূল্য দেয়, শীঘ্র দেয়, হেন লোক নাই রে।
কে সুহৃৎ, বিপরীত, যেই রীত, কাল।
সাড়ে ছয়, নয় নয়, কিছু হয়, ভাল।
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে মূল্যটা দে।
ত্বরা দে ত্বরা দেয় টাকা কটা দে।
যদি মূল্য মিলে হয় হর্ষ মনে।
অতি কাতর তোটক ছন্দ ভণে।[১]

১ 'চনকচূর্ণ' (সাধারণী : ১৯শে মাঘ, ১২৮১ । পৃ ১৬৫)। 'সাধারণী'র গ্রাহকদের কাছ থেকে মূল্য পাওয়া যাচ্ছিল না। 'চনকচূর্ণ' বিভাগে তাই নিয়ে রসিকতা করে ছড়া কাটা হয়েছে। "আমি বলিলাম, "পাঠকমহলে, 'চেনাচুরের' বিলক্ষণ আদর আছে,…আমি একটা 'চনকচূর্ণ' লিখি, লিখে আমাদের দুঃখের কথা জানাই। ..আমি অমনি ভাবিতে লাগিলাম ; বাগিরামের পিতামহ ভারত রায়ের ছড়া সকল উচ্চৈস্বরে আওড়াইতে লাগিলাম" [অতঃপর উল্লিখিত ছড়াটি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

৪৯২

॥ পুণ্যপুকুর ব্রতের ছড়া ॥

॥ বর প্রার্থনার ছড়া॥

হে হর পার্বতী, দাও মাগো সুমতি,
আমি অতি হীনমতি, নাহি জানি স্তবস্তুতি।
সাবিত্রী সম সীতা, হই যেন পতিব্রতা
মনের সুখে করি ঘর, দাও মাগো এই বর ॥[১]

৪৯৩

॥ অশ্বথ পাতা ব্রতের ছড়া ॥

ক. স্নানের পূর্বের ছড়া ;

অশ্বথ পাতা কুঞ্জলতা,/ শ্যামা পণ্ডিতের ঝি[২]
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়/ সাত বৌ যায় সাত দোলায়,
কর্তা যান দেব হস্তীতে,/ গিন্নি যান রত্ন সিংহাসনে,
ঠাকুর-ঠাকরণ যান দোলনে ॥

খ. অশ্বথের নানা ধরণের পাতা নিয়ে ডুব দেবার ছড়া[৩] :

পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ পাকা চুলে সিন্দুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

১ শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : চৈত্র, ১৩১৯। পৃ. ১২৩৭-১২৩৮)। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে বৈশাখের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এই ব্রত করা হয়। ক্রমান্বয়ে চার বছর ধরে তা উদ্‌যাপন করতে হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন সকাল বেলায় উঠোনের এক পাশে একটি গর্ত খোঁড়া হয়। একটি কাঁটাওয়ালা বেলগাছের ডালে সিঁদুর দিয়ে তাতে পুঁতে দেওয়া হয়। তারপর ওই গর্তে জল ঢেলে নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দিয়ে পুজো করা হয়। ছড়া বলে ফুলগুলি গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। সকলের শেষে বর প্রার্থনা করা হয়।

২ কথান্তর : চাকুন্দে সুন্দরীর কন্যা ৩ এক একটি করে অশ্বথ পাতা মাথায় নিয়ে ডুব দেবার সময় সেই পাতার নাম ধরে ছড়া বলতে হয়।

ঝুরঝুরে পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ মণিমুক্তার ঝুড়ি পায়।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে নাইলে/ কমলপুত্র কোলে পায়।
উড়াইতে পারলে ইন্দ্রের শচী হয়,/না পারিলে কুকের দাসী হয়॥[১]

৪৯৪

॥ গোকল ব্রতের ছড়া ॥

ক. গোকল গোকুলের ধনী/ ব্রত করে রাজরাণী॥

খ. গোকল গোকুলে বাস/ গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস॥

গ. তোমারে পূজিয়া গাভী বাতাস করি পাখা।
আমার হাতে থাকে যেন সুবর্ণের শাঁখা॥[২]

১ শ্রীমতী বেণুকাবালা দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। পৃ. ৮১৯-৮২১)। চৈত্রের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত করা হয়। ক্রমান্বয়ে চার বছর তা উদ্‌যাপন করতে হয়।

২ শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী : গোকল ব্রত (ভারতী : আশ্বিন, ১৩১৯। পৃ. ৬৪৮-৬৪৯)। ["শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত এই ব্রতের একখানি বহুবর্ণে মুদ্রিত চিত্র এই সংখ্যার মুখপত্রস্বরূপ দেওয়া হইল"]। "এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালিকারা তিন গোছা দূর্বাঘাস, সরিষার তৈল, বাটা হলুদ, সিন্দুর, চন্দন, তিনটা পাকা কলা আর একখানি পাখা লইয়া গাইগরুর নিকট যায়। তারপর ঐ গাইগরুর শিঙে ঐ তেল, ও কপালে সিন্দুর, চন্দর মাখাইয়া দেয়। তাহার পর নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া গরুর চারখানি ক্ষুর ধুইয়া দেয় :—[ক-সংখ্যক ছড়া]। তৎপরে নীচের ছড়াটি বলিয়া দূর্বাঘাসের সহিত কলাটি হাতে করিয়া গরুকে খাইতে দেয় [খ-সংখ্যক ছড়া] এইরূপ তিনবার করে। তৎপরে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া গরুকে পাখা দিয়া বাতাস করে :—[গ-সংখ্যক ছড়া] তারপর নমস্কার করে।"

৪৯৫

রণেএয়ো ব্রতের ছড়া ।

ক. সিঁদুরের কৌটো ধরে : রণে রণে এয়ো হবো ।
ধানের পুঁটুলি ধরে : জনে জনে সো[১] হবো ।
ধনের পুঁটুলি ধরে : আকালে লক্ষ্মী হবো ।
আম বা সুপুরি ধরে : সময়ে পুত্রবতী হবো ।
[এই রকম তিনবার বলতে হয়]

খ. প্রণামের ছড়া :
রণে এয়ো ব্রত করে যেন হই স্বামীর সো ।
যতকাল থাকব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো[২] ॥

গ. রণে এয়ো সনে যান ।
আকালের ভাত সকালে খান ॥
সরু ধানে কাল পুতে ।
জন্ম যায় যেন এয়োতীতে ।
এক গলা গঙ্গার জলে, শুক্ল মল্লিকে ফুলে
মরণ হয় যেন সোয়ামী পুত্রের কোলে ॥[৩]

৪৯৬

॥ 'চাঁপাচন্দন' ব্রতের ছড়া ॥

চাঁপা চন্দনে পূজলে হরি/ শোকদুঃখ না পায় নারী !
জন্মিয়ে না দেখি যেন বন্ধুর মরণ,
জন্মিয়ে না দেখি যেন গুরুর মরণ,

১ প্রিয় ২ নোয়া, লোহা ৩ শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী ; ব্রতমন্ত্র (ভারতী : আষাঢ়, .৩১৯ । পৃ. ২৬৮ ২৬৯) । "এই ব্রত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তি পর্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম । . " "বালিকারা·· একটি পিটুলির ঘর আঁকিয়া নেকড়ায় বাঁধা গোটা ধনে একটি ঘরে, নেকড়ায় বাঁধা ধান একটি ঘরে, সিন্দুর কৌটা একটি ঘরে, এবং একটি কাঁচা আম কিংবা সুপারি একটি ঘরে রাখে। · "

অগ্নিতে না দেখি যেন আমার মরণ !
স্বর্ণ শয্যা নিঃসতা ঘর[১], শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় অমর।
বৈশাখের চাঁপা গঙ্গার জল, এই পেলে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর।[২]

৪৯৭

। যমপুকুর ব্রতের ছড়া ।

ক. যমরাজ সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
যমা গোদার মা, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি ॥
মেচো, মেচুনী সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
ধোপা ধোপানী সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
হাঙর, কুমীর সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
চিলে, চিলে, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
কাগা, বগা, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।
কুঁচে, কচ্ছপ, সাক্ষী থেকো যমপুকুরটী করি।

খ. গর্তের মধ্যে জল ঢালবার ছড়া :
এ ঘাটটি কার ? বাপ মার।
এ ঘাটটি কার ? শ্বশুর শাশুড়ীর ॥
এ ঘাটটি কার ? পাড়া প্রতিবাসীর।
এ ঘাটটি কার ? স্বামীর আর আমার ॥
এ পুকুরটি কি ?—ভাগ্যবতী পূজে জল ঘটিটি দি ॥

গ. প্রণামের ছড়া :
যমরাজ ধর্মরাজ এই বর চাই।
তোমার তাড়না হতে মুক্তি যেন পাই ॥[৩]

১ যে সংসারে সপত্নী নেই ২ শ্রীমতী নিরুপমা দেবী : পল্লীবালিকাদের উৎসব (ভারতী : বৈশাখ, ১৩১৯। পৃ. ২৩-২৫)। "চন্দনে হরির চরণ অঙ্কিত করিয়া ততোধিক শুভ্র মল্লিকা ও সুবর্ণ বর্ণ চম্পক দ্বারা বিবাহিতা বালিকারা হরিহরের পূজা করে।" এ ব্রত বৈশাখ মাসের।

৩ শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। পৃ. ৮১৯-৮২১)। "এই ব্রত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত করিতে হয়। এই ব্রত চারি বৎসর করা নিয়ম। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন সকাল বেলায় ব্রতকারিণী একটি চারি কোণা গর্ত

৪৯৮

॥ কুল্-কুলতি ব্রতের ছড়া ॥

ক. কুল্-কুলতি কুলবতী,/ তুলসী তলায় দিয়ে বাতি,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাতি ॥

খ. প্রণামের ছড়া:
হরিপ্রিয়া তুলসী দেবী করি নমস্কার।
অন্তিম কালে কোরো মাগো ভব নদীপার ॥[১]

করিয়া তাহার চারিদিকে পাঁচ রকম কলাই (মুগ, মাস কলাই, ছোলা প্রভৃতি) ছড়াইয়া দেয়। গর্তের মধ্যে কলা গাছ, কালকচু ও সাদাকচুর গাছ, ধানগাছ, কলমী শাক, শুশনিশাক এবং মাটির নির্মিত হাঙর, কুম্ভীর, কুঁচে, কচ্ছপ রাখিয়া দেয়। পুকুরের (গর্তের) চারিকোণে চারটি সুপারী, চারখানি হলুদ এবং চারটি বেঁচিকড়ি রাখিয়া দেয়। চারিধাবে চারিটা করিয়া ষোলটা মাটীর পুতুল বসাইয়া দেয়, কাটি পুঁতিয়া উহার উপরে চিলে, ঢিলে, কাগা, বগা বসাইযা দেয়। এককোণে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। তৎপরে পূজা করিতে বসে। /"ধান, মান, কলা, কচু, হলুদায় নমঃ"/এই বলিয়া একটি ফুল ঐ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই রকম তিনবার করে। ·"

১ রেণুকাবালা দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : আষাঢ়, ১৩১৯। পৃ. ২৪৮-২৪৯)। "এই ব্রত বালিকারা আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত করে। এই ব্রত চারি বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যার পর তুলসী গাছের তলায় কুলপাতা পাতিয়া হাতে করিয়া প্রদীপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে :—[ক-সংখ্যক ছড়া] প্রদীপটি তিনবার ঘুরাইয়া তাহার পর কুলপাতাব উপর রাখিয়া দেয় এবং নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া তুলসী নমস্কার করে :—[খ-সংখ্যক ছড়া]। 'ভারতী' পত্রিকাতেই (চৈত্র, ১৩১৯। পৃ. ১২০৭-.২৩৮) রেণুকাবালা এ বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানিয়েছিলেন। তাতে তিনি এই ব্রতের "আর একটি রূপ"-এর পরিচয় দিয়েছেন : "প্রদীপটি তিনবার ঘুরাইয়া কুলপাতার উপর রাখিবার পর ব্রতকারিণী একটি ফুল লইয়া সেটি কুলপাতার উপর হাতে ধরিয়া বলে, 'কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশে ধূপ দীপায় নমঃ'। "তৎপরে ফুলটি তুলসীগাছের গোড়ায় ফেলিয়া দেয়। এইরূপ তিন বার করে"। পরে নীচের ছড়াটি

৪৯৯

॥ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ছড়া, পূর্ববঙ্গ ॥

স্বর্গে হুলুথুল মর্কে[১] জোকার[২] / না যাইও ভাই যমদুয়ার,

যম দুয়ারে দিয়া কাঁটা / বোনে দেয় ভাইয়েরে ফোঁটা ॥[৩]

৫০০

॥ পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বরাত্রিতে "পৌষ আগ্‌লাবার" ছড়া, বীরভূম ॥

পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান কাপাসে ঘর আলা,

এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না

পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, না যাও ছাড়িয়ে,

গাল ভরে পান দেবো কটোরা পূরিয়ে

আঁদারে পাদারে পৌষ, বড় ঘর চেপেই বোস্ ॥[৪]

বলিয়া তুলসীগাছের তলায় জল ঢালিয়া দেয়:—'তুলসী তুলসী নারায়ণ/ তুমি তুলসী বৃন্দাবন।/তোমার শিরে ঢালিলাম জল। অন্তিমকালে দিও স্থল।' "তারপর নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া প্রণাম করে:—'তুলসী তুলসী মাধবী-লতা/কহ তুলসী কৃষ্ণ কথা। /কৃষ্ণকথা শুনিলাম কানে/দ্বাদশ দণ্ডবৎ তুলসীর চরণে।'

১ মর্ত্তে ২ উলুধ্বনি ৩ নলিনীকুমার ভদ্র: বাংলার লোকসংস্কৃতি—ব্রত ও উৎসব (প্রবাসী: আশ্বিন, ১৩৫৬। পৃ. ৫৫৬-৫৫৯)।

৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ: মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)। "বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুপ্রধান পল্লীতে পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে "পৌষ আগ্‌লাবার" প্রথা প্রচলিত আছে। স্থানভেদে এ সম্বন্ধে নানারকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা গীত হইয়া থাকে। আমাদের বীরভূমি অঞ্চলে নিম্নোক্ত ছড়াটি প্রচলিত,—[সেটি ওপরে উদ্ধৃত করেছি] পৌষ মাস "ধান কাপাসে ঘর আলো" করিলেও বৈশাখ, অগ্রহায়ণ প্রভৃতি পুণ্য মাস থাকিতে পৌষকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এত আগ্রহ কেন?.. ছত্রিশ অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া 'ঠ'-এর মাথায় মাত্রা দেওয়ার মত এই পৌষের এত আদর কেন? আমাদের অনুমান হয়, "মাঘী পূর্ণিমা"র সহিত ইহার কিছু সংশ্রব আছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই "মাঘী পূর্ণিমায়াং কলি যুগোৎপত্তি"। এই জন্যই বোধহয় কলিভয়ভীত নরনারী মাঘের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পৌষ মাসকে সম্মান দেখাইয়া কলির প্রতি আপনাদের আন্তরিক অপ্রীতির পরিচয় প্রদান করে।"

৫০১

॥ মকরসংক্রান্তির পূর্বরাত্রিতে তোষলাকে নিয়ে গ্রাম-ভ্রমণের ছড়া ॥

তিরিশ দিন রাখিলাম মাকে তিরিশ সলতে দিয়ে গো,
আর রাখিতে নারিলাম মাকে মকর আইছেন নিতে গো।
এতদিন রাখ্‌লাম মাকে মা বলে' ত ডাকলে না।
যাবার সময় নগড় নিলে, মা না হলে যাব না ॥[১]

৫০২

॥ তুঁষ-তুষলি ব্রতের 'মালসা' ভাসাবার ছড়া ॥

তুঁষ্-তুষ্‌লি গেল ভেসে/ বাপ মার ধন এলো হেসে ॥
তুঁষ তুষ্‌লি গেল ভেসে/ শ্বশুর শাশুড়ীর ধন এলো হেসে ॥
তুঁষ তুষ্‌লি গেল ভেসে/ আমার স্বামীর ধন এলো হেসে[২] ॥

৫০৩

॥ সূর্যব্রতের ছড়া ॥

প্রথম দল ॥ কৈ যাওলাল ঠাকুর কি না বর দিয়া।
অমুখে রাখ্‌ছে[৩] তোমায় হাতে পায়ে ধরিয়া ॥

১ রাধারমণ চক্রবর্তী . তোষলা বা তুষু পূজা (প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩২৯। পৃ. ৬২৮)। "মকর সংক্রান্তির পূর্বরাত্রিতে বালিকাগণ তোষ্‌লার মাল্‌সার চারিধারে বৃত্তাকারে প্রদীপ সাজাইয়া তোষ্‌লাকে চতুর্দোলে বসাইয়া গ্রাম ভ্রমণ করায় এবং সংক্রান্তির উষায় নিকটবর্তী নদী তড়াগ বা পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে আসে। উক্ত রাত্রি ভ্রমণকালে বালিকাগণ যখন করুণস্বরে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে [সেই ছড়াটি ওপরে সঙ্কলিত হল] তখন মনে হয় আজি যে কাল্পনিক দুঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ, ভবিষ্যতে সেই দুঃখ অনুভব ও সহ্য করিবার জন্যই যেন বালিকা প্রস্তুত হইতেছে।"

২ শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী : ব্রতমন্ত্র (ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। পৃ. ৮১৯-৮২১)। এই ব্রত অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে পৌষের সংক্রান্তির দিন শেষ করতে হয়। একাদিক্রমে চার বছর ধরে করতে হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূজো করে, ছয় বুড়ি ছয় গণ্ডা গোলা একটা মালসায় রেখে, তাতে আগুন দিয়ে দিতে হয়। ছ' বুড়ি ছ' গণ্ডা পিঠে খাবার সময় ওই মালসা নিজের পেছন দিকে রেখে দিতে হয়। খাওয়া শেষ হলে ওপরের ছড়াটি বলে মালসাটি কোনো নদী বা পুকুরে ভাসিয়ে দিতে হয়।

৩ রেখেছে।

দ্বিতীয় দল ॥ হোক তার ধনজন পরমায়ু বিস্তর।
সকালেতে হোক তার তীর্থ দরশন ॥
পুত্র দরশন, বিবাহ দরশন, বিদ্যা দরশন…১

৫০৪

॥ হঁ্যাচড়া পুজোর ছড়া ॥

হ্যাচোড়া ঠা'য়াণ লো' ক্যাচোড়া চুল,
তাতে শোভে লো, নোয়া-গাড়ীর২ ফুল।
নোয়াগাড়ীর ফুল স্যা লো, বেড়ার মাটি…৩

১ সত্যভূষণ দত্ত: সূর্যের ব্রত (প্রবাসী: বৈশাখ, ১৩২১। পৃ. ৩৬-৩৭)। "সূর্যের ব্রত বৎসরে দুইবার বৈশাখ ও মাঘ মাসে করা হয়। উক্ত দুই মাসের রবিবারে ব্রত করিতে হইবে।" "ব্রতীদিগকে ব্রতের পূর্বদিন একবেলা নিরামিষ ভোজন করিয়া সংযম করিতে হইবে। ব্রতের দিবস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বসিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে এবং ঘরের ভিতর প্রবেশও নিষেধ · [পাদটীকা. "এই ব্রত মালদহ জেলাতেও প্রচলিত ছিল; স্থানীয় নাম "থাড় ব্রত"—প্রবাসীর সম্পাদক"] "ব্রতীরা ব্রতের দিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করেন। স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্রে (কেহ কেহ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন) "চাটা" (প্রদীপ) হাতে নিয়া করপুটে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সূর্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া সূর্যের নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন।… কেহ কেহ বা ভিজা কাপড়েই দাঁড়াইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। সূর্যাস্তের পূর্বে পুনরায় স্নান করিয়া পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন করিয়া রাখেন। ঠাকুর আসিয়া পূজা ও যজ্ঞ শেষ করিলে পর, ব্রতীদিগকে 'যজ্ঞকুণ্ড' সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তারপর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া উপরিউল্লিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া বলিতে থাকেন" [সে ছড়াগুলি ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে]।

২ কোন স্থাননাম (?) ৩ পল্লীগ্রামে হঁ্যাচড়া পূজার ছড়া: (মাসিক বসুমতী: ভাদ্র, ১৩৪৭। পৃ. ৫২৪-৫২৬)। (দ্রঃ ৭৬-সংখ্যকে ছড়া)। "হ্যাচড়া দেবী ফরিদপুর অঞ্চলের বালক বালিকাগণের উপাস্য দেবতা;…এই হ্যাচড়া দেবী তাহার উপাসক গণের মতই শিশু;…"প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে বাসগৃহের দাওয়ায় কোন সুবিধাজনক স্থানে পরিবারস্থ বালক বালিকাগণ কর্তৃক দোলমঞ্চস্থিত ভিটার অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র বেদী নির্মিত হয়। সেই ভিটার উপর

৫০৫

সুয্যা ওঠে রে উদায় দিয়্যা।/ বাঁওন বাড়ীর পেছন দিয়্যা॥
বাঁওন ছেমড়ি লো বড় সিয়ান/ পৈত্যা যোগায় রে নিত্তি বিয়ান।[১]

৫০৬

ব্যাত্যা শাক[২] তুলতে গেলাম সাপে ছোবল মারে।
সাপের জ্বালায় এলাম ঘরে ননদে ঠোকা মারে॥
ননদের জ্বালায় গেলাম গোয়ালে গরু শিং নাড়ে।
গরুর জ্বালায় গেলাম কানাচ মশা ভিন ভিন করে॥

দেশী কুল গাছের (স্থানীয় ভাষায় বরই-শাখা) একটি অনতিবৃহৎ শাখা প্রোথিত করিলে তাহাদের ধারণা হয়—এই বদরী শাখায় হ্যাঁচড়া দেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন। অনন্তর মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর—সন্ধ্যা অতীত হইবার পূর্বেই সেই শাখাটিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়।…সমগ্র মাস ধরিয়া পূজা চলে।…বালক বালিকারা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সুর করিয়া সমস্বরে কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এক রাশি দূর্বাসহ উল্লিখিত ফুলের ["উহা কোন কোন বৃক্ষের পত্রাঙ্কুর, কিশলয়, মঞ্জরী, শিস্ প্রভৃতি"] অঞ্জলি দিলেই দেবীর পূজা শেষ হইল।…বিশেষতঃ বালিকাগণেরই এ পূজায় অধিকার।"…"এই-ভাবে যথানিয়মে প্রতিদিন পূজা করিবার পর মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে পূজারিণীগণ সেই শুষ্ক বদরীশাখাটি, তাহার সম্মুখে সংস্থাপিত ঘটটি, এবং এক মাস ধরিয়া যে সকল দূর্বা দ্বারা দেবীর পূজা করা হইয়াছে—সেই শুষ্ক দূর্বাগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া দেবীপ্রতিমার ন্যায় নদীর জলে বিসর্জন দিয়া আসে; তবে যদি বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন বিসর্জন দেওয়ার অসুবিধা হয়—তাহা হইলে শ্রীপঞ্চমীতে অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।…হ্যাঁচড়া পূজায় যে সকল ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা পনেরটি;… [আমরা এই সঙ্কলনে নির্বাচিত পাঁচটি ছড়া দিলাম]।

১ "প্রত্যুষে বালিকা হ্যাঁচড়া পূজা আরম্ভ করিয়া এই ছড়াটি সঙ্গিনীদের সহিত সমস্বরে আবৃত্তি করে,—…ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে সেকালে ব্রাহ্মণের কন্যারা প্রত্যহ প্রভাতে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে পৈতা সরবরাহ করিত।…"

২ বাস্তু শাক।

মশার আলায় গেলায় বাছে বাপে ধবল ছাড়ে।
বাঘের আলায় গেলায় গাছে কুম্যারে জল নাড়ে॥

৫০৭

চরকা দিলাম চরকি দিলাম নাটাই দিলাম দানে,
তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে চক্কোবর্তীর কানে—
বাবা বাঁক দিলে না ক্যানে ?[১]

৫০৮

লাল ঠাকুরের বাগানে কে রে কাটে পাত।
লাল ঠাকুরের ছোট ভাই শিব্যাই কাটেন পাত॥
ও শিব্যাই শিব্যাই রে, আর কেটো না পাত।
ঘরে আছে সোনার থাল তাইতে খাওগা ভাত॥
তোমরা সাতো ভাই খাইবা ভাত
আমরা সাতো বুন ফ্যালাবো পাত॥

৫০৯

॥ ইটাকুমারের ছড়া, শিলাইদহ উত্তর নদীয়া ॥

ক. আবাহনের ছড়া :
ইটেকুমারের মা গো ভিঁটে বেঁধে দে
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবে, সাজনে এনে দে।
সাজনে আনতে গেল বুড়ি, পথে প'ল খেওয়া
সেই খেওয়া ধুয়ে নিলেন চৈতন পুরের দেওয়া॥
সাঁঝ এলো রে সাঁঝ লাগাতে,/কেন রে সেঁঝে এতক্ষণ ?
বাড়ীর কাছে রে পাটবন/তাই ভাংতে রে এতক্ষণ॥
চাঁদ ওঠে উদয় দিয়ে/বামুন পাড়ার ঐ পাশটি দিয়ে।
বামুন মেয়ে গো কেন শুয়ে/পৈতে জাগাও লো চাঁদের বিয়ে।
এক কড়ার খুঁটী মাছ দুই কড়ার ঘি,
সাঝ পিদিম লাগাও রে বামুন পাড়ার ঝি।

১ "সেকালে পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক রমণীকে চরকায় সুতা কাটিতে হইত বলিয়া বিবাহের সময় কন্যাকে চরকা, চরকী এবং নাটাই উপহার দান করিতে হইত.."

বামুন ঝি, বামুন ঝি, বলে এলাম তোরে
(আমার) সোনার গৌরাঙ্গের বিয়ে হবে শনি মঙ্গল বারে ॥

খ. আরতির গান :

আরতি করতে কি-কি লাগে,
হাতি ঘোড়া পঞ্চমালা ঝুমুর ঝুমুর করে।
ইটেকুমার ঠাকুর তুমি হর মনোরমা,
রূপেগুণে ত্রিভুবনে নাই তব সীমা।
স্বর্গেতে বসতি তব মর্তেতে বিহার
দয়া করে বাপের বাড়ি এসো একবার।
পাদ্য দেব অর্ঘ্য দেব, আর আচমনী জল
কর্পূর-বাসিত জল, মিষ্টি মিষ্টি ফল ॥
ভাল্‌তো ঠাকুর বসন বড় রে।

গ. প্রার্থনার গান, টানা সুরে গাইতে হয় ·

ঘাটা বাড়ীরে সারি সারি/ আমার বাপ মারে রাজেশ্বরী
রাজেশ্বরীরে দিলো বর—/ ধান চাল দিলো রে গোলাভর ॥

ঘ. প্রণামের ছড়া :

এবারকার মত যাওরে ঠাকুর ফোটপচাড় নিয়ে।
আরবার এসো রে ঠাকুর শঙ্খ সিঁদুর নিয়ে ॥
ফোটপচাড়ের নাও যায় রে আদাড়-পাদাড় দিয়ে,
শঙ্খ সিঁদুরের নাও চলে রে মধ্যি গাং দিয়ে ॥

ঙ. আশীর্বাদ প্রার্থনা :

তুমি ঠাকুর কালো—/অমুকের করো ভালো ॥[১]

১ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : ইটাকুমারের ছড়া (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ, ১৩৫৪। পৃ. ৮৫-৮৬)। নদীয়া ও ফরিদপুরে ফাল্গুন মাস এবং রাজশাহীতে চৈত্র মাস ব্যেপে কিশোর-কিশোরীরা এই ব্রত করে। 'ইটাকুমার' কোথাও 'দেব', কোথাও 'দেবী'। কেউ একে বলেন 'বনদুর্গার' পূজো, কোথাও আবার এঁর নাম 'বসনবড়ু'—অর্থাৎ বসন্তরোগের দেব বা দেবী। এর সঙ্গে তুলনীয় ঘেঁটু এবং 'ন্যাচড়া ঠাকরুণে'র পূজো। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত একটি ছড়ায় 'ইটাকমল' নামটি মেলে। এ পূজোয় লাগে পলাশ, শিমুল, মাদার, ভাঁট প্রভৃতি বন্য ফুল। ভোগ হয় মুড়ি-মুড়কি-পাটালি দিয়ে। ছড়াই এ পূজোর মন্ত্র।

৫১০

॥ জন্মাষ্টমীর সং-এর ছড়া, ঢাকা ॥

আহ্লাদে বাচোস্ নারে প্রাণ।
তোর ভাইএর নামে আমার নাম॥[1]

৫১১

॥ শিবের গাজনের ছড়া-কাটাকাটি, বর্ধমান ॥

সঙের প্রশ্ন : ধূল সাপট[2] খাটিলে ভাই, ধূলের কহ নাম
কোন্ ধূলেতে তুষ্ট তব কৃষ্ট বলরাম ?
কোন্ ধূলেতে তুষ্ট তব অমর নগর।
কোন্ ধূলেতে তুষ্ট তব ভোলা মহেশ্বর ?

উল্লিখিত প্রবন্ধে লেখক শিলাইদহ অঞ্চলে (উত্তর নদীয়া) প্রচলিত রূপটির বিবরণ দিয়েছেন। মাঘ সংক্রান্তির দিন ছেলে মেয়ে দল বেঁধে কুল গাছের একটি বড়ো ডাল কেটে নিয়ে এসে ঢেঁকিঘর বা গোলাঘরের পাশে বেদী রচনা করে পুঁতে দেয়। আল্পনা দেওয়া হয়। গোটা ফাল্গুন মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় পূজো করা হয়। গাছটি নানা ফুলে সাজানো হয়। প্রথমে পাঁচটি শিমুল ফুলের পাপড়িতে তেল মাখিয়ে কাজল পড়ানো হয়। পাঁচটি প্রদীপ ও পাঁচটি বন্য ফুল দেওয়া হয়। ব্রতী-ব্রতিনীরা সেই কাজল পরে, বেদীতে কাজলের দাগ দেয়।

মাঝখানে নানা লৌকিক ও অনানুষ্ঠানিক ছড়া গাওয়া হয়। অনাবশ্যক বোধে আমরা তা উদ্ধৃত করি নি। শুধু এইটুকু লক্ষ করবার বিষয় যে, পূজো ও আমোদ এসব ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে।

১ সমালোচনা (বঙ্গবাণী : ফাল্গুন, ১৩৩২। পৃ. ১০৫)। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৩২) প্রকাশিত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষের 'নির্বাণ' নামে কবিতাটির ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা উপলক্ষে 'সুদর্শন' এই ছদ্মনামধারী সমালোচক কর্তৃক সংকলিত। তাঁর মন্তব্য: "…ঢাকার জন্মাষ্টমীর সং মনে পড়িল। সে বহুকালের কথা। মিছিল বাহির হইয়াছে। লোকে লোকারণ্য। তখনকার এক নূতন লেখককে কিঞ্চিৎ আক্কেল দিবার জন্য এক সং তৈরি হইয়াছে। গরুর গাড়ীর উপর একটি লোক কলম কানে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতার নাচিয়া নাচিয়া তারস্বরে আবৃত্তি করিতেছে; তার দুটি লাইন এই :" [সেটি ওপরে উদ্ধৃত করেছি]।

২ গাজনের একটি অঙ্গ। ভক্ত এই অনুষ্ঠানে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়।

সন্ন্যাসীর উত্তর : ধূল সাপট খাটিলাম ভাই ধূলের গুন গাই।
গোধূলেতে তুই আমার কৃষ্ণ বলরাম ॥
পবন ধূলেতে তুই আমার অমর নগর।
বিভূতি ধূলেতে তুই আমার ভোলা মহেশ্বর ॥[1]

৫১২

॥ শিবের গাজনের ছড়া-কাটাকাটি, বর্ধমান ॥

সঙের প্রশ্ন : উত্তর থেকে আসছ তোমরা / করে কোলাহল।
চোর নও ডাকাত নও / সঙ্গে আছে ঢোল ॥
ছাগল নও পাগল নও / গলায় কেন দড়ি।
রাখাল নও বাগাল নও / হাতে বেতের ছড়ি ॥
কে দিল যজ্ঞের কৌটা / কে দিল সিন্দুর।
ঘন ঘন মাথা নাড়ো / কুরকুটে ইন্দুর ॥
সন্ন্যাসীর উত্তর : উত্তর থেকে আসছি মোরা / করে কোলাহল।
চোর নই, ডাকাত নই / সঙ্গে আছে ঢোল ॥
রাখাল নই বাগাল নই / হাতে বেতের ছড়ি।
ছাগল নই পাগল নই / —গলায় উত্তরী ॥
শিব দিল যজ্ঞের কৌটা / দুর্গা দিল সিন্দুর
ঘন ঘন মাথা নাড়ি / সন্ন্যাসী ঠাকুর ॥[2]

১ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় · পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন (অলকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮। পৃ. ৭৮১-৭৮৩)।

২ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন (অলকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮। পৃ. ৭৮১-৭৮৩)।

["সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের পাট কাঁধে করিয়া গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়,—তাহাদের সঙ্গে থাকে একদল সঙ। তাহারা নানারকম অভিনয় দেখাইয়া পল্লীবাসীর মন তুষ্ট করে ।··গাজন উৎসবে সন্ন্যাসীদের কাজ হইল পাট ঠাকুরের পূজা করা ও নানারকম ছড়া বলিয়া বেড়ানো। সঙের দল নাচ গান কত কি করে ।·· শিব ও ধর্ম নিরঞ্জনকে উপজীব্য করিয়া গাজন উৎসবের ছড়াগুলি বিরচিত। এইসব ছড়া ধর্মমঙ্গলের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। শূন্য পুরাণ, শ্রীধর্মপুরাণ প্রভৃতি যে-সব পুঁথি আমরা পাইয়া

৫১৩

। গাজনের ব্যঙ্গের ছড়া[১], বর্ধমান।

আহা, কি বা আর্টের[২] নমুনা, তুমি দেখালে এবার মামা।
আর ওই শান্তিপুরের শত্তারের বত্তাপচা ভালকানা।
আর ওই নিচের ধাপে এলাজ্-বেলাজ
কেউ নাকুয়া, কেউ ভাঙা ঠ্যাং
আবার চলে ওরা লগাং-লগাং[৩]।
ডুবতে শিব গোরের জলে, কতো সাধ্যি-সাধনা করে—
আমার মিস্ত্রী এলো কলঘরে।[৪]

৫১৪

আশ ঘোড়া পাশ ঘোড়া, তার সাক্ষী ভীমে ছোঁড়া,
অষ্টমী নবমী ছুটি, ছেলে ছুটোর জনমতিথি,
ক্যাপার চৌদ্দ কেপীর আট, বুঝে সুঝে কাল কাটু,

থাকি, সে সবের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে।…সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের পাঠ কাঁধে করিয়া গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হয় এবং অনেক ছড়া বলিতে থাকে। সঙের দল তাহাদের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলে এবং অনেক গান করে। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর সহিত কথা কাটাকাটি করে [কথা কাটাকাটির যে নিদর্শন লেখক উপস্থিত করেছেন, ওপরে তা সঙ্কলিত হয়েছে] ..বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে এখনো ইহার প্রচলন আছে।"

১ শিবের গাজনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেব-দেবীর ও মানব-মানবীর ব্যঙ্গাত্মক মূর্তি নির্মিত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে 'থাকা'। বিভিন্ন গ্রামের বা একই গ্রামের বিভিন্ন দলের স্বতন্ত্র মূর্তি থাকে। এইসব মূর্তির নির্মাণ-দক্ষতা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, ব্যঙ্গ করে ছড়াও কাটা হয়। প্রত্যেক দলই নিজ-নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে শান্তিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে কারিগর নিয়ে এসে প্রয়োজন মতো 'থাকা' তৈরী করিয়ে নেয়। বর্তমান ছড়াটি অপর একটি দলের মূর্তিকে ব্যঙ্গ করে রচিত ২ আর্টের ৩ এইসব মূর্তি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুটি গোরুর গাড়ির চলমানতাকে নির্দেশ করছে ৪ তরুণকুমার মাজিল্যা (কুড়মুন, বর্ধমান)।

ইথে যদি করিস হেলা, চলে যাস ঠুঁটোর মেলা,
তাও যদি না পারিস, ভগার খালে ডুবে মরিস্ ।[১]

৫১৫

। বাউল-অবধূতদের চিমটায় আরতির মন্ত্র-ছড়া ।

বীর অবধূত / নিতাই অবধূত
কায়োয়াধারী, / কাম্বাধারী, / প্রভু অটলবিহারী ।[২]

৫১৬

।'বদর পীরে'র উদ্দেশে ছড়া, চট্টগ্রাম ।

আমরা আছি পোলাপান / গাজি আছে নিগাপান,[৩]
সাহেব গঙ্গা দরিয়া, / পাঁচ পীর বদর বদর বদর ।[৪]

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্যগাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩ । পৃ. ২৪৩-২৪৬) । "প্রথমতঃ, শয়ন, উত্থান, পার্শ্ব পরিবর্তন ও ভৈমী একাদশীর কথা । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বা জন্মাষ্টমী এবং সীতানবমীর উল্লেখ করিয়া থাকেন । ক্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট—শিব-চতুর্দশী এবং শারদ শুক্লাষ্টমী, (যাহা বীরাষ্টমী দুর্গাষ্টমী) নামে খ্যাত । ঠুঁটোর মেলা শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র এবং ভগার খাল হইতেছেন শ্রীগঙ্গাদেবী । শিব, দুর্গা, জগন্নাথ এবং গঙ্গাদেবী ঐরূপ অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ এই ছড়াটি আনুষ্ঠানিক হিন্দুর কতকগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছে ।"

২ রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ : টাঙ্গাইলের প্রাচীন সাহিত্য (সৌরভ : কার্তিক, ১৩৩৪ । সঙ্কলন : প্রবাসী : পৌষ, ১৩৩৪ । পৃ. ৩৪৩-৩৪৪) । "সহজিয়া মতে যাহারা সিদ্ধ, তাহাদিগকে অবধূত বলে । ইহাদের সাধারণ নাম বাউল । বাউলেরা মাথায় দীর্ঘ চুল রাখে, হাতে একটা লৌহ বলয় ধারণ করে । ইহারা শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডন করে না । লোহার একটা দীর্ঘ চিমটা সর্বদা সঙ্গে রাখে এবং সন্ধ্যাকালে ধূপধূন দিয়া এই চিমটার আরতি করে । সেই সময়ে উচ্চকণ্ঠে—[অতঃপর ওপরের মন্ত্র-ছড়াটির উদ্ধৃতি] এই মন্ত্র আবৃত্তি করে । . "

৩ নেগাবান, দয়ালু ৪ 'জনৈক বাঙ্গালী' : বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান (প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩১৪ । পৃ. ১৯১-২০০) । "বদর পীর—পূর্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । চট্টগ্রাম সহর এই 'বদর আউলিয়া'র খাস অধিকার ভুক্ত । তথাগত কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই 'বদর সাহেবে'র সেবা দিয়া থাকেন । নৌকার মাঝিরাও ডাকিয়া থাকে,—"[অতঃপর যে ছড়াটি লেখক উদ্ধৃত করেছেন, ওপরে তা সঙ্কলিত হল] ।

৫১৭

॥ ধান গাছের সাধ-ভক্ষণের ছড়া, খুলনা ॥

আমড়া দিছি বটের পাতা, ধান ফলেছে লক্ষী কাটা ;
ধান রে সাধ খা, সাধ খা ॥
আশ্বিন গেল কার্তিক এল, মা লক্ষী গর্ভে বসল ;
ধান রে, সাধ খা, সাধ খা ॥[১]

৫১৮

॥ বৃষ্টি নামাবার ছড়া, খুলনা ॥

আয় বিষ্টি ঝেঁপে/ ধান দেব তোর মেপে।
ধান হল কামার বাড়ী/ আয় বিষ্টি আমার বাড়ী ॥[২]

৫১৯

॥ রোদ তোলার ছড়া, বীরভূম ॥

রোদ আয় রে ছটাফটা, ছাগল দেব গোটা-গোটা,
শুষ্যির মা বুড়ি, কাঠ কুড়াইতে গেলি,
ছ'খানা কাপড় পেলি, ছ' বৌকে দিলি,
সে বৌ কই ? শাকে জল দিচ্ছে , সে শাক কই ?
গরুতে খেয়েছে , সে গরু কই ? বনে গিয়েছে ,
সে বন কই ? পুড়ে গিয়েছে , সে ছাই কই ? উড়ে গিয়েছে ,
কলাগাছের আড়ে, কলা পড়ে দুপ্ দাপ্
বুড়ি খায় কুপ্ কাপ্
খেঁকশিয়ালির লোটা কান ডুবো ভরা রোদ আন্ ॥[৩]

১ একান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সিঙ্গবনিয়া, বাগেরহাট, খুলনা)। আশ্বিন মাসের শেষ দিন সকালে বা সন্ধ্যায় নারী-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে ধানের ক্ষেতে গিয়ে এই ছড়া মন্ত্রবৎ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করা হয়। নারীরা একটি কুলোয় ধান-দূর্বা-সিঁদুর-কাজল ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে ধান গাছকে বরণ করেন। পুরুষরা ছড়া আবৃত্তি করেন। ধান গাছকে এখানে মানবী রূপে দেখা হয়েছে।

২ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা)।

৩ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩ । পৃ. ২৪৩-২৪৬)। "শীতের প্রভাতে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট পল্লীবালক-বালিকাগণ প্রায় প্রতিদিনই সমস্বরে এই ছড়াটি আবৃত্তি করিতে থাকে।..."

৫২০

॥ অপরের পিঠে ঘা হবার মন্ত্র-ছড়া, ২৪-পরগণা ॥

পিঠে-পড়ুনীর ঘা পিঠে পড়ে / ছাাক্ ছোঁক্ জল পড়ে ।
ওর পিঠে ফুরিস্ নে[১]— / কার দোহাই ?—মা কালীর দোহাই ॥[২]

৫২১

॥ 'বাণ' মারার মন্ত্র-ছড়া, খুলনা ॥

যে বাণেতে বিঁধেছিল অন্ধ-মুনির পুত্র সিন্ধুমুনি
সেই বাণেতে বিঁধিলাম আমি ।
আমার এই কথা যদি নড়ে, মহাদেবের জট খসি' পড়ে ॥[৩]

৫২২

॥ 'বাণ' মারার মন্ত্র-ছড়া ॥

আকাশ বন্ধ, পাতাল বন্ধ, ছত্রিশ কোটি দেবতা বন্ধ,—
কার জয় ?—মহাদেবের জয় ।
কার আজ্ঞে ?—মহাদেবের আজ্ঞে—
শিগ্‌গীর গিয়ে লাগ্‌গে ।
আমার এ কথা যে করবি ঘা,[৪] সে গাবা-গোস্ত খা[৫] ,
না হয় কালী-দুর্গাব মাথা খা ॥[৬]

৫২৩

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে ।
গুয়ো পোকাতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ॥[৭]

১ ফুলিস নে, ফুলে উঠিস নে ২ শেখ সা'আতুল ইসলাম (তিলপী, জয়নগর, ২৪-পরগণা) ।

৩ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা) ।

৪ যে অমান্য করবে ৫ গাভী-গরুর মাংস খা ৬ লালু চক্রবর্তী (প্রতাপনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা) ।

৭ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬) ।

৫২৪

এক নেড়ে কুলে বেঁড়ে তাল গাছে থাকে,
যে ছেলেটা কাঁদে তার কাণে ধরে নাচে ॥[১]

৫২৫

॥ 'মহড়া'[২]-নাচের ছড়া, মেদিনীপুর ॥

ক. মহিষ-মহড়া : মহিষ্ আল্য[৩] রে, কাড়া[৪] আল্য রে—
পালাবি রে ভয় ভায়ারা[৫], ধুঞে[৬]দিল রে ॥

খ. ভালুক-মহড়া : ভালুক হুন কুথায় পায়, তেল কুথা পায়—
আল্‌নাআল্‌না খায়্যে[৭]ভালুক বনকে পালায় যায় ॥

গ. হনুমান-মহড়া : হনু গেল রে, রাবণ, হনু গেল রে—
পালাবি রে রাবণ, হনু লঙ্কা পোড়ায় রে ॥

ঘ. সিঙ্গী-মহড়া : গ্রামকে সিংহ এল রে
পালাবি রে ছানাপুনারা,[৮]ধর্যে নিয়ে যাবে রে ॥

ঙ. বাবুমহড়া : কুইল্‌কুঁঢা[৯] মরিচগুঁড়া গাঁইঠ্যে বাঁধ্যে[১০] লও
বিহাই বিহাই হে, পথের সন্ধান বাঁধ্যে লও ॥[১১]

১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গ্রাম্যগাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ (ভারতবর্ষ : মাঘ, ১৩২৩। পৃ. ২৪৩-২৪৬)।

'সাহিত্য' পত্রিকায় ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছড়াটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঋতেন্দ্রনাথের মতে ছড়াটির রূপ এই : কাঁধ-কাটা বলে আমি তাল গাছে থাকি / যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধে ধরে নাচি। এ সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য : "আমাদের শিশুকালের সেই একনেড়ে-ভীতি কিন্তু এখনো সময়ে-সময়ে মনে পড়ে। জানি না ঠাকুর মহাশয় ইহাকে সুদূর অতীতের বৌদ্ধ বা মুসলমান-ভীতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন কিনা। "কুলে বেঁড়ে" বোধহয় কুলহীন বা জাতিভ্রষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিত্যাগী হিন্দু, বৌদ্ধ (বৌদ্ধ শ্রমণগণ মস্তক মুণ্ডন করিতেন অর্থাৎ নেড়া মাথা ছিলেন) বা কালা পাহাড়ের অভিনয় করিবে, আশ্চর্য নহে কিন্তু তালগাছের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।"

২ মুখোশ। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার শিলদা, জয়পুর, জামির-ডিহি প্রভৃতি অঞ্চলে 'ছৌ নাচ' কথাটি চলিত নেই। 'মহড়া নাচ' নামেই তা পরিচিত। বেলপাহাড়ী থেকে কিছুদূরে, বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে অনেক

'ছৌনাচ' শব্দটি চলিত, যেহেতু তা পুরুলিয়ার সন্নিহিত। পুরুলিয়ার ছৌনাচে নৃত্যের বিষয়টি আজকাল আগে কণ্ঠে গেয়ে নেওয়া হয়। জয়পুর, জামির-ডিহিতে দেখেছি, নাচের বিষয়টি গলায় গাওয়া হয় না, বাঁশের বাঁশিতে (অন্যান্য অংশে সানাই ব্যবহৃত হয়) তার সুরটুকু বাজানো হয় মাত্র এবং তা নাচের সঙ্গে সঙ্গেই করা হয়, আগে নয়। অর্থাৎ গানের কথা স্থানীয় শ্রোতাদের কাছে এতোই পরিচিত, কিংবা সেইসব গান এমনই ব্যাপক যে তার সুরটুকুই যথেষ্ট, কথার প্রয়োজন নেই। এতে ওই সব গানের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যমূলকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জানি না, পুরুলিয়াতেও এই রীতি আগে প্রচলিত ছিল কিনা; এবং সভ্য-মার্জিত শ্রোতা-দর্শকদের কাছে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করবার জন্যে কোনো কোনো ব্যক্তির সচেতন প্রয়াসে এই পরিবর্তন এসে পড়েছে কি না। যাই হোক, নৃত্যের বিষয়টি বা তার বর্ণনাটি সুরে গীত হলেও তার ঢঙ ও চাল ছড়ার, কথার মধ্যে তো বটেই, নাচের সঙ্গে যুক্ত বলেও তাতে ছড়ার ধর্ম পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাঙলা ছড়ার নানা পরিবর্তন, রূপান্তর ও রকমফের প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাই এই রচনাগুলোকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রদর্শনের জন্যে মাত্র পাঁচটি ছড়া-গান দিলাম। এগুলো ঐতিহ্যমূলক রচনা, যুগযুগ ধরে অবিকৃতভাবে চলে আসছে। প্রথম চারটি ইতর প্রাণীর 'মহড়া' পরে, শেষেরটি সামাজিক মানুষের 'মহড়া' পরে নাচা হয়। এটির নাম, 'বেহাই সম্ভাষণ'। স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন, 'বাবুমহড়া' আধুনিক বস্তু। এই শেষেরটি অনেক সময় 'ফাঁস গান' (অর্থাৎ হাস্যকৌতুক করবার জন্যে) রূপেও গীত হয়, 'মহড়া' পরাও আবশ্যিক নয়। এটিতে অবশ্য ছড়ার চেয়ে সঙ্গীত ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ করেছি ৩ এলো ৪ মহিষ ৫ ডোম ভাইয়েরা, নাচের সঙ্গে যারা ঢোল বাজাচ্ছে ৬ তুলোর মতো 'ধুনে' দিল ৭ আলুনি রান্না খেয়ে ৮ ছেলে-পুলেরা ৯ খুদকুঁড়ো ১০ গাঁঠে বেঁধে ১১ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগৃহীত: লক্ষ্মীকান্ত মাহাত (জয়পুর, ঝাড়গ্রাম), ভরতচন্দ্র মাহাত (জামিরডিহি, ঝাড়-গ্রাম), হীরালাল মাহাত (জয়পুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।

আলোচ্য অঞ্চলে 'মহড়া-নাচ' মূলতঃ আনুষ্ঠানিক। গাজনের সময়, 'জাগরণ' উপলক্ষে সারারাত এই নাচ হয়ে থাকে। এই কারণে এইসব ছড়া আনুষ্ঠানিক ছড়ার পর্যায়ভুক্ত করেছি।

নির্দেশিকা

[পার্শ্বস্থিত সংখ্যা সংশ্লিষ্ট ছড়ার নির্দেশক]

ই, ঈ

ড

ঢ